ত্রৈমাসিক পত্রিকা

বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৭৬

॥ সূচীপত্র ॥

॥ সম্পাদক : হুমায়ুন কবির ॥

॥ সহঃ সম্পাদক : সুধাংশু ঘোষ ॥

আতাউর রহমান কর্তৃক শ্রীসরস্বতী প্রেস লিমিটেড, ৩২ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা ৯ হইতে মুদ্রিত ও ৫৪ গণেশচন্দ্র এভিনিউ, কলিকাতা ১৩ হইতে প্রকাশিত।

ত্রৈমাসিক পত্রিকা শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৭৬

॥ সূচীপত্র ॥

সম্পাদক : দিলীপকুমার গুপ্ত

সহকারী সম্পাদক : সুধাংশু ঘোষ

আতাউর রহমান কর্তৃক শ্রীসরস্বতী প্রেস লিমিটেড, ৩২ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা ৯ হইতে মুদ্রিত ও ৫৪ গণেশচন্দ্র এভিনিউ, কলিকাতা ১৩ হইতে প্রকাশিত।

ত্রৈমাসিক পত্রিকা

কার্তিক-পৌষ ১৩৭৬

॥ সূচীপত্র ॥

সম্পাদক : দিলীপকুমার গুপ্ত

সহকারী সম্পাদক : সুধাংশু ঘোষ

আতাউর রহমান কর্তৃক শ্রীসরস্বতী প্রেস লিমিটেড, ৩২ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা ৯ হইতে মুদ্রিত ও ৫৪ গণেশচন্দ্র এভিনিউ, কলিকাতা ১৩ হইতে প্রকাশিত।

ত্রৈমাসিক পত্রিকা চতুরঙ্গ মাঘ-চৈত্র ১৩৭৬

॥ সূচীপত্র ॥

সম্পাদক : দিলীপকুমার গুপ্ত

সহকারী সম্পাদক : সুধাংশু ঘোষ

আতাউর রহমান কর্তৃক শ্রীসরস্বতী প্রেস লিমিটেড, ৩২ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা ৯ হইতে মুদ্রিত ও ৫৪ গণেশচন্দ্র এভিনিউ, কলিকাতা ১৩ হইতে প্রকাশিত।

একত্রিংশত্তম বর্ষ প্রথম সংখ্যা

বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৭৬

ভারতীয় ঐতিহ্য

হুমায়ুন কবির

অর্থনৈতিক সংগ্রাম যত তীব্র হয়েছে, সাধারণ মানুষের মনে সংসারের যে সহজ স্বীকৃতি, তা-ও ততই টলে উঠেছে। চিরাচরিত প্রথায় প্রাচুর্য ছিল না একথা সত্য, কিন্তু সকলের জন্যই জীবনধারণের জন্য যা প্রয়োজন, তার মোটামুটি ব্যবস্থা ছিল। বাপদাদাদের পথে চলে তাঁদের পেশা অবলম্বন করে যে জীবনব্যবস্থা, তা আজ প্রায় অচল। জাতিধর্ম-নির্বিশেষে সকল রকমের মানুষ আজ সকল রকমের কাজ পেতে উদগ্রীব। বর্তমান যুগে যে সমস্ত শিল্পবাণিজ্য বা সরকারী বেসরকারী চাকুরির ব্যবস্থা, পূর্বে মানুষ তা ধারণাও করতে পারেনি। গ্রামে সবাই সবাইকে চেনে, তাই সেখানে হঠাৎ সামাজিক শ্রেণী অথবা বৃত্তি বদল তত সহজ নয়। শহর-নগরের বিরাট জনতার মধ্যে ব্যক্তি হারিয়ে যায়, সেখানে বিভিন্ন সমাজ বিভিন্ন ধর্মের মানুষ অনায়াসে মেলে, অনায়াসে আলাদা হয়ে যায়। তার ফলে আমাদের চোখের সামনে সমাজ আমূল বদলে যাচ্ছে। পুরাতন আদর্শ, পুরাতন নীতিবোধ, এমনকি সনাতন ধর্মের বন্ধন আজ শিথিল হয়ে পড়ছে। অনেকের মতে জাতিভেদপ্রথা হিন্দুসমাজের ভিত্তি, কিন্তু আজ নাগরিক জীবনের প্রভাব ও শিল্প-উদ্যোগের প্রসারের ফলে জাতিভেদপ্রথায়ও ভাঙন ধরেছে। পুরাতন অর্থনৈতিক কাঠামোর আজ অস্তিত্ব নেই বললেই চলে। জীবনযাত্রার প্রণালী ও মান দুই বদলে যাচ্ছে এবং তার ফলে মানুষের চিন্তাধারা ও জীবনদৃষ্টিতেও বিপুল পরিবর্তনের পরিচয় মেলে।

ইয়োরোপিয় প্রভাবের ফলে জীবন ও আচার ব্যবহার সম্বন্ধে ভারতবর্ষকে আজ নতুন করে ভাবতে হচ্ছে। ইয়োরোপের চিন্তাধারায় বাস্তব ও ব্যবহারিককেই বড় করে দেখা হয়েছে। ভারতবর্ষ বাস্তবকে অস্বীকার করেনি, কিন্তু প্রাচীন ভারতের ঐশ্বর্যবান যুগের কথা ছেড়ে দিলে ভারতীয় চিন্তাধারায় আধ্যাত্মিক ও পরাবিদ্যার প্রতিই ঝোঁক বেশী। শঙ্করাচার্যের আবির্ভাবের পূর্বেই ভারতীয় জীবনদৃষ্টিতে রাজসিকের প্রভাব কমে এসেছিল—তার স্থানে যা দেখা দিল, তাকে কেউ বলেছেন সাত্ত্বিক, কেউ বলেছেন তামসিক। প্রথম আবির্ভাবের দিনে ইসলাম বুদ্ধিকেন্দ্রিক বিপ্লবী মতবাদ—ভারতবর্ষে পৌঁছতে পৌঁছতে ইসলামের সেই বুদ্ধিনির্ভর বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী প্রায় লুপ্ত হয়ে এসেছিল।

ইয়োরোপের বিজ্ঞানে পরাবিদ্যার স্থান গৌণ—স্থানকালনির্ভর ব্যবহারিক বর্তমানকে নিয়েই তার কারবার। যা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, তাকে মাপা যায়, বোঝা যায়, নিয়ন্ত্রণ করা যায়। যা মাপা যায় না, বোঝা যায় না, নিয়ন্ত্রণ করা যায় না—সেই আধ্যাত্মিক নিয়ে ইয়োরোপ বহুদিন মাথা ঘামায় নি।

ভারতবর্ষের সাধনা নশ্বরকে অতিক্রম করে অবিনশ্বরের উপলব্ধি। ইংরেজ—এবং এদেশে ইংরেজই ইয়োরোপের প্রতিভূ—নশ্বরকে নিয়ে কারবার করেছে, তাকে মেপেছে, বিশ্লেষণ করেছে, ভেঙে গড়বার চেষ্টা করেছে। সুদূর ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি নিবন্ধ বলে ভারতবর্ষ বহুক্ষেত্রে বর্তমানকে অবহেলা করেছে। বর্তমানের প্রতি বেশী দৃষ্টি দিতে গিয়ে ইংরেজ বহুক্ষেত্রে ভবিষ্যতের ভাবনা করেনি, বলেছে আজকার সমস্যা আজ সমাধান করলেই যথেষ্ট। বর্তমান দুঃখগ্লানিকে ইংরেজ সহ্য করেনি—তাকে দূর করতে প্রাণপণে চেষ্টা করেছে কিন্তু ভবিষ্যতে কি বিপদ হতে পারে, কি দুঃখ আসতে পারে তা নিয়ে বিশেষ ভাবেনি। ভারতবাসী ভবিষ্যতের চিন্তায় এত মগ্ন যে অনাগত বিপদের সম্ভাবনায় বর্তমান বিঘ্নবিপদের চিন্তা করেনি। সমস্ত রকমের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার কথা ভেবে ভেবে তাই বর্তমান সম্ভাবনা অনেক সময়েই তার হাত এড়িয়ে যায়। ভারতবাসী গর্ব করে যে তার চিন্তা দূরপ্রসারী এবং ন্যায়ধর্মী। সব জিনিসের ছক কেটে তবে সে এগুতে চায়। ইংরেজ অত যুক্তিতর্কের ধার ধারে না, বলে যে জীবন ন্যায়শাস্ত্র মেনে চলে না এবং জীবনধর্মী ইংরেজ তাই জোড়াতালি দিয়েও নিজের কাজ উদ্ধার করে। পরকালে মোক্ষ মিলবে এই ভরসায় ভারতবাসী—এ বিষয়ে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বিশেষ কোন তফাত নেই—ইহলোক খোয়াতে রাজী। ইংরেজ পরকালের ভরসায় বর্তমানকে ছাড়তে প্রস্তুত নয়, এখানে এবং এখনি সে জীবনকে উপভোগ করতে চায়। বলা চলে যে এক অর্থে ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গী ও ইংরেজের দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে আকাশপাতাল তফাত। ইংরেজের বাস্তবধর্মী ও ব্যবহার-নির্ভর দৃষ্টিভঙ্গীরই কিন্তু বহুযুগ ধরে এদেশে এবং বিদেশে জয়জয়কার। তাই ভারত-বাসীও নিজের চিন্তাধারার ভিত্তি ও সার্থকতা সম্বন্ধে নতুন করে ভাবতে বাধ্য হয়েছে।

আজ ভারতবর্ষের সর্বত্র সমাজে যে পরিবর্তনশীলতা, নতুনকে গ্রহণ করবার যে প্রস্তুতি, তাকে ক্রমবর্ধমান এক নতুন ব্যবহারিক দৃষ্টিভঙ্গীর বিকাশ মনে করলে ভুল হবে না। এই নমনীয়তা ও গ্রহণশীলতা ছিল না বলেই ভারতবর্ষের ইতিহাসে বারবার বিপর্যয় ঘটেছে। ইসলামের আবির্ভাবের যুগে ভারতবর্ষের প্রাণশক্তি কমে এসেছিল বলে ভারতবাসী পরাজিত হয়েছিল। ইসলামকে গ্রহণ করেও তাকে সম্পূর্ণ আপন করে নিতে পারল না। মোগল সাম্রাজ্যের আমলেও ভারতীয় জীবনে সেই জড়তা আবার দেখা দিয়েছিল। পরিবর্তন-শীল জগতের সঙ্গে খাপ খাইয়ে পরিবর্তনকে স্বীকারের বদলে এক কঠিন ও অনমনীয় জড়তা ভারতবর্ষের হিন্দু এবং মুসলমান উভয়ের মধ্যেই দেখা দিয়েছিল। পরিবর্তন জীবনের ধর্ম, যা বদলায় না তার বিনাশ অনিবার্য। প্রাণশক্তিতে ভাটা এসেছিল বলেই ভারতবর্ষ ইয়োরোপের নবজাগ্রত শক্তির সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পরাজিত হ'ল। সামরিকক্ষেত্রে ইয়োরোপের বিজয় মানসিক ক্ষেত্রে ভারতবর্ষের অবক্ষয়ের সাক্ষাৎ ফল।

ইয়োরোপের সংঘাতে জীবনদৃষ্টি ও চিন্তাধারার পুরোনো খোলা ভেঙে গেল। ইয়োরোপ যে আদর্শ নিয়ে এসেছিল, ভারতীয় আদর্শের সঙ্গে তার কোন মিল ছিল না, অথচ ইয়ো-রোপের সামরিক ও সাংস্কৃতিক বিজয়ের পরে এ নতুন জীবনাদর্শের শক্তি ও ঔজ্জ্বল্য অস্বীকার করবারও উপায় রইল না। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য আদর্শের সংঘাতে নতুন নতুন প্রশ্ন

দেখা দিল, আজও জীবনের প্রায় সকল ক্ষেত্রেই নতুন সন্দেহ ও জিজ্ঞাসায় মুখর, কিন্তু আজও এ সন্ধান ও অভিযানের লক্ষ্য ও গতি সকলের কাছে স্পষ্ট নয়। প্রশ্নের মাধ্যমেই জ্ঞানের প্রসার। জিজ্ঞাসা না করলে কোনদিন উত্তর মেলে না। তাই প্রশ্ন ও জিজ্ঞাসা চিরদিনই তারুণ্যের লক্ষণ বলে পরিগণিত। ভারতবর্ষে যেদিন নতুন নতুন প্রশ্ন ও জিজ্ঞাসা দেখা দিল, তার অর্থ এই যে সেদিন ভারতবর্ষের যৌবন আবার দীপ্ত হয়ে উঠল। নব-জীবনের আহ্বানেও বিপদ আছে। তরুণ যেদিন শৈশব অতিক্রম করে, সেদিন সে কিছুই মানতে চায় না, সবকিছুই তার প্রশ্ন, জিজ্ঞাসা ও আনন্দের বিষয়বস্তু। তরুণ স্বপ্ন দেখে যে পৃথিবীকে নতুন করে গড়বে। যা কিছু পুরাতন, তাই জীর্ণ এবং ফলে বর্জনীয় একথা ভাবা তরুণের পক্ষে স্বাভাবিক। তার ফলে জাতির জীবন বা ঐতিহ্যের মধ্যে কি রাখতে হবে কি বাদ দিতে হবে, সে বিচার তরুণ করতে চায় না। তরুণ শুধু বিদ্রোহী নয়, সঙ্গে সঙ্গে অসহিষ্ণু। তাই তরুণের বিদ্রোহ অনেক ক্ষেত্রে আসল গলদকে আক্রমণ না করে তার বহিঃপ্রকাশকে বর্জন করেই ক্ষান্ত হয়। নবযৌবনের যে সমস্ত ত্রুটি, পুনর্যৌবনে সে সমস্ত ত্রুটি আরো মারাত্মক হতে পারে।

ভারতবর্ষের জীবনে আজ যে চাঞ্চল্য ও বিদ্রোহ, তাকে যদি সংহত ও নিয়ন্ত্রিত করা না হয়, তবে নিষ্ফল নৈরাজ্যে তা ব্যর্থ হতে বাধ্য। সংহতি ও নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রয়োজন বিচার ও বিশ্লেষণ, বুদ্ধির পুনঃপ্রতিষ্ঠা। বর্তমান যুগে পৃথিবীর সর্বত্রই বুদ্ধি ও বিচারের খানিকটা অনাদর, উনবিংশ শতকে ও বিংশ শতকের প্রথমার্ধে বিদেশের প্রতি মানুষের যে ভরসা ও আস্থা, আজ নানা কারণে তা খানিকটা শিথিল, অথচ যে সমস্ত কঠিন সমস্যা আজ আমাদের সম্মুখে, শান্ত ও স্থির বুদ্ধি ভিন্ন তাদের সমাধানের কথা ভাবাও যায় না।

একথা ভারতবর্ষের বেলা আরো বেশী প্রযোজ্য। প্রায় দুই শতাব্দীর পরাধীনতার ফলে আমাদের দেশের সাধারণ মানুষ জড়বাদী, অন্যদিকে অত্যধিক অভিমানী ও স্পর্শ-কাতর। বহুদিন বিদ্রোহ করবার শক্তিও ছিল না বলে নিজেদের অক্ষমতা ও দুর্বলতাকেও বিদেশীর অত্যাচার ও ষড়যন্ত্রের ফল মনে করেছে, নিজের কাজের দায়িত্ব নিজে নিতে চায়নি। সঙ্গে সঙ্গে অপমানবোধ এত তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে যে দেশবিদেশে সবাইকে সন্দেহ করেছে, সমালোচনাকে শত্রুতা ভেবেছে, বন্ধুর সতর্কবাণীকে আক্রমণ মনে করে প্রত্যাহার করেছে। পরাধীনতার ফলে ব্যক্তিজীবনে যে অবনতি, সামাজিক জীবনে তা আরো বেশী প্রকট হয়ে উঠেছে। সাম্রাজ্যরক্ষার স্বার্থে ইংরেজ ভারতবর্ষের ইতিহাসের বিকৃত ব্যাখ্যা করবে এটা হয়তো স্বাভাবিক, কিন্তু তার ফলে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষ নিজেদের মানবধর্ম ভুলে পরস্পরকে হিংসা ও বিদ্বেষের চোখে দেখেছে। এই সন্দেহ ও সংঘাতের আবহাওয়ায় পুনরুজ্জীবন ও পুনরাবৃত্তির মধ্যে পার্থক্য বহুক্ষেত্রে লোপ পেয়েছে। জাতির উন্নতির জন্য পুনরুজ্জীবন প্রয়োজন। মরা গাঙে যদি বান না ডাকে, তবে জাতি এগোবে কি ভাবে? তার অর্থ কিন্তু পুনরাবৃত্তি নয়। পুনরাবৃত্তি সম্ভব নয়, পুনরাবৃত্তির সাধনায় জাতির শক্তি ও উদ্যমের শুধু অপব্যয় হবে। পঞ্চম শতাব্দীর গুপ্তযুগের ভারতবর্ষ আজকার জগতে অচল। ষোড়শ শতাব্দীর মোগল যুগের ভারতবর্ষকেও ফেরানো যাবে না। পুনরু-জ্জীবন ও পুনরাবৃত্তির মধ্যে পার্থক্য স্পষ্ট করে তুলে ধরা হয়নি বলে আজকার ভারতবর্ষে একই মানুষ একই সঙ্গে কুসংস্কারবদ্ধ সাম্প্রদায়িকতাবাদী এবং বিপ্লবপন্থী প্রগতিবাদী। ফলে প্রগতি এবং সংস্কার দুই-ই অসম্পূর্ণ, কেবলমাত্র অন্ধ আবেগ ও গোঁড়ামি আমাদের

চলার পথ কঠিন করে তোলে। ভারতীয় অতীতে যা ঐশ্বর্যবান যা মহৎ তাকে সঞ্জীবিত করে যা জীর্ণ যা ক্ষীয়মাণ তাকে বর্জন করে যদি মহিমান্বিত ভবিষ্যৎ গড়তে আমরা চাই, তবে বুদ্ধির শান্ত ও শীতল দৃষ্টিতে সমস্ত কিছুর নতুন মূল্যায়ন করতে হবে। ভারতবর্ষে আজো একদল লোকের পরিচয় মেলে যারা কেবলমাত্র বহিরাগত বলে ইয়োরোপের সবকিছু বর্জন করতে চায়। এককালে ইয়োরোপের অন্ধ অনুকরণ যারা করেছে, তাদের পক্ষে এ ধরনের প্রতিক্রিয়া অস্বাভাবিক নয়। অন্যায়কে বর্জন করলেই কিন্তু ন্যায় প্রতিষ্ঠিত হয় না—এক মিথ্যার স্থান আরেক মিথ্যা অধিকার করতে পারে। কেবলমাত্র ইয়োরোপিয় বলে যদি আজ আমরা পাশ্চাত্যের আদর্শ বা চিন্তাধারা অন্ধভাবে বর্জন করি, তবে তাতে আমাদেরই ক্ষতি হবে বেশী। আক্রোশের বশে ভারতবর্ষের ভবিষ্যতের জন্য অবশ্য-প্রয়োজনীয় উপাদানও কেউ কেউ বাদ দিতে চান, কিন্তু যদি এ ধরনের ছুঁৎমার্গ আবার ভারতবর্ষে প্রবল হয়, তবে ভারতবর্ষ আবার পৃথিবীর সভ্যতার বিপুল প্রবাহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে। বিচ্ছেদ থেকে আসবে মানসিক দূরত্ব, এবং মানসিক দূরত্বের ফল জড়তা। আমরা যদি অন্যকে একঘরে করি, তবে তাদের সম্পর্কে আমরাও যে নিজেরাই একঘরে হয়ে পড়ি সেকথা অনেক সময় মনে থাকে না। বিশ্বসভ্যতাপ্রবাহ থেকে বিচ্ছিন্ন হবার ফলে অতীতে বহুবার ভারতবর্ষের বিরাট ক্ষতি হয়েছে, আজ সজ্ঞানে সে ক্ষতি ডেকে আনা আত্মঘাতেরই নামান্তর।

আরো একটি কথা আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন। বিচ্ছিন্ন হতে চাইলেই বর্তমান জগতে বিচ্ছিন্ন থাকা যাবে না। বিজ্ঞানের প্রগতিতে ব্যবসায়ে-বাণিজ্যে, শিক্ষায়-দীক্ষায় অর্থনীতিতে রাজনীতিতে আজ যেভাবে পৃথিবী একতাবদ্ধ, তাতে কেউ সরে থাকতে চাইলেও সরে থাকতে পারবে না। ফল হবে শুধু এই যে স্বেচ্ছায় সজ্ঞানে বিশ্বপ্রবাহের অংশীদার না হয়ে আমরা বিশ্বশক্তির ক্রিয়াপ্রক্রিয়ায় ক্রীড়নক হয়ে দাঁড়াব। আমরা সরে দাঁড়াতে চাইলে আমরা পৃথিবীকে প্রভাবান্বিত করতে পারব না, কিন্তু পৃথিবীর অন্যান্য দেশ, অন্যান্য শক্তি নিজেদের স্বার্থে সমস্ত কাজ করবে, তার ফলভোগ আমাদেরও করতে হবে। ভারতবর্ষে অনেকে যে প্রতীচ্যকে অস্বীকার করতে চান, তার কারণ বোঝা কঠিন নয়। ভারতবর্ষের গত দুই শতাব্দীর ইতিহাস জাতির অবমাননা ও সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদের ইতিহাস—দেশভক্ত মানুষ সে ইতিহাস ভুলতে চাইবেন, তাতে আশ্চর্য কি? কিন্তু তবু এ প্রলোভন আমাদের ছাড়তে হবে। পাশ্চাত্য যে সমস্ত ক্ষেত্রে এগিয়ে গেছে, সেখানে তার দান স্বীকার না করলে আমাদেরই ক্ষতি হবে। ভারতবর্ষে তার প্রথম বিকাশ বলে যদি আজকার দিনে অচল ধারণা বা প্রতিষ্ঠান আঁকড়ে ধরতে চাই, তাহলে সে চেষ্টাও ব্যর্থ হবে। যুক্তি না থাকলে মানুষ চেঁচিয়ে নিজের কথা চালাতে চায়, মনের মধ্যে যদি হীনতাবোধ থাকে তবে জোর করে বহু ক্ষেত্রে তা চাপা দিতে চেষ্টা করে। আত্মবিশ্বাস থাকলে এ ধরনের ব্যবহারের প্রয়োজন নেই। যে দেশ বা যে জাতি যে কোন কালে মানুষের সংস্কৃতিতে মূল্যবান যা কিছু দিয়েছে তাকে আপন করে নিয়ে জাতির সংস্কৃতি ও সভ্যতাকে সমৃদ্ধ করাই আত্মস্থ সুস্থ মানুষের ধর্ম।

এ প্রসঙ্গে আরো একটি কথা মনে রাখা প্রয়োজন। ইংরেজের চশমা দিয়ে ভারতবর্ষ পাশ্চাত্যকে দেখেছিল বলে সমস্ত প্রতীচ্য সভ্যতায় ইংরিজি রঙ লেগেছিল। আমাদের চিন্তাধারায় যে বিদেশী প্রভাব, তা মুখ্যত ইংরিজি সাহিত্যদর্শনের প্রভাব। ইংরিজি ভাষার মাধ্যমে যতটুকু পরিচয় সম্ভব, ইয়োরোপের অন্যান্য দেশকে আমরা শুধু ততটুকু জেনেছি। আমেরিকার যে স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে সেকথাও আমরা বহুদিন স্বীকার করিনি। আজ

অবশ্য অবস্থা অনেক বদলেছে কিন্তু তবু ইংরিজি প্রভাব আমরা পুরোপুরি এড়িয়ে উঠতে পারিনি। অনেক ইংরেজ মনীষীও বলেন যে ইংলন্ডের সংস্পর্শে এসে ভারতবর্ষের যা যা লাভ হয়েছে, তার মধ্যে ইংরিজি সাহিত্য এবং ভাষা সবচেয়ে বড়। একথা বহুলাংশে সত্য। আমাদের পোশাকে আচারব্যবহারে সামাজিক রীতি-নীতি অনুষ্ঠানে বহুদিন ইংরেজ বিশেষ কোন পরিবর্তন আনতে পারেনি। সে তুলনায় ইংরিজি ভাষা ও সাহিত্যের মাধ্যমে আমাদের জীবনদর্শন ও চিন্তাধারায় যে পরিবর্তন, তাকে বিপ্লবকারী বললে অত্যুক্তি হবে না।

ইংরিজি ভাষা ও সাহিত্য আমাদের গভীরভাবে প্রভাবান্বিত করেছে কিন্তু তার ফলে পৃথিবীর অন্য বহু সভ্যতার প্রভাব থেকে আমরা অন্তত আংশিকভাবে বঞ্চিত হয়েছি। একথা সত্য যে ইংরিজি অনুবাদের মাধ্যমে ইয়োরোপের অন্যান্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির খানিকটা পরিচয় আমরা পেয়েছি, কিন্তু ইংরিজির উপর আমরা এত বেশী জোর দিয়েছি যে তার ফলে অন্য সব কিছুই অবহেলিত হয়েছে। প্রত্যেক ইয়োরোপিয় ভাষার নিজস্ব একটা ঢঙ আছে। সভ্যতা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও ফরাসী, জার্মান বা রুশদেশের সঙ্গে ইংলন্ডের অনেক তফাত। ইংরেজি অনুবাদে তাই আসলের স্বাদ খানিকটা বদলে যায়। শুধু তাই নয়। যে সমস্ত আদর্শ বা উপাদান ইংরেজের কাছে গ্রহণযোগ্য, সাধারণত সেগুলিরই ইংরিজি অনুবাদ হয়। ইংরিজি মাপকাঠি দিয়ে তাদের বিচার করা তাই অন্যায়। আমরা কিন্তু শুধু ইয়োরোপিয় নয়, এশিয়া-আফ্রিকার সাহিত্য-সংস্কৃতিকেও ইংরিজির দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে বিচার করতে চেয়েছি। তার ফলে অনেক সময় হাস্যকর পরিস্থিতি দেখা দেয়। যত চেষ্টাই করি না কেন, ভারতবাসী কোনদিনই ভাবনায় আদর্শচিন্তায় ষোলআনা ইংরেজ হতে পারবে না। এ ধরনের প্রয়াসে হয়তো কিছু নকল ইংরেজ তৈরী হতে পারে, কিন্তু যেখানে আসল ইংরেজ উপস্থিত, সেখানে নকলের কোন দাম নেই। স্ব-অধিকারে যদি বিশ্ব নাগরিক হতে না পারি, তবে অন্যের দোহাই দিয়ে সে অধিকার মিলবে না।

ইংরিজি প্রভাবের একটি বিশেষ দিকের উল্লেখ অবান্তর হবে না। সামাজিক ব্যবহার ও ব্যক্তিগত সম্বন্ধে ইংরেজ অত্যন্ত সংযত ও সাধারণত অল্পভাষী। সহজে উত্তেজিত হয় না, সব ব্যাপারেই মাথা ঠান্ডা—ইংরেজের এ পরিচয় প্রায় সর্বজনবিদিত। সংযম ও সতর্কতার এ অভিব্যক্তি শুধু ব্যক্তিগত জীবনে নয়, জাতীয় জীবনেও মেলে। নেপোলিয়ন তাই বলেছিলেন যে ইংরেজ দোকানদারের জাতি, নিক্তিতে ওজন করে হিসেব করে কথা বলে, কাজ করে। ইংরেজ চরিত্রের এ পরিচয় কিন্তু পুরোপুরি মানা যায় না। কথায় বা ব্যবহারে যে আবেগ সংহত ও নিয়ন্ত্রিত, কাব্যসাহিত্যচিত্রে তা উদ্বেল হয়ে ওঠে। ইংরিজি কবিতায় কামনা ও আশার যে তীব্র অনুভূতি, পৃথিবীর যে কোন ভাষার সাহিত্যের সঙ্গে তার তুলনা চলে।

ইংরেজের স্বভাব ও ইংরিজি কবিতার আদর্শ দিয়ে যদি আমরা সাহিত্যের বিচার করতে চাই, তাহলেও ভুল হতে বাধ্য। মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষা কামনা সাহিত্যের অন্যতম উপাদান, হয়তো শ্রেষ্ঠ উপাদান। কিন্তু তাই বলে আশা আকাঙ্ক্ষা কামনাকে সাহিত্যের লক্ষ্য মনে করা চলে না। বুদ্ধিবিচারও সাহিত্যের অঙ্গ এবং ফরাসী অথবা ইতালিয় সাহিত্যে বুদ্ধিপ্রধান যে স্বচ্ছ ও উজ্জ্বল রচনা, তার সাহিত্যমর্যাদাও কম নয়। ইংরিজি চশমা দিয়ে অন্যান্য সভ্যতা বা সাহিত্যের বিচার করতে চাইলে তাই পদে পদে ভুল হবে, কিন্তু সেই ভুল ভারতবর্ষের অনেকেই করেন। মার্কিন সাহিত্যে যেভাবে সব জিনিস খোলাখুলি আলোচনা হয়, সামাজিক সাম্যের তাগিদে তথাকথিত ভদ্রতার মুখোশ অনেকখানি

খুলে যায়, ইংরেজের ভব্যসভ্য সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গিতে তার আদর নেই কিন্তু তার ফলে ক্ষতি হয়েছে ইংরেজেরই বেশী। ফরাসী সাহিত্যের বিশ্লেষণী মনোভাব বা জাপানী কবিতার কঠোর ভাবসংযম ইংরিজি কবিতার আবেগবহুল মাপকাঠি দিয়ে বিচার করা চলে না।

তবু ইংরেজের আবির্ভাবে ভারতবর্ষের সাহিত্যে এক নতুন যুগ দেখা দিল। বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় সাহিত্যসৃষ্টি বহুদিন পূর্ব হতেই শুরু হয়েছিল। পাঠান মোগল যুগে বাঙলা সাহিত্যের যে বিকাশ তার উল্লেখ পূর্বেই করেছি। মহারাষ্ট্রে যে ভক্তিকাব্য মধ্যযুগে রচিত হয়, তার মূল্য চিরদিন থাকবে। কবির এবং তাঁর সহযোগীদের কবিতায় অভিজ্ঞতা ও অভিব্যক্তির যে প্রকাশ, তারও বেশী তুলনা মিলবে না। তুলসীদাসের রামায়ণ আজো হিন্দীভাষীদের দৈনন্দিন পাঠ। ইংরেজের আবির্ভাবের পূর্বেই তাই এদেশে বিভিন্ন ভাষায় সমৃদ্ধ সাহিত্যের পত্তন হয়েছিল কিন্তু ইংরেজ শাসনে সমাজের বহু নতুন স্তরে এক নব-জীবনের স্পন্দন দেখা দিল বলে সাম্প্রতিক যুগে এদেশে যে সাহিত্য গড়ে উঠল, প্রসার, প্রাণশক্তি ও দৃষ্টিভঙ্গীর নবীনতায় তার বৈশিষ্ট্য অনস্বীকার্য।

ইংরেজ আমলে দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক সংগঠনে যে সমস্ত রূপান্তর, তার প্রভাব সাহিত্যেও লক্ষণীয়। বাঙলাদেশের সামাজিক সংগঠন গত দেড়শো দুশো বছর কিভাবে বদলেছে তার কথা পূর্বেও বলেছি। তার একটি প্রধান লক্ষণ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অভূতপূর্ব সম্প্রসারণ। সেই সম্প্রসারণের ফলে অবসর উপভোগের সম্ভাবনা বেড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে সেই অবসরের সদ্ব্যবহার করতে পারে, সমাজে এ ধরনের মানুষের সংখ্যাও অনেকখানি বৃদ্ধি পেল। বাঙলাদেশে সাহিত্যশিল্পসংগীত প্রভৃতি চারুকলার যে অভূত-পূর্ব বিকাশ, মধ্যবিত্তশ্রেণীর সম্প্রসারণের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ যোগ রয়েছে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রভাবে জমিদার, পরে তালুকদার এবং শেষে ভূমিস্বত্বের অধিকারী নানা ধরনের মধ্যবিত্তশ্রেণীর সংখ্যা ক্রমাগত বাড়তে লাগল। ফলে অর্থনীতির ক্ষেত্রে বাঙলাদেশের যে ক্ষতি তা অপরিমেয়। দেশের ঐশ্বর্য ব্যবসাবাণিজ্য উদ্যোগের মাধ্যমে নিত্যনতুন সম্পদ সৃষ্টির বদলে জমিদারি প্রথার স্বল্প-লাভ কিন্তু নিশ্চিত আয় এবং সামাজিক মর্যাদার মোহে মানুষ আকৃষ্ট হল। বাঁধা আয়—সে বেতনই হোক অথবা ভূমি থেকে উপলব্ধ উপার্জন হোক —বাঙালীর লক্ষ্য হয়ে দাঁড়াল বলে ব্যবসা-বাণিজ্য যে ঝুঁকি নিতে হয়, বেশী লাভের লোভে লোকসানের সম্ভাবনা মেনে নিতে হয়, বাঙালী তা থেকে পিছে হঠে এল। কেবল অর্থ-নীতির ক্ষেত্রে নয়। রাজনীতির ক্ষেত্রেও চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে বাঙলাদেশের বহু ক্ষতি হয়েছে। জমিদার তালুকদার সৃষ্টি করে ইংরেজ দেশের শাসকশ্রেণী ও শাসিত-শ্রেণীর মধ্যে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের সম্ভাবনাকে মলিন করে দিয়েছে। শাসিত শ্রেণী বহুক্ষেত্রে শোষিতশ্রেণী কিন্তু তাদের বিদ্রোহ ও ক্রোধের প্রথম ধাক্কা সয়েছে তাদেরই মত শাসিত আর এক শ্রেণী—রাজা মহারাজা জমিদার তালুকদারের দল। একমাত্র চারুকলার ক্ষেত্রে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে দেশের প্রভূত লাভ হয়েছে। বাঙলাদেশের সম্প্রসারিত মধ্যবিত্তশ্রেণীর মাধ্যমে সাহিত্যের যে বিকাশ, তাতে মাইকেল মধুসূদন বিদ্যাসাগর থেকে শুরু করে যে-সব মহারথীর আবির্ভাব, রবীন্দ্রনাথের বিশ্ববিজয়ী প্রতিভায় তার চরম পরিণতি।

ইংরিজি কাব্যসাহিত্যের সংস্পর্শে এসে বাঙালীর মনে যে নতুন উদ্দীপনা, তার ফলে বাঙলা সাহিত্যে নতুন ফসলের মৌসুম দেখা দিল। কেবলমাত্র ইংরিজি সাহিত্যের প্রভাবে বাঙলার নবজাগরণ সম্ভব হত না, কিন্তু ইয়োরোপিয় ধনতন্ত্রের সংঘাতে এদেশের সমাজে যে অর্থনৈতিক রাজনৈতিক ও মানসিক রূপান্তর, তাদের যুগ্ম প্রভাব বাঙালীর মানসে

নবজীবনের সঞ্চার হল। সাম্প্রতিক বাঙলা সাহিত্যে সেই নবজীবনের শ্রেষ্ঠ প্রকাশ।

নয়া বাঙলার সমাজ মধ্যবিত্তশ্রেণীকে ভিত্তি করে গড়ে উঠছিল। মধ্যবিত্ত সমাজের মানুষ সর্বত্রই আত্মকেন্দ্রিক, নিজের ভাবনাচিন্তা আবেগ-আশাকে বেশী বড় করে দেখে। ইংরিজি সমাজেও মধ্যবিত্তশ্রেণীরই প্রাধান্য এবং সেজন্য ইংরিজি সাহিত্য অত্যধিক পরিমাণে আবেগনির্ভর। আমরা পূর্বেই দেখেছি যে ইংরিজি কবিতায় ভাবের যে অকুণ্ঠ প্রকাশ, বাসনা কামনা সে কাব্যে যেভাবে উদ্বেল হয়ে ওঠে, কোন দেশের ধ্রুপদী সাহিত্যেই তার পরিচয় মেলে না। কেবল ধ্রুপদী সাহিত্য বলে নয়, ইয়োরোপের লাতিন সাহিত্যেও ভাবাবেগকে সংহত ও সংযত করেই শিল্পের বিকাশ। সংহতি ও সংযম সমাজরক্ষার জন্য প্রয়োজন। ইংরেজ সামাজিক সংগঠনে সংহতি ও সংযমের উপর বেশী জোর দিয়েছে বলে হয়তো তারই প্রতিক্রিয়ায় ইংরেজি সাহিত্যে আশা-আকাঙ্ক্ষা-কামনার অনিরুদ্ধ প্রকাশ।

মধ্যবিত্তশ্রেণীর অত্যধিক সম্প্রসারণের ফলে কিন্তু ভারতবর্ষের প্রাচীন সমাজব্যবস্থায় ভাঙনের লক্ষণ দেখা দিল। মধ্যবিত্ত মানুষ আত্মকেন্দ্রিক, তাই আচার-ব্যবহারের বন্ধন বা সংস্কারের নিষ্প্রশ্ন প্রভুত্ব সহ্য করতে চায় না। চিরাচরিত প্রথার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ প্রথম তরুণ সম্প্রদায়ের মধ্যেই দেখা দিল। স্বাধীনতার নবীন উন্মাদনায় তারা শাসনের অচলায়তনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম শুরু করল। জাতীয় চরিত্রে তার ফলে যে পরিবর্তন, ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য, জিজ্ঞাসা ও বিদ্রোহ তার মর্মকথা। ইংরিজি সাহিত্যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতার জয়জয়কার, তাই নবযুগের বাঙালী সেই সাহিত্যে নিজের মনের কথার প্রতিধ্বনি দেখে আরো উদ্দীপ্ত হয়ে উঠল। ভারতবর্ষের অন্য কোথাও ইংরিজি সাহিত্যের প্রভাব এত ব্যাপক বা গভীর হয়নি, কারণ অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় মধ্যবিত্তশ্রেণীর সম্প্রসারণ বাঙলাদেশে অনেক বেশী।

ইংরিজি আমলের শুরু থেকেই বাঙলার কাব্যসাহিত্যে তাই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের এক নতুন সুর দেখা দিল। জিজ্ঞাসা ও বিদ্রোহের কবিতা বাঙলাদেশে যত বেশী, ভারতবর্ষের অন্যত্র তার পরিচয় মেলে না। বাঙলাকাব্যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের সুর দিনদিন এত প্রবল হয়ে উঠল যে তার ফলে ব্যক্তি সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নিজেকে একান্তভাবে নিঃসঙ্গ ও একক ভাবতে শুরু করল। বিশ্বজগতের বিরাট প্রসারের মধ্যে মানবাত্মার নিঃসঙ্গ অভিযান রবীন্দ্র-কাব্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য, সেই সঙ্গীহীনতার বিষাদ তাকে গভীর ও মায়াময় করে তুলেছে।

ব্যক্তি যখন নিজেকে স্বতন্ত্র মনে করে, তখন তার প্রথম অভিব্যক্তি নিদারুণ নিঃসঙ্গতা-বোধ। মানুষ কিন্তু একান্তভাবে সামাজিক জীব, তাই সেই নিঃসঙ্গতাবোধের পরিণতিতে ব্যক্তিত্বের ঐক্য বিনষ্ট হয়ে যায়। বিখণ্ডিত ব্যক্তিত্বের পরিচয় বাঙলাকাব্যে সুস্পষ্ট কিন্তু ভারতবর্ষের প্রায় প্রতি অঞ্চলে চারুকলার সমস্ত প্রকাশেই তার লক্ষণ দেখা দিয়েছে।

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের উপর বেশী জোর দিলে সমাজবন্ধন শিথিল হতে বাধ্য। ধর্মবিশ্বাস ও নীতিবোধ ছাড়াও লোকাচার ও সামাজিক অনুষ্ঠান মানুষে মানুষে যোগস্থাপন করে। ব্যক্তি যখন সামাজিক আদর্শকে মনে প্রাণে গ্রহণ করে তাকে পূরণ করতে চায়, তখন সমাজের মধ্যে সংঘর্ষ কমে আসে। অন্যপক্ষে ব্যক্তি যখন নিজের বিচারবুদ্ধিকে সামাজিক দৃষ্টি-ভঙ্গীর চেয়ে বড় মনে করে, তখন পুরাতন সামাজিক আদর্শ ভাঙতে শুরু করে। সমাজ-ব্যবস্থা যখন এভাবে ভাঙে, তখন কিন্তু সে ক্ষতির পরিপূরণ অন্যভাবে হয়। জীর্ণ ক্ষয়িষ্ণু সমাজে সাহিত্য-শিল্পকলার আকস্মিক বিকাশ আমাদের বিস্মিত করে, কিন্তু ইতিহাসে এ ধরনের পরিণতি বহুবার দেখা দিয়েছে। সে বিকাশ আকস্মিক হলেও অকারণ বা

অপ্রত্যাশিত নয়। ব্যক্তির আত্মপ্রকাশই সমস্ত শিল্পকলার মর্মকথা। যে সৃষ্টিতে ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্যের পরিচয় মেলে না, তাকে সার্থক শিল্পকলা বলা যায় না। সমাজের চিরাচরিত প্রথা বা প্রচলিত বিশ্বাস যখন ভেঙে পড়ে, ব্যক্তি নিজের মতামতকে সামাজিক সংস্কারের উপর প্রাধান্য দেয়, তখন যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়, তাতে শিল্পকলার উৎকর্ষ হওয়া স্বাভাবিক। ব্যক্তিকেন্দ্রিক মধ্যবিত্তশ্রেণীর সম্প্রসারণের সঙ্গে ভারতবর্ষে যে শিল্পকলার বিভিন্ন ক্ষেত্রে নতুন নতুন বিকাশ দেখা দেবে, তাতে আশ্চর্য হবার কারণ নেই।

এ প্রসঙ্গে আর একটি কথাও মনে রাখা দরকার। সাম্প্রতিক ভারতবর্ষে শিল্পকলার প্রায় সমস্ত ক্ষেত্রেই অভূতপূর্ব বিকাশের পরিচয় মেলে, কিন্তু স্থাপত্যশিল্পের বেলা আমাদের বর্তমান দৈন্য অতীত কীর্তির তুলনায় আরো স্পষ্ট হয়ে উঠে। শুধু স্থাপত্য বলে নয়, নাট্যশিল্পেও সত্যিকার মহৎ সৃষ্টির বর্তমানে একান্ত অভাব। "বর্তমান" কথাটির উপর জোর দেওয়া প্রয়োজন, কারণ প্রাচীন যে সমস্ত বিরাট কীর্তি আজও পৃথিবীর বিস্ময় আকর্ষণ করে, তাদের দিকে তাকালে মানতেই হবে যে ভারতীয় প্রতিভা এককালে স্থাপত্যে নাট্যে অপরূপ সমৃদ্ধি সৃষ্টি করেছিল। দক্ষিণ ভারতের মন্দিরে একদিকে বিচিত্র ও সূক্ষ্ম কারুকার্যের অপরূপ সমাবেশ, অন্যদিকে মহিমা ও শক্তির স্পর্ধিত প্রকাশ। মোগলযুগের মসজিদে মকবরায় ভারসাম্য ও রেখাশিল্পের যে অপূর্ব সমন্বয়, সকল দেশের সকল স্থপতি তাকে শ্রদ্ধা নিবেদন করে। সাম্প্রতিক ভারতবর্ষে এ গৌরবান্বিত ঐতিহ্যের অকস্মাৎ অবসান হয়েছে। বিরাট সৌধ অথবা মহৎ স্থাপত্য রচনার জন্য যে কল্পনাশক্তি ও সৃষ্টিকরী প্রতিভার প্রয়োজন, গত দেড়শো দুশো বছরে ভারতীয় স্থপতি কোথাও তার পরিচয় দেননি। নাট্যশিল্পের বেলায় একথা সমানভাবে প্রযোজ্য। এককালে ভারতীয় নাট্যকারের প্রতিভাদীপ্ত রচনা সমস্ত পৃথিবীর বিস্ময় অর্জন করেছে, কিন্তু স্থাপত্যের মতন নাট্য-শিল্পেও বিগত দু-তিন শতাব্দী ধরে ভারতীয় প্রতিভা বন্ধ্যা। শিল্পকলার অন্যান্য ক্ষেত্রে যেখানে বহু সার্থক সৃষ্টির পরিচয় মেলে, সেখানে স্থাপত্যে অথবা নাট্যে এ নিষ্ফলতার কারণ এ দুটি শিল্পপদ্ধতির প্রকৃতির মধ্যেই রয়েছে মনে করলে ভুল হবে না।

শিল্পসৃষ্টির যত বিভিন্ন প্রক্রিয়া, তাদের মধ্যে স্থাপত্য বোধ হয় সবচেয়ে বেশী সমাজনির্ভর। কবি নিজের মানসজগতে বিহারী, পারিপার্শ্বিক জগৎকে অবহেলা বা অস্বীকার করেও কাব্যসৃষ্টি সম্ভব। চিত্রকরও প্রতিকূল প্রতিবেশ অগ্রাহ্য করে নিজের রচনার মধ্যে তৃপ্তি পেতে পারে। সংগীতের মূল সূত্রও ব্যক্তির সম্বিতের মধ্যে নিহিত। স্থপতিকে কিন্তু প্রতিপদেই সামাজিক সহযোগের উপর নির্ভর করতে হয়। বহু মানুষের সমবেত প্রচেষ্টা ভিন্ন ক্ষুদ্র বা বিরাট কোন সৌধরচনাই সম্ভব নয়। কেবলমাত্র শিল্পপতি নয়, তার সহকারী প্রত্যেকটি শিল্পীর মনে যদি স্থাপত্যের মহিমা ও সৌন্দর্যের ছবি না থাকে, তবে হয়তো অট্টালিকা তৈরী হবে কিন্তু স্থাপত্যসৃষ্টি হবে না। সমস্ত সমাজের আদর্শ ও প্রয়াস সংহত ও একমুখী না হলে বিরাট সৃষ্টি সম্ভব নয়। দক্ষিণ ভারতের পাথরে খোদা মন্দিরই হোক, ইয়োরোপের গথিক ক্যাথেড্রালই হোক অথবা মুসলমান আমলের বিরাট মসজিদ মকবরাই হোক—স্থাপত্যের এ সমস্ত মহৎ সৃষ্টির মূলে সমগ্র সমাজের ঐক্য ও সংহতি। অন্তর্দ্বন্দ্বের কারণ যাই হোক না কেন, আভ্যন্তরিক সংঘর্ষের ফলে সমাজ যখন দ্বিখণ্ডিত হয়, তখন সমস্ত শিল্পসৃষ্টির মধ্যে স্থাপত্যের অবনতিই প্রথম দেখা দেয়। স্থাপত্যের মতন নাট্যশিল্পও একান্তভাবে সমাজনির্ভর, তাই সমাজের আভ্যন্তরিক শান্তি ও ঐক্যলোপের সঙ্গে সঙ্গে নাট্যশিল্পেরও অবক্ষয় শুরু হয়।
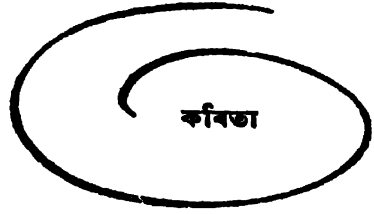
আধিভৌতিক

চিন্ময় গুহঠাকুরতা

মৃতের মত শীতল সেই জ্যোৎস্না, মৃদু আলো
কাচের শবাধারে, ঠিকরে পড়ে দীর্ঘতর ছায়া
শাদারঙের চাদরখানি বিছিয়ে আছে মাঠে
পায়ে পায়ে ঘুরতে থাকে হাওয়া।

এমন সময় কারা যেন মাঠ পেরিয়ে আসে
অন্ধকারের পাল্কি কাঁধে নিয়ে
এপার ওপার দুলতে থাকে বড়ই ম্রিয়মাণ
লণ্ঠনের শঙ্কাতুর শিখা।

যতই কাছে আসছে হাওয়া, পাল্কি জোরে ছোটে
জোনাকিদের ব্যস্ত আসা যাওয়া
শাদা চাঁদের নরম আলো কাচের শবাধারে
ফুলবাগানে শিউলি ঝরে থাকে।
পথ খুঁজতে পথ হারালো, গতি বাড়ছে দ্রুত
হৃদয়পুরের রাস্তা কি উত্তরে?
পাল্কি থেকে মুখ বাড়িয়ে ফিসফিসিয়ে বলে
পর্দা ফেলে মুখ লুকালো কেন?

রহস্যের গন্ধ পেয়ে শিউলি ফুটে ওঠে
জোনাকিরাও সহসা উৎসুক,
ঘষা কাচের বাক্স থেকে লাফিয়ে পড়ে চাঁদ
গড়িয়ে যায় দূরের মাঠে মাঠে।

কলকাতা, একই ছবি

অজিতকুমার মুখোপাধ্যায়

সেই পরিচিত গ্রাম, নদী, মাঠ, খোলামেলা সবুজ প্রান্তর,
পুরান দৃষ্টির পথে ঠেকে
বাসনা অন্তিমে যেন রোদ হয়ে মিশে যায় বিমুগ্ধ বকুলে;
—ফিরে আসা আমেরিকা থেকে।

তৃপ্তির আকাশে আঁকা একই ছবি কলকাতা সাজানো শহর,
টমাটো সসের রঙে ডোবা।
যা ছিল বুকের মাঝে বুক ভেঙে বার হয়, মেঘময় গানে
বাঁধা পথ দিগন্ত-সম্ভবা।

এখানে কোথায় সেই লাল আপেলের কুঞ্জে টেক্সাসের চাষী
জ্বলন্ত রোদ্দুরে দেখে ট্রেন
দিগন্ত কাঁপায় ঝড়ে। নীল নির্নিমিখ ভাঙে চকিত বিস্ময়ে-
'আপনি কি সেখানে ছিলেন?'

চেনা সে গলির মোড় কিদোয়াই রোড আর মৌলানা কলেজ,
কতদিন দেখিনি স্মৃতিকে;
তিনের ছয়ের বি—বাড়িতে কাঁপছে রোদ; দীর্ঘ বেলা বয়;
—ফিরে আসা আমেরিকা থেকে।

প্রস্থানের আগে

শান্তি লাহিড়ী

শেষ বারের মত মুখ ফেরালে তুমি আমাকে দেখতেই পাবে না।

আমি যত ছলনাই করি—
নীলকে শাদা এবং লোহিতকে সবুজ—
আমি ডিগবাজি খেয়ে নিজের বুকে নিজে হাত রাখি।
কিন্তু সব শেষ হতে হলে
তোমাকে রঙ্গমঞ্চের আড়ালে আরো কিছুক্ষণ বসে থাকতে হবে,
কারণ
দর্শকের আসনে তোমাকে মানায় না।
তুমি যখন অধীর উত্তেজনায়
হাততালি দেবে বলে প্রস্তুত হয়ে বসে আছ
ঠিক যখন ওপর থেকে নীল আলোটা আমার মুখে—
তুমি হাততালি দেবার পরিবর্তে আর্তনাদ করে উঠলে,
কারণ
তুমি কি জানতে এমন নাটক কখনো বিয়োগান্ত হয়!

আমার মুখের রং তখন শাদা,
তুমি আমার বিবর্ণ ঠোঁট তোমার সতৃষ্ণ ঠোঁটের মধ্যে টেনে নেবে,
কারণ,
আমি তো এমনি করেই তোমাকে চুম্বন করতাম,
আর
সে চুম্বনে আমার রং প্রতি মুহূর্তে সূর্যের সাতরং হয়ে উঠত।

অথচ
তুমি কি জানতে আজকেই আমার বাজি দেখাবার শেষ রজনী।

গন্ধরাজ

সমীর রক্ষিত

এজন্মেই মর্তের ঘনিষ্ঠ কোলে—এজন্মেই কবে যেন সেইসব গাঢ়তম কৈশোরক দিনগুলি
আমার চোখের তন্ময় কৃষ্ণ মণিকার চারিধারে কুঁদে কুঁদে
কেটেছিল একটিই পরিক্রমাপথ;
পৃথিবীর কিম্বা অন্য যেকোন গ্রহের চেয়ে ঢের দীর্ঘ সে পথ,
আমি তারে বাল্যের খেলাচ্ছলে
গ্রীষ্ম বর্ষা শরৎ হেমন্ত শীত নিবিড় বসন্তে হেলেদুলে পার হয়ে গেছি—
নদীর সহজগতি বাতাসের চেয়ে দ্রুতবেগে।
সেই যে প্রথম আমি চিনেছি উদ্ধতশির শুভ্র গন্ধরাজ আঁধারের পর্বতশিখরে
তারে আমি ভুলিতে পারি না—চোখ রুদ্ধ হলে তবু সৌগন্ধে সন্নত নীলনেত্রের পল্লব।
মহৎ যৌবনে আমি তাই দুবাহু ভীষণ ঊর্ধ্বে তুলে অগণন তারা খুঁজে খুঁজে
তাদের দুর্লভ স্নিগ্ধ আলো করেছি সঞ্চয় পরাগের কেশরের পাশে;
মেধার প্রপাত বেয়ে তীব্রধারা হয়ে নেমে গেছি আনিখিল তন্ত্রী ও মজ্জায়
মৃত্তিকায় শিকড়ের মূলে, মিশে গেছি রক্তে মাংসে চেতনার দীপ্র তন্তুজালে।
কার মায়া দুচোখের অঞ্জনে আজো লেগে আছে!
কার কথাগুলি মৃণালের মত শিরদাঁড়াব্যাপী!
নিজরক্তে ডুব দিয়ে সর্বাঙ্গে রক্তাক্ত আমি আজ
তবু কোন দ্রব দুঃখে আর হৃদয় গলে না, সব হাহাকার ক্ষণস্থায়ী মনে হয়
অনিঃশেষ কালের বিস্তারে—যেন সব পরমায়ু আমি করেছি হরণ
সবপথ আমার কক্ষপথ, পথিপার্শ্বে কঙ্কালের স্তূপ
দূরতম গৃহ অন্বেষণে প্রণোদিত করে।
মাঝে মাঝে ভয়াল অগ্নিকাণ্ড ঘটে গেছে লোকালয়ে জানি
ভুক্ত দেহ অবশেষে কারা কবরস্থ করে গেছে বৃক্ষের তলে
অনেক প্রস্তরবেদী ডুবে গেছে পঙ্কিল প্লাবনে
তবু যোনিমুখ মর্তমানুষের উপাস্য হয়নি হবে না,
কারা ভ্রষ্ট কুক্কুরে করেছে বাহন পশু?
মহাবিশ্ব বেশ্যা নয় মানুষেরা নয় তার পোষ্য দালাল;
চোখের সমুখে যদিও অনেক সুপ্রশান্ত পথ সংকীর্ণ হয়ে গেছে জানি
গন্ধরাজে ইদানীং কিছু কীট মাঝেমাঝে চোখে পড়ে;
জীবন যৌবন দিয়ে আমিও যে কত অন্ধকার করেছি অর্জন;
রক্তস্রোতে তার বিশালবিপুল ভার—বৃন্ত ঘিরে নরকের দাহ
দিন যায় কখনো সখনো নিথর জরায়
রাত্রি জুড়ে শোকগাথাগুলি মাঝে মাঝে নিদ্রাহীন ছড় টেনে যায়
অকালব্যাধির স্মৃতি তপ্ত করতলে—পিঠে—কার্বাঙ্কল

কিম্বা সূচীমুখ হাওয়া চোখের ভিতরে দ্রুত ছুটে আসে, উঞ্ছবৃষ্টিপাতে চতুর্দিকে
পঙ্কিল প্লাবন
পাদনখ থেকে হাঁটু বেয়ে ক্লেদ উরুতের দিকে উঠে যায়
ত্বকের ওপরে মরা কটালের শূন্য আস্ফালন; তথাপি এখনো পূর্ণিমার চন্দ্রোচ্ছ্বাসে
ভেসে যায় মেধার বলয় শরীরের গাঢ় অন্তঃপুরে;
শুক্র অত্রি মঙ্গল তারকারা সেসকল কথা জানে, জানে দূর পর্বতশিখরে দৃঢ় গন্ধরাজ,
কৈশোরক দিন জানে আর জানে মহাবিশ্বে পরিব্যাপ্ত পরিধি তন্ময়।

ফাল্গুনী প্রলাপ

শুভাশিস গোস্বামী

হঠাৎ বসন্তরজনীতে
গৃহস্থালি-ভুল-করা হাওয়া এল কলকাতায়—বাসের
দিক্-বিদিক ভুল হয়,—
স্বপ্নের ওপার থেকে ধূলি ওড়ে।

আর আমারও আচমকা মনে হয়—ফাল্গুনের রাতে
দিক্-ভুল ধূলির মতো উড়ে উড়ে,
রঙিন নিশেনের মতো দুলে দুলে,
উদাত্ত মাতাল গলায়
'পাগল ভা-ই-ই-ই' বলে' কাউকে ডাকি:
কাউকে ডাকি,—
যারা স্বপ্নের ওপার থেকে হাতছানি দেয়—
বাংলার মানুষ।

আগাছা-উপড়োনো শক্তদেশীর অজস্র হাত
স্বপ্নের ওপার থেকে হাতছানি দেয়।
আর দিক্-ভুল ধূলির মতো উড়ে উড়ে,
রঙিন নিশেনের মতো দুলে দুলে
'ও আমার পাগল ভাই—বাংলার মানুষ'—
উড়নচণ্ডী ডাক দিয়ে যেতে চাই বসন্তের রাতে॥

অবশিষ্ট

ভাস্কর চক্রবর্তী

সরু রাস্তার মতো, লম্বা করিডর--
শুধু একটা চেয়ার, আজ সমস্তরাত, বসে থাকবে করিডরে।

ঝোপ থেকে
লাফ দিয়ে উঠে আসবে চাঁদ,
সিঁড়ির কোণ থেকে বিড়াল, আজ সরে যাবে উনুনের পাশে

শুধু একটা আলপিন, আজ সমস্তরাত, দোল খাবে হাওয়ায়
শুধু একজন মানুষ, আজ সমস্তরাত, খোলা ছাদে দাঁড়িয়ে থাকবে।

আত্মঘ্ন

প্রলয় সেন

মল্লিনাথ এসেছিল খুব ভোরে। আমি তখন ঘুমে। ও খুট-খুট করে কড়া নাড়ছিল। জেগে উঠে প্রথমটায় আমি পাশ ফিরে শুয়েছিলাম। সকালের এই ঘুমটুকু, বলতে গেলে আমার সর্বস্ব। রাত করে ঘরে ফিরি। খেয়েদেয়ে শুতে বেশ দেরি হয়। তারপর, অনেকক্ষণ বিছানায় ছটফট করি। সহজে আমার ঘুম আসে না। মল্লিনাথ একটানা কড়া নেড়ে যাচ্ছিল। কিছুতেই আত্মস্থ থাকতে না পেরে এক সময় উঠে পড়লাম। মনে হচ্ছিল, কেউ আমার মগজের কোমল অংশে হাত রেখে অবিরাম টাইপ করে যাচ্ছে। তাড়াহুড়ো করে উঠতে গিয়ে মশারির এককোনার দড়ি ছিঁড়ে গেল। বিরক্ত হয়ে খাট থেকে নেমে এগিয়ে দরজা খুলতে দেখি মল্লিনাথ। ওর এক হাতে রঙচটা টিনের সুটকেশ। মালকোঁচা মেরে ধুতি পড়া। শ্রমকাতর চোখ। থুতনিতে কালচে শ্যাওলা।

আমি চোখ ডলবার অছিলায় দ্রুত স্মৃতি হাতড়ালাম। তারপর বললাম, আরে মলু, তুই! মল্লিনাথ নিরুত্তর হাসল। আমি পেছিয়ে খাটের কাছে চলে এলাম। বালিশ দুটো দেয়ালের দিকে ছুড়ে দিলাম। আমার বুকের ভেতর তখন কেউ লাটাইয়ের সুতো গুটোচ্ছিল। ফের বললাম, উফ্, কতদিন বাদে দেখা! তোর কথা একেবারে ভুলেই গিয়েছিলাম।

মল্লিনাথ জ্ঞাতি সম্পর্কে আমার ভাই। সেটা বড় কথা নয়। দেশের বাড়িতে কৈশোরের অনেকগুলি দিন আমরা একসঙ্গে কাটিয়েছি। ওর বাবা আসামে চাকরি করত। পড়াশুনোর অসুবিধের জন্যে মল্লিনাথ আমাদের বাড়িতে ছিল কিছুকাল। প্রায় বছর তিনেকের মত। আমরা এক ক্লাশে পড়তাম। গলা জড়াজড়ি করে এক বিছানায় শুতাম। একসঙ্গে চলতাম ফিরতাম। আমাদের দুজনের খুব ভাব দেখে সোনাজেঠি প্রায়ই বলত, আর জন্মে নির্ঘাত তোরা এক মায়ের পেটে জন্মেছিলি। সুটকেশটা দরজার ওধারে রেখে মল্লিনাথ এগিয়ে খাটে বসল। বড় করে একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে ক্লান্তি দূর করে বলল, হ্যাঁ, তা বছর কুড়ি তো হবেই।

আমি দরজা ভেজিয়ে ফিরে আসার সময় ওকে ফের এক পলক গভীর করে চোখে তুলে নিলাম। ছেলেবেলার সঙ্গে মিলিয়ে দেখবার চেষ্টা করছিলাম। তেমন পরিবর্তন লক্ষ্য করলাম না। সেই ছোট কপাল। চৌকো মুখ। খোসাছাড়ানো লিচুর মত উদাস চোখ। চিবুকের কাছাকাছি গুটিকয় সরু প্রফুল্ল ভাঁজ। যেটুকু বিসদৃশ, তা নেহাতই সময়ের কৌতুক। কপালের নদীনালা গালের অসমানতা, কিংবা ঝাপসা কণ্ঠস্বর।

আমি খাটের আরেক পাশে, ওর মুখোমুখি বসে, জিজ্ঞেস করলাম, এই সকালে, কোত্থেকে? মল্লিনাথ ঝুঁকে পাম্পশু খুলতে খুলতে জবাব দিল, রাতের লালগোলায় এলাম, ওর মলিন মুখের দিকে তাকিয়ে আমার ভেতরকার আতিথ্যবোধ নড়েচড়ে উঠল। আমি বললাম, চা খাবি তো? সারারাত ট্রেনে—

মল্লিনাথ নীরব সম্মতি জানালে আমি দরজা খুলে রাস্তায় নামলাম। দুটো বাড়ি পরেই নিতাইর চায়ের দোকান। আমি হাঁক পেড়ে দুকাপ চায়ের অর্ডার দিয়ে ফিরে এলাম। মল্লিনাথ ততক্ষণে পাঞ্জাবি খুলে খাটে আধশোয়া হয়েছে। আমি ঢুকতে বলল, ঘরের কি

অবস্থা করে রেখেছিস পল্টু! এভাবে মানুষ থাকতে পারে?

আমার ঘরের হতশ্রী কারুর চোখ এড়ায় না। ভাঙা খাট অপরিচ্ছন্ন সুজনি তেল-চিটেচিটে দুটো বালিশ, মেঝে ধুলো আর সিগ্রেটের মেশামেশি, বৈদ্যুতিক বাল্বের ওপর-নিচে বাহারি মাকড়সার জাল, নোনাধরা দেয়ালে ছয় ঋতুর দাপট—নানাবিধ প্রাকৃতিক জীব-জন্তুর আভাস, কত দ্রষ্টব্য জিনিস আছে এঘরে। মাঝে মাঝে বকুল এসে গজগজ করে। কোমরে শাড়ির আঁচল গ‍ুঁজে ঘরের হালহকিকত পাল্টাতে তৎপর হয়। মাসিক ছাব্বিশ টাকার ইজারাদার হিসেবে এঘরে আমি আছি অনেক কাল। চাকরি জুটবার পর থেকেই। এবং সত্যি বলতে কি, এসব আমার ভালই লাগে। এমনি ছন্নছাড়া ভাব। এর ভেতর আড়াল থেকে নিজেকে বেশ একান্ত করে পাওয়া যায়।

আমি অল্প হেসে প্রসঙ্গটা উদাসীন করে দিতে চাইলাম, তারপর, তোর খবর কি বল্‌?

নিতাই চা নিয়ে এল। মল্লিনাথ একটা ভাঁড় তুলে নিয়ে বলল, আমার আর খবর। গণ্ডগ্রামে ইস্কুল মাস্টারি করছি।

আমি বললাম, বিয়ে-থা করেছিস তো?

মল্লিনাথ একচুমুকে ভাঁড় শূন্য করে বলল, কবে! দুটো বাচ্চা হয়ে গেল।

আমি উঠে দাঁড়ালাম। অফিসের তাড়া। স্নানের সময় হয়ে গেছে। বললাম, তাহলে ভালই আছিস, কি বল্‌! ওর মুখে মুহূর্তে হাল্কা ছায়া নামল, নারে পল্টু। একে টাকা-পয়সার টানাটানি। তার ওপর ছেলেদুটো অপুষ্টিতে ভুগছে। বউর শরীরও ভাল নেই।

আমার খেয়াল হল, প্রশ্নটা নির্বোধের মত করে ফেলেছি। কেইবা ভাল আছে আজকাল। ভাল থাকার দিন কি আর আছে।

কলতলা থেকে ফিরে আসতে দেখি মল্লিনাথ জানলার দিকে উদাস তাকিয়ে। আমি চটপট তৈরি হয়ে নিলাম। বললাম, চল্‌ তোকে হোটেলটা দেখিয়ে নিয়ে আসি। মল্লিনাথ উঠল, গায়ে পাঞ্জাবি চাপাল। গলিতে নেমে বললাম, সোনাজেঠির দুর্ঘটনার কথাটা জানিস মলু? মল্লিনাথ চলার গতি কমাল। মাটির দিকে চোখ নামিয়ে স্বগতোক্তি করল, জানি! ছেলেবেলায় আমার মা মারা যায়। মল্লিনাথের মা-বাবা থাকত দূরে। সোনাজেঠি নিঃসন্তান, কাঁচ বয়সে বিধবা। কিশোর বয়সে আমাদের জীবনে ওর একটা বড় ভূমিকা ছিল। দেশ-বিভাগের পর সোনাজেঠি উঠেছিল ভাইপো যতীনদার বাড়িতে। যতীনদারা বামুনগাছিতে আছে। দেশের জলমাটি মাঠপ্রান্তর হারিয়ে সোনাজেঠি কেমন মনমরা হয়ে গিয়েছিল। শেষের দিকটায় মাথার ব্যামোতে ধরেছিল। সোনাজেঠি মারা গেল জলে ডুবে, গত বছর গ্রীষ্মের শুরুতে। আমি কালেভদ্রে বামুনগাছি গেলে আক্ষেপ করে বলত, কিছুই আর ভাল লাগে না রে পল্টু। দেশটার কি হয়ে গেল—

হোটেলে এক্সট্রা মিলের বন্দোবস্ত করে মল্লিনাথকে ম্যানেজারের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলাম। ও সরকারী বকেয়া টাকার তদ্বিরে শহরে এসেছে। খেয়েদেয়ে বিশ্রাম করে বেরুবে। ঘরের চাবি মল্লিনাথের কাছেই রইল।

অফিসে এসে কাজে কিছুতেই মন বসাতে পারছিলাম না। কতগুলি জরুরী চালান টাইপ করবার কথা। সময়মত না পেলে সুবোধ চাটখণ্ডী, আমার অন্নদাতা—সে একহাট লোকের মাঝখানে চেঁচাতে শুরু করবে। বারকয়েক বাথরুমে গিয়ে হাতমুখ ধুয়ে এলাম। টাইপ শুরু করলেই আঙুল ঘেমে যাচ্ছিল। হতাশ হয়ে পর পর অনেকগুলো সিগ্রেট টেনে বুকটাকে কার্বনে ভরে তুললাম। আর, এরই ফাঁকে, ড্রয়ার খুলে এক শীট সাদা কাগজ

টেনে বের করে রঙীন পেন্সিলে তার ওপর আঁকিবুকি কাটতে লাগলাম। এক সময় কাগজে চোখ পড়তে দেখি, আমার হিজিবিজি কখন একটা অদ্ভুত আকার পেয়ে গেছে। ছবিটা দেখে আমি আঁৎকে উঠলাম। মুণ্ডুটা সুবোধ চাটখণ্ডীর, আর ধড়টা এক নিটোল গাধার। আমি বুঝলাম, আজ মল্লিনাথই আমার সঙ্গে অদৃশ্যভাবে শত্রুতা শুরু করে দিয়েছে। বছর কুড়ি-বাইশ আগেকার কিছু হারিয়ে-যাওয়া স্মৃতি মনের ভেতর চারিয়ে তুলে ও আমার ভাবনাকে এলোমেলো করে দিয়েছে। আমাদের গ্রাম, আমাদের বাড়ি, বাড়ির পেছনে কামরাঙা ঝোপের ওপাশে সরষেখেত, মাথার ওপরে সুখদুঃখের আকাশ, আরো দক্ষিণে ইরফান মিঞার উঠোনে ছাঁচি কুমড়োর মাচায় বিষণ্ণ হরিয়াল, মুখুজ্জেদের আটচালায় শ্রাবণমাসে রয়ানী গান, দুপাশে দুধটসটসে আমন ধানের গন্ধে দ্বিপ্রহরে আমাদের বাধাহীন চলা, বর্ষাশেষে ঠাকুরঝির বিলে দোয়াড়ি পেতে কুচোমাছ ধরা, শীতের শুরুতে ছাঁচতলায় সোনাজেঠির মাঘমণ্ডল ব্রতের আয়োজন, অসংখ্য ছবি আমার চোখের সামনে ভেসে উঠেছিল। আর এসব ছবির সঙ্গে মল্লিনাথ এতটা জড়িয়ে আছে যে ওকে বাদ দিয়ে কোনকিছুই ভাবতে পারছিলাম না।

ছুটির কিছু আগে বকুল ফোন করল। আমি বললাম, কি ব্যাপার? ও নরম গলায় উত্তর করল, আজ ছুটির পরে তোমার সময় হবে? গতকালও বকুলের সঙ্গে দেখা হয়েছিল, কলেজ স্ট্রীটে। আমি বিরক্ত হয়ে বললাম, আজ, হঠাৎ! বকুল গলার স্বরে আর্দ্রতা এনে জবাব দিল, হ্যাঁ, আজই। সাউথ স্টেশনে। একটা ভীষণ সুখবর আছে। প্লীজ—। বকুল ঢাকুরিয়ায় থাকে। বৌবাজারের দিকে টিচারি করে। আমি ভারী গলায় 'ঠিক আছে' বলে রিসিভার নামিয়ে দিলাম।

দারুণ ভিড়ে ট্রামে ঝুলতে ঝুলতে ক্যানিং স্ট্রীট থেকে শিয়ালদ পৌঁছতে কিছু দেরি হল। বকুল চায়ের স্টলের কাছে দাঁড়িয়ে ছিল। আমার দেরিতে রুষ্ট হল না। ও আমাকে দেখে এগিয়ে হাসি-হাসি মুখ করে বলল, চলো, ওদিকের বেঞ্চে গিয়ে বসি। কথা আছে। আমি জানতাম, আমার সম্পর্কে ওর বিশ্বাস বহুকাল হল একটা অস্পষ্ট সংস্কারে দাঁড়িয়ে গেছে। সারাদিন বন্ধঘরে, দুপুরটা বিশ্রী কেটেছে, ভিড় ভাল লাগছিল না। তবু প্রতিবাদ-হীন এগিয়ে সামনে বেঞ্চে বসলাম। ওর শরীর থেকে একজাতীয় উগ্র সুগন্ধ বেরুচ্ছিল। ওর দিকে তাকিয়ে বুঝলাম, ছুটির পর বাড়ি ফিরে বকুল সেজেগুজে শরীর নিকিয়ে এসেছে। মেয়েরা অতিরিক্ত প্রসাধিত হলে, আমার ধারণায়, কেমন সার্বজনীন হয়ে যায়। আমি দায়সারা বললাম, বলো, কি সুখবর?—আমার কথায় তেমন উষ্ণতা না থাকায় ও মুহূর্তে অন্যমনা হয়ে উঠল। আমি কনুই দিয়ে ওর পাঁজরায় আস্তে করে খোঁচা মেরে বললাম, কি ব্যাপার, কথা বলছ না কেন।—বকুল ঘুমের ভেতর থেকে উত্তর করল, কিছু না, এমনি। বকুলের হেঁয়ালি অসহ্য লাগছিল। তবু, ওকে স্বাভাবিক করে তোলার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠলাম। ওকে ফুরফুরে করে তোলার কৌশলগুলি আমার জানা ছিল। নাটকীয়ভাবে ওর ডানহাতটা টেনে নিজের কোলে এনে আদুরে গলায় বললাম, বকুল, বলো না। আমাদের মাথার ওপরে বৈদ্যুতিক পাখা চলকাচ্ছে। সেই পাখার চিকন ছায়া বকুলের মুখে রহস্য আঁকছিল। এক সময় ও সপ্রতিভ হয়ে বলল, গত রবিবার গভর্নিং বডির মিটিং ছিল। সেই মিটিং-এ আমার কনফারমেশন হয়ে গেছে। আজ খবরটা পেলাম।—এ সংবাদটা ওর কাছে জরুরী হলেও তেমন উত্তেজনা বোধ করলাম না। আজ তিন বছর হতে চলল বকুলকে প্রাণপণে ঠেকাচ্ছি, ভবিষ্যৎ অনিশ্চয়তার দোহাই দিয়ে। এতদিনে ওর চাকরিতে স্থিতি

এল। এবার আমাদের সম্পর্কটাকে পাকাপাকি করে তোলার ব্যাপারে ওর তরফ থেকে জোর চাপ আসবে। আমি নিজের মনোভাবকে চেপেচুপে ঝানু খেলুড়ের মত ফস করে বলে ফেললাম, এতবড় একটা সুখবর। চলো কোনো চায়ের দোকানে গিয়ে সন্ধ্যেটা সেলিব্রেট করে আসি।—আমার শক্ত হাতের মুঠো থেকে নিজের হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে বকুল স্টেশনের বড় ঘাড়ির দিকে মুখ তুলল। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে কাপড়ের কুচি ঠিক করে বলল, আজ নয় শান্তনু, বাড়ি ফিরতে রাত হয়ে যাবে। কাল পঁচিশে বৈশাখ, ছুটি। কাল দুপুরে ঘুরব। আমি আর কচলাতে চাইলাম না। তাছাড়া, সেদিন সন্ধ্যায় আমি বড় গৃহকাতর হয়ে পড়েছিলাম। তবু বকুলকে উষ্ণ রাখার জন্যে ট্রেনে তুলে দেবার আগে বলেছিলাম, কাল তুমি আমাকে কি প্রেজেন্ট করছ?—উত্তরে বকুল প্রসন্ন হেসে বলেছিল, বলো, তুমি কি চাও। আমি ওর কানের কাছে মুখ নামিয়ে ফিসফিসিয়ে কিছু একটা বলেছিলাম। ও ট্রেনে উঠবার আগে একপ্রস্থ চোখ মটকে কপট হেসে বলেছিল, তুমি ভারি ইয়ে—

ঘরে ফিরতে দেখি মল্লিনাথ খাটে চিৎ হয়ে শুয়ে সিগ্রেট ফুঁকছে। আমার সাড়া পেয়ে উঠে বসল। আমি বললাম, কখন ফিরলি? ও একটা বালিশ টেনে বুকে চেপে ধরে বলল, এই তো কিছুক্ষণ। আর বলিস না পল্টু, সরকারী টাকা পাওয়া—যেন বাঘের জিভ টেনে বের করা। এ টেবিল সে টেবিল করতে করতে প্রাণ বেরিয়ে যায়—। মল্লিনাথ আরো অনেক কিছু হয়ত বলত। আমি থামিয়ে দিলাম, চল, খেয়ে আসা যাক। ও কয়েকটা হাই তুলে শরীরের জট ছাড়াল। তারপর বিজ্ঞের মত বলল, এবার একটা বিয়ে করে ফ্যাল পল্টু। কাঁহাতক এভাবে একলা দিন কাটাবি।—বিরক্ত হতে গিয়ে মনে মনে হাসি পেয়ে গেল। সকালে মল্লিনাথ নিজের বিবাহিত জীবনের যে নিদারুণ বর্ণনা দিয়েছিল সেটা স্মরণে এল। কেউ অন্যের অবস্থাটাকে সহ্য করতে পারে না। মল্লিনাথও তার ব্যতিক্রম নয়। এইজন্যেই ও বিয়ে করে আমাকেও জাহান্নামে যাবার পথটা বাৎলে দিচ্ছে। আমি মৃদু হেসে বললাম, কেন, বেশ তো আছি। মিছিমিছি ঝামেলা বাড়ানো—।—মল্লিনাথ উঠে পাম্পশু জোড়া পায়ে গলিয়ে বলল, তার মানে! বিয়ে করলে কি শুধু ঝামেলাই বাড়ে! এ তোদের অত্যন্ত বাজে ধারণা। আসলে স্বার্থপরের মত বাঁচতে চাস বলেই এসব ভাবিস।—ওর কথার ধারাটা আমি সঠিক বুঝে উঠতে পারলাম না। তবে কি আমাকে আত্মপর ঠাওরাচ্ছে। কিংবা আমার জীবনযাত্রার ব্যাপারে কোন কটাক্ষ করতে চাইছে। আমি ওর সদুপদেশকে উড়িয়ে দেবার জন্যে বললাম, আমার ঠিকানা কোথায় পেলিরে মলু?—ও হাসল, তবে কি আমার দুর্বলতা ওর চোখ এড়ায়নি, খুব সহজ সুরেই বলল, গত পুজোয় আসানসোলে গিয়েছিলাম। বিল্টুদার কাছে থেকে তোর ঠিকানাটা নিয়ে এসেছি।—বিল্টুদা আমার বড় জ্যাঠামশায়ের ছেলে। আসানসোলে চাকরি করে। আমার অথর্ব বাবা বিল্টুদার কাছেই থাকে। বস্তুত, তেমন কোন পারিবারিক দায়দায়িত্ব আমার নেই। ছোট বোন মাধুরী আছে মধ্যপ্রদেশে, ওর স্বামী কলিয়ারির টালিক্লার্ক।

হোটেল থেকে খেয়েদেয়ে ফিরে খাটে বসে মল্লিনাথ ফের বৈষয়িক কথাবার্তা জুড়ে দিল। আমি ঘুরেফিরে পুরোন প্রসঙ্গে যেতে চাইছিলাম। ও দায়সারা উত্তর দিচ্ছিল। আমি কেবলই দেশের বাড়ির নানা কথা তুলছিলাম। সেইসব কথা, যা এখন আমার কাছে এজন্মের বলে মনেই হয় না, কিংবা রূপকথার মত দূরস্থ ও রোমাঞ্চকর মনে হয়। ওর জুলপির নিচের কাটা দাগটা দেখে আমার স্মৃতি নড়েচড়ে উঠল। এক গ্রীষ্মদিনের দুপুরে ভুবন চৌধুরীর বাগানে আম চুরি করতে গিয়ে পড়ে গিয়েছিল মল্লিনাথ। বাঁ গাল কেটে প্রচুর রক্তক্ষরণ

হয়েছিল। বাবার কাছে বেজায় বকুনি খেয়েছিল ও। অথচ দুর্ঘটনার জন্যে দায়ী ছিলাম আমিই। ওকে জোরজবরদস্তি করে আমি গাছে উঠিয়েছিলাম। আরেক বারের কথা মনে পড়ে গেল। শীতের শুরুতে ঠাকুরঝির বিলে নানা জাতের পাখি আসত। হরিয়াল জল-পিপি মাছরাঙা বক কাদাখোঁচা, আরো কত কি। মল্লিনাথ হাট থেকে টোন সুতো কিনে জাল বুনে বাঁখারিতে বেঁধে বিলের কাদাজমিতে ফেলত। পাখি ধরত। তার মধ্য থেকে বেছে দু-চারটে পাখি রেখে পুষত। আমাদের দরদালানের উত্তরে গোয়ালঘরের মাচায় খাঁচায় ভরে লুকিয়ে রাখত। কেননা বাবা এসব পছন্দ করত না। একবার মল্লিনাথ দুটো জলপিপি পুষেছিল। এক ছুটির দিনে, দুপুরবেলায়, কি যে দুর্বুদ্ধি হল, চুপি-চুপি গোয়ালঘরে ঢুকে পাখিদুটোকে খাঁচা থেকে বের করে ছেড়ে দিলাম। বিকেলে দানাপানি দিতে এসে পাখিদুটোকে দেখতে না পেয়ে মল্লিনাথের সে কি চিৎকার। সোনাজেঠি অনেক করে বুঝিয়েও ওকে থামাতে পারে না। সে রাতে যতবার ঘুম ভেঙেছে, পাশ ফিরতে টের পেয়েছি—মল্লিনাথ বালিশে মুখ লুকিয়ে অনবরত হেঁচকি তুলে কাঁদছে।

মল্লিনাথ এক সময় আমার হাত ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, আয় শুয়ে পড়ি। তুই কিছুই শুনছিস না। আমি নীরবে হাসলাম। কত পাল্টে গেছে ও। রূঢ় সত্য কথাটা বলতে এখন আর ওর মুখে বাধে না। অথচ সেদিন, পাখিদুটো আমি ছেড়ে দিয়েছি জেনেও মল্লিনাথ কিছু বলেনি আমাকে।

আলো নিভিয়ে মশারির ভেতরে ঢুকে আমি মল্লিনাথের কাছে চলে গেলাম। ছেলে-বেলায় ওর গা থেকে চমৎকার একটা বুনো গন্ধ ফুটত। সে গন্ধটা পেলাম না। ও পাশ ফিরতে আমার গায়ে হাত পড়তে চমকে উঠল, তোর গা এত ঠাণ্ডা কেনরে পল্টু!—লিভারের গণ্ডগোলে ভুগছি বহুকাল। ওর এজাতীয় প্রশ্ন আমার ভাল লাগছিল না। আমি ওকে প্রশ্রয় দেব না স্থির করে কোন উত্তর করলাম না।

পরদিন সকালে ঘুম ভাঙলে দেখি মল্লিনাথ দাড়ি কামিয়ে স্নান সেরে দরজার কাছে আলোয় খবরের কাগজ পড়ছে। ওকে ওভাবে দেখে প্রথমটায় আমার করুণা হল। বেচারী! কেমন নিয়মে বাঁধা পড়ে গেছে। জীবনের ঢিলেঢালা সুখগুলিকে সময়ের সুতো দিয়ে বেধে ফেলেছে। আর এখন, জীবনটা নয়, নিয়মই বড় হয়ে ওকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরেছে। ফের ভাবলাম, নিয়মটা কি খারাপ। এই যে আমি, চালচুলো নেই, নেই দায়দায়িত্ব বন্ধন, উদ্দেশ্যহীন জীবন, বুক জ্বলছে মাথা ঘুরছে সবকিছু বিস্বাদ তাৎপর্যহীন লাগছে, দিনরাত দুশ্চিন্তা আর অস্বস্তিতে জ্বলছি, এর ভেতরেই বা কি সুখ আছে। বরং, মল্লিনাথই ভাল আছে। ছেলেবেলায় বাগান তৈরির শখ ছিল ওর। কামরাঙা গাছের ঝোপের পেছনে খানিকটা জমি কুপিয়ে নিড়িয়ে চমৎকার বাগান করত মল্লিনাথ, প্রত্যেক শীতে। রংকচু মল্লিকা গাঁদা যুঁই, চারপাশে রংচিতার বেড়া—স্নেহে যত্নে এক মনোরম প্রাকৃতিক সংসার রচনা করত। আর এখন, স্ত্রীপুত্র চাকরি—জীবনের পরিবর্তনকে মেনে নিয়ে নিজেকে নতুন করে তৈরি করে নিয়েছে।

আমি উঠে বাথরুমে গেলাম। ফিরে আসতে দেখি মল্লিনাথ সেজেগুজে প্রস্তুত। আমি বললাম, কিরে, কোথায় যাচ্ছিস?—ও একটা সিগ্রেট ধরিয়ে বলল, সোনারপুরে। কাল মেজদার অফিসে গিয়েছিলাম। আজ ওদের ওখানে খাবার নেমতন্ন।

মল্লিনাথ চলে যেতে আমি খাটে শুয়ে কাগজ পড়তে লাগলাম। দিনকয়েক হল অসহ্য গুমোট। আকাশ মেঘে ভরে আছে। অথচ একটু বাতাস নেই বৃষ্টি নেই। এক সময়

নিতাই চা দিয়ে গেল। মল্লিনাথের ওপর রাগ হচ্ছিল। আজ সকালটা ওর জন্যে ফাঁকা রেখেছিলাম। মল্লিনাথ না এলে, এমন ছুটির সকালটা বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা মেরে কাটানো যেত। কাগজ পড়তে পড়তে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম খেয়াল নেই। ঘুম ভাঙতে বেশ বেলা হয়ে গেল। আড়াইটার সময় শ্যামবাজারে এক সিনেমা হাউসে বকুল অপেক্ষা করবে। ওর সঙ্গে একটা রমরমা হিন্দী ফিল্ম দেখবার কথা। পেটের ডানদিকে একটা চোরা ব্যথা অনবরত ছুরি চালাচ্ছিল। উঠে বসতে গা ম্যাজ-ম্যাজ করতে লাগল। অতিরিক্ত শ্লেষ্মা জমলে শরীর যেমন রসস্থ হয় তেমনি ভাব। উঠে কোনো রকমে মাথায় খানিকটা জল ঢেলে শরীর মুছে নিলাম। বেলা তখন দেড়টার ওপর। দমদমের এই ঘিঞ্জি বাগজলা রোড থেকে শ্যামবাজার—এতটা পথ, হোটেলে গিয়ে খেয়ে সময়মত পৌঁছুনো দুষ্কর।

ছুটির দিনেও দুপুরের বাসে ভিড়। বিপজ্জনকভাবে লাফিয়ে পাদানিতে উঠে কোন রকমে হ্যান্ডেল ধরলাম। ওপর থেকে একজন হেঁড়ে গলায় ধমকে উঠল, আচ্ছা লোক তো মশাই, এভাবে উঠতে গিয়ে একদিন বেঘোরে প্রাণটা দেবেন!—বকুলের ওপর রাগে আমার সর্বশরীর রি-রি করে জ্বলছিল। ছুটির দিনেও ও রেহাই দেয় না। বকুলের হ্যাংলামি দিন দিন অসহ্য হয়ে উঠছে। সিনেমা, ঋতু ঘুরতে নিত্যনতুন উপহার, ঘন ঘন দেখা করা, —আসলে এসব ছল। ও আমাকে বাঁধতে চায়। যেমন মল্লিনাথের বউ মল্লিনাথকে বেঁধেছে। এতদিনে বকুল আমাকে অনেকটা গ্রাস করে ফেলেছে। আমি সব বুঝেও ওকে এড়াতে পারছি না।

বাস টালা ব্রিজের মুখে এলে আমি লাফিয়ে নেমে পড়লাম। মাটিতে পা পড়তে গা থেকে যেন ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল। হনহনিয়ে রাস্তা পেরুলাম। নীরদের বাড়ি কাছেই, ইন্দ্রবিশ্বাস রোডে, আমার শহুরে বন্ধু। দুপুরে ওর বাড়িতে অনেকেই আসে। ভাবলাম, ওর ওখানে গিয়ে খানিক আড্ডা দিয়ে আসি। বকুলের জন্যে বুকের ভেতর উদ্বেগ একবার পাশ ফিরেছিল। ও সিনেমা হাউসের পোর্টিকোর নিচে এখন অপেক্ষা করছে। শো শুরু হবার বেশ কিছুক্ষণ পর অব্দি অপেক্ষা করবে। জয়পুরী বটুয়াটা কেবলই হাতবদল করবে। ঘন ঘন মণিবন্ধে চোখ রাখবে। তারপর ক্লান্ত, বোধ হয় অভিমানে ফিরে যাবে। ফিরে যাক বকুল। ওর ভুল ভাঙা দরকার। ও আমার কাছে যতটা চায় আমি ওকে ততটা দিতে রাজী নই। এ সত্যটা ও বুঝতে পারলে উভয়েরই লাভ। ও নিজেকে গুটিয়ে নিতে পারবে। আর আমিও স্বস্তি পাব।

নীরদের বাড়ি পৌঁছুতে দেখি প্রিয়তোষ বসে। ওরা দুজনে ফ্ল্যাশ খেলছিল। আমিও বসে পড়লাম। কয়েক বাজি খেলতে বিকেল ভেঙে এল। আমি প্রায় প্রতি ডিল-এ হেরে যাচ্ছিলাম। আসলে আমি তখন নিজের মধ্যে ছিলাম না। বকুল মল্লিনাথ আমার মনস্কতায় বাদ সাধছিল। এক সময় খেয়াল হল, আমার অন্যমনস্কতার সুযোগে ওরা আমাকে ঠকাচ্ছে। নীরদ সম্পর্কে কোনোকালেই আমার ধারণা ভাল নয়। পরনিন্দায় ওর জুড়ি নেই। সুযোগ পেলেই পরিচিতদের কাছে আমার নামে সাতসতেরো রং ফলিয়ে বলে। বিজনটা আরো বাজে। অত্যন্ত পরশ্রীকাতর ও লোভী। তবু ওরাই আমার বন্ধু। ওদের বাদ দিলে আমার জীবনের একটা দিক শূন্য। এক সময় আমি হাতের তাস ফেলে দিয়ে বললাম, চল্, ওঠা যাক। ভাল লাগছে না।—বিজন বলল, কোথায় যাবি?—ওর চোখের বিরক্তি আমার দৃষ্টি এড়াল না।—আমি বললাম, চল না, ধর্মতলার দিকে যাই।—নীরদের চোখ শিকারী বিড়ালের মত চক্-চক্ করে উঠল। ও বলল, খাওয়াবি?—আমি উঠে দাঁড়ালাম। শার্টের কলার ঠিক করে নিয়ে

বললাম, চল্ তো, দেখা যাক। পকেটে আমার বেশ কিছু টাকা ছিল। মাস মাস বাবাকে কিছু টাকা পাঠাই। এমাসে একাজে সেকাজে টাকাটা মনিঅর্ডার করা হয়নি। মেজাজটা খিচড়ে ছিল। ঠিক করলাম, টাকাটার সদ্ব্যবহার করে আসি। বাবাকে তো প্রতিমাসেই পাঠাচ্ছি। তাছাড়া ওঁর টাকার কিইবা দরকার। বিল্টুদা যত্নের ত্রুটি করে না। তবু, প্রতিমাসের শেষে বাবার চিঠি আসে। সে চিঠিতে বাৎসল্যের চেয়ে পিতৃত্বের দাবিটাই প্রকট। যেন অর্থ ছাড়া আর কোন সম্পর্ক নেই ওঁর সঙ্গে। তলিয়ে ভাবছে, ছেলে হিসেবে বাবা তেমন কোন দায়িত্ব পালন করেনি কোনদিন। গ্রামের বাড়িতে থাকতে সাতপুরুষ আগেকার ক্ষেতের ফসলে আমরা প্রতিপালিত হয়েছি। এপারে আসার পর, কলেজের পড়াশুনা থেকে চাকরি—সব নিজের চেষ্টায় করেছি।

ট্রামে উঠবার পর নীরদ বিজন সারাটা পথ আমার তোয়াজ করেছিল। মদের দোকানে সেদিন তেমন ভিড় ছিল না। আমরা পুরনো খদ্দের। ম্যানেজার দেখেশুনে একটা ভাল জায়গা বেছে দিল। মদের দোকানে এলে আমি সাধারণত স্বাভাবিক হয়ে উঠি। নীরদ বিজন ঠিক উল্টো। ওদের মুখে খই ফোটে। নির্বোধের মত হইচই শুরু করে দেয়। কিছুক্ষণের ভেতর চড়া আলোগুলি নিভে ঘরটা রহস্যময় হয়ে উঠল। সামনের পাটাতনে মাইকের কাছে একটি মেয়ে এসে দাঁড়াল। পেছনে দুজন ছোকরা বাজনদার। এ মেয়েটাকে আগে এখানে দেখিনি। ছিপছিপে চেহারা। ফিকে নীল আলোয় গায়ের রঙ ঠিক ধরা গেল না। পরনে সাদামাটা একখানা কটকি শাড়ি। চোখে কালো শেল-ফ্রেমের চশমা। নীরদ ওকে দেখেই আমার উরুতে চিমটি কেটে নিচু সুরে বলল, দেখেছিস, শালা হুরী মাইরী।—বিজনটা কামুক। ও চোখের গুলি স্থির করে মেয়েটাকে চাখছিল। এক সময় জোরে বাজনা বেজে উঠল। মেয়েটা একটা ডাইরি খুলে গান শুরু করল। খুব নির্বিকারভাবে। যেন চার-পাশে আমরা কেউ কোথাও নেই। আমি এক বোতল করে সান লেগারের অর্ডার দিলাম। ওরা একচুমুকে গ্লাস নিঃশেষ করল। মেয়েটা বাঁপায়ে তাল ঠুকছিল। মুখে সস্তা হিন্দী গানের বোল, মাঝে মাঝে ডানহাতের সরু সরু আঙুল দিয়ে চশমার ডাঁটি চেপে ধরে আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করছিল। আমি নীরদকে বললাম, এবার কি খাবি?—ওপাশ থেকে বিজন বলে উঠল, রাম হলে মন্দ হয় না। জমবে ভাল।—আমি সঙ্গে সঙ্গে বেয়ারাকে ডেকে রাম আনতে বললাম। মেয়েটার দিকে তাকিয়ে আমার কেবলই বকুলের কথা মনে পড়ে যাচ্ছিল। মিলিয়ে ভাবতে গেলে বকুলের চেয়ে এই মেয়েটাকে সুশ্রী বলে স্বীকার করে নিতে হয়। মুখের গড়ন স্বাস্থ্য প্রগল্ভা সবদিক থেকে মেয়েটা ভাল। এমনকি অনেক নিরাপদও। কিছু টাকা ফেললে এখ্খুনি ওকে পাওয়া যায়। এবং কোন দায়দায়িত্ব না নিয়েই। বিজন মাঝে মাঝে হিক্কা তুলে আর্তনাদ করে উঠছিল, মরে যাব, মরে যাব। আমি আরো কয়েক পেগ রামের অর্ডার দিলাম। যাতে ওরা একেবারে বেচাল হয়ে পড়ে। ওরা অপ্রকৃতিস্থ হলে গাড়লের মত চেঁচাবে হাত-পা ছুঁড়বে খিস্তি করবে। আর আমি, ওদের নষ্টামি দেখে মনে মনে হাততালি দেব। দোকান থেকে বেরিয়ে আমি ট্যাক্সি ডাকতে ছুটলাম। ফিরে এসে দেখি, ওরা দুজনে দোকানের বাইরে একপাশে সার্কাসের জোকারের মত শরীর ভেঙেচুরে পরস্পরের গলা জড়িয়ে হাসছে কাঁদছে। চারপাশে কিছু ভিখিরি ভবঘুরে পথচারী মজা দেখছিল। আমি টেনে হিচড়ে নীরদকে ট্যাক্সির ভেতরে ঢোকালাম। বিজনটা আস্ত হাতি। ওকে বাগে আনতে প্রাণান্ত। শেষে গোটাকয়েক লাথি মেরে ট্যাক্সির ভেতরে ঢোকালাম।

মল্লিনাথ গলির মোড়ে অপেক্ষা করছিল। ঘরের চাবি আমার কাছে। ও বলল, এত

দেরি হল কেন রে। কখন থেকে দাঁড়িয়ে আছি।—আমি কোন উত্তর করলাম না। কথা বলবার মত উৎসাহ আমার ছিল না। ঘরে ঢুকে মল্লিনাথ জামাকাপড় ছেড়ে জানলার তাক থেকে সিগ্রেটের প্যাকেট খুলে একটা বের করে ধরাল। তারপর একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বলল, রাতের খাওয়াটাও ওখানে সেরে এলাম। তুই খেয়েছিস তো।—আমি মাথা নেড়ে জানালাম, খেয়েছি। ও বিছানায় গা এলিয়ে দিয়ে বলল, প্রতিদিন রাত করে ফিরছিস। খাওয়া-দাওয়ার ঠিক নেই। এত বেহিসেবী হলে মারা পড়বি যে!—ছেলেবেলায় বরাবর আমি ওর ওপরে খবরদারি করতাম। ওর কথাগুলো আমার ভাল লাগছিল না। ওর এই ধরনের অযাচিত অভিভাবকত্বে আমি মনে মনে চটে গেলাম। আমার মনে হল, ও যেন আমাকেই হটিয়ে দিয়ে এঘরের কর্তা সেজে বসেছে। আমার সিগ্রেট ধ্বংস করছে, খাওয়ার ভাগ বসাচ্ছে, আমার একান্ত নিজস্ব সময়টুকু কেড়ে নিতে চাইছে। এখন আমিই যেন এঘরে অবাঞ্ছিত, অনধিকারপ্রবেশকারী। আমি পাল্টা ওকে বিব্রত করার জন্যে বললাম, তোর কাজ কবে শেষ হচ্ছে রে মলু?—ও ভাবলেশহীন জবাব দিল, আরো দিনদুই লাগবে। টোকেন তো পেয়ে গেছি। এখন এ. জি. বেঙ্গল থেকে টাকা তোলার ঝামেলা।—আমি বললাম, আয় শুয়ে পড়ি, রাত অনেক হয়ে গেল।

পরদিন বেশ বেলা করে ঘুম ভাঙল। শরীর গুরুতর কিছু খারাপ না হলে আমি এত বেলা অব্দি ঘুমোই না। পাশ ফিরতে দেখি, মল্লিনাথ নেই। দরজাটা হাট করে খোলা। ঘরের ভেতর তেমন আলো নেই। খাট থেকে নামতে অল্প পা টলছিল। কপালে পুরু পুলটিশের মত যন্ত্রণা লেগে। জিভের ডগা শুকনো। কণ্ঠনালীতে খানিকটা বাষ্প দলা পাকিয়ে। মেঝেয় চোখ পড়তে বুক থেকে আচমকা ভারি কিছু একটা নেমে গেল। দরজার ওপাশে পুরু ধুলোর মাঝখানে খানিকটা শূন্য আয়তাকার জায়গা। ওখানে মল্লিনাথের সুটকেশটা ছিল। আরো ওদিকে জানলার গা ঘেঁষে ইতস্তত পায়ের ছাপ। বুঝতে কষ্ট হল না, মল্লিনাথ চলে গেছে। আমার জন্যে ও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করেছিল। ওপাশের জানলার কাছে পায়চারি করেছিল কিছুটা সময়। আমাকে জাগাতে সাহস করেনি, অথবা, মল্লিনাথ আমাকে এখনো কুড়ি বাইশ বছর আগেকার মত ভালবাসে বলেই আমার ঘুম ভাঙাতে চায়নি। আমার আপশোস হল, ওর ঠিকানাটা নেওয়া হয়নি বলে।

বাসিমুখেই দাড়ি কামাতে বসলুম। অফিসে পেঁছুতে দেরি হয়ে যাবে। আয়নায় চোখ পড়তে দেখলাম চোখের নিচের হাল্কা ছায়াটা গালের গালের অনেক দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছে। কপাল, গলার ভাঁজে বিন্দু বিন্দু ঘাম। দুচোখ রক্তাভ। তবে কি আমি ঘুমের ভিতর ভয়ঙ্কর কোন স্বপ্ন দেখেছি। মনে করতে পারলাম না। এক সময় অন্যমনস্কতা-বশত আমার বাঁ গালের কিছুটা অংশ কেটে গেল। ঠিক জন্মদাগটার ওপরে। বেশ কিছুটা রক্ত বেরুল। ক্রমশ সেই রক্ত জন্মদাগটাকে লালচে করে তুলল। আমি হাতের তালু দিয়ে জায়গাটা চেপে ধরতে এক ধরনের মৃদু যন্ত্রণা অনুভব করলাম। কুড়ি বাইশ বছর আগে যেমনটা করেছিলাম। এক মাঝরাতে। জলপিপি দুটোর দুঃখে মল্লিনাথ যখন বালিশে মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিল।

বাসস্টপে এসে পেঁছুতে আকাশ কালো হয়ে এল। এলোমেলো হাওয়ায় ধুলো লাট খেয়ে রাস্তায় হুটোপুটি খাচ্ছিল। একের পর এক বাস চলে যাচ্ছে। আমি কিছুতেই উঠতে পারছিলাম না। আমার বিশ্বসংসারের ওপর রাগ হচ্ছিল। কোথাও একটু স্বস্তি নেই, অবকাশ নেই। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমি ক্রমশ ক্লান্ত হয়ে পড়ছিলাম। এক সময় মনে

হল, আর দশজনের মত আমিও কবে একটা আস্ত অপদার্থ বনে গেছি। সকালে ঘুম ভাঙতে অফিসের তাড়া, অফিসে পৌঁছে লেজার টাইপ, সুবোধ চাটখণ্ডীর ধমকে চিড়ে চ্যাপ্টা, সন্ধ্যার দিকে বকুলের সঙ্গে পানসে কথা বলে সময় খোওয়ানো অথবা নীরদ বিজনের সঙ্গে আড্ডা—মনের ভেতর কিছু হিংসা-ঘৃণা-আক্রোশকে জাগিয়ে তোলা। তারপর ঘরে ফিরে গভীর রাত পর্যন্ত অন্ধকারে ছটফট করা।

আমি ধীর পায়ে রাস্তা পেরিয়ে উল্টোদিকে চলে এলাম। আজ আমি অফিসে যাব না। আমার কোন কিছুই ভাল লাগছে না। আকাশে মলিন ধোঁয়ার মত মেঘ উড়ছে। বাতাস ক্রমশ অশান্ত। একটা প্রাইভেট বাস স্টপে এসে থামতে লাফিয়ে উঠে পড়লাম। ফিরতি বাস; তেমন ভিড় নেই। জানলার কাছে সীট পাওয়া গেল। বাস ছাড়তে এলোমেলো হাওয়া আমার চোখেমুখে বুকের নগ্ন অংশে আঁচড় কাটছিল। দুপাশে মানুষের বহু যত্নে গড়া ঘরবাড়ি, সংসার। বাসটা নৌকোর মত হেলেদুলে এগুচ্ছিল। গত দুদিনের ঘটনাগুলি আমার ভাবনায় অনবরত পাক খাচ্ছে। এক সময় বুঝতে পারলাম, আমি বকুল নীরদ বিজন সুবোধ চাটখণ্ডী এমনকি মল্লিনাথ—সবাইকে একটা নোংরা দৃষ্টি দিয়ে দেখতে চেয়েছি। হায়, ভেবেছি, ওরা বুঝি শুধুই আমার কাছ থেকে কিছু ছিনিয়ে নিতে চায়। আমার আশ্রয় নিরাপত্তা ভালবাসা আনুগত্য স্বাধীনতা।

হাওয়ায় চুল উড়ছে। বাস কখন শহরের জটিলতা ছাড়িয়ে বিরাট মাঠের মাঝখানে এসে পড়েছে। বাতাসে অদ্ভুত মোহ জড়িয়ে। মাটি আর ঘাসের। বিষণ্ণ হরিয়ালের ডাক ভেসে আসছে। বৃষ্টির ছাটে আমার শরীর ভিজে যাচ্ছে। তবু আমি নির্বিকার।

জাতীয়তাবাদের স্বরূপ ও ভবিষ্যৎ

দেবী চট্টোপাধ্যায়

পাশ্চাত্যের একদল লেখক জাতীয়তাবাদের তীব্র সমালোচক। (ক) লাস্কি[১] এবং ম্যাক্-আইভার[২] প্রমুখ রাষ্ট্রবিজ্ঞানিগণ মনে করেন, জাতীয়তাবাদ আত্মাভিমানী-সংকীর্ণতা-সূচক, আন্তর্জাতিকতার শত্রু, এবং, যা আরো মারাত্মক, আগ্রাসী—পররাজ্যলোভী। এ-কথা ভাবা বোধহয় খুব ভুল হবে না যে, পশ্চিমী পণ্ডিতদের এই মত বহুলাংশে ফ্যাশিস্ট ইটালী এবং নাৎসী জার্মানীর রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা দ্বারা প্রভাবিত। অন্য কিছু কিছু কারণও তাঁরা অবশ্য উল্লেখ করেছেন। (খ) মার্ক্স ও তাঁর অনুগামীদেরও অনেকে মনে করেন যে, শ্রেণী-বিভক্ত জাতির জাতীয়তা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ঐক্যের বিরোধী। আলোচ্য প্রবন্ধে আমি দেখাতে চেষ্টা করব: (১) উপরিউক্ত দুটি মতই সংকীর্ণ, অর্থাৎ (ক) ও (খ) বহু দেশের ও জাতির জাতীয়তাবাদের স্বরূপ ও অবদান ব্যাখ্যা করতে অসমর্থ এবং, সেই জন্য, অংশত অগ্রহণীয়; (২) জাতীয়তাবাদ এখনো পৃথিবীর অনেক দেশে বরণীয় সামাজিক ও রাজনৈতিক শক্তিরূপে ব্যবহৃত হতে পারে। (৩) তবে (ক) ও (খ) জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে যে সতর্ক-বাণী উচ্চারণ করেছে তা সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করলে বহু অশুভ পরিণাম দেখা দেবার সমূহ আশঙ্কা বিদ্যমান। (৪) যে-সব দেশে এখনো অধিকাংশ মানুষ শিক্ষা পায়নি, জাতীয় ঐক্যের ভিন্নতর ভিত্তি সম্পর্কে সচেতন হতে পারেনি সে-সব দেশে বেশ কিছুকাল জাতীয়তা-বাদ ঐক্যের আদর্শ ভিত্তি বলে স্বীকৃত হবে, এবং তাতে আশঙ্কিত হবার কারণ নেই।

আলোচনা সুরু করবার পূর্বে কটি কথা স্মরণ রাখলে আলোচ্য বিষয় হয়তো কিঞ্চিৎ স্পষ্টতর হবে। যে-অর্থে জাতীয়তাবাদ শব্দটি ইদানীং ব্যবহৃত হচ্ছে এর উৎপত্তি পশ্চিম য়ুরোপে,—প্রথম প্রস্ফুট প্রকাশ বোধহয় আমেরিকান ও ফরাসী বিপ্লবে। অবশ্য ঐতিহাসিক মূল-সন্ধানে উৎসুক পণ্ডিত দূরতর অতীতেও যেতে পারেন।[৩] দক্ষিণ আমেরিকা, এশিয়া[৪]ও আফ্রিকার[৫] জাতীয়তাবাদ পশ্চিম য়ুরোপীয় প্রভাব দ্বারা উদ্দীপ্ত হয়েছে। 'উদ্দীপ্ত হয়েছে' এ জন্য বললুম যে, জাতীয়তাবাদের বৈষয়িক ও আত্মিক কিছু কিছু উপাদান ঐ-সব অঞ্চলে পশ্চিমী প্রভাব আবির্ভূত হবার পূর্ব থেকেই অল্পাধিক উপস্থিত ছিল। জাতীয়তা-বাদের উপাদান কি কি, তাদের পরিমাণগত গুরুত্বই বা কি রকম—এ জাতীয় প্রশ্নের উত্তর আমাদের আলোচ্য বিষয়ের বহির্ভূত। যে-কোনো বহু-ব্যাপক তত্ত্বের মতো জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে যদি আমরা একটি সর্বগ্রাসী তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করতে চাই, তাহলে আমার আশঙ্কা, আলোচনা প্রাণহীন হয়ে পড়বে। ভিন্ন ভিন্ন ঐতিহাসিক-সামাজিক পরিমণ্ডলে জাতীয়তা-বাদের স্বরূপ, সমস্যা ও ভবিষ্যৎ বিভিন্ন হতে বাধ্য। বর্তমান জাতীয়তাবাদ অতীতের, ঐতিহ্যের সামাজিক প্রক্ষেপ।

[১] হ্যারল্ড জে. লাস্কি, এ গ্রামার অব্ পলিটিক্স, ষষ্ঠ অধ্যায়।
[২] আর. এম. ম্যাকআইভার, দি ওয়েব অব্ গভর্নমেন্ট, পৃঃ ১৬৮-৯, ৪৪৩-৪৪।
[৩] হান্স্ কোন, দি আইডিয়া অব ন্যাশনালিজ্‌ম্, ন্যু ইঅর্ক, ১৯৪৪।
[৪] ঐ , এ হিস্টরি অব ন্যাশনালিজ্‌ম্ ইন দি ইস্ট, লন্ডন, ১৯২৯।
ঐ , ন্যাশনালিজ্‌ম্ অ্যান্ড ইম্পিরিয়ালিজম্ ইন দি হিদার ইস্ট, লন্ডন, ১৯৩২।
[৫] হ্যারল্ড জে. লাস্কি, ন্যাশনালিজ্‌ম্ অ্যান্ড ফিউচার অব সিভিলাইজেশন, পৃঃ ৩৬-৭।

২

ভিন্ন পূর্ব-প্রকল্প থেকে হেগেল এবং ম্যাৎসিনি একই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন: জাতীয় ঐক্যের ভিত্তিতে গঠিত রাষ্ট্রই হল আদর্শ রাজনৈতিক সংস্থা। ঊনবিংশ শতাব্দীর রাজনৈতিক চিন্তাধারায় জাতীয়তাবাদের আদর্শ ছিল অ-মলিন। মিল্‌ মনে করতেন, স্বাধীন সমাজের রাজনৈতিক সীমান্ত ও জাতীয়তার সীমান্ত হওয়া উচিত অভিন্ন। গ্রীস, ইতালী ও দক্ষিণ আমেরিকার প্রজাতান্ত্রিক দেশগুলির জাতীয়তা-ভিত্তিক স্বাধীনতার দাবী ও সংগ্রাম তদানীন্তন প্রগতিশীল জনগণের উদার সমর্থন লাভ করেছিল। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর জাতীয়তাবাদী স্বাধীনতা-আন্দোলনের প্রতি অনুরূপ মনোভাব অকুণ্ঠিত-ভাবে প্রকাশিত হয় নি। কেন?

জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ যে, এই বোধটি (১) একদিকে সংকীর্ণ এবং, অন্যদিকে (২) সম্প্রসারণধর্মী। সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদ সংশ্লিষ্ট জাতির ব্যক্তির মনে তার ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য সম্পর্কে একটি অন্ধ অনুরাগ সৃষ্টি করে। যুক্তি-বর্জিত এই অনুরাগে যে গভীরতা ও আবেগাতিশয্য থাকে তা জাতির ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে আবদ্ধ করা শক্ত। ফলত, শূন্যগর্ভ জাতি কালক্রমে জাতির শক্তি ও আয়তন বৃদ্ধির জন্য পররাজ্য গ্রাসে উদ্যোগী হয়। আপন জাতীয়তা সম্পর্কে যখন কেউ বিনাবিচারে মুগ্ধ ও মগ্ন হয়, অন্য জাতির গুণাগুণ অবহেলা করতে সুরু করে তখন তার পক্ষে বিপথগামী হওয়া সহজ হয়ে ওঠে। (৩) সম্প্রসারণবাদের পরিণামে অনেক ক্ষেত্রে যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে ওঠে।[*] যখন জাতীয় অহং শিল্প-শক্তিতে সমৃদ্ধ ও স্ফীত হয়ে ওঠে তখন সে-জাতির শাসকগোষ্ঠী তার বাণিজ্য-স্বার্থ চরিতার্থ করবার লোভকে জাতীয় সংস্কৃতি প্রচারের মুখোশ পরিয়ে পররাজ্য গ্রাসের জন্য বেরিয়ে পড়ে। পররাজ্য গ্রাসের নির্লজ্জ প্রতি-যোগিতায় জয়ী হওয়া কালক্রমে জাতীয়তাবাদের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য হয়ে পড়ে। সুতরাং, দেখা যাচ্ছে, জাতীয় সংকীর্ণতা-অহংকার থেকে যেমন সম্প্রসারণবাদের প্রবণতা উদ্ভূত হয়, তেমনি আবার সম্প্রসারণবাদ বা সাম্রাজ্যবাদ থেকে যুদ্ধ-বিগ্রহের আশঙ্কা উদ্ভূত হয়। বস্তুত প্রথম ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকে অনেকেই শক্তিমদমত্ত বিরোধী-স্বার্থসম্পন্ন জাতির বাণিজ্যগত বিবাদের পরিণাম বলে ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন।

জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে আনীত সকল অভিযোগ সকল স্তরে খণ্ডন করা, আগেই বলেছি, আমার উদ্দেশ্য নয়। কারণ, কিছু কিছু অভিযোগ বৈধ। তবে এই অভিযোগ বা সমালোচনাগুলিকে ভিন্ন দুটি পরিপ্রেক্ষিত থেকে দেখলে, আমার মনে হয়, এমন কিছু পেতে পারি যা লাস্কি, ম্যাক্‌আইভার ও টয়েনবি প্রমুখ জাতীয়তাবাদের সমালোচকগণ উপেক্ষা করেছেন, এবং যার ফলে, তাঁদের সমালোচনা একদিগ্‌দর্শী দোষে দুষ্য। (ক) ইতিহাস ও (খ) আদর্শ—এই দুটি ভিন্ন অথচ সংশ্লিষ্ট পরিপ্রেক্ষিত থেকে জাতীয়তাবাদকে নতুন করে একবার ভাবা দরকার।

(ক) ইতিহাস। জাতীয়তাবাদের সংজ্ঞা নিরূপণ কঠিন। ভিন্ন ভিন্ন জাতির জাতীয়তাবোধ এতোই বিভিন্ন যে তা কোনো একটি সংজ্ঞায় সূচনা করা অসম্ভব। তবু, মোটামুটি বুঝবার জন্য এ-বিষয়ে বিশেষজ্ঞগণ বহু সংজ্ঞাই উত্থাপন করেছেন।[*] রেনানের মতে জাতীয়তার মূল উপাদান নৃতাত্ত্বিক জাতি-বোধ বা ধর্ম বা অর্থনৈতিক কিছু নয়।

[*] ফ্রেডারিক মার্ট্‌জ্‌, ন্যাশনালিটি ইন্‌ হিস্টরি অ্যান্ড পলিটিক্স, প্রথম অধ্যায়।

তাঁর মতে জাতীয়তা একপ্রকার আত্মিক চৈতন্য যার পশ্চাতে রয়েছে গৌরবময় অতীতের, মহান ব্যক্তিত্বের এবং ঐতিহ্যের অজস্র উপাদান। একক উপাদানরূপে, আমার ধারণা, একই ঐতিহাসিক—বিশেষত প্রতিকূল—অভিজ্ঞতা জাতি-গঠনে সর্বাধিক সহায়তা করে। রাজনৈতিক শাসন-ব্যবস্থা কোনো-না-কোনো প্রকারে এক না-হলে অনেক জনগোষ্ঠী দেশকালের ব্যবধান সহজে অতিক্রম করে এক হতে পারে না। জাতি সৃষ্টির নৃতাত্ত্বিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক কারণ উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও 'বিক্ষিপ্ত' জনগোষ্ঠী অনেক সময়ে ঐক্যবদ্ধ হয়ে জাতি সৃষ্টি করতে পারে না। ঐক্যবদ্ধ হবার কারণ উপস্থিত থাকলেও জনগোষ্ঠীগুলি প্রতিকূল ও সামগ্রিক অভিজ্ঞতার কিংবা একই শাসনের অভাবে ঐক্যবদ্ধ হবার প্রেরণা ও প্রয়োজন প্রবলভাবে অনুভব করে না। বৈদেশিক শাসন বা তার আশঙ্কা প্রায় সকল ক্ষেত্রে একই দেশের বিভিন্ন জনগোষ্ঠীকে, আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব সত্ত্বেও, জাতীয়তার বৃহত্তর প্রাঙ্গণে সমবেত হতে সাহায্য করেছে। যে রাজনৈতিক অর্থে 'জাতীয়তাবাদ' পদটি ইদানীং ব্যবহৃত হচ্ছে তার ঐতিহাসিক জন্মভূমি, যদি তেমন কিছু থাকা সম্ভব হয়, য়ুরোপ।

কেউ কেউ মনে করেন যে, পোল্যান্ডের প্রথম বিভাগই (১৭৭২) য়ুরোপীয় জাতি-সৃষ্টি আন্দোলনের সূত্রপাত।[৭] এ-কথা নিঃসন্দেহে সত্য রাশিয়া ও প্রাশিয়ার ষড়যন্ত্রে বিভক্ত প্যোলান্ড জাতীয়তার বন্ধনে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কৃত্রিম রাজনৈতিক সীমান্তকে বানচাল করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়েছিল। কিন্তু, আমার ধারণা, এক অর্থে জাতি-সৃষ্টির প্রথম এবং সার্থক চেষ্টা ইংল্যান্ডেই হয়েছিল। সপ্তদশ শতাব্দীতে ইংরাজ ও স্কচ জাতির সম্মিলনে প্রথম ব্রিটিশ জাতি সৃষ্টি হল। ১৭০১ খৃষ্টাব্দের অ্যাক্ট অব সেটেলমেন্টকে এই সম্মিলিত জাতি-সৃষ্টির স্বীকৃতি-পত্র বলে গ্রহণ করা যেতে পারে। যে-সব উপকরণ ব্রিটিশ জাতি সৃষ্টির পশ্চাতে ছিল তা মোটামুটি এইরকম: (১) লাতিন ভাষার নির্ভরশীলতা থেকে মুক্ত জাতীয় ভাষায় ধ্যান-ধারণা প্রকাশের আগ্রহ; (২) একই শ্রেণীর আইন দ্বারা শাসন; (৩) স্বার্থ-সচেতন বণিক-শ্রেণী ও আমলাতন্ত্র রাজার প্রতিনিধি-স্বরূপ সমগ্র দেশে ছড়িয়ে থেকে, একই প্রকার ভাব-ধারা প্রচার করে জাতীয় ঐক্য সৃষ্টিতে সহায়তা করেছিল; (৪) সার্বজনীন ধর্মায়তন (রোমের চার্চ) থেকে মুক্ত জাতীয় ধর্মায়তন; এবং (৫) প্রতিনিধিত্বমূলক শাসন-ব্যবস্থা রাজধানী থেকে দূরবর্তী নাগরিকদের মনেও জাতীয়তা বোধ জাগাতে সাহায্য করেছিল।[৮] বার্গান্ডিকে স্বীয় শাসনাধীনে এনে ফ্রান্সও তার জাতি সৃষ্টির প্রথম অধ্যায় সম্পূর্ণ করেছিল অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে। ব্রিটিশ ও ফরাসী জাতি সৃষ্টির উপকরণে প্রভূত মিল রয়েছে। এর মধ্যে প্রধান লক্ষণীয় বিষয় হল কার্যকরী, সক্ষম কেন্দ্রীয় শাসন। আগেই বলেছিলুম, এক অর্থে ইংল্যান্ডে ও ফ্রান্সে জাতি সৃষ্টি হয়েছিল; এই অর্থের ভিত্তি হল কেন্দ্রীয় শাসন। এ-কথা বোধহয় অংশত সত্য যে, ক্রমওয়েলের শাসন ও রক্তহীন বিপ্লবের পরে ব্রিটিশ জাতি নিছকই কেন্দ্রীয় শাসনের সৃষ্টি ছিল না, বরং ব্রিটিশ জাতি কেন্দ্রীয় শাসনের 'পর কর্তৃত্ব বিস্তার করতে সুরু করেছিল। ফ্রান্সের জাতীয়তায় এই পর্ব ফরাসী বিপ্লবের আগে সুরু হয়নি। য়ুরোপের বিভিন্ন জাতির ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে, প্রায়-সকল জাতি সৃষ্টির পশ্চাতে রয়েছে কার্যকরী কেন্দ্রীয় শাসন, এবং যে-শাসন ছিল বৈদেশিক (কোনো-না-কোনো কালে)।

জাতি ও রাষ্ট্রের সম্পর্ক দু'দিক থেকে দেখা যেতে পারে। প্রথম স্তরে দেখা যায়,

---

[৭] ডব্লিউ. এফ. রেড্‌এওয়ে ইত্যাদি সম্পাদিত দি কেম্ব্রিজ হিস্টরি অব পোল্যান্ড (১৬৯৭-১৯৩৫)।
[৮] ই. এইচ. কার; এম. গিন্‌স্‌বার্গ প্রমুখ প্রণীত রয়্যাল ইনস্টিট্যুট অব্‌ ইন্টারন্যাশনাল অ্যাফেয়ার্স।

রাষ্ট্রশক্তি—বৈদেশিক বা আভ্যন্তরীণ—কেন্দ্রীয় শাসনের মধ্য দিয়ে সংশ্লিষ্ট জনগণের মধ্যে সুপ্ত জাতীয়তার উপাদানগুলোকে জাগিয়ে তোলে: অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই জাগিয়ে তোলা ইচ্ছাকৃত নয়। দ্বিতীয় স্তরে দেখা যায়, জাগ্রত জাতীয় শক্তি রাষ্ট্রশক্তিতে অধিকার চায়। প্রথম স্তর থেকে দ্বিতীয় স্তরে উত্তরণ সময়-সাপেক্ষ ব্যাপার: শিক্ষা, যুদ্ধ ও বিপ্লব এই উত্তরণকে ত্বরান্বিত করে।

(খ) আদর্শ। জাতীয়তা সৃষ্টির প্রথম স্তর ঐতিহাসিক দিক থেকেই স্পষ্টতরভাবে বোঝা সম্ভব। দ্বিতীয় স্তর বুঝবার জন্য আদর্শগত বিশ্লেষণ প্রথম প্রয়োজন: অবশ্য তার অর্থ এই নয় যে, সে-বিশ্লেষণের পশ্চাদ্ভূমিতেও ইতিহাস উপস্থিত থাকবে না। জাতীয় চৈতন্য থেকে বিচ্ছিন্ন শাসন-ব্যবস্থা ঐ জাতির মানুষদের মধ্যে তাদের অন্তর্নিহিত ভাবগত ঐক্য জাগিয়ে তোলে। 'অন্তর্নিহিত' বলতে 'জাতীয় আত্মার আত্মিক সারাৎসার' বা তজ্জাতীয় কোনো পরাতাত্ত্বিক ধারণা বোঝাতে চাইছি না: আমি সুপ্ত সাংস্কৃতিক ও ঐতিহ্যগত উপকরণাদি নির্দেশ করছি। ভাষার ব্যাকরণ-সূত্র না জেনেও যেমন ভাষার সদ্ব্যবহার সম্ভব, তেমনি মানুষেরা তাদের জাতির অন্তর্নিহিত উপকরণগুলো স্পষ্টভাবে না জেনেও একই ধ্যানধারণার ওপর চলমান সামাজিক পটভূমিতে দৈনন্দিন জীবন যাপন করতে পারে। তবে যখন মানুষেরা তাদের ভিত্তি সম্বন্ধে সচেতন হয় তখন তাদের পারস্পরিক ঐক্যবোধ প্রবল হয়, তারা তাদের এই বোধকে প্রথমে সাংস্কৃতিক এবং পরে রাজনৈতিক আত্ম-নিয়ন্ত্রণের ধারক ও বাহক হিসেবে ব্যবহার করতে উদ্যোগী হয়। এ-কথা মনে করলে ভুল হবে যে, জাতীয়তার সকল উপকরণই অতীতের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি থেকে আহৃত: জাতীয়তার একটি দিক শিল্প-সমৃদ্ধ যন্ত্র-প্রভাব দ্বারা যথেষ্ট প্রভাবিত। জাতীয়তার এই দিকটি আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক ঘটনাচক্র ও আদর্শগত ধ্যান-ধারণা দ্বারাও প্রভাবিত। জাতীয়তার এই দ্বিতীয় দিকটি আধুনিক, চলিষ্ণু এবং আদর্শ-চেতন।

মুশকিল হল, জাতীয়তা তার অতীত-নির্ভর ও সংরক্ষণশীল ঐতিহ্যের দিকটি ভিত্তি করে একটি ন্যূনতম প্রাণ-কোষ সৃষ্টি করতে না-পারলে দ্বিতীয় দিকটির প্রসার ও বর্ধন বাঞ্ছনীয় হলেও সম্ভব নয়। বিপ্লবের গর্ভ থেকেও সম্পূর্ণ নতুন জাতি ভূমিষ্ঠ হয় না: পুরাতনের সঙ্গে তার সংযোগ, প্রবল-প্রকট না-হলেও, থাকতে বাধ্য। জাতি তার অতীতের সঙ্গে সম্পর্ক সম্পূর্ণ ছিন্ন করবে না,—এ কথা যেমন স্মর্তব্য তেমনি স্মর্তব্য জাতিকে ভবিষ্যৎ-মুখী, যুগ-সচেতন করা, এবং আন্তর্জাতিক দায়-দায়িত্ব সম্পর্কে সদা-সতর্ক করা। জাতীয়তার এই দ্বিতীয় দিকটি উপেক্ষা করে প্রথম দিকটির 'পর ক্রমাগত গুরুত্ব আরোপ করলে, জাতীয় অহংকে—তা সে যতই মহৎ হোক—অত্যন্ত বড় করে তুললে বিপদ অনিবার্য। কারণ, যে-অহং অন্য জাতির অহং-এর প্রাপ্য মূল্য স্বীকার করে না সে তার সমসাময়িক পৃথিবীর রাজনীতিকে সঠিক পরিপ্রেক্ষিতে দেখতে পারে না। তাছাড়া, মনে রাখতে হবে, জাতীয়তাবাদের স্তরে মানুষ-সমাজ পরিষ্কারভাবে শ্রেণী-বিভক্ত। শ্রেণী-বিভক্ত সমাজের শাসক-অহং তার অন্ধ অহংকারে শুধু আন্তর্জাতিক রাজনীতি বুঝতেই ভুল করে না, আভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক শক্তিনিচয়ের পারস্পরিক সম্পর্ক বুঝতেও ভুল করে।

ইতালী, জার্মানী এবং জাপান বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় ও চতুর্থ দশকে এই ভুলই

করেছিল। ফ্যাসিবাদ ও নাৎসীবাদের মানসিক বিকৃতির দিকের পশ্চাতে রয়েছে গভীরতর সমাজায়ত ও আন্তর্জাতিক পটভূমি।

ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সের জাতীয়তাবাদ থেকে জার্মানী ও ইতালীর জাতীয়তাবাদের স্বরূপ ঐতিহাসিক বিচারে ভিন্ন। জার্মানী ও ইতালীর জাতীয়তাবাদ আধুনিক জার্মান ও ইতালীয় রাষ্ট্রের স্রষ্টা,—সৃষ্টি নয়। জার্মান জাতীয়তাবাদের পরিপুষ্টি সাংস্কৃতিক স্তরে সুরু হয়েছে অনেক কাল: হার্ডার, হেগেল থেকে সুরু করে গাবিন্যু, ট্রাইট্শকে প্রমুখ বহু চিন্তাশীল ব্যক্তিই এ তত্ত্ব বারবার জোরালো ভাষায় জার্মানদের শুনিয়ে গেছেন। বিস্মার্ক এই সাংস্কৃতিক তত্ত্বকে সার্থক রাজনৈতিক রূপ দিলেন। বাস্তব সার্থকতা অনেক ক্ষেত্রে নীতির বা আদর্শের প্রশ্নকে গৌণ করে তোলে। শিল্প-সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী জার্মানীর বহু লোকই তাদের সার্থকতার মৌল কারণ বলে মনে করেছিল জাতীয়তাবাদকে। অষ্টাদশ শতাব্দীর ফরাসী বুদ্ধিবাদের প্রতিবাদে জার্মান ঐতিহাসিক গোষ্ঠী (Historismus) ইচ্ছা ও উৎসাহের জয়গান সুরু করেছিল। আবেগময় সৌভ্রাতৃত্বের (Gemeinschaft) ও পুনরুজ্জীবনের (Wiedergeburt) বাণী জার্মান জাতির হৃদয় মথিত করে তুলল। হেগেলীয় রাষ্ট্রদর্শনের উত্তরাধিকারীরা ব্যক্তির 'মহত্তর' রাষ্ট্রসত্তার নিকট আনুগত্য জানানোকে পরম উচিত-কর্ম বলে ঘোষণা করল। ১৮৪৮-এর বিপ্লবের পরে জার্মান জাতীয়তাবাদ দ্রুত এগুতে লাগল। জার্মান ঐক্য অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক কারণেও একান্ত হয়ে উঠেছিল। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব-ভয়ে ভীত জার্মানীর উদারনৈতিক মধ্যবিত্তেরা বিত্তবানদের সঙ্গে আপোষ করে রাষ্ট্রশক্তির অংশীদার হবার পরে আপামর জনগণকে নিয়ে জাতীয়তাবাদ গড়বার উচ্চ আদর্শ পরিত্যাগ করল। বিস্মার্ক গণতন্ত্রের ছিটেফোটা দিয়ে মধ্যবিত্তদের সমাজতান্ত্রিক নিম্নবিত্ত ও সর্বহারাদের সংস্রব থেকে সার্থক-ভাবে দূরে সরিয়ে নিল। উঁচুতলার জীবনকে কেন্দ্র করে জার্মান জাতীয় ঐক্য সাধিত হল। মার্ক্স ও তাঁর সমর্থকগণ এই বিকৃত জাতীয়তাবাদকে সর্বদাই সমালোচনা করেছেন। বিংশ শতাব্দীর রুশ বিপ্লব য়ুরোপের সমাজতান্ত্রিক শক্তিকে নতুন প্রেরণা জোগাল। তাই হিটলার যখন জাতীয়তাবাদকে রাজনৈতিক আদর্শরূপে সর্বজনপ্রিয় করে তুলতে চাইল তখন সমাজতন্ত্রকে জাতীয়তাবাদের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জনগণের কাছে তুলে ধরল। বিস্মার্কের কাছে জাতীয়তাবাদ ছিল নিরংকুশ রাষ্ট্রবাদের দোসর; হিটলার জাতীয়তাবাদকে করল সমাজতন্ত্রের দোসর।[১] বোঝা গেল, সমগ্র স্তরের জনগণের সঙ্গে যে-জাতীয়তাবাদ অঙ্গাঙ্গিভাবে ও বিচারসংগতভাবে সংযুক্ত নয় তাকে শাসক-শক্তি স্বীয় স্বার্থসিদ্ধির জন্য সময়-সুযোগ বুঝে বিভিন্ন ক্ষেত্রে কাজে লাগাতে পারে।

ইতালীর জাতীয়তাবাদের ইতিহাসের সঙ্গে জার্মান জাতীয়তাবাদের ইতিহাসের একাধিক বিষয়ে মিল আছে। উভয় ক্ষেত্রেই রাষ্ট্রগত ঐক্য সাধনের অনেক পূর্ব থেকেই সাংস্কৃতিক ও ঐতিহ্যগত এক অস্ফুট ঐক্যবোধ ছিল। উভয় ক্ষেত্রেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে লোক চলাচল অব্যাহত থাকায় রাজনৈতিক সীমান্ত অতিক্রম করে সুদীর্ঘ-কাল ধরেই একটা ভাবগত ঐক্য ছিল। ইতালীর পোপতন্ত্র ও জার্মানীর প্রাশিয়া-সাম্রাজ্য জাতিগত ঐক্য সৃষ্টির পথে সুদীর্ঘকাল ধরে অন্তরায় ছিল। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ থেকেই অর্থনৈতিক কারণে জার্মানীর ও ইতালীর জাতীয় ঐক্য সৃষ্টির প্রয়োজন অনুভূত হচ্ছিল। এই অনুভূতি গভীরতর করার পশ্চাতে ছিল ফরাসী বিপ্লব ও নেপোলিয়নের

[১] ডব্লিউ. এল. শিরার, দি রাইজ অ্যান্ড ফল অব্ দি থার্ড র্যাইখ্, লন্ডন, ১৯৬০।

সাম্রাজ্য-বিজয় যুদ্ধ। জার্মান জাতীয়তা সৃষ্টির অন্তরায় ছিল দেশেরই অভ্যন্তরে: সেদিক থেকে বিবেচনা করলে ইতালীর সমস্যা ছিল কঠিনতর—অস্ট্রিয়ার শাসনের অবসান ঘটানো। তাছাড়া ইতালীর মধ্যবিত্ত জার্মানীর তদানীন্তন মধ্যবিত্তের তুলনায় শক্তিহীন ছিল: জাতীয়তা সৃষ্টির আন্দোলনে কার্যকরী নেতৃত্ব দেবার মতো পর্যাপ্ত সংঘশক্তি তার ছিল না। ইতালীর নিম্নতম দরিদ্র শ্রেণীর মানুষদের মধ্যে সংঘশক্তি ছিল আরো কম। তবে এ-প্রসঙ্গে স্বীকার্য যে, জার্মানীর মধ্যবিত্তের মতো ইতালীর মধ্যবিত্ত শাসক-শক্তির সঙ্গে মিতালী করে দরিদ্রদের প্রতি অবিচার করেনি। এর একটা কারণ, বৈদেশিক শাসন-পিষ্ট উদারনৈতিক অভিজাতদের স্বার্থ একটা স্তর পর্যন্ত দরিদ্র ও মধ্যবিত্তের স্বার্থের সঙ্গে সংগতিশীল ছিল। জাতীয়তা সৃষ্টির আন্দোলনে নরমপন্থীরা চাইছিল ধীরে এগুতে; গ্যারিবল্ডি ও ম্যাজিনি প্রমুখ চরমপন্থীরা সংঘশক্তির অভাবে একসময়ে যথেষ্ট এগিয়ে গিয়েছিল বটে, কিন্তু পরে পিছু হটতে বাধ্য হয়েছিল। সাময়িক ব্যর্থতার অভিজ্ঞতা থেকে চরমপন্থীরা বুঝেছিল, যে-দেশে দরিদ্র জনগণ আন্দোলনের সক্রিয় ও সংঘবদ্ধ সহযোগী নয় সে-দেশে উদারপন্থী অভিজাত ও মধ্যবিত্তের সঙ্গে আপোষ দরকার। ইতালীর জাতীয় আন্দোলনে ফরাসী সাহায্য ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। প্যাডমন্ত্, ক্যাভুর ও গ্যারিবল্ডি ইতালীকে জাতি হিসেবে ঐক্যবদ্ধ করার রাজনৈতিক দিকে যেমন অবদান জুগিয়েছিলেন, জাতীয়তার আদর্শ সম্বন্ধে কিন্তু তেমন গভীরভাবে ভাবেন নি। সেদিক থেকে বিবেচনা করলে, ম্যাজিনির চিন্তাধারা প্রশংসার দাবী রাখে। সেন্ট্-সাইমন ও ফরাসী বিপ্লবের আদর্শে উদ্বুদ্ধ ম্যাজিনি ব্যক্তির তুলনায় জাতির 'পর অধিক গুরুত্ব আরোপ করতেন। জাতীয় আত্ম-নিয়ন্ত্রণের অধিকারকে সুপ্রতিষ্ঠিত না-করে ব্যক্তিস্বাধীনতার প্রশ্ন বিবেচনা করতে তিনি প্রস্তুত ছিলেন না। ম্যাজিনির বিশ্বাস ছিল, প্রত্যেক জাতি যখন আত্ম-নিয়ন্ত্রণের অধিকার লাভ করবে তখন যুদ্ধ-বিগ্রহ বন্ধ হয়ে যাবে এবং আন্তর্জাতিক শান্তি ও মৈত্রী স্থায়ী হবে। বলা বাহুল্য, এ আশা মহৎ হলেও অবাস্তব ছিল।

অবাস্তব যে ছিল তা মুসোলিনীর ফ্যাসিবাদ ও দুটি বিশ্ব মহাযুদ্ধ নির্ভুলভাবে দেখিয়ে দিয়ে গেছে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে দারিদ্র্যজর্জরিত ইতালীকে নেতৃত্ব দেবার মতো যখন কেউ ছিল না তখন সন্ত্রাস সৃষ্টি করে, ভয় দেখিয়ে আর সমৃদ্ধ সমাজ সৃষ্টির মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে মুসোলিনী রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করল।[১০] ১৮৭০ খৃস্টাব্দের পর থেকে ইতালীতে বৈপ্লবিক বা গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য গড়ে উঠছিল না;—পার্লামেন্টারী শাসনের সঙ্গে জনগণের সংযোগ ছিল সামান্য। সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের যে ধারাটি ছিল তা সংকীর্ণ স্থানীয় রাজনীতির ঊর্ধ্বে উঠে কোনো বলিষ্ঠ ও প্রশস্ত জাতীয় কর্মপন্থা গ্রহণ করতে পারছিল না। ১৯২১ খৃস্টাব্দের অর্থনৈতিক সংকট এবং সমাজতান্ত্রিকদের দুর্বলতা ও ভ্রান্তিই ফ্যাসিবাদের বিজয়ী হবার প্রত্যক্ষ কারণ। ফ্যাসিবাদ ও নাৎসীবাদের অভ্যুত্থান সম্যকভাবে বুঝতে হলে উভয় দেশের ঊনবিংশ শতাব্দীর ইতিহাস গভীরভাবে অনুধাবন করা দরকার। লাস্কির মতে : Had government, either in Italy or Germany, acted firmly against either Hitler or Mussolini in their early days, there would have been little difficulty in destroying the movements they symbolized।[১১] কিন্তু লাস্কির বিশ্লেষণে নাৎসী ও ফ্যাসিবাদের ঐতিহাসিক পটভূমি

[১০] এ. রসি, দি রাইজ অব ইটালিয়ান ফ্যাসিজ্‌ম্‌ ১৯১৮-২২, লন্ডন, ১৯৩৮।
[১১] হ্যারল্ড জে. লাস্কি, রিফ্লেকশন্‌স্‌ অব দি রেভল্যুশন অব আওয়ার টাইম, পৃঃ ৮৯।

যথোচিত প্রাধান্য পায়নি। যেমন ইতালীতে তেমনি জার্মানীতে সমাজতান্ত্রিকদের অনৈক্য প্রতিক্রিয়াশীল জাতীয়তাবাদকে জয়ী হতে সাহায্য করেছে। সাম্যবাদীদের সঙ্গে সহযোগিতার প্রশ্নে সমাজতান্ত্রিকদের অসহযোগিতা ও নেতিবাচক মনোভাব হিটলারের ক্ষমতাপ্রাপ্তির পক্ষে সহায়ক হয়েছিল।

ক্ষমতালাভের পর অবশ্য সমাজতান্ত্রিক ও সাম্যবাদী আন্দোলনকে হিটলার ও মুসোলিনী প্রায় সমান নিষ্ঠুরতা ও অবিচারের সঙ্গে দমন করেছিল। জার্মানী ও ইতালীর স্বৈরতন্ত্রের রাজনৈতিক কর্মপন্থা বিশ্লেষণ করলে নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলো সাধারণভাবে পরিস্ফুট হয়: (১) মার্ক্সবাদের বিরোধিতা; (২) গণতন্ত্রের বিরোধিতা; (৩) ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যে অনাস্থা; (৪) হিংসায় প্রগাঢ় আস্থা; এবং সর্বোপরি (৫) জাতীয়তাবাদ। দুর্ভাগ্যের বিষয় জাতীয়তার 'আদর্শ'কে নাৎসীরা ও ফ্যাসিস্টরা তাদের অন্যান্য আদর্শগত বৈশিষ্ট্যের সংযোগসূত্র ব'লে গ্রহণ করেছিল ও জনগণের কাছে পরম লক্ষ্য ব'লে তুলে ধরেছিল।

জাপানী জাতীয়তাবাদের স্বরূপ ফ্যাসিবাদ ও নাৎসীবাদ থেকে অনেকাংশে ভিন্ন।[১২] পরাধীনতা থেকে জাপান তার জাতীয়তার প্রেরণা সংগ্রহ করেনি। উনবিংশ শতাব্দীর সপ্তম দশকে যখন জাপানে সম্রাট-শাসন পুনঃ-প্রবর্তিত হল, শিল্প-সমৃদ্ধির সূত্রপাত হল তখনও দেশের মোটামুটি সামাজিক কাঠামো ছিল সামন্ততান্ত্রিক। সামন্তগণ, ডাইমিও ও সামুরাই, সম্রাটের প্রতি নামমাত্র আনুগত্য জানিয়ে স্বীয় স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখত। জাপানের শিল্পোন্নতি সুরু হয়েছিল এক মধ্যযুগীয় সামন্ততান্ত্রিক সমাজের পটভূমিতে। কৃষির 'পর নির্ভরশীল ও প্রতিক্রিয়াপন্থী সামন্তরা কৃষকদের সুযোগ-সুবিধা দেবার ঘোরতর বিরোধী ছিল। সম্ভাব্য কৃষক-বিদ্রোহ দমনের জন্য সামন্তরা সর্বদা তাই শাসক-শক্তির সঙ্গে সদ্ভাব রক্ষা ক'রে চলত। দ্রুত লোক-সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য জাপান অন্যত্র উপনিবেশ স্থাপনের কথা ভাবতে সুরু করল। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে রাশিয়াকে পরাস্ত করে জাপান আপন সামরিক শক্তি সম্পর্কে অত্যন্ত গর্বিত হয়। জাপানের সামরিক শক্তিগোষ্ঠী রাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার মধ্যে থেকেও নিজ হাতে প্রভূত ক্ষমতা হাতে রাখতে পেরেছিল। জাপানের সামরিক নেতৃবৃন্দ ছিলেন সামন্ত-ঘেঁষা এবং শিল্পপতিদের প্রতি প্রতিকূলমনোভাবাপন্ন। জাপানের আভ্যন্তরীণ রাজনীতির বিভিন্ন শক্তিধারার স্বরূপ ও পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্যে কতোগুলি বৈশিষ্ট্য ছিল যা অন্যত্র সাধারণত দেখা যায় না। শিল্পোন্নতির ফলে জাপানে যে শ্রমিকশ্রেণী গড়ে উঠল তারা কৃষকদের তুলনায় অনেক বেশী রাজনীতি-চেতন ছিল। কিন্তু তবু সমাজতান্ত্রিক প্রভাব জাপানী রাজনীতিতে তখন প্রবল হয়নি। জাপানী জাতীয়তাবাদের প্রধান ভিত্তি ছিল পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতা : জাপান চেয়েছিল এই আওয়াজ তুলে এশিয়ার পরাধীন দেশগুলির সহানুভূতি পেতে। কিন্তু জাপানের চীন আক্রমণ থেকে এশিয়ার পরাধীন দেশেরা জেনে নিয়েছিল, জাপানও সাম্রাজ্যবাদী। আত্ম-সংহতি ও শিল্পোন্নতি-সাধন করার সঙ্গে সঙ্গে জাতীয়তাবাদ যদি আন্তর্জাতিক শান্তি ও সৌভ্রাতৃত্বের প্রয়োজনীয়তা বুঝতে সুরু না করে, তাহলে আভ্যন্তরীণ সমস্যা সমাধান করবার পরে, কিংবা তাতে ব্যর্থ হয়ে, তার মধ্যে সাম্রাজ্যবাদী প্রবণতা দেখা দেয়। বিংশ শতাব্দীর ইতিহাসে এ-সত্য স্পষ্ট-ভাবে ঘোষিত যে, সাম্রাজ্যবাদ স্ব-বিরোধী।

[১২] জ্যান্ রোমেইন্, দি এসিয়ান সেঞ্চুরি, পৃঃ ১৫৫-৬৫, লন্ডন, ১৯৬২।

৪

জার্মান, ইতালী ও জাপানের জাতীয়তাবাদের উত্থান-পতনের ইতিহাস লক্ষ্য করলে, জাতীয়তাবাদের যে সমালোচনা লাস্কি, টয়েন্‌বি প্রমুখ ব্যক্তিরা উত্থাপন করেছেন তা নিছক অসার বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। আমার উদ্দেশ্যও তা নয়। আমার বক্তব্য: এ'দের সমালোচনা নৈতিধর্মী; এ'রা জাতীয়তাবাদের বিকৃতির ইতিহাসকে ভিত্তি করেই জাতীয়তা-বাদের তত্ত্বকে সরাসরি খারিজ করতে চান। কোনো তত্ত্বের বিকল্প না দিয়ে সেই তত্ত্বের শুধু সমালোচনা করে পরিত্যাগ করা বাস্তব দিক থেকে ভুল। আমার সমালোচনার উত্তরে একথা উল্লিখিত হতে পারে যে, লাস্কি জাতীয়তার বিকল্প ঐক্যের আদর্শ হিসেবে আন্তর্জাতিক-তার বাণী প্রচার করেছেন। খুব সরাসরিভাবে না বললেও ম্যাক্‌আইভারের বক্তব্যও অনুরূপ : আন্তর্জাতিক মানব-সমাজ এখন এমনই একটা স্তরে পৌঁচেছে যে আমরা জাতিকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক কর্মপন্থার সিন্ধান্ত গ্রহণ করলে ভুল হবে। ম্যাক্‌আইভার ও লাস্কি উভয়েই জাতীয় সার্বভৌমত্বের নিরংকুশ কর্তৃত্ব সীমাবন্ধ করার স্বপক্ষে এবং, ওঁদের মতে, সমস্ত জাতির উচিত একটি ন্যূনতম আন্তর্জাতিক কর্তৃত্ব মেনে নেয়া। জাতীয়তা—টয়েনবির[১৩] ভাষায় 'bastard offspring of the impact of Democracy upon Parochial Sovereignty'—আন্তর্জাতিকতার শত্রু। টয়েনবি এবং শ্রীঅরবিন্দ[১৪] মনে করেন, এই কাঙ্ক্ষিত আন্তর্জাতিকতা বৈষয়িক সভ্যতার মাধ্যমে আসতে পারে না: তার জন্য চাই বিভিন্ন জাতির আত্মিক গভীরতা—গভীরতার চেতনা। ভিন্ন ভাষায় ইয়ুংও আত্মিক পথে, আন্তর্জাতিক ঐক্য সন্ধানের 'পর গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতার সম্বন্ধ সম্পর্কে আমি এখন বিস্তৃত আলোচনা করতে চাই না। আমার মতে, এই সম্বন্ধ যেহেতু ঐতিহাসিক সেইহেতু নিয়ত পরিবর্তনশীল এবং এদের মধ্যে সংজ্ঞানির্ভর কোনো স্থির সম্বন্ধ নির্ণয় অসম্ভব। দ্বিতীয় কথা হল—যা রাজনৈতিক বা অন্য যে-কোন সমাজবিজ্ঞানের আলোচনায় অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক—বাস্তব পরিস্থিতির সম্যক বিচার না করে উচ্চ আদর্শের কথা—আদর্শরূপে তা যতই বাঞ্ছনীয় হোক না কেন—ঘোষণা করা ভুল। আমার বক্তব্য এই নয় যে, বাস্তব রাজনীতি আদর্শ-নিরপেক্ষ হবে। পক্ষান্তরে, আমার বক্তব্য হল, বিকল্প যদি হয় (১) বাস্তবকে আদর্শায়িত করা, অথবা (২) আদর্শকে বাস্তবায়িত করা, তাহলে আমি (১)-কে গ্রহণ করব; কারণ, (২)-র প্রবণতা হল রাজনীতিকে অতিবেশী অতীত-মুখী ও বর্তমান-অনুগ করা। তবু, মনে রাখতে হবে, (১)-র তাৎপর্য এই নয় যে, বাস্তবকে আদর্শায়িত করতে গিয়ে সম্ভব ও অসম্ভব আদর্শের মধ্যে আমরা ভেদ-রেখা টানব না। হতে পারে যে, যে-কোনো ভেদ-রেখাই আমরা টানি না কেন, কালক্রমে বা ইতিহাসধর্মে তার পরিবর্তন হবে।—তা হোক। তবু আদর্শ নির্বাচনে আমাদের ঐতিহাসিক ও সমাজায়ত দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করতে হবে। তা না হলে আদর্শ কখনো তাত্ত্বিক স্তর থেকে নেমে মানুষের অভিজ্ঞতায় সত্য বলে প্রতিভাত হবে না, এবং ফলত বাস্তবকে আদর্শের দিকে টেনে নিতে পারবে না।

এই কারণেই জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে মার্ক্সবাদী তত্ত্বের আমি আংশিক সমালোচক। মার্ক্স জাতীয়তাবাদের সম্ভাব্য বিপদ সম্পর্কে উনবিংশ শতাব্দীতেই সতর্কবাণী উচ্চারণ

[১৩] অর্নল্ড টয়েন্‌বি, এ স্ট্যাডি অব হিস্টরি, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৪০৭।
[১৪] শ্রীঅরবিন্দ, দি হিউম্যান সাইক্‌ল্‌, পৃঃ ৩৯-৪৯।

করে গেছেন। জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে লাস্কির বক্তব্যের যেটুকু গ্রহণযোগ্য তা মার্ক্সবাদ থেকে গৃহীত। কিন্তু, জাতীয়তার বিকল্প আদর্শরূপে মার্ক্সবাদ যে আন্তর্জাতিকতার বাণী ঊনবিংশ শতাব্দী থেকে প্রচার করছে তা নীতিগতভাবে আমি স্বীকার করলেও দ্বিবিধ কারণে—ঐতিহাসিক ও আদর্শগত—ত্রুটিপূর্ণ মনে করি।

সমালোচনার সমর্থনে জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে মার্ক্সবাদী মত একবার স্মরণ এ-মত বুঝতে সাম্প্রতিক কালের ঐতিহাসিক পটভূমি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

এ-কথা বোধহয় অনস্বীকার্য যে, সামাজিক সগোত্রীয়তা অনেক স্তরেই জাতীয় সীমান্ত অতিক্রম করে থাকে।—অন্তত ইতিহাসে তার অনেক সাক্ষ্য আছে। ফরাসী বিপ্লবের পর পলাতক ফরাসী অভিজাতবৃন্দ তাদের স্বজাতীয়দের প্রতি ঘৃণা অনুভব করেছেন,—আর স্বাজাত্য অনুভব করেছেন বার্কের মতো অন্ধ রক্ষণশীলদের সঙ্গে, জার্মান এবং ইংরাজ অভিজাতদের সাহচর্যে। জারের আমলে অভিজাত ব্যক্তিরা নিম্নশ্রেণীর স্বজাতীয় ব্যক্তিদের সঙ্গে যে ঘনিষ্ঠতা অনুভব করতেন না, সেই ঘনিষ্ঠতা অনুভব করতেন পশ্চিম য়ুরোপী—বিশেষত ফরাসী অভিজাত সমাজে, তাদের ভাষা ও সাহিত্যের পরিমণ্ডলে। অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীর য়ুরোপীয় দৌত্যের ইতিহাস পাঠ করলে দেখা যায় যে, আন্তর্দেশীয় বিবাহসম্পর্কে সম্পর্কিত মুষ্টিমেয় অভিজাত ব্যক্তি অনেক দুরূহ আন্তর্জাতিক সমস্যা সমাধানে সাহায্য করছে। এখনো পশ্চিম য়ুরোপের অভিজাত ও বণিক-সমাজের মধ্যে সাম্যবাদীভীতিসঞ্জাত একটি ঐক্যবোধ প্রচ্ছন্ন রয়েছে। তবে এ-কথা ঠিক যে, সামন্ততান্ত্রিক অভিজাতদের তুলনায় বণিক-অভিজাতরা অধিক 'আন্তর্জাতিক' মনোভাবাপন্ন। এর কারণ নিতান্তই বৈষয়িক,—খুব আদর্শ-উদ্বুদ্ধ নয়। সামন্তস্বার্থ যতোটা স্থানীয় বণিকস্বার্থ নিঃসন্দেহে ততোটা নয়। বিশেষতঃ এ যুগের বণিকস্বার্থ আন্তর্জাতিক হতে বাধ্য; এ আন্তর্জাতিকতায় উদ্বুদ্ধ বণিক কম্যুনিস্ট রাষ্ট্রের সঙ্গে বাণিজ্যেও খুব উৎসুক।

মার্ক্স দেখাতে চেয়েছিলেন জাতীয়তার প্রতি বিভিন্ন শ্রেণী কিরূপ মনোভাব অবলম্বন করবে তা নির্ভর করে সংশ্লিষ্ট শ্রেণীস্বার্থের ওপর। অর্থাৎ, শ্রেণীস্বার্থ জাতীয়স্বার্থের ওপর আধিপত্য বিস্তার করে। তাই জাতীয়তার আন্দোলন কোনো নির্দিষ্ট শ্রেণী সমর্থন করবে কি করবে কিনা তা নির্ভর করবে সেই আন্দোলনের শ্রেণীস্বরূপের উপর। যে আন্দোলনের নেতৃত্ব দিচ্ছে বুর্জোয়ারা বা পরশ্রমজীবীরা সে আন্দোলনের স্বরূপ স্বভাবতই তাদের শ্রেণীস্বার্থ-প্রভাবিত হবে; এবং, সেজন্য সে আন্দোলনকে শক্তিশালী করলে শ্রমিক- ও কৃষক-শ্রেণী আত্মস্বার্থ-বিরোধী কাজ করবে। তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে এ ধারণা যে সত্য নয় তা মার্ক্স নিজেই বলে গেছেন।

সাধারণত যে অর্থে 'জাতীয়তাবাদ' শব্দটি ব্যবহৃত হয় তার সঙ্গে মার্ক্সবাদের বিরোধ বুঝতে হলে জাতিভিত্তিক রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে মার্ক্সের সমালোচনা, যা লেনিনের বিশ্লেষণে আরো স্পষ্ট হয়েছে, বুঝতে হবে। মার্ক্সের মতে, সামাজিক বিবর্তনের প্রত্যেক স্তরে শাসকশ্রেণী শাসনযন্ত্র বা সরকার, সামাজিক রীতিনীতি, নিয়মকানুন এবং, এমনকি ধ্যান-ধারণাগুলোকেও শ্রেণীর কর্তৃত্ব বজায় রাখার জন্য ব্যবহার করে। ধনতান্ত্রিক সমাজে এই

ব্যবস্থা—শ্রেণীকর্তৃত্ব বজায় রাখার জন্য রাষ্ট্রশক্তির অপব্যবহার—আরো দৃঢ় হচ্ছে। এককভাবে কোনো ধনতান্ত্রিক সমাজের সর্বহারাশ্রেণীই সংঘশক্তির অভাবে ও অন্যান্য কারণে পরশ্রমজীবী শ্রেণীকে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব থেকে দূর করতে পারে না। তাই তাদের কর্তব্য হল আন্তর্জাতিক সর্বহারাদের সমর্থন ও সহযোগিতালাভের চেষ্টা করা। জাতিগত 'ঐক্য', মার্ক্সের মতে, শ্রেণীস্বার্থের বিভিন্নতায় বিদীর্ণ ও দুর্বল। অতএব ঐ কাল্পনিক এবং স্বীয় স্বার্থ-বিরোধী ঐক্যের ডাকে বিপথগামী না হয়ে সর্বহারাদের উচিত আন্তর্জাতিক সর্বহারা-শ্রেণীর ঐক্য গড়ে তোলা। 'Working men of all countries, unite!'—মার্ক্সের এই আহ্বানের পশ্চাতে ছিল শ্রেণী-ভিত্তিক জাতীয় রাষ্ট্র-কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে কঠোর সমালোচনা।

মার্ক্স-এঙ্গেলস্ সকল প্রকার জাতীয়তার আন্দোলনের সমর্থক কিংবা বিরোধী ছিলেন না। শ্রেণীবিন্যস্ত সমাজ হলেও কতোগুলি ক্ষেত্রে সর্বহারাদের শ্রেণীস্বার্থের ওপর প্রাধান্য আরোপ না করেই মার্ক্স-এঙ্গেলস্ সামগ্রিকভাবে জাতীয়তার আন্দোলন সমর্থন করেছেন। আয়র্ল্যান্ড এবং প্যোলান্ডের জাতীয়তার আন্দোলনকে তাঁরা অকুণ্ঠ সমর্থন জানিয়েছেন। কিন্তু প্যান-স্লাভ জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের তীব্র বিরোধী ছিলেন মার্ক্স-এঙ্গেলস্। কেন আয়র্ল্যান্ড ও প্যোলান্ডের জাতীয়তাবাদ সমর্থন করে তাঁরা চেকোস্লাভ, সার্বিয়ান, বুলগেরিয়ান, প্যালিসিয়ানদের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে সমর্থন করলেন না ? এ প্রশ্নের উত্তর বিশ্লেষণ করলে আমরা এমন কতোগুলি ঘটনা ও যুক্তি দেখতে পাব যা ইদানীন্তন বিভিন্ন জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে বুঝতে সাহায্য করবে। এ আলোচনায় পরে ফিরছি। তার আগে দেখা যাক, জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে মার্ক্সবাদী মতবাদ কিভাবে ধীরে-ধীরে পরিবর্তিত হল।

প্রথম ইন্টারন্যাশনালে জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে মার্ক্সীয় মতবাদ সম্পূর্ণ অনুমোদিত হয়েছিল। তারপরে পশ্চিম য়ুরোপে-বিশেষত ইংল্যান্ড ও জার্মানীতে-যেরকমভাবে শিল্পোন্নতি ঘটতে লাগল তাতে শ্রমিক শ্রেণীর মনোভাব ভিন্নতর খাতে বইতে সুরু করল। শিল্পসমৃদ্ধির অংশবণ্টনে শ্রমিক-শ্রেণী যুক্তিসংগত ভাগ না পেলেও তারা জাতীয় রাষ্ট্রকে নিছক শোষণের যন্ত্র হিসেবে মানতে রাজী হল না। সমৃদ্ধি বণ্টনের অন্যায় দূর করবার জন্য শ্রমিকেরা ট্রেড-য়ুনিয়ন আন্দোলনের দিকে ঝুঁকতে লাগল : বিপ্লবের উদ্দীপনা ও প্রস্তুতি বাঁচিয়ে রাখবার যথোচিত সংগঠন দেখা দিল না। দ্বিতীয় ইন্টারন্যাশনালে মার্ক্সের মত সরাসরি প্রত্যাখ্যাত হল না বটে, তবু সংস্কারবাদ (Reformism) সুরু হল। মার্ক্সীয় তত্ত্বের নতুন ব্যাখ্যা দেওয়া হল : শ্রমিক শ্রেণী সর্বদা জাতীয় রাষ্ট্রের বিরোধিতা না করে কখনো কখনো তার সংগে সহযোগিতাও করতে পারে ; এবং এতে বিপ্লব-বিরোধিতা করা হবে না ; কারণ, বিপ্লব ঐতিহাসিক ধারায় অনিবার্যরূপে আসবেই। তত্ত্বের দিক থেকে এ-মত নিঃসন্দেহে ভুল। যাঁরা এ-মতের প্রধান সমর্থক ছিলেন তাঁরা প্রধানত ছিলেন শিল্পোন্নত পশ্চিম য়ুরোপীয় দেশগুলির সমাজতান্ত্রিক দলের প্রতিনিধি : তাঁরা তাঁদের দেশের শ্রমিক আন্দোলনের বাস্তব গতিপ্রকৃতি দেখে সর্বহারাদের আন্তর্জাতিক আন্দোলনসৃষ্টির বিষয়গত অবস্থা দেখা দিয়েছে বলে মনে করতে পারেননি। বলাবাহুল্য, লেনিন ও তাঁর অনুগামিবৃন্দ মার্ক্সবাদের এই ব্যাখ্যার তীব্র বিরোধিতা করেছিলেন। প্রথম মহাযুদ্ধে সার্বিয়া এবং রাশিয়া ব্যতীত সমগ্র য়ুরোপীয় দেশের সমাজতান্ত্রিক দলগুলি তাদের জাতীয় সরকারের যুদ্ধ-ঋণ অনুমোদন করল। ইংল্যান্ড এবং ফ্রান্সের যুদ্ধ-মন্ত্রিসভায় শ্রমিক-শ্রেণীর প্রতিনিধিরা যোগদান করল। লেনিনের ভাষায়, আন্তর্জাতিক সর্বহারা আন্দোলনের প্রতি সংকীর্ণ

জাতীয়তাবাদী সমাজতান্ত্রিকরা বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল।

১৯১৯ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে মস্কোতে তৃতীয় ইন্টারন্যাশনাল স্থাপিত হল। লেনিন এবং ট্রট্স্কি ভেবেছিলেন, রুশ-বিপ্লবের সংকেত ও নেতৃত্ব অনুসরণ করে পশ্চিম য়ুরোপের শ্রমিক-আন্দোলন বৈপ্লবিক পথে দ্রুত অগ্রসর হবে। তাঁদের ধারণা ভুল প্রতিপন্ন হল। কোলের ভাষায়[১৩]:

In the most powerful capitalist countries—in Great Britain, France, and Germany, and, even more, in the United States—the necessary conditions for Socialist Revolution simply did not exist: and the attempts of communist minorities to act as if they did brought down disaster upon them and, even where Revolutions of a sort did occur, opened the way for counter-revolution—for example in Germany, in Italy, and, most speedily of all, in Hungary.'

দ্বিতীয় ইন্টারন্যাশনালের স্টকহোম অধিবেশনেই (১৯১৭) নরম ও চরমপন্থীদের মতপার্থক্য অনমনীয়রূপেই স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল। সংখ্যালঘিষ্ট বলশেভিকপন্থী সমাজ-তান্ত্রিকরা বিপ্লববাদিতার প্রতি তাঁদের আস্থায় অবিচল রইলেন। পক্ষান্তরে নরমপন্থীরা বিপ্লবের আসন্ন সম্ভাবনার কোনো বাস্তব ভিত্তি আছে বলে স্বীকার করলেন না এবং, ফলত, বিপ্লবের পথে সর্বহারাদের তক্ষুনি আহ্বান জানাতে অস্বীকৃত হলেন। স্টকহোম অধিবেশনের সময়ে বলশেভিকরা তখনও রাশিয়ার রাষ্ট্রকর্তৃত্বে আসেনি। ১৯১৯-এর ফেব্রুয়ারীতে ভ্যান্ডারভেল্ডে, হেন্ডার্সন এবং টমাস প্রমুখের উদ্যোগে আহূত ইন্টার-ন্যাশনাল বার্ন কনফারেন্সে আন্তর্জাতিকতার প্রতি সমাজতান্ত্রিকদের আনুগত্য ঘোষিত হল বটে; কিন্তু একনায়কতন্ত্র ও প্রথম মহাযুদ্ধ-'সমর্থনকারী' জার্মান ও অন্যান্য সমাজতন্ত্রী দল সম্পর্কে দ্ব্যর্থহীন কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্ভব হল না। সংখ্যাগরিষ্ঠ 'ব্রান্টিং' সিদ্ধান্তে গণতন্ত্রের প্রশংসা করা হল। সংখ্যালঘিষ্ঠ এড্লার-লঙ্গোয়েৎ সিদ্ধান্তে বলশেভিক বিরোধিতার প্রচেষ্টাকে নিন্দা করা হল। এ সত্য অনস্বীকার্য যে ইন্টারন্যাশনাল বার্ন কনফারেন্সে সমবেত সমাজতন্ত্রীরা আন্তর্জাতিক সর্বহারাদের বৈপ্লবিক ঐক্য সৃষ্টির বিষয়ে স্পষ্ট কোনো সিদ্ধান্ত ঘোষণা করতে পারেনি।

প্রধানত এজন্যই লেনিন পরবর্তী মাসে মস্কোতে প্রতিদ্বন্দ্বী তৃতীয় ইন্টারন্যাশনাল আহ্বান করেছিলেন। এই সম্মেলনের পর লেনিন, ট্রট্স্কি, জিনোভিয়েভ, রকোভস্কি এবং প্ল্যাট্রেন সম্মিলিত ঘোষণাপত্র (Declaration of Participants in Zimmerwald Conference) প্রকাশিত হল। তাতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলিকে প্রাধান্য দেয়া হল:

(ক) সর্বহারাদের সংঘ-শক্তির মাধ্যমে সকল দেশের রাষ্ট্র-ক্ষমতা বুর্জোয়াদের হাত থেকে ছিনিয়ে নিতে হবে;

(খ) সর্বহারাদের বিপ্লবকে শক্তিশালী ও নিরাপদ করবার জন্য সর্বহারাদের সশস্ত্র এবং বুর্জোয়াদের নিরস্ত্র করতে হবে;

(গ) একনায়কতন্ত্রের মাধ্যমে ব্যক্তিগত মালিকানা নির্মূল করতে হবে এবং উপাদান-পদ্ধতির কর্তৃত্ব অধিকার করতে হবে।

বলাবাহুল্য, নরমপন্থী গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রীদের উদ্দেশে তৃতীয় ইন্টারন্যাশনাল

[১৩] জি. ডি. এইচ. কোল, সোশ্যালিস্ট থট্, কমুনিজম অ্যান্ড সোশ্যাল ডেমক্রাসি, ১৯১৪-১৯৩১।

থেকে তীব্র সমালোচনা উচ্চারিত হয়েছিল। লক্ষণীয় হল, আন্তর্জাতিক সর্বহারা আন্দোলনের যে প্রস্তাব মস্কো অধিবেশনে গৃহীত হল তাতে জাতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টির নেতৃত্ব সম্পর্কে কিছুই বলা হল না। এর কারণ বোধহয়, (১) জাতীয় স্তরে তখনও রাশিয়ার বাইরে কোনো দেশে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন তেমন দানা বাঁধেনি এবং (২) আন্তর্জাতিক আন্দোলনকে সেই স্তরে কেন্দ্রীভূত রাখার প্রয়োজনীয়তা। তবে সাম্যবাদের কর্মসূচী আলোচনা প্রসঙ্গে বিভিন্ন জাতীয় স্তরে অবস্থা অনুযায়ী ব্যবস্থা অবলম্বনের স্বাধিকার স্থানীয় সাম্যবাদী দলকে দেওয়া হয়েছিল।

তৃতীয় ইন্টারন্যাশনালের 'ম্যানিফেস্টো'তে ধরে নেওয়া হয়েছিল যে (ক) প্রথম মহাযুদ্ধের ফলে ধনতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থা এমন এক বিধ্বস্ত অবস্থায় নিক্ষিপ্ত হয়েছে যে সেই সময়ে সমাজতান্ত্রিক শক্তি যদি সজোরে বৈপ্লবিক আঘাত হানতে পারে তাহলে সাম্যবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে বেশী বেগ পেতে হবে না; এবং (খ) ধনতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থায় যুদ্ধ যে অনিবার্য এ বিষয়ে মার্ক্সের ভবিষ্যদ্বাণী সত্যে পরিণত হয়েছিল বলে (ক)ও সত্যে পরিণত হবে। পরবর্তী কালের ইতিহাস সাক্ষ্য রেখে গেছে, তৃতীয় ইন্টারন্যাশনালের আশা পূর্ণ হবার মতো বিষয়গত অবস্থা বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় ও চতুর্থ দশকেও য়ুরোপে দেখা দেয় নি। আন্তর্জাতিক বিপ্লবের সম্ভাবনা সম্বন্ধে খুব আশাবাদী হলেও বিভিন্ন জাতি-রাষ্ট্রের সীমান্ত নিশ্চিহ্ন করে কবে যে সর্বহারার জগৎ-সমাজ সৃষ্টি হবে সে-বিষয়ে তৃতীয় ইন্টারন্যাশনাল নীরব ছিল।

প্রথম মহাযুদ্ধে দুর্বল ধনতান্ত্রিক দেশগুলির বিরুদ্ধে যে বিপ্লব মাথা চাড়া দিয়ে উঠল তার মধ্যে একমাত্র রুশ বিপ্লব ছাড়া অন্য সকল আন্দোলন প্রতিক্রিয়ার বিকৃত পথে এগিয়ে গেল। তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ, ইতালীর ফ্যাসিস্ট এবং জার্মানীর নাৎসী আন্দোলন। ইংল্যান্ড এবং ফ্রান্সে শ্রমিক-সংঘ শক্তিশালী হল বটে কিন্তু তারা বৈপ্লবিক পথে অগ্রসর হতে রাজী হল না : তারা মনে করল, শিল্পসমৃদ্ধির ক্রমবর্ধমান প্রভাবে তাদের সমস্যা তারা জাতীয় স্তরেই সমাধান করতে পারবে; তাছাড়া সমাজতন্ত্রের ফ্যাসিস্ট ও নাৎসী বিকৃতি শ্রমিক আন্দোলনের বৈপ্লবিক শক্তিকে প্রভূত পরিমাণে নষ্ট করে দিয়েছিল। মূল কথা, ১৯১৯-২১ খৃষ্টাব্দের বিরোধী ইন্টারন্যাশনালদ্বয় সমাজতন্ত্রের আন্দোলনকে জাতীয় স্তর থেকে আন্তর্জাতিক স্তরে উন্নীত করতে ব্যর্থ হল।

তার অর্থ এই নয় যে, রুশ বিপ্লব এবং তৃতীয় ইন্টারন্যাশনাল বহু দেশে—শুধু য়ুরোপে নয়, এশিয়ায়ও—প্রগতিশীল ও জাতীয়তাবাদী শক্তিকে সাম্রাজ্যবাদ ও ঔপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে জাগিয়ে তোলেনি। অনুন্নত এশিয়ার বিভিন্ন সমাজে সমাজতান্ত্রিক শক্তি তখনো জাতীয়তা-নিরপেক্ষ কোনো রূপ নিতে পারেনি। ভারতবর্ষ, চীন ও মধ্যপ্রাচ্যের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন রুশ বিপ্লব থেকে নিঃসন্দেহে প্রেরণা পেয়েছে, কিন্তু তাদের ঐতিহাসিক-সামাজিক স্তর বিশ্লেষণ করলে সহজেই বোঝা যায় কেন ঐসব আন্দোলনে কোনো স্পষ্ট আন্তর্জাতিক চরিত্র ছিল না।

লেনিনোত্তর রুশ নেতৃবৃন্দ উপলব্ধি করতে সুরু করল, আন্তর্জাতিক রূপ পরিগ্রহ না করলেও সমাজতন্ত্র নির্দিষ্ট কোনো দেশের সীমানায় সার্থক হতে পারে। অবশ্য লেনিন নিজেই ১৯২১ সালে আন্তর্জাতিক বিপ্লবের সম্ভাবনা সম্পর্কে সন্দিহান হয়ে ওঠেন। জার্মান বিপ্লবের ব্যর্থতা ও ইতালীতে ফ্যাসিষ্ট-অভ্যুত্থান লেনিনকে আরো আশাহত করল। সোভিয়েট কম্যুনিস্ট পার্টির নবম কংগ্রেসে (১৬ই মার্চ, ১৯২১) ধনতান্ত্রিক দেশসমূহের

নিকট থেকে সাহায্য গ্রহণের প্রস্তাব গৃহীত হয়:

The basic lask confronting the Soviet Republic cannot be achieved to any large extent and in a short time without the use of foreign technique, foreign equipment, with machinery imported from abroad.'

শুধু দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নতির জন্যই নয়, অন্যান্য কারণেও তখন রাশিয়ার পক্ষে আন্তর্জাতিক আন্দোলন সৃষ্টির চেষ্টা অব্যাহত রাখা সম্ভব ছিল না: (১) গৃহযুদ্ধে ও বৈদেশিক হস্তক্ষেপে রাশিয়া তখন দুর্বল; (২) নিঃসঙ্গ সমাজতান্ত্রিক রাশিয়া ছিল শত্রুবেষ্টিত; এবং (৩) বহু-জাতির দেশ সোভিয়েট রাশিয়ায় তখন ক্ষুদ্রতর একাধিক জাতি জাতীয় স্বাতন্ত্র্য রক্ষার আন্দোলন করছিল।[১৬] অবস্থার চাপে পড়ে রাশিয়া তার আন্তর্জাতিকতার আদর্শ বিসর্জন না দিলেও স্থগিত রাখতে বাধ্য হল। আত্মরক্ষার জন্য রাশিয়া তার প্রতিবেশী আফগানিস্তান, তুরস্ক, রুমানিয়া প্রভৃতি রাষ্ট্রের সঙ্গে মৈত্রীরক্ষার চেষ্টা করতে লাগল। ফ্রান্স, জার্মানী এবং ইংল্যান্ডের মতো ধনতান্ত্রিক দেশও রাশিয়াকে স্বীকার করল। রাশিয়া বুর্জোয়া রাষ্ট্রের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্কে আবদ্ধ হয়ে ঐসব রাষ্ট্রের শ্রমিকদের প্রত্যক্ষভাবে আর রাষ্ট্রদ্রোহিতায় উৎসাহ দিতে পারল না।[১৭] স্তালিন সোভিয়েট পররাষ্ট্রনীতিকে আন্তর্জাতিক বিপ্লবের উচ্চ গ্রাম থেকে নামিয়ে দেশের অর্থ-নৈতিক সংগঠনের সঙ্গে মেলাতে চাইছিলেন। ট্রট্স্কি[১৮] ছিলেন এ মতের বিরোধী। তাঁর ভাষায়:

The national interests of Russia coincide with the interests of her ruling class, i.e. the proletariat. But the genuine interests of the working class cannot be satisfied otherwise than by international means, i.e. by means of a world federation of republics based on labour and its solidarity.

স্তালিন বুঝেছিলেন, ট্রট্স্কির নীতি বাস্তবতা-বর্জিত। স্তালিনের নীতি ছিল এইরকম: (ক) এককভাবে সোভিয়েট রাশিয়ায় সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা সম্ভব এবং এই সমাজ-তান্ত্রিক রাষ্ট্রকে অর্থনৈতিক উন্নতির মধ্য দিয়ে শক্তিশালী করলে তবে আন্তর্জাতিক সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনকে কার্যকরী সাহায্য দেওয়া সম্ভব হবে; (খ) সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের স্থায়িত্ব সম্পর্কে স্থিরনিশ্চিত হতে হলে আন্তর্জাতিক সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনকে প্রবল করে তুলতেই হবে। চতুর্দশ পার্টি কংগ্রেস (১৯২৫) স্তালিনের নীতি অনুমোদন করল। শুধু তাই নয়, ধনতান্ত্রিক দেশগুলো যে যুদ্ধের ধাক্কা সামলে স্থির-শক্ত হয়ে উঠেছে এই মর্মে উত্থাপিত জিনোভিয়েভের প্রস্তাবও কংগ্রেস বিনা আলোচনায় গ্রহণ করল।[১৯]

পরাধীন জাতিগুলোর স্বাধীনতা আন্দোলনে স্তালিন তাঁর সাধারণ সমর্থন জানালেও তিনি সেইসব জাতির আন্দোলন সমর্থন করতেন না যেখানে সর্বহারাদের স্বার্থ উপেক্ষিত

[১৬] রুডল্‌ফ্‌ শ্লেইজিঙ্গার, দি ন্যাশনালিটিজ প্রব্লেম অ্যান্ড সোভিয়েট অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, লন্ডন, ১৯৫৬।

[১৭] এই সময়কার রুশ পররাষ্ট্র-নীতি বুঝবার পক্ষে রয়াল ইনস্টিটুট অব ইন্টারন্যাশনাল অ্যাফেয়ার্স প্রকাশিত (লন্ডন, ১৯৫১-৫৩) 'সোভিয়েট ডকুমেন্টস অব ফরেন পলিসি' (৩ খণ্ড) পুস্তকখানি খুব সাহায্যকারী।

[১৮] (১৭) ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩৭৫।

[১৯] ই. এইচ. কার, সোশ্যালিজ্‌ম্‌ ইন ওয়ান কান্ট্রি, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ৪৫-৪৬।

হচ্ছে। যে-সব জাতীয় মুক্তির আন্দোলন সাম্রাজ্যবাদকে দুর্বল বা বিতাড়িত করতে পারবে তিনি কেবল সেইসব আন্দোলনেরই সমর্থক ছিলেন। জাতীয় মুক্তি-আন্দোলনকে তিনি বিচ্ছিন্নভাবে, জাতীয় স্তরে দেখার বিরোধী। তাঁর ভাষায়[২০]:

The rights of nations are not an isolated and self-contained question, but part of the general question of the proletarian revolution, a part which is subordinate to the whole and which must be dealt with from the point of view of the whole.

১৯৩৪ সালের মধ্যে আন্তর্জাতিক রাজনীতি এমন একটা রূপ নিল যে, রাশিয়া তার স্বীয় নিরাপত্তার জন্যই এতো উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ল যে তার পক্ষে আর ভিন্ন দেশের জাতীয় মুক্তি-আন্দোলনে সক্রিয় সাহায্য করা শক্ত হয়ে উঠল। জাপান কর্তৃক চীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা, মাঞ্চুরিয়া দখল, প্রতিহিংসা-পরায়ণ নাৎসীদের হাতে জার্মান রাষ্ট্রক্ষমতা চলে যাওয়া, জাতিসংঘ থেকে জার্মান ও জাপানের সদস্যপদ-প্রত্যাহার ইত্যাদি ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সপ্তদশ কংগ্রেসে (জানুয়ারি, ১৯৩৪) স্তালিন বৈদেশিক নীতি পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা ঘোষণা করলেন। নানা দেশের সঙ্গে রাশিয়া অনাক্রমণ চুক্তি সম্পাদন করতে ব্যগ্র হল এবং সম্পাদন করলও। যে লিট্‌ভিনভ ১৯২৫-এর ২৩শে নভেম্বর জাতিসংঘের সমালোচনা করে বলেছিলেন 'The League is a cover for the preparation of military action for the further suppression of small and weak nationalities' তিনিই ১৯৩৪-এর ১৮ই সেপ্টেম্বর সোভিয়েট রাশিয়ার জাতিসংঘে প্রবেশ-উপলক্ষে বললেন[২১]:

For its part, the Soviet Government, following attentively all developments of international life, could not but observe the increasing activity in the League of Nations of States interested in the preservation of peace and their struggle against aggressive militarist elements. . . The organization of peace! Could there be a loftier and at the same time more practical and urgent task for the cooperation of all nations.' আন্তর্জাতিক রাজনীতির ক্ষেত্রে যে দ্রুতাবনতি দেখা দিচ্ছিল তার পটভূমিকায় সোভিয়েটের পরিবর্তিত নীতি সহজবোধ্য। জাতি যখন সংকটাপন্ন তখন তার লক্ষ্য আন্তর্জাতিক হলেও তা রক্ষা করা অসম্ভব।

১৯৩৩ সালে অর্থনৈতিক সংকট ও ফ্যাসিস্ট শক্তিকে রোধ করবার জন্য ফরাসী র‍্যাডিকালদের সমর্থন করতে সোশ্যালিস্টরা এগিয়ে গেল, কিন্তু কম্যুনিস্টরা শুধু পশ্চাৎপদই হল না,—উপরন্তু সোশ্যালিস্টদের এ জন্য তীব্র সমালোচনা করল। ফ্যাসিস্ট-অভ্যুত্থানে শঙ্কিত কমিনটার্ন নীতি পরিবর্তন করল: মস্কোর নির্দেশে ফরাসী কম্যুনিস্টরা র‍্যাডিকাল এবং সোশ্যালিস্টদের সঙ্গে ফ্যাসি-বিরোধী সম্মিলিত ফ্রন্টে যোগদান করল। এই সময়ে কমিনটার্ন নীতি পরিবর্তন করে বিভিন্ন কম্যুনিস্ট পার্টিকে নির্দেশ দিল সকল জাতির সর্বহারা-আন্দোলনকে এখন মাত্র একটি নীতি দিয়ে ঐক্যবন্ধ করা সম্ভব, আর সে নীতি হল ফ্যাসিস্ট-বিরোধিতা। প্রত্যেক জাতির মধ্যে যে শ্রেণী-সংগ্রাম ছিল সেইদিকে প্রধান

[২০] জোসেফ স্তালিন, মার্ক্সইজ্‌ম্‌ অ্যান্ড দি ন্যাশনাল অ্যান্ড কলোনিয়াল কোয়েশ্চন, পৃঃ ১৯৩, মার্টিন লরেন্স লিঃ, লন্ডন (তারিখ নেই)।

[২১] এ. জেড্‌. রুবিনস্টাইন (সংকলিত ও সম্পাদিত) দি ফরেন পলিসি অব দি সোভিয়েট য়ুনিয়ন, পৃঃ ৯১, ১০২, ন্যু ইঅর্ক, ১৯৬০।

গুরুত্ব আরোপ না করে কমিনটার্ন সাম্যবাদী আন্দোলনকে আন্তর্জাতিক রূপ দিতে চাইল ফ্যাসি-বিরোধিতার সঙ্গে তাকে সংযুক্ত করে। এই দিক থেকে বিবেচনা করলে, পশ্চিম য়ুরোপের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির তুলনায় রাশিয়াই যে পূর্বাহ্নে ফ্যাসি-সংকটের তাৎপর্য উপলব্ধি করেছিল তা অনস্বীকার্য। ১৯৩৩ সালেই রাশিয়া ইতালীর সঙ্গে অনাক্রমণ চুক্তিতে আবদ্ধ হয়। ১৯৩৬ সালে রাইনল্যান্ড অধিকার করবার পর চেকোস্লোভাকিয়া ও ফ্রান্সের সঙ্গেও রাশিয়ার অনাক্রমণ চুক্তি কার্যকরী হল।

ঐ বছরেরই জুলাইতে স্পেনে গৃহ-যুদ্ধ সুরু হল। স্পেনের গৃহ-যুদ্ধের সময়ে অনুসৃত সোভিয়েট রাশিয়ার পররাষ্ট্র নীতি বিশ্লেষণ করলে আবার এ সিদ্ধান্ত স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অনুসরণীয় (আদর্শ) নীতির সঙ্গে যখন জাতীয় স্বার্থের বিরোধ দেখা দেয় তখন আন্তর্জাতিক আদর্শ-সংগঠনের নেতৃ-রাষ্ট্রের (এ-ক্ষেত্রে রাশিয়ার) পক্ষে জাতীয় স্বার্থের প্রতি অধিকতর মনোযোগ দেয়া স্বাভাবিক। এখানে উচিত-অনুচিতের প্রশ্নকে আমি প্রাধান্য দিচ্ছি না : রাজনীতিতে ঔচিত্যের প্রশ্ন থেকে অস্তিত্বের বা বাস্তব ইতিহাসের প্রশ্ন যতদিন পর্যন্ত অধিক গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হচ্ছে—তার কারণ যাই হোক—ততদিন পর্যন্ত আমাদের পক্ষে এ ব্যাপারটিকে ঘটনা হিসেবে অন্তত মেনে নেয়া দরকার। ১৯৩৬ সালে রাশিয়ার পক্ষে য়ুরোপের শক্তিশালী বুর্জোয়া রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে যুগপৎ সৎ সম্পর্ক রাখা এবং তাদেরই দেশের সর্বহারা-আন্দোলনের আন্তর্জাতিক লক্ষ্যকে উৎসাহ দান করা সম্ভব হচ্ছিল না। ম্যাক্স বেলফের ভাষায়:

Even more clearly than events in France, the Spanish Civil War served to illumine the contradictions inherent in the Soviet attempt to combine diplomatic action at the side of the Western democracies with an active 'popular front' policy on the part of the Comintern.

১৯৩৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে স্পেনের সমাজতান্ত্রিক নেতা লার্গো ক্যাবালেরো (Largo Caballero) যখন প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে সমবেত হবার জন্য বামপন্থী ঐক্য সৃষ্টির জন্য আহ্বান জানাল তখন ট্রট্স্কিবাদীরা সাড়া দিল, কিন্তু কম্যুনিস্টরা বা নৈরাজ্যবাদী সিন্ডিক্যালিস্টরা যোগ দিতে রাজী হল না। এ প্রসঙ্গে স্মর্তব্য, স্পেনের সমাজতান্ত্রিক দল, স্থানীয় কম্যুনিষ্টদের সহযোগিতা না পেলেও, সোভিয়েট আদর্শের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাশীল ছিল। ১৯৩৬ সালে অবশ্য পপুলার ফ্রন্টে স্পেনীয় কম্যুনিস্টরা দু' কারণে যোগ দিল : (১) কমিনটার্ন এ বিষয়ে প্রবল চাপ দিচ্ছিল; (২) সমাজতান্ত্রিক প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবার জন্য ক্রমাগত বামপন্থার দিকে অগ্রসর হচ্ছিল। যদিও কমিনটার্নের তদানীন্তন জেনারেল সেক্রেটারি ডিমিট্রভ পপুলার ফ্রন্ট গঠনের আন্দোলন সৃষ্টির জন্য ১৯৩৫ সালের আগস্ট থেকেই বিভিন্ন দেশের কম্যুনিস্ট পার্টিকে উদ্যোগী হতে বলছিলেন, স্পেনের চরমপন্থী কম্যুনিস্টরা তা গ্রহণে যথোচিত তৎপরতা প্রদর্শন করেনি। এবং, লক্ষণীয় হল, তখন পপুলার ফ্রন্টের বৈপ্লবিক নীতি কমিনটার্নের নীতির তুলনায় অনেক বেশী চরমপন্থী ছিল। স্পেনের গৃহযুদ্ধের বিস্তৃত ইতিহাস[২৩] আমার আলোচ্য নয়।

[২২] ম্যাক্স বেলফ, দি ফরেন পলিসি অব সোভিয়েট রাশিয়া, ১৯২৯-১৯৪১, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ২৮, লন্ডন, ১৯৪৯।

[২৩] উৎসাহী পাঠক হিউ টমাসের 'দি স্প্যানিশ সিভিল ওয়ার' লন্ডন, ১৯৬১ দেখতে পারেন। প্রয়োজনীয় পুস্তক-পঞ্জীসহ এ বইটি প্রামাণিক।

আমি এ প্রসঙ্গে দুটি বিষয়ের প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি: (১) এক সময়ে কমিনটার্ন যখন চাইছিল স্পেনের কম্যুনিস্ট পার্টি অন্য সমাজতান্ত্রিক শক্তির সঙ্গে ঐক্যবন্ধ হোক, তখন কম্যুনিস্ট পার্টি সম্মত হচ্ছিল না; (২) পরে যখন পপুলার ফ্রন্টের নেতৃত্ব-গ্রহণ করে কম্যুনিস্টরা বৃহত্তর স্বার্থে চরমপন্থী নীতি অনুসরণ করতে চাইল, তখন কমিন-টার্ন তাতে সম্মত হল না। স্পেনের গৃহযুদ্ধে নিরপেক্ষ থাকবার যে নীতি ইংরাজ সরকার এবং ফরাসী সরকারের দক্ষিণপন্থীরা গ্রহণ করেছিল তা নাৎসী-ভয়ে ভীত রাজনৈতিক শক্তিদের কাছ থেকে অপ্রত্যাশিত নয়। কিন্তু নিরপেক্ষ থাকবার চুক্তি নির্লজ্জভাবে ভঙ্গ করে ইতালী এবং জার্মানী যখন ফ্রান্সের প্রতিক্রিয়াশীল জাতীয়তাবাদীদের সশস্ত্র সমর্থন জানাচ্ছিল, তখন আন্তর্জাতিকতার আদর্শে অনুপ্রাণিত প্রজাতান্ত্রিক শক্তির প্রতি স্তালিনের সকুণ্ঠ সমর্থন সমালোচনার উদ্রেক করে। জুলাই (১৯৩৬)-এ স্পেনে গৃহযুদ্ধ সুরু হয়, আর প্রজাতান্ত্রিকদের 'সাহায্য' বহন করে প্রথম রুশ নৌবহর এসে পৌঁছল অক্টোবরের শেষে। দুঃখের বিষয়, ঐ নৌবহর অস্ত্র বহন করছিল না—যা তখন ছিল নিদারুণ প্রয়োজনীয়,—বহন করছিল খাদ্য। দ্বিতীয় ইন্টারন্যাশনালে আলোচনা-প্রসঙ্গে নরমপন্থীরা যখন বৈদেশিক বিপ্লবকে নৈতিক ও মানবিক সমর্থন জ্ঞাপনের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করছিল তখন বলশেভিকরা ক্লীব ও অবৈপ্লবিক 'মানবিকতা'কে নিয়ে পরিহাস করেছিল। স্পেনের গৃহযুদ্ধে রাশিয়া যে আশানুরূপ সাহায্য করতে পারেনি তার এক কারণ তখন দলীয় অন্তর্দ্বন্দ্ব এক উন্মুক্ত রক্ত-কলঙ্কিত স্তরে পৌঁচেছিল; দ্বিতীয় কারণ, ফ্যাসিস্ট শক্তির বিপজ্জনক সম্প্রসারণ সত্ত্বেও ফ্রান্স ও ইংল্যান্ড গণতান্ত্রিক ঐক্য গড়বার প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণে মারাত্মক অবহেলা করছিল,—এ অবস্থায় স্বীয় নিরাপত্তার চিন্তায় উদ্বিগ্ন নিঃসঙ্গ কম্যুনিস্ট দেশের পক্ষে অন্য এক দূর দেশের প্রজাতান্ত্রিক আন্দোলনকে সাহায্য করা ছিল খুবই কঠিন। কারণ হয়তো আরো ছিল। কিন্তু এ সত্য (১৯৩৬-৩৮-এ) স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল, জাতীয় স্বার্থের ঊর্ধ্বে কোনো জাতিই কোনো আন্তর্জাতিক নীতি—তা সে যতোই মহৎ হোক—অনুসরণ করতে রাজী নয়। বলাবাহুল্য, এ 'সত্য' মার্ক্সবাদবিরোধী। কেউ হয়তো বলবেন, বিশেষ বিশেষ ঐতিহাসিক পটভূমিতে মার্ক্সবাদী তত্ত্বের পরিবর্তন নিশ্চয়ই দূষ্য নয়। এ-যুক্তি আমি অংশত গ্রহণ করি। তবু সমস্যা থেকে যায় : কোনো বিশেষ ঐতিহাসিক পটভূমিতে মার্ক্সবাদী কোনো এক তত্ত্বের কতোটা পরিবর্তন প্রয়োজন সে বিষয়ে কারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে?—জাতীয়, নাকি আন্তর্জাতিক কোনো সংগঠন?

এই প্রশ্নের 'পর আমি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করি। কারণ, (১) এই প্রশ্ন কমিনটার্নের সঙ্গে চীনা কম্যুনিস্ট পার্টির সম্পর্কের প্রসঙ্গে উঠেছিল; এবং (২) এই প্রশ্নের সঠিক উত্তরের 'পর ভবিষ্যৎ জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সাফল্য অনেকাংশে নির্ভর করছে। কম্যুনিস্ট-কুওমিন্টাং মিতালীর যুগে (১৯২৩-২৭) চীনা কম্যুনিস্ট পার্টিকে এই প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। কুওমিন্টাং তখন যে ধরনের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের পক্ষ-পাতী ছিল তার সমর্থন করা কম্যুনিস্টদের পক্ষে আদর্শগত কারণে শক্ত ছিল। পক্ষান্তরে, কমিনটার্ন চাইছিল চীনা কম্যুনিস্টরা আপাতত চরম পথে না এগিয়ে জাতীয়তাবাদী বুর্জোয়াদের সঙ্গে সহযোগিতা করুক। গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক আদর্শ সম্বন্ধে জাতীয় স্তরে সিদ্ধান্ত গ্রহণের অক্ষমতা জাতীয় কম্যুনিস্ট নেতৃত্বের সম্মুখে কঠিন সমস্যা সৃষ্টি করে। তদানীন্তন চীনা কম্যুনিস্ট পার্টির সভাপতি চেন তু-সিউ এ-বিষয়ে তাঁর উভয়সংকট এভাবে প্রকাশ করেছেন :

The International asks us to implement our own policies. On the other hand, it will not allow us to withdraw from the Kuomintang. There is thus no way out. [২৪]

ট্রট্স্কি এই সময়ে স্তালিন ও বুখারিনের চীন-নীতির তীব্র সমালোচনা করেন[২৫] :

Had the Comintern pursued a more or less correct policy, the outcome of the struggle of the Communist Party for the masses would be determined in advance: the Chinese proletariat would have supported the Communists, while the peasants' war would have supported the revolutionary proletariat...But precisely in the sphere of leadership something absolutely monstrous occurred, a veritable historical catastrophe: the authority of the Soviet Union, of the Bolshevik Party and of the Comintern went entirely to the support of Chiang Kai-Shek against an independent policy of the Communist Party and then to the support of Wang Chin Wei as the leader of the agrarian revolution.

ট্রট্স্কি তদানীন্তন চীনা রাজনীতির যে বিশ্লেষণ করেছেন তার সঙ্গে আমি একমত নই। সে কথা এখানে বড় নয়। এখানে লক্ষণীয় হল, মস্কো-নিয়ন্ত্রিত চীন-নীতি কী কারণে ভুল হল। উৎসাহী পাঠক যদি ঐ সময়ে হুনানের কৃষক আন্দোলন সম্বন্ধে মাও-র রিপোর্ট পড়েন তাহলে দেখবেন তাঁর বক্তব্য ট্রট্স্কির সিদ্ধান্তের অনুরূপ[২৬]:

'The force of the peasantry is like that of the raging winds and driving rain...rapidly increasing in violence. No force can stand in its way...The peasantry will tear apart all nets which bind it and hasten along the road to liberation...Shall we stand in the vanguard and lead them or stand behind them and oppose them?'

সর্বহারা শ্রেণী বিপ্লবের জন্য প্রস্তুত হলেই বিপ্লবের আহ্বান জানানোর মুহূর্ত উপস্থিত হয় না। তার জন্য অন্যান্য শর্ত পূরণ হওয়াও দরকার। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হবার পূর্বে চীনে বিপ্লব সাফল্যমণ্ডিত করার বিষয়গত অবস্থা দেখা দিয়েছিল কি না সে সম্পর্কে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে।

কিন্তু একথা সন্দেহ করবার অবকাশ নেই যে, রাশিয়া তার নিজ স্বার্থে কুওমিন্টাংদের সঙ্গে মিতালী রাখার জন্য শেষপর্যন্ত চীনা কম্যুনিস্ট পার্টির 'পর চাপ দিয়েছে। মানবেন্দ্রনাথ রায় কমিনটার্নের এই নীতি সম্বন্ধে তখন অসন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন। চীনা কম্যুনিস্ট পার্টির পঞ্চম জাতীয় অধিবেশনে তিনি কমিনটার্নের প্রতিনিধিরূপে যোগ দিয়েছিলেন। বোরোডিনের সরকারী নীতিকে রায় যথেষ্ট বৈপ্লবিক মনে করতেন না। চীনা পার্টিকে কমিনটার্নের পথে আনবার জন্য রায়ের স্থলাভিষিক্ত হলেন লোমিনাড্জে। চুউ চিইউ-পাই (Ch'ü ch'iu-pai) সিয়াং চুং-ফা (Hsiang chung-fa) এবং লি লি-সানের (Li Li-San) নেতৃত্বের কালে (আগস্ট ১৯২৭—নভেম্বর ১৯৩১) চীনা কম্যুনিস্ট পার্টি কুওমিন্টাংদের

[২৪] বেঞ্জামিন শোয়ার্ট্জ্, চাইনিজ কম্যুনিজম অ্যান্ড দি রাইজ অব মাও, পৃঃ ৬৭, হার্ভার্ড, ১৯৫১।

[২৫] লিঅন ট্রট্স্কি, প্রব্লেম্স অব চাইনিজ রেভল্যুশন, ন্যু ইঅর্ক, ১৯৩২, পৃঃ ১৩৪-১৩৫।

[২৬] মাও-ৎসে-তুং, সিলেক্টেড ওঅর্ক্স, পৃঃ ১৯।

সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করে স্বতন্ত্রভাবে বিপ্লবের পথে এগুবার নীতি গ্রহণ করে বহু দুরূহ সমস্যার সম্মুখীন হয় এবং সে নীতি পরিত্যাগ করতে বাধ্য হয়। এর জন্য প্রধান দায়ী স্তালিন নিজে। এ সময়ে মাও এবং চু-তে যে কৃষকবিদ্রোহ পরিচালনা করে বিপ্লবের ভিত্তি রচনা করছিলেন তার গুরুত্ব স্তালিন সম্যক উপলব্ধি করতে পারেন নি; এবং এ'দের দু'জনকে তখন চীনা পার্টির সর্বোচ্চ নেতৃত্বের স্তরে আনা হয়নি।

চীনা কম্যুনিস্ট পার্টির[২৭] ও রুশ-চীন কূটনীতির[২৮] ইতিহাস পাঠ করলে এ বিষয় দুটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, (১) রাশিয়া সকল সময়ে এমন পার্টি-নেতৃত্ব চেয়েছে যা স্তালিন-পন্থী—তা সে স্তালিনের পন্থা যা'ই হোক; (২) চীনের আভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে চীনা কম্যুনিস্ট পার্টি এমন কোনো নীতি যেন না গ্রহণ করে যাতে রাশিয়ার জাতীয় স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হয়। (১) এবং (২)-এর সমর্থনে রাশিয়ার যুক্তি ছিল (৩) আন্তর্জাতিক সমাজতন্ত্রের স্বার্থ। জাতীয় স্তরে রাশিয়া বিভিন্ন সময়ে কম্যুনিস্ট পার্টিকে স্থানীয় বিষয়ে এমন সকল বিষয়ে আপোস করতে বাধ্য করেছে যা সংশিলষ্ট পার্টির স্বার্থ-বিরোধী। কমিনটার্নের বিরুদ্ধে ১৯৩৬ সালে জার্মানী এবং জাপান চুক্তিবদ্ধ হয়ে ঘোষণা করল, বিভিন্ন জাতির আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করে যে কমিনটার্ন জাতীয় নিরাপত্তা এবং বিশ্ব-শান্তি নষ্ট করেছে তাকে প্রতিহত করতে হবে; জাপান পূর্ণ উদ্যমে চীন আক্রমণ করল ১৯৩৭-এর জুলাইতে; ঐ বছরেরই ২১শে আগস্ট চীন-রাশিয়ার মধ্যে যে অনাক্রমণ চুক্তি সম্পাদিত হয় তার ফলে জাপান এবং রাশিয়ার যে সুবিধা হল চীনের তা অর্ধেকও হয় নি; রাশিয়া চীনকে জাপানের বিরুদ্ধে সামরিক সাহায্য দিয়ে যেতে লাগল যাতে চীন-যুদ্ধে ব্যাপৃত জাপান রাশিয়ার পূর্ব-সীমান্তে বিপদ সৃষ্টি না করে, অন্যদিকে জাপানকে তুষ্ট রাখার জন্য মলোটভ জাপান সম্পর্কে বন্ধুত্বপূর্ণ কথা বলতে লাগল (অক্টোবর, ১৯৩৯) এবং স্তালিন রুশ-জাপান সম্পর্ক উন্নত করার জন্য নতুন রাষ্ট্রদূত স্মেটানিনকে টোকিওতে পাঠান।

জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে মার্ক্সবাদী তত্ত্বের সঙ্গে বাস্তব রাজনীতির বিরোধ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রাক্কালে পোল্যান্ড এবং ফিনল্যান্ডের সঙ্গে রুশ কূটনীতির গতি-প্রকৃতি বিশ্লেষণে আরো স্পষ্ট হবে। নাৎসী-রুশ চুক্তির পশ্চাতে রুশ জাতীয় স্বার্থ রক্ষার প্রচেষ্টা পরিস্ফুট। অবশ্য এজন্য আমি রাশিয়াকে এককভাবে দোষী ঘোষণা করতে প্রস্তুত নই। বরং চতুর্থ দশকের (১৯৩৩-৩৯) আন্তর্জাতিক রাজনীতির ইতিহাস অনুসরণ করলে পাঠক এ সত্য মানতে বাধ্য হবেন যে, নাৎসী-ফ্যাসিস্ট শক্তির অভ্যুত্থানের এবং সম্প্রসারণের পরিণাম চিন্তা করে রাশিয়া তার নীতি যতটা পরিবর্তন করেছিল, ইংল্যান্ড, ফ্রান্স ও অন্যান্য গণতান্ত্রিক দেশ তা করেনি। যদি তা করত ১৯৩৯-এর পরবর্তী কালের ইতিহাস হয়তো অনেকটা ভিন্ন হত।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর পূর্ব য়ুরোপে ও চীনে কম্যুনিস্ট শাসন যখন সম্প্রসারিত হয় তখন নীতি হিসেবে অন্তত একথা স্বীকৃত হয়েছিল যে, সর্বহারা আন্দোলন রাষ্ট্রশক্তি দখলে সমর্থ হলেও অন্তর্বর্তী কালের জন্য প্রগতিশীল জাতীয় বুর্জোয়াদের সঙ্গে তাদের সহযোগিতা রক্ষা করা প্রয়োজন। এই 'অন্তর্বর্তীকাল' ও 'প্রগতিশীল জাতীয় বুর্জোয়া' কারা?—এবং কারাই বা প্রতিক্রিয়াশীল জাতীয় বুর্জোয়া?—এইসব প্রশ্ন ১৯৫৩ সালের

[২৭] ব্রাণ্ড্, কোয়ার্ট্জ ও ফেয়ারব্যাঙ্ক, এ ডকুমেন্টারি হিস্টরি অব দি চাইনিজ কম্যুনিজম, লন্ডন ১৯৫১।

[২৮] হেনরী ওয়েই, চায়না অ্যান্ড সোভিয়েট রাশিয়া, প্রিন্সটন, ১৯৫৬।

পূর্ব পর্যন্ত জাতীয় স্তরে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ছিল অসম্ভব। কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্তের ফলে এসব ক্ষেত্রে যেসব ভুলভ্রান্তি হয়েছিল একাধিক সময়ে তা অত্যন্ত গুরুতর রূপ ধারণ করেছিল।

যুদ্ধোত্তর যুগে উল্লিখিত প্রশ্নের পরিষ্কার আলোচনা পাওয়া যায় লি শাও-চি'র "ইন্টারন্যাশনালিজ্‌ম্‌ অ্যান্ড ন্যাশনালিজ্‌ম্‌" নামক পুস্তিকায়।[২১] বুর্জোয়াদের জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে ধারণার সমালোচনা করে লি শাও-চিন বলেন:

Only when it is to its own advantage does the bourgeoisie use the slogan of nationalism to arouse the people. But when it is against its interests, the bourgeoisie completely discard the integrity of their nation and turns traitor to their people.

জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে এ সমালোচনা মূলত স্বীকার করি। কিন্তু সঙ্গে এও বলি : আন্তর্জাতিকতার আদর্শের ধারক-বাহক যে রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রগোষ্ঠী হবে তারা যে পর্যন্ত জাতীয়তার তুলনায় উচ্চতর কোনো রাজনৈতিক ভিত্তি জন-চৈতন্যে সঞ্চারিত করতে না পারবে সে পর্যন্ত আন্তর্জাতিকতাবাদীদের অনুসৃত নীতিতেও সংকীর্ণ স্বার্থপরতা দেখা দেবে। এটা মুখ্যত ন্যায়-অন্যায়ের প্রশ্ন নয়, বাস্তব ও ঐতিহাসিক ঘটনার কথা। ঐতিহাসিক ঘটনা অবজ্ঞা করে আন্তর্জাতিক রাজনীতির ক্ষেত্রে ন্যায়নীতিকে প্রাধান্য দেয়ার প্রস্তাব শ্রুতিমধুর হতে পারে, কিন্তু তা বাস্তব তাৎপর্যশূন্য। অতএব, আমার বক্তব্য হল, আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে ন্যায়নীতির বিষয় আমরা আদর্শের মানদণ্ডে নিশ্চয়ই বিচার করব এবং, যথাসম্ভব, সেইরকম আচারও করব; কিন্তু কোনো বিশেষ অবস্থায় আমরা কিভাবে আচরণ করা সম্ভব ও কর্তব্য তা জাতীয় স্তরেই নির্ণীত হওয়া প্রয়োজন।

১৯৫৩ থেকে ১৯৬০ সালে কম্যুনিস্ট সমাজগোষ্ঠীতে অসম অর্থনৈতিক উন্নতির ফলে অনেক ঘটনা ঘটেছে যা আন্তর্জাতিকতার প্রতি আস্থাশীল জাতিদের পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে ঘটা উচিত ছিল না,—মার্ক্সবাদ অনুসারে তো নিশ্চয়ই নয়। পূর্ব বার্লিন, প্যোলান্ড এবং হাঙ্গেরীর বিদ্রোহকে নিছক প্রতিক্রিয়ার কারসাজি বলে উড়িয়ে দিলে ঐতিহাসিক ঘটনাকে অবজ্ঞা করা ও অতি সরল ব্যাখ্যা দেয়া হবে। মার্ক্সবাদী ডায়ালেকটিকের একটি মূল তাৎপর্য হল 'অতীতের ঘটনা থেকে শেখো।' এ সব বিদ্রোহের পশ্চাতে যে অবরুদ্ধ জাতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষা ছিল তা পরবর্তীকালের নানা সংস্কারের (reforms) মধ্য দিয়ে স্বীকৃত হয়েছে। এটা গোপন রাখবার বিষয় নয়। ভুল করার মধ্যে ততটা অন্যায় নেই, যতটা অন্যায় রয়েছে ভুলকে গোপন করে ভবিষ্যতে আরো ভুলের দোর উন্মুক্ত রাখায়। লেনিন একাধিক বিষয়ে তাঁর ভুল স্বীকার করেছেন। স্তালিন এ বিষয়ে ছিলেন অনুদার: তাঁর চৈনিক নীতি ১৯২৭ সালে সম্পূর্ণ ভ্রান্ত প্রমাণিত হল: তবু তা তিনি কখনো স্বীকার করেন নি। 'অভ্রান্ত নেতৃত্ব' মানুষ ধর্মীয় গুরুর কাছ থেকে আশা করে, কোনো রাজনৈতিক নেতা বা বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের প্রবক্তার কাছ থেকে নিশ্চয়ই নয়।

১৯৫৬ সাল পর্যন্ত ভারতের জাতীয় বুর্জোয়ারা চীনা পার্টির বিচারে ছিল প্রগতিবাদী। আজ ভারতের শাসক শ্রেণীই শুধু নয় ভারতীয় কম্যুনিস্ট পার্টিও, চীনা পার্টির বিচারে, প্রগতিবাদী নয়। শুধু যুগোস্লাভিয়ার বিরুদ্ধে নয় আজ রাশিয়ার বিরুদ্ধেও চীন

[২১] লি শাও-চি, ন্যাশনালিজম অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনালিজম, ফরেন ল্যাঙ্গোয়েজস প্রেস, পিকিং, তারিখহীন।

এই অভিযোগ তুলেছে, এসব দেশের পার্টি মার্ক্সবাদী আন্তর্জাতিকতার আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়ে জাতীয় স্বার্থের সংকীর্ণ পথে চলছে। চীনা বক্তব্যের সঙ্গে আমার মিল নাই। আমার দৃঢ় অভিমত, চীনও সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদের পথে এগুচ্ছে; ভারতবর্ষের সীমান্ত আক্রমণ করে চীন ভারতের আভ্যন্তরীণ প্রগতির আন্দোলনের সমূহ ক্ষতি করেছে; পশ্চিমের সঙ্গে সামরিক আঁতাতে আবদ্ধ পাকিস্তান আজ চীনের মিত্র; ভারতবর্ষের তুলনায় এশিয়ার অন্যান্য যেসব দেশে গণতন্ত্রের কণ্ঠ রুদ্ধ চীন সেইসব দেশের সঙ্গে মিত্রতাবদ্ধ হবার জন্য ব্যগ্র। চীনের মুখে আন্তর্জাতিক আদর্শের কথা আজ অতি অশোভন শোনায়।

জাতীয়তা, আন্তর্জাতিকতা এবং সমাজতন্ত্রের পারস্পরিক সম্বন্ধ সম্পর্কে সাম্প্রতিকতম রুশ বক্তব্য[৩০] চীনা বক্তব্যের তুলনায় বেশ খানিকটা সহিষ্ণু। সীমান্ত বিষয়ে চীনা নীতির আমি সম্পূর্ণ বিরোধী হলেও চীন কম্যুনিস্ট পার্টির একটি নীতি আমি সমর্থন করি : প্রত্যেক জাতীয় পার্টির যথেষ্ট স্বাধীনতা থাকা উচিত। চীনা পার্টি নিজের অভিজ্ঞতা থেকে এ শিক্ষা গ্রহণ করেছে। কিন্তু, আমার আশংকা, কার্যক্ষেত্রে চীন এ নীতি নিজেই ভঙ্গ করতে উদ্যত।

জাতীয়তাবাদ বনাম আন্তর্জাতিকতাবাদ সম্পর্কে মার্ক্সবাদী যে তত্ত্বের এবং ঐতিহাসিক ঘটনাসমূহের বিশ্লেষণ করলুম তা থেকে একটি সত্য সর্বাধিক স্পষ্ট হয়ে উঠছে : জাতীয়তাবাদ একটি নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক স্তর অতিক্রম না করা পর্যন্ত যথার্থ আন্তর্জাতিক চরিত্র অর্জন করতে পারে না; এবং, তার ফলে, আন্তর্জাতিকতার সঙ্গে বিরোধ দেখা দিলে সে জাতীয় স্বার্থকেই প্রাধান্য দেয়। ইতিহাসের এ শিক্ষা আমাদের গ্রহণ করা উচিত।

১৮৮২ সালে পোল্যান্ডের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে এঙ্গেলস্ বলেছিলেন[৩১] :

An international movement of the proletariat is possible only among independent nations...I hold the view that there are *two* nations in Europe which do not only have the right but the duty to be nationalistic before they become internationalists : the Irish and the Poles. They are internationalistic of the best kind if they are very nationalistic.

দ্বিতীয় যুদ্ধোত্তর কালে আফ্রিকায় ও এশিয়ায় যেসব দেশ স্বাধীনতা লাভ করেছে অনেক ক্ষেত্রেই সেসব দেশে জাতীয়তার ঐক্য দানা বাঁধতে পারে নি। ধর্ম, বর্ণ, উপজাতীয়তা, ভাষা, আঞ্চলিকতা প্রভৃতি নানা বাধার মধ্য দিয়ে সেসব জাতি এখন জাতীয় ঐক্যই অর্জন করতে পারে নি। উপজাতীয় কলহ অতিক্রম করে আফ্রিকার বহু স্বাধীন দেশই এখন জাতীয় ঐক্য সাধন করতে পারছে না। ইন্দোনেশিয়া ধর্ম ও আঞ্চলিকতার সংকীর্ণ প্রভাবে এখনো দুর্বল। বর্মার উপজাতীয় বিদ্রোহের আজো অবসান হয়নি। মধ্যপ্রাচ্যে ধর্ম, সামন্ততন্ত্র ও উপজাতীয়তা এখনো আদর্শ জাতীয় ঐক্যের অন্তরায়।

প্রায় অর্ধ-শত কোটি মানুষের বিশাল দেশ ভারতবর্ষে জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাস

[৩০] ওয়ার্লড্ মার্ক্সিস্ট রিভিউ, মার্চ, ১৯৬৩, পৃঃ ৬৯-৭১।
[৩১] মার্ক্স-এঙ্গেলস্, দি রাশিয়ান মীনাস টু য়ুরোপ, ইলিনই, ১৯৫২, পৃঃ ১১৭-৮।

বেশ পুরাতন, তবু এ কথা অনস্বীকার্য যে, স্বাধীনতা পাওয়ার ষোলো বছর পরেও আঞ্চলিকতা, বর্ণভেদ, ভাষা, উপজাতীয়তা ভারতবর্ষের জাতীয় ঐক্যকে দৃঢ় হতে দেয়নি। দ্রাবিড় কাড়াগাম দ্রাবিড় জাতির জন্য স্বতন্ত্র রাষ্ট্র চাইছে; নাগারা স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠন করবার জন্য অস্ত্রধারণ করেছে; মুসলমান-হিন্দু ঐক্য এখনো আদর্শমাত্র; হিন্দীভাষাভাষীদের সঙ্গে অহিন্দীভাষাভাষীদের সম্পর্ক আদর্শ নয়; বিভিন্ন রাজ্য ভাষাকে কেন্দ্র করে যে প্রকার আচরণ করেছে তা নিতান্ত দুর্ভাগ্যজনক; বিভিন্ন রাজ্যের অধিবাসীদের মধ্যে সাম্প্রতিক কালেও যে প্রকার দাঙ্গা-হাঙ্গামা হচ্ছে তা দুশ্চিন্তার ব্যাপার;—এসব ঘটনা যদি রোধ বা দূর করতে হয় তাহলে সুস্থ জাতীয় ঐক্যের 'পর জোর দিতে হবে। ভারতবর্ষের জাতীয়তা ইংরাজ-শাসনের ফল। জাতীয়তার এ আন্দোলনের লক্ষ্য হয়তো ছিল ধর্মের সীমা অতিক্রম করা, কিন্তু আজ এ সত্য আমাদের স্বীকার করা উচিত আমরা মুসলমানদের এ কথা বোঝাতে ব্যর্থ হয়েছি। পাকিস্তান আন্দোলনের অবাঞ্ছনীয় সার্থকতার জন্য শুধু জিন্নার সাম্প্রদায়িক ও সুবিধাবাদী রাজনীতিকে দোষ দিলেই এ রকম একটা বিরাট ঘটনার সব্যাখ্যা হয় না। অবিভক্ত ভারতের অ-মুসলমান রাজনীতি এমন জাতীয়তাবাদী আন্দোলন সৃষ্টি করতে পারে নি যার ফলে মুসলমান জনসাধারণ সাম্প্রদায়িকতার ঊর্ধ্বে জাতীয়তাবাদী রাজনীতিতে প্রত্যক্ষভাবে উৎসাহিত হতে পারে। এ বিষয়ে কংগ্রেসের ব্যর্থতা—বিশেষত ১৯৩৭-এ বিস্ময়ের উদ্রেক করে।

ভারতবর্ষের জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করার একমাত্র আদর্শ নীতি এখন জাতীয়তাবাদ। কারণ, (১) অন্যান্য যেসব রাজনৈতিক শক্তি এখন ভারতবর্ষে সক্রিয় তা প্রতিক্রিয়াশীল ও বিপজ্জনক; (২) যে দেশ জাতীয় ঐক্যই সাধন করতে পারে নি তাকে আন্তর্জাতিকতার আদর্শে ঐক্যবদ্ধ করা অসম্ভব। বরং জাতীয় ঐক্য একটা নির্দিষ্ট স্তরে উন্নীত না হলে আন্তর্জাতিকতার 'পর বেশী জোর দিলে প্রগতির শক্তি জাতীয়তাবাদী শক্তিদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে এবং তাতে প্রতিক্রিয়ার সুবিধা হয়। ইরাক তার শেষ দৃষ্টান্ত।

প্রগতির আন্দোলন যখন জাতীয়তার স্তরে থাকে তখন সে আন্দোলন যাতে সংকীর্ণতা মুক্ত থাকে তা দেখা দরকার। একথা ভাববার কারণ নেই যে, জাতীয়তাবাদের মধ্যে সংকীর্ণতা ও পররাজ্যবিদ্বেষ থাকবেই। একাধিক নৃতাত্ত্বিক (ethnic) গোষ্ঠীর ও ভাষাভাষীদের দেশ সুইৎজারল্যান্ড সুদীর্ঘকাল শান্তি, স্বাধীনতা ও ঐক্য বজায় রেখেছে।[৩২] জাতীয়তাবাদ সাম্রাজ্যবাদে বিকৃত হবেই এমন তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করাও শক্ত : নাৎসী ফ্যাসিস্ট উদাহরণকে সার্বজনীন করবার ঐতিহাসিক ভিত্তি নেই। বহু জাতীয়তাবাদই সাম্রাজ্যবাদের সমাপ্তি ঘোষণা করেছে,—সূচনা নয়। বিশেষত বর্তমানে পৃথিবীর আন্তর্জাতিক রাজনীতি এমন একটা স্তরে উন্নীত হয়েছে যে, এখন প্রধান সমস্যা এই নয় 'জাতীয়তাবাদ সাম্রাজ্য-বাদিতায় বিকৃত হবে কি হবে না?'—এখন সমস্যা দুটি (ক) 'কিভাবে আদর্শ বা অর্থের আড়ালে দুর্বল জাতিগুলির 'পর শক্তিশালী জাতিগুলির অন্যায় আধিপত্য রোধ করা যায়?' এবং (খ) 'কিভাবে দুর্বল জাতিগুলির জাতীয় বিকাশের পথে আভ্যন্তরীণ সংকীর্ণ অন্তরায় দূর করা যায়?'

উল্লিখিত সমস্যা দুটির সমাধান সন্ধান করবার পূর্বে দুটি বিষয় মনে রাখতে হবে : (১) আণবিক মারণাস্ত্র আবিষ্কারের রাজনৈতিক তাৎপর্য; এবং (২) পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী যে দুটি জাতিগোষ্ঠীতে আন্তর্জাতিক সমাজ বিভক্ত তাদের অভ্যন্তরেও বিবাদ বর্তমান।

---

[৩২] হ্যান্স্ কোন, ন্যাশনালিজ্ এ্যান্ড লিবার্টি, দি সুইস এগ্জাম্প্ল্, লন্ডন, ১৯৫৬।

নিরপেক্ষতার যতই বিরূপ সমালোচনা হোক নিরপেক্ষ জাতি পৃথিবীতে এখন অনেক আছে এবং তাদের বৈধ জাতীয় স্বার্থ রক্ষার জন্য, নিরপেক্ষ থাকাই তাদের কর্তব্য। স্তালিন-নিয়ন্ত্রিত কমিনটার্নের নীতির তিক্ত অভিজ্ঞতা অনেক দেশের কম্যুনিস্ট পার্টিই ভুলতে পারে নি। স্তালিনোত্তর যুগে এ তিক্ততা কমলেও সম্পূর্ণ তিরোহিত হয়নি। পোজনান বিক্ষোভের পরে পোল্যান্ডের কম্যুনিস্ট পার্টি প্রথম যখন গোমুল্‌কাকে নেতৃত্বে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিল তখন (১৮-১৯ অক্টোবর, ১৯৫৬) মলোটভ, মিকোয়ান ও কাগানোভিচ সমভিব্যাহারে খ্রুশ্চেভ অকস্মাৎ ওয়ারশ'তে পৌঁছে পোল্যান্ড পার্টির কেন্দ্রীয় সমিতির অধিবেশনে হস্তক্ষেপ করেছিলেন: আশঙ্কিত সোভিয়েট-বিরোধী অভ্যুত্থানকে রোধ করবার জন্য রকোসভস্কি রুশ-সৈন্যদের ওয়ারশ'-এ সমবেত হবার নির্দেশ দিলেন : রুশ নেতৃবৃন্দ দাবি করলেন রুশ-পন্থী নাটোলিন-গোষ্ঠীকে নেতৃত্ব থেকে বাদ দেয়া চলবে না এবং গোমুলকাকে প্রধান নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত করা চলবে না।[৩৩] ওচাব ও গোমুলকার দৃঢ়তায় ও যুক্তিতে রুশ নেতৃবৃন্দ শেষ পর্যন্ত মানলেন যে, নেতৃত্বের এই পরিবর্তন পোল্যান্ডের জাতীয় স্বার্থে প্রয়োজন; এর সঙ্গে কম্যুনিস্ট-বা রুশ-বিরোধিতার কোনো সম্পর্ক নেই। স্তালিন-আমলে হয়তো এ-ঘটনা শোচনীয় দুর্ঘটনায় পর্যবসিত হত। নিরপেক্ষ জাতিদের নিরপেক্ষতা আমেরিকাও দীর্ঘকাল সু-নজরে দেখেনি। আইজেনহাওয়ার-আমলে তো ওয়াশিংটন পররাষ্ট্র দপ্তরে 'নিরপেক্ষতা' ও 'নীতিভ্রষ্টতা' ছিল সমার্থবাচক শব্দ। সিয়েটো, সেন্টো প্রভৃতি সামরিক চুক্তি-বহির্ভূত জাতিগুলি, ডালেসের মতে, ছিল নীতিভ্রষ্ট। মিশর ইন্দোনেশিয়া ও ভারতবর্ষের নিরপেক্ষতা নীতি ডালেস-নিক্সনের [নিক্সনের ম্যানিলা-বক্তৃতা স্মর্তব্য] চোখে ছিল অত্যন্ত ঘৃণ্য। কেনেডি-যুগে নিরপেক্ষতা-নীতিভ্রষ্টতার সহজ সমীকরণ যদিচ পরিত্যক্ত, তবে এই প্রবণতা এখনো মার্কিন রাজ্যে বেশ প্রবল।

এককালে জাতীয়তাবাদের শত্রু ছিল সাম্রাজ্যবাদ,—এখন জাতীয়তাবাদের অন্তরায় হল অর্থ ও আণবিক-শক্তিপুষ্ট বিরোধী আদর্শের বাহক বৃহৎ কটি জাতি। এখন এ-সব জাতিদের এ-সত্য মানতে হবে যে, নতুন স্বাধীনতা-প্রাপ্ত জাতিগুলোর মধ্য থেকেই তারা তাদের নেতা নির্বাচন করবে,—বৈদেশিক আদর্শ ও নেতৃত্ব চাপিয়ে দেবার জিনিস নয়। আদর্শের মধ্যে ভালো-মন্দর নিশ্চয়ই পার্থক্য আছে। এবং, এ-কথা অনস্বীকার্য যে, রাশিয়ার শক্তি ও সমর্থন আফ্রো-এশিয়ার বহু জাতিকেই দ্বিতীয়যুদ্ধোত্তর কালে স্বাধীন হবার প্রেরণা যুগিয়েছে। দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য অনুন্নত জাতিদের সম্মুখে সমাজতন্ত্রের আকর্ষণ এখন সুগভীর। তবে, তারা রাশিয়া ও চীনের রাজনৈতিক কাঠামো গ্রহণে অনিচ্ছুক। রাজনৈতিক শক্তি কেন্দ্রে সংহত না করলে দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়ন—বিশেষত অনুন্নত দেশে—কঠিন। মুখ্যত এই কঠিন সমস্যার সঙ্গেই অনুন্নত জাতিরা আজ সংগ্রাম করছে। বৃহৎ জাতিরা এ সংগ্রামে সহযোগিতা করে অনুন্নত জাতিদের জাতীয় স্তরে প্রথমে যদি সংহত হতে দেয় তাহলে তারা আন্তর্জাতিক সমাজ-গঠনে প্রকৃত সাহায্য করতে পারে। সহাবস্থান ঐতিহাসিক ঘটনা; একে শুধু কৌশল হিসেবে নয়,—নীতি হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। তারপরেও আদর্শগত লড়াই চলতে পারে। রাজনৈতিক বা আণবিক শক্তি প্রয়োগ করে আদর্শগত প্রশ্নের মীমাংসার চেষ্টা করলে সুফলের তুলনায় কুফল হবে ঢের বেশী। আদর্শ-বিস্তারে সাফল্য অর্জনের তুলনায় বিশ্বশান্তি রক্ষার দুরূহ দায়িত্ব পালন করা

[৩৩] এম. কে. দ্জিভানোভস্কি, দি কম্যুনিস্ট পার্টি অব পোল্যান্ড, হার্ভার্ড, ১৯৫৯, পঞ্চদশ অধ্যায়।

অনেক মহৎ কর্তব্য—বিশেষত আদর্শবাদী জাতির পক্ষে।

জাতীয়তাবাদের সঙ্গে শ্রেণী-বৈষম্যের যে-সম্পর্ক আছে তা সম্পূর্ণ অবহেলা করবার নয়। এ-বিষয়ে মার্ক্সীয় সতর্ক-বাণী শ্রদ্ধার স্মরণ করা দরকার। জাতির নাম করে শাসক-শ্রেণী যদি স্বীয় স্বার্থ বজায় রাখতেই তৎপর হয় তাহলে জাতীয়তাবাদকে সুদৃঢ় ভিত্তিতে স্থাপন করা শক্ত। গণতন্ত্রের কাঠামোয় দরিদ্র কৃষক-মজুর যদি রাষ্ট্রক্ষমতা পরিচালনের কোনো অধিকার না-পায় তাহলে জাতীয়তার আন্দোলন জাতির ভৌগোলিক সীমারেখার মধ্যে সুদীর্ঘকাল বন্দী রাখা শক্ত। জাতীয় গণতন্ত্রকে প্রকৃত গণতন্ত্র করার জন্য উচ্চ- ও মধ্যবিত্ত শ্রেণী চেষ্টা করুক আর না-ই করুক কৃষক-মজুরদের কর্তব্য নিজ সংহতি রক্ষা করে শাসকশক্তির 'পর সর্বদা একটি চাপ বজায় রাখা। সমাজতান্ত্রিক শক্তি যদি গণতন্ত্রের কাঠামোয় পূর্ণ বিকাশ না-পায় তাহলে জাতীয়তাবাদ সংকীর্ণ হয়ে পড়ার আশংকা রয়েছে, এবং তার ঐক্য শূন্যগর্ভ হয়ে আসবে।

গত এক শ'বছরে পশ্চিম য়ুরোপে জাতীয়তাবাদের বহু সমালোচনা হয়েছে। মার্ক্স, অ্যাক্টন[৩৪] থেকে শুরু করে লাস্কি, ম্যাক্‌আইভার প্রমুখ বহু রাজনৈতিক চিন্তাশীল ব্যক্তিরাই জাতীয়তার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে সমালোচনা করেছেন। আমি তাঁদের সমালোচনা সম্পূর্ণ ভুল বলতে চাই না। আমার বক্তব্য, তাঁরা অনেকেই প্রধানত তিন কারণে জাতীয়তাবাদের তাৎপর্য সম্যক্ বুঝতে পারেন নি: (১) ইংল্যান্ড ও ফ্রান্স তাদের ইতিহাসে জাতীয়তার স্তর অতিক্রম করে এসেছে বহুকাল। ফলে তাদের কাছে রাজনৈতিক ঐক্যের সূত্র হিসেবে জাতীয়তাবাদের মূল্য বিস্মৃতি-প্রায়। শিক্ষা, সমৃদ্ধি ও স্থায়ী গণতন্ত্র তাদের ঐক্য ও শক্তি দিয়েছে। অন্ততঃ আমরা যে-অর্থে জাতীয়তা চাই তা তাদের নিষ্প্রয়োজন। (২) জাতীয়তার ফ্যাসিস্ট এবং নাৎসী বিকৃতিকে জাতীয়তার অনিবার্য পরিণাম বলে ধরে নেওয়া হয়েছে। (৩) আন্তর্জাতিকতার আদর্শে অনুপ্রাণিত অনেকে এ-সত্য ভুলে গিয়েছেন যে, পৃথিবীর অনেক দেশেই জাতীয়তাবাদের ন্যূনতম ঐক্যই স্থাপিত হয়নি এবং আন্তর্জাতিক সমাজ-গঠনের বিষয়গত ভিত্তি এখনো সম্পূর্ণ রচিত হয়নি।

বিভিন্ন মানব-সমাজ তাদের রাজনৈতিক অভিজ্ঞতার পথ ধরে কালক্রমে যেমন উপ-জাতীয়তার স্তর অতিক্রম করে এসেছে তেমনি উত্থান-পতনের বাঁকা পথে একদিন হয়তো জাতীয়তার স্তরও অতিক্রম করবে। তবে এ-কথা কোনো অনিবার্যতার ঘোষণা নয়,—ঐতিহাসিক প্রবণতামাত্র। সকল সমাজ একসঙ্গে এগোয় না; ফলে নানা সমাজ তাদের বিভিন্ন প্রয়োজন-অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন সমাধান খুঁজে নেয়। যারা অগ্রবর্তী সমাজের পরিচালক তারা তাদের অভিজ্ঞতা দিয়ে পশ্চাদ্বর্তীদের অগ্রগমনের গতি নিশ্চয়ই ত্বরান্বিত করতে পারে, কিন্তু সেটা হওয়া উচিত স্বাধীন দেয়া-নেয়ার ব্যাপার,—চাপানোর ব্যাপার নয়। শিক্ষার অন্যতম সুফল হল, সাধারণ মানুষও আজ তুলনামূলক বিচার করতে পারে। জাতীয়তাবাদকে পশ্চাতে রেখে আমরা যদি আরো এগিয়ে যেতে চাই তাহলে আমাদের প্রথম কর্তব্য জাতীয় ঐক্য সম্পূর্ণ করা এবং জনগণকে তত্ত্ব ও অভিজ্ঞতা দিয়ে বুঝতে সাহায্য করা কেন আমরা আন্তর্জাতিক সমাজ গড়তে চাই।

[৩৪] (লর্ড) জে. ই. ই. ডি. অ্যাক্টন, এসেজ অন ফ্রিডম অ্যান্ড পাওয়ার, ষষ্ঠ অধ্যায়; বস্টন, ১৯৪৮।

বনিতা

সুশীল রায়

পরাশরবাবু খুব তাজা ও জ্যান্ত মানুষ। তাঁর যেমন নাম, তেমনি বদনাম। কিন্তু এই নাম নিয়েও তিনি যেমন উল্লসিত নন, বদনাম নিয়েও তেমনি এতটুকু বিব্রত নন। বেঁচে থাকতে হলে মানুষকে যুদ্ধ যেমন করতে হয়, শান্তও থাকতে হয় তেমনি। পুরোপুরি শান্ত হয়ে যে মানুষ বসে থাকে আসলে তার জীবন নাকি অর্থহীন; আবার, সব সময়ই যে রণং দেহি ভাবে ঘুরে বেড়ায় তার জীবনও নাকি তথৈব। একটা ছবিকে ফুটিয়ে তুলতে হলে যেমন আলোও দরকার, অন্ধকারও তেমনি দরকার। সুতরাং নামের সঙ্গে বদনাম একটু মিশে না থাকলে নামেরও তেমন মানে হয় না।

পরাশরবাবুর বয়স হয়েছে। ষাট বছর তো হবেই। তার চেয়ে কিছু বেশিও হয়ে থাকতে পারে। বয়সের হিসেব নিয়ে মাথা ঘামাতে তিনি রাজি নন। সেকেন্ডে-সেকেন্ডে যখন বয়স বেড়ে চলেছে তির্‌তির্‌ করে, হাতঘড়ির ঐ ক্ষুদে কাঁটাটার মতনই তার যখন দুর্দম অনর্গল গতি, তখন ঐ ব্যাপারটা নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ কোথায়? ওকে থামানো যাবে না। ঘড়ির দম বন্ধ করে দিয়ে ঘড়ির কাঁটা থামানো যাবে, নিজের দম বন্ধ করে তো বয়সের রাশ টেনে ধরা যাবে না।

খুব হাসতে পারেন পরাশরবাবু। যখন হাসেন তখন তাঁর চোখমুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। প্রাণবন্ত মানুষ তিনি, তাই তাঁর হাসিতে কেবল শব্দই সার নয়, তাঁর হাসিতে প্রাণেরই উৎসার দেখা যায়।

জীবনে তিনি সফল। কিন্তু এ সাফল্য আপনি আসেনি। অনেক মেহনত করতে হয়েছে তাঁকে। কুঁড়েমি জিনিসটা নাকি এমনই শম্বুকগতিতে হাঁটে যে পিছন থেকে দারিদ্র্য এসে তাকে ধরে ফেলে। পরাশরবাবু একসময় দরিদ্র ছিলেন, কিন্তু এমন অসম্ভব গতিতে তিনি নিজেকে দৌড় করিয়েছেন যে, দারিদ্র্যকে ডিঙিয়ে তিনি এগিয়ে গিয়েছেন অনেক দূরে।

পয়সা-কড়ি হয়েছে মন্দ না। কিন্তু সে বিষয়ে তিনি তেমন সচেতন না। এ কথা কেউ তুললে তিনি বলেন যে, ওটা নতুন কথা কিছু না; পয়সা রোজগার করতে জানলে পয়সা হবেই, এর মধ্যে নাকি বিশেষত্ব কিছু নেই। কিন্তু রোজগার করার কৌশলটা জানলেই কেবল হল না, সেই কৌশল কাজে লাগাতে হবে।

পরাশরবাবু আজ চল্লিশ বছর ধরে একটানা কাজ করে চলেছেন। যা-কিছু কৌশল তাঁর জানা, তার সবই কাজে লাগিয়ে চলেছেন তিনি। যে চাবি সব সময় ব্যবহার করা হয় তাতে মরচে ধরে না। এই জন্যেই নিশ্চয় পরাশরবাবুর চেহারাটা অমন চকচকে। এবং তাঁর মেজাজেও অমন চাকচিক্য। তাঁর বয়সের অনেক মানুষ আছেন সংসারে, তাঁর বয়সী বন্ধুও তাঁর আছেন অনেক; কিন্তু তাঁরা সকলেই কেমন-যেন অন্যরকম হয়ে গিয়েছেন। কেউ স্থবির, কেউ পঙ্গু, কেউ অলস, কেউ মিথ্যাচারী, কেউ স্ত্রৈণ, কেউ শঠ। অথচ, সকলের থেকে নিজেকে আড়াল না করে অদ্ভুত রকম আলাদা হয়ে গিয়েছেন পরাশরবাবু। তাঁর নাম আছে সেইজন্যে। স্বনামধন্য পুরুষ বলে একজাতের পুরুষ মানুষ আছেন; আসলে কিন্তু তাঁদের অনেকের মধ্যেই পৌরুষ বলে কিছু নেই। নিজের নাম নিয়ে তাঁদের

মধ্যের অনেকেই ধন্য হয়ে আছেন বলেই হয়তো তাঁদের ঐ পরিচয়। পরাশরবাবু কিন্তু নিজেকে ধন্য মনে করেন না। তাই স্বনামধন্য নন। পরিচিত-মহলে সকলেই তাঁর নাম করে। সকলেই ভালোবাসে পরাশরবাবুকে। সকলে তাঁকে ভালোবাসে, এ জন্যে অবশ্য নিজেকে তিনি ধন্য জ্ঞান করে থাকেন।

পরাশরবাবু যখন নিজের সঙ্গে লড়াই করে চলেছেন, তখন তিনি হঠাৎ প্রেমে পড়ে যান সরলা নামে একটি মেয়ের সঙ্গে। মেয়েটা নামেও যেমন, স্বভাবেও তেমনি। বেশ সরল আর সাদাসিদে। বিয়ের ইচ্ছে তখন পরাশরবাবুর ছিল না, কিন্তু প্রেম ব্যাপারটা চালিয়ে যাবার আগ্রহ ছিল খুব। কিন্তু মেয়েটি সরল হলে হবে কি, বোকা সে ছিল না। সেইজন্যে সে সাফ জেনে নিতে চেয়েছিল পরাশরবাবুর ইচ্ছেটা। পরাশরবাবু তাকে জানিয়েছিলেন যে, বিয়ে করার ঝক্কি নেবার মত সামর্থ্য তাঁর নয়, সুতরাং—ইত্যাদি।

তা যদি না থাকে তবে এই ছেলেখেলায় কাজ নেই। এখানেই ব্যাপারটা তবে ইতি করে দেওয়া যাক-না! এতে কষ্ট অবশ্যই হবে দুজনেরই। অথচ এ ছাড়া তো উপায় নেই। এই রকম বলেছিল সরলা।

আসল কথা এই যে, সরলা পরাশরবাবুর মতলবটা বোধ হয় বুঝতে পেরে গিয়েছিল। পরাশরবাবুর প্রকৃতিটা হয়তো সে ধরে ফেলেছিল।

ধরে ফেলার কারণ অবশ্যই ছিল। সরলার কানে একটা সংবাদ পেঁছে গিয়েছিল যে, ব্যান্ডেলের গির্জার চত্বরে গঙ্গার কিনারে পরাশরবাবুর সঙ্গে একটি মেয়েকে অন্তরঙ্গভাবে বসে থাকতে দেখা গিয়েছে।

প্রকাশ্য দিবালোকে এতটা ঝক্কি যে লোক নিতে পারে, একটা বিয়ের ঝক্কি নেবার সাহস তার নেই কেন, তা বুঝতে পেরে গিয়েছিল সরলা।

সরলা তাই একটু সাবধান হল, একটু সরে এল।

এতে ফল হল অন্যরকম। সরলার উপরে টান বেড়ে গেল পরাশর পুরকায়স্থর।

অল্প দিনের মধ্যেই দুজন দুজনের নাম সংক্ষেপ করে নিল। পরাশরকে সরলা বলত—পিপি; সরলা সোমকে পরাশর ডাকত সিসি।

দুজন দুজনের নামের আদ্যক্ষর নিয়ে নতুন নাম তৈরি করে নিল।

নামকরণ করার এই একটা নতুন টেকনিক পাওয়ায় সুবিধে হয়ে গেল অনেক। পরাশর-বাবু জীবন্ত মানুষ, একটা সিসিতে তাঁর প্রাণের প্রাচুর্যের স্থান হওয়া মুশকিল। দেবিকা দত্তকে ডিডি, বকুল ব্যানার্জিকে বিবি বলতে আরম্ভ করলেন তিনি।

কিন্তু খুব হুঁশিয়ার মানুষ পরাশর পুরকায়স্থ। জীবনের হাল তিনি শক্ত হাতে ধরে নিজেকে লক্ষ্যের দিকেই এগিয়ে নিয়ে যেতে লাগলেন। বেসামাল হয়ে পড়েন নি একদিনও।

নিজের কাজের কোনো বিঘ্ন তিনি ঘটতে দেন নি এ-সবের জন্যে। নিজের বিজনেসের কোনো ক্ষতি করে তিনি কখনো কাউকে নিয়ে মাতামাতি করেন নি। কাজের সময়ে তিনি কাজ নিয়ে মেতে থাকতেন, অবসর সময়ে মাততেন নিজেকে নিয়ে।

প্রায়ই তাঁকে বাইরে যেতে হত। কখনো দিল্লি, কখনো বোম্বাই, কখনো লখনউ, কখনো কানপুর। কারো অনুরোধ উপরোধ বা অনুনয়ে তিনি তাঁর বাইরে যাবার প্রোগ্রাম কখনো বদল করেন নি। এক-এক সময় তাঁর নিজেরই মনে হত তিনি নিষ্ঠুর হয়ে যাচ্ছেন। মেয়েদের মিনতি জিনিসটা নাকি মারাত্মক জিনিস। কিন্তু ঐ জিনিসও তাঁকে কাবু করতে

পারছে না কেন। নিজেকে নিয়ে একটু ভাবনাও তাঁর হত। কিন্তু সেই ভাবনা নিয়ে মশগুল হয়ে বসে থাকতেন না।

যেখানেই তিনি যেতেন সেখানেই গড়ে উঠত তাঁর এক বন্ধুমহল। তাঁর দিলদরিয়া মেজাজের ও বৈঠকী স্বভাবের জন্যে তিনি অল্প সময়ের মধ্যেই সকলের অন্তরঙ্গ হয়ে যেতেন। এতে মাঝে মাঝে একটু-আধটু অসুবিধেয় পড়তে যে হয়নি, এমন নয়। কোনো কোনো জায়গায় আটক পড়ে যাবার আতঙ্কও তাঁর হয়েছে।

বিশেষ করে এ অবস্থা হয়েছিল রেঙ্গুনে। এজন্যে রেঙ্গুনের উপর তাঁর একটা মায়া আছে বরাবরই।

অবস্থা যখন ক্রমেই বেশ জটিল হয়ে উঠছে, তখন তিনি মনস্থির করার জন্যে একটু স্থির হয়ে বসলেন।

ইতিমধ্যে অবশ্য ছয়-সাত বছর কেটে গিয়েছে। ইতিমধ্যে বকুল ব্যানার্জি বিয়ে করে বসেছে পাটনার এক ডাক্তারকে।

বকুলের বড়-বড় কথাগুলো খুব মনে পড়ে পরাশরের। সেই মেয়ে যে সেসব কথা ভুলে গিয়ে হঠাৎ এমন কান্ড করে বসবে তা ভাবতেই পারেন নি পরাশর।

বিয়ে করার ঝক্কি নেবার মত সামর্থ্য ইতিমধ্যে একটু হয়েছে বলেই মনে হল পরাশরের। সুতরাং আর চিন্তার কোনো দরকার নেই। এক ফাল্গুন মাসের শুভ তিথি দেখে পরাশর বিয়ে করলেন তার প্রথমা প্রেমিকাকে—সরলা সোমকে।

পুরাতন প্রসঙ্গ সব ভুলে গিয়ে নতুন অন্তরঙ্গতা গড়ে তুলতে হবে—মনে-মনে এই রকম সংকল্প করে নিলেন পরাশর। অনেক দিন, প্রায় আট বছর, অপেক্ষা করেছে সরলা। তার ধৈর্যের প্রশংসা একটু করতেই হবে। বকুলের সঙ্গে পরিচয় খুব বেশি দিনের না, দেবিকার সঙ্গেও প্রায় ঐ রকমই, উল্লেখযোগ্য এই দুজনের কথাই এখন মনে পড়ছে। বকুলও যেমন ব্যস্ত হয়ে পাটনায় চলে গেল, দেবিকাও তেমনি ইচ্ছে করলে চলে যেতে পারে পাবনায়। সুতরাং ওদের কথা ভেবে লাভ নেই।

সরলা সোম এখন সরলা পুরকায়স্থ হয়ে গিয়েছে। পরাশরকে এখন আর পিপি বলে ডাকতে হয় না তার।

মানুষের স্বভাব মানুষেরই স্বভাব। তার বদল হওয়া বড় কঠিন। খুব আনন্দের, খুব সুখের, এবং খুব শান্তির জীবনই যাপন করে চলল তারা দুজন।

হুহু করে কেটে যেতে লাগল বছর। সেইসঙ্গে অনুরূপ দ্রুততায় পরাশরের উন্নতিও হতে লাগল। সরলার ভাগ্যে তার এই উন্নতি, কিংবা তার মেয়েদের ভাগ্যে? ভাবত পরাশর।

ইতিমধ্যে তিনটি মেয়ে হয়েছে তাদের।

কাজের তাড়া ছিল অবশ্যই, তার সঙ্গে মনের তাড়াও অবশ্যই ছিল। মাস-তিনের জন্যে পরাশরকে যেতে হচ্ছে রেঙ্গুনে।

সরলা সংক্ষেপে বলল, "সাবধানে থেকো কিন্তু।"

ঐ কথা শোনা মাত্র বুকের ভিতরটা ছ্যাঁৎ করে উঠল পরাশরের। হঠাৎ এভাবে তাকে সাবধানে থাকতে বলা কেন!

পরাশর অকপটভাবে অট্টহাস্য করে উঠল, বলল, "থাকব। থাকব। মেয়েদের নিয়ে তুমিও সাবধানে থেকো।"

তিন মাসের জায়গায় চার মাস হয়ে গেল, তারপর ফিরল পরাশর।

তার মন যেন একটু ভারি, হাসি যেন একটু কম। তার মুখের দিকে চেয়ে সরলা বলল, "অত ভারিক্কে হয়ে গেলে কেন।"

প্রাণ খুলে হেসে উঠল পরাশর, বলল, "বয়সটাও তো বাড়ছে! তার পর জাহাজের জার্নি! টায়ার্ড!"

"যাই হোক, শরীর ভালো আছে তো?"

"কেমন দেখছ?"

"ভালোই। একটু যেন মোটাই হয়েছ!"

পরাশর বলল, "খুব স্বাস্থ্যকর জায়গা রেঙ্গুন। তোমাদের একবার নিয়ে যাব।"

বছরগুলো কেটে যাচ্ছে। বয়সও বেড়ে যাচ্ছে। কিন্তু শরীরের বয়স শরীরেরই বয়স, মন তাজা রাখতে পারলে বয়স তাকে কাবু করতে পারে না।

এক-এক করে মেয়েদের বিয়ে হয়ে গেল। বাড়িটা কেমন জমজমাট ছিল, ধীরে-ধীরে কেমন-যেন শূন্য, কেমন-যেন নীরব হয়ে যেতে লাগল বাড়িটা।

কিন্তু পরাশর তার বিজনেস নিয়ে মেতে আছে, শূন্য বাড়ির শূন্যতা তাকে তেমন কাবু করে না। কিন্তু সরলা ক্রমেই যেন কেমন কাবু হয়ে যেতে লাগল।

কিন্তু এই অবস্থাটা যে এমন মারাত্মক হয়ে উঠতে পারে তা কেউই ভাবতে পারে নি।

তেমন কিছু অসুস্থ অবশ্য ছিল না সরলা, কিন্তু একদিন গভীর রাত্রে ডাক্তার ডাকার অবকাশ না দিয়ে সরলা মারা গেল।

এইখানেই আমরাও বিদায় নিতে পারতাম। এইখানেই এই কাহিনী সমাপ্ত হয়ে যেতে পারত।

কিন্তু পরাশর পুরকায়স্থ জীবন্ত মানুষ। দিন-কয়েক স্তব্ধ থেকে আবার তিনি জেগে উঠলেন। প্রতিকূল অবস্থার কাছে মাথা নীচু করতে কোনো দিনই তাঁর ইচ্ছে নয়।

স্ত্রীবিয়োগের পর একেবারে একা হয়ে যেতে হল পরাশরকে। বড় মেয়ে তার দুটি বাচ্চাকে নিয়ে রাঁচী থেকে এসে বাবার সঙ্গে দিন-কয়েক কাটিয়ে গেল, সান্ত্বনা দিয়ে গেল। মেজমেয়ে এডেনে আছে, তার আসা সম্ভব হল না। ছোটটি রুরকীতে, তার স্বামী মিলিটারি ডাক্তার; সেও আসতে পারল না, কেননা, সে নিজেই হাসপাতালে, তার বাচ্চা হয়েছে।

মেয়েরা চিঠি লেখে ব্যস্ত হয়ে। তাদের বাবার দেখাশোনা কে করবে—এই তাদের ভাবনা। বয়সও হয়েছে বাবার, এই সময়েই মানুষ একটু সেবাশুশ্রূষা চায়, আর, মায়ের যেমন আক্কেল, এই সময়েই তাঁর মারা যাবার দরকার ছিল না!

কিন্তু সরলা মানুষটি বরাবরই সরল, অত ভেবে দেখার মত মন তার তৈরি ছিল না হয়তো। তা যদি থাকত তা হলে অত সহজে মৃত্যুকে সে স্বীকার করে নিত না নিশ্চয়। দীর্ঘকাল যে প্রতীক্ষা করে ছিল এই মানুষটার জন্যে, তাকে এমন একা ও অসহায় করে ফেলে রেখে নিশ্চয় যেত না।

মন যতই ফাঁকা হয়ে গেল পরাশরের, ততই পুরাতন কথাগুলি এসে তার মনের শূন্য-স্থান পূর্ণ করতে লাগল। বকুল ব্যানার্জি কি এখনো পাটনাতেই আছে? দেবিকা দত্ত এখন কোথায়? তাদের এখন দেখলে নিশ্চয় তাদের চিনতে পারবে না পরাশর। তারাও কি চিনতে পারবে পরাশরকে? বোধ হয় না। আরও একজনের কথা খুব বেশি করে মনে পড়ে এখন, গায়ত্রী গঙ্গোপাধ্যায়; তাকে পরাশর বলত—জিজি। সেসব কথা এখন থাক্।

সেসব তো দীর্ঘকাল আগের ঘটনা। পুরনোকে আঁকড়ে বসে থাকার কোনো অর্থ হয় না। একটা ঘাটে নোঙর গেঁথে বসে থাকলে জাহাজের জীবন জীর্ণ হয়ে যায় না?

হঠাৎ এই রকম অবস্থায় পড়লে মানুষের মনমরা হয়ে যাবার কথা। কিন্তু পরাশর পুরকায়স্থ পরাস্ত হতে রাজি না বলেই সম্ভবত নিজেকে ফুর্তিতে ও আনন্দে ভরপুর রাখার চেষ্টাতেই ব্যস্ত। এজন্যে তাঁকে ভুল বোঝা স্বাভাবিক। তাঁকে নিষ্ঠুর মনে হওয়াও বিচিত্র নয়।

কে কি ভাবল, কে কি মনে করল—ওসব চিন্তা দিয়ে নিজেকে বিভোর রাখার পক্ষপাতী তিনি নন। তিনি আগেও যেমন হাসি দিয়ে নিজেকে জাগিয়ে রাখতেন, এখনো তাঁর মুখে সেই হাসি; কিন্তু এখন সম্ভবত নিজেকে জাগিয়ে না, নিজেকে তিনি ভুলিয়ে রাখেন।

শোক যখন একটু পুরনো হয়ে এল, বন্ধুবান্ধবেরা তখন তাঁকে নানারকম পরামর্শ দিতে আরম্ভ করলেন। একটা সঙ্গী জুটিয়ে না নিলে পরাশরবাবু বাঁচবেন কী করে এই হল তাঁদের ভাবনা। দীর্ঘজীবনের একটা বদ্ধমূল অভ্যাস, সেই অভ্যাস থেকে নিজেকে আলগা করে নিলে মনের উপর পীড়ন করা তো হয়ই, স্বাস্থ্যের পক্ষেও তা ক্ষতিকর।

কথাগুনো মন দিয়েই শোনেন পরাশরবাবু। তাঁদের কথার মধ্যে যে যুক্তি আছে তা তিনি মানেনও। কিন্তু—

পরাশরবাবু বলেন, "তা হলে কি বলতে চাও তোমরা। এই ষাট বছরের বুড়ো আবার একটা বিয়ে করুক, এইটেই কি তোমাদের ইচ্ছে?"

"আমাদের ইচ্ছের কথা পরে হবে, তোমার ইচ্ছেটা কি, সেইটে আগে খুলে বলো দেখি!"

পরাশরবাবু হেসে ওঠেন, বলেন, "একটা বিয়ে করারই ইচ্ছে, কিন্তু তেমন পাত্রী পাই কোথায়? আছে নাকি তোমাদের কারো খোঁজে?"

"এসব জিনিস কি আর খোঁজে থাকে হে? খোঁজ করে দেখতে হয়। আদেশ করো তো, খুঁজে দেখি!"

এ কথা নিয়ে সকলে অনেকক্ষণ ধরে বেশ হাসাহাসি করলেন।

সে হাসিতে অকৃপণ ভাবে যোগ দিলেন বটে পরাশরবাবু, কিন্তু কথাটা তিনি হেসে উড়িয়ে দিলেন না।

বন্ধুদের মধ্যে অন্তরঙ্গ একজন, যাঁর কাছে অনেক প্রাণের কথা আর অনেক আঁতের কথা পরাশরবাবু বলেছেন, তিনি বললেন, "অনেক তো ঘুরলে, অনেক তো উড়লে—তাদের একজনকে আজ এই দুঃসময়ে ডেকে আনো-না।"

পরাশরবাবু বললেন, "ওটা কাজের কথা হল না। যাদের সঙ্গে ওড়া যায় ঘোরা যায়, তাদের নিয়ে ঘর করা যায় না। যাকে নিয়ে ঘর করব সে হবে ঘরনী, ঘুরুনী হলে চলবে না।"

নিজের এই মন্তব্যে নিজেই শব্দ করে হেসে উঠলেন পরাশরবাবু।

বন্ধুটি বললেন, "বলেছো ভালো। অভিজ্ঞ মানুষের কথাই আলাদা।"

এ রকম অনেক কথাই চলল অনেক দিন ধরে, কিন্তু কাজের কাজ কিছু হল না।

সত্যি, এ দেশটা বড় বাজে। বিদেশের কোনো জায়গা হলে কত পাত্রী এসে জুটে যেত। ওদেশে বাহাত্তর বছর বয়সের লোকও বিয়ে করছে, এমনকি, কিছুদিন আগেই খবর পড়া গেল, চুয়ানব্বই বছর বয়সেও কে যেন বিয়ে করল।

"তাদের কাছে তুমি তো শিশু হে পরাশর।"

সব কথাই শুনছেন পরাশরবাবু, নিজেও ভাবছেন অনেক কথা। কিন্তু কি যে করা

যায় তাই ভেবে পাচ্ছেন না। একটা-কিছু করা যে দরকারই, সেটা মনে-মনে ঠিক হয়ে গিয়েছে। কিন্তু বিয়ে করার মধ্যে একটা ল্যাঠাও আছে। এত তাঁর ঐশ্বর্য, এত তাঁর প্রপার্টি—তার লোভে হয়তো কোনো তরুণীও এসে যেতে পারে—বৃদ্ধাদের কথা বাদই দেওয়া গেল—কিন্তু কি মতলব নিয়ে সে আসবে বলা শক্ত। সে রকম কারো খপ্পরে পড়ে যাওয়া ঠিক হবে কিনা, সেটাও ভাববার বিষয়।

বন্ধুটি এ কথা শুনে একটু ভাবলেন, তারপর বললেন, "সাবধান হওয়া ভালো। সাবধানের মার নেই অবশ্যই, কিন্তু মারেরও সাবধান নেই। যথেষ্ট সাবধান হলেও অঘটন ঘটতে পারে, ঠেকানো বড় কঠিন হে!"

"বউ হয়ে এলেই নানারকম বাই এসে যাবে।" পরাশরবাবু বললেন, "এই বয়সে আমিও যদি স্ত্রৈণ হয়ে যাই, সেটাও বড় ভালো দেখাবে না। এমন বুড়ো মানুষের বউ হয়ে যিনি আসবেন, তিনি কেবল শোষণ করেই তুষ্ট হবেন না, তিনি শাসন করতেও চাইবেন নিশ্চয়। বিদ্রোহ করলে অশান্তি হবে, অশান্তির ভয়ে সব মেনে নিলে স্ত্রৈণ হতে হবে। মানুষ যে স্ত্রৈণ হয়, বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই সেটা স্ত্রীর ভয়ে না, অশান্তির ভয়ে।"

স্ত্রৈণ নামে খ্যাত বন্ধুটি বললেন, "ঠিক ধরেছ তো হে পরাশর।"

অন্য-এক বন্ধু মন্তব্য করলেন, "এক্সপিরিয়েন্সড মানুষ ও, অনেক পুরুষই কেবল দেখে নি, অনেক—"

"থাক্ থাক্ থাক্" সকলে বাধা দিল।

মনে হল, পরাশরবাবু নিশ্চয় মনে-মনে কিছু-একটা বুদ্ধি এঁটেছেন। অথচ সে কথাটা তিনি এখনি ফাঁস করছেন না।

তিনি সত্যিই হাঁপিয়ে উঠেছেন। স্ত্রী-বিয়োগের পর প্রায় এক বছর গত হল, কেবল কথা কেবল পরামর্শ আর কেবল পরিকল্পনা—এই নিয়ে বছর পার হবার জোগাড়।

আর কারো সঙ্গে পরামর্শ নয়, তিনি যা ঠিক করেছেন, তাই এবার তিনি করবেন—কথাটা অকপটে স্বীকারই করলেন তিনি।

"কি করবে ঠিক করেছ?"

"একজন উপযুক্ত হাউস-কীপার রাখব। এতে স্যাটিসফ্যাক্শন আছে, কম্প্লিকেশন নেই। একজনকে পছন্দ না হলে তাকে ছাড়িয়ে দিয়ে—"

"দিব্য বুদ্ধিই ফেঁদেছ। নিত্য নূতন সঙ্গিনী! এই না হলে সাধে কি তুমি পরাশর পুরকায়স্থ। কিন্তু জোগাড়টা করবে কোন্ কৌশলে?"

পরাশরবাবু বললেন, "সহজ কৌশল। কাগজে বিজ্ঞাপন দেব। যারা দরখাস্ত করবে তাদের ইন্টারভিউ নেব। যাকে পছন্দ হবে—"

স্ত্রৈণ বন্ধুটি কি-যেন বলতে গিয়েছিল, অন্যজন তাকে বাধা দিয়ে বললেন, "ইউ আর গ্রেট পরাশর, ইউ আর গ্রেট। আমাদের সেই নতুন বৌদিকে দেখার জন্যে ব্যাকুল হয়ে রইলাম। তোমার কল্যাণে অনেক দেখেছি; এবার আর-এক রকম দেখব।"

পরাশরবাবু বললেন, "প্রাপ্যের অধিক পেয়ে যাচ্ছি যেন! প্রাপ্যের অধিক পুরস্কার আমাকে দিয়ে দিচ্ছ যেন। আচ্ছা, দেখি এবার আর-একটা চেষ্টা করে।"

হাসতে লাগলেন পরাশরবাবু।

পরাশরবাবুর হাতযশ আছে। তাঁর নিজেরও বিশ্বাস আছে নিজের উপর। তাঁর বন্ধুরাই কেবল না, তিনি নিজেও একটু ব্যাকুল হয়েছেন। একটা এতবড় বাড়িতে একেবারে

একা থেকে-থেকে তিনি ক্লান্ত হয়েই পড়েছেন বলতে হয়। এমন থাকার অভ্যাস তাঁর কোনোদিনই না। তাই তাঁর দম প্রায় বন্ধ হবার দশা হয়েছে। এ অবস্থা থেকে নিজেকে উম্ধার তিনি কিভাবে করবেন তা ভাবতে-ভাবতেই এতগুলো দিন গত হল। কিন্তু না, আর না। এবার এর একটা বিহিত করতেই হবে।

বিহিত করার ব্যবস্থা করলেন পরাশরবাবু। তিনি আর কালবিলম্ব না করে কাগজে বেশ ফলাও করে বিজ্ঞাপন দিলেন—

॥ স্বাস্থ্যবতী কর্মঠ সুশ্রী সুরুচিসম্পন্না নির্ঝঞ্ঝাট হাউস-কীপার
আবশ্যক। বয়স আনুমানিক চল্লিশ হওয়া বাঞ্ছনীয়।
ষাট বৎসর বয়স্ক বিপত্নীক স্বাস্থ্যবান কর্মক্ষম
ব্যবসায়ীর যাবতীয় সুখস্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি দৃষ্টি
রাখিতে হইবে। ব্যবসায়সূত্রে ভ্রমণকালে
সঙ্গীরূপে যাইতে হইতে পারে। বয়স ও
সম্ভবস্থলে ছবি-সহ আবেদন করুন॥

বিজ্ঞাপনটি যেদিন বেরিয়ে গেল সেদিন পরাশরবাবু বার-বার সেটি পড়তে লাগলেন, আর ভাবতে লাগলেন—এটি পড়ে পাঁচজনের মনে কিরকম ক্রিয়া হচ্ছে বা হওয়া সম্ভব। এটা পড়ে লোকে যা-তা ভাববে না তো। বুড়োর ভিমরতি হয়েছে বলেও অনেকে মনে করতে পারে নিশ্চয়!

কিন্তু ওকথা নিয়ে মাথা-ঘামানো ঠিক না। হাতের ঢিল ছেড়ে দেওয়া হয়েছে, এখন সেটা যেখানে গিয়ে পড়ে পড়ুক। নিজে তিনি মনে-মনে হাসতে লাগলেন। তাঁর মনে হতে লাগল—দরখাস্ত হয়তো কেউ করবে না। সকলে হাসাহাসিই করবে।

আর কে-কে হাসাহাসি করল তার খবর তিনি অবশ্য পান নি, কিন্তু তাঁর বন্ধুরা এটা নিয়ে বেশ হাসিতামাশা করতে লাগল। তারা বলতে লাগল, "একেবারে ফাঁস হয়ে গেছে তোমার মতলব। অত কথা খোলসা করে লেখার কি দরকার ছিল? অত স্বাস্থ্যের কথা, অত রুচির কথা, অত দেহশ্রীর কথা! কেবল কর্মঠ সঙ্গিনী চাই লিখলেই মিটে যেত। কি-কি তার ডিউটি, কোথায়-কোথায় যেতে হবে ইত্যাদি বিবরণ দেবার কোনো দরকার ছিল না।"

স্ত্রৈণ বন্ধুটি হঠাৎ হেসে উঠলেন, বললেন, "না, ঠিকই হয়েছে। জাহান্নম পর্যন্ত যেতে হবে না নিশ্চয়, তা যদি যেতে হত তাহলে তারও উল্লেখ অবশ্যই থাকত।"

সকলে অট্টহাস্য করে উঠলেন।

দিন-দুই গত হল, কিন্তু একটাও চিঠি এল না। এতে একটু চিন্তিতই হলেন পরাশরবাবু। তিনি যে একটু বাড়াবাড়ি করে ফেলেছেন তা যেন বুঝতে পারলেন তিনি। কিন্তু হাল ছেড়ে দেবার মানুষ তিনি নন। তাঁর এ বিজ্ঞাপনে কাজ না হলে তিনি আবার একটা বিজ্ঞাপন দেবেন, তাতে হেঁয়ালি রাখবেন। বড় বড় হরফে কেবল লিখে দেবেন—

॥ গৃহরক্ষিকা আবশ্যক। বেতন-সহ
আবেদন করুন ॥

সে বিজ্ঞাপন-দেখে নিশ্চয় কয়েকটা অন্তত দরখাস্ত অবশ্যই আসবে। আজকাল নানারকম কাজ খুঁজছে মেয়েরা। মেয়েরা আজকাল অনেক সাহসী হয়েছে, অনেক অ্যাডভেঞ্চারাস হয়েছে।

ঠিক। যা ভেবেছেন পরাশরবাবু, তাই। দ্বিতীয় বিজ্ঞাপন তাঁকে দিতে হল না, প্রথম বিজ্ঞাপনের জবাবেই চিঠি আসতে আরম্ভ করল। খবরের কাগজের পিয়ন এসে একই দিনে দুবেলায় দশখানা চিঠি দিয়ে গেল। খুলে-খুলে চিঠি পড়েন তার পরাশরবাবু বেশ মজা পান। মেয়েরা সত্যিই সাহসী আর অ্যাডভেঞ্চারাস হয়ে গিয়েছে তো!

বক্স নম্বরের বিজ্ঞাপন। তাই সরাসরি তাঁর কাছে আসছে না। খবরের কাগজের দপ্তর হয়ে আসছে। কয়েক দিন ধরে দফে-দফে চিঠি আসতে লাগল। চিঠির যেন আর শেষ নেই। সব চিঠি তাঁর পড়ে ওঠাই দায় হল। কিন্তু অবসর-বিনোদনের জন্যে তিনি একটা কাজও বেশ পেয়ে গেলেন। রাত্রে একা-একা বসে আলোর ফোকাসের নীচে চিঠিগুলো ধরে ধরে তিনি সেগুলি পড়ে যেতে লাগলেন। বিভিন্ন রসে রসালো চিঠিগুলো। হাস্যরস আছে, করুণরস আছে, রৌদ্ররস আছে, বীভৎসরসও দু-একটায় একটু-আধটু যেন আছে। আবেদন-নিবেদন কোনো-কোনোটায় অনুনয়ের মত শুনতে হয়েছে, কেউ-কেউ একটু আশ্রয়ের জন্যে ব্যাকুলতা জানিয়েছে, কেউ প্রশ্রয় দেবার প্রলোভনও দেখিয়েছে। এদের মধ্যে কাকে রাখা যায়, কাকে ডাকা যায়—তা বাছাই করাই এক সমস্যা।

কিন্তু সমস্যা নিয়ে বিব্রত হলে আর লাভ কি! জীবনটাই তো আসলে একটি আস্ত সমস্যা। সমস্যা এলে তার সম্মুখীন বরাবরই তিনি হয়েছেন, এখনও তিনি তার জন্যে প্রস্তুত।

দিন-পনেরো বাদে চিঠি আসা শেষ হল। এই কয়দিন তিনি কিছু-কিছু বেছে রেখেছেন, এবার তিনি পাকাপাকি বাছাই করতে বসলেন।

মোট বাহাত্তরটা চিঠির মধ্যে থেকে তিনি বারোটা বেছে রাখলেন। বাকিগুলো সযত্নে রেখে দিলেন আপাতত।

সেই বারোজনকে তিনি ডেকে পাঠালেন। সকালে একজন, বিকেলে একজন। ছয়দিন ধরে এই বারোজনের ইন্টারভিউ নেবেন বলে সাপ্তাহিক একটা প্রোগ্রাম করে নিলেন।

সুবর্ণা বকসী, স্নেহময়ী সেন। প্রসন্নময়ী বিশ্বাস, অলকা উকিল। মিস হাসনুহানা, কুমারী মমতা। হেমন্তবালা দত্ত, আরতি অধিকারী। গোপা গঙ্গোপাধ্যায়, প্রীতি সোম। এনা রক্ষিত, ঈপ্সিতা চাকী।

সোম থেকে শনি—এই ছয়দিনের জন্যে পরাশরবাবু এই কয়টি নাম বেছে রাখলেন।

কিন্তু বার-বারই তাঁর মনে হতে লাগল যে, বাকি ষাটটি প্রার্থীর মধ্যেই হয়তো সবচেয়ে উপযুক্তটি রয়ে গেল। সেজন্যে অবশ্য এখনি আক্ষেপ করার কিছু নেই। ওগুলি তো তাঁর হাতে রইলই। তেমন যদি দরকার মনে করেন তাহলে দ্বিতীয় দফায় আবার ওদের থেকে এক ডজন বেছে নিয়ে তাদের ডাকা যেতে পারে।

অর্থের যখন কোনো টানাটানি নেই, সামর্থ্যও যখন আছে, ইচ্ছাও আছে আগ্রহও আছে মর্জিও যখন আছে, তখন আর কথা কী! এদের সকলকেই ডেকে-ডেকে দেখা করে-করে তাঁর ফাঁকা সময় তিনি কিছুদিন অত্যন্ত ভরাট করে রেখে দিতে পারেন। এতে একরকম আলাদা রোমাঞ্চ আছে। ভাবতে-ভাবতে তাঁর কলেবর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠতে লাগল।

অনেক ভেবে-চিন্তে তাঁকে এগোতে হবে। কোন্‌খান থেকে কে এসে তাকে এমন অভিভূত করে ফেলতে পারে যে, তিনি তাকেই নির্বাচন করতে বাধ্য হবেন। তারপর এক গভীর রাত্রে হয়তো সাংঘাতিক এক কেলেঙ্কারি হয়ে গেল। যেমন, তাঁকে ব্ল্যাকমেল করবার জন্যে অকারণেই একটা কেস খাড়া করে সেই নির্বাচিত মেয়েটি লোকজন দিয়ে ঘেরাও করে

ফেলল তাঁর বাড়ি। তাঁর নামে যাচ্ছেতাই রকম অভিযোগ করতে আরম্ভ করল। আর, ওসব কথা এতই মুখরোচক যে, তা শোনামাত্র সকলে বিশ্বাস করে ফেলল। পরাশরবাবুর কোনো কৈফিয়তেই কেউ কান করল না।

যে পথে তিনি পা বাড়িয়েছেন তা যে একেবারে নিষ্কণ্টক নয়, তা তিনি বেশ বুঝতে পারছেন।

তিনি যদি সামান্য একজন মানুষ হতেন, অর্থাৎ তাঁর যদি এত অর্থ না থাকত, কিংবা অর্থবান্ মানুষ বলে পরিচয় তাঁর না থাকত, তাহলে বরঞ্চ কথা ছিল। যদি তিনি সাধারণ ও সামান্য একজন মানুষ হতেন, তাহলে বিশেষ ঝুঁকি থাকত না। এরকম পরিচারিকা তো রাখতেই হয় কত লোককে। তারা কি অত-শত ভাবে? বোধ হয় ভাবে না।

তিনি নিজের মনে-মনেই ভাবেন, 'কিন্তু মানুষটা যে আমি সুবিধের নই। আমার মনেও যে অনেক মতলব। এই জন্যেই বুঝি আমার এ দুশ্চিন্তা।'

কিন্তু পরাশরবাবু বোধ হয় জানেন না যে, সব মানুষই ঐ রকম অসুবিধার। সব মানুষের মধ্যেই ও রকম একটু-আধটু মতলব থাকে। কেউ সংগতির অভাবে, কেউ-বা লোকলজ্জায়, কেউ-বা অন্য কোনো কারণে একটু অন্যরকম সেজে থাকে। মনের ফটোগ্রাফ যদি তোলা যেত, এবং তা এনলার্জ করে দেখা যেত যদি, তাহলে সব কটি ছবির প্রিন্টই হুবহু একই জাতের দেখাত।

এইজন্যে ওসব চিন্তা বাদ দেওয়াই ভালো। আমরাও বাদ দিলাম। পরাশরবাবুও বোধ হয় বাদ দিয়ে দিলেন। তিনি প্রস্তুত হলেন। আর ভাবনা-চিন্তার কোনো দরকার নেই, তিনি এবার কাজে নামবেন।

পরদিনই তিনি চিঠিগুলিতে দিন ও সময় উল্লেখ করে সেগুলি ডাকে দিলেন।

আজ বুধবার। আগামী সোমবার থেকে ইন্টারভিউ আরম্ভ। সোম থেকে শনি— এই ছয় দিনে তিনি এদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা শেষ করে ফেলবেন ঠিক করলেন। আরও ঠিক করলেন, তিনি কতকগুলো প্রশ্ন ঠিক করে রাখবেন, সেইগুলি জিজ্ঞাসা করে তার জবাব দিতে বলবেন, ব্যস। এবং, সেইসঙ্গে চোখের দেখা যেটা, সেটাও চোখে-চোখেই সেরে ফেলবেন।

সকালবেলা ৯টা থেকে ১০টা এবং সন্ধ্যাবেলা ৬টা থেকে ৭টা তিনি ধার্য করে রাখলেন এই কাজের জন্যে। তাঁর বাড়িতেই তাঁর ড্রইংরুমে এই সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা হল।

বড় ঘর, মেঝেতে মোটা কার্পেট। দরজায় জানালায় ভারি পর্দা। বড় টেবিলের ওপাশে একটি চেয়ার, এপাশে একটি। একটি মাত্র বেয়ারা দরজার বাইরে পর্দার ওপারে অপেক্ষা করবে। ঘরের সামনের দিকে আপিসের বিশ্বস্ত কর্মচারী ফণিভূষণ একটা ছোট টেবিল ও চেয়ার নিয়ে অপেক্ষা করবে, প্রার্থিনী এলে তাঁকে বসিয়ে সে এসে খবর দেবে পরাশরবাবুকে—এই হল ব্যবস্থা।

নির্দিষ্ট সময়ের কিছু আগে পরাশরবাবু তাঁর চেয়ারে বসে চুরুট টানতে লাগলেন। ঘড়ির দিকে তাঁর চোখ।

যদি কেউ আগে এসে পৌঁছয় তাহলে যেন তাকে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করতে বলা হয়-ফণিভূষণের উপর এই রকম নির্দেশ দেওয়া আছে। সময় পার হবার পর যদি কেউ আসে তাকে যেন ফিরে যেতে বলা হয়, এ রকম নির্দেশও দেওয়া আছে।

আমরা বেশি খুঁটিনাটির মধ্যে যাব না, যে-যে আসবে চেহারার বর্ণনা দিয়ে তার

সঙ্গে পরাশরবাবুর কি-কি কথা হল তার বিবরণ মাত্র দেব। এবং তাকে দেখে পরাশরবাবুর কি রকম মনোভাব হল তারও আভাস দেবার চেষ্টা করব।

প্রার্থী এসেছেন—

সুবর্ণা বকসী

বছর ত্রিশ বয়স। চোখ দুটো উজ্জ্বল। ভুরু দুটো হালকা। শরীর ঈষৎ স্থূল। মাথায় চুল অজস্র। এলোখোঁপা করে চুল বাঁধা। মুখখানা গোলগাল। বিজ্ঞাপনের চাহিদা অনুযায়ী স্বাস্থ্যবতী ও সুশ্রীই বলা যায়। কিন্তু ঐ চাহিদার চেয়ে বয়স কিছু কম।

কিছুক্ষণ চেয়ে দেখার মতনই চেহারা। পরিচারিকার থেকে পরিবার হওয়ার অনুরূপই দেখতে।

পরনে হালকা রঙের ডুরে শাড়ি। গায়ে খাটো-হাতের মিহি জামা। ঠোঁট দুটো পরিচ্ছন্ন, দাঁত ঝকঝকে।

পরাশরবাবু হাতের চুরুট ছাইদানির উপরে রেখে অনেকক্ষণ তার দিকে চেয়ে রইলেন। কোনো কথা বললেন না।

সুবর্ণাও পরাশরকে দেখে নেবার চেষ্টা করতে লাগল। ঘরের দেয়ালে তাকিয়ে সে দেখতে লাগল ছবি। ফটোগ্রাফ একটাও নেই এ ঘরে, সবই পেন্টিং। কোনোটা সূর্যাস্তের ছবি, কোনোটা বা সাঁওতাল দম্পতির।

পরাশরবাবু বোধ হয় এতটা ভাবেন নি। এ ধরনের এমন সুন্দরী মহিলা যে তাঁর ডাকে এরকম সাড়া দিয়ে এসে হাজির হতে পারে, তা তাঁর কল্পনার বাইরেই ছিল হয়তো। মনে-মনে হাসছেন তিনি। প্রথমটিই যদি এই, তাহলে পরে আরো যে কারা আসছেন, তা তো বলা কষ্টই। যাই হোক, অতগুলো চিঠির মধ্যে থেকে পয়লা নম্বর যে হয়েছে, সে যে সত্যিই এমন পয়লা নম্বরেরই হয়েছে, এটা বেশ আশার কথা। তিনি ব্যবসায়ী লোক, বউনি বলে একটা কথা তাঁরা ব্যবহার করে থাকেন, সেদিক থেকে তাঁর বউনিটা ভালোই হল।

সুবর্ণার দরখাস্তটি টেবিলের উপর বিছিয়ে নিয়ে তাতে আর-একবার চোখ বুলিয়ে, গলাটা পরিষ্কার করে নিয়ে পরাশরবাবু একটু হেসে বললেন, "বয়সের কথা লিখেছিলাম চল্লিশ, কিন্তু—"

"কোনো অসুবিধে হবে না তাতে। তিরিশে আর চল্লিশে খুব তফাৎ নেই। চল্লিশের মতই ব্যবহার পাবেন।"

প্রশ্ন॥ সেটা আবার কি রকম?

উত্তর॥ তা বলতে পারব না। কিছু-একটা হিসেব করেই তো ঐ বয়সের কথা উল্লেখ করেছেন? আমার মনে হয় আমি সেই হিসেব মেনে চলতে পারব।

প্র॥ পারবেন? ভালো কথা। কিন্তু এই তো দেখছেন আমার বাড়ি। আমি একেবারে একা থাকি, আপনি আমার সঙ্গে এখানে একা থাকতে পারবেন বলে মনে করেন?

উ॥ সব জেনেই দরখাস্ত করেছি। বিজ্ঞাপনে তো আপনি খুলেই লিখেছেন সব কথা।

প্র॥ বাইরে যেতে হতে পারে—

উ॥ তাও তো লিখেছেন বিজ্ঞাপনে।

প্র॥ আমার বয়স ষাট। দেখে কত মনে হয়?

উ॥ আর-একটু বেশি দেখায়। কিন্তু—

প্র॥ কিন্তু কি?

উ॥ বয়স্ক বটে, কিন্তু বৃদ্ধ আপনি নন।

পরাশরবাবু হেসে উঠলেন। বললেন, "এইটুকু মাত্র দেখে এত বড় কথাটা বলে ফেলতে পারলেন?"

"এইটুকু দেখেই বলিনি। আগে থেকে বুঝতে পেরেছি বলেই এত তাড়াতাড়ি বলতে পারলাম।"

প্র॥ আগে থেকেই কি রকম?

উ॥ ঐ বিজ্ঞাপনে কথাগুলো পড়ে। আপনার বয়স হয়েছে বটে, কিন্তু আপনি তরুণ।

প্র॥ আপনিও তো তরুণী। তাহলে সাহস করে এই তরুণের—

উ॥ প্রয়োজনে। একটা আশ্রয় পাব, এই ভরসায়।

প্র॥ চট করে অতটা ভরসা করা ঠিক হয় নি মনে হচ্ছে না?

উ॥ বেঠিকই-বা হল কোথায়? জীবনটাই জুয়োখেলা। হারতে পারি, জিততেও তো পারি।

প্র॥ কিন্তু আমি মানুষটা কেমন তার খোঁজখবর আগে নিয়ে নেওয়া উচিত। যার সঙ্গে একা থাকতে হবে তার প্রকৃতিটা তার স্বভাবটা জেনে নেওয়া কি উচিত না?

উ॥ উচিত বটেই। কিন্তু অসম্ভবও। পুরুষের প্রকৃতি পুরুষের স্বভাব কোনো মেয়ের পক্ষেই জানা সম্ভব না, হাজার খোঁজখবর করা সত্ত্বেও না।

প্র॥ এর বিপরীতটাও কি ঠিক না?

উ॥ ঠিক। কোনো পুরুষও কখনো চিনতে পারে না কোনো মেয়েকে।

কিছুক্ষণ দুইজনে চুপচাপ বসে রইল। মনে হল, হঠাৎ যেন ওদের কথা ফুরিয়ে গিয়েছে। পরাশরবাবু তাঁর হাতের প্রশ্নপত্রের উপরে চোখ বুলিয়েও যেন কোনো প্রশ্ন খুঁজে পেলেন না।

সুবর্ণা বলল, "খুব খারাপটা ভেবে রাখাই ভালো। ওতে দাগা পেতে হয় কম। আপনার বিজ্ঞাপন দেখে বুঝে নিয়েছি আপনার মন খুব পরিষ্কার নয়। কিন্তু তাতে কি এল-গেল? আমার মন যে পরিষ্কার তাই-বা আপনি মেনে নেবেন কেন। সেইজন্যে পরিষ্কার-অপরিষ্কার সুমতলব-কুমতলব ওসব কোনো কথা না ভেবে আমি এসেছি চাকরির সন্ধানে। চাকরি একটা আমার চাই।"

"যদি", পরাশরবাবু একটু থেমে বললেন, "ধরুন, এই চাকরিটা আপনার হল না, কিন্তু আপনাকে আমি যদি অন্য-কোনো চাকরি দিই—"

"এ চাকরি না হবার কারণটা তবে বলে দেবেন। এ কাজের জন্যে আমি যদি অযোগ্য হই, অন্য যে কাজ দিতে চাচ্ছেন তার যে আমি যোগ্য—এটা কি করে জানলেন?"

"আপনি এম.এ.। আপনার উপযুক্ত কাজ—"

"কাজ আমি করি। উপযুক্ত কাজই করি। আমি টিচার। কিন্তু মাথার উপর কেউ নেই বলে যে উৎপাত সহ্য করতে হচ্ছে তা আর বলার না। কেবল চাকরি না, আমি চাই একটা আশ্রয়ও।"

আশ্রয়? কেবল আশ্রয়ের জন্যেই এর তবে এখানে আসা। কিন্তু পরাশরবাবু তো আশ্রয় বিলি করার জন্যে এই বিজ্ঞাপন দেন নি। আশ্রয় তো দরকার হাজার জনের। যে-যে

কাজের জন্যে তাঁর একজন লোক দরকার, সেইসব কাজের দিকে এর যে ঝোঁক আছে, সেসব কথা তো একবারও বলছেন না এই মহিলাটি।

পরাশরবাবু বললেন, "আপনার তাহলে দেখছি অনেক ঝঞ্ঝাট। আমি তো নির্ঝঞ্ঝাট লোক চেয়েছি।"

"নির্ঝঞ্ঝাট হয়েই তো আপনার কাছে আসতে চাই।"

"তখন এখানে ঝঞ্ঝাট বাধবে না তো? যারা উৎপাত করে চলেছে তারা যদি এখানে এসে উৎপাত করতে আরম্ভ করে তখন তাদের ঠেকাবে কে?"

"আপনি। আপনার হেপাজতে থাকব, সব ঝঞ্ঝাট তখন আপনার।"

"আমার হেপাজতে আপনি? আমি লোক চাই, তাঁর হেপাজতে আমি থাকব বলে। আমাকে দেখাশুনো করতে হবে, আমাকে সামলাতে হবে, আমার তদারক-তম্বির করতে হবে —এই রকম একজন মহিলা আমার দরকার।"

"আপনার স্ত্রী আপনার জন্যে এত কাজ করতেন?"

"না। তা অবশ্য তিনি করতেন না, কিন্তু তাঁর ইঙ্গিতে বাড়ির ঝি-চাকরেরা—"

"ঝি-চাকর কি এবার তবে সব ছাড়িয়ে দেবেন বলে ইচ্ছে করেছেন?"

পরাশরবাবু যেন একটু ফাঁপরে পড়লেন, বললেন, "তা, তা—কয়েকজন নিশ্চয় থাকবে।"

"তবেই হল। তাহলে কোনো কাজ আটকাবে না। আমরাও একটু-আধটু ইঙ্গিত করতে জানি। আমাদের ইঙ্গিতেও অনেক কাজ তাহলে হতে পারবে। আপনি ভাববেন না।"

"অতই যদি বললেন তবে বলি, আমি আর-একজন স্ত্রী চাই নি, চেয়েছি—"

"বেশ তো। তার জন্যেই তো এসেছি। এসেছি হাউস-কীপার হতেই।"

"কিন্তু স্ত্রীর মতন অধিকার একটু যেন চাচ্ছিলেন বলে মনে হল। সেইজন্যে ওকথা বললাম।"

"যদি চাই-ই, দিতে বাধা কি। একজন মহিলা স্ত্রীর মতন, কিংবা তার চেয়েও বেশি কর্তব্য করবে, কিন্তু অধিকার পাবে না, এটা কি ঠিক হল?"

"ওটা কেবল অধিকার নয়, ওর সঙ্গে মর্যাদাও যে এসে যায়।"

"মর্যাদা নিয়েই তবে বাধা হচ্ছে। মর্যাদা বুঝি দিতে চান না?"

"অতটা দিতে গেলে নানাভাবে জড়িয়ে পড়তে হবে, অতটা চাইবেন না। কিন্তু মর্যাদা আপনার প্রাপ্য, তা বুঝতে পারছি। কিন্তু এ কাজের জন্যে আপনি এলেন কেন তাও ভাবছি। এ কাজটা কিন্তু ভালো না। যে কাজে মাইনে আছে সে কাজে মর্যাদা তত নেই, বিশেষ করে এ ধরনের কাজে। পুরুষের সঙ্গিনী হবার কাজে। ধরুন, আমার সঙ্গে নানা জায়গায় যেতেও হতে পারে। আমি ব্যবসায়ী লোক। ব্যবসায়ে অনেক ঝামেলা। অনেকের মন রক্ষা করে চলতে হয়। কখন কোথায় গিয়ে আপনার কি পরিচয় দেব, তার কোনো ঠিক নেই। কখনো হয়তো বলব ওয়াইফ, কখনো বলব মিসট্রেস, কখনো গার্ল ফ্রেন্ড, কখনো সেক্রেটারি। এই রকম সব অবস্থায় নিজেকে মানিয়ে চলতে হবে। এতটা কি পারবেন?"

"আগে থেকে কথা দেওয়া অসুবিধে আছে। কি রকম অবস্থায় কখন পড়তে হবে, বুঝতে পারছি নে। কিন্তু অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করার চেষ্টা করতে হবে। আর, তাছাড়া যে কাজে মাইনে আছে সে কাজে মর্যাদা যদি না থাকে, তবে মাইনে না দিলেন।"

সুবর্ণা মাথা নীচু করে বসল। চোখের পাতা দ্রুত ওঠানামা করতে লাগল। মনে

হল যেন কান্না চাপা দেবার চেষ্টা করছে সে।

কিছুক্ষণ ঐ ভাবে বসে থেকে হাতব্যাগ থেকে ছোট একটা রুমাল বের করে নাকের ডগা মুছে নিল। তার পর সোজা হয়ে বসল, বলল, "বুঝেছি। আমি এবার তবে চলি।"

"কি বুঝলেন এরি মধ্যে? অত অধৈর্য হলে কি চলে?" পরাশরবাবু বললেন, "নটা থেকে দশটা আপনার সঙ্গে কথা বলার সময়। মাত্র তো দশ-বারো মিনিট কথা হল। এত অল্প সময়ের মধ্যেই সব বুঝে ফেললেন? অত তাড়াতাড়ি কাউকে বুঝে ফেলতে নেই, মিস্, সরি, মিসেস্—"

সুবর্ণা ম্লান হাসল। তার ঠোঁটের উপর ঐ হাসির রেখা ফুটে ওঠায় তাকে আরো সুশ্রী আর আরো সুন্দরী বলে মনে হল পরাশরবাবুর।

পরাশরবাবু বললেন, "আপনি মাইনে চান না?"

"বাধ্য হয়ে চাইনে। আপনি যে বললেন—" কথাটা শেষ করতে পারল না সুবর্ণা। আবার তার চোখ ছলছল করে উঠল। সেটা সে গোপন করার চেষ্টা করে বলল, "কোন্‌খান থেকে বুঝি ধোঁয়া আসছে ঘরে।"

চুরুটের দিকে চেয়ে পরাশরবাবু বললেন, "কোন্‌খান থেকে আবার আসবে। এই-যে—"

"তাই বলুন। চোখ জ্বালা করছে।"

পরাশরবাবু একটু নড়ে-চড়ে ভালো হয়ে বসলেন। তাঁর অনেকক্ষণ থেকেই মনে হচ্ছে এমন সুন্দরী এমন সুশ্রী এমন বুদ্ধিমতী ও শিক্ষিতা হয়েও ইনি এমন ছেঁড়া কাজের উমেদার হয়ে কেন এলেন।

পরাশরবাবু হেসে আবহাওয়াটা অন্তরঙ্গ করে নিয়ে বললেন, "আপনি বিয়ে করলেন না কেন। আপনার মত মেয়ের কিন্তু বিয়েসাদী করে ঘরসংসার করা উচিত।"

"এত অল্প পরিচয়েই এতটা ধরে ফেললেন কী করে? অত চট্ করে কি মানুষ চেনা যায়, না, চেনা উচিত!" সামান্য একটু হেসে উত্তর দিলেন সুবর্ণা বকসী।

পরাশরবাবু এ কথা শুনে অপ্রস্তুত হলেন না, কিন্তু মনে-মনে তিনিও একটু হাসলেন, ভাবলেন, ঠিক উত্তরটাই দিয়েছে বটে।

একটু থেমে থেকে সুবর্ণা বললেন, "তা ছাড়া বিয়ে আমি করিনি, এ কথা আপনাকে বলল কে!"

"তাই বলুন। মুখ দিয়ে তাই আমার হঠাৎ মিসেস্ বেরিয়ে গিয়েছিল। একটু আন্দাজ নিশ্চয় করেছিলাম।"

"মোটেই না। আমার কাছ থেকে কথাটা বের করে নেবার জন্যেই নিশ্চয় বলেছিলেন। শুধু তো মিসেস্ নয়, আপনার মুখ থেকে মিস্ও তো বেরিয়ে পড়েছিল।"

শব্দ করে হেসে উঠলেন পরাশরবাবু, বললেন, "তাও আপনি তবে মিস্ করেন নি। বেশ ঠিক আছে, বলুন মিসেস্ বকসী, তারপর কি হল?"

"কিসের পর?"

"বিয়ের পর।"

"বিয়ের পর আমি আবার মিস্ হয়ে গেলাম। মাত্র কিছুকাল ছিলাম মিসেস্— মিসেস্ হালদার। দেখুন, কত কথা আপনাকে বলে ফেললাম। এত কথা বলার জন্যে তো আসিনি আপনার কাছে। এসেছিলাম একটা কাজের জন্যে।"

"এটাও তো একটা কাজ। কাজের কথাই তো হচ্ছে!"

"এটা কাজের কথা মোটেও না। আপনি কি ঠিক করলেন?"

"ঠিক এত তাড়াতাড়ি কিছু হবে না। আগে সবার সঙ্গে কথা বলে নেব, তারপর যা হয় একটা-কিছু ঠিক করব। অনেককে আসতে লিখেছি।"

"তাই বুঝি? বেশ, তবে সব দেখে নিন্‌, তার পর যা হয় করবেন। আমি তবে চলি।"

পরাশরবাবু অদ্ভুত মানুষ। বাধা তিনি দিলেন না, বারণও করলেন না, অকপটভাবে একটু হাসলেন, বললেন. "তাড়া কিসের এত। ইস্কুল তো সেই এগারোটায়। মিস্টার হালদার এখন কোথায়? তাঁর সঙ্গে আলাপ করতে খুব ইচ্ছে করছে।"

সুবর্ণা বকসী বললেন, "আপনার কৌতূহল বড্ড বেশি।"

"তা ঠিক। ঐ নিয়েই বেঁচে আছি।"

কথায় কথা বেড়ে গেল। কৌতূহলী পরাশর পুরকায়স্থ চেয়ে রইলেন সুবর্ণার দিকে। মাঝে-মাঝে কেবল হুঁ দিয়ে যেতে লাগলেন। ঘড়ির কাঁটার দিকে আর তাকালেন না।

সুবর্ণা বকসীরা চার বোন। সে হচ্ছে মেজ। বড় বোনের বিয়ে হয়েছে, এখন কানাডায় আছে। স্টেট স্কলারশিপ পেয়ে তার হাজব্যান্ড সেখানে গিয়েছে বছর-তিনেক হল। তার নাম? তার নাম অপর্ণা।

সুবর্ণারও ঐ রকম বিয়ে হতে পারত। কিন্তু হল না।

তার বাবার নাম এখন সে আর প্রকাশ করতে চায় না। তিনি একজন নামকরা লোকই। তাঁর নাম শোনা মাত্র পরাশরবাবু তাঁকে না-ও চিনতে পারেন, কিন্তু একটু খোঁজ করলেই তাঁকে চিনতে পারবেন নিশ্চয়।

তার বাবা কেবল নামকরা লোকই না, বাবার পয়সাও অনেক, বাবার পজিশনও আছে সমাজে। যোগ্য পাত্র খুঁজে মেয়েদের বিয়ে দেবার যোগ্যতা যাকে বলে তাও তাঁর আছে। কিন্তু মেয়েই যদি বেকায়দার হয় তবে তার সঙ্গে পেরে ওঠা কোনো বাবারই সাধ্য নয়।

সুবর্ণা বেকায়দার হয়ে গিয়েছিল, সেইসঙ্গে হয়তো বোকাও।

হল কি, সে প্রেমে পড়ে গেল একটি ছেলের। ছেলেটা দেখতে-শুনতে ভালো, চালাক-চতুর। সুবর্ণার মনে হল, সে একজন মনের মতন মানুষই পেয়ে গিয়েছে। তার দিদির বর এর কাছে চেহারার দিক থেকে দাঁড়াতেই পারে না, স্মার্টনেসের দিক থেকে তো নয়ই।

ধরা যাক তার নাম মলয়। চমৎকার কথা বলতে পারত মলয়। তার একটা কথাও অবিশ্বাস করার উপায় ছিল না। অবিশ্বাস করা যেতই না। বরঞ্চ আরো বেশি করে বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করত। মনে হত, ছেলেটা বড় বিনয়ী, সব কথা যেন খুলেই বলতে চায় না।

এর সঙ্গে তার আলাপ হয়েছিল এক পিকনিক পার্টি উপলক্ষে।

সুবর্ণা তখন এম.এ. পড়ে। ইউনিভারসিটির জন-পনেরো মেয়ে মিলে চাঁদা তুলে বনভোজনে গিয়েছিল—কোনো বনে নয়—ব্যান্ডেলে। সেখানে তারা গঙ্গার কিনারে উনুন খুঁড়ে খুব মজা করে খিচুড়ি রাঁধছে। তারা সকলেই আনাড়ি, হাতা খুন্তি ধরার অভ্যেস তেমন নেই, নুনের আন্দাজও নেই। কিন্তু পিকনিক পিকনিকই, খাবারে স্বাদ এমন-তেমন হলে তাতে পিকনিকের স্বাদ বরঞ্চ বাড়েই, ঐ নিয়ে বেশ মজা করা যায়। রান্না নিয়েও তারা হৈহৈ করে মজাই করছিল।

অল্প-কিছু দূরে একটা ছেলের দলও এসেছে তাদেরই মতন মজা করতে!

পরাশরবাবু একটু বাধা দিয়ে বললেন, "বা, বেশ জমেছে তো! আর যদি নাও বলেন

তাহলেও আমি ধরে ফেলেছি। ঐ ছেলেদের দলে নিশ্চয় ছিলেন মলয়।"

"মোটেই না। এটা তো উপন্যাস নয়, উপন্যাসে ঐরকম ঘটে বটে। কিন্তু এটা জীবন।" নিশ্বাস ফেলে বলল সুবর্ণা।

ঐ ছেলের দলটা ছিল খুব ভদ্র। তাদের কাছ থেকে অনেক সাহায্য তারা নিয়েছিল। ওদের মধ্যের একজন এসে তাদের উনুনে কাঠ দিয়ে উনুনের আঁচ তুলে দিয়েছিল। খিচুড়ি পুড়ে যাবার দশা হলে আঁচ আবার কমিয়েও দিয়ে গিয়েছিল। কোন্ একটা টেকনিকাল স্কুল থেকে নাকি ওরা এসেছিল।

সুবর্ণাদের দলের সঙ্গে ওই দলটার বেশ আলাপ-পরিচয় হয়ে গেল। বিকেলের দিকে তারা ব্যান্ডেল স্টেশনে যখন ট্রেনের জন্যে অপেক্ষা করছে তখন সেইখানে হঠাৎ যার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল তার নাম মলয়—মলয় হালদার।

খুব আলাপী সে, ছেলেদের দলের সঙ্গে কিছুটা দূরে দাঁড়িয়ে খুব গল্প করছিল। আর সুবর্ণাদের দলের দিকে তাকিয়ে দেখছিল।

চেহারাটা ভালো। তার দিকে চোখ না পড়ে উপায় নেই। সুবর্ণারও চোখ পড়ল। কিন্তু তার মধ্যে কোনো বিশেষত্ব কিছু ছিল না। ট্রেনে যেতে-যেতে টেলিগ্রামের তারের উপরের ফিঙেটার দিকেও চোখ পড়ে, আবার জলার মধ্যে একপায়ে দাঁড়ানো বকধার্মিকের দিকেও তো চোখ পড়ে মানুষের।

তার পর তারা ট্রেনে উঠল। চলে এল হাওড়ায়। চলে গেল যে যার বাসায়। এক-দিনের একটা আনন্দ-অনুষ্ঠান, একদিনের একটা উল্লাস-উত্তেজনা স্মৃতিতে সবই ফিকে হয়ে এল দুচার দিনের মধ্যে। আবার চলল পড়াশুনা, আবার ইউনিভারসিটি।

দিন-দশ কেটে গেল। হঠাৎ একদিন প্রেসিডেন্সি কলেজের গেটের সামনে তার সঙ্গে দেখা। বেশ অন্তরঙ্গ হেসে সে বলল, "কেমন আছেন? চিনতে পারেন?"

চমকে উঠেছিল সুবর্ণা, চমকে উঠে তার দিকে চেয়ে তাকে চিনতে সে পেরেছিল, তবু কি বলবে ভেবে না পেয়ে বলেছিল, "কে বলুন তো?"

সে উত্তর দিল, "পরিচয় দেবার মত কিছু নেই। আপনাদের সেদিন দেখেছিলাম ব্যান্ডেল স্টেশনে। খুব স্ট্রাইকিং লেগেছিল আপনাকে। আজ দেখেই চিনে ফেললাম। আপনি আমাকে নিশ্চয় চিনতে পারেন নি? না পারারই কথা।"

কোনো জোর না, কোনো জুলুম না, কোনো অসৌজন্য না, বেশ অমায়িক আর ভদ্রভাবে কথা বলতে-বলতে সে চলল। বেশ নম্র আর বেশ বিনয়ী বলেই তাকে মনে হয়েছিল সুবর্ণার।

কথা বলতে-বলতে তারা এসে পেঁছিল ওভারটুন হলের কাছে। এখানে এসে সুবর্ণা দাঁড়াল, হাত তুলে নমস্কার করে বলল, "এবার তবে আসি?"

"নিশ্চয় আসবেন। বাস্-এ উঠবেন বুঝি? চলুন, বাস্-এ তুলে দিই।"

এই ভাবে মাঝে-সাঝেই তার সঙ্গে দেখা হয়ে যেত। দেখা হওয়া স্বাভাবিকও বটে। সেও এম.এ. পড়ে ঐ ইউনিভারসিটিতেই। কিন্তু এতদিন তা জানাই ছিল না। দুজনের সাবজেক্ট আলাদা, তাই ক্লাসে কখনো দেখা হয় না। দেখা হয় রাস্তাতেই।

একদিন দুপুরে ওরা দুজনে গিয়ে বসল ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের চত্বরে। প্রবল শীত তখন। সেদিনের রোদ্দুরটা এমন মিষ্টি লেগেছিল যে, আজ জীবন এত তিক্ত হওয়া সত্ত্বেও সেইদিনের রোদ্দুরের স্বাদটার কথা বেশ মনে আছে।

অমন মিষ্টি লাগার কারণ এও হতে পারে যে, জীবনের সেদিন একটা নতুন অভিজ্ঞতা,

একজন মনের মতন সঙ্গী সঙ্গে নিয়ে সেদিন প্রথম মনোহর কথার উদ্বোধন।

মলয় অনেক আক্ষেপ করতে লাগল, বলল, "এত আলাপ এত অন্তরঙ্গতা, কিন্তু সবই কেমন নিরর্থক দেখ।"

দিন দশ-বারোর মধ্যেই তারা সম্বোধনও পালটে ফেলেছিল।

সুবর্ণা সংক্ষেপে বলেছিল, "নিরর্থক কেন?"

মলয় অনেকক্ষণ চুপ করে থাকল, তার পর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলল, "আর ক'টা মাস আগেও যদি তোমার সঙ্গে দেখা হত, তবে হয়তো এমন হত না।"

কি ব্যাপার, কিছুই বুঝতে না পেরে সুবর্ণা মলয়ের মুখের দিকে চেয়ে রইল কিছুক্ষণ, তার পর বলল, "আমি কিন্তু কোনো কথারই মানে বুঝতে পারছিনে।"

মলয় বেশ অকপট ভাবে বলতে লাগল, সে আর এমন কী আহা-মরি একটা ছেলে। মাত্র তো এম.এ.-ছাত্র। ভবিষ্যতে রাজা হবে না উজির হবে, তার কোনোই ঠিক নেই। কিন্তু যে ঘরের ছেলে সে, সেটা যে মস্ত ঘর, তার বাবাও তো একজন এক্‌জিকিউটিভ এঞ্জিনিয়ার। তাই—

"তাই কি?"

মলয় বলল, "বুঝতে পারলে না তুমি? এত বোকা কেন?" বলে আদর করে সুবর্ণার হাতে একটা চিম্‌টি কাটল।

ঐ সামান্য চিম্‌টিতে সুবর্ণার কিছুই হয়নি, তবু সে আহ্লাদ করে মুখ দিয়ে শব্দ করে উঠল, "উঃ!"

মলয় একটা নিশ্বাস ফেলে বলল, "এইটুকুতেই উঃ! অত সহজে মূর্ছা যেতে নেই সুবর্ণা। অনেক বড়-বড় আঘাতের জন্যে তৈরি থাকতে হয়।"

মলয় সেদিন আর কোনো কথা বলল না। খুব বেশি কৌতূহল দেখাতেও সুবর্ণার খুব সংকোচ বোধ হল বলে সেও আর জিজ্ঞাসা করল না।

মাঠের রোদ সরে যেতেই বেশ শীত করতে লাগল সুবর্ণার। সেই অজুহাত দেখিয়ে সেদিনকার মত সে উঠতে চাইল। মলয়ও আর বাধা দিল না।

এর পর সুবর্ণা যেন কেমন হয়ে গেল। স্বপ্নেও সে কখনো ভাবে নি যে এরকম সে হয়ে যেতে পারে। কেমন-যেন উন্মনা হয়ে গেল সে। সব সময়ই তার মনে হত একজনের কথা। মলয়ের কথা। কত ভদ্র সে, কত বিনয়ী সে। এই বয়সের ছেলেরা তো নিজেকে খুব বড় মনে করে, নিজেদের সম্বন্ধে খুব একটা উঁচু ধারণা নিয়ে ঘুরে বেড়ায়।

সুবর্ণার মনে হয়েছিল, এটা বংশের গুণ। পারিবারিক পরিচ্ছন্ন আবহাওয়ার গুণ। অল্প কথায় তাদের বাড়ির যে পরিচয় সে দিয়েছে তার থেকেই আন্দাজ করা যায় কিরকম বাড়ির ছেলে সে। তার সম্বন্ধে ভাবতে ভাবতে সুবর্ণা সত্যিই তাকে ভীষণ ভাবে ভালো-বেসে ফেলল।

এই ভালোবাসার অনুভূতিটা একটা আশ্চর্য জিনিস। কথা দিয়ে সে কথা বোঝানো অসম্ভব। তানপুরার তারে আস্তে একটু আঙুল ছোঁয়ালে যে ভাবে মৃদু ঝংকারে কেঁপে ওঠে সেই তার, সুবর্ণার সর্বাঙ্গ সেই রকম কাঁপতে লাগল, এবং তার কানের মধ্যে ঝংকারের মতন শব্দ করে কি-যেন বেজে চলল দিনের পর দিন।

কখন ক্লাস আরম্ভ, কখন ক্লাস আরম্ভ—এই রকম অসহ্য ব্যস্ততায় তার সকাল আরম্ভ হত।

মাঝে তিন-চার দিন মলয়ের সঙ্গে দেখা হল না। খুব রাগ হল মলয়ের উপর। তার মনে হল, এবার দেখা হলে খুব রাগ করবে মলয়ের উপর।

কিন্তু আশ্চর্য, আবার যেদিন দেখা হল, সেদিন তার সব রাগ-উত্তাপ জল হয়ে গিয়েছে।

মলয় হাসতে-হাসতে এগিয়ে এসে বলল, "কেমন মজা। কেমন জব্দ। খড়গপুরে চলে গিয়েছিলাম না বলেই। বাবা ফোন করেছিলেন আমাকে না দেখে তাঁর মন কেমন করছে বলে, তাই—"

"খুব আদুরে ছেলে দেখছি।"

"তা একটু আছি। কেন, এতে অপরাধ কিছু হল নাকি?"

"না। অপরাধ আবার কি। আদর পাওয়া কি সবার ভাগ্যে ঘটে। যারা পায় তারা ভাগ্যবান্।"

গড়ের মাঠের যে নির্জন রাস্তাটিকে লাভার্স লেন বলে তারা গিয়ে সেই নিভৃতে বসল দুজন।

অনেক জড়তা এবং অনেক সংকোচ ইতিমধ্যে কেটে গিয়েছে তাদের দুজনেরই।

সুবর্ণা বলল, "সেদিন যে কথাটা বলতে-বলতে থেমে গিয়েছিলে, কী সেই কথাটা?"

"কোন্ কথা মনে পড়ছে না।" মনে না পড়ার ভান করল মলয়, সুবর্ণার মুখের দিকে অনেকক্ষণ চেয়ে থেকে সে বলল, "সুন্দর। বিউটিফুল।"

"কে? কি?"

মলয় সুবর্ণার হাত চেপে ধরে বলল, "তুমি।"

অনেকক্ষণ চুপ করে বসে রইল দুজন। এ কথার পর কে কি কথা বলবে তা কেউই ভেবে পেল না।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে মলয় বলল, "বাবার সঙ্গে কথা বলে এলাম। আভাসে বলেছি, খুলে বলিনি।"

"কিসের কথা?"

"বলব?" মলয় জিজ্ঞাসা করল, "কিছু মনে করবে না তো?"

বুকের ভিতরটা কাঁপতে লাগল সুবর্ণার, কি কথা মলয় বলবে, কে জানে তা। তবু বলল, "বলো-না, মনে করব কেন!"

মলয় বলল, "সেদিন বলতে গিয়ে থেমে গিয়েছিলাম। সেদিন বলেছিলাম আর কিছুদিন আগে তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে গেলে ভালো হত। তাই বোধ হয় হত।"

"কিছু বুঝতে পারছি নে আমি।" অধৈর্য গলায় বলেছিল সুবর্ণা।

মলয় একটু যেন শক্ত হয়ে বসল, বলল, "আমার বিয়ে।"

বুকের ভিতরটা হঠাৎ যেন শব্দ করে বেজে উঠল সুবর্ণার, দম নিয়ে সংক্ষেপে বলল, "কবে?"

"দিন ঠিক হয়নি, তবে পাত্রী রেডি। পাবনা জেলার নাম শুনেছ? এখন তা পাকিস্তানে। সেখানকার সুসুঙ্গের রাজবাড়ির মেয়ে। আমি দেখিনি, কিন্তু শুনেছি মেয়েটি দেখতে নাকি অপূর্ব সুন্দরী। বাবা নাকি তাদের কথা দিয়ে দিয়েছেন।"

দম বন্ধ করে সব কথা শুনে গেল সুবর্ণা। একটা কথার উত্তর দিল না। অনেকক্ষণ পরে বলেছিল, "কি কথা হল বাবার সঙ্গে?"

"বলে এলাম, এখন না। এম.এ. পাস করি, চাকরি-বাকরি করতে আরম্ভ করি, তারপর।

কিন্তু বাবা ধমক দিয়ে বললেন, “চাকরির ভাবনা তোমার না। আমি আছি। তা ছাড়া, চাকরি তোমাকে করতেই হবে, এমন কী কথা আছে?” মলয় চুপ করল।

সুবর্ণা আর-একটু সময় চুপ করে বসে থেকে বলেছিল, “চলো এবার উঠি।”

“খুব আঘাত দিলাম বুঝি? এত অল্পেই অমন কাবু হতে নেই সুবর্ণা। সামান্য চিমটিতেই যে মেয়েরা উঃ বলে, তাদের নিয়ে কী-যে করব তাই ভাবছি।”

সুবর্ণার পিঠে হাত বুলিয়ে মলয় বলল, “ভেবো না। সব ঠিক হয়ে যাবে। ব্যবস্থা একটা-কিছু করতেই হবে। আমিই তাঁর একমাত্র ছেলে কি না, তাই তাঁর এত টান। আর, তার উপর সুসুঙ্গের এখন যিনি রাজা তিনি বাবার অনেক কালের বন্ধু কি না, তাই সেই বন্ধু-কন্যার উপর এমন মমতা।”

যে মলয় এত নিকটের, যে তার অন্তরঙ্গ এত ঘনিষ্ঠ কাছে বসে আছে, তাকে হঠাৎ অনেক দূরের অনেক তফাতের বলে তার মনে হল। মনে হল, মলয়ের মতন ছেলেটি বুঝি তার নাগালের অনেক বাইরে।

“কি করব বলো তো?” জিজ্ঞাসা করল মলয়।

“যা তোমার ইচ্ছে।”

“ইচ্ছে? আমার ইচ্ছে তোমাকে বিয়ে করি। কি বলো?”

সুবর্ণা উত্তর দেয় নি। অনেক পিড়াপিড়িতে সে কেবল বলেছিল “জানি নে।”

মাস-তিনেকের মাত্র আলাপ, মলয় যা বলেছে সব বিশ্বাস করে সুবর্ণা ঝাঁপ দিল। সে বিয়ে করল মলয়কে। বাবা-মার কোনো বাধা সে মানল না। আসলে, সুবর্ণার বিয়ের ব্যবস্থা তার বাবা করেই রেখেছিলেন। পড়ার বাধা না ঘটিয়ে এম.এ. পাস করার পরই বিয়ে দেবেন বলে পাকাপাকি সব ব্যবস্থাই করে রাখেন। কিন্তু বাবার মুখ হাসিয়ে, মায়ের চোখে জল ফেলিয়ে একদিন সে চলে এল সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে। কার সঙ্গে কোথায় গেল, তাও জানিয়ে এল না।

পরাশরবাবুর মুখের দিকে চেয়ে সুবর্ণা বলল, “ঠিকই বলেছিল মলয়। সত্যিই আমি বোকা।”

পরাশরবাবু বললেন, “কেন, বোকা কেন!”

“সব মিথ্যা, সব ফাঁকি।”

বিয়ের দিনই তার ধোঁকা লেগেছিল। কিন্তু তখনো ঠিক ধরতে পারে নি। ম্যারেজ রেজিস্ট্রারের আপিস থেকে বেরিয়েই মলয় বলল, “এখন কোথায় যাওয়া যায়?”

“তোমাদের বাসায় চলো!”

“তা হয় না।”

“তবে খড়্গপুরে তোমার বাবার কাছে চলো।”

মলয় হেসে বলল, “তিনি খড়্গহস্ত হয়ে আছেন। সেখানে যাওয়া অসম্ভব।”

“তবে, আগে থেকে জায়গার কথা ভেবে রাখলে ভালো করতে, মলয়।”

মলয় বলল, “এখন আমি আর মলয় না, আমি তোমার স্বামী। তুমিও সুবর্ণা না, তুমি আমার স্ত্রী। স্ত্রীদের উচিত স্বামীর উপর নির্ভর করা। এসো।”

একেবারে চুপ করে গেল, একেবারে স্তব্ধ হয়ে গেল সুবর্ণা। তার ঠোঁট ঈষৎ কাঁপতে লাগল। দাঁত দিয়ে আলগোছে ঠোঁটে কামড় দিয়ে নিজেকে সংযত করার চেষ্টা করতে

লাগল সে।

পরাশরবাবু বললেন, "তারপর।"

"আজ আর না। এবার চলি। আরও তো অনেককে ডেকেছেন, তাদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে পেরে উঠব কি না জানিনে। যদি পারি, ডাকবেন, আসব। তখন যদি আপনার কৌতূহল থাকে, বলব সব কথা। যদিও বলার মতন নয় সে-সব। আর না, উঠি। আপনারও সময় হয়ে এল, দশটা প্রায় বাজে।"

সুবর্ণা উঠবার জন্যে প্রস্তুত হল। কিন্তু পরাশরবাবু তাকে বিদায় দেবার জন্যে একটুও প্রস্তুত হলেন না। কেবল বললেন, "এখনো পাঁচ-সাত মিনিট বাকি আছে কিন্তু।"

"তা থাক্‌। ওইটুকু সময়ে এই দীর্ঘ কাহিনীটা বলা যাবে না।"

"পাঁচ-সাত মিনিট সময় কিন্তু কম না", পরাশরবাবু বললেন, "বলতে জানলে এই সময়ের মধ্যে মহাভারতের গল্পটাও চট্‌ করে সংক্ষেপে সেরে ফেলা যায়।"

পরাশরবাবুর কথা শুনেও সুবর্ণা চুপ করে আছে দেখে তিনি বললেন, "মলয় তো ডাকল, এসো। কোথায় গেলেন তার সঙ্গে?"

শিউরে ওঠার মত নড়ে বসল সুবর্ণা, বলল, "জাহান্নামে। সেই রাস্তায় সে নিয়ে গেল আমাকে।"

মলয়ের বাকি সব মিথ্যা, সব ফাঁকি। ইউনিভারসিটির ছাত্র সে আদপেই ছিল না। আদপে লেখাপড়াও সে নাকি বেশি দূর করেনি। কিন্তু কী আশ্চর্য, তার কথা শুনে, তার চালচলন দেখে কিছু বুঝবার উপায় ছিল না। সে সময়ে তার সম্বন্ধে কোনো রকম খোঁজ করার কথাই ওঠে না। গোপনেই তার সঙ্গে সুবর্ণার দেখা হত, সব ব্যাপারটাই তাই গোপন রাখতে হয়েছে। এই সুযোগ সে নিয়েছে পুরোপুরিই। প্রথমে নিয়ে গিয়েছিল টেরিটি বাজারের এক বিরাট ব্যারাক-বাড়িতে। তার তিনতলার একটা আধা-অন্ধকার ঘরে নিয়ে গিয়ে তাকে ওঠালো। সংক্ষেপেই বলছে সুবর্ণা। সেখান থেকে হাওড়ার শালকিয়ায়। সারাদিন সুবর্ণা একা থাকে। মলয় কোথায় বেরিয়ে যায়। কখনো ফিরত সন্ধ্যাবেলা, কখনো অনেক রাত্রে। ফেরার সময় বড়-বড় ঠোঙায় করে নিয়ে আসত খাবার। কখনো-কখনো কিছু টাকাও।

অবাক হয়ে মলয়ের মুখের দিকে সে চেয়ে থাকত। বাবা-মা'র জন্যে মন কেঁদে উঠত। কিন্তু তাঁদের কাছে ফিরে যাবার সব রাস্তা তখন বন্ধ।

এইভাবে কেটে গেল মাস-তিনেক। এর মধ্যে মলয়কে কিছুটা সে চিনেছে। কিন্তু সত্যিই যে চিনেছে তা বিশ্বাস করতেও তার বাধত।

তারপর মলয় তাকে নিয়ে এল কলকাতায়।

আসার আগে বলল, "না, এত কষ্ট করে থাকা যায় না। তোমাকে কত কষ্টই দিলেম আমি সুবর্ণা। আমাকে মাপ করো। বিডন স্ট্রীটের কাছে ভালো একটা ফ্ল্যাট জোগাড় করেছি। এবার একটু আরামে থাকা যাবে।"

সুবর্ণা সত্যিই বোকা, সত্যিই বোকা। মলয়কে একটু সে চিনতে পেরেছিল বলে মনে করেছিল, কিন্তু তার ঐ কথা শুনে ঐ কথাগুলোকে আবার সে বিশ্বাস করে ফেলল।

বিডন স্ট্রীটের পাশেই একটা গলির মধ্যে দোতলার একটা ফ্ল্যাটে উঠে এল।

একটা সিগারেট ধরিয়ে কায়দা করে নাকি বসল মলয়, বলল, "আমি তোমার স্বামী। স্বামীকে মেনে চলা সব স্ত্রীরই কাজ, এটা নিশ্চয় জানো?"

একটু থেমে বলল, "আমার এক বন্ধু আসবে আজ। তাকে খাতির যত্ন কোরো।"

স্বামীকে মেনে চলার সঙ্গে বন্ধুকে খাতির যত্ন করার মধ্যে যোগ কোথায় তা ধরতে পারল না সুবর্ণা। তবু সে বলেছিল, "আচ্ছা।"

নিত্য নতুন বন্ধু আসতে লাগল মলয়ের।

ইতিমধ্যে সব বুঝে ফেলেছিল সুবর্ণা। পরাশরবাবুও নিশ্চয় সব বুঝতে পেরেছেন, সুবর্ণা তাই এ-বিষয়ে আর বেশি-কিছু বলতে চায় না।

দিন-কয়েক এই রকম বন্ধুর সমাগম দেখে সুবর্ণা একদিন দুপুরবেলা সেই যে পালিয়েছে, আজ পর্যন্ত মলয়ের সঙ্গে আর দেখা হয়নি। এবং দেখাও আর হবে না নাকি। একটা নিশ্বাস ফেলল সুবর্ণা।

কত বছর নষ্ট করে বছর-তিনেক হল সে পাশ করেছে এম.এ.। নিজেকে লুকিয়ে রেখে, নিজেকে বাঁচিয়ে রেখে কিভাবে তার সেই দীর্ঘ সময়টা কেটেছে সেটা এক কুরুক্ষেত্রের কাহিনী। তার জীবনের মহাভারত সে সংক্ষেপে সারতে চায়। তাই কথাগুলো সে আর ফেনিয়ে-ফাঁপিয়ে বলতে ইচ্ছে করছে না।

ট্রেনে যেতে-যেতে রিসড়া-কোন্নগরের কাছে মাঠের মধ্যে খোলার চালার কলোনি দেখা যায়। মলয় নাকি ছিল ওই কলোনির একজন বাসিন্দে। ট্রেনে-ট্রেনে দৌরাত্ম্য করাই ছিল তার ব্যবসা। তাদের মস্ত দল। ভদ্রলোক সেজে তারা ঘুরে বেড়ায়। ট্রেনযাত্রীদের দামী-দামী জিনিসপত্র লুঠ করে চম্পট দেয়। এই ছিল তাদের কাজ।

সুবর্ণা বলল, "কি, অমনভাবে তাকাচ্ছেন যে, বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি?"

"বিশ্বাস করতে পারছিনে", পরাশরবাবু বললেন, "কিন্তু ব্যাপারটা যদি সত্যিই হয়ে থাকে তাহলে বলতে হবে প্রাণে বেঁচে গিয়েছেন, এটা মস্ত কথা। ভীষণ পাল্লায় পড়ে গিয়েছিলেন তো!"

"এখনো আছি ঐ পাল্লাতেই। ওরা আমার পিছু ছাড়ে নি। ওরা লেগেই আছে পিছনে—"

একটু থেমে সুবর্ণা বলল, "তাই একটু আশ্রয় চাই। একটু নিরাপদ জায়গা পেলে বেঁচে যাই।"

পরাশরবাবু বললেন, "আপনার বাবার পরিচয়টা জানাবেন?"

"উঁহু। তাঁকে অনেক অমান্য করেছি, আর তাঁর সম্মানহানি করতে চাইনে।" সুবর্ণা চোখের কোণ পরিষ্কার করে নিল।

"এই ভয়ংকর একটা গ্যাং, এদের হাত থেকে আপনি যে নিজেকে রক্ষা করে চলেছেন, এটা আপনার মনের জোরই কেবল না, আপনার সাহসেরও—"

"এ রকম সুখ্যাতি অনেকে করে। কিন্তু প্রশংসায় আমার আর কাজ কি! মুখের কথা দিয়ে আমার কি কাজ বলুন। কাজের কাজই যদি না হল, তবে কথায় আর কাজ কি। আপনার এত বড় বাড়ি, অত বড় গাড়ি, আপনার এত অজস্র টাকা। কিন্তু সেই গাড়ি-বাড়ি-টাকার মতন মনটাও যদি বড় না হল তাহলে আমাদের মতন সামান্য মানুষদের ভরসা কোথায়?"

মেয়েটা খুব ভালো কথা বলতে পারে তো! এত বিপদের মধ্যে দিয়ে, এত সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে, এভাবে নিজেকে চালিয়ে নিয়ে আসা সত্ত্বেও শরীরে একটু টোল পড়েনি, কপালে একটু ভাঁজ পড়েনি, এটা আশ্চর্য কথাই। তার উপর রুচিটাও বেশ বাঁচিয়ে রেখেছে।

উৎকট আতিশয্য এতটুকু নেই তার সাজে, সুন্দরভাবে নিজেকে সাজিয়ে এনেছে পরিচ্ছন্ন সজ্জায়।

কিছুক্ষণ সুবর্ণার দিকে চেয়ে থেকে পরাশরবাবু নেভা চুরুটটা মুখে তুলে নিলেন, সেটা ধরালেন। ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, "মলয়কে খুঁজে বার করব আমি, তার ডেরার হদিশ তো পেয়ে গেলামই। দ্যাট্ স্কাউন্ড্রেল, দ্যাট্ রোগ্। একটা ভদ্রলোকের মেয়ের এই সর্বনাশ করল সে!"

একটু উত্তেজিতই হয়েছেন পরাশরবাবু। কিন্তু সুবর্ণার মধ্যে এতটুকু উত্তেজনা নেই, ঠাণ্ডা হয়ে বসে ঠাণ্ডা গলাতেই সে বলল, "তাকে আর পাবেন কোথায়?"

"কেন, ওই রিসড়া-কোন্নগর—"

সুবর্ণা ম্লান হেসে বলল, "তার সঙ্গে আর দেখা হবে না, বললাম যে আপনাকে একটু আগে। খবরের কাগজ বুঝি পড়েন না? আমি রোজ পড়ি খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে।"

"কাগজে কি আছে?"

"খবরের কাগজে যা থাকে—খবর।" সুবর্ণা একটু দম নিয়ে বলল, "আমি যেদিন আপনাকে দরখাস্ত লিখি, তার তিন দিন আগের কাগজ দেখবেন। হিন্দ্ মোটরস্ স্টেশনের কাছে একটা হাতঘড়ি ছিনতাই করে চলন্ত ট্রেন থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ে পালাতে গিয়ে উল্টো দিকের একটা ট্রেনের তলায় পড়ে—"

কথা শেষ করল না সুবর্ণা। উঠে দাঁড়াল, হাতব্যাগ তুলে নিল। বলল, "আসি। নমস্কার। যদি করুণা হয়ে থাকে খবর দেবেন।"

পর্দা তুলে দরজা পার হয়ে চলে গেল সুবর্ণা। দেয়ালঘড়িতে ঠংঠং করে দশটা বাজল। একেবারে চমকে দিয়ে চলে গেল সুবর্ণা বকসী।

সামান্য কিছুক্ষণ চুপ করে বসে ছিলেন পরাশরবাবু। তারপর গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে পড়লেন। আর দেরি করা চলবে না। এবার যেতে হবে আপিসে। আজ অনেক কাজ আছে। কানপুরে টেলিগ্রাম করতে হবে। বম্বেতে ট্রাঙ্ক কল। কেপ অব গুড হোপ হয়ে যে কার্গো শিপ আসছে বম্বে পোর্টে তাতে তাঁর অনেক মাল আসছে। সেগুলি খালাস করেই পাঠাতে হবে কানপুরে। ফ্যাক্টরিকে সময়মত কাঁচামাল জোগান দিতে না পারলে— ইশ, উল্টো দিকের ট্রেনের তলায় পড়ে—

সুবর্ণা তাহলে বিধবা! দেখে কেমন কুমারী মনে হচ্ছিল।

সারাদিন কাজের মধ্যে ডুবে থাকা সত্ত্বেও মাঝে-মাঝেই ঐ এক কথা তাঁর মনে হতে লাগল। ইতিমধ্যে সুবর্ণার দরখাস্তের তারিখটা দেখে তার তিন দিন আগের কাগজটা বের করে দিতে নির্দেশ দিলেন তিনি আপিসকে।

কাগজটা তিনি পেলেন। প্রথম পাতা থেকে শেষ পাতা পর্যন্ত তিনি তন্ন তন্ন করে খুঁজলেন। কিছু পেলেন না। হাল ছেড়েই দেবেন ভাবছেন এমন সময় পয়লা পাতার নীচের দিকে খুব ক্ষুদে অক্ষরে হেডিংবিহীন একটা ছোট খবরে চোখ পড়ল। ঠিক, হিন্দ্ মোটরস্, তার কাছেই, হ্যাঁ, ঘটেছে বটে একটা ঘটনা। লোকটার নাম মলয় হালদার।

বার-কয়েক খবরটা পড়লেন পরাশর পুরকায়স্থ। মনটা বেশ ভারি হয়ে উঠল।

এমন-একটা ঘটনা ঘটে গেল কলকাতা শহরে, কিন্তু খবরের কাগজে তার কোনো খবর নেই। হিন্দ্ মোটরসের ঐ দুর্ঘটনার কথা ভাবছেন না পরাশরবাবু; তিনি ভাবছেন সুবর্ণার জীবনের ঘটনাটার কথা।

ঘটনাটা বিশ্বাস করতেও ইচ্ছে করছে তাঁর, আবার তখনই বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করছে না কেন যেন। যাই হোক, ঠিকানা তো তাঁর জানা। তিনি ছাড়বার পাত্র নন, এ'কে তিনি তাঁর কাজে বহাল করুন বা না-করুন, ওর খোঁজ একবার তিনি করবেনই। সত্যিই যদি বিপন্ন সে হয়ে থাকে, তাহলে একটা ব্যবস্থার কথাও তাঁকে ভাবতে হবে। অমন একটি মেয়েকে একেবারে অসহায় অবস্থায় ফেলে রাখা নিশ্চয় ঠিক হবে না।

কিন্তু না। এখনও অনেক কাজ তাঁর বাকি। আপিসের কাজ তো আছেই, কিন্তু সে কাজের কথা তিনি ভাবছেন না। এখনও অনেকের আসার কথা আছে। আজ মাত্র সোমবার, এই শনিবার পর্যন্ত প্রোগ্রাম ঠাসা। সেই কথাই ভাবতে লাগলেন পরাশরবাবু।

স্নেহময়ী সেন

বয়সের দিক থেকে একেবারে ঠিক। চল্লিশের মতনই বয়স হবে। টালিগঞ্জ থেকে আসছেন স্নেহময়ী সেন।

এখন বিকাল ছয়টা। দিনের আলো একেবারে ফুরিয়ে যায় নি। চিলেকোঠার উপরে উঠে দাঁড়িয়েছে দিনের শেষ রোদ্দুর।

শীতের ছয়টা হলে এখন গাঢ় অন্ধকার হয়ে যেত। কিন্তু এটা শরৎকালের সোনালি রোদের শেষ প্রহর। এ রোদে তেমন তাপ নেই, কিন্তু এ রোদের একটা বর্ণ আছে।

স্নেহময়ী সেন এই রোদের চেহারা নিয়ে উপস্থিত। শরৎকালের মাজা রোদের মতন মার্জিত তাঁর চেহারা।

কিন্তু স্বাস্থ্যবতী নন। দেখে মনে হয় কর্মঠ হতে পারেন।

পরনে সাদা থান। মাথায় সাদা সিঁথি। গায়ের রং কিন্তু তেমন সাদা নয়।

অনেক উঁচু থেকে গভীর কূপের মধ্যে তাকালে তার জল যেমন অদ্ভুত স্তব্ধ দেখায়, স্নেহময়ীর চোখ যেন তেমনি স্থির গভীর ও স্নেহার্দ্র।

দারিদ্র্য নাকি মানুষের অবয়বে থাকে না, থাকে আচরণে। স্নেহময়ী দরিদ্র কি না সেটা পরে জানা যাবে, কিন্তু তাঁর আচরণে কিছুটা আভিজাত্য আছে।

এই কাজের জন্যে তিনি এসেছেন। সব জেনেশুনেই তিনি এসেছেন। চিঠি লেখার আগে অনেক ভেবে দেখেছেন। ভেবে দেখেছেন, কী আর হবে? নিজে যদি শক্ত থাকা যায় তাহলেই যথেষ্ট। নিজের উপর পরিপূর্ণ বিশ্বাস রাখতে পারলেই হল, তাহলে কেউই কিছুতেই টলাতে পারবে না।

খুলনা জেলার কালিয়া নামকরা গ্রাম। সেই গ্রামের নামকরা ঘরের তিনি বধূ।

বড়-বড় ঘরে যা-সব কাণ্ড থাকে, তার আকারও মাপমত বড়ই থেকে থাকে।

স্নেহময়ী সেনের বড় জা ছিলেন তাঁর সতীন। কথাটা বলাও ভালো না, কথাটা শুনতেও খারাপ। এ কথা নিজেদের পরিবার-পরিজনদের মধ্যে খোলাখুলিভাবে বলা চলে না বটে, কিন্তু কথাটা কখনো কোথাও বলা উচিত না, এমন তো নিয়ম থাকা ঠিক না। কাজের সময় কাজের কথা বলে ফেলাই ভালো। স্নেহময়ী বলেই ফেললেন।

এ কথা বলার জন্যে তিনি আসেন নি। এ কথা তাঁকে বলে ফেলতে হবে, তাও তিনি ভাবেন নি। কিন্তু জিজ্ঞাসার জবাব দিতে-দিতে তিনি এমন-এক জায়গায় এসে পৌঁছে গিয়েছিলেন যে, তারপর আর পিছিয়ে যাওয়া চলে না। আর, যে কথা নিয়ে খোলাখুলি

ভাবে কেউ আলোচনা না করলেও যে কথা সকলেরই জানা, একটা অচেনা-অজানা মানুষের কাছে সে কথা বললে কার কী এসে যায়?

যাঁকে নিয়ে এই ঘটনা, তিনিও তো ইহলোকে আর নেই। তাঁর গায়েও আর দাগ লাগবে না।

খুব ফুর্তিবাজ মানুষ ছিলেন স্নেহময়ীর স্বামী। আনন্দ করতে তিনি জানতেন। স্নেহময়ী প্রথম যখন বধূ হয়ে এলেন তখন তিনি এসে পৌঁছলেন, যাকে তাঁর এখনো মনে হয়, একটি আনন্দ-নিকেতনে।

কিন্তু, কোন কবিতায় কবে যেন তিনি পড়েছিলেন একটা কথা—প্রফুল্লকমলে কীট। ঐ কথাটা বার-বারই তাঁর মনে পড়ে। সেই আনন্দ-নিকেতনে তাঁর জন্যে এতবড় একটা নিরানন্দ যে লুকিয়ে ছিল, তা ছিল তাঁর কল্পনারও বাইরে। ঐ কীট তাঁকে দংশে দংশে কুরে-কুরে খেতে লাগল।

তিনি আজ বিধবা। কিন্তু তাঁর জা আগের মত এখনো সধবাই। স্নেহময়ীর ভাশুর এখনো জীবিত আছেন।

তিন বছর বয়সের একটি ছেলে যখন তাঁর কোলে তখন তাঁর স্বামী মারা গেলেন। স্বামী যেমনই হোন, তবু তিনি ভরসা তো বটেই। সে আজ বিশ বছর আগের কথা।

সে একটা স্মরণীয় বছর। ঐ বছর ভারতবর্ষ স্বাধীনতা পায়। ঐ বছরই দ্বিখণ্ডিত হল বঙ্গদেশ।

কালিয়ার বাস ত্যাগ করে কলকাতায় চলে এল তারা সকলে। টালিগঞ্জে জমি নিয়ে বাড়ি বানানো হল। সেই বাড়ি থেকেই আজ এখানে এসেছেন স্নেহময়ী সেন।

আজ এই প্রথম তিনি একা বের হয়েছেন। কলকাতার পথঘাট তাঁর তেমন চেনা না। কিন্তু ধর্মতলা স্ট্রীটের নাম তাঁর জানা। প্রতিবেশীদের কাছ থেকে তিনি কথায়-কথায় জেনে নিয়েছেন কোন্ বাস্-এ উঠে কোন্ দিক দিয়ে এখানে আসা যায়। কত অন্ধ মানুষও তো আছে সংসারে, তারাও তো পথ চলে। স্নেহময়ীর তো চোখ-দুটো অন্তত আছে, তিনিই-বা তবে পথ চলতে কেন পারবেন না—এই বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে তিনি চলে এলেন, এবং পেয়েও তো গেলেন বাড়িটা।

তাঁর বড় জা'র নাম জয়ন্তী। অল্প কথা বলেন, অল্প হাসেন। বুদ্ধি বেশ ধারালো। তাঁর মনের কথা বোঝা কঠিন।

স্নেহময়ীর যখন এই দশা হল তখন তাঁর মনে হয়েছিল যে, জয়ন্তীর স্নেহ এখন এসে পড়বে তাঁরই উপর। যাঁকে নিয়ে রেষারেষি, তিনিই যখন চলে গেলেন, তখন নিশ্চয় বিরোধের আর-কোনো বিষয়ই থাকবে না। কিন্তু ফল হল বিপরীত।

জয়ন্তীর যন্ত্রণায় তিনি পাগল হয়ে উঠলেন। তাঁর ইচ্ছে হল, তিনি আগুনে ঝাঁপ দিয়ে, জলে ডুবে, বিষ খেয়ে যেভাবেই হোক, এই যন্ত্রণার হাত থেকে পরিত্রাণ চান। কিন্তু তা তিনি পারেন নি যার জন্যে, সে হচ্ছে মাধব।

"মাধব কে?" জিজ্ঞাসা করলেন পরাশরবাবু।

"আমার ছেলে।"

বলতেও সংকোচ হয়, টালিগঞ্জের বাড়ির তিনি বধূ অবশ্যই, কিন্তু আসলে তাঁর যা পরিচয় দাঁড়াল তা হচ্ছে—

বাড়ির ঝি ছাড়িয়ে দিলেন জয়ন্তী। বাড়ির যাবতীয় কাজ করতে হত স্নেহময়ীকে।

মাধব তখন শিশু। তাকে কোলে নিয়ে একা-একা তিনি সংসারের সব কাজ করে যেতেন মুখ বুজে। জয়ন্তী দেবী তখন শুয়ে শুয়ে পাশ-বালিশের উপরে পা তুলে দিয়ে রেডিয়োর গান শুনতেন।

স্নেহময়ীর পিঠের উপর উপুড় হয়ে দাঁড়িয়ে থাকত মাধব, আর তিনি কলের নীচে বাসনের কাঁড়ি নিয়ে একে-একে সেগুলি মাজতেন। মাজতেন আর ভাবতেন, মাধব বড় হলে তার মায়ের এই দুঃখ ঘোচাবে।

টালিগঞ্জের বাড়ির উপরে তাঁরও দাবি আছে। কালিয়ার বাড়ি বিক্রি-করা টাকা দিয়েই এ বাড়ি তৈরি।

জমিদার তাঁরা। কিন্তু এখন আর জমিদারি নেই বটে, কিন্তু জমিজমা বেচা টাকা আছে ব্যাঙ্কে জমা। সেই টাকা ভেঙে-ভেঙেই সংসার চলছে। তবে, স্নেহময়ীকে গলগ্রহ বলা কেন। তাঁর ভাশুরও তো কিছুই করেন না। জয়ন্তীই বা তবে গলগ্রহ নয় কেন।

কিন্তু এসব কথা তুললে কথাই বাড়বে, অশান্তিই বাড়বে, কাজের কাজ কিছু হবে না। এইজন্যে ওসব কথা নিয়ে কোনো আলোচনা না করে স্নেহময়ী মাধবকে বড় করে তোলার জন্যে চেষ্টা করতে লাগলেন।

সংসারের কাজ তো সংসারের বধূরাই করে, সুতরাং তিনিও করছেন—নিজেকে এই-ভাবে প্রবোধ দিয়ে তিনি মুখ বন্ধ করে বছরের পর বছর টেনে গিয়েছেন সংসার।

"কিন্তু জানেন? আর পারলাম না। তাই বেরিয়ে পড়েছি। কাজকর্ম আমি ভালোই জানি। একটা শিশুকে লালন-পালন করে সেবা-শুশ্রূষার অভ্যাসও আছে। তাই বলছি, কোনো অসুবিধে হবে না। আপনার কাজ আমি করতে পারব।"

স্নেহময়ীর কথা শুনে পরাশরবাবু কোনো উত্তর দিলেন না। তিনি চুপ করে বসে রইলেন।

একটু পরে বললেন, "তা, পারবেন না কেন। এটা এমন-কিছু কঠিন কাজ না। আমিও বেশ সুস্থ আর হয়তো সবলও। শয্যাশায়ী রুগীও নই যে, আমাকে নিয়ে হিমশিম খেতে হবে।"

যেন অনেকটা ভরসা পেয়ে গিয়েছেন স্নেহময়ী, এইভাবে তিনি তাকালেন পরাশর-বাবুর মুখের দিকে। পরাশরবাবু তখন চুরুট ধরাচ্ছিলেন।

ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, "কিন্তু আমি মানুষটা কেমন তাও তো আপনাকে জেনে নিতে হবে!"

"তা জানতে যাব কেন, আপনি যাকে কাজ দেবেন তাকে যাচাই করে দেখার অধিকার আপনার। আমি এতক্ষণ যা বললাম তা বিশ্বাস করেছেন তো?"

পরাশরবাবু হেসে উঠলেন, বললেন, "কেন, বিশ্বাস না করব কেন। কিছু নিশ্চয় বানিয়ে বলেন নি।"

"না। বানিয়ে বলতে আর পারলাম কই।" স্নেহময়ী তাঁর মাথার কাপড় একটু টেনে নিয়ে চোখ নীচু করে বসলেন, বললেন, "কিছু বানিয়ে বলব ভেবেই এসেছিলাম। কিন্তু কথা বলতে-বলতে সব কি রকম যেন হয়ে গেল। আর বানাতে পারলাম না। সব বলে ফেললাম একে-একে।"

পরাশরবাবু কি রকম মানুষ তা জানার চেষ্টা তিনি নাকি করতে রাজি না। তাঁর ধারণা, ও জিনিস জানা যায় না। যতই চেষ্টা করা যাবে ততই অন্ধকার হাতড়ে মরতে হবে।

তাঁর স্বামীর কথা তিনি বলেছেন। তিনি আনন্দ করতে জানতেন। মানুষকে আনন্দে রাখতেও জানতেন। অথচ, কিজন্যে যে স্নেহময়ীর জীবনের যাবতীয় আনন্দ তিনি কেড়ে নিলেন, তা জানা গেল না।

তাঁর জা জয়ন্তী তাঁর স্বামীর প্রায়-সমবয়সী। স্নেহময়ীর চোখেরই দোষ কিনা তা তিনি বলতে পারবেন না, কিন্তু জয়ন্তীর চেহারা খুবই সাধারণ; কথা তো তিনি কমই বলেন, সুতরাং কথা দিয়ে মুগ্ধ করারও তেমন কথা না। একে রোগা, তার উপর বেঁটে-খাটো দেখতে।

তাঁর স্বামীর রুচি ছিল। জমিদারির আয় বেশ ভালোই ছিল। সেইজন্যে বিশেষ-কিছু কাজকর্ম তাঁকে করতে হত না। কিন্তু সব সময়ই তিনি বেশ ব্যস্ত থাকতেন। কালিয়ার সকলে তাঁকে ভালোবাসত। অনেক রকম কাজ নিয়েই তিনি মেতে যেতেন; অথচ কোনো কাজেই তিনি ডুবে যেতেন না।

স্বামীর নাম করতে নেই। সেইজন্যে তাঁর নাম তিনি আর উল্লেখ করতে পারছেন না। এমন হওয়াও কিছু অস্বাভাবিক নয় যে, তাঁর নাম করলে এ আমলেও কেউ-কেউ তাঁকে চিনতে পারবেন। কালিয়া গ্রামের মানুষ তিনি, কিন্তু গ্রাম্য মানুষ তো তিনি ছিলেন না। শহর-কলকাতার সঙ্গে তাঁর খুব যোগ ছিল। ছবি-আঁকার শখ তাঁর ছিল, কলকাতার অনেক আর্টিস্টের সঙ্গে সেই সূত্রে তাঁর যোগও ছিল; থিয়েটার করতেন; শিকার করতেন। কী না করতেন তিনি? রাজপুত্রের মত চেহারা ছিল তাঁর।

স্নেহময়ী হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে গেলেন। তাঁর চোখের দু কোণ ভিজে উঠল। হয়তো তাঁর মনে হল যে, তিনিও তো রাজমহিষীর মর্যাদা নিয়েই এসেছিলেন, অথচ, অথচ—আজ তিনি একটা সামান্য কাজের জন্যে এইখানে দ্বারস্থ হয়েছেন।

পরাশর ঠিক যেন সান্ত্বনা দিলেন না, সামান্য একটু সহানুভূতি জানালেন, বললেন, "পুরনো কথা ভেবে মন খারাপ করাটা কিন্তু ঠিক হচ্ছে না। প্রত্যেকের জীবনেই পুরনো অধ্যায় একটা থাকে। কিন্তু সে অধ্যায়ের দিকে তাকালে কষ্ট-ই কেবল পেতে হয় অযথা।"

একটু থেমে পরাশর বললেন, "আমি ভাবছি অন্য কথা—"

চমকে ওঠার মত মাথা তুলে তাকিয়ে স্নেহময়ী বললেন, "অন্য কি কথা ভাবছেন আপনি?"

"ভাবছি। কাজটা তো ছোট কাজ। আপনার মতন একজন মানুষকে এই রকম কাজে নেওয়াটা—"

বিষণ্ণতার সঙ্গে সামান্য বিরক্তি মিশিয়েই বুঝি উত্তর দিলেন স্নেহময়ী, বললেন, "তাহলে সত্যি কথাগুলি আমাকে দিয়ে বলিয়ে নিলেন কেন। আপনি চান কাজের লোক, আপনি লোকের কাজ নিয়েই নিশ্চয় তার বিচার করবেন। সে কে, কোথা থেকে সে এল—এসব বিচার করলে সত্যিকারের যোগ্য লোক আপনি তো বেছে নিতে পারবেন না। আমি অপারগ হয়ে এসেছি, আমার একটা কাজ চাই-ই।"

চিন্তিত হয়ে বসে রইলেন পরাশরবাবু। নিজেকে তিনি বিপন্নও বোধ করতে লাগলেন। অথচ তাঁর মনে হল—বিজ্ঞাপনে তিনি তাঁর যা-যা চাহিদা জানিয়েছেন, তার বেশির ভাগই এঁর কাছ থেকে তিনি পাবেন মনে হচ্ছে—ইনি সুরুচিসম্পন্ন, উনি কর্মঠও মনে হচ্ছে, সুশ্রী তো বটেই। বয়সের দিক থেকেও তো ইনি আদর্শই, পরাশরবাবু যেমনটি চেয়েছেন ঠিক তাই। অন্তত দেখে তো তাই মনে হচ্ছে।

এখনো আরো অনেকের সঙ্গে তাঁর দেখা করার কথা আছে, সেইজন্যে পাকাপাকি কিছু স্থির তিনি করতে পারছেন না বটে, কিন্তু এই মহিলাকে তাঁর বেশ পছন্দ হয়েছে। মায়া-মমতা যাকে বলে, তা তো একটু চাই-ই। এ'র চোখমুখে সেই মমতার মায়া যে আছে পরাশরবাবু তা দেখে নিয়েছেন।

পরাশরবাবুর মনের নিভৃতেও যে আর-একটা মন আছে, সে মনের চাহিদা একটু মলিন। তাঁর জীবনেও অনেক ঘটনা ঘটে গিয়েছে, অনেক অঘটন ও দুর্ঘটনাও। সে-সব কথা হঠাৎ মনে পড়ে গেল তাঁর। হঠাৎ বেশি করে মনে পড়ে গেল রেঙ্গুনের সেই জিজি'র কথা। তার পুরো নামটা এখন তিনি উচ্চারণ না'ই করলেন। সে নাম আর উচ্চারণ করারও দরকার নেই।

নিজের কথা হঠাৎ মনে পড়ে গেল পরাশরের। সত্যি, বড় নিষ্ঠুর তিনি। নিজেকে যতই সদাশয় ও সহৃদয় বলে তিনি মনে করুন, আসলে মানুষটা হয়তো তিনি ভালো না। তিনি নিজেকে নিজে যতটা জানেন, অন্য কারো পক্ষে তাঁকে ততটা জানা সম্ভব না। হঠাৎ তাঁর মনে পড়ে গেল রেঙ্গুনের কথা। সেই কতকাল আগে তিনি সেখানে গিয়েছিলেন, তারপর আর গেলেন না, আর কোনো খোঁজও রাখলেন না। এমন যারা করে, তারা নিষ্ঠুর!

অথচ, নিষ্ঠুর হবার তাঁর এতটুকু ইচ্ছে নয়। তা যদি হতে চাইতেন, তাহলে এক্ষুনি তিনি বিদায় দিয়ে দিতে পারতেন এই মহিলাটিকেও। অথচ, তা তিনি পারছেন না। তাঁর মনে হচ্ছে, ঠিক এইরকম একজনকেই যেন তাঁর দরকার। কিন্তু এর চেয়েও তো উপযুক্ত আরও কেউ এসে যেতেও পারেন, সে লোভও আছে পরাশরের। এ'কে তিনি লোভ বলবেন, না, লালসা বলবেন তা তিনি এখনি ভেবে পেলেন না।

পরাশরবাবু এবার অন্য কথা জিজ্ঞাসা করলেন, বললেন, "লেখাপড়া কতদূর করেছেন?"

"রামায়ণ-মহাভারত পর্যন্ত।"

উত্তর শুনে পরাশরবাবু হেসে উঠলেন, বললেন, "গৃহস্থঘরের বধূরা ওটুকু তো পারবেনই। আমি বলছিলাম ইস্কুল-কলেজের কথা।"

সে-সব উল্লেখযোগ্য না। আর, সে কথার উল্লেখও তো বিজ্ঞাপনে ছিল না, তা যদি থাকত তাহলে স্নেহময়ী তা পরিষ্কার করে লিখেই দিতেন।

পরাশরবাবু স্নেহময়ীর দরখাস্তটির উপর চোখ বুলিয়ে নিলেন, তারপর বললেন, "ব্যবসার খাতিরে বাইরে-টাইরে যেতে হতে পারে। হয়তো সব জায়গায় কেবল বাংলা কথা দিয়ে কাজ না চলতে পারে, এইজন্যে জিজ্ঞাসা করছিলাম আর-কি। তাছাড়া, হঠাৎ একটা জরুরি চিঠি এসে গেল—"

স্নেহময়ী বললেন, "কিছু মনে করবেন না। আপনি তো চেয়েছেন গৃহরক্ষিকা, কিন্তু এখন যে কাজের কথা বলছেন তা তো দেখছি প্রাইভেট সেক্রেটারির। আর, বাইরে গেলে কেবল বাংলা কথায় কাজ চলবে না কেন, কথা তো বলব আপনার সঙ্গে।"

পরাশরবাবু হাসতে জানেন, এ কথা শুনে তিনি হেসে উঠলেন, বললেন, "তা ঠিক। বিদেশে গিয়ে পড়লে আমি নিশ্চয়ই বাংলা ভুলে যাব না?"

পরাশরের কথা শুনে স্নেহময়ীও হেসে ফেললেন।

না, অদ্ভুত পরিচ্ছন্ন দাঁত তো! মুক্তার সঙ্গে তুলনা করে বেশি বাড়াবাড়ি করতে চান না পরাশরবাবু, কিন্তু ঐ দাঁতের পরিচ্ছন্নতা মাত্র এক মুহূর্তের জন্যে দেখতে পেয়ে

তিনি বুঝি মুগ্ধই হয়ে গেলেন। যে ভদ্রলোক অত ছবি আঁকতেন, অত নাটক করতেন, তাঁর রুচি অবশ্যই ছিল, কিন্তু লোকটা কি এই মহিলাটির দিকে ভালো করে নজর দেন নি?

"তাঁকে জয় করে ফেলেছিলেন জয়ন্তী। আমি তাঁর নজরের বাইরে ছিলাম।" মুখের হাসি মুছে ফেলে স্নেহময়ী বললেন।

রাজপুরুষের মত যাঁর চেহারা, রাজপুত্রের মত যাঁর আচরণ, তাঁর মন যে অমন দরিদ্র ছিল, আগে তা জানা যায় নি। তিনি এক সামান্য মহিলাকে নিয়ে অসামান্যভাবে মেতে রইলেন। তাঁর সম্মুখে যে তাঁর পরিণীতা ভার্যা ধীরে-ধীরে একজন দাসীতে পরিণত হয়ে চলেছে, তাও তাঁর চোখে পড়ল না।

অসাধারণ ক্ষমতা ঐ জয়ন্তী দেবীর—একথা স্বীকার করতেই হবে। তিনি তাঁর স্বামীকে বশে রেখেছেন, এবং তাঁর স্বামীর ভ্রাতাটিকেও করতলগত করেছেন। এই ঘটনা নিয়ে কত কানাকানি হয়েছে, কত জানাজানি হয়েছে ঘটনাটি, কিন্তু এতে এতটুকু বিচলিত কেউ হয় নি। ওদের মনের জোরও বলতে হবে। সত্যিই ওরা নমস্য।

পনেরো বছর বয়সের একটি মেয়ে ঐ অতবড় একটা বাড়ির বধূ হয়ে গেল। তার চোখে তখন কত স্বপ্ন, কত কল্পনা। সব মুছে গেছে, সব উহ্য হয়ে গিয়েছে। পঁচিশ বছর ধরে সেই যন্ত্রণা টেনে নিয়ে চলেছে। আত্মহত্যাও করা হল না।

"বাধা হয়ে দাঁড়াল মাধব।"

বাধা হয়ে সে দাঁড়াল বটে, কিন্তু সে-ই তো হল তাঁর জীবনের ভরসাও। যখন সে হাঁটতে শিখেছে তখন থেকে সংসারের যাবতীয় কাজের সে হয়েছে সহায়। মাধব, এটা এনে দে, ওটা এগিয়ে দে; মাধব, কাক বসেছে রে, তাড়িয়ে দে; জ্যেঠিমা কি বলছেন শুনে আয় রে, মাধব—ইত্যাদি খুঁটিনাটি ফরমাশ খেটে বেড়াত মাধব।

"আমরা দুটি মাত্র প্রাণী কাজ করতাম ঐ বাড়িতে। আমাদের দুজনের উপরেই নির্ভর করে থাকত বাড়ির যাবতীয় লোক।"

মাধব ধীরে-ধীরে বড় হয়ে উঠতে লাগল। এতে আরো সাহায্য হল স্নেহময়ীর।

কনকনে শীতের রাত্রেও মাধব থাকত তার মায়ের পাশে। সমস্ত বাড়ির কাজ সেরে শুতে যেতে অনেক রাত হত স্নেহময়ীর। মাধবকে লেপের তলায় চেপে-চুপে শুইয়ে দিয়ে তিনি বসেছেন কলতলায় বাসনের কাঁড়ি নিয়ে। বাসন মাজার শব্দ শুনে ঐ লেপের নীচ থেকে মাধব উঠে এসেছে। তাকে বাসনে হাত দিতে দেন নি স্নেহময়ী। কিন্তু বাসন ধোওয়ার সময় তাকে আটকানো যায় নি, জল ঢেলে দিয়েছে। জল ঢালতে গিয়ে হাত-পা ভিজিয়েছে, হিহি করে কেঁপেছে, তবু মাকে সে একা ছেড়ে দেয় নি। কিন্তু তারই সমবয়সী ছেলে সে বাড়িতে আরও ছিল, তারা তখন অকাতরে ঘুমচ্ছে।

সে এক অসহনীয় অবস্থা। কিন্তু এর কোনো প্রতিকার নেই, এর থেকে নিস্তারের কোনো উপায় নেই বলেই সব মেনে নিতে হয়েছে। অবস্থাটা স্নেহময়ীর অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল বলে তিনি তাঁর নিজের সম্বন্ধে বিশেষ কিছু ভাবতেন না, কিন্তু মাধবের কথা ভেবে তাঁর কান্না পেত। বার-বারই মনে হত, তার বাবা যদি বেঁচে থাকতেন তাহলে যত দুর্দশাই স্নেহময়ীর হোক, মাধবের নিশ্চয় এ দুর্গতি হত না।

কিন্তু কী যে হত, আর কী যে হত না—সেসব কথা এখন ভাবা ছেড়ে দিয়েছেন স্নেহময়ী সেন।

রাত্রে মায়ের গায়ের সঙ্গে এঁটে শুয়ে কত গল্প করত মাধব। বড় হয়ে কত কী সে

করবে, মাকে নিয়ে চলে যাবে কত দূরের দেশে।

মাধবের ঐসব কথা শুনে স্নেহময়ীর স্বপ্ন ও কল্পনা আরো রঙিন হয়ে উঠত, আরো উজ্জ্বল হয়ে উঠত। ছেলের মাথায় হাত বুলিয়ে তিনি বলতেন, "শিগ্‌গির শিগ্‌গির বড় হ, মাধব।"

বিছানা থেকে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে মাধব বলত, "এই দ্যাখো, কত বড় হয়েছি, মশারির চালে হাত দিচ্ছি।"

চিৎ হয়ে শুয়ে ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে বুক ফুলে উঠত স্নেহময়ীর।

একটা নিশ্বাস ফেলে পরাশর স্নেহময়ীর দিকে চেয়ে বললেন, "স্বাভাবিক, স্বাভাবিক। বুক ফুলে ওঠারই কথা।"

কাঁধের উপর থেকে আঁচল টেনে গা একটু ঢেকে বসে স্নেহময়ী বললেন, "মাধব ক্রমেই বড় হয়ে উঠতে লাগল। আমার আশাও বড় হয়ে উঠতে লাগল সেইসঙ্গে।"

এমন ধৈর্য ধরে কেউ কখনো কোনোদিন শোনেনি স্নেহময়ীর কথা। আজকে এমন সহিষ্ণু শ্রোতা পেয়ে স্নেহময়ীর মনের সব আগল যেন খুলে গিয়েছে। অপরিচিত একজন পুরুষের সামনে বসে তিনি অকপটে সব কথা বলে চলেছেন। যে রকম ঘরের বধূ বলে তিনি নিজের পরিচয় দিয়েছেন, তাঁর পক্ষে অজানা অচেনা জায়গায় এসে অপরিচিত একজন মানুষের সামনে বসে এত কথা বলা অস্বাভাবিকই। কিন্তু চাপে পড়লে মানুষের স্বভাব তো বদলায়। নিজেকে বদল করে নেওয়া ছাড়া তাঁর আর উপায় কি। তিনি তো পরিপূর্ণভাবে নিজেকে অন্যরকম করে নেবার জন্যেই আজ এখানে এসেছেন।

"কিন্তু জায়গাটা কেমন, এত বড় বাড়িতে একজন পুরুষ মানুষের সঙ্গে একা থাকা শোভন হবে কিনা, ভেবে দেখেছেন তো?"

পরাশরবাবুর একথা শুনে স্নেহময়ী কিছুক্ষণ ভাবলেন। তারপর বললেন, "লোকে কি বলবে, তাই না? লোকের কথার ভয় আমার ভেঙে গিয়েছে। অনেক কথা রটানো হয়েছে আমার নামে। যিনি আমার জীবনের সব অশান্তির মূলে, তিনি কী-না বলেছেন আমার নামে?"

"এসবও বলেছেন বুঝি?"

"বলেন নি? তাঁর তো কোনো কাজ নেই। কুড়ে মানুষের কাজই তো হচ্ছে অন্যকে জ্বালানো-পোড়ানো। সেসব ঘেন্নার কথা থাক্‌।"

"থাক্‌। কিন্তু এতবড় বাড়িতে একা থাকাটা আপনি নিরাপদ বলে মনে করেন তো?"

"সেটা নির্ভর করবে আমার উপর।"

"নিজের উপর এতটা বিশ্বাস দেখে ভালো লাগল।"

"ধন্যবাদ।"

পরাশরবাবু ক্রমেই যেন প্রলুব্ধ হয়ে উঠছেন, ক্রমেই যেন সরাসরিভাবে সব কথা বলে বসতে ইচ্ছে করছেন। কিন্তু হঠাৎ কোন্‌ কথার ফল কিরকম দাঁড়িয়ে যাবে তা আন্দাজ করতে না পেরে চুপ করে যাচ্ছেন, আর স্নেহময়ীর মুখের দিকে তাকাচ্ছেন। অবশেষে বললেন, "আপনার মতন স্ত্রী পেয়েও তিনি যোগ্য মর্যাদা দিতে পারলেন না, তাঁকে হতভাগ্যই বলব।"

"তা, যা-খুশি বলুন। সব পুরুষ মানুষেরই ঐ দশা। স্ত্রীর প্রাপ্য মর্যাদা কেউই কি দিতে পেরেছে? কিছু মনে করবেন না, আপনার স্ত্রী কেমন ছিলেন জানিনে, আপনিও

কি তাঁকে ঠিক মর্যাদা দিতে পেরেছেন? বোধহয় পারেন নি। আপনি কাজের লোক, কাজ নিয়েই হয়তো আপনাকে ব্যস্ত থাকতে হয়েছে। ইচ্ছে করে অমর্যাদা করেছেন বলছিনে, কিন্তু ঘটনাচক্রে হয়তো করতে হয়েছে।"

একথা শুনে পরাশরবাবু একটু যেন চমকে উঠলেন। তাঁর হঠাৎ মনে হল স্নেহময়ীর কথাটা মিথ্যে না হতেও পারে।

স্নেহময়ী বললেন, "কোনো স্বামী স্ত্রৈণ হয়ে যায়, কোনো স্বামী শাসক হয়ে যায়, কোনো স্বামী উদাসীন হয়ে যায়—মেয়েদের পক্ষে কোনোটাই সম্মানের নয়। স্বামীকে হতে হবে স্বামী, সব দিকের মাত্রা বজায় রেখে। এমন স্বামী ভূভারতে ক'জন আছেন জানিনে। আমার বরাতটা অবশ্য অন্যরকম—একটু বেশি রকম আলাদা, তাই আমার কথা নিয়েই আজ এত কথা হল। আমার অদৃষ্টের জন্যে দায়ী আমার ভাশুর।"

"কি রকম, কি রকম?" একটু ঝুঁকে বসলেন পরাশরবাবু।

"তিনি না স্ত্রৈণ, না উদাসীন, না শাসক, না শোষক। আজও তিনি বেঁচে আছেন একটা জীবন্ত মাংসপিণ্ডের মত। অমন মানুষের স্ত্রীর পক্ষে যা করা সম্ভব তা তিনি করেছেন, এবং এখনও—"

"থাক্, আর শুনতে চাইনে।"

"তাই। ও কথা থাক্।"

জয়ন্তীর উপরে কোনো রাগ নেই স্নেহময়ীর। কিন্তু স্নেহময়ীর উপরে জয়ন্তীর এত আক্রোশ কেন, আজও তা ভেবে পাননি স্নেহময়ী।

"আপনি অত্যন্ত ভালোমানুষ দেখছি।" পরাশর বললেন।

স্নেহময়ী হেসে বললেন, "এত তাড়াতাড়ি চিনে ফেললেন? আপনি তো এতক্ষণ এক-তরফা বক্তব্য শুনলেন, অন্যপক্ষের কথা শুনলে হয়তো দেখবেন সব ব্যাপারটাই অন্য-রকম।"

পরাশরবাবু বললেন, "না, না। সে কথা বলছি নে। যে অবস্থার কথা শুনলাম তাতে মনে হচ্ছে, এর মধ্যে মানুষের ভালো থাকাই কঠিন। নষ্ট হয়ে যাবার কথা।"

স্নেহময়ী ম্লান হাসলেন, "আমি যে নষ্ট নই সেকথা জানলেন কি করে! আমার মুখের কথা শুনে আমাকে বিশ্বাস করছেন। অন্যের মুখেও আমার কথা শুনে নিলে তবে তো বিচার ঠিক হবে। আমি মেয়ে, তবু বলছি—মেয়েরা না পারে এমন কাজ নেই, মহৎ কাজও যেমন করতে পারে, ঘৃণিত কাজও করতে পারে তেমনি।"

পরাশরবাবু হঠাৎ বলে ফেললেন, "তার প্রমাণ তো আপনি।"

"কি রকম?" মাথার কাপড় একটু সরিয়ে সোজা হয়ে বসে স্নেহময়ী দেবী ঈষৎ গর্জনের সুরে বললেন, "কি রকম?"

পরাশরবাবু বুঝলেন ব্যাপারটা। তবু বিচলিত না হয়ে স্থির হয়ে বসে বললেন, "বধূর জীবন একটা মহৎ জীবন, পরিচারিকার কাজ ঘৃণিত কাজ। আপনি তো—"

"বুঝেছি। আমি বুঝেছি সেই মহৎ জীবনের কোনো দাম নেই।"

"আর, এরই কি কোনো দাম আছে মনে করেন?"

"নিশ্চয় আছে। আমি এর জন্যে মজুরি পাব, আশ্রয় পাব—সেইটেই এর দাম।"

পরাশরবাবু একটু আশ্চর্য হয়ে গিয়েছেন। এই অল্প সময়ের মধ্যে স্নেহময়ী একেবারে আলাদা সুরে আলাদা মেজাজে কথা বলতে আরম্ভ করেছেন। প্রথম যখন কথা

আরম্ভ করলেন তখন চেহারা ছিল এক রকম, এখন যেন তার একটু পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে!

বৃথাই নাকি তিনি এত কায়ক্লেশে জীবন কাটালেন। বৃথাই নাকি তিনি একটা ভরসায় ভর করে ছিলেন। তাঁর সব আশা সব স্বপ্ন সব কল্পনা ধূলিসাৎ হয়ে গিয়েছে।

আর ভালো হয়ে থাকবার ইচ্ছে তাঁর নেই, আর ভালোমানুষ হয়ে থাকতে তিনি চান না। তিনি এখন অন্যরকম হয়ে যেতে চান, আলাদা রকমের একটা জীবন চান। যে জীবনে মর্যাদার কোনো প্রশ্ন থাকবে না, প্রত্যাশার কোনো আলেয়া থাকবে না। যে জীবনে স্বপ্ন নেই, কল্পনা নেই, আশা নেই, আশ্বাস নেই।

স্নেহময়ী বললেন, "জীবনে যা ঘটে ঘটুক। আপনি আমাকে নিন্।"

এ কথার কোনো উত্তর দিতে পারলেন না পরাশরবাবু। কেবল স্নেহময়ীর মুখের দিকে চেয়ে রইলেন।

স্নেহময়ী বললেন, "মাধব চলে গিয়েছে। আমাকে ছেড়ে চলে গিয়েছে।"

"কি বললেন? সে ইয়ে—"

"না। সে মরে গেলে এত কষ্ট পেতাম না।" একটু দম নিয়ে স্নেহময়ী বললেন, "অনেক কষ্টে তাকে মানুষ করেছিলাম। অনেক ইচ্ছে ছিল তাকে ঘিরে। তার দিকে চেয়েই বেঁচে ছিলাম।"

টালিগঞ্জে তাঁদের বাড়ির একটু দূরে একজন কাঠমিস্ত্রির এক বউ ছিল। কবে থেকে, কখন থেকে, কি যে হয়েছে কিছুই নাকি তিনি জানতেন না। তিনিও জানতেন না, কেউই জানত না।

"সেই বউটাকে নিয়ে সে পালিয়ে গেছে। আমাকে একটা চিঠি লিখে জানিয়ে গেছে. সে আর আসবে না।"

কাপড়ের নীচে জামার মধ্যে হাত দিয়ে স্নেহময়ী একটা চিঠি বের করলেন, "এই চিঠিই আমার এখন সম্বল। এই দেখুন।"

পরাশরের হাতে চিঠিটা দিয়ে স্নেহময়ী পাথরের মূর্তির মত বসে রইলেন।

প্রসন্নময়ী বিশ্বাস

খুব তৈরি হয়ে এসেছে প্রসন্নময়ী। সাজের ঘটা আছে খুব। কিন্তু এই সজ্জায় তাকে দেখতে কেমন হয়েছে, সে বিষয়ে বোধহয় তার কোনো বোধ নেই। কেমন যেন অদ্ভুত দেখাচ্ছে তাকে। সাজ যেন শরীরের উপর আলগোছে বসিয়ে রাখা হয়েছে, শরীরের সঙ্গে খাপ খেয়ে বসেনি।

অনেকটা জগদ্ধাত্রী মূর্তির মত দেখতে। অন্তত তার দিকে চেয়ে পরাশরবাবুর সেই রকমই মনে হল। একটা মাটির মূর্তির গায়ে অনেক রঙের পোঁচ দেবার পর তার গায়ের উপর কাগজের শাড়ি এঁটে দিয়ে, ডাকের সাজ দিয়ে সেই মূর্তি ঢেকে নিলে যেমন দেখায়, প্রসন্নময়ী বিশ্বাস অনেকটা যেন সেই রকম দেখতে। কিন্তু একটু তফাৎ আছে, জগদ্ধাত্রীর মুখে মাখানো থাকে হলুদ রং, প্রসন্নময়ীর মুখে কালো রং মাখানো। কিন্তু তার মুখের রংটা আসলে মাখানো রং নয়, ঐটেই তার আসল রং, ঐটেই তার গায়ের রং।

চল্লিশের বেশি বয়স হবে, পঁয়তাল্লিশও হতে পারে। কিন্তু শরীরে বাঁধন আছে। শরীরটা বেশ মজবুত। এবং একটু বুঝি রসস্থ। চেহারাটা ঢলঢলে না, একটু বুঝি

টলটলে।

মুখের আদল দেখে বয়সের আন্দাজ পাওয়া যায়। কিন্তু ঐ মুখের উপর একটা কচি ও কাঁচা মুখ বসিয়ে নিলে সমস্ত শরীরের চেহারাই বদলে যেতে পারত। শারীরিক গঠনে বয়সের কোনো ছাপ পড়েনি।

মাথায় অজস্র চুল। পিছন দিকের খোঁপার পরিমাণ দেখেই কেবল চুলের পরিমাপ করতে হচ্ছে না। মাথাটি সিঁথি দিয়ে দুভাগ করে দুপাশে অজস্র চুল ফেঁপে আছে। সিঁথিটা যেন সিঁথি না, সে যেন আগুনের শিখা—সিঁদুরের মোটা রেখা দিয়ে তা ভরাট করা। কপালের মাঝখানে রক্তজবা-রঙের মস্ত সিঁদুর-ফোঁটা। ঠোঁটে পানের দাগ, কিছুক্ষণ আগে ঐ দাগ হয়তো লালই ছিল, এখন তার রং চকোলেট বর্ণ ধারণ করেছে।

সেই রক্তাভ ঠোঁটে ঈষৎ হাসি খেলিয়ে প্রসন্নময়ী দেবী দুই হাত একত্রে বললেন, "নমস্কার।"

স্তব্ধ হয়ে তার মুখের দিকে চেয়ে প্রতি-নমস্কার করলেন পরাশরবাবু, ধীর গম্ভীর স্বরে বললেন, "বসুন।"

"এই চেয়ারে বসব?"

পরাশরবাবু ইশারা করলেন, হ্যাঁ।

চওড়া লাল পাড়ের উপর জরির রেখা দেওয়া শাড়িতে। সাধারণভাবে পরা সেই শাড়ি। আনকোরা পাট ভাঙা বলে শাড়িটা বেশ ফুলে আছে। পিঠের উপর থেকে দুই কাঁধ বেয়ে নেমে এসেছে মিহি গেরুয়া রঙের সিল্কের ওড়না। সিঁথিটা বাঁচিয়ে মাথার মাঝখান পর্যন্ত চওড়া পাড় দুই কানের পাশ দিয়ে ফিতের মতন নেমে এসেছে।

চেয়ারে বসে পরাশরবাবুর দিকে প্রসন্ন দৃষ্টিতে চেয়ে সে বলল, "আমার নাম প্রসন্নময়ী, প্রসন্নময়ী বিশ্বাস।"

"হ্যাঁ। জানি।"

"জানেন বুঝি? আমার নাম শুনেছেন বুঝি?"

পরাশরবাবু সম্মুখের দরখাস্তটির দিকে চেয়ে একটু হাসলেন।

প্রসন্নময়ী বলল, "চিঠি দিয়েছি কবে! উত্তরই আসে না, উত্তরই আসে না। চাতকিনীর মত চেয়ে থাকি আশাপথ পানে। আপনি আমাকে আজ এই উচ্চ আসনে বসতে দিলেন, আজ আমার কী ভাগ্য।" চেয়ারের চকচকে হাতলে হাত রেখে প্রসন্নময়ী বেশ আরাম পেল, বেশ আনন্দও পেল বলে মনে হল যেন।

পরাশরবাবুরও আনন্দ অবশ্যই লাগছে, মজাও লাগছে বেশ। খুব মন্দ হয় না। এই রকম একজন মহিলাকে তিনি যদি বেছে নিয়ে তাঁর পরিচর্যার ভার এর উপরে দেন।

সিঁথিতে সিঁদুর আঁকতে আর কপালে ফোঁটা পরতেই এর অনেক সময় লেগে যাবে বটে, কিন্তু অমন সময় কার না লাগে! যারা ঠোঁটে রং মাখে, গালে গোলাপি আভা ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করে—সেসব কাজে তাদেরও তো সময় খরচ খুব কম হয় না।

কিন্তু সে কথা এখন থাক্।

"সেই কালনা থেকে আসছেন বুঝি এখন?"

তা নাকি আসছে না প্রসন্নময়ী। এই সকালে কি অত দূর থেকে এসে পৌঁছনো সোজা।

"কাল বিকেলের গাড়িতে এসে পৌঁছেছি। আগাম এসে গেলাম এই কলকাতা শহরে। ভারি ভালো শহর, তাই না। মৌমাছির মত মানুষের ঝাঁক চারদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে, উড়ে

বেড়াচ্ছে।" একটু দম নিয়ে অল্প একটু হেসে, কাপড়ের পাড় দিয়ে ঠোঁটের কোণ একটু মুছে প্রসন্নময়ী বলল, "চারদিকেই মধু কিনা, মধুর ভাণ্ড!"

একটু হেসে পরাশরবাবু বললেন, "তাই বুঝি? আমরা তো থাকি এই শহরে, কিন্তু মধু তো দেখিনে কোথাও।"

"বুঝেছি।" প্রসন্নময়ী বলল, "তাই বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছে কাগজে।" বলেই সে একটু হাসল।

কি উত্তর দেবেন তা বুঝেই পেলেন না পরাশরবাবু। কিছুক্ষণ পরে বললেন, "মধুর সঙ্গে বিজ্ঞাপনের সম্পর্ক এল কোথা থেকে।"

"ঐ হল। যেখানে বঁধু, সেখানেই মধু। বঁধু চাই মানেই মধু চাই। কেমন কিনা। বলুন-না একবার ভেবে!"

পরাশর ভেবেচিন্তে একথার কি উত্তর দেন তা শোনার জন্যেই হয়তো প্রসন্নময়ীর চোখের সুপ্রসন্ন দৃষ্টি পরাশরের মুখের উপরে আটকে রইল কিছুক্ষণ। কিন্তু কোনো উত্তর না পেয়ে একটু আশ্চর্যই হল সে। লোকটার প্রাণে কোনো রস-কষ আছে কিনা সে সম্বন্ধেই বুঝি তার মনে সন্দেহ জাগল।

প্রসন্নময়ী বেশ সপ্রতিভ। পরাশরকে চুপ করে থাকতে দেখেও সে চুপ করল না, বলল, "আপনি বুঝি কথা কম বলেন। আমাদের রসের নাগরটিরও মুখে কথা নেই, আছে কেবল বাঁশি।"

পরাশর চমকে উঠলেন, এ কী কথা বলছেন এই মহিলাটি।

পরাশরকে চমকে উঠতে দেখে প্রসন্নময়ীর মুখে হাসি ফুটল, বলল, "আমার কথা বুঝি প্রেত্যয় হল না? আমি বলছিলাম কানুর কথা। কানু-বিনে গীত নাই, কিন্তু কেউ কখনো শুনেছে কানুর মুখে কোনো কথা? অধরে মুরলী ধরি/নধর গঠন মরি/আমি সখী প্রাণে মরি বাঁশির স্বরে/এই-যে বাঁশির ধ্বনি, সেই ধ্বনিই তো আমাদের সব। তার মুখেতে নাহিক রা/বাঁশি বাজে রাধা রাধা/ভাঙিব কুলের বাধা, রব না ঘরে/আমরাও চাই ঘর ভাঙতে, কিন্তু ঘর ভাঙা কি সহজ কথা? আমরা তা পারিনে। কেমন কিনা বলুন?"

পরাশরের সব কথা বুঝি ফুরিয়ে গিয়েছে, তাঁর আর কিছু বলার নেই। কিন্তু চাপা-গলায় গুনগুন করে এই যে দু কলি এ গাইল, তা তো নেহাৎ মন্দ লাগল না পরাশরের। গলা বেশ সাফ আছে। গলায় সুরও আছে বেশ। গান-টান তবে একটু-আধটু জানে বুঝি? কিন্তু গান তো জানে কতজনই, এমন অচেনা অজানা জায়গায় এসে কিছু না বলতেই নিঃসংকোচে এভাবে গান শুনিয়ে দিতে পারে—এ তো মজা মন্দ না।

এর কাছে কাজ কেমন পাওয়া যাবে সে সম্বন্ধে সন্দেহ থাকতে পারে, কিন্তু ক্লান্তি দূর করার জন্যে—বিশেষ করে মানসিক ক্লান্তি দূর করার জন্যে—এরকম একটা লোক হলে নেহাৎ মন্দ বোধহয় হয় না। পরাশরের রুচি নিয়ে অনেকে নানা কথা বলতে হয়তো পারে, কিন্তু এমন সঙ্গিনীতে কারও বিশেষ অরুচি না থাকতে পারে, এমনই তো মনে হয় পরাশরের। রংটা যা একটু কালো, মুখটা যা একটু বয়স্ক—এছাড়া এর সর্বাঙ্গে আর কোনো ত্রুটি আছে বলে মনে হচ্ছে না।

পরাশর এতক্ষণে কথা বললেন, বললেন, "গান করা অভ্যাস আছে বুঝি?"

"কি করে জানলেন?"

"এই যে এক্ষুনি গাইলেন একটু!"

প্রসন্নময়ী একটু হাসল। হাসামাত্র তার মুখ অনেকটা অন্য রকম দেখাল, অনেকটাই কমবয়স্ক দেখাল। বলল, "ওটা কি গান? গান আর গাইলাম কই। একটু গুন্‌গুন্‌ করলাম মাত্র। মধুকরেরা যেমন গুন্‌গুন্‌ করে। তারা কি গান গায়? গায় না।"

পরাশর বলেই বসল, "আপনি তবে নিজেকে মধুকর বলে মনে করেন বুঝি?"

"আমি কিছু মনে করিনে। লোকে তাই বলে বটে।"

পরাশর এবার শব্দ করে হাসলেন, চুরট নিয়ে নাড়াচাড়া করলেন, বললেন, "লোকে তবে ঐ কথা বলে? আমি তবে ভুল কিছু বলিনি?"

পরাশরের মতন বিচক্ষণ লোক ভুল বলবে কেন। বয়স যখন তাঁর হয়েছে, জীবনে অভিজ্ঞতাও তাহলে নিশ্চয় আছে, অনেক অভিজ্ঞতাই আছে, অনেক রকম অভিজ্ঞতাও। মানুষও নিশ্চয় কম দেখেননি, কেবল পুরুষমানুষ কেন, মেয়েমানুষও। সুতরাং কারা ভিমরুল, কারা মৌমাছি—তা আর তিনি জানবেন না?

প্রসন্নময়ী বলল, "আপনার কাছে কাজ করতে এসেছি বটে, কিন্তু এমন কাজ আগে কখনো করিনি। আগে করিনি বলেই এমন কাজ করতে পারব না কেন! পারব বলে বিশ্বাস আছে বলেই এসেছি। মেয়েরা না পারে কোন্‌ কাজ, বলুন। সব পারে তারা।"

"কি করতেন তাহলে আগে?"

"করতাম মাধুকরী। করতাম বলছি কেন, এখনো তাই করি। জীবন তো কাটাতে হবে। জীবন তো এমনি কাটে না।"

পরাশর বললেন, "তবে তো গান করার অভ্যাস আছে। একদিন শুনতে হবে গান।"

এ আবার কি কথা বলছেন এই ভদ্রলোক? একদিন কেবল শুনতে হবে কেন, প্রসন্নময়ী রোজই শোনাতে পারবে। একজন জ্যান্ত মানুষকে দেখাশোনা করতে কত আর সময় যাবে। সারাটা দিনই তো থাকবে পড়ে, সেই সারাদিনের মধ্যে যখন তিনি ফরমাশ করবেন তখনই খুলবে সে তার গলা। এটা এমন কঠিন কাজ কি!

এতবড় বাড়ি। এত যার ঘর, এত যার বারান্দা, এত যার ঐশ্বর্য, এত যার উপকরণ—তার সঙ্গী হয়ে থাকতে হলে সমস্ত ঘরবাড়ি তো ভরাট করে তুলতে হবে। সেটাও নিশ্চয় প্রসন্নময়ীর অনেক কাজের মধ্যের একটা কাজ। সেকথা বেশ ভালোমতই সে জানে। সেকথা জেনেশুনেই সে এসেছে। সে প্রায় তৈরি হয়েই এসেছে, আজ থেকে এখন থেকে থাকতে বললে সে তাই থেকে যাবে।

প্রসন্নময়ী বলল, "মেয়েদের নিজের কোনো চেহারা নেই, এ তো আপনি জানেন। যে পাত্রে রাখেন সেই পাত্রের মতনই সে চেহারা নেয়। এইজন্যেই, মেয়েদের যখন বিয়ে দেয়, তখন বলে তাকে পাত্রস্থ করা হল। আপনার এ বাড়িতেও আমি নিশ্চয় নিজেকে মানিয়ে নেব। নিজেকে নতুন করে আপনার বাড়ির মাপে বানিয়ে নেব। আপনি ভাববেন না।"

পরাশরের মনে কোনো ভাবনাই ছিল না, কিন্তু প্রসন্নময়ী অত কথা বলে পরাশরকে সত্যিই ভাবিয়ে ছাড়ল। প্রসন্নময়ীর আশ্বাসে ফল বিপরীতই হল, পরাশর চিন্তিতই হলেন।

ইতিমধ্যে প্রসন্নময়ী আরও যেন অনেক সহজ হয়ে গিয়েছে। কাঁধের উপর থেকে সরিয়ে ফেলেছে ওড়না। মাথার কাপড়ও পড়ে গিয়েছে। কিছুক্ষণ আগেও তার মুখ বয়স্ক ছিল, মাথার কাপড়ের বালাই দূর হওয়ায় সে মুখের বয়স কমে গিয়েছে।

মানুষকে আনন্দ দেওয়া নাকি স্বার্থপরতার মতনই কাজ, তাতে আনন্দ পাওয়াই যায়। নিজে যদি আনন্দ না-ই পেল তাহলে লোকে অযথা সাধ করে অন্যকে আনন্দ দেবার

জন্যে ব্যস্ত হবে কেন।

আনন্দে অধীর চিত/পিরিতির এই রীত/লোকে বলে বিপরীত/কেন কহে বুঝিনি তো!/

গুন্‌গুন্‌ করে গান গাওয়া শেষ করে প্রসন্নময়ী পরাশরের দিকে চেয়ে রইল। একদিন শুনতে হবে গান, এই কথা বলছিলেন না ঐ ভদ্রলোক? কেন, আজই প্রসন্নময়ী আরও অনেক গান তাঁকে শোনাতে পারে।

পরাশর কোনো কথা বলছেন না দেখে প্রসন্নময়ীই জিজ্ঞাসা করল, "কেমন লাগল এবার?"

"বেশ, বেশ, সুন্দর।"

"তারিফ শুনলে প্রাণ তাজা হয়ে ওঠে। ইচ্ছে করে গলা ছেড়ে গেয়ে চলি একের পর এক।" একটু হেসে বলল, "এই গানই আমার প্রাণ—সে এক মস্ত গপ্প।"

প্রসন্নময়ী যখন ছোট ছিল, তখন লোকে তাকে বলত পাগলী। নবদ্বীপের নাম নিশ্চয়ই শুনেছেন পরাশরবাবু? সেখানে পোড়ামাতলা বলে একটা পাড়া আছে। সেই-খানেই তার জন্ম।

ছোটবেলা থেকেই গান তার খুব ভালো লাগত। নবদ্বীপে তো অনেক আখড়া। আখড়ায় আখড়ায় সে শুধু ঘুরে বেড়াত। কেউ বারণ করত না, কেউ আটকে রাখত না তাকে। কেই-বা ওসব করবে। বছরখানেক যখন তার বয়স তখন তার মা মরে যায়। তার বাপ আবার বিয়ে করে। তার এই নতুন-মা তাকে একটুও পছন্দ করত না। তার দেখাদেখি তার বাবাও তাকে অপছন্দ করতে আরম্ভ করল। তাদের কোনো দোষ নেই। তারা পছন্দ করবে কি দেখে? ব্যাঙাচির মত দেখতে কালোকুলো তার চেহারা। তখন সে নাকি ছিল খুবই রোগা-টিংটিঙেও। কারো মায়া নেই, মমতা নেই, দরদ নেই—এমন একটা জীবন যেভাবে কাটতে পারে, সেইভাবেই কাটতে লাগল।

বিড়িবাঁধার কাজ করত তার বাবা। কোলের উপর বেঁটে কুলো নিয়ে মাথা ঝাঁকি দিয়ে দিয়ে বিড়ি পাকাত আর সুতোয় পাক দিয়ে বিড়ি বানাত তার বাবা তাদের ঘরের দাওয়ায় বসে। প্রসন্ন বসে বসে দেখত, আর তার মনে হত তার বাবা বুঝি মনে মনে গান গাইছে আর মাথা ঝাঁকি দিয়ে তাল দিচ্ছে। আগের দিন রাত্রেই সে ওইভাবে মাথা ঝাঁকি দিয়ে দিয়ে তাল দিতে দেখে এসেছে অনেক লোককে ললিতা-সখীর আখড়ায়। তার বাবা যেভাবে দুহাতে কাজ করে চলেছে, ঠিক ওইভাবে দুহাত দিয়ে যারা করতাল বাজায় তারাও ওইভাবে মাথা ঝাঁকায়।

তার বাবার কোনো কদর ছিল না, এক কোণে বসে বসে তার বাবার ছিল ঐ এক কাজ। তাই তার ইচ্ছে হত, তার বাবা যদি একাজ না করে আখড়ায় গিয়ে করতাল বাজায় তাহলে বেশ হয়। বাবার পাশে বসে সে তাহলে কীর্তন শুনতে পারে, একা একা তাকে যেতে হয় না। ফিরে এসেও একা একা বকুনি খেতে হয় না নতুন-মায়ের।

কিন্তু বাবাকে সে তার ইচ্ছের কথাটা কখনো বলতে পারেনি। বাবাও যে তাকে পছন্দ করেন না, তা সে বুঝে নিয়েছিল। নিজেকে কেবল অসহায় বলে মনে হত তার।

কেউ তার সহায় আছে কিনা, এমন খোঁজে অবশ্য সে কখনো বের হত না; ঘরে তার মন বসত না বলেই সে এখানে সেখানে ঘুরে ঘুরে বেড়াত।

তখন থেকেই তার একটা নতুন নাম হয়ে গেল। তাকে সকলে বলতে লাগল পাগলী।

ঐ নামটা খুব পছন্দ হয়েছিল প্রসন্নময়ীর। তার কেন যেন মনে হত ঐ নামে তাকে ডেকে লোকে তাকে বোধহয় আদরই জানাচ্ছে।

জীবনে ঐ তার প্রথম আদর। জীবনে ঐ তার প্রথম আদরের স্বাদ পাওয়া। এ স্বাদ তার খুব মিষ্টি লাগত। কিন্তু আদরও যে তেতো লাগতে পারে তা তার জানাই ছিল না। তা জানল কিছুকাল পরে।

যে ছিল ব্যাঙাচির মত দেখতে, দেখতে দেখতে কয়েক বছরের মধ্যে সে-ই হয়ে উঠল যেন একটা কোলা ব্যাঙ। বেশ ফেঁপে-ফুলে উঠল প্রসন্নময়ী। পোড়ামাতলার পানের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে সে বাঁদর-খেলা দেখছিল সেদিন দুপুরবেলা। পানের দোকান থেকে একটা সিটির শব্দ শুনে সেই দিকে তাকাতে গিয়েই আয়নায় তার চোখ পড়ল। আয়নায় ওটা কার ছায়া? মস্ত একটা ডাগর মেয়ে যে। ওটা তারই ছায়া কিনা তা পরখ করে দেখার জন্যে সে তার নাক চুলকালো, ছায়াটাও তাই করল। আলগা খোঁপাটা সে দুহাত দিয়ে জড়িয়ে আঁটো করতে লাগল, ছায়াটাও তাই করছে দেখল। তখনই তার চোখ পড়ল দোকানের একটা মাঝবয়সী লোকের দিকে, লোকটা মুখ সরু করে সিটি মারল।

কিছু বুঝতে পারল না প্রসন্নময়ী। সত্যি, তখন তার বয়স হচ্ছে ভালোই—তেরো কি চোদ্দ। তখন কিন্তু তার উচিত ছিল ঐ লোকটার মুখ সরু করে ওরকম শব্দ করার মানেটা বোঝার। কিন্তু কি রকম যেন বোকা ছিল সে, কি রকম যেন পাগলী ছিল সে।

গানের গলা ছিল তার। যে গান শুনত সেই গানই তুলে নিতে পারত সে তার গলায়। আখড়ায় আখড়ায় গান শুনে অনেক গান সে শিখে ফেলেছিল তখন। ঐ গান সে শোনাতো সকলকে।

নবদ্বীপ দেখেছেন কি পরাশরবাবু? সে খুব পুরনো শহর। অনেক পুরনো পুরনো বাড়িতে ভরা, অনেক গলিঘুঁজি ছিল তখন। এখন নাকি তার চেহারা অনেক বদলে গিয়েছে, এখন নাকি অনেক নতুন বাড়ি আর নতুন পল্লী গড়ে উঠেছে সেখানে। কিন্তু এখনকার নবদ্বীপ দিয়ে তার কাজ কি! তার জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে আছে সেকালের নবদ্বীপ।

তার ঘরে তাকে কেউ চাইত না। তখন তাদের ঘরে তার নতুন-মায়ের অনেকগুলি বাচ্চাকাচ্চা। সেখানে তার জন্যে আর জায়গাই নেই।

কিন্তু তার জায়গা ছিল অনেক বাড়িতে। ভট্টাচার্যদের বাড়ি, ঘোষেদের বাড়ি, নন্দীদের বাড়ি, কত বাড়ির আর নাম করবে সে!

তখন থেকেই আরম্ভ তার জীবনের মাধুকরী।

কেউ বলত, 'প্রসন্ন গান গা একটা', কেউ বলত, 'এই পাগলী, নতুন কি গান শিখলি রে, গেয়ে শোনা'।

প্রসন্ন গাইত। তাকে সাধতে হত না। একবার বলামাত্র সে তার গলা খুলে দিত!

খুব আদর হল তার, খুব কদর হল।

সারা নবদ্বীপেই তার তখন নাম। সব বাড়ির মানুষই গান শুনতে চায় প্রসন্ন-পাগলীর। গানও সে গায়, মজুরিও পায় অবশ্যই। বাড়িতে বাড়িতে খেয়ে খেয়ে বেড়ায় সে।

সে আমলে চাল-ডালের এমন টানাটানি ছিল না। লোককে মানুষে খেতে দিত বেশ আগ্রহের সঙ্গেই। মধুকরের মতন ঘরে ঘরে অন্ন সংগ্রহ করে বেড়াতে সে তখন আরম্ভ করেছে, এইজন্যেই তখন থেকেই তার মাধুকরী আরম্ভ বলে তার ধারণা।

পাগলীই বলুক আর যা-ই বলুক, প্রসন্নর তখন তো বেশ বয়স হয়েছে। সে কিছু বুঝুক আর না বুঝুক, তার শরীর তো কিছু মানবে না, তার কাজ সে করবেই। করেও বেশ চলেছিল। আর, হয়তো বেশ ভালোমতই করে চলেছিল।

নন্দীদের বাড়ির মেজকর্তা লোকটা বেশ অমায়িক। পঞ্চাশের কাছে তখন তাঁর বয়স। ঠোঁটের উপরে একজোড়া মোটা গোঁফ, গোঁফেও পাক ধরেছে, মাথার চুলেও বেশ পাক ধরেছে। তখন অত-শত বোঝেনি, কিন্তু এখন সে বোঝে যে, তাঁর চেহারা ছিল অনেকটা নাগর-নাগর টাইপের।

তিনি প্রসন্নকে পাগলী ছাড়া কিছু বলতেন না। তাঁর ডাকটার মধ্যে বেশ দরদ ছিল, বেশ আদর ছিল।

সকাল থেকে প্রসন্ন কুটনো কোটায় বাটনা বাটায় অনেক সাহায্য করেছে গিন্নিদের। তাঁদের গান শুনিয়েও বেশ খুশি করেছে। তারপর তাঁদের থেকে একটু তফাতে বসে খাওয়া-দাওয়াও করেছে।

মেজকর্তাবাবু খাওয়া সেরে খড়কে দিয়ে দাঁত খোঁচাতে খোঁচাতে উপরের ঘরে যাবার সময় বললেন, 'ওরে পাগলীটা, অনেক তো কাজের হয়েছিস। পাকা চুল বাছতে পারিস?'

প্রসন্ন ঘাড় নেড়ে জানিয়েছিল—পারে। তিনি বললেন, 'খেয়েদেয়ে তবে আয়।'

বাড়ির গিন্নিরা নীচের ঘরে বসে পান সাজছে, পান খাচ্ছে, আর এ-বাড়ির ও-বাড়ির মেয়েদের চালচলন নিয়ে কথাবার্তা বলছে তখন, প্রসন্নর বেশ মনে আছে, প্রসন্ন উঠে চলে গেল উপরে।

মেজকর্তাবাবু পিঠের নীচে মোটা একটা তাকিয়া দিয়ে আধো-শোওয়া হয়ে গড়গড়া টানছিলেন। গড়গড়ার লম্বা নল তাঁর শরীর জড়িয়ে আছে। প্রসন্ন কাছে যেতেই সোজা হয়ে উঠে বসে তার হাত ধরে টানলেন তিনি।

ঐ টানে প্রসন্নর খুব গর্ব হল। তার মনে হল এই দুনিয়াটা তবে একেবারে শুকনো মরুভূমি না। মানুষের মনে দয়া মায়া মমতা স্নেহ তবে এখনো একটু-আধটু আছে। তার খুব ভালো লাগল, তার মন একেবারে গলে গেল।

গড়গড়ার নল তাঁকে যেভাবে জড়িয়ে ছিল, ঠিক সেইভাবে তিনি প্রসন্নকে জড়িয়ে ধরলেন। মেজকর্তার গায়ের তাপ তার গায়ে লাগল।

কিছু বুঝতে পারেনি তখনো প্রসন্ন, তখনো তার মনে বেশ আনন্দই ছিল। কিন্তু হঠাৎই সে বুঝতে পারল সব।

কিন্তু যখন সে বুঝল তখন আর তার কিছু করার নেই।

তার কাছে পৃথিবীটা হঠাৎ আবার মরুভূমি হয়ে গেল। তার ভীষণ পিপাসা পেল। লাফ দিয়ে উঠে বিছানা থেকে নেমে মেজকর্তাবাবুর মুখের দিকে তাকাতে তার ভীষণ লজ্জা করল।

জীবনে সেইদিন তার প্রথম লজ্জা।

পরাশরবাবুর মুখের দিকে চেয়ে সে বলল, "কি রকম নির্লজ্জ হয়েছি দেখুন। লজ্জার কথা কেমন নিলাজের মত বলে ফেললাম।"

এই হল নাকি তার জীবনের প্রথম জাগরণ। এবার নাকি জেগে উঠল প্রসন্নময়ী।

"এ কি, আপনি ঘুমিয়ে পড়লেন নাকি? অমন চোখ বন্ধ করে চুপ করে বসে আছেন যে।"

"শুনেছি।" চোখ বন্ধ রেখেই সংক্ষেপে উত্তর দিলেন পরাশরবাবু।

কীর্তনের পদ গাইতে-গাইতে অনেক কথা সে শিখেছে এখন। এখন সে তার মনের কথা বুঝিয়ে বলার মত বেশ লাগসই শব্দ পেয়ে যায়। এটাও কম লাভ না।

সেই দিনটির কথা তার এখন খুব মনে পড়ে। সে এক ভীষণ দিন। সেই দিন থেকে একেবারে অন্য রকম হয়ে গেল নাকি প্রসন্ন। সেই দোকানের সেই লোকটি সিটি দিয়েছিল কেন, তাও সে বুঝতে শিখে গেল।

মেজকর্তার পাকাচুল না বেছেই সে নিজে পেকে গেল।

"সেই-যে আমার পাক ধরল, সেই থেকে শুরু হল আমার সর্বনাশ।" দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল প্রসন্নময়ী বিশ্বাস।

পোড়ামাতলা থেকে বুড়োশিবতলা, সেখান থেকে ব্যাদরাপাড়া, তারপর চারচারাতলা—সারা নবদ্বীপ টহল দিয়ে বেড়াত যে মেয়ে সে কিনা কিছুদিন একেবারে ঘরকুনো হয়ে গেল? ঘর থেকে বের হতে তার কেমন ভয়-ভয় করত। ঘরের এক কোণে শুয়ে-শুয়ে সে দেখত বারান্দার একপাশে তার নতুন-মা তার শরীর আদুল করে বসে ছোট বাচ্চাটিকে সামলাচ্ছে, নতুন-মায়ের উপর তার খুব রাগ হত, মনে হত লজ্জাসরম কিছু বুঝি নেই তার নতুন-মায়ের! আর, দেখত দাওয়ার আর-এক পাশে বসে করতাল বাজাবার মতন করে বিড়ি বাঁধছে তার বাবা। তার বাবাকে দেখে খুব মায়া হত প্রসন্নর। সারাদিন বসে ঐ কাজ করছে, আর শরীরটা করে তুলেছে পাটকাঠির মতন।

নিজেকে নিয়ে সে খুবই বিব্রত। আগে কী সুন্দর উদাসীন আর উদ্‌ভ্রান্তের মতন সে ঘুরে বেড়াতে পারত। নিজের সম্বন্ধে বিশেষ চৈতন্য ছিল না। কিন্তু এখন সব সময় তাকে কেবলই ভাবতে হয় নিজের কথা।

দিন-কয়েক সে বাড়ি থেকে বের হল না। খাওয়া-দাওয়াও তেমন ভালো-মত হল না। না হওয়াই স্বাভাবিক। অতগুলো ছেলেপেলে নিয়ে তার বাবা-মা হিমশিম খাচ্ছে, তার উপর আবার আর একজনের খোরাক জোটানো কি সহজ কথা?

তার ধারণা ছিল যে, তাকে সকলেই খুব ভালোবাসে। তার দেখা না পেয়ে সকলেই বেশ চিন্তিত হবে বলে সে মনে করেছিল। কিন্তু পৃথিবীটা যে এমন ভীষণ জায়গা, তা ধরতেই পারেনি প্রসন্ন। ভটচার্যবাড়ি বল, নন্দীবাড়ি বল, ঘোষের বাড়ি বল—কোনো বাড়ি থেকেই কেউ তার খোঁজ করতে এল না।

বাড়ি থেকে সেদিন সন্ধ্যাবেলা সে বের হল, সোজা গিয়ে হাজির হল ললিতা-সখীর আখড়ায়।

এখন সে আর পাগলী নেই, এখন সে সব বোঝে, সব জানে। এখন সে সজাগ। কোনো সম্ভাবনার কথা ভাবলে এখন তার শরীর শিরশির করে ওঠে। কেউ তার দিকে তাকালেই এখন সে তার মতলব বুঝে নেয়।

এই সময় তার দেখা হল একটি মানুষের সঙ্গে, তার নাম বৈকুণ্ঠ। প্রসন্ন ভাবল তার হাতে বুঝি বৈকুণ্ঠই এসে গেল। তার বুঝি মুক্তিই এসে গেল।

কিন্তু যাকে সে মুক্তি ভেবেছিল তা যে কতবড় বন্ধন, তা সে জেনেছে। এখনো সে সেখানেই বাঁধা।

খুব জোয়ান আর খুব তেজি মানুষ এই বৈকুণ্ঠ। মাথায় লম্বা চুল। শরীরটা যেমন শক্ত, গানের গলা তেমনি নরম। বৈকুণ্ঠ খুব সুন্দর গান গাইত। আখড়ায় তার গান

অনেকবার শুনেছে প্রসন্ন—

গজেন্দ্রগামিনী চলে
নিতম্ব সুন্দর দোলে,
　　প্রতিবিম্ব নেহারি' সলিলে
যমুনা দোমনা হয়ে
কভু খেলে ছায়া লয়ে,
　　কায়ার মায়াতে কভু ভুলে।

অনেক গানের মধ্যে এই গানটির কথাই প্রসন্ন বলছে এইজন্যে যে, এইদিন বৈকুণ্ঠ বার-বার তার দিকে চেয়ে গানটি গেয়েছে ও চোখের ইশারায় কি-যেন বলতে চেয়েছে তা সে লক্ষ করেছিল। আখড়ার জমায়েত স্ত্রীপুরুষ কেবল গানের কলিই শুনেছে, কিন্তু প্রসন্ন তার চেয়েও বাড়তি কিছু শুনতে পেয়েছিল। সেই শোনাটাই হল তার কাল, এবং হয়তো হল তার সর্বনাশ।

"আমিও গান গেয়েছি ওই আখড়ায়। আমি যখন গাইতাম, তখন লক্ষ করে দেখেছি বৈকুণ্ঠ আমার মুখের দিকে না চেয়ে মাথা নীচু করে বসে বারবাড় নেড়ে-নেড়ে সে গানের খুব তারিফ করেছে।"

লোকটাকে তার নাকি মন্দ লাগল না। সে গান গায়, সেই গান কেউ অমন মন দিয়ে শুনলে তা ভালো লাগারই কথা।

আখড়া থেকে বেরতে রোজই রাত হয়ে যায়। এখন নাকি অনেক বিজলীবাতি হয়ে গিয়েছে নবদ্বীপে। তখন কিন্তু এমন ছিল না। একটা কেরোসিন-আলো এখানে জ্বলত, আর-একটা ওই ওখানে। সেই অন্ধকার রাস্তা দিয়ে একা-একাই বাড়ি ফিরত প্রসন্ন। বাড়িতে এসে দাওয়ায় এক কোণে চাটাই বিছিয়ে শুয়ে পড়ত।

নিজেকে সে নিজে কখনো দেখতে পায় নি। দেখতে পেলেই-বা ফল আর কী হত। নিজের শরীরের উপর কোন মানুষের আর লোভ হয়? কিন্তু যাকে নাকি লোভনীয় বলে, তাকে দেখতে নাকি তখন সেইরকমই হয়েছে। কথাটা নেহাত মজারই। একটা মানুষকে দেখে আর-একটা মানুষের লোভ হবে কেন। খুব বেশি-কিছু হলে ভালোবাসা হতে পারে, এইমাত্র।

সেই পানের দোকানের সেই লোকটা নাকি চাঁই, সেই নাকি ছিল সেই দলে। কখন থেকে তারা তাক্ করে ছিল তা আদপে টেরই পায় নি প্রসন্ন। ঘুটঘুটে অন্ধকার রাস্তা ধরে সে আসছে, হঠাৎ খপ্ করে কে-যেন তার হাত চেপে ধরল, বলল, 'চুপ। চল্, পালাই মায়াপুর। নৌকো আছে ঘাটে।'

প্রসন্ন চীৎকার করে উঠবে ভাবছে, এমন সময় সেই অন্ধকারের মধ্যে আরও তিন-চারটি ছায়া দেখতে পেয়ে তার শরীরের রক্ত হিম হয়ে গেল, গলা বন্ধ হয়ে গেল।

সেই দিন তার কী দশা হত, তা সে জানে না।

হঠাৎ সেই অন্ধকারের মধ্যে হাজির হল বৈকুণ্ঠ। কীর্তন গাওয়ার তৈরি গলায় সে বলে উঠল, 'কারা রে তোরা? দাঁড়া।'

যাদের মতলব খারাপ তারা বড় ভিরু হয়। যাদের দাঁড়াতে বলল বৈকুণ্ঠ তারা তক্ষুনি চম্পট দিল।

কাছে এসে বৈকুণ্ঠ বলল, 'বড্ড সাহস! ওরা বলে জগদ্ধাত্রী, জগদ্ধাত্রী না ছাই।

জয় মা-কালীর মতন মূর্তি হয়েছে, একা-একা যাওয়া হচ্ছে পোড়ামাতলায়।'

"আগে আমি কখনো কাঁদিনি। আমি কেঁদে ফেললাম। খুব ভয় পেয়েছিলাম। হঠাৎ এই ভরসা পেয়েই আমার এ কান্না কি না জানিনে।"

ইনিয়ে-বিনিয়ে সব কথা খুঁটিনাটি করে বলার ইচ্ছেও নেই প্রসন্নর, আর পরাশর-বাবুরও বুঝি সময় নেই, মাঝে-মাঝেই তিনি যখন হাতঘড়ির দিকে তাকাচ্ছেন, তখন সংক্ষেপেই সারতে চায় প্রসন্ন।

ওই বোম্বেটেদের সঙ্গে সে রাত্রে সে মায়াপুরীতে যায় নি বটে, কিন্তু সপ্তাহখানেকের মধ্যেই সে বাঁধা পড়ে গেল নতুন মায়ার পুরীতে। আজও সেইখানেই সে বন্দী।

কাউকে কিছু না জানিয়ে তারা নবদ্বীপ ছেড়ে চলে গেল। সেই-যে ছেড়েছে, আজ পর্যন্ত আর সেখানে ফেরেনি। নন্দীবাড়ির কথা বেশ মনে পড়ে। অনেকরই তো দশ রকম দশা হয়েছে, তাদের এখন কি দশা, কে জানে!

সন্ধ্যার অন্ধকারে নৌকো চেপে তারা নবদ্বীপ থেকে চলে গেল শান্তিপুরে। শান্তিপুর থেকে রাণাঘাট। রাণাঘাটেই তারা ছিল বছর তিনেক। দুজনেই গান গায়। বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে দরজায়-দরজায় গান গায় তারা।

এইখানে বৈকুণ্ঠ নেশা করা আরম্ভ করল। কত রকমের মানুষ থাকে এখানে তার ঠিক নেই। কত রকমের গুণ্ডা-বদমায়েসও তো থাকে!

বৈকুণ্ঠকে অনেক নাকি সে বুঝিয়েছে, বৈকুণ্ঠ যদি নেশা করে বুঁদ হয়ে থাকে তাহলে দরকার হলে প্রসন্নকে রক্ষা করবে কে! কিন্তু বৈকুণ্ঠ সে-সব কথায় কানই দেয় নি, নিজেকে নিজেরই রক্ষা করতে হবে বলে তাকে উপদেশ দিয়েছে মাত্র। তা যদি সত্যি, তবে কেন সে তাকে সেবার উদ্ধার করেছিল।

নিজেকে নিজের রক্ষা করাটা কি কম কঠিন কাজ? যতই সতী হয়ে থাকার চেষ্টা কর, যতই-না কেন সাধ্বী হও, মানুষের মন তো মানুষেরই মন। প্রসন্নও তো রক্তমাংসেরই মানুষ। তার মনও কখনো-কখনো দুর্বল না হবে কেন। যাদের বদমায়েস লোক বলে বাইরে থেকে মনে করা যাচ্ছে, তাদের মধ্যেও তো খাঁটি মানুষ থাকতে পারে। এমনি কোনো মানুষের উপর মনের টান যে হবেই না, এমন কথা কে বলতে পারে। নিজেকে নিজে রক্ষা করায় ঝামেলাও তাই আছে। এইজন্যেই মেয়েদের দরকার হচ্ছে একজন স্বামীর।

নিজেকে সতীসাধ্বী বলে জাহির করার জন্যে এখানে আসেনি প্রসন্ন। এখানে এসেছে একটা কাজের জন্যে, যে কাজ সে পারবে, যে কাজের যোগ্য বলে সে নিজেকে মনে করে।

স্বামী থাকলে মেয়েদের মনে জোর বাড়ে, এমন-তেমন কিছু করার বাসনা জাগলে সংস্কার তাকে বাধা দেয়।

বৈকুণ্ঠ তো তার স্বামী না। কিন্তু আজ পঁচিশ বছর তারা আছে একসঙ্গে।

বাড়িতে-বাড়িতে গিয়ে দুজন একসঙ্গে গেয়ে-গেয়ে বেরিয়েছে অনেক দিন ধরে। তার গান শুনে সকলেই বেশ খুশি। লোকের মুখে-মুখে ছড়িয়ে প্রসন্নর বেশ নাম হল।

নাম যখন হয়েছে, তখন তা কাজে লাগিয়ে নিতে তো হয়। প্রসন্ন অনেক ভাবল। তখন তারা কালনায় এসে পেঁৗছেছে। সেও প্রায় পনেরো বছরের কথা হল। রাস্তার ধারের পর-পর কয়েকটা মাটির ঘর। প্রসন্ন তাদের মাটির ঘরের বাতার দেয়ালে আলপনা দেবার মত করে পিঠুলি গুলে বড় বড় হরফে লিখে দিল—প্রসন্ন কীর্তনী।

একদিনেই ফল হয় না। কিন্তু ফল হল। পালেদের বাড়ির এক প্রান্তে সে প্রথম

বায়না পেল।

খুব গেয়েছিল নাকি সেদিন। লালপেড়ে শাড়ি পরে, সিঁথি ভ'রে সিঁদুর দিয়ে আসরে জাঁকিয়ে বসে সে গেয়েছিল তিনঘণ্টা ধরে। পাশে বসেছিল বৈকুণ্ঠ খোল নিয়ে।

তারপর নাম আরও ছড়ালো। ক্রমেই দূর-দূর জায়গা থেকে বায়না আসতে লাগল। শান্তিপুর গুপ্তিপাড়া নৈহাটি কেষ্টনগর—কত আর নাম করা যায়?

কিছু পয়সা আসতে লাগল। পয়সা যতই আসে, ততই তোড়ে তা ভেসে যেতে লাগল। বৈকুণ্ঠ খুব নেশা করতে লাগল। কেবল মদ, আর মদ। সেইসঙ্গে যোগ হয়েছে আবার গাঁজা। গাঁজা টেনে গানের গলাও গিয়েছে নষ্ট হয়ে। গলায় এখন খসখসে আওয়াজ বেরোয়।

খুব কষ্ট হত প্রসন্নর। প্রসন্নর নেশা কি তবে একদম কেটে গেছে বৈকুণ্ঠের?

কী নেই প্রসন্নর? বয়স এখন একটু বেড়েছে বটে, তা বাড়ুক; ওটা তো বাড়ারই জিনিস। বয়স কি বৈকুণ্ঠেরও বাড়ে নি? সে তো এখন বুড়ো। এতটা বুড়ো নিশ্চয় হত না, যদি ঐ বিষগুলো গিলে-গিলে শরীর কাহিল না করত।

তখনও সে যায় প্রসন্নর সঙ্গে প্রত্যেক কীর্তনের আসরে। কিন্তু মৃদঙ্গ বাজাতে এখন আর পারে না। এখন বাজায় করতাল। আসরে বসে যখন মাথা নেড়ে-নেড়ে ও করতাল বাজায় তখন আর-একটা চেহারার কথা মনে পড়ে যায় প্রসন্নর। দুই চেহারাই প্রায় একরকম হয়েছে দেখতে। ঐ দেখে বড় মায়া হয় প্রসন্নর।

বৈকুণ্ঠের শরীর এখন আরও খারাপ হয়েছে। হিলহিলে হয়ে গেছে চেহারা। এখন কীর্তনে যেতে হলে বৈকুণ্ঠকে সঙ্গে নেওয়া যায় না। তার শরীর সে ধকল সহ্য করতে পারে না। কিন্তু একা-একা ফেলে রেখেও তো যাওয়া যায় না, সারাদিন তবে ঐসব গিলে-গিলে দম আটকে মরে পড়ে থাকবে—এই ভাবনা।

"তাই আপনার কাছে এসেছি এই চাকরির জন্যে। আপনি রাখুন আমাকে, দেখবেন, কোনো অসুবিধে আপনার হবে না।"

পরাশর বললেন, "ভেবে দেখি।"

"ভাবুন। সেইসঙ্গে আরও একটা কথাও একটু ভাববেন। আপনার এটা তো মস্ত বাড়ি, অনেক ঘর। কোনো-একটা কুঠুরিতে ওকেও কিন্তু ঠাঁই দিতে হবে।"

"কাকে?"

"বৈকুণ্ঠকে। আমাকে ছেড়ে ও থাকতেই পারবে না।"

পরাশর একটু হেসে বললেন, "তাই বুঝি? কিন্তু, কাল থেকে এতক্ষণ ছেড়ে আছে কি করে?"

মাথার কাপড় একটু টেনে, একটু সলজ্জ হেসে প্রসন্ন বলল, "সেই পাত্রই বটেন তিনি। তিনি সঙ্গে এসেছেন। আপনার ফটকের কাছে বসিয়ে রেখে এসেছি। আসুন-না, দেখবেন তাকে। নেশাড়ু হলে কী হয়, খুব বিনয়ী, খুব ভদ্র।"

পরাশরবাবু উঠে দাঁড়ালেন, ঘড়ির দিকে একবার তাকালেন। উঃ, সাড়ে দশটা বাজে। এক্ষুনি বেরতে হবে তাঁকে।

বললেন, "তাহলে তো একবার দেখতেই হয়।"

প্রসন্নর সঙ্গেই তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লেন।

[ক্রমশ]

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পাঠ

তারাপদ মুখোপাধ্যায়

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পুথির পাঠোদ্ধার ও পাঠ-নির্ণয় দুরূহ ব্যাপার। সম্পাদক বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভের অসাধারণ পরিশ্রম এবং প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের জন্য এ-ধরনের দুরূহ পুথি এমন সুসম্পাদিত হয়ে প্রকাশিত হতে পেরেছে। কিন্তু অতি সুসম্পাদিত পুথির পাঠেও সংশয় থাকে, সব জটিলতার গ্রন্থি সম্পাদক একই প্রযত্নে উন্মোচন করতে পারেন না। যতদিন বসন্তবাবু বেঁচে ছিলেন ততদিন প্রতি সংস্করণেই তিনি পাঠের কিছু না কিছু উন্নতিসাধন করেছেন। পাঠ-নির্ণয়ে বসন্তবাবুর অবলম্বন ছিল একখানি পুথি, তুলনামূলক বিচারের সুযোগ ছিল না বলে সংশয়-স্থলে নিজের বিচার-বিবেচনার উপরই তাঁকে বেশি নির্ভর করতে হয়েছিল। এইভাবে তিনি যা করেছেন তা অতুলনীয়। পুথির সঙ্গে মুদ্রিত সংস্করণের পাঠ মিলিয়ে পড়লে বোঝা যায় কি অসাধারণ নিষ্ঠা এবং পাণ্ডিত্যের সঙ্গে বসন্তবাবু গ্রন্থের প্রতি ছত্রের পাঠ নির্ধারণ করেছেন। এর ফলে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের মুদ্রিত সংস্করণে পাঠের গুরুতর কোনো গোলমাল নেই। তবে কয়েকটি জায়গার পাঠ সম্পর্কে মনে ছোটোখাটো সংশয় জেগে ওঠে। পুথির সঙ্গে মিলিয়ে পড়লেও দেখা যায় মুদ্রিত সংস্করণের পাঠে কয়েক জায়গায় পুথির সঙ্গে মিল নেই। কয়েকটি ছাড়া এই সংশয়-অমিলের কোনোটিই তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়। তথাপি শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের গুরুত্বের কথা মনে করলে পাঠ সম্পর্কে ছোট-বড় কোনো সংশয়কেই উপেক্ষা করা চলে না। সেই কারণে যে কয়েকটি পাঠ সম্পর্কে আমি নিঃসংশয় হতে পারি নি সেগুলির প্রতি বিশেষজ্ঞদের দৃষ্টি আকর্ষণ করাতে চাই।

'যা য়া-না-হী জাণে লোক তা জাই ঘর', ৪র্থ সংস্করণ, পৃ. ১৫৪—এই ছত্রটির পাঠ সম্পর্কে আমি সম্পূর্ণ নিঃসংশয় হতে পারি নি। সংশয়ের কারণ ব্যক্ত করবার আগে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পুথির লিপিকরের একটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা প্রয়োজন।

আধুনিক কালে একটি শব্দকে লাইনের পরিমিত সীমার মধ্যে ধরিয়ে দিতে না পারলে আমরা শব্দটিকে দু-অংশে ভাগ করে উত্তরাংশ নূতন লাইনে লিখি এবং পূর্বাংশের পর একটি হাইফেন্ চিহ্ন দিয়ে নির্দেশ করি যে শব্দটি সে-লাইনে সম্পূর্ণ হয় নি, বাকী অংশ পরবর্তী লাইনে আছে। যেমন,

'আমি যে সহজিয়া গীত গান ছাড়া ও দোঁহার উল্লেখ করি-
য়াছি সেগুলি বদল হয় নাই।'

এই হাইফেন্ চিহ্নকে বলতে পারি শব্দ-ভঙ্গের চিহ্ন।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পুথির লিপিকরের রীতি অন্য রকম। তিনি পুথির প্রায় সব পাতাতেই শব্দকে একাধিক লাইনে বিভক্ত করে লিখেছেন। পুথির ১৯৪।২ পাতার ছবি দেখুন। প্রথম লাইনে 'ব-ন্দী', দ্বিতীয় লাইনে 'না-হ্ণী', চতুর্থ লাইনে 'তো-হ্মারে', ষষ্ঠ লাইনে 'গি-রী' —এই শব্দগুলিকে একাধিক লাইনে বিভক্ত করে লেখা হয়েছে: কিন্তু 'ব', 'না', 'তো' এবং

'গি' প্রভৃতির পর শব্দ-ভঙ্গচিহ্ন ব্যবহার করা হয় নি। অথচ পুঁথির ঐ একই পাতায় পঞ্চম লাইনের শেষে 'বোলোঁ' শব্দটি সম্পূর্ণ লেখা হওয়া সত্ত্বেও শব্দটির পর একটি চিহ্ন দেওয়া হয়েছে। এই চিহ্নটি লাইন সমাপ্তির চিহ্ন। আট সংখ্যাবাচক অক্ষরটি শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পুঁথিতে লাইন সমাপ্তির চিহ্নরূপে ব্যবহৃত হয়েছে। লাইন সমাপ্তি চিহ্ন ব্যবহার করা হয়েছে কেন? যদি দেখা যায় বাক্য বা বাক্যাংশ লেখা সম্পূর্ণ হওয়ার পরও লাইনের শেষ প্রান্ত পুঁথির সেই পাতার অন্যান্য লাইনের শেষ প্রান্তের সঙ্গে সুসঙ্গতভাবে মিশে যাচ্ছে না, একটু জায়গা শূন্য থেকে যাচ্ছে এবং সে-শূন্যস্থানটুকু একটি অক্ষর লিখবার পক্ষে যথেষ্ট প্রশস্ত নয়, তখন সেই শূন্যস্থানে লাইন সমাপ্তির চিহ্নস্বরূপ আট সংখ্যাবাচক অক্ষরটি লেখা হয়। সম্ভবত এই উদ্দেশ্যে লেখা হয় যে পরবর্তীকালে শূন্যস্থানে কেউ কোনো অক্ষর যোজনা না করে দেয়। পুঁথির ১৯৪।২ পাতায় দেখছি 'বোলোঁ' লেখা হওয়ার পরেও পঞ্চম লাইনটি প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ লাইন থেকে দৈর্ঘ্যে কিছু ছোট, অথচ এত ছোট নয় যে 'উপাএ'-র 'উ' অক্ষরটিকে সেখানে ধরিয়ে দেওয়া যায়। অগত্যা লিপিকরকে লাইন সমাপ্তির চিহ্ন দিয়ে জানাতে হল লাইনটি এখানেই শেষ হয়েছে। লাইনের দৈর্ঘ্য সম্বন্ধে অবশ্য নির্দিষ্ট কোনো মাপ নেই, প্রতি পাতার প্রথম লাইনটি যে সেই পাতার অন্যান্য লাইনের দৈর্ঘ্যের মাপ তাও নয়; কারণ, প্রথম লাইনের শেষেও লাইন সমাপ্তির চিহ্ন বহু জায়গায় আছে। পাতার দীর্ঘতম লাইনটিই সেই পাতার অন্যান্য লাইনের দৈর্ঘ্যের মাপ। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পাতার প্রথম অথবা দ্বিতীয় লাইনটিই দীর্ঘতম (সুতরাং সম্পূর্ণ পাতাটি লেখা হয়ে যাওয়ার পর লাইন সমাপ্তির চিহ্ন বসানো হয় এমন মনে করবার কারণ নেই)।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পুঁথিতে কোনো কোনো লাইনের শেষে (এবং অর্ধ-লাইনের শেষে) যে-চিহ্নটি ব্যবহৃত হয়েছে সেটি শব্দ-ভঙ্গের চিহ্ন নয়, লাইন সমাপ্তির চিহ্ন। এবং এও দেখা যাচ্ছে আধুনিক কালে শব্দের ব্যাকরণগত অবিভাজ্যতার কথা মনে রেখে শব্দ-ভঙ্গচিহ্ন বসানো হয়, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পুঁথিতে লাইনের দৈর্ঘ্যের সমতার দিকে লক্ষ্য রেখে লাইন সমাপ্তির চিহ্ন ব্যবহার করা হয়।

এবার 'ঘা য়ানাহী না জাণে লোক তা জাই ঘর' এই লাইনটি পুঁথির যে-জায়গায় লেখা হয়েছে সে-জায়গার ছবি দেখুন।

ছবি দেখলে বোঝা যায় যে 'ঘা' শব্দটি লিপিকর লিখেছিলেন বটে; কিন্তু লেখার পর দেখলেন,

'যা'-র া-কার লাইনের নির্দিষ্ট সীমা ছাড়িয়ে গেছে (এ পাতায় দ্বিতীয় লাইনটি অন্যান্য লাইনের দৈর্ঘ্যের মাপ)। তাই 'যা'-র উপর লিপিকর এমনভাবে লাইন সমাপ্তির চিহ্নটি লিখলেন যাতে সন্দেহ না থাকে যে শব্দটিকে কেটে দেওয়া হয়েছে। পরে পূর্ববর্তী লাইনে তিনি যা লিখতে যাচ্ছিলেন তা পরবর্তী লাইনে লিখলেন। পুথিতে অক্ষর কেটে দেওয়ার এটাই অবশ্য সাধারণ রীতি নয়। সুতরাং যদি মনে করি 'যা' কাটা হয় নি তাহলে স্বভাবতই প্রশ্ন হবে লিপিকর লাইনসমাপ্তির চিহ্ন লিখলেন কেন। 'যা'-র া-কারটা লাইন থেকে একটু বেরিয়ে আছে বটে, কিন্তু সে অসমতাটুকু লিপিকর উপেক্ষা করতে পারতেন। কিন্তু লিপিকর তা করেন নি, তিনি লাইন সমাপ্তির চিহ্ন লিখেছেন। 'যা' পুথিতে আছে মনে করলে লাইন সমাপ্তির চিহ্ন লেখার কোনো সার্থকতাই খুঁজে পাওয়া যায় না। আর, লিপিকর অসতর্কতাবশত চিহ্নটি লিখে ফেলেছেন বলে যদি মনে করি তাহলেও প্রশ্ন হবে চিহ্নটি 'যা' শব্দটির উপর লেখা হল কেন, পাশে ফাঁকা জায়গা ত প্রচুর ছিল। তাই 'যা' শব্দটি লিখে কেটে দেওয়াই যে লিপিকরের অভিপ্রায় ছিল সে-সম্বন্ধে বোধহয় কোনোই সন্দেহ নেই। বসন্তবাবু লিপিকরের অভিপ্রায় বুঝতে না পেরে কিংবা বুঝেও গ্রাহ্য না করে 'যা' পুথিতে আছে ধরে নিয়ে পাঠ স্থির করেছেন।

সংশয় অবশ্য শুধু 'যা' নিয়ে নয়। 'য়ানাহী না জাণে লোক' বাক্যাংশের পাঠও সম্পূর্ণ সন্দেহাতীত নয়। টীকায় সম্পাদক বলেছেন, 'য়ানাহী লোক' অর্থে 'অন্য লোক' (পৃ. ২৮১)। ধরা গেল, 'য়ানাহী' মানে 'অন্য' এবং 'লোক' মানে 'লোক'। এই অনুসারে 'য়ানাহী লোক' মানে 'অন্য লোক' মেনে নিতে কিছুমাত্র আপত্তি নেই। কিন্তু পুথিতে ত 'য়ানাহী লোক' নেই, আছে 'য়ানাহী না জাণে লোক'। তাই 'য়ানাহী না জাণে লোক' এই বাক্যাংশের অর্থ যদি বসন্তবাবু বলেন 'অন্য লোকে না জানে' তাহলে বলব শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের মত দীর্ঘ এবং দুরূহ পুথির পাঠোদ্ধার এবং পাঠ-নির্ণয় করে শেষের দিকে বসন্তবাবুর মনোযোগ শিথিল হয়ে পড়েছিল। 'য়ানাহী না জাণে লোক' বাক্যাংশের দুটি অর্থ সম্ভব— 'অন্যকে লোক জানে না' অথবা 'অন্য [কেউ] লোককে জানে না'। এ-ছাড়া অন্য কোনো অর্থ হলে বুঝতে হবে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ত বটেই বাংলা ভাষার বাক্যগঠনে এবং শব্দবিন্যাসে কোনো শৃঙ্খলা নেই, অভিধান থেকে শব্দ নিয়ে শব্দের মালা গাঁথলেও তা বোধগম্য ভাষা হয়ে উঠবে। 'অন্য' এবং 'লোক'-এর মধ্যে ক্রিয়াপদের সন্নিবেশ ঘটলে 'অন্য লোক' এই অর্থ বজায় থাকে না—কি মধ্যযুগের বাংলায়, কি কবিতার বাংলায়, কি মুখের বাংলায়, কি রাঢ়ের বাংলায়। তুলনীয়, 'আন পথে' (৪), 'আন ভানে' (১৪), 'আন নারী' (২৪), 'আন বাটে' (৫৬) ইত্যাদি। 'আন পথে' মানে 'অন্য পথে' বটে; কিন্তু 'আন পথে'-র মধ্যে একটি ক্রিয়াপদ ঢুকিয়ে দিয়ে যদি বলি, 'আন যাএ পথে' তাহলে কি অর্থ হবে? '[সে] অন্যপথে যায়' না 'অন্য [লোকে] পথে যায়'? সুতরাং যে-অর্থ কল্পনা করে বসন্তবাবু 'যা য়ানাহী না জাণে লোক তা জাই ঘর' পাঠ দাঁড় করিয়েছিলেন সে-অর্থ অস্বাভাবিক। এই অর্থের কথা মনে ভেবেই বোধহয় 'যা' পুথিতে পরিত্যক্ত হওয়া সত্ত্বেও 'তা'-র সঙ্গে মেলাবার জন্য বসন্তবাবু 'যা'-কে ধরে রেখেছিলেন। অবশ্য কেবলমাত্র অর্থের অস্বাভাবিকতাই লাইনটির পাঠে সন্দেহ প্রকাশ করবার একমাত্র কারণ নয়।

'য়া-না-হী' শব্দটি শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে অসম্ভব বলে আমার মনে হয়। অসম্ভাব্যতার কারণ একটু বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা প্রয়োজন। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পুথির লিপিতে 'য়' নেই, আছে 'য'। সম্পাদক প্রসঙ্গানুসারে পুথির 'য' অক্ষরটিকে একবার 'য', একবার 'য়' পড়েছেন।

একই অক্ষর এক জায়গায় 'য', আর এক জায়গায় 'য়' কেন পড়া হবে সে-সম্পর্কে সম্পাদকের নির্দেশই যথেষ্ট নয়, প্রসঙ্গের উল্লেখও যথেষ্ট নয়। এমন শব্দও পুথিতে থাকতে পারে কেবলমাত্র প্রসঙ্গের সাহায্যে যার পাঠ-নির্ণয় অসম্ভব। সুতরাং প্রসঙ্গ ছাড়া অন্য কোনো উপায়ে পুথিতে 'য'/'য়' পার্থক্য প্রকাশ পেয়েছে কিনা তা অনুসন্ধান করা প্রয়োজন। প্রকাশ না পেলে বুঝতে হবে পুথিতে 'য'/'য়' অভিন্ন, লিপিতেও বটে, উচ্চারণেও বটে। তবে প্রসঙ্গের নির্দেশ না মানলেও দেখা যায় শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পুথিতে 'য'/'য়' অভিন্ন নয়, পৃথক। এই পার্থক্য লিপিতে দেখান হয় নি, কিন্তু অন্য উপায়ে দেখান হয়েছে। পুথিতে শব্দের আদিস্থিত 'য' বহুশব্দে 'জ' দিয়েও লেখা হয়েছে। যেমন, 'য-খ-ন' (১২০)='জ-খ-ন' (৩২), 'য-ম-ল' (৩)='জ-ম-ল' (৩৮), 'য-ত-নে' (৪)='জ-ত-নে' (১৪৩), 'য-বে*' (৫)='জ-বে*' (১৪৩), 'য-র-ম' (৮৯)='জ-র-ম' (২), 'য-শো-দা-এ*' (২৮)='জ-সো-দা' (৪১), 'যা' (৫৮)='জা' (৫৭), 'যা'-গি-এ্রাঁ' (১৫৪)='জা-গি-ল' (৬৪) ইত্যাদি। 'য' ও 'জ' এই দুই বানানে পাওয়া যায় না এমন শব্দ পুথিতে কম এবং তার অনেকগুলিই একবার মাত্র ব্যবহৃত হয়েছে। তাই বিকল্প বানান সম্ভব কিনা জানবার উপায় নেই। সুতরাং অনুমান করতে বাধা নেই যে শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তনের পুথিতে শব্দের আদিস্থিত 'য' এবং 'জ' পার্থক্যহীন। কিন্তু পুথিতে কোনো একটি ক্ষেত্রেও পদের মধ্য ও অন্তস্থ 'য'-র পরিবর্তে 'জ' লেখা হয় নি। যেমন, 'আ-জি' (৪), 'কা-জ' (৯৫), 'খ'ু-জি-তে' (৪৬), 'তে-জ' (১৬), 'ম-জি' (১৮), 'ভ-জি-লে*' (৫০), 'বা-জা-এ' (৭৯), 'উ-জ-লা' (২৭), 'তি-য়-জ' (১৫৩), 'দু-অ-জ' (৫) প্রভৃতি শব্দের কোনো একটিতেও 'জ'-র পরিবর্তে 'য' পাওয়া যায় না। এতেই প্রমাণ হয় যে শব্দের মধ্য ও অন্তস্থ 'য' এবং শব্দের আদিস্থিত 'য' অভিন্ন নয়। পুথির 'য' অক্ষরটি অবস্থানভেদে দ্বিবিধ প্রকার ছিল, আদিতে 'য', অন্যত্র 'য়'। এ-সিদ্ধান্ত সত্য হলে একথাও সত্য বলে মানতে হবে যে শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তন পুথিতে অবস্থানগত পার্থক্যের উপরই যখন 'য'/'য়' পার্থক্য প্রতিষ্ঠিত তখন 'য'/'য়' বিপর্যয় অন্তত এই পুথিতে অভাবিত ব্যাপার। অর্থাৎ পদের আদিস্থিত 'য'-কে একবার 'য' আর একবার 'য়' পড়লে ভুল হবে। কোনো কোনো বাংলা পুথিতে অবশ্য 'য়া-মি'='আ-মি', 'য়া-সি='আ-সি' ইত্যাদি পাওয়া যায়, কিন্তু সে-প্রসঙ্গ এখানে উত্থাপন করতে চাই না, এখানে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পুথির বানান-রীতি-ই শুধু লক্ষ্য করা যাক। আমার অনুমান (প্রমাণ অনুসন্ধান সাপেক্ষ) 'য়া-মি', 'য়া-সি' যে পুথিতে পাওয়া যাচ্ছে সে-পুথিতে 'য'/'য়' অক্ষর দুটি লিপিতে অভিন্ন থাকে নি, 'য'-র নীচে বিন্দু যুক্ত হয়ে 'য়' স্বতন্ত্র অক্ষররূপে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছে।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের প্রথম সংস্করণের চারটি শব্দের পাঠে বসন্তবাবু পদের আদিতে 'য়' অনুমান করেছিলেন। অন্য উপায়ে পাঠ স্থির করতে না পেরে বাধ্য হয়েই করেছিলেন। তবু মনে খটকা রয়ে গিয়েছিল। শব্দ চারটি এই—

১. য়ে-বা-র আণিএ্রাঁ দিলে কাহ্ন মোর ঠাঁয়ি।
তোক আর কভোঁ দুখ না দিবোঁ বড়ায়ি॥ পৃ. ৩৮৮

২. হর আর্দ্ধ আঙ্গে গোরী শিরে গঙ্গা ধরে।
য়ে-তে-কে যাণিল নারী যেহেন শরীরে॥ পৃ. ৩৮৮

৩. নানাবিধ দুখ পাঁয়িলোঁ
য়া-র বিরহে পুড়িলোঁ
সে কাহ্নে নান্দে বাইতে মোরে। পৃ. ৩৯০

৪. উতরলী নহ রাধা মন কর থীর।
যা য়া-না-হী না জাণে লোক তা জাই ঘর॥ পৃ. ৩৯১

এই চারটি শব্দই তথাকথিত দ্বিতীয় লিপিকরের লিখিত অংশে (পুথির পৃ. ২২১।১, ২২২।১) এবং 'য়ে-বা-র' ও 'য়ে-তে-কে' শব্দ দুটি একই গানে পাওয়া যাচ্ছে। পরবর্তী সংস্করণে এই চারটি শব্দের একটিকে ('য়া-র) সম্পাদক রূপান্তরিত করতে পেরেছিলেন (দ্র. 'যা-র বিরহে পুড়িলোঁ', ৪র্থ সং, পৃ. ১৫৪)। এতেই বোঝা যায় পদের আদিতে 'য'-কে 'য়' পড়তে বসন্তবাবুর মন পুরোপুরি সায় দেয় নি। সম্ভব হলে অন্য তিনটি শব্দকেও 'য'-তে রূপান্তরিত করতে পারলে তিনি খুশীই হতেন বলে মনে হয়, অর্থসংগতি থাকবে না আশঙ্কায় তা করেন নি। অর্থসংগতি রক্ষা করতে গিয়ে বসন্তবাবু এই তিনটি শব্দে পুথির বানান-রীতিকে উপেক্ষা করেছেন। কিন্তু দ্বিতীয় উদ্ধৃতিটিতে 'য়ে-তে-কে'-র পরিবর্তে 'যে-তে-কে' পাঠ ধরলে অর্থের এবং প্রয়োগের তেমন গুরুতর কোনো পরিবর্তন হয় বলে মনে হয় না। এ-রকম প্রয়োগ শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে বিরল নয়। গোলমাল 'য়ে-বা-র' নিয়ে। 'যে-বা-র' পাঠ ধরলে পদের দ্বিতীয় লাইনটির অর্থে সংগতি থাকে না। প্রসঙ্গ অনুসারে 'এ-বা-র'-ই হবে তাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নেই। একটি লাইন আগেও লিপিকর 'এ-বা-র' লিখেছেন ('এবার পায়িলে বড়ায়ি সে সুন্দর কাহ্নে')। আলোচ্য লাইনটিতেও লিপিকর 'এ-বা-র'-এর বিকল্প বানান 'য়ে-বা-র' লিখেছেন এ-অনুমান অবশ্যই করা চলত যদি জানতাম পদের আদিতে 'য়' ব্যবহারের রীতি সম্বন্ধে লিপিকর অবহিত ছিলেন। 'দুই' এবং 'দুয়ি', 'মাইল' এবং 'মায়িল' বিকল্প বানান-রীতি স্বীকার করতে কিছুমাত্র বাধা নেই; কারণ, স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে এটা লিপিকরের স্বভাব। কিন্তু 'য'/'য়' বিপর্যয় যে শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তনে সম্ভব নয় তার প্রমাণ পাওয়ার পর কি করে আশা করা যায় 'য়' পদের আদিতে বসতে পারে। তাছাড়া, এত বড় একখানি পুথির একেবারে শেষের দিকের দুটি পাতায় যদি দেখি পদের আদিতে 'য়' বসেছে তাহলে পুথির বানান-রীতির শৃঙ্খলায় সংশয় প্রকাশ করব না পাঠে সংশয় প্রকাশ করব? এ-সমস্যা সম্বন্ধে বক্তব্য এই—লিপিকর পদের আদিতে 'য়' ব্যবহার করেন নি, করা যায় তা তিনি জানতেন না। 'এ-বা-র' লিখবার কথা, লিপিকর 'য়ে-বা-র' লিখেছেন; ভুল করেই লিখেছেন। এ-রকম সাধারণ ভুল লিপিকর বহু জায়গায় করেছেন। তিনি 'বুলিল' স্থলে 'বুলিহ', 'কাহ্ন' স্থলে 'কর', 'বনমালী' স্থলে 'চন্দ্রাবলী', 'দাসী' স্থলে 'রাণী' লিখেছেন। অর্থে আটকাচ্ছে বলে এগুলিকে লিপিকরের ভুল মনে করতে আমাদের বাধে নি, 'য়ে-বা-র' বানানে আটকাচ্ছে বলে ভুল মনে করতে বাধা কি? পুথি সম্পাদনায় অর্থসংগতি রক্ষা করাই কি আমাদের একমাত্র দায়িত্ব, বানান-সংগতি রক্ষার দায়িত্ব থেকে কি আমরা মুক্ত? লিপিকর নিজেই ভুল লিখুন বা মূল পুথির ভুলের পুনরাবৃত্তি করুন, পুথিতে পাওয়া যাচ্ছে 'যে-বা-র'। সমস্যা হল, সম্পাদক 'যে-বা-র'-কে অর্থসংগতি রক্ষার জন্য 'য়ে-বা-র' পড়বেন কিনা। এর উত্তর, সম্পাদক পাঠ-নির্ণয় করবেন লিপি এবং ব্যাকরণের নির্দেশে, অর্থসংগতি রক্ষা সম্পাদকের দায়িত্ব নয়।

এবার 'যা য়া-না-হী না জাণে লোক তা জাই ঘর' লাইনটি দেখা যাক। আগে দেখা গেছে 'যা'- পুথিতে নেই, 'য়া-না-হী' শব্দ শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে অসম্ভব। সুতরাং পাঠ দাঁড়াচ্ছে 'যা নাহী না জাণে লোক তা জাই ঘর'। 'যা' অর্থে 'যাবৎ', 'তা' অর্থে 'তাবৎ' (তু. 'যাবত আছে পরাণে ল তাবত দেহ বচনে', পৃ. ১৪২)। গোল বাঁধে 'নাহী' এবং 'না' দুটি নঙর্থক শব্দ নিয়ে। এখানেও অনুমান করতে বাধা নেই লিপিকর ভুল করে একটি অতিরিক্ত 'না'

লিখে ফেলেছেন। সুতরাং অনুমিত পাঠ দাঁড়াচ্ছে—'যা নাহী জাণে লোক তা জাই ঘর'। অর্থাৎ 'যাতে লোকে জানতে না পারে, তেমনভাবে ঘরে যাই [চলো]'।

ক. কেমনে কাহ্নের　　বোল পালিবোঁ
মো-য়ে পরাণে ডরাওঁ॥　　পৃ. ২৪
খ. মুছিআঁ পেলায়িবোঁ [মো]-য়ে সিসের সিন্দুর। পৃ. ১৩২

উপরের উদ্ধৃতি দুটিতে 'মো-য়ে' এবং '[মো]-য়ে' পাঠ সম্পূর্ণ সংশয়রহিত বলে মনে হয় না। পুথিতে 'য়' নেই বলেই যে শব্দ দুটি সন্দিগ্ধ তা নয়। পুথিতে 'আমি' অর্থে 'আহ্মি', 'আহ্মে'-র পাশাপাশি 'মো', 'মোএঁ' বা 'মোঞেঁ' অসংখ্য জায়গায় ব্যবহৃত হয়েছে; কিন্তু 'মো-য়ে' পাওয়া যাচ্ছে মাত্র উপরের উদ্ধৃতিটিতে। এর মধ্যে দ্বিতীয় উদ্ধৃতির প্রয়োগটি আদৌ সন্দেহাতীত নয়। '[মো]-য়ে' পুথির পাঠ নয়, সম্পাদকের অনুমিত পাঠ। সম্পাদক এ-জায়গায় পুথির 'যে'-কে 'য়ে' পড়েছেন বলেই '[মো]-য়ে পাঠ পুনর্গঠিত করবার প্রয়োজন হয়েছে। কিন্তু লিপি অনুসারে 'যে' এবং 'য়ে' দুই-ই যখন সম্ভব তখন একটির পরিবর্তে অন্যটি কেন নির্বাচন করা হচ্ছে তার কারণ নির্দেশ করা প্রয়োজন। প্রথম সংস্করণে সম্পাদকের মনে দ্বিধা ছিল, তাই মুদ্রিত পাঠ থেকে শব্দটি তিনি বাদ দিয়েছিলেন (দ্র. 'মুছিআঁ পেলায়িবোঁ সিসের সিন্দুর', পৃ. ৩৩৬)। পরবর্তী সংস্করণে এই জায়গার পাঠ স্থির করবার সময় '[মো]-য়ে' যে 'মো-এঁ'-র বিকল্প বানান সে-সম্পর্কে সম্পাদক দ্বিধা কাটিয়ে উঠেছিলেন এবং '[মো]-য়ে' পাঠই যে যথার্থ সে-সম্বন্ধে তাঁর মনে সংশয় ছিল না। কিন্তু এখানেও বিচার ঠিক যুক্তি অনুসারে হয় নি। পুথির 'যে'-কে 'য়ে' মনে করে '[মো]-য়ে' পাঠ পুনর্গঠিত করবার আগে অন্য সম্ভাবনার কথাও বিবেচনা করে দেখা উচিত ছিল। অন্য সম্ভাবনাটি এত স্পষ্ট যে সম্পাদকের দৃষ্টি কেন সেদিকে আকৃষ্ট হয় নি, বোঝা শক্ত। পুথিতে নিশ্চয়ার্থে এবং অবধারণে 'যে' বহু জায়গায় ব্যবহৃত হয়েছে, কোথাও 'যে' বানানে, কোথাও 'জে' বানানে। যেমন, 'আহ্মে যে কৃষ্ণ হরি বনমালী', পৃ. ৪০, 'তোহ্মে যে বড়ায়ি হঅ কাহ্নাঞি'র দূতী', পৃ. ১১০, 'মো যে সখি সব সঙ্গ করিবোঁ', পৃ. ১১৮, 'মো জে কস্তুরী কপুর খাইবোঁ', পৃ. ১১৮, 'বড় দুষ্টমতী সে জে কাহ্ন', পৃ. ৯৭, 'মো জে গোআলিনী আবালী রাধা', পৃ. ৩৯। সম্পাদক যে শব্দটিকে '[মো]-য়ে' বলে অনুমান করেছিলেন সে-শব্দটি যদি পুথিতে 'যে'-র পরিবর্তে 'জে' বানানে লেখা হত (যেমন হয়েছে 'মো জে কস্তুরী কপুর খাইবোঁ' এবং 'মো জে গোআলিনী আবালী রাধা' লাইন দুটিতে) তাহলে তিনি '[মো]-য়ে' পাঠ ধরতেন কিনা সন্দেহ। নিতান্ত আকস্মিকভাবে 'জে'-র পরিবর্তে 'যে' লেখা হয়েছে বলেই সম্পাদকের মনে সর্বাগ্রে '[মো]-য়ে' এসেছে। কিন্তু পুথিতে 'যে' এবং 'জে' অভিন্ন একথা মনে রেখে পাঠ-নির্ণয় করলে সম্পাদকের আনুমানিক পাঠের পরিবর্তে 'মুছিআঁ পেলায়িবোঁ যে সিসের সিন্দুর' পাঠ অধিকতর সঙ্গত মনে হয়। সুতরাং সম্পাদকের পুনর্গঠিত '[মো]-য়ে'-র কথা ছেড়ে দিলে 'মো-য়ে' শব্দের প্রয়োগ সমগ্র শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে মাত্র একটি জায়গায় পাওয়া যাচ্ছে—'মো-য়ে পরাণে ডরাওঁ' লাইনটিতে। সেই কারণে শব্দটি সন্দিগ্ধ। তা ছাড়াও, শব্দটিকে সমর্থন করবার মত কোনো যুক্তি শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে নেই। উত্তম পুরুষের সর্বনামে 'মো-ঞেঁ',

'মো-ঞি', 'মো-ঞ", 'মো-এ", 'মো'-র পাশে যেমন 'মো-য়ে' শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে ব্যবহৃত হয় নি, তেমনি মধ্যম পুরুষের 'তো-ঞে", 'তো-ঞি", 'তো-ঞ", 'তো-এ", 'তো'-র পাশে 'তো-য়ে' একবারও নেই। 'তো-য়ে' পাওয়া গেলেও অন্তত সেই যুক্তিতে 'মো-য়ে' সমর্থন করা একেবারে অসম্ভব হত না। শব্দটি যদি বিশেষ্যপদ হত তা হলেও একমাত্র প্রয়োগের ব্যাপারটির উপর গুরুত্ব না দিলেও চলত। কিন্তু 'আমি' অর্থে এতগুলি সর্বনাম পদ এত বিভিন্ন বানানে পাওয়া যাচ্ছে, শুধু পাওয়া যাচ্ছে না 'তো-য়ে'—একে আকস্মিক মনে করতে বাধে। সুতরাং 'মো-য়ে' শব্দটি শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে ব্যবহৃত হয় নি এ-অনুমান অপরিহার্য হয়ে পড়ছে। এই অনুমানের পক্ষে অবশ্য অন্য যুক্তিও আছে।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পুথির বানান-রীতি পরীক্ষা করলে দেখা যায় আধুনিক বাংলায় এমন মধ্যযুগের কোনো কোনো বাংলা পুথিতে শব্দের মধ্যে এবং অন্ত্যে যেখানে '-য়ে-'/'-য়-' লেখা হয় শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে সেখানে 'এ' লেখা হয়। এ-রীতি প্রাচীন কি আধুনিক, আঞ্চলিক কি প্রাদেশিক সে-প্রশ্ন এখানে অবান্তর, কিন্তু এটা যে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পুথির বানানের বৈশিষ্ট্য সেটা বিশেষভাবে লক্ষ্য করবার বিষয়। কয়েকটি উদাহরণ দিচ্ছি—'ক-র-এ' (৭৯)='করয়ে', 'বা-জা-এ' (৭৯)='বাজায়', 'যা-এ' (৭৯)='যায়', 'হ-এ' (৭৯)='হয়', 'জু-আ-এ' (৭৯)= 'জুয়ায়', 'বি-কা-এ' (৭৯)='বিকায়', 'জা-গা-এ' (৭৮)='জাগায়', 'আ-ছ-এ' (৭৮)='আছয়ে', 'মা-এ-র' (৭৮)='মায়ের', 'আ-ভ-এ' (৮৭)='আভয়', 'তো-ল-এ' (৮৩)='তোলয়ে', 'র-ম-এ' (৮৪)='রময়ে', 'পো-ড়-এ' (৮৬)='পোড়য়ে', 'পা-তি-আ-এ' (৮৭)='পাতিয়ায়', 'র-এ' (২৯) ='রয়ে', 'শো-ভ-এ' (২৯)='শোভয়ে', 'পা-এ' (২৯)='পায়', 'জী-এ' (২৯)='জীয়ে', 'গী-এ' (২৯)='গীয়ে', 'প-রি-চ-এ' (১৮)='পরিচয়', 'বি-ন-এ' (১৩৪)='বিনয়', 'স-ম-এ' (৫)= 'সময়', 'যা-এ' (১১)='যায়', 'দে-এ' (১২)='দেয়'। এ-রীতির যে ব্যতিক্রম নেই তা নয়, তবে ব্যতিক্রম বিরল। হাজার হাজার 'এ'-র পাশে গুটিকয়েক শব্দে 'য়ে' থাকলে বুঝতে হবে 'এ' নিয়ম, 'য়ে' নিয়মের ব্যতিক্রম। যেখানে সংশয় সেখানে নিয়মকে ছেড়ে ব্যতিক্রমকে আঁকড়ে ধরা অযৌক্তিক। সুতরাং স্বীকার করতেই হবে 'মো-য়ে' পাঠ পুথির বানান-রীতি অনুসারেও অসম্ভব। সেই কারণে সম্পাদকের 'মো-য়ে'-র পরিবর্তে 'মো-যে' পাঠ ধরলে সব দিক থেকেই সঙ্গতি রক্ষা হয়, অর্থেরও সামঞ্জস্য থাকে। তাহলে লাইন দুটির পাঠ হবে—'মো যে পরাণে ডরাওঁ' এবং 'মুছিআঁ পেলাইবোঁ যে সিসের সিন্দুর'।

'তীন ভুবনে নাহি" হেন আছিদরী।
হা-ণে কু-লে এখো নাহি" পাটাবুকী তিরী॥' পৃ. ১১

উপরের উদ্ধৃতিটিতে প্রথম লাইনটি সম্বন্ধে কোনো সংশয় নেই, কিন্তু দ্বিতীয় লাইনটির 'হা-ণে কু-লে' পাঠ মেনে নেওয়া অসম্ভব হয়ে পড়ছে। 'হা-ণে কু-লে' বাক্যাংশের অর্থ সম্বন্ধে বসন্তবাবুর মনেও সংশয় ছিল, তাই টীকায় 'এহেন বংশে' অর্থ দিয়ে তিনি জিজ্ঞাসার চিহ্ন দিয়েছিলেন, দ্র. ৪র্থ সং. পৃ. ১৯৩। 'কু-লে' অর্থে বংশে স্বীকার করা গেল, কিন্তু 'হাণে' অর্থে 'এহেন' একটু অস্বাভাবিক, বিশেষ করে আগের লাইনেই যখন 'হেন' ব্যবহৃত হয়েছে। পুথির এই জায়গায় ছবি ৯৫ পৃষ্ঠায় দেখুন। পুথির ছবি খুঁটিয়ে দেখলে অবশ্যই ধরা পড়বে যে, বসন্তবাবু যে-শব্দটিকে 'হা-ণে' মনে করেছেন সে-শব্দটি 'হা-ণে'

তীনভুবনেনাহিঁতমআতিসবী। হালেকুলেএথানাইঁগাইবুকীতিবী॥

নয়, 'হা-লে'। আরও কয়েকটি জায়গায় যেমন হয়েছে এখানেও তেমনি 'ণ'/'ল'-র পার্থক্য বসন্তবাবুর চোখ এড়িয়ে গেছে। 'ণ'/'ল'-র লিপিগত পার্থক্য সম্বন্ধে এখানে সংক্ষেপে এটুকু বলতে পারি যে একমাত্র 'ণি' ছাড়া আর কোথাও 'ণ'-র মাথায় মাত্রা থাকে না; এবং একমাত্র 'ণি' ছাড়া সর্বত্রই 'ণ'-র বাঁ ও ডান অংশের সংযোগ উঁচুতে, অক্ষরের উচ্চতম বিন্দুতে। ছবিতে দেখুন বসন্তবাবু যে-অক্ষরটিকে 'ণে' মনে করেছেন তার মাথায় মাত্রা আছে এবং তার বাঁ ও ডান অংশের সংযোগ অনেক নীচেয়, ডানদিকের দাঁড়ি-রেখার প্রায় মাঝামাঝি জায়গায়। সুতরাং অক্ষরটি অবশ্যই 'লে'। সম্পূর্ণ নিঃসংশয় হওয়ার জন্য 'হা-লে'-র 'লে' অক্ষরটির সঙ্গে 'ম-ণে'-র 'ণে' অক্ষরটির তুলনা করুন। 'ম-ণে'-র ছবি দেওয়া হল।

মণে

'ণে'/'লে'-র লিপিগত পার্থক্য সম্বন্ধে বসন্তবাবু যে অবহিত ছিলেন না তা নয়, তিনি 'কু-লে'-র 'লে' পড়তে ভুল করেন নি এবং এই 'লে'-র সঙ্গে তুলনা করলেই তিনি সহজেই ধরতে পারতেন 'হা-ণে' পাঠ অসম্ভব। হয় অসতর্কতার জন্য বসন্তবাবু 'হা-লে'-কে 'হা-ণে' পড়েছেন, কিংবা 'হালে কুলে'-র চেয়ে 'হাণে কুলে' তাঁর কাছে শুদ্ধতর বোধ হওয়ায় এই পাঠই তিনি স্থির করেছেন। তবে পুথির পাঠ পাদটীকায় উদ্ধৃত হয় নি বলে অনুমান করা যেতে পারে যে এখানে পাঠের পরিবর্তন করা হয় নি, পাঠোদ্ধারে গোলমাল-ই হয়েছে।

এবার 'কুলে' শব্দটি পুথির ছবিতে বিশেষ সতর্কতার সঙ্গে লক্ষ্য করতে বলি। পুথিতে দু' রকমের 'ক' আছে, এক রকম 'ক' দেখতে প্রায় 'ফ'র মত। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়েরও তাই মনে হয়েছিল (শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, ভূমিকা, ১৸৴০)। 'ক' ও 'ফ' দুটি অক্ষরেরই ডানদিকে আঁকুড়ি আছে এবং দুটিরই উৎপত্তি মাত্রা থেকে তির্যগ্ভাবে বেরিয়ে আসা ছোট একটি রেখার প্রান্ত থেকে। এই মিল ছাড়া অমিলও আছে অনেক। 'ক' ও 'ফ' অক্ষর দুটির গঠন-বৈশিষ্ট্য বিস্তৃতভাবে আলোচনার স্থান এটি নয়। সংক্ষেপে এটুকু বলতে পারি যে 'ক'-র পেট পুষ্ট, 'ফ'-র পেট অপুষ্ট। এছাড়া, 'ক' লিখতে কলম যখন উপর থেকে নীচেয় নেমে আবার উপরে ওঠে তখন সোজাভাবে ওঠে, উপরে উঠে একটু বাঁক নিয়ে ডানদিকের আঁকুড়িটা লেখে। 'ফ' লিখতে কলম সোজাভাবে নীচে থেকে উপরে ওঠে না, ডানদিকে একটু বেঁকে উপরে ওঠে। কিন্তু উপরে উঠবার সময় কলম যদি যথেষ্ট না বাঁকে তাহলে বাঁ-অংশ ডান-অংশের সঙ্গে জুড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে (কারণ, 'ফ'-র পেট ক্ষুদ্র)। জুড়ে না গেলেও বাঁ ও ডান-অংশের মধ্যে ফাঁক যদি অপ্রশস্ত হয় তাহলে 'ক' ও 'ফ'-র মধ্যে পার্থক্য স্থির করা শক্ত হয়ে পড়ে। আলোচ্য জায়গায় তাই হয়েছে। যে-শব্দটিকে বসন্তবাবু 'কু-লে' পড়েছেন, সে-শব্দটি সম্ভবত 'ফু-লে'। বাঁ-অংশ ডান-অংশের সঙ্গে জুড়ে যাওয়ার ফলে 'ফু'-কে 'কু'-র মত দেখাচ্ছে। অক্ষরের দুটি অংশ এ-রকম জুড়ে যাওয়ার দৃষ্টান্ত বিরল নয়, বিশেষ করে পুথির প্রথম দিকে অর্থাৎ ১৫।২ পাতা পর্যন্ত। এই অংশে প্রতি পাতায় ৮টি করে লাইন লেখা হয়েছে বলে অক্ষরের আকার খুব ছোট হয়েছে। ১৫।২ পাতার পরবর্তী অংশে অক্ষরগুলি বেশ বড়, অন্তত পুথির প্রথম অংশের তুলনায়। প্রথম অংশে আকস্মিকভাবে অক্ষরের দুটি অংশ জুড়ে যাওয়ার দৃষ্টান্ত একাধিক আছে। নীচের 'ম-থু-রা' শব্দটির দুটি ছবি দেওয়া হল। 'থু' অক্ষরটির দুটি অংশ পৃথক থাকা উচিত, কিন্তু একটিতে জুড়ে গেছে, একটিতে পৃথক আছে। 'থু'-র

দুটি অংশ জুড়ে গেলেও অন্য অক্ষরের সঙ্গে গোলমালের সম্ভাবনা নেই, তাই প্রথম 'ম-থু-রা'-র পাঠোদ্ধারে গোলোযোগ সৃষ্টি হয় নি। কিন্তু 'ফ'-র দুটি অংশ জুড়ে গেলে 'কু'-র মত দেখায়; তাই বসন্তবাবু 'ফু'-কে 'কু' মনে করে পাঠ-নির্ণয় করেছেন।

মথুরা মথুরা

এ-কথা ঠিক যে তাড়াতাড়ি পড়লে আকারসাদৃশ্য হেতু 'ফু'-কে 'কু' পড়া অস্বাভাবিক নয়, বিশেষত 'ফ'-র বাঁ ও ডান-অংশ যদি জুড়ে গিয়ে থাকে। কিন্তু একটি মারাত্মক বাধা আছে। যিনি পুরনো বাংলা লিপি বা শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পুঁথির লিপি মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করেছেন তিনি চরম অসতর্কতার মুহূর্তেও 'ফু'-কে 'কু' বলে সন্দেহ করবেন না। বসন্তবাবু যে-অক্ষরটিকে 'কু' পড়েছেন সে-রকম 'কু' শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে দেখতে পেলে যে-কেউ-ই চমকে উঠবেন। এরকম 'কু' শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে থাকলে বৃথাই পুঁথির লিপিকাল নিয়ে এতদিন এতজন এত রকম জল্পনা-কল্পনা করেছেন। আধুনিক বাংলায় আমরা যে 'কু' লিখি সে-রকম 'কু', পুঁথিতে দূরের কথা, প্রথম যুগের ছাপা বাংলা বইতেও সচরাচর দেখতে পাওয়া যায় না। কি প্রাচীন পুঁথি, কি উনিশ শতকের পুঁথি, পুঁথিতে বাংলা 'কু' অক্ষরটির আকার আধুনিক বাংলার চৈতনহীন 'ঈ'-র মত। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের 'কুম্ভ' শব্দটির ছবি দেখুন। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে এই 'কু' সর্বত্রই ব্যবহৃত হয়েছে। সুতরাং 'ফু-লে'-র 'ফ' অক্ষরটির সঙ্গে 'ক'-র গোলমাল হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকলেও, যখনই অক্ষরটিতে উ-কার যুক্ত হয়েছে তখনই সে-গোলমালের সম্ভাবনা অন্তর্হিত হয়েছে। 'কু' এবং 'ফু'-র এই পার্থক্য কি করে বসন্তবাবুর দৃষ্টি এড়িয়ে গেল, বোঝা শক্ত।

কুম্ভ

তাহলে লাইনটির পাঠ দাঁড়াচ্ছে—'হালে ফুলে এখো নাহিং পাটাবুকী তিরী॥' এখন স্বভাবতই প্রশ্ন হবে, 'হালে ফুলে'-র অর্থ কি? অর্থ সম্বন্ধে মতদ্বৈধ থাকতে পারে, সেটা বড় কথা নয়। আমাদের কর্তব্য লিপি অনুসারে পুঁথির পাঠোদ্ধার করা এবং ব্যাকরণ অনুসারে পাঠ-নির্ণয় করা। পুঁথির পাঠ অর্থহীন হলেও প্রথমে জানা দরকার, পুঁথিতে কি পাঠ আছে। পাঠের সংশোধন, সংস্করণ পরের কথা। এখানে, লিপি অনুসারে 'হাণে কুলে'-র পরিবর্তে 'হালে ফুলে' পাঠ পড়তে হবে, এটা প্রথম কথা এবং প্রধান কথা। অর্থ সম্পর্কে বলা যায় যে, 'হালে ফুলে' পাঠ একেবারে অর্থহীন নয়। জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের বাংলা অভিধানে 'হাল্‌ফিল্‌' শব্দটির অর্থ দেওয়া হয়েছে 'উপস্থিত', 'এখন'। তাঁর মতে আরবী শব্দ 'ফিল্‌হাল্‌' বাংলায় শব্দ-বিপর্যয়ের ফলে 'হাল্‌ফিল্‌' হয়েছে। 'হালফিল' এবং 'হালেফেলে' বাংলা ভাষায় অপ্রচলিত নয়। সম্ভবত 'হালেফুলে' শব্দটি 'হাল্‌ফিল্‌' শব্দের বিকৃতি বা স্থানীয় পরিবর্তন। অর্থের দিক থেকে বাধা নেই 'ইদানীং', 'আজকাল', 'সচরাচর', যে-কোনো অর্থই প্রাসঙ্গিক। এই পাঠ, এই ব্যুৎপত্তি ঠিক হলে শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তনের "কয়েকটি" আরবী-পারসী শব্দের সঙ্গে নূতন আর একটি আরবী শব্দ যুক্ত হল।

'মোর বুধী তো রাখউ মতী' পৃ. ১০৮

টীকার এই ছত্রটির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে সম্পাদক মন্তব্য করেছেন—'তো' অর্থে 'তোমার' (তুলনীয় চর্যাপদ), 'রাখউ' অর্থে 'রক্ষা করুক'। প্রথম সংস্করণে লাইনটির পাঠ ছিল 'মোর বুধী তোর খেউ মতী' (পৃ. ২৭৫)। তবে প্রথম সংস্করণের পাঠ সম্বন্ধে সম্পাদক সম্পূর্ণ নিঃসংশয় ছিলেন না বলে টীকায় মন্তব্য করেছিলেন "বোধহয় 'মোর বুধী তো রাখ উ মতী' পাঠ হইবে।" (১ম সং. পৃ. ৬১৪)। 'রাখউ' পাঠ যেন বসন্তবাবুর মনে একেবারে শুরু থেকে দৃঢ়মূল হয়ে গেঁথে গিয়েছিল। প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হওয়ার পর একটি প্রবন্ধে তিনি বলেছিলেন প্রথম সংস্করণের 'খেউমতী' পাঠ ঠিক নয়। "শুদ্ধ পাঠ 'মোর বুধী তো রাখউ মতী', কলিতার্থ 'আমার গোয়াল-বুদ্ধি তোমার [চঞ্চল] মতিকে [অবশ্যম্ভাবী পরিণাম হইতে] রক্ষা করুক।" (সাহিত্য-পরিষদ্ পত্রিকা, ১৩৪৪, ১ম সংখ্যা, পৃ. ৩৭)। যোগেশচন্দ্র রায় 'খেউমতী' পাঠে সন্দেহ প্রকাশ না করে ছত্রটির অর্থ করেছেন—"আমার বুদ্ধি আছে, তোমার মতি ক্ষত।' (সাহিত্য পরিষদ্ পত্রিকা, ১৩৪২, ২য় সংখ্যা, পৃ. ৭৩)।

পুথিতে আছে 'মোর বুধী তো-র-খে-উ-ম-তী'। প্রথম সংস্করণে পুথির পাঠই মুদ্রিত হয়েছিল, যদিও এ-পাঠে সম্পাদকের সমর্থন ছিল না। দ্বিতীয় এবং পরবর্তী সংস্করণের সংশোধিত পাঠে সন্দেহ করবার একাধিক কারণ আছে। প্রথম, লিপিকরপ্রমাদ। সম্পাদকের সংশোধিত পাঠ শুদ্ধ হলে অনুমান করতে হয় লিপিকর 'তো রাখউ মতী' লিখবার পরিবর্তে ভুল করে 'তোর খেউমতী' লিখেছেন, অর্থাৎ অসতর্কতাবশত 'র' না লিখে 'রা' লিখেছেন। এরকম ভুল লিপিকর অবশ্যই করতে পারেন। কিন্তু লিপিকর ভুল করেছেন এ যুক্তি এত সহজ এবং অনায়াসলভ্য যে সর্বপ্রকার অনুসন্ধান-চেষ্টায় ফল না হলে অগত্যা লিপিকরপ্রমাদের শরণাপন্ন হওয়া উচিত। অন্যথায় দোষের বোঝা লিপিকরের স্কন্ধে দুর্বহ হয়ে ওঠে। দ্বিতীয়, ব্যাকরণের বাধা। 'তোমার মতিকে রক্ষা করুক' এই অর্থের কথা মনে রেখে বসন্তবাবু 'তো রাখউ মতী' পাঠ স্থির করেছেন, কিন্তু এই পাঠে এবং অর্থে যে ব্যাকরণের রীতি লঙ্ঘন করা হয় সেদিকে লক্ষ্য দেন নি। 'তোমার' বা 'তোর' অর্থে 'তো'-র ব্যবহার শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে নেই। 'তোঁ লাগি'-র প্রয়োগ একবার আছে বটে তবে তা বিশেষ প্রয়োগ এবং এখানেও 'তোঁ'-র অর্থ যে 'তোর' তা আধুনিক প্রয়োগের নজিরে (তু. 'তোর লাগি', 'তোর জন্য'। চর্যার 'তো মুহ' অর্থাৎ 'তোর মুখ' প্রয়োগটির কথা ভেবেই বসন্তবাবু চর্যাকে সাক্ষ্য মেনেছিলেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে ত 'তো মতী' নেই, আছে 'তো রাখউ মতী'। দুটিতে আকাশ-পাতাল তফাত; সুতরাং চর্যার সাক্ষ্য এক্ষেত্রে অচল। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের সর্বনাম পদগুলির ব্যবহার লক্ষ্য করলে ধরা পড়ে যে, '-র' বিভক্তিযুক্ত সর্বনাম সাধারণ বিশেষ্যের অব্যবহিত পূর্বে বসে। যেমন, 'তোর মুখে' (৫), 'তোর বড়ান্নি' (৬), 'তোর আলিঙ্গনে' (৯), 'তোর কাজে' (৫), 'তোর দরশনে' (৮), 'তোর নাতিনী (১০)। ব্যতিক্রমও আছে, 'অদভুত লাগে তোর সুণিআঁ বচন' (৬০)। এখানে 'তোর' এবং 'বচন' সম্বন্ধবন্ধ, কিন্তু 'বচন'-এর অব্যবহিত আগে 'তোর' বসে নি। নিয়ম এবং নিয়মের ব্যতিক্রম উভয়ক্ষেত্রেই কিন্তু 'তোর', 'তো' নয়। বসন্তবাবু যদি 'তো[র] রাখউ মতী' পাঠ পুনর্গঠন করতেন তাহলে মূলের উপর গুরুতর হস্তক্ষেপ হত বটে কিন্তু ব্যাকরণের নিয়ম লঙ্ঘন হত না। ব্যাকরণের নিয়ম কি? অব্যবহিত পূর্বপদের সঙ্গেই পরপদের সমাস হয়। চর্যার 'তো মুহ' তার উদাহরণ। সমাসবন্ধ (সমাসবন্ধ বলতে আপত্তি থাকলে সম্বন্ধবন্ধ) পদের মধ্যে অন্যপদ সন্নিবিষ্ট হতে পারে না, সন্নিবিষ্ট হলে সম্বন্ধভঙ্গ হয়। সুতরাং

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে 'তো' পাওয়া না গেলেও 'তো মতী' অর্থে 'তোমার মতি' স্বীকার করতে কিছুমাত্র আপত্তি ছিল না। কিন্তু 'তো রাখউ মতী' পাঠে 'রাখউ'-কে ডিঙিয়ে 'তো' এবং 'মতী'-র সম্বন্ধবন্ধ হওয়া অসম্ভব। তাই 'তো রাখউ মতী' অর্থে 'তোমার মতি রক্ষা করুক' শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ত বটেই বাংলা ভাষার প্রকৃতিবিরুদ্ধ। তৃতীয়, গোটা লাইনটির অর্থই আনুমানিক। অর্থ স্পষ্ট করতে সম্পাদককে অনেকগুলি শব্দ আমদানি করতে হয়েছে। যদি বাইরে থেকে এরকমভাবে ঠেলা দিয়ে অর্থ টেনে বের করতে হয় তাহলে বুঝতে হবে হয় অর্থ বের করবার ঠিক চাবিটা পাওয়া যায় নি, কিংবা পাঠে গোলমাল আছে। এক্ষেত্রে পাঠের বিশুদ্ধতায় সংশয় করবার কারণ পাওয়া গেছে। কিন্তু বসন্তবাবু সেদিকে লক্ষ্য না দিয়ে 'খেউমতী' পাঠ এড়াবার জন্যেই যেন জোর করে 'রাখউ মতী' পাঠ দাঁড় করিয়েছেন এবং তার অর্থ করতে নিজেও গলদ্ঘর্ম হয়েছেন, ভাষারও প্রাণান্ত হয়েছে।

লাইনটি কৃষ্ণের প্রতি রাধার উক্তি। প্রসঙ্গ এই—কৃষ্ণ বলছে, রাধা তুই রোজ দই বিক্রি করিস [অর্থাৎ তুই গোয়ালা, দুধ-দই বিক্রি তোর পেশা] তোর কতই না বুদ্ধি হবে।

'রাধা নিতী বিকণসি দধী।
তোর হৈবে কত না বুধী॥'

কৃষ্ণের অভিযোগের উত্তরে রাধা বলছে, কানাই, আমি গোয়ালা জাতি বটে, কিন্তু আমার [আছে] বুদ্ধি, তোর 'খেউমতী'।

'কাহ্নাঞি' হওঁ মো গোআল জাতী।
মোর বুধী তোর খেউমতী॥'

লক্ষ্য করতে হবে যে এখানে তর্ক রাধা ও কৃষ্ণের বুদ্ধি [-নির্বুদ্ধিতা] বিষয়ক। স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে 'মোর' [রাধার নিজের প্রতি] 'তোর' [কৃষ্ণের প্রতি], বুধী [রাধার নিজের প্রতি], 'খেউমতী' [কৃষ্ণের প্রতি] বিরুদ্ধ শব্দ। 'মোর'-র বিরুদ্ধ বলেই 'তোর' পাঠ স্বীকার করবার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। লিপিকর লিখেছেনও তাই। 'তোর' স্বীকার করলে 'খেউমতী' ছাড়া অন্য কোনো পাঠ অসম্ভব হয়ে পড়ে। গোল বাঁধে 'খেউমতী' নিয়ে; কেননা শব্দটার চেহারার সঙ্গে আমরা পরিচিত নই। কিন্তু একটি গোলমেলে শব্দের দায়িত্ব এড়াতে গিয়ে ভুলের দায়িত্ব লিপিকরের কাঁধে চাপিয়ে দেওয়া সুবিচার নয়।

'খে-উ-ম-তী' শব্দটা কি একেবারেই অসম্ভব? আমার অনুমান 'খেউমতী' শব্দের অর্থ 'ক্ষিপ্তমতি', অর্থাৎ 'ক্ষ্যাপা মতি', অর্থাৎ 'পাগলামি'। 'ক্ষিপ্ত' অর্থে 'পাগলামি' বোঝাতে সংস্কৃতে শুধু ক্ষিপ্ত নয়, 'ক্ষিপ্তচিত্ত' ব্যবহৃত হত। এবং তা থেকে বাংলায় 'ক্ষিপ্ত'র অর্থ দাঁড়িয়েছে 'পাগলামি'। একাধিক অর্থবিশিষ্ট সংস্কৃত 'ক্ষিপ্'/'ক্ষেপ্' ধাতু থেকে উৎপন্ন। সুতরাং 'খেউমতী' শব্দটা গোলমেলে হলেও এর অর্থ এবং ব্যুৎপত্তি একেবারে দুর্জ্ঞেয় হয়ত নয়।

'আজি সে সফল হ[উ নবী]ন যৌবনে' পৃ. ৮২

পুথিতে আছে 'আজি সে সফল...বন যৌবনে'। 'স-ফ-ল' এবং '-ব-ন' এর মধ্যে তিনটি অক্ষরের ঊর্ধ্বাংশ মুছে গেছে। সম্পাদক পুথির লুপ্ত পাঠ পুনর্গঠিত করেছেন। এই পুনর্গঠিত পাঠে সংশয় প্রকাশ করবার কারণ আছে। পুথির এই জায়গার ছবি দেখুন।

(লাইনের শেষ)

(লাইনের শুরু)

পুথিতে 'সফল' এবং 'বন'-র মধ্যে তিনটিই অক্ষর আছে। এই তিনটি অক্ষরের একটি যে 'হ' তাতে সন্দেহ নেই। অর্ধাংশ লুপ্ত হওয়া সত্ত্বেও অবশ্য সম্পাদক 'হ'-কে পুনর্গঠিত পাঠে বন্ধনীর মধ্যে রাখেন নি। 'হ'-র পরে পুথিতে দুটি অক্ষর লুপ্ত। সম্পাদকের পুনর্গঠিত পাঠে কিন্তু তিনটি অক্ষর ('-উ নবী-'); অর্থাৎ সম্পাদক একটি অতিরিক্ত অক্ষর যোজনা করেছেন। পুনর্গঠিত 'হউ' পাঠে আপত্তিজনক কিছু নেই। কিন্তু '[ন-বী-]ন' পাঠ পুনর্গঠিত করতে গিয়ে সম্পাদক ভুলে গেছেন যে লুপ্ত অক্ষর কটির পরে 'ন' নেই, আছে 'বন' (পুথির ছবি দেখুন)। '[ন-বী-]ন' পাঠ পুনর্গঠিত করলে পাঠ দাঁড়ায় '[ন-বী-]ব-ন'। সে-পাঠ অসম্ভব। সুতরাং পুথির সঙ্গে পুনর্গঠিত পাঠের সামঞ্জস্য থাকছে না।

আগেই বলা হয়েছে লুপ্ত অক্ষর তিনটির একটিকে 'হ' মনে করতে বাধা নেই। অন্য দুটি অক্ষরের যে নিম্নাংশটুকু অবশিষ্ট আছে তা দেখে সহজেই অনুমান করা যায় যে অক্ষর দুটির আকার উ, ত, ভ, ড, জ প্রভৃতি অক্ষরের অনুরূপ। অর্থাৎ অক্ষর দুটির নিম্নার্ধ অর্ধবৃত্তাকার। সেই কারণে [হ-উ] পাঠ অসম্ভব নয়। বাকী যে একটি অক্ষর সেটিও উ, ভ, ত, ড, জ প্রভৃতির একটি। পুথিতে পরে আছে 'ব-ন'। 'ব-ন'-র আগে একটি দাঁড়ির মত রেখা আছে। রেখাটি অবশ্যই লুপ্ত ব্যঞ্জন অক্ষরের সঙ্গে সংযুক্ত া-কার কিংবা ী-কার ('ব'-র সঙ্গে সংযুক্ত ি-কার নয়, ি-কার হলে 'ব'-র কাঁধ থেকে আর একটি রেখা বের হত।) সুতরাং লুপ্ত ব্যঞ্জন অক্ষরটি অবশ্যই 'জ' এবং 'ব-ন'-র আগেও রেখাটি ী-কার, ঊর্ধাংশ মুছে গেছে। গোটা শব্দটি তাহলে '[জী]-ব-ন'। সম্পাদকের 'আজি সে সফল হ[উ নবী]ন যৌবনে' পাঠের পরিবর্তে 'আজি সে সফল [হউ জী]বন যৌবনে' পাঠ ধরলে পুনর্গঠিত পাঠ মূলের নিকটতর হয় বলে মনে হয়।

আধ্বনিক সাহিত্য

তিরিশের যুগের বাঙালি লেখকরা বাংলা গল্পের খ্যাতি যতই ত্বরান্বিত করে থাকুন, গল্প-ভাবনার একটা ক্ষতিও তাঁরা করে গেছেন। বিষয়বৈচিত্র্যের আকর্ষণ তাঁদের উদ্দিষ্ট করেছিল নিটোলতার দিকে, বা, বলা যায়, নিপুণ কাহিনী সৃষ্টির চমৎকারিত্বে। রীতিটা মঁপাসা, শেখভ্ হয়ে মম্ কিংবা, বড়জোর, লরেন্সীয় অনুভাবনায় এসে থমকে দাঁড়িয়েছিল; এমনকি গল্পগুচ্ছের প্রায় অর্ধেক গল্পে যে অতীন্দ্রিয় সুষমা বিকীর্ণ তার ধারেকাছে যাওয়ার প্রয়োজনও তেমনভাবে অনুভূত হয়নি। তা হলেও, বাংলা গল্পের শক্ত বনিয়াদের সৃষ্টি এঁদেরই হাতে। ঘটনা, চমক, রহস্যবৈচিত্র্য নির্ভর করে জ্যামিতিক নিয়মে গল্পকে শিল্পের স্তরে উতরে দেয়া—কেতাবি ধারণায় এটা অবশ্যই শ্লাঘার বস্তু এবং কাম্য; কে না জানে, এর মধ্যেই নিহিত থাকে সাফল্যের শর্ত। কিছু অনিবার্য ব্যতিক্রম ধরে নিলে লেখক হিসেবে নতুন, পুরনো যে-কেউই এখনো পর্যন্ত এই ধারাবাহিকতায় আত্মমোক্ষণ অমোঘ বলে মানবেন।

ক্ষতির কারণ সম্পূর্ণ ভিন্ন, গল্প-কৌশলের সঙ্গে যার কোন সম্পর্ক নেই। বিষয় বলতে যে-সব লক্ষণ স্পষ্ট হয়: এক ধরনের চরিত্র, এক ধরনের পরিবেশ, এক ধরনের জীবন-যাপন এবং এ-সবের বৈচিত্র্য, একজন লেখককে আলাদা করে চেনার পক্ষে এগুলি যথেষ্ট নয়; যদিও প্রতিভার হেরফেরে এর মধ্যে থেকেই একজন আর একজনকে ধাক্কা দিতে পারেন। আলাদা হবার পক্ষে যেটা সবচেয়ে জরুরী তা হল যে-কোন বিষয়ের মধ্যেই প্রত্যক্ষভাবে বিশিষ্ট, ও ব্যক্তিগত, মানসতার বিস্ফোরণ ঘটানো, ইংরিজীতে যাকে বলে রকেটিং অব্ দি সেল্ফ্। এর অভাবে গল্পের শ্রেণীত্ব হয়তো নষ্ট হয় না, কিন্তু লেখক যে কিঞ্চিৎ নির্বিশেষ হয়ে পড়েন তাতে কোন সন্দেহ নেই।

বিমল কর প্রসঙ্গে আলোচনায় উপরের তত্ত্বটুকু মনে রাখা দরকার; আবশ্যিকও বলা যায়, না হলে বাঙালি গল্পকারদের মধ্যে কেন তিনি বিশিষ্ট এ প্রশ্নের উত্তর অনুধাবন করা যাবে না। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের অবশ্যম্ভাবী লেখকদের একজন তিনি, একালের বিবর্তমান গল্প আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা, এবং একান্তভাবেই চিত্রধর্মিতায় ব্যাপ্ত তাঁর রচনাশৈলী—তাঁর সম্পর্কে এগুলি সর্বজনীন তথ্য; একটু অদলবদল করে নিলে যে-কোন সার্থক লেখকের সম্পর্কেই বৈশিষ্ট্যের অব্যবহিত লক্ষণ হিসেবে এদের চালানো যেতে পারে।

এই গুণটি, ব্যক্তিত্ব, তাঁর সমকালীন গদ্যলেখকদের মধ্যে সর্বতোভাবে পেয়েছি কিনা তা তর্কের বিষয়। বলা বাহুল্য, এটি গল্পলেখকদের প্রতি কটাক্ষ নয়—যে-প্রশ্ন থেকে এই আলোচনার সূচনা, তারই বিস্তার মাত্র। প্রসঙ্গত স্মর্তব্য, বিমল করের আবির্ভাব নির্দিষ্ট ঐতিহ্যের মধ্যে থেকে এবং যাকে প্রভাব বলে, অন্তত গোড়ার দিকে তিনি তা সম্পূর্ণ এড়িয়ে যেতে পেরেছেন এমন মনে করার কোন হেতু নেই। তাঁর শ্রেষ্ঠ-গল্প-সংকলনেই এমন কিছু রচনা সন্নিবেশিত হয়েছে যা উপরোক্ত ধারণা, অস্পষ্ট হলেও, সমর্থন করে। আত্মজা-র হিমাংশুর আত্মহনন কিংবা পিঙ্গলার প্রেম-এর মৃগাঙ্কর আকর্ষণ থেকে বিবমিষায় প্রত্যাবর্তন ব্যাপক থীম্ হিসেবে এক সময়ের বুদ্ধদেব বসু বা অচিন্ত্যকুমারের রচনায় বিরল নয়; মানবপুত্র গল্পে মানুষের অতিমর্ত্য বর্বরতার বিরুদ্ধে ক্যাথলিক

অনুকম্পা ব্যবহার পরোক্ষভাবে সুবোধ ঘোষের মধ্যেও দেখেছি। বিমল করের প্রথম দিকের অনেক গল্পই তাঁর ঐতিহ্য-অনুগামিতার সাক্ষ্য দেয়। কিন্তু, একটু লক্ষ করলেই বোঝা যাবে, এইসব গল্পেই বিমল কর নিজের স্বাতন্ত্র্যের অভিধাটি ধীরে ধীরে স্পষ্ট করে তুলেছেন। ঐতিহ্যে লিপ্ত থেকে এই যে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে আসা, এটা সহজ ব্যাপার নয় এবং বিমল করের পক্ষে যে সম্ভব হয়েছে তার কারণ তাঁর ব্যক্তিত্ব, তাঁর অন্তর্মুখী চিন্তা ও শুভাশুভ-নিরপেক্ষ মানবিক দর্শন। এই বিষয়টি অবহিত হলেই মানবপুত্র, আত্মজা, উদ্ভিদ, পলাশ, পিঙ্গলার প্রেম, আঙুরলতা এবং সুধাময়, জননী, অপেক্ষা প্রভৃতি গল্প, তাদের দুই পর্বের বৈসাদৃশ্য সত্ত্বেও, যে একই লেখকের রচনা তা বুঝতে অসুবিধা হয় না।

কথাটা হয়তো ঠিক বলা হল না। দুই পর্ব, একই লেখক, তবু দুইয়ের মধ্যে প্রভেদ এতই দুস্তর যে কিঞ্চিৎ দ্বিধায় পড়তেই হয়। সত্যি বলতে, এই মুহূর্তে না হলেও, আজ থেকে বিশ কি পঁচিশ বছর পরের পাঠক যদি স্বাভাবিক অন্যমনস্কতা হেতু এদের মধ্যে দুজন লেখককে আবিষ্কার করেন, তাতে আশ্চর্য হবার কিছু থাকবে না। বরং, ঘটনা হিসেবে সেইটেই হবে সত্য। এই সংকলনে পাওয়া যায় প্রায় পরস্পরবিরোধী দুজন বিমল করকে। একজন, যিনি মানবপুত্র, পার্ক রোডের সেই বাড়ি, উদ্ভিদ, আত্মজা, পলাশ, পিঙ্গলার প্রেম, আঙুরলতা, যযাতি, শূন্য প্রভৃতি গল্পের লেখক—প্রেম ও সমাজসত্যের, মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কের এবং মনোজগতের তীব্র বিশ্লেষণে তৎপর, ভাষা ও আঙ্গিকের নিত্যনতুন ব্যবহারে অক্লান্ত; আর একজন, যিনি সুধাময়, জননী ও অপেক্ষা গল্পের রচয়িতা—ঐতিহ্যের পৌনঃপুনিক ব্যবহারে ক্লান্ত, গল্প সম্পর্কে প্রচলিত সংজ্ঞায় বিরক্ত, শান্ত ও বিবেকপ্রবণ, কখনো বা ধার্মিক, অস্তিত্ব ও জীবনযাপনের আধিদৈবিক রহস্য যাকে আকর্ষণ করে সবচেয়ে বেশি এবং অত্যন্ত 'ব্যক্তিগত'। অতিশয়োক্তি হবে না যদি বলি, এই শেষোক্ত পর্যায়ের লেখক বাংলা সাহিত্যের পক্ষে একটি নতুন অভিজ্ঞতা—পরবর্তী পালাবদলের সেতু।

গল্পের বিষয়নির্বাচনে বিমল কর অবশ্য প্রথম থেকেই একটু স্বতন্ত্র। সমাজ-সম্পৃক্ত তাঁকে কোনদিনই প্রবলভাবে আকর্ষণ করেনি; রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তন চরিত্র হিসেবে মানুষের যে বিবর্তন সম্ভব করে, তার পরোক্ষ প্রভাব তাঁর রচনায় কোথাও কোথাও দৃষ্ট হলেও, কার্যত তাঁর উপেক্ষার বস্তু। বরং তিনি আকৃষ্ট হয়েছেন মানুষ নামক সেই জীবটির প্রতি, চর্মচেহারার অবৈকল্যের আড়ালে যে দীর্ণ, ক্লিষ্ট ও ক্ষয়িত, আমিত্ব সম্পর্কে কাতর ও অসহায়, নিজের সৃষ্ট জটিলতার শিকার। বিমল করের অনুরূপ মনোভঙ্গীতে কেউ কেউ ফ্রয়েডীয় তত্ত্বের সামীপ্য লক্ষ করেছেন, ব্যবচ্ছেদে তাঁকে নিয়তি-বা-অভিজ্ঞতাবাদী প্রতিপন্ন করা যায় হয়তো; কিন্তু, এটা ঠিক, এই মানসতা প্রাচ্যদেশীয় নয়। প্রাচ্যের সমাজগুলিতে ব্যক্তির চেয়ে সমাজ, স্বকীয়তার চেয়ে প্রধানুগামিতা বরাবরই প্রাধান্য পেয়েছে বেশি, ফলে এইসব সমাজে, এমনকি বাঙলাদেশেও, ব্যক্তিচেতনার বিকাশ, অন্য-নিরপেক্ষ চৈতন্যের স্ফুরণ প্রায়ই ঘটেনি, বা ঘটলেও ঘটেছে সমাজ ও শ্রেণীর বিকাশের সূত্র ধরে। সাহিত্যও ব্যক্তির সাফল্য ও পতনের সঙ্গে কোন-না-কোন সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক অথবা প্রাকৃতিক সংস্রব এড়াতে পারেনি। পশ্চিমে, বিশেষত ইওরোপে, ব্যক্তিকে সমাজসংস্রবমুক্ত করে স্বাতন্ত্র্যের চর্চা চলেছে কয়েক শতাব্দী ধরে—আজকের বিভিন্ন মতাদর্শে সংঘর্ষের কারণও এই। ব্যক্তি সম্পর্কে তার অস্তিত্বের স্বকীয়তা সম্পর্কে সচেতন হওয়ায় খুব স্বাভাবিকভাবেই এসেছে তার বিনাশ সম্পর্কে সংশয়। অনুরূপ সংশয় ও অসহায়তার-বোধ থেকেই বিমল করের সাম্প্রতিক রচনার উৎপত্তি।

লেখক হিসেবে তাঁর সারবত্তার কারণও এই সংশয় ও বিষাদের অনুভবে নিহিত। একই অনুষঙ্গ কখনো সরাসরি কখনো বা প্রতীকের আশ্রয়ে বার-বার ফিরে এসেছে তাঁর রচনায়, গল্পে, ইদানীংকার উপন্যাসেও। প্রেম, ধর্ম, উজ্জীবন ইত্যাদি তাঁর প্রিয় বিষয়গুলি, রসায়নবিদের মতো, একই আধারে সম্ভাব্য কোন বিশ্বাসে উপনীত হবার প্রেরণায় বার-বার পরীক্ষা করছেন তিনি। ফল: সুধাময়, ফল: জননী, ফল: অপেক্ষা। এবং এই প্রক্রিয়ার যেটা অবশ্যম্ভাবী লক্ষণ, গভীর অভিনিবেশ, বিমল করের সাম্প্রতিক রচনায় সেটি বিশেষভাবেই লক্ষণীয়; যে-কারণে মাঝে মাঝেই তাঁর রচনা আত্মজৈবনিক বলে ভ্রম হয়।

ব্যক্তির শেষ উত্তরণ সম্পর্কে সংশয় সত্ত্বেও বিমল কর যে-হেতু ভারতীয়, সুতরাং, অবক্ষয়ের ধারণাই তাঁর কাছে শেষ সত্য নয়, আত্মার সজীবতাকে শেষপর্যন্ত তিনি শ্রেয় বলে গ্রহণ করেছেন; শ্রেয়, যা অনশ্বরতারই নামান্তর। সুধাময় গল্পে সুধাময়ের মুক্তি ও আনন্দর আকাঙ্ক্ষায় কক্ষ থেকে কক্ষান্তরে ভ্রমণ শেষ পর্যন্ত তাকে কিছুই দেয় না—শাশ্বত সম্পর্কে তার উপলব্ধি সংশয়ে পর্যবসিত হয়—

'বিরাট সংশয় আমাকে কাঁটার মতো সর্বক্ষণ বিঁধছে। রাজেশ্বরীর মধ্যে তার দেহের বাইরে আলোর ভুবন খুঁজেছিলাম, পাইনি। হৈমন্তীর মধ্যে তার মনের আলোময় অস্তিত্ব অনুভব করে সারবস্তু পেয়েছি ভেবেছিলাম; কে জানত—তার দেহের সঙ্গে এত গভীরভাবে সে-অস্তিত্ব জড়িয়ে আছে। আমার ভালবাসা অন্ধকারের মতন, প্রদীপের কাছে যতক্ষণ আছে ততক্ষণ আলোকিত। একে ভালবাসা বলি না। যে আনন্দ এত চঞ্চল, ভঙ্গুর—সে আনন্দ মিথ্যে।'

কিন্তু, লেখক এইখানেই থামেননি, এর পরেও আছে তারপর-এর রহস্য। আমরা দেখছি, সুধাময় 'নতুন করে তার বিশ্বাসকে খুঁজতে বেরিয়েছে কিংবা তার সেই অদ্ভুত আনন্দকে।' অপার্থিব অতিশক্তির নিকট পরাভব সে মানেনি। তর্কের খাতিরে অনুমান করে নিচ্ছি নিরন্তর আত্মানুসন্ধানেই একদিন তার শেষ হবে, অনুপ্রাণিত বিশ্বাসই তার শেষ অবলম্বন।

তাৎক্ষণিক, কিছু বা আপেক্ষিক, উপলব্ধিকে অভিজ্ঞতা ও অনুভূতির ভিতর দিয়ে স্পষ্টই মননের গভীরতর স্তরে উত্তীর্ণ করতে পারেন বিমল কর। কিছুটা জিদ্-এর ধরনে তাঁর রোম্যান্টিক মানসিকতা যে-কোন চরিত্রের স্বত্বকেন্দ্রিক হয়ে খুঁজে নেয় সেইসব অস্পষ্ট রহস্যময়তাকে—বস্তুবাদী বিশ্ব যাদের অস্বীকার করবে। কিন্তু, বস্তুবাদী বিশ্ব সতত পরিবর্তনশীল, সময়সীমার বাইরে নির্বিশেষ অনুভবকে অমরতা দানে অক্ষম।*

দিব্যেন্দু পালিত

*বিমল করের শ্রেষ্ঠ গল্প। বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ১২। সাত টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

স মা লো চ না

The Red Book and the Great Wall-An Impression of Mao's China. *By* Alberto Moravia. Secker & Warburg. London. 25*s*.

অ্যালবারটো মোরাভিয়া চীন দেখে এসে মাও-এর চীন সম্পর্কে তাঁর ধারণা লিপিবন্ধ করেছেন। রাজনীতির চশমা চোখে দিয়ে চীনের ঘটনাবলী দেখলে একদিকে মেলে চীন-ভক্তির উচ্ছাস, অন্যদিকে চীন-বিরোধিতা। মোরাভিয়া সাহিত্যিক হিসাবে চীনকে দেখেছেন। ফলে সাংস্কৃতিক বিপ্লবের প্রবল স্রোতে মহাচীনে কি ভেসে গেল, কি রইল, বিপ্লবী উন্মাদনার ফলশ্রুতি হিসাবে চীনের সমাজজীবনে ও মানসিকতায় কি পরিবর্তন দেখা গেল, এসব সম্পর্কে গ্রন্থকার প্রসন্ন-গম্ভীর, পরিহাস-স্নিগ্ধ বর্ণনা দিয়েছেন। গ্রন্থকার রেড-গার্ডদের বিপ্লবী উন্মাদনা প্রত্যক্ষ করেছেন, চীনের নব্যগীতা 'লাল কিতাবে'র ভূমিকা বর্ণনা করেছেন। দেখেছেন চীনের সমাজজীবনের সর্বত্র 'জনতা'র অপ্রতিহত উপস্থিতি। চীনের প্রাচীর দেখে বিস্ময়াবিষ্ট হয়েছেন এবং চীনের দীর্ঘবিলম্বিত, উত্থানপতনের ইতিহাস রোমন্থন করেছেন। টুকরো টুকরো চিত্রকল্প সৃষ্টি করে, গল্পের ঢং-এ নানা বিষয়ের অবতারণা করেছেন মোরাভিয়া। তবে সর্বত্রই গ্রন্থকারের বর্ণনা সহানুভূতিতে স্নিগ্ধ, মননশীলতায় উজ্জ্বল।

বিষয়সূচীতে আছে এই ক'টি অধ্যায়: ১। ভূমিকা ২। কি দেখলাম ৩। লাল কিতাব ৪। সংস্কৃতিবিপ্লব কেন ৫। স্বয়ং মাও এই কথা বলেন ৬। বিপদগ্রস্ত বুর্জোয়া শ্রেণী ৭। গ্যাস চুল্লী ৮। তোমরা ইতালিতে কি মাও-এর বই পড় ৯। চীনারা পেটি-বুর্জোয়া স্তরকে বাতিল করেছে ১০। পূর্ণতা ও শূন্যতা ১১। গলদা-চিংড়ি দেশ ১২। অতীতকে ঘৃণা ১৩। ডন জিওভ্যান্নির ডিনারের অতিথি ১৪। হংকং-এর আহ্বান ১৫। সত্যই কি কমিউনিস্ট ঐ স্থানে আছে।

মোরাভিয়া সংস্কৃতি-বিপ্লবের ঢেউ-এ-ভেসে-যাওয়া চীনকে প্রত্যক্ষ করেছেন। প্রত্যক্ষ করেছেন এর আতিশয্য, খোকামি, মূঢ়তা। তবুও চীনকে মোরাভিয়ার ভাল লেগেছে। চীনের সম্পর্কে সমালোচনা তাঁর আছে, তবুও মাওবাদের প্রতি তাঁর আকর্ষণ সুস্পষ্ট। এই আকর্ষণের কারণ দুটি। প্রথমত, চীন বলতে পেরেছে 'হে দারিদ্র্য, তুমি মোরে করেছ মহান'। একদিকে সম্পদের পাহাড় অন্যদিকে দারিদ্র্যের অন্তহীন বিস্তার, একদিকে মানিব্যাগের ঔদ্ধত্য অন্যদিকে সাধারণ মানুষের হীনমন্যতা আধুনিক চীনে নেই। কেননা চীনে দারিদ্র্য ভাগাভাগি করে নিয়েছে সকলে। দ্বিতীয়ত, চীনের আছে চারিত্রমর্যাদা।

বলা হয়েছে যে, সমাজতন্ত্র নির্মাণের প্রশ্নে চীন সাহিংস পদ্ধতিরই শুধু গুণগান করেছে। অর্থনীতির বিকাশের হার দ্রুততর করবার জন্য শ্রমকে দিয়েছে সামরিক রূপ। সাংস্কৃতিক বিপ্লবের লক্ষ্য আলোচনা প্রসঙ্গে গ্রন্থকার ঐ মতবাদকে অস্বীকার করেছেন। তাঁর মতে সাংস্কৃতিক বিপ্লব কৃষি ও ছোট কারিগর-প্রধান, অনুন্নত চীনকে যন্ত্রবিদ্যাকুশলী দেশে রূপান্তরিত করতে চেয়েছে। সাম্যবাদে উত্তরণের পথে যে 'পেটি-বুর্জোয়া স্তর'

থাকে, সেই স্তরকে বর্জন করে কৃষকসমাজের সব মানুষকে জাগাবার জন্যই এই বিপ্লবের সূত্রপাত। মোরাভিয়ার মতে এই সব মানুষ বৈষয়িক দিক থেকে দরিদ্র, কিন্তু আবেগে, অনুরাগে, বিরাগে, জ্ঞানে, কর্মে ও ভক্তিতে অনেকখানি অপাপবিদ্ধ। "What is the fundamental goal of the Cultural Revolution? It is to make China—humanly intact and integrated, innocent and virginal—take the great leap from rustic and artisan society to technological society without going through the hitherto apparently unavoidable petit-bourgeois phase of communism."

মোরাভিয়া বলেছেন যে সাংস্কৃতিক বিপ্লবে যারা যোগ দিয়েছে তাদের হিংসাত্মক আচার-আচরণ, মুখব্যাদান, 'কবর দাও', 'পুড়িয়ে মার' এধরনের নানা শ্লোগান—সতত 'যুদ্ধং দেহি' মনোভাব—এসবই সাংস্কৃতিক বিপ্লবের একটা দিক। কিন্তু চীনের যুগ যুগ ধরে প্রবাহিত ঐতিহ্য নেপথ্যচারী হয়েও আজও মৃত নয়। অন্য আর একদিক থেকে দেখা যায় যে, চীনের জনতা নির্বিকার, স্থাণু ও পাহাড়ের মতো নিশ্চল। মোরাভিয়া চীন দেখে এসে তাই বলেছেন, "Everything was violent but at the same time lacking in violence." অর্থাৎ চীনের মানসিকতার আছে দুটো দিক। আন্দোলনকারী জনতা আবেগের দিক থেকে কৃত্রিমতার লেশবর্জিত। কল্পিত শত্রু সম্পর্কে তাদের ঘৃণায় ভেজাল নেই। সাম্রাজ্যবাদ, সোভিয়েট দেশ,—যারা দেশে পুঁজিবাদী পথ নিতে চায়, যারা পার্টি কিংবা রাষ্ট্রের চিরস্থায়ী অধিকর্তা—তাঁদের বিরুদ্ধে জনতার ক্রোধাগ্নি প্রজ্বলিত। কিন্তু চীনের স্বভাবের আর একটা দিক আছে। সুপ্রাচীন সভ্যতার অংশীদার হওয়ায় চীনের মজ্জায় মজ্জায় আছে একধরনের প্রশান্তি। হিংসাটা এদেশে তাই বীভৎস বিকৃতির রূপ নেয়নি, যা নিয়েছে অন্যান্য দেশে। মোরাভিয়া চীনের ঐতিহাসিক বিকাশ, তার সামাজিক-অর্থনৈতিক পরিস্থিতির বিচার করেছেন নিজস্ব ঢং-এ। প্রাচীনকালে এবং মধ্যযুগে একদিন চীন ছিল পূর্ব এশিয়ার নেতৃস্থানীয়। একদিকে বিপুল জনসংখ্যা ও আপেক্ষিকভাবে উন্নত সভ্যতা—অন্যদিকে অন্যান্য দেশ থেকে চীনের বিচ্ছিন্নতা চীনে এক বিশেষ ধারণার সৃষ্টি করেছিল। এই ধারণাটি হল এই যে, চীনই পৃথিবীর কেন্দ্র। চীন দীর্ঘকাল মনে করেছে যে যারা চীনা নয় তারাই বর্বর,—অসভ্য। এই বর্বরদের হাত থেকে দেশকে বিচ্ছিন্ন করবার জন্য চীনে তৈরী হয়েছিল 'চীনের প্রাচীর'। এই মনোভাব থেকে চীনের জীবনে এসেছিল রক্ষণশীলতা, 'ছুঁয়োনা-আমায়' এই মনোভাব। এই ইতিহাসগত মানসিকতা চীনে এখনও আছে। একদিকে সনাতনের প্রতি আকর্ষণ, অন্যদিকে গতিশীলতায় অবগাহন, এ দুই মানসিকতাই আধুনিক চীনে বর্তমান।

মোরাভিয়া মাওপুজো, মাও-মন্ত্র উচ্চারণ, সমাজজীবনে সর্বত্র পরিব্যাপ্ত মাও-ভজনা প্রভৃতি বিষয় নিয়ে চিত্তাকর্ষক আলোচনা করেছেন। সমালোচকের দৃষ্টিতে নয়, গুণমুগ্ধের দৃষ্টিতে।

মোরাভিয়া চীনের বর্তমান সামাজিক কাঠামোর উপর কোন আলোকপাত করেননি। "চীনে দেখে এলাম" ধরনে নয়াচীনের কয়েকটি দিক তুলে ধরেছেন। চীন সমাজতান্ত্রিক দেশ। সাংস্কৃতিক বিপ্লবের ফলে চীনের সামাজিক কাঠামো বিকৃত রূপ ধারণ করেছে কিনা, মাথাপিছু উৎপাদন হ্রাস পেয়েছে কিনা, রাষ্ট্রীয় আমলাতন্ত্রের নাগপাশ থেকে চীনের সমাজ মুক্ত হচ্ছে কিনা এসব প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন নিয়ে মোরাভিয়া মাথা ঘামাননি। মোরাভিয়া যখন

বলেন যে চীনে পেটি-বুর্জোয়া স্তরকে বাদ দিয়ে নতুন সমাজ গড়বার প্রচেষ্টা হচ্ছে তখনও মনে সংশয় থাকে। সাংস্কৃতিক বিপ্লবের কাহিনী পাঠ করে মনে হয় যে, মাও সে-তুং চীনের কমিউনিস্ট পার্টিতে ও সমাজে পেটি-বুর্জোয়া ঝোঁকের বিরুদ্ধে সংগ্রামের পরিবর্তে তাকে প্রশ্রয় দিয়েছেন কিনা। শুধু তাই নয়। মোরাভিয়া চীনের যে চিত্র এঁকেছেন তা কল্পনায় স্নিগ্ধ কিন্তু বোধ হয় বাস্তব নয়। কমিউনিস্ট পার্টি ও চীনের রাজনৈতিক যন্ত্রের অন্যান্য অংশে ব্যক্তিগত ক্ষমতার শাসন কতখানি স্থান জুড়ে আছে, গণতন্ত্র সে দেশে কতখানি আছে, ট্রেড ইউনিয়ন ও অন্যান্য প্রতিনিধিত্বমূলক সংস্থা সে দেশে গণতন্ত্রসম্মত পন্থায় কতটা কাজ করতে সক্ষম এসব অতিজরুরি প্রশ্নও গ্রন্থকার এড়িয়ে গেছেন। মোরাভিয়া চীনে 'জনতা'র উপস্থিতি সর্বত্র লক্ষ্য করেছেন। অথচ সমাজতন্ত্রী শিবির থেকেই বলা হয় যে, চীনে জনগণের বশ্যতার আধিক্যই চোখে পড়ে। পার্টি ও রাষ্ট্রসংস্থার কাজে গণতান্ত্রিক রীতিনীতির বালাই সে দেশে নাকি নেই। লালফিতা ও নিছক ফতোয়া দিয়ে শাসন—এ দুই ব্যবস্থার দৌরাত্ম্যে সংস্কৃতিবিপ্লবী চীন আজ একনায়কতন্ত্রের সেরা দেশ। সংস্কৃতিবিপ্লবের ধ্বনি তুলে মাওবাদীরা চীনে বহু পার্টি কমিটি, ইয়ং কমিউনিস্ট লীগ, ট্রেড ইউনিয়ন ও অন্যান্য নানা প্রতিষ্ঠানকে বাতিল করেছে। তারপর তারা বে-আইনীভাবে এসব প্রতিষ্ঠানের নেতৃত্ব দখল করতে শুরু করে। কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় সংবাদপত্রগুলির নেতৃত্ব, শাসনক্ষমতার প্রাদেশিক সংস্থাগুলির নেতৃত্ব সবই চীনের সংস্কৃতিবিপ্লবীরা করায়ত্ত করে। চীনের কমিউনিস্ট পার্টির ৮ম কংগ্রেসে নির্বাচিত কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যদের মধ্যে দুই-তৃতীয়াংশকে লাঞ্ছিত করে কাজকর্ম থেকে বে-আইনীভাবে সরিয়ে দেওয়া হয়। চীনের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সম্পাদকমণ্ডলীর ১২ জন সদস্যের মধ্যে ৮ জনকে এবং তিনজন বিকল্প সদস্যের মধ্যে দুজনকে 'কালো ডাকাত' আখ্যা দিয়ে বিতাড়িত করা হয়। "চেয়ারম্যান মাও-এর চিন্তাধারার শত্রু" এই অভিযোগে শিক্ষক, অধ্যাপক, পার্টিকর্মী, সাহিত্যিক, সেনাপতি প্রভৃতিকে সাধারণ্যে অপমান করে বিতাড়িত করা হয়। গ্রন্থকার এসব প্রশ্নও সযত্নে এড়িয়ে গেছেন।

পাঠক জানতে চান যে চীনে পার্টি ও রাষ্ট্রসংস্থার উপর এবং পরে অর্থনৈতিক সংগঠনগুলির উপর সামরিক নিয়ন্ত্রণ চালু হয়েছে কিনা। বিচারবিভাগীয় সংস্থার স্থান 'সামরিক বিচার' গ্রহণ করেছে কিনা, সরকারী সংস্থাগুলিও সেনাবাহিনীর প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণাধীন কিনা। গ্রন্থকার পাঠকদের এই জিজ্ঞাসা মেটাতে চাননি।

মোরাভিয়া সাহিত্যিক হিসাবে সুপ্রতিষ্ঠিত। মুশকিল হয় যখন সাহিত্যিকেরা ভাসা ভাসা ভাবে কোন দেশ দেখে "দেখে এলাম" গোছের সুখপাঠ্য কাহিনী লেখেন। সেই কাহিনী হয়তো অসত্য নয়, খণ্ডসত্য। মোরাভিয়াও সেই খণ্ডসত্যের অবতারণা করেছেন অসামান্য দক্ষতার সঙ্গে।

সতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

Aspects of Bengal Politics in the Early Nineteen-thirties. *By* Bhola Chatterjee. World Press. Calcutta, 12. Rs 10.

রাজনৈতিক দলের মধ্যে নেতৃত্বের লড়াইয়ের পিছনে সব সময় যে নীতির বা আদর্শের মতভেদ

থাকে ইহা ভুল ধারণা। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে প্রতিদ্বন্দ্বী নেতাদের মধ্যে মতের বিশেষ পার্থক্য নাই। নেতাদের মধ্যে একযোগে কাজ করিবার প্রবৃত্তির অভাবেই অনেক সময় উপ-দলীয় সংঘর্ষের উৎপত্তি। সংঘর্ষ যখন সুরু হয় তখন দুপক্ষ থেকেই আদর্শের তত্ত্বকথা শোনান হয় এবং যাঁরা এই সংঘর্ষে ঝাঁপাইয়া পড়েন তাঁদের অনেকেই তত্ত্বকথাতেই অনুপ্রাণিত হন; যখন সংগ্রাম শেষ হয় এবং উত্তাপ দূর হয় তখনই ইতিহাস রচনার সময় আসে। উপ-দলীয় সংঘর্ষের আসল রূপ তখন ধরা পড়ে।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের মৃত্যুর পর বাঙলার কংগ্রেসের ইতিহাসের অনেকটাই নেতৃত্বের সংঘর্ষের ইতিহাস। সুভাষচন্দ্র ও যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তকে কেন্দ্র করিয়া এই সংঘর্ষের সূত্রপাত। বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে বাঙলার কংগ্রেস দলের এই দুই ব্যক্তিত্বসম্পন্ন চরিত্রের সংঘর্ষের ইতিহাস আলোচ্য পুস্তকের মূল বিষয়বস্তু। সেদিনের সংঘর্ষের আবেগ ও জ্বালা আজ প্রশমিত। ঐতিহাসিকের আবেগহীন দৃষ্টির মাধ্যমে সেদিনের ঘটনাপ্রবাহের বাস্তবরূপ ফুটাইয়া তোলা সম্ভব।

সেযুগে "লিবার্টি" ও "অ্যাডভান্স" এই দুই জাতীয়তাবাদী দৈনিক যথাক্রমে সুভাষচন্দ্র ও যতীন্দ্রমোহনের সমর্থনে আত্মনিয়োগ করিয়াছিল। লেখক এই সংবাদপত্র দুইটির পুরানো ফাইল হইতে প্রচুর উপাদান সংগ্রহ করিয়াছেন। লেখকের সিদ্ধান্তমতে সুভাষচন্দ্র ও যতীন্দ্রমোহনের মধ্যে এমন কোন মতভেদ ছিল না যাহার ফলে সংঘর্ষের প্রয়োজন ছিল। এ সংঘর্ষ ছিল নেহাৎই নেতৃত্ব দখলের সংঘর্ষ, কে এবং কোন গোষ্ঠী কংগ্রেস দখল করিবে ইহাই ছিল মূল প্রশ্ন।

লেখক বাংলাদেশের সাম্প্রদায়িক ও অর্থনৈতিক সমস্যা লইয়া বিশদভাবে আলোচনা করিয়াছেন। লেখকের মতে এই সমস্যা দুইটি সম্বন্ধে কংগ্রেসের দুই উপদল একই মতবাদ ও চিন্তাধারা পোষণ করিতেন এবং এই চিন্তাধারা ছিল বাঙ্গালী হিন্দু মধ্যবিত্ত সমাজের চিন্তাধারা। দুই উপদলই মনে করিতেন হিন্দু-মুসলমান সমস্যা নিছক ব্রিটিশের সৃষ্টি ও ব্রিটিশ-শাসনের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে সমস্যাও দূর হইবে। সাম্প্রদায়িক রাজনীতির পিছনে ব্রিটিশের কৌশল ছাড়াও মুসলমান সমাজের নিজস্ব কোন ভয়, ভাবনা, আশা ও আকাঙ্ক্ষা থাকিতে পারে এ কথা কংগ্রেসের নেতারা কখনও মনে করেন নাই। মৌলানা আজাদ প্রমুখ কয়েকজন প্রখ্যাত মুসলমান নেতাকে কংগ্রেসের মধ্যে পাইয়া তাঁহারা বিশ্বাস করিতেন যে কংগ্রেস সকল সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি। মুসলমান সমাজ এই সব নেতাদের তাঁহাদের প্রতিনিধি বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিল কি না তাহা যাচাই করিয়া লওয়ার প্রয়োজন তাঁরা বোধ করেন নাই। অবিভক্ত বাঙলার মুসলমান জনতা সম্বন্ধে কংগ্রেস নেতাদের মনে সব সময় যে ভয় ও অবিশ্বাস ছিল, লেখক তাহা উদাহরণ দ্বারা প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু এ বিষয়ে লেখকের সকল উক্তিই যে নির্ভুল তাহা বলা চলে না। সাম্প্রদায়িক সমস্যা নিরসনের জন্য মৌলানা আজাদ যে প্রস্তাব এককালে রাখিয়াছিলেন লেখক কয়েকবার তাহার উল্লেখ করিয়াছেন এবং কংগ্রেসের হিন্দুনেতারা যে সেই প্রস্তাবটি গ্রহণ করেন নাই তাহার জন্য আক্ষেপ করিয়াছেন। মৌলানা আজাদের প্রস্তাবের মূল কথা ছিল যে বাঙলার আইনসভায় ১০ বৎসরের জন্য মুসলমান প্রতিনিধিদের সংখ্যাধিক্য থাকিবে এই প্রতিশ্রুতি আইনের মারফৎ দিতে হইবে। এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়া কংগ্রেস যে অন্যায় করিয়াছিল তাহা মনে হয় না। প্রস্তাবটি স্বীকার করিয়া লইলেই যে মুশ্লিম লীগের প্রভাব বাঙলাদেশ হইতে লুপ্ত হইয়া যাইত তাহা মনে হয় না।

সাম্প্রদায়িক ও বিভেদমূলক রাজনীতিক দাবীগুলি প্রত্যাখ্যান করিয়া কংগ্রেস দোষ করে নাই; দোষ করিয়াছিল মুসলমান জনসাধারণকে অবজ্ঞা করিয়া, জাতীয় আন্দোলনে মুসলমান জনসাধারণকে টানিবার কোন চেষ্টা না করিয়া। মুসলমান জনতাকে নিকটে টানিবার আন্তরিক চেষ্টা কেন কংগ্রেসের নেতারা করেন নাই তাহার কারণও লেখক বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন যে কংগ্রেসের দুই দলই এবং অনুশীলন ও যুগান্তর দুই গোষ্ঠীই হিন্দু মধ্যবিত্ত সমাজ অর্থাৎ হিন্দু জমিদার শ্রেণীর প্রতি প্রচুর সহানুভূতি পোষণ করিতেন, ফলে চরমপন্থী কংগ্রেস নেতাদের পক্ষেও জমিদার-বর্গের স্বার্থ উপেক্ষা করা সম্ভব হয় নাই। বেশীর ভাগ জমিদারই হিন্দু ও মুসলমান সমাজের অধিকাংশই তাঁহাদের গরীব প্রজা। প্রজাদের পক্ষ লইলে মুসলমান জনতার বৃহৎ এক অংশকে কংগ্রেসের পতাকাতলে সমবেত করা সম্ভব হইত বটে কিন্তু তাহা হইলে হিন্দু জমিদারদের সহিত চরম বিচ্ছেদ হইত। সে বিচ্ছেদ ঘটাইতে তৎকালীন কংগ্রেস নেতারা রাজী ছিলেন না। ফলে তাঁহাদের জাতীয়তাবাদের হিসাব হইতে মুসলমান সমাজ বাদ ছিল। বাঙলার কংগ্রেস যদি প্রজাদের অর্থনৈতিক দাবীগুলি প্রত্যাখ্যান না করিত ও দাবীগুলির সহিত স্বাধীনতা আন্দোলনের যোগসূত্র স্থাপন করিতে পারিত তাহা হইলে মুসলমান সমাজের প্রগতিশীল যুবশক্তির সহিত জাতীয় আন্দোলনের যে সহযোগিতা ও সখ্যতার সৃষ্টি হইত তাহার বেড়া ভাঙিয়া মুশ্লিম লীগের পক্ষে বাঙলাদেশে অগ্রসর হওয়া সম্ভব হইত না। কিন্তু সুভাষচন্দ্র ও যতীন্দ্রমোহন কেহই সে পথ লইতে পারেন নাই। ফলে বাঙলার কংগ্রেস বাঙলার হিন্দু মধ্যবিত্ত সমাজের বাহিরে বিস্তৃতিলাভ করিতে পারিল না ও মুসলমান জনসাধারণ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল।

এ বিষয়ে যে সকল কংগ্রেস নেতাই সমানভাবে অন্ধ ছিলেন তাহা নয়। তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই সেদিন বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে মুশ্লিম লীগের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা তখনই সফল হইবে যখন কংগ্রেস চাষী ও শ্রমিকের অর্থনৈতিক সংগ্রাম নিজের সংগ্রাম বলিয়া মনে করিতে পারিবে। পণ্ডিত নেহেরু মুসলমান জনতার সহিত "জনসংযোগের" কথা বলিতেন। কিন্তু বাঙলার কংগ্রেসের পক্ষ হইতে মুসলমান জনতার সহিত জনসংযোগের কোনই আন্তরিক প্রচেষ্টা হয় নাই। লেখক দেখাইয়াছেন সে যুগে বাঙলা কংগ্রেসের চরম-পন্থীরাও হিন্দু সাম্প্রদায়িক বোধ হইতে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত হইতে পারেন নাই। এই সূত্রে লেখক সে যুগের বৃহত্তর বাঙলা গঠনের দাবী সম্বন্ধে যে মন্তব্য করিয়াছেন তাহা অনুধাবনীয়। লেখকের মতে বৃহত্তর বঙ্গভাষাভাষী প্রদেশ গঠনের দাবীর পিছনে যত না ছিল বঙ্গভাষার প্রতি অনুরাগ তাহার চাইতে অনেক বেশী ছিল হিন্দু নেতাদের মুসলমান সংখ্যাধিক্যের ভীতি। আসাম ও বিহারের বঙ্গভাষাভাষী এলাকাগুলি বাঙলার সহিত যুক্ত হইলে হিন্দুদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ হইবে এই আশাতেই বাঙলার জাতীয়তাবাদী নেতারা এই ধ্বনি তুলিয়াছিলেন।

সাম্প্রদায়িক সমস্যা সম্বন্ধে অবিভক্ত বাঙলায় কংগ্রেসী নীতির ইতিহাস বুঝিতে হইলে এই পুস্তক সাহায্য করিবে। কেবল তাহাই নয়; ১৯৩০ সাল হইতে ত্রিপুরি কংগ্রেস অধিবেশন পর্যন্ত বাঙলার কংগ্রেসের মধ্য যে বিরামবিহীন সংঘর্ষ চলিয়াছিল তাহার তাৎপর্যও লেখক সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অহিংসাবাদী ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের পূজারী বাঙলার কংগ্রেস নেতাদের সহিত সন্ত্রাসবাদী দলগুলির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক লেখকের লেখায় পরিষ্কারভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। সংঘর্ষমুখর বাঙলার কংগ্রেসের

মধ্যে গান্ধীজী কি ভাবে তাঁহার প্রভাব বিস্তার করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন ও কংগ্রেসের নেতৃত্বমহলে তাহার কি ঘাত-প্রতিঘাত হইয়াছিল তাহাও লেখক বিস্তারিতভাবে আলোচনা করিয়াছেন।

বাঙ্গালীর ভাগ্যে যাহা ঘটিয়াছে তাহা যে একেবারেই অনিবার্য ছিল না তাহা বইটি পড়িয়া বুঝিতে কষ্ট হয় না। সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের ব্যক্তিগত বীরত্ব ও স্বার্থত্যাগে সম্মোহিত হইয়া বাঙলাদেশ সেদিন ভুলিয়াছিল যে রাজনৈতিক আন্দোলনের শক্তির উৎস জনগণের জাগরণ ও উদ্দীপনা। অনেক সময় মনে হয় যে গান্ধীজী তাঁহার নরমবুলি ও সীমিত লক্ষ্য সত্ত্বেও জনগণের মনে যে আশা ও উৎসাহ সৃষ্টি করিয়াছিলেন বাঙলার চরমপন্থী নেতারা তাহার অর্ধেকও পারেন নাই। পরবর্তীকালে প্রবাসে নেতাজীরূপে সুভাষচন্দ্র যে রাজনীতিক বিচক্ষণতা ও দূরদৃষ্টির পরিচয় দিয়াছিলেন তার অংশমাত্রও যদি যুদ্ধপূর্ব-যুগে বাঙলার রাজনীতিতে প্রকাশিত হইত তাহা হইলে হয়ত ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারা ভিন্ন পথে প্রবাহিত হইত।

অজিত রায় মুখার্জি

Les Belles Images. *By* Simone De Beauvoir. Translated by Patrick O'Brain. Collins. London. 25*s*

সিমোন্ দ্য বোভোয়া তাঁর আত্মজীবনীর তৃতীয় খণ্ডে লিখেছিলেন : To grow older is to define oneself...I've written certain books, not written others! যে কোনো লেখকের প্রতি এই উক্তি প্রযোজ্য হতে পারে; কিন্তু শ্রীমতী বোভোয়া সম্পর্কে এর যাথার্থ্য একটু বেশি। জাঁ পল সার্ত্র-এর বিশ্বস্ত সহযোগী এবং অস্তিত্ববাদী দর্শনের একজন উৎসাহী প্রবক্ত্রী—এই লেখিকা যদিও বহু পাঠক-পাঠিকার কাছে এখন পর্যন্ত *The Second Sex*-এর রচয়িতা হিসেবে নিন্দিত বা প্রশংসিত, তবু তাঁর উপন্যাস ও কাহিনীগুলির স্বাতন্ত্র্য অনস্বীকার্য। যুদ্ধোত্তর ফ্রান্সের জটিল, ক্লান্ত ও বিনষ্ট সমাজজীবনের বিভিন্নস্তরে ব্যক্তি-বিবিক্ততার সঙ্কটই তাঁর কাহিনীগুলির প্রধান উপজীব্য। এই সঙ্কটের রূপ কখনও বুদ্ধিজীবীদের আদর্শ-দ্বন্দ্বে ও নৈতিক-চেতনায় প্রতিফলিত (*The Mandarins*), কখনও সচ্ছল ও সফল জীবনধারণের ক্লান্তিকর পুনরুক্তির প্রতি বিবমিষায় (*Les Belles Images*), কখনওবা বিগতযৌবনা নায়িকার নিঃসঙ্গতার যন্ত্রণায় (*The Women Destroyed*)।

আলোচ্য উপন্যাসটিকে 'theme of nausea'র প্রকারান্তর বলা চলতে পারে। এই কাহিনীর পাত্র-পাত্রীরা যে জগতের অধিবাসী তার সঙ্গে ইতিপূর্বেই আমাদের পরিচিত করেছেন অ্যালবেয়ার কামু ও সার্ত্র: যেন কোনো যূথচারী, আচরণবাদীর জগৎ, কোনো অলক্ষ্য নিয়তির দ্বারা (এই নিয়তির আর-এক নাম অভ্যাস) চালিত হচ্ছে এইসব পাত্র-পাত্রীদের বেঁচে থাকা; চৈতন্যহীন, নির্বিশেষে ও প্রায় অসহ্যরূপে সমতল (In another garden, wholly different and exactly the same, someone said Dominique Langlois?...পৃঃ ১১)—এই রকম মনে হয় আমাদের বইটি পড়তে পড়তে।

কাত্রিন্ এই আত্মতৃপ্ত, মনোহীন জগতের একমাত্র উজ্জ্বল ব্যতিক্রম। একমাত্র তারই মুখে উচ্চারিত হচ্ছে জীবনের গভীরতম প্রশ্ন: 'Why do people live?...What about the people who aren't happy: Why are they alive? (পৃঃ ২৯)। একমাত্র তারই চৈতন্য এই প্রশ্নের দ্বারা আক্রান্ত হচ্ছে এবং তাকে পীড়িত করছে। এবং যেহেতু এই কাহিনীর অন্যান্য চরিত্রদের মধ্যে কেউই এই প্রশ্নের সম্মুখীন হতে প্রস্তুত নয়, তাই কাত্রিনের উপস্থিতি তাদের কাছে অস্বস্তিকর, অসুস্থতার প্রতীক। জাঁ-শার্লের কাছে (কাত্রিনের বাবা) সফলতা, নির্বীজতা ও স্বাস্থ্যকরতাই জীবনের অনুধ্যান। এমনকি: 'Love too was smooth, hygienic and habitual' (পৃঃ ৩৩); অসুস্থতা মানেই নন্-করফরমিটি। কিন্তু উপন্যাসটির শেষাংশে লোরাঁস্ (কাত্রিনের মা) যখন কাত্রিনের প্রশ্নের অভিঘাতে বিপন্নবোধ করছে, এবং এই অগভীর জীবনের প্রতি তার বিবমিষা শারীরিক অর্থে প্রকাশিত ও প্রতিবাদে সোচ্চার, সেই সময়ে জাঁ-শার্লের তার স্ত্রীর প্রতি নাটকীয় আনুগত্য (ভুললে চলবে না যে, লোরাঁসের ইচ্ছার অবস্থিতি তার স্বামীর ধ্যান-ধারণার ঠিক বিপরীত মেরুতে) একটু বেশি গৃহপালিত ও সজ্জনোচিত ঠেকে। শ্রীমতী বোভোয়া কি উপন্যাসটির উপসংহার অন্যভাবে ঘটাতে পারতেন না? 'They lived happily ever after'—এই প্রাচীন উপসংহারের বিরুদ্ধে বলার কিছু নেই; কিন্তু কাহিনীতে তার যথেষ্ট প্রমাণ থাকা চাই। জাঁ-শার্লের তুলনায় বরং বিগতযৌবনা দোমিনিকের (লোরাঁসের মা) পুরুষহীন নিঃসঙ্গ জীবনের প্রতি ভীতি ও প্রেমিক হারানোর ফলে তীব্র ক্ষোভ অনেক বেশি জীবন্ত।

অবশ্য এই উপন্যাসের নায়িকা লোরাঁসের চরিত্র সম্পূর্ণ নির্দ্বন্দ্ব নয়। কাত্রিনের মানসিক চিকিৎসা অথবা কনফরমিটির বিরুদ্ধে তার তীব্র প্রতিক্রিয়া ও তীক্ষ্ণ প্রতিবাদ এই উপন্যাসের মূল বিষয়। 'They shan't do what they've done to me to Catherine' (পৃঃ ২১৯); কিংবা : 'But she is not going to be maimed' (পৃঃ ২২০)—এই হলো কাত্রিনের চিকিৎসা সম্পর্কে লোরাঁসের শেষ সিদ্ধান্ত। কিন্তু এই প্রতিক্রিয়া এমনই তীব্র, আকস্মিক ও নাটকীয় (লেখিকা লোরাঁসের এই বিবমিষাকে শারীরিক স্তরেও নামিয়ে এনেছেন) যে সন্দেহ হয় নায়িকার চরিত্রে তার যথেষ্ট প্রস্তুতি আছে কিনা। সত্য বটে যে উপন্যাসটির শুরুতেই লোরাঁস প্রশ্ন করছে: 'but what in fact have they got that I haven't?' (পৃঃ ১৮), এবং এই প্রশ্ন সমস্ত কাহিনীটির মধ্যে ধ্বনিত হয়েছে একাধিকবার; কিন্তু প্রশ্নটি কখনও তার অন্তর্গত রক্তের ভিতরে প্রবিষ্ট হয়নি। অন্যপক্ষে, জীবনের মৌল প্রশ্নগুলি সম্বন্ধে একধরনের ভীতি, এমনকি জীবনের গভীর ও একান্ত অনুভূতিগুলির প্রতি আতঙ্ক লোরাঁসের বৈশিষ্ট্য। সেই সহজ ও মসৃণ জীবনের প্রতি তার পক্ষপাত যা 'could be swallowed like a glass of milk—no roughness, nothing that stuck, nothing that rasped.' কিঞ্চিৎ স্নায়বিক উত্তেজনাও তার ঈপ্সিত—তাই প্রেমিকের মন রাখতে সে ব্যস্ত। কিন্তু এই প্রেমিকের প্রতি কিংবা এই অবৈধ প্রণয় প্রসঙ্গে লোরাঁসের মনোভাব আশ্চর্যরকম অ-নৈতিক (amoral): 'Lucien was peripheral' (পৃঃ ২৮), কিংবা : '...he was a rest from Jean-Charles' (পৃঃ ৪০)। কোনো কারণে যখন জীবনের অবিরলভাবে মসৃণ জলস্তর ঈষৎ আন্দোলিত হয়ে ওঠে, স্বাস্থ্যের পুনরুদ্ধারের জন্য লোরাঁস তখন এক গেলাস জল ও শারীরিক ব্যায়ামের সাহায্য নেয়। লুসিয়াঁ একটি হতাশ মুহূর্তে লোরাঁসকে বলছে :

'You don't drink, you never fly off the handle, I've never seen you cry once : you're afraid of losing grip on yourself : that's what I call refusing to live.' (পৃঃ ৭৭)। অথচ প্রাপ্তবয়স্ক পাত্র-পাত্রীদের মধ্যে একমাত্র লোরাঁসই নিঃসঙ্গ; কাত্‌রিনের বিষাদ একমাত্র তাকেই স্পর্শ করে যাচ্ছে; কনফরমিটির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ একমাত্র তারই কণ্ঠে ধ্বনিত। এমনকি ব্যক্তি- ও -শিল্পকেন্দ্রিক সংস্কৃতির শেষ প্রতিনিধি, লোরাঁসের বাবাও, তার নিঃসঙ্গতা দূর করতে পারে না। বরং দোমিনিকের সঙ্গে তার পুনর্মিলন ও কাত্‌রিন সম্পর্কে তার পরিবর্তিত মতামত লোরাঁসের কাছে বিশ্বাসঘাতকতার নামান্তর। শ্রীমতী বোভোয়ার অধিকাংশ নায়িকার মতো, লোরাঁসও অসুখী। (আমাদের এমার্সনের সেই বিখ্যাত উক্তি মনে পড়ে : 'Almost every woman described to you by a woman presents a tragic idea, not an idea of well-being.)

কিন্তু লোরাঁসের নিঃসঙ্গতা ও চৈতন্যের বিষাদ কি একার্থক? এই নায়িকা কি সত্যসত্যই কাত্‌রিনের মতো সেই দুশ্চিকিৎস্য ব্যাধি, দুঃখের কবলিত? নাকি সে যা অনুভব করছে তার নাম বোরডম্‌? শ্রীমতী বোভোয়ার মুখেই শোনা যাক : 'Monteverdi's pathos, the tragic utterances of Beethoven, referred to pains of a kind that she had never felt—huge, vehement, mástered pains. She had experienced a piercing anguish now and then, a certain wretchedness of mind, forlornness, perturbation, emptiness, boredom—above all boredom.' (পৃঃ ৪৪)। আর তাই কাহিনীটির উপসংহারে লোরাঁসের তীব্র বিবমিষা যথেষ্ট বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হয় না। তৃপ্ত জীবনধারণের যে অসহ্য গ্লানিকে লোরাঁস উগ্‌রে ফেলতে চাইছে, তা কি সত্যই এই নায়িকার অভিপ্রেত—একটি তুমুল নৈতিক সিদ্ধান্ত? নাকি স্নায়বিক উত্তেজনার ফলশ্রুতি? মোটের উপর, *The Mandarins*-এর তুলনায় এই উপন্যাসটি অনেক অনুজ্জ্বল।

১৮৪৬ সালে কির্কেগার্ড একটি উপন্যাস সমালোচনা[১] প্রসঙ্গে বলেছিলেন : 'The levelling process is not the action of an individual but the work of reflection in the hands of an abstract power. . . The individual who levels down is himself engulfed in the process. . . A demon is called up over whom no individual has any power, and though the very abstraction of levélling gives the individual a momentary, selfish kind of enjoyment he is at the same time signing the warrant for his own doom.' 'লেভেলিং প্রোসেস'-এর যে-সব উদাহরণ কির্কেগার্ড ঐ প্রবন্ধে দিয়েছেন তার সঙ্গে আধুনিক 'সাইকো-থেরাপির' নাম যোগ করা যেতে পারে; এবং আলোচ্য উপন্যাসটিতে এইটেই সিমোন্‌ দ্য বোভোয়ার প্রধানতম বক্তব্য। কাত্‌রিনের বিষাদ কি সত্যই কোনো ব্যাধি? কনফরমিটির বিরুদ্ধাচরণ কি অসুস্থতার লক্ষণ? যে সমাজে সবাই সুখী, তৃপ্ত ও বেঁচে থাকার জৈবিক প্রক্রিয়ার কাছে অনুগত, সেখানে যদি কোনো ব্যক্তিবিশেষের মনে (লক্ষণীয় যে, বোভোয়ার উপন্যাসে ঐ বিশেষ মানুষটি কোনো বিনষ্ট বয়স্ক নয়, একটি অপাপবিদ্ধ শিশু। 'Animula Vagula blomdula' —এই প্রাচীন 'থীমের' একটি সার্থক প্রয়োগ এলিজাবেথ বাওয়েনের *The Death of the Heart* উপন্যাসে দ্রষ্টব্য।) এই যূথচারী জীবনের প্রতি

[১] *The Present Age.* (Trans. A. Dru). Oxford, 1940. *p* 30.

বিতৃষ্ণা এবং তার থেকে এক 'গাঢ় বেদনার' সঞ্চার হয়, তবে তাকে কি আমরা মানসিক রুগ্নতা বলবো? নাকি এইটেই স্বাস্থ্য—অন্তত স্বাস্থ্য ও চৈতন্যের দিকে অগ্রসৃতি? কেনেথ্ বার্ক, বলেছিলেন: 'People may be unfitted by being fit in an unfit fitness.' 'সাইকোথেরাপি' প্রসঙ্গে লোরাঁসের মনোভাব হুবহু এই। কাত্রিনের বিষাদকে কেড়ে নিয়ে কোনো মনশ্চিকিৎসক তাকে নিশ্চয়ই মনোহীন যূথচারী জীবে পরিণত করতে পারে, এবং এই অবস্থার নামই জাঁ-শার্ল ও অন্যান্য চরিত্রদের কাছে স্বাস্থ্যের পুনরুদ্ধার; কিন্তু লোরাঁসের মন তাতে সায় দেয় না। একাধারে প্রাচীন ও আধুনিক এই সমস্যা, এবং ব্যাধির স্বরূপপ্রসঙ্গে শ্রীমতী বোভোয়ার আশ্চর্য অন্তর্দৃষ্টি উপন্যাসটির সবচেয়ে মূল্যবান অংশ। ১৯২২ সালে লিখিত 'Goethe and Tolstoy' নামক প্রবন্ধে টোমাস মান ব্যাধির স্বরূপ প্রসঙ্গে একটি গভীর দার্শনিক মন্তব্য করেছিলেন। মন্তব্যটি হয়তো এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না: 'Disease has two faces and a double relation to man and his human dignity. On the one hand it is hostile: by overstressing the physical, by throwing man back upon his body, it has a dehumanizing effect. On the other hand, it is possible to think and feel about illness as a highly dignified human phenomenon. It may be going too far to say that disease *is* spirit, or, which would sound very tendentious, that spirit is disease.....And the question, the aristocratic problem, is this: is he not by just so much the more man, the more detached he is from nature—that is to say, the more diseased he is? For what can disease me, if not disjunction from nature?'

বিকাশ চক্রবর্তী

সাহিত্য ঐতিহ্য মূল্যবোধ—আবদুল হক। সমকাল প্রকাশনী। ঢাকা। মূল্য ৬·৫০

আজকের পূর্ব-পাকিস্তানে একাধিক উজ্জ্বল ও বিচারশীল লেখক যে সমাজ ও সাহিত্য-ভাবনায় নবযুগের আলো আনতে পেরেছেন তা পশ্চিম বাঙলায় আমরা অনেকেই ঠিকমতো অবহিত নই। শহীদুল্লা কায়সার, বদর-উদ্দীন ওমর, আনিসুজ্জামান, জিললুর রহমান সিদ্দিকী, এবং পরলোকগত আহমেদুর রহমান প্রভৃতি লেখক, পূর্ব পাকিস্তানে বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির নবরূপায়ণে যে অভিনিবেশ ও উন্নত দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন তা বাংলাভাষী-দের সযত্ন অনুশীলন দাবী করে। এঁদের মধ্যে কেউ কেউ মার্ক্সবাদী কিন্তু সকলে নিশ্চয় তা নন। এই বিচারশীল ও ভবিষ্যৎমুখী লেখকদের মধ্যে আবদুল হক সাহেবের নামও অতঃপর অন্তর্ভুক্ত হবে মনে হয়।

সাহিত্য, চিন্তা ও স্বগত—এই তিনটি অংশে সংকলিত মোট উনত্রিশটি প্রবন্ধ আলোচ্য গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। তার মধ্যে ইবসেনের ছ'টি নাটকের উপর লিখিত ছ'টি প্রবন্ধ ব্যতীত অন্য সবগুলির-ই ক্ষেত্র হলো বাঙলা সাহিত্য ও বাঙালী মুসলিম সমাজ—বিশেষত পূর্ব-পাকিস্তানের সাহিত্য ও সমাজ—তার সমস্যা ও সংকট, তার অতীত ও

বর্তমান। তাই সাহিত্য বিষয়ক আলোচনায় স্থান পেয়েছে "আবদুল্লা" উপন্যাসের জন্য খ্যাত কাজী ইমদাদুল হকের সাহিত্য-কৃতির উপর বিস্তৃত আলোচনা, "মতিচুরে"র লেখিকা, সমাজচিন্তা ও শিক্ষাবিস্তারে অগ্রগামী বেগম রোকেয়ার শাণিত ব্যক্তিত্ব ও রচনার বিচার এবং লুৎফর রহমানের চিন্তাশীল মানস ও রচনার উপর একটি সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ।

সবকটি প্রবন্ধই পরিণত বিচারবুদ্ধির দান। বলতে বাধা নেই যে 'নজরুল ও ফারসী সাহিত্য' শীর্ষক আলোচনাটি তত মূল্যবান মনে হয়নি এই কারণে যে এতে স্তুতিবাদের প্রেরণা বিচারের কিছুটা প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছে।

অবশ্য এই সংকলনের মধ্যে পাঠকের মনে যা আগ্রহ জাগায় তা হলো সেই সব রচনা যেগুলি আজকের পূর্ব-পাকিস্তানের সাহিত্য ও সমাজচিন্তার আধুনিক পরিমণ্ডলের সংবাদ বহন করে আনে। এই বিচারে উল্লেখ্য মনে হয় সাহিত্য পর্যায়ে 'সাহিত্যের দিগন্ত ও সাহিত্যিকের স্বাধীনতা'; চিন্তা পর্যায়ে 'পাকিস্তানী সংস্কৃতির তাৎপর্য", 'চিন্তার অগ্রসরণ' এবং 'প্রগতি ও ধর্ম"; এবং স্বগত অংশে 'নামায়ন' শীর্ষক প্রবন্ধটি। 'ঢাকার মুসলিম সাহিত্য সমাজ' শীর্ষক আলোচনাটিও শিক্ষাপ্রদ। এ বিষয়ে প্রবীণ ঔপন্যাসিক আবুল ফজল সাহেব তাঁর 'সাহিত্য ও সংস্কৃতিসাধনা' গ্রন্থে একাধিক আলোচনা সন্নিবিষ্ট করেছেন। বিষয়টি মূল্যবান কারণ মুসলিম সাহিত্য সমাজ ও তাঁদের প্রকাশিত "শিখা" পত্রিকার মাধ্যমে বাংলার মুসলিম সমাজে রেনেসাঁসের প্রথম পদক্ষেপ চোখে পড়ে। এই পরিপ্রেক্ষিতেও বর্তমান আলোচনাটি মূল্যবান যদিও এই আন্দোলনের ভাবযোগীরূপে কথিত কাজী আবদুল ওদুদের বক্তব্য এবং সাহিত্যসমাজের প্রতি স্বাতন্ত্র্যবাদীদের ব্যবহার স্মরণে রাখলে, মুক্ত-বুদ্ধির এই আন্দোলনের সঙ্গে পাকিস্তান দাবীর যোগসংযোগ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা না করলেই ইতিহাসের প্রতি সুবিচার করা হোত।

বাংলাসাহিত্য সম্পর্কিত ভাবনায় আমরা লেখকের মুক্ত মন ও সাহিত্যবোধের পরিচয় পাই। 'সাহিত্যের দিগন্ত' প্রবন্ধে তিনি উল্লেখ করেন, 'ইসলাম হবে [পূর্ব-পাকিস্তানের] সাহিত্যের আদর্শ এ-কথা কেউ কেউ বলেন।' (পৃঃ ৫১) কিন্তু তাঁর প্রধান বক্তব্য : 'সাহিত্য বাধ্যতামূলকভাবে এই-ধর্মভিত্তিক বা ওই-ধর্মভিত্তিক হবে একথাই বা মনে করা কেন? সাহিত্য নিছক সাহিত্য হতে পারে,...এবং আধুনিক যুগে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে তাই হয়ে থাকে। তার আদর্শ হতে পারে শুধু সুন্দরের ধারণা, শুধু মানবপ্রেম বা ধর্মনিরপেক্ষ মানবতাবাদী কোনো মতবাদ। যিনি যে ধর্মের-ই হোন প্রত্যেক সাহিত্যিকেরই আরেকটি ধর্ম' থাকে সেটি সাহিত্যধর্ম।' (পৃঃ ৫১-৫২) ভাষার প্রশ্নেও তাই কোনো সংস্কার তাঁকে আচ্ছন্ন করেনি। বাংলাভাষার প্রকাশক্ষমতা বৃদ্ধির জন্যেই তিনি শুধু অন্য ভাষার স্বারস্থ হতে রাজি—অন্য কারণে নয়। তিনি যখন শোনেন, "আরবী-ফারসী-উর্দু শব্দ এ ভাষায় [বাংলায়] আরও প্রচুর পরিমাণে আমদানী করতেই হবে,' তখন বলেন, 'আমরা বিদেশী শব্দ নেব না কেন? এই বিদেশী শব্দের মধ্যে আরবী-ফারসী শব্দও থাকবে, তাদের নিজস্ব কোনো বিশেষ অধিকারে নয়, জোর জবরদস্তি করে নয়, আমাদের প্রয়োজনে।' (পৃঃ ৫০) বাংলা ভাষার প্রকৃতি ও শব্দপ্রয়োগের ঐতিহ্য সম্পর্কে বিশেষ অবহিত বলেই তিনি বলেন 'আমাদের মধ্যে অনেকেই স্বীকার করতে কুণ্ঠিত হবেন তবু একথা সত্য যে, কিছু সংখ্যক লেখক যে কিছু সংখ্যক লেখকের চেয়ে ভালো লেখেন তার একটা কারণ তৎসম বা সংস্কৃত শব্দরীতির উপর 'তাঁদের অপ্রতিহত অধিকার।' (পৃঃ ৫১)।

সাহিত্য সম্পর্কে এই বোধ তাঁর সংস্কৃতি-ভাবনাতেও সঞ্চারিত। পাকিস্তানী

সংস্কৃতির তাৎপর্য আলোচনায় তিনি প্রথমত উল্লেখ করেন, 'ইসলামী সংস্কৃতি ও সংখ্যালঘু সংস্কৃতির যে সামগ্রিক যোগফল তাই হবে পূর্ব-পাকিস্তানের সংস্কৃতি।' (পৃঃ ১৭৫) এবং 'এখানকার সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলির ওপর আমরা জোর করে ইসলামী সংস্কৃতি চাপিয়ে দিতে পারি না।' (ঐ) কিন্তু এইখানেই তাঁর বক্তব্য থেমে যায় নি, বরং আরো অগ্রসর হয়ে তিনি সাহসের সঙ্গে প্রশ্ন করেন, 'যদি কেবল মুসলমানদের কথা বলা যায়, তবু এমন কথা বলা যায় না যে, সব মুসলমানকেই বিশুদ্ধ ইসলামী আদর্শে সংস্কৃতিমূলক কাজ করে যেতে হবে' এবং বাস্তব সত্য হিসেবে উল্লেখ করেন যে 'মুসলমান সর্বদা পিউরিটানিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে বিশুদ্ধ ইসলামী সংস্কৃতি গড়ে তোলে নি, ভবিষ্যতেও তুলবে না—কারণ সেটা সম্ভব নয়।' (পৃঃ ১৭৫) চিত্রকলা, সঙ্গীত, বিশেষত লোকসঙ্গীত, নাটক, যাত্রা, লোকনৃত্য, পোশাক প্রভৃতির উল্লেখ করে তিনি অবশেষে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, পাকিস্তানী সংস্কৃতিতে অনৈসলামিক বস্তুর পরিমাণ কম নয়; সংখ্যালঘু সংস্কৃতি এর মধ্যে ধরা হোক আর না হোক। (পৃঃ ১৭৭) এবং পাকিস্তানের সংস্কৃতি প্রসঙ্গে তাঁর চূড়ান্ত মত হোলঃ 'আমাদের সংস্কৃতি যেন রাষ্ট্রবিরোধী না হয় এবং সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ প্রচার না করে। এই শর্তটুকু পালিত হলে সে সংস্কৃতি গোঁড়া ধর্মবাদীদের ব্যাখ্যা মাফিক ইসলামী সংস্কৃতি হলো কি না, তা আমরা দেখতে যাবো না।' (পৃঃ ১৭৯)

উপরোক্ত আলোচনাগুলি থেকে এটুকু স্পষ্ট যে বর্তমানে পূর্ব পাকিস্তানে বাঙালী মুসলিম সমাজে যে নতুন আত্মজিজ্ঞাসা জেগেছে, আত্ম-পরিচয় সম্পর্কে যেসব নতুন প্রশ্ন উত্থিত হয়েছে এবং তার উত্তরে যেভাবে নতুন এক দেশ ও ভাষাগত জাতীয়তার বোধ সমাজ মানসে উত্তরোত্তর প্রবল হয়ে উঠেছে, আবদুল হক সেই বোধের-ই অন্যতম বাণীবাহক। তাঁর 'নামায়ন' প্রবন্ধেও এই বোধের প্রতিফলন দেখি। তাঁর দুঃখ এই যে 'কিছু সংখ্যক ব্যতিক্রমের কথা বাদ দিলে বাঙ্গালী মুসলমান কোনোদিনই জানলো না তার নামের অর্থ কি......' (পৃঃ ২৩৯) আর তাই তাঁর প্রশ্ন 'আমরা আমাদের ভাষায় নাম রাখলে তা একটা সৃষ্টিছাড়া হৃৎকম্পকর ব্যাপার হবে কেন?' (পৃঃ ২৪২) তবে তিনি আনন্দিত কারণ 'নতুন চেতনার আভাস কোথাও কোথাও দেখা যাচ্ছে। বাঙ্গালী মুসলমান মেয়েদের ঘরোয়া নাম মাতৃভাষায় রাখা হচ্ছে এ আজ একেবারে আজগুবি ব্যাপার নয়।" তাঁর মনের কথা এই যে 'ওই ঘরোয়া নামগুলি যাঁরা রেখেছেন তাঁরা আমাদের শ্রদ্ধার পাত্র।' (পৃঃ ২৪৩)।

বৃহত্তর দেশ ও ভাষাগত পরিচয় সমাজ-মানসে সত্যতর হয়ে ওঠার ফলে ধর্মীয় পরিচয় এবং জীবনে ধর্মের স্থান সম্পর্কেও নতুন বক্তব্য ক্রমশ প্রখর না হয়ে পারে নি। 'প্রগতি ও ধর্ম' শীর্ষক প্রবন্ধে দেখি আবদুল হক লক্ষ্য করেছেন যে আজকের জগতে 'বিচারবৃত্তির এই প্রাধান্যের ফলে অন্ধবিশ্বাসপ্রবণতা ক্ষীণ হয়ে এসেছে।' (পৃঃ ১৮৭) ধর্ম এবং ঐতিহ্যের ক্ষেত্রে বিশেষ করে তিনি খোলাচোখে দেখছেন যে, "নীতিবোধ—অন্য কথায় বিবেক ধর্ম-নিরপেক্ষ বিচারবৃত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে জীবনযাত্রা ধর্মের সঙ্গে ক্রমশ সম্পর্ক-হীন হয়ে আসছে।......দৈনন্দিন ধর্মাচরণ ক্রমশই পরিত্যক্ত হচ্ছে।' (পৃঃ ১৮৯) এই অবস্থায় তাঁর প্রশ্ন 'ধর্মের ভবিষ্যৎ তাহলে কি?' (ঐ)।

ভবিষ্যৎ খুব একটা তিনি দেখতে পান নি। প্রথমে তাঁর মনে হয়েছে যে, "ভবিষ্যতে ধর্ম হয়তো লুপ্ত হয়ে যাবে!" পরে অবশ্য এই চিন্তায় তিনি ঠিক নিজেকে না হলেও বিশ্বাসীদের কিয়দংশকে আশ্বস্ত করতে চেয়েছেন যে "কিছু লোক" তাদের প্রকৃতি-বৈশিষ্ট্যের জন্যেই সর্বক্ষেত্রেই ধর্মের শাসন ও নিয়ন্ত্রণ স্থায়ী রাখতে সংকল্পবদ্ধ; এই

সম্ভাবনায় তাঁরা খুব একটা উৎসাহিত হবেন মনে হয় না।

ফলত লেখকের মন গতিশীল এবং 'চিন্তার অগ্রসরণ' প্রবন্ধে দেখি যে, ভবিষ্যৎ যে বর্তমান বা অতীতের—এমনকি আদর্শায়িত অতীতেরও পুনরাবৃত্তি হবে না, এই ভাবনা তাঁকে এতটুকু দুঃখিত করে না, বরং তিনি একে স্বাগত জানান। এই জন্যেই সাহিত্য বিচারে 'প্রত্যয়ের সাহিত্য' ও 'আধুনিক কবিতা' শীর্ষক আলোচনা দুটি আমাদের কিছুটা নিরাশ করেছে। আধুনিক কবিতা বা সাহিত্যের মূল প্রেরণাটা তিনি ধরতে পেরেছেন মনে হয় না। তিনি মনে করেন যে ক্ষয়িষ্ণুতা সাহিত্যের বিষয়বস্তু হতে পারে 'সমাজে যখন ক্ষয়িষ্ণুতা বর্তমান'। 'কিন্তু পশ্চিম ইয়োরোপের ক্ষয়িষ্ণু সমাজের মতো লক্ষ্যহীন আমরা নই' এবং এই পরিপ্রেক্ষিতে পশ্চিমবঙ্গের সাহিত্যের কথাও তিনি উল্লেখ করেছেন।* যদি আমরা তাঁর সঙ্গে একমতও হই যে 'আমাদের [পূর্ব-পাকিস্তানের] সমাজের অগ্রগতির সম্ভাবনা এখনো অফুরন্ত (পৃঃ ৬) এবং তাঁরই মতো সেই অগ্রগতির রাজনৈতিক ও অর্থ-নৈতিক চরিত্র সম্বন্ধে কোনো প্রশ্ন না তুলে প্রচলিত ব্যবস্থা সম্পর্কে অলীক আশাবাদের শরিক হই, তবু প্রশ্ন জাগে যে, তথাকথিত সামাজিক-অর্থনৈতিক অগ্রগতি বা উন্নতি কি সব সময়ে সাহিত্যিককে আশাবাদী করে তোলে? শিল্প-বিপ্লবের পর অন্তত কোথাও এরকম ঘটে নি। উনিশশতকের গোড়ায় ইংলন্ড যখন অগ্রগতির রথে ধাবমান তখন কীট্‌স্‌ চারিপাশে চোখ মেলে দেখেছিলেন:

Here where men sit and hear each other groan.
Where palsy shakes a few, sad, last grey hairs,
When youth grows pale and spectre-thin, and dies;
Where but to think is to be full of sorrow;

ইংলন্ডে তখন যাঁরা আশা রাখতে পেরেছিলেন তাঁরা হয় বিপ্লবের কথা ভেবেছিলেন, নয় সমাজ-সম্পর্কহীন প্রকৃতির কথা।

জার্মান সাম্রাজ্যের অগ্রগতির যুগেও (১৮৭০-এর পর) সাহিত্যকরা সবচেয়ে বিমর্ষ ও প্রত্যয়হীন হয়ে পড়েছিলেন। গোটা প্রক্রিয়ার মধ্যে টোমাস মান দেখেছিলেন গভীর একটা অসুখ। মানুষ আশা করছে যে, সমাজতান্ত্রিক অগ্রগতিতে সাহিত্যের অন্যতর রূপ ও প্রকৃতি স্ফুটিত হবে। কিন্তু সেক্ষেত্রে সরকারী অতি-নিয়ন্ত্রণ শেষ পর্যন্ত সে সম্ভাবনা ব্যর্থ করেছে। রুশ-বিপ্লবের সমকালে যে বিপুল সাহিত্যিক-স্ফুরণ ঘটেছিল, গোর্কীর তৎকালীন সমালোচনায় আমরা যার উল্লেখ পাই, আলেকসান্দার ব্রক ও মায়াকোভস্কীর রচনায় নতুন কৃতির যে প্রতিশ্রুতি ছিল, পরে তা শূন্যে বিলীন হয়েছে। বস্তুত স্তালিন-যুগের সাহিত্যকর্ম সম্পর্কে ট্রটস্কীর মতের সঙ্গে একমত না হয়ে উপায় নেই যে, La litte'rature et l'art de l'e'poque Stalinienne resteront dans l'historic commedes exemples du byzantinisme le plus absurde et le abjet" (*Staline, par L. Trossky*, Grasset, Paris 1948, *p* 540)। অথচ স্তালিন-যুগে জীবনের নানা ক্ষেত্রে যে অগ্রগতি হয়েছে তাকে অস্বীকার করলে সত্যকেই অস্বীকার করা হবে শুধু।

*যদিও অন্যত্র ('সমৃদ্ধি, সংস্কৃতি ও মূল্যবোধ' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য) তিনি এর বিপরীত কথা বলেছেন। যেমন—"স্বাধীনতার আমলে বাঙালী মুসলিম সমাজ বহুকাল পরে সমৃদ্ধির কিছুটা সুযোগ পেলেও অবলুপ্ত ও অবলুপ্তিমান জাতি ও সমাজের দুর্লক্ষণগুলির সঙ্গেও জড়িয়ে পড়েছে" (পৃ ২০২)।

বস্তুত আধুনিক সাহিত্যের প্রেরণা সম্পর্কে দার্শনিক সান্তায়ানার মত সর্বাধিক গ্রহণীয় মনে হয়। সান্তায়ানা বলেন যে, বর্তমানে আধুনিকতার চেতনা সক্রিয় হয়েছে, কারণ অতীতে, 'The perspective of Time was less clear because the synthesis of experience was more complete' (দ্রষ্টব্য : *Times Lit. Suppl.*, 16 April '69) এইটাই প্রকৃত কথা। আধুনিকতা জেগেছে কারণ অতীতের সংগে আজকের অভিজ্ঞতার সংশ্লেষণ আর সম্ভব হচ্ছে না। জোড় নয়—বিজোড়টাই বড়ো হয়ে ঠেকছে। অগ্রগতি হলেও এটা সত্য, না হলেও তাই। আর তাই আধুনিক চেতনা, সাহিত্য ও শিল্পে সচেতন-ভাবে আত্মপ্রকাশ করছে। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতেও আমরা এর অনুরণন শুনেছি।

অসিতকুমার ভট্টাচার্য

মই ময়ূর মন—লোকনাথ ভট্টাচার্য। অব্যয়, ৪২ গড়পার রোড, কলকাতা, ৯। তিন টাকা।

কখনও কখনও এমন দু-একজন কবির সাক্ষাৎ পাওয়া যায় যাঁরা জনপ্রিয় না হবার সমস্ত রকম ঝুঁকি নিয়েও প্রচলিত পথে চলতে অস্বীকার করেন। তাঁরা এমন একটি কাব্য-রীতিকে আঁকড়ে থাকেন যা অপরীক্ষিত না হলেও ব্যবহারে মলিন নয়। কোন প্রলোভনেই তাঁরা সেই রীতিটি বর্জন করতে চান না।

লোকনাথ ভট্টাচার্য এই ধরনের বিরল কবিত্ব-শক্তির অধিকারী। আলোচ্য কাব্য-গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত ছাপ্পান্নটি কবিতাই গদ্য-কবিতা। একবারও তিনি পদ্য-ছন্দে একটি কবিতা লিখবার জন্য প্রলুব্ধ হননি। তাঁর এ ধরনের প্রয়াসকে নিঃসংশয়ে দুঃসাহসিক বলা যায়।

লোকনাথবাবুর কবিতা পড়তে পড়তে স্বাভাবিকভাবেই কবি অরুণ মিত্রের কবিতা মনে পড়ে। দুজন কবির মধ্যে অনেক বিষয়ে মিল আছে, আবার অমিলও আছে। বিদেশী (বিশেষত ফরাসী) সাহিত্যের সংগে ঘনিষ্ঠ পরিচয় দুজন কবিকেই গদ্য-কবিতা লিখতে অনুপ্রাণিত করেছে কিনা—এ প্রশ্ন আমাদের মনে জাগে। অরুণ মিত্র গদ্যে কবিতা লেখেন, লোকনাথবাবুও তাই। কিন্তু অগ্রজ কবির কবিতায় যে আপাত-সারল্য লক্ষ্য করা যায়, তা অনুজ কবির ক্ষেত্রে অনেক সময়ই অনুপস্থিত। অবশ্য ব্যতিক্রমও আছে। কোন কোন কবিতায় লোকনাথবাবু অনায়াসেই অকপটে মনের ভাবটি ব্যক্ত করেছেন। এই প্রসংগে এই গ্রন্থের প্রথম কবিতাটির শেষ অংশটি উদ্ধৃত করা যেতে পারে—

> শুনলাম, কলকাতায় নাকি চারশো মেয়ের দল শোভাযাত্রা করে নীরব প্রতিবাদ জানিয়েছে আমেরিকান আপিসে: আবার ভিয়েৎনাম। ভিড়ের মধ্যে আমি সেই নেত্রীর মুখটি খুঁজি, হাতে একগুচ্ছ ফুল, তার খোঁপায় পরাবার। [সেই নেত্রীর মুখ]

কিন্তু এই অনায়াস স্বাচ্ছন্দ্য তাঁর অধিকাংশ কবিতাতেই লক্ষ্য করা যায় না। বরং অনেক ক্ষেত্রেই বাক্যের পদবিন্যাস জটিল আকার ধারণ করেছে।

অরুণ মিত্রের কবিতায় যে জীবনবোধ ও আশাবাদের সুর লক্ষ্য করা যায় তা লোকনাথ বাবুর কবিতায়ও দুর্লক্ষ্য নয়। লোকনাথবাবুর বেশ কয়েকটি কবিতায় জীবনসম্পর্কিত আবেগ তীব্র হয়ে উঠেছে। তাঁর এই জীবনপ্রীতির সংগে মিলিত হয়েছে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কবির নিশ্চিত প্রত্যয়। উদাহরণস্বরূপ—

আমার প্রস্তাব: আমার এই ঘরের মূঢ় কোণটাকে বকবকিয়ে হঠাৎ পাগলা করে তোলো। আনো অনেক শিশুর হাসি, বিচিত্র খেলনা, আনো উজ্জ্বল আলো, আনো আনন্দ। [আমার প্রস্তাব]

হে ঈশ্বর, প্রেম দাও ভাইকে ভালোবাসার, ভাইকে প্রেম দাও আমায় ভালোবাসার, দাও সহজ শুচিতার গন্ধ মনের নাসিকায়—কবিতা পরে হবে। [প্রার্থনা]

ঐ শোনো জীবন জাগছে পাখির ডাকে, আলোয়, হাওয়ায়—এসেছে কেউ তোমার দ্বারে রাত্রির তিমির পেরিয়ে। [তিন মুহূর্ত]

সে ঘুমোচ্ছে, নীরব নির্জীব নিরহংকার নির্জ্ঞান, তার আমি দোষ দিই না। তবু তাকে জাগতে হবে, কারণ ফুলকে যে ফুটতে হবে। নইলে আমরা কি সারারাত শুধু জপের মালায় যে-ভোর এল না তার নাম গাঁথব? [তার নিদ্রার মৃত্যু]

এরকম আশাবাদী বক্তব্য এই গ্রন্থের বহু কবিতার মধ্যেই ছড়িয়ে আছে। উদ্ধৃতির বাহুল্যের আশংকায় এখানে কয়েকটি কবিতার অংশমাত্র উদাহৃত হল।

লোকনাথবাবুর কবিতায় কবির আত্মগত ভাবনাই প্রাধান্য পেয়েছে। তাঁর কবিতায় নিসর্গের নিছক বস্তুনিষ্ঠ বর্ণনা নেই। তাঁর স্বগত ভাবনার কাব্যিক প্রকাশে প্রকৃতি-বর্ণনা সহায়তা করেছে। তাঁর বিভিন্ন কবিতায় কখনও স্বদেশ-স্বকাল, কখনও সৌন্দর্য-চেতনা, আবার কখনও প্রেমকে অবলম্বন করে তাঁর বিচিত্র ভাবনার প্রকাশ ঘটেছে। একটি কবিতায় কবি 'অকবির অগভীর দৌরাত্ম্যে'র বিরুদ্ধে স্পষ্টভাবেই বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন। ময়ূরের প্রসঙ্গ এই গ্রন্থের বহু কবিতায় ফিরে ফিরে এসেছে। কাব্যগ্রন্থের নাম মনে রাখলে তার একটি সঙ্গত কারণও আবিষ্কার করা কঠিন নয়।

কবির বড়ো বৈশিষ্ট্য হল চিত্রকল্পের সার্থক প্রয়োগ—যা স্বকীয়তায় উজ্জ্বল এবং পূর্বসূরী বা সমসাময়িক কবিদের ব্যবহারে জীর্ণ নয়। 'এই পোড়া মাটিতে যে ফুল ফোটাই আমার বেদনায়, সে আগুনের ফুল—টেক্কা দেয় কোটি যোজন দূরের তারার সঙ্গে। আকাশ তাকে দেখবার জন্যে হয়েছে পাষাণ-শতদল—মুখ ঘুরিয়ে বিস্ফারিত সে চেয়ে আছে তলার দিকে, বোঁটা তুলে দেখা অদেখা শূন্যে' কিংবা 'আকাশে আকাশে অজস্র মেঘের খুন, তখন ছিনিমিনি রক্তের। নিমেষের লাল পর্দা, মেঘেরা, সরিয়ে উঁকি মারল তখনো যে একটিমাত্র ব্যথা : তারা।' এই ধরনের চিত্র তাঁর কবিতার মধ্যে ইতস্তত ছড়িয়ে আছে।

লোকনাথবাবুর কবিতার বাঁধুনি দৃঢ়। দু-একটি ক্ষেত্র ছাড়া তাঁর অধিকাংশ কবিতারই আয়তন পরিমিত। শব্দব্যবহারেও কবি বিশুদ্ধ শব্দের পাশাপাশি অসংস্কৃত শব্দকে অনায়াসে স্থান দিয়ে নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন।

সুবন্ধু ভট্টাচার্য

তৃষ্ণার জল—অন্নদাশঙ্কর রায়। ডি. এম. লাইব্রেরী, ৪২ বিধান সরণি, কলিকাতা-৬। মূল্য ছয় টাকা।

Love is a craving to fulfil man's inner solitude, inviting others to tresspass upon it thinking that all our emotional problem can be solved by it—

সম্ভবত খুশবন্ত সিং, এডিনবার্গ পেন কংগ্রেসে, প্রেমের এই রকম একটা সংজ্ঞা নির্ধারণের চেষ্টা করেছিলেন। নরনারীর প্রেমানুভূতি সম্পর্কে সকলে যে এই রায়ই মেনে নেবেন, তা নয়। কিন্তু তবু inner 'solitude' কথাটার সঙ্গে—বিষাদের আত্মীয়, বেদনার অঙ্গীকারে বিহ্বল, সেই রহস্যময় মানবানুভূতির যেন কোথাও একটা নিবিড় সম্পর্ক আছে। প্রবীণ কথাশিল্পী অন্নদাশঙ্কর রায় তাঁর সাম্প্রতিক দুখানি উপন্যাসে এই অনুভূতিরই যেন অন্য এক পরিভাষার সন্ধান করেছেন। উপন্যাসের বিষয় হিসেবে প্রেম বরাবরই অন্নদাশঙ্করের কাছে আকর্ষণের বস্তু। প্রথম দিকে সংস্কারমুক্ত পাশ্চাত্ত্য সভ্যতায় অনুরক্ত লেখক, প্রেমের অন্তর্নিহিত শক্তিকে নানা পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে যাচাই করে নিতে চেয়েছিলেন। এমনকি সেই দৈবী অনুভূতির বহুল অসারতা বা কৃত্রিমতার প্রতি ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করতেও সেদিন কসুর করেননি তিনি। কিন্তু আজ এই পরিণত বয়সে অন্নদাশঙ্করের ভাবদৃষ্টি প্রাচ্য মূল্যবোধের সংযুক্তিতে প্রগাঢ়তর, প্রেমানুভূতি যেন পূর্ণতাবোধেরই প্রমিতি। বস্তুত, এখন তাঁর নিকট 'বিশল্যকরণী'ই প্রেমের অভিধা, 'তৃষ্ণার জল' অন্বিষ্ট।

আজ থেকে প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর আগে অন্নদাশঙ্কর লিখেছিলেন 'পুতুল নিয়ে খেলা', তারও তিন বছর আগে 'আগুন নিয়ে খেলা'। বিষয় তখনও ছিল মূলত প্রেম, পটভূমি অংশত ইয়োরোপ। পাত্রপাত্রীরা ছিল পাশ্চাত্ত্যপ্রেমিক ইঙ্গবঙ্গ সমাজের প্রতিনিধি, কিছু বা সরাসরি পাশ্চাত্ত্যদেশীয়। 'বিশল্যকরণী' বা 'তৃষ্ণার জল' সময়ের দিক থেকে প্রায় চার দশকের ব্যবধানে লিখিত হলেও এর মধ্যে সেই পুরানো ছকটার অনেকটাই বজায় আছে। এখানেও কাহিনীর সূত্রপাত বিদেশে, পরিণতি বাংলাদেশে। 'বিশল্যকরণী'র নায়ক হারীত এবং 'তৃষ্ণার জল'-এর নায়ক প্রবাহনের জীবনসমস্যা পূর্বোক্ত উপন্যাসদুটির মতই যেন একই ভাববৃত্তের দুটি পর্যায়। তবু পার্থক্য একটা অবশ্যই চোখে পড়ে। যে হৃদয়-বিনিময়ের আখ্যান শিল্পীর দৃষ্টিতে একদা ছিল 'খেলা'র সমতুল তাই আজ তাঁর চোখে সমগ্র অস্তিত্বেরই এক প্রচণ্ড পিপাসা। যার উপশম নেই, প্রতিকার নেই সেই অপূরণীয় দুঃসহ তৃষ্ণায় আজ যুগলপ্রাণের আত্মসমর্পণ! 'তারই জন্যে আমি অপেক্ষা করতে চাই যে আমার তৃষ্ণার জল, আমি যার তৃষ্ণার জল।'—একথা বলে প্রবাহন যে একইসঙ্গে অকপট দুঃসাহসিকতায় প্রথম জীবনের প্রেমিকা এবং এক বিদেশিনীর প্রতি তার অনুরাগকেও সমান মর্যাদা দেয়। একটি ছাইচাপা আগুনের মত, আর একটি যেন বিয়াট্রিস-এর ভালবাসার মত, যা 'দূর আকাশের নক্ষত্র। জ্বালাময় নয় জ্যোতির্ময়।' প্রবাহনের কাছে এ দুই-ই আছে, থাকবে। কিন্তু তবু দেহমনের সম্মিলিত তৃষ্ণায় আকুল নায়কের বিশেষ একটি হৃদয়ের জন্যেই দুর্মর প্রতীক্ষা।

প্রবাহনের জীবনে এই উপলব্ধি এসেছে হঠাৎ নয়, কয়েকটি ঘটনার স্তর, বিভিন্ন বয়স ও স্বভাবের কয়েকটি নারীচরিত্রের সান্নিধ্যের অধ্যায় পেরিয়ে। 'বিশল্যকরণী'র হারীত-বকুল, হারীত-পার্বণী, হারীত-জোনস-এর অনুরাগপর্বের আর এক নাম হয়ত প্রেমেরই পথপরিক্রমা, অভিজ্ঞতার আবর্ত; যার মধ্যে দিয়ে জন্মলাভ করেছে প্রবাহন নামক চরিত্র, তৃষ্ণার জলের আইডিয়া। প্রবাহন তাই কোন অবিমিশ্র একক চরিত্র নয়, তার মধ্যেই নিহিত হারীতের জীবন ও মানসিকতা। হারীতের মত সেও ভাবুক ও লেখক। তারও প্রথম প্রণয়িনী ইচ্ছার বিরুদ্ধে অন্যত্র বিবাহিতা। এবং যে বিদেশিনী নারীর মধ্যে হারীত তার বিয়াট্রিসকে আবিষ্কার করে 'বি-শল্য' হতে চেয়েছিল তারই দুর্মর স্মৃতি প্রবাহনের কল্পনায় লালিত।

ইলেন সেই আশ্চর্য নারী যে নায়কের প্রার্থিত তৃষ্ণার জলের আশ্বাস বহন করে আনে

এবং যার সঙ্গে মিলনের মধ্যে দিয়েই প্রবাহনের অনুসন্ধান শেষ হয়। আলংকারিক বিচারে তাই ইলেনেই হয়ত এই গ্রন্থের নায়িকা। কিন্তু বিন্যাসের দিক থেকে রানীবৌদিই এই কাহিনীর প্রধান চরিত্র। বর্ষীয়সী, সন্তানের জননী এবং গৃহস্থবধূ রানীবৌদির কাছেই প্রথম তৃষ্ণার জল প্রার্থনা করে বসে প্রবাহন। প্রবাহন সদ্য বিলেত-ফেরত সিভিলিয়ান, তরুণ লেখক এবং পুরোপুরি বোহেমিয়ান। তার আচমকা এই প্রস্তাবে সুদেষ্ণাদেবী নিমূঢ় হয়ে পড়েন ঠিকই কিন্তু কোথাও একটা প্রশ্রয়ের ভঙ্গিই থেকে যায় তাঁর অসম্মতির মধ্যে। দুজনের মধ্যে নিবিড় প্রীতির সম্পর্কের গভীরে এক অবোধ্য আকর্ষণের টান জড়িয়ে থাকে। সেটা প্রবাহনের দিক থেকে যতটা না, অসমবয়সী সুদেষ্ণার দিক থেকে তার অনেক বেশি। শেষপর্যন্ত রানীবৌদির স্বপ্ন-কামনার মধ্যে ফ্রয়েড-ইয়ু তত্ত্ব সন্ধানেরও অবকাশ এসে যায়। সে যাই হোক, মোটামুটি রানীবৌদির সামনেই প্রবাহন নিজেকে যথেষ্ট মেলে ধরতে পেরেছে। সুদেষ্ণার উন্মুখ শ্রুতিকে উপলক্ষ করেই তার বক্তব্য অনর্গল উৎসারিত। ভালবাসা, বিবাহ এবং তার সঙ্গে দেহ ও মনের সম্পর্ক বিষয়ে নানা আলোচনায় নিজেকে ব্যক্ত করে প্রবাহন। সম্পত্তিভিত্তিক বিবাহে তার অরুচি, বিবাহবর্জিত সহবাসে তার অতৃপ্তি—একমাত্র প্রেমভিত্তিক বিবাহেই তার আসক্তি। 'প্রিয়াকে স্ত্রীরূপে পাওয়াই আমার জয়। যে প্রিয়া নয় তার স্বামী হওয়াই পরাজয়।' তার কল্পিত প্রিয়াকে পরখ করে নেবার জন্যে সে একটা অদ্ভুত পরিকল্পনাও ঠিক করে। বিয়ের আগে আই.সি.এস. পদে ইস্তফা দিয়ে সে তার ভাবী প্রিয়ার কাছে আত্মমূল্য যাচাই করে নিতে চায়। ধন নয়, মান নয়, মাত্র লেখক প্রবাহনের জন্যেই যে অনুরাগী সেই হবে বাঞ্ছিত নায়িকা। কাজরীর ভালবাসা বোধহয় এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারে না, ইলেন পারে। ইলেন আর প্রবাহন—দুরন্ত আবেগ ও উষ্ণতায় এই দুটি চরিত্র দেহমন নিয়ে একাকার হয়ে যায়। কী লাবণ্যময় সেই প্রেম-বিনিময়ের ভাষা! কী রমণীয় সেই দিব্যযন্ত্রণার আনন্দিত উৎসার! কিন্তু পরিপূর্ণ মিলনের মুহূর্তেই আসে বিরহের আকস্মিক অভিঘাত।

সুদেষ্ণার ভালবাসা 'গোপীপ্রেম', আর ইলেনের? পূর্বরাগ, অভিসার, মিলন, আক্ষেপানুরাগ এবং তারপর বিরহ। প্রাচ্য-প্রেম-কল্পনায়-ধৃত সেই ধ্রুববলয়ের মধ্যে দিয়েই যেন তাদের সম্পর্ক পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়। বিয়ের পরই অসুস্থ পিতার কাছে ছুটে যেতে হয় ইলেনকে আর 'জাহাজঘাটে পাগলের মতো রুমাল নাড়তে থাকে বিরহী যক্ষ। আর সবাই যখন তাদের প্রিয়জনদের বিদায় জানিয়ে চলে গেছে তখনো সে একা দাঁড়িয়ে একদৃষ্টে চেয়ে আছে পশ্চিম দিগন্তে।' লক্ষ করতে হবে, ভারতীয় প্রেমকাব্যের অধীশ্বর কালিদাসের যক্ষ এই আন্তর্জাতিক মিলন ও বিরহের মুহূর্তে একটি তাৎপর্যপূর্ণ অনুষঙ্গ। অভিনিবেশ সহকারে আরও লক্ষণীয়, ইলেনের কাছে আত্মসমর্পণের মুহূর্তে প্রবাহনের প্রথম প্রার্থনা একটি সন্তান। প্রেমকল্পনার প্রাচ্য মহিমা, কুমারসম্ভবের স্মৃতি, কে জানে, এই অকপট প্রার্থনার মধ্যে অভিব্যক্ত কিনা।

প্রবাহন-ইলেন আখ্যান এখানেই সমাপ্ত কিন্তু কাহিনী এর পর আরও এক ধাপ অগ্রসর হয়ে এই উপন্যাসের প্রধান চরিত্র সুদেষ্ণাদেবী, প্রবাহনের রানীবৌদিকে আর একবার ফিরিয়ে এনেছে। রানীবৌদির উন্মুখহৃদয় প্রবাহনের মধ্যে এক হৃদয়-জয়-করা রাজপুত্রের স্বপ্ন দেখেছিল একদিন। সেই নিষিদ্ধ স্বপ্নের জন্যে আজ কুণ্ঠিতা সুদেষ্ণার অনুনয়: 'ওটা তুমি ভুলে যেও লক্ষ্মিটি।' না, রানীবৌদি কাব্যের উপেক্ষিতা নন। তার মধ্যে দিয়েই শিল্পীর অন্য এক দুঃসাহসিক অভিজ্ঞান সঞ্চালিত হয়ে উঠেছে অন্তিম অনুচ্ছেদ জুড়ে।

'স্বপ্নই মানুষকে মুক্তি দেয়। স্বপ্নেই মানুষ স্বাধীন। সে যা স্বপ্ন দেখে তা সমাজের চোখে নয়, সংসারের চোখে নয়, তা আপনার চোখে, তার তৃতীয় নয়নে। তার আর সব স্বাধীনতা হাতছাড়া হতে পারে, কিন্তু এই স্বাধীনতা সব সময় তার হাতে। তাই তো আমরা রোজ রোজ স্বপ্ন দেখি। যা খুশি। যখন খুশি।'

একটি রোমান্টিক বিষন্নতার মধ্যে তৃষ্ণার জল শেষ হয়। এবং সঙ্গে সঙ্গে যেন এর ঘটনা, চরিত্র এমনকি মূল ভাবটিও একটি সুপরিকল্পিত স্বপ্নের মত বিলীন হয়ে যায়। কাহিনীর অতিপরিশীলিত বিন্যাস আমাদের চমকে দেয় অনেকবার—কিন্তু আকর্ষণ করে না, আঘাতও নয়। তার একটা বড় কারণ হয়ত এই অভিজাত চরিত্রগুলি আমাদের বড় বেশি অচেনা। আত্মপ্রত্যয়ে কঠিন এই বিদগ্ধ চরিত্রগুলি বড় বেশি প্রগলভ; মননশীল লেখকের অভিভাবকত্বের নিয়ন্ত্রণে প্রায়শই নিরাকার। অন্নদাশঙ্করের চরিত্রসৃষ্টি সম্পর্কে সমালোচকের* যে অভিযোগ, 'they remain at best stereotypes and do not become men and women of flesh and blood'—তা বোধ হয় এই উপন্যাসের পাত্রপাত্রীদের অতি মুখরতা সত্ত্বেও খারিজ হয় না। অবশ্য সমস্যাকেই অথবা তাঁর বিশেষ দার্শনিকতাকেই অন্নদাশঙ্কর উপন্যাসের মধ্যে সবচেয়ে বড় বলে মানেন। কিন্তু চরিত্রের অসহযোগিতায় সে তত্ত্ব বহুক্ষেত্রে অপরিস্ফুট থেকে যায়, কখনও বা লেখকের অপ্রত্যাশিত আবির্ভাবে মূল প্যাটার্ন থেকে বিচ্ছিন্নও হয়।

তবু শেষের কবিতার পর প্রেম বা প্রেমতত্ত্বের উপন্যাস হিসেবে 'তৃষ্ণার জল' উল্লেখযোগ্য উপন্যাস। বিশেষ করে শেষের কবিতার নামটিই হয়ত এই সূত্রে প্রাসঙ্গিক। কারণ, রবীন্দ্রপ্রভাব অন্নদাশঙ্করের কাছে কোথাও কোথাও সচেতনভাবেই স্বীকৃত হয়েছে।

বিভূতি রায়

Unlawful Assembly. *By* D. J. Enright. Hogarth Press Ltd., London. 18*s*.

বর্তমান শতাব্দীর পঞ্চম দশকে ইংলন্ডে 'দি মুভমেন্ট' নামে একটি কাব্য আন্দোলন দেখা দিয়েছিল। তখনকার অনেক তরুণ কবিদের অনেকেই সেই আন্দোলনের অংশীদার ছিলেন। যেমন কিংস্‌লে অ্যামিস, টম গান, জন ওয়েইন ইত্যাদি। কবিতাকে সহজ হতে হবে এই ছিল তাঁদের প্রধান বক্তব্য। এ'রা বায়বীয় চিন্তার বিরোধী, তরল আবেগে অবিশ্বাসী। আবেগকে এ'রা অশ্রদ্ধেয় বলে উড়িয়ে দেননি, কিন্তু মননকে তার ওপরে স্থান দিয়েছেন। প্রতীক বা রূপকল্প রচনা থেকে শতহস্ত দূর থেকেছেন। এ'রা স্পষ্টতই পাউন্ড-এলিয়ট-অডেন গোষ্ঠীর বিরুদ্ধচারী। অসহজ কবিতা যেন এ'দের দু'চক্ষের বিষ। 'দি মুভমেন্টে'র আর একজন সহযোগী ডি. জে. এনরাইট কবিতা সম্বন্ধে বলেছেন :

Poems at least
Ought not to be phantoms.

এনরাইট খ্যাতিমান কবি নন। তবে ইংলন্ডে তিনি কবি হিসেবে স্বীকৃত। তাঁর কর্মজীবনের একটা অংশ কেটেছে পশ্চিম এশিয়া এবং দূর প্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে। কবিতায় তার

* Humayan Kabir. *The Bengali Novel.* Firma K. L. 1968

ছায়াপাত খুব স্পষ্ট এবং ভিন্নতর স্বাদসঞ্চারী।

'দি মুভমেন্টে'র অনুশাসনের সঙ্গে এনরাইটের কাব্যচরিত্রের মিল যেন খাপ এবং ছুরির মতো। কোথাও গরমিল নেই, বিচ্যুতি নেই, বিদ্রোহ নেই। নিন্দে করতে চাইলে এমনও বলা যেতে পারে যে এনরাইট 'দি মুভমেন্টে'র অনুশাসনকে ব্যাখ্যা করবার জন্যেই কবিতাগুলো লিখেছেন। তাঁর কবিতা সহজ, খুবই সোজা করে বলা। অলংকরণকে এমন নির্মমভাবে বর্জন করেছেন যে অবাক হতে হয়। হঠাৎ একেবারে উলঙ্গ মনে হতে পারে। একটি ছোট কবিতা সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করছি:

> The Tok-Tok Bird is in the tree,
> Its clear and steady strokes
> Beat out a neat reproach.
> Whatever God may be,
> He's not a novelist!
> He has no mills at all but all he has is grist.
> Whose rhythm is as pure as this?
> Whose life so perfect in its plot?
> Oh marble metrics of this bird,
> Oh cool unfebrile song!
> (The bird is also called Dong-Dong)
> Oh long unblotted line with not one worried word!

বক্তব্য পরিবেশনের সামান্য এবং অপরিহার্য তির্যক ভঙ্গিমা ছাড়া কবিতাটির কোথাও ইচ্ছাকৃত। আলোচ্য গ্রন্থের অন্যান্য কবিতায়ও এই সারল্য, এই অলংকারহীনতা। তাছাড়া এনরাইটের কবিতায় আর একটি বৈশিষ্ট্যও সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখের কথাকে কবিতায় স্থান দেননি তিনি। নিজেকে সম্ভাব্য দূরত্বে রেখেছেন। না হলে, হয়তো তাঁর ধারণা, মানুষের জীবন সম্বন্ধে তাঁর অনুসন্ধান ব্যর্থ হবে।

কিন্তু এসব মহৎ প্রচেষ্টা সত্ত্বেও এনরাইটের কবিতা আমাকে মুগ্ধ করেনি, এমনকি সামান্য নাড়াও দেয়নি। আলোচ্য গ্রন্থের কোন কবিতা আমি ভবিষ্যতে কখনো স্মরণ করব মনে হয় না। বরঞ্চ শুধুমাত্র সারল্য এবং অলংকারহীনতাই কোন বক্তব্যকে কাব্যের পর্যায়ে নিয়ে যেতে পারে না এই পুরোনো কথাটা আবার চমৎকার উদাহরণসহ আলোচিত হয়েছে বলে মনে হল।

মৃগাঙ্ক রায়

ভারতীয় ঐ্য

হুমায়ুন কবির

সাম্প্রতিক ভারতবর্ষে আমাদের দৃষ্টি সবচেয়ে বেশী আকর্ষণ করে তরুণ সম্প্রদায়ের বিক্ষোভ ও বিদ্রোহ। এ বিদ্রোহ কোন বিশেষ শ্রেণী, সম্প্রদায় বা অঞ্চলে সীমিত নয়। প্লাবনে যেমন সব কিছু ভাসিয়ে নেয়, এ বিদ্রোহী মনোবৃত্তি তেমনি ভাবে ভারতের সর্বত্র সর্ব সম্প্রদায়ের সর্বশ্রেণীর নরনারীকে ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে। ভারতবর্ষের কৃষকসমাজের সহনশীলতা সর্বজনবিদিত, আজ কৃষকসমাজের ধৈর্যের বাঁধ হয় ভেঙেছে নয় ভাঙছে। ভারতবর্ষের শ্রমিকশ্রেণী আজ মানবোচিত জীবনযাপনের জন্য যা প্রয়োজন, তা সরবে দাবী করে, দাবী না মেনে নিলে ক্ষান্ত থাকে না। ভারতীয় ছাত্রসমাজ পূর্বে গুরুজনের কথা শিরোধার্য বলে মেনে নিত, সে সশ্রদ্ধ মনোভাব আজ বিলীয়মান। ভারতবর্ষের নারীসমাজেও আজ অধিকারের দাবী, দেবীর মর্যাদার স্তোকবাক্যে তারা মানবিক অধিকার ছাড়তে রাজী নয়। তরুণ সম্প্রদায় আজ যা-কিছু পুরাতন, যা-কিছু জীর্ণ তার বিরুদ্ধে অভিযানে বেরিয়েছে। কেবলমাত্র সনাতন বলে কোন অধিকার বা শাসনকে মানতে তারা অনিচ্ছুক।

যাঁরা প্রবীণ অথবা ক্ষমতায় আসীন, শাসনের বিরুদ্ধে এ বিদ্রোহকে তাঁদের মধ্যে অনেকেই অনুশাসনহীনতা বা উচ্ছৃঙ্খলতা বলে অগ্রাহ্য করতে চান। পুরাকালের শান্ত নিস্তরঙ্গ সমাজের স্মৃতি তাঁদের কাছে আরো উজ্জ্বল হয়ে উঠে, বর্তমানের উদ্বেল ও অশান্ত ক্রিয়াকলাপ দেখে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তাঁদের হতাশা তীব্রতর হয়। প্রবীণ সম্প্রদায়ের এ খেদ অথবা আশাভঙ্গের কিন্তু ঐতিহাসিক কোন যৌক্তিকতা নেই। পুরনো রাজনৈতিক আদর্শ আজ নিষ্প্রাণ। পুরোনো সামাজিক রীতিনীতি বর্তমান যুগে বহুক্ষেত্রে অচল। পুরোনো অর্থনৈতিক কাঠামো ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে, তার পুনর্গঠন অসম্ভব। দুঃখ-বিপদে মানুষকে সান্ত্বনা দিতে ধর্মের যে বিপুল শক্তি, আজ তাও পূর্বের তুলনায় ক্ষীয়মাণ। চিন্তা ও কর্মের প্রতিটি ক্ষেত্রে আজ অনিশ্চয়তা, সন্দেহ, দ্বিধা। পুরাতন জগতের সমস্ত দিগ্‌দর্শনচিহ্ন যেখানে অবলুপ্ত, সেখানে দিশাহারা তরুণ সম্প্রদায় যে চঞ্চল হবে, আচার ও সংস্কারের বন্ধন ছিন্ন করে কোন কোন ক্ষেত্রে উদ্দাম হয়ে উঠবে, তাতে আশ্চর্য হবার কি আছে?

প্রবীণ সম্প্রদায়ের উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তাও সমান স্বাভাবিক। তাঁরা যে যুগে যে সমাজে মানুষ হয়েছিলেন, ক্ষমতাকে মেনে নেওয়াই সে যুগের সে সমাজের রেওয়াজ। জন্মগত অধিকারে সমাজে মানুষের স্থাননির্ণয় হত। যাঁর যাতে জন্মগত অধিকার, সবাই তাকে মেনে নিত, এবং সেই স্বীকৃতির ভিত্তিতেই ব্যক্তির সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সম্বন্ধ পরিচালিত হত। প্রকৃতির নিয়ম যেমন অমোঘ, সাধারণ মানুষের চোখে সামাজিক রাজনীতিও সমান অমোঘ মনে হত।

ধর্মের শিক্ষাও এ স্থিতাবস্থায় সহায়তা করেছে। শাশ্বত কাল থেকে যা চলে এসেছে, তার বিষয়ে প্রশ্ন করাও অপরাধ। যাঁরা পয়গম্বর, যাঁরা অবতার—পয়গম্বরের শাব্দিক অর্থ ঈশ্বরের বাণী যাঁর উপর অবতরণ করে, সে অর্থে দুটি শব্দ সমান মনে করলে ভুল হবে না—তাঁরা অবশ্য বারবার বিদ্রোহের বাণী নিয়ে এসেছেন, কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই চিরাচরিত প্রথার প্রভাবে সে বিদ্রোহ স্বীকৃতিতে পরিণত হয়েছে। বুদ্ধ সর্বমানুষের প্রতি প্রেম ও সকল মানুষের সমান অধিকারের কথা বলেছিলেন, জাতিভেদের অচলায়তন তাতে হয়তো একটু টলে উঠেছিল কিন্তু কয়েক শতাব্দীর মধ্যে বৌদ্ধসমাজের মধ্যেও নানাপ্রকার স্তরভেদ শ্রেণীভেদ দেখা দিল। খৃষ্টধর্মের বেলায়ও তাই হয়েছিল। হজরত ইসা যাই বলুন না কেন, তাঁর অনুগামীদের হাতে খৃষ্টিয় সমাজে সাম্রাজ্যবাদী সংরক্ষণশীল মনোবৃত্তি প্রবলভাবে দেখা দিল। ইসলাম বিপ্লবী গণতন্ত্রের বাণী নিয়ে এসেছিল, জন্মগত অধিকার ও শাসকের শোষণ তাতে কিছুদিনের জন্য কমেছিল, কিন্তু মুসলমান সমাজের মধ্যেই নতুন প্রভুত্ববাদ দেখা দিল। ফলে রাজতন্ত্র ফিরে এল, বুদ্ধির স্বাধীনতায় বাধা এল, বিশ্বমানবের ভ্রাতৃত্বের ভিত্তিতে সমসমাজ গড়ে উঠল না।

ভারতবর্ষে তাই সকল ধর্মই প্রভুত্ব-মনোবৃত্তির সহায়ক হয়ে দাঁড়িয়েছে, শক্তিভিত্তিক সমাজের সংরক্ষণে সহায়তা করেছে। এই পরিবেশে যাঁদের শৈশব ও যৌবন কেটেছে, আজ প্রৌঢ় অথবা বৃদ্ধ বয়সে তাঁরা কিভাবে বর্তমানের দ্রুতপরিবর্তনশীল জগতের সঙ্গে পা ফেলে চলবেন? বস্তুতপক্ষে, সমাজসংসার অর্থনীতি রাজনীতিতে যে পরিবর্তন, বহুক্ষেত্রে তাঁরা প্রথমে তা লক্ষ্যই করেননি। অবশেষে পুরাতন সমাজ যখন প্রায় ভেঙে পড়েছে, তাঁরা বিস্ময় ও আতঙ্কের সঙ্গে দেখেছেন যে তাঁদের পরিচিত জগতের আর প্রায় চিহ্ন নেই।

অধিকাংশ ভারতবাসী যে নিষ্ক্রিয়ভাবে পরিবর্তনকে সহ্য করেছে, সক্রিয়ভাবে এগিয়ে এসে পরিবর্তনকে নিজে আহ্বান করেনি, তার আর একটি কারণও আছে। ধর্ম মানুষের মনকে মুক্তি দেয় কিন্তু ভারতবর্ষে ধর্মও সাম্রাজ্যবাদের প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয়েছে। নতুন ধর্মপ্রচারের সঙ্গে সঙ্গে নতুন নতুন সাম্রাজ্যও ভেঙেছে গড়েছে। বৌদ্ধমতবাদ যখন প্রবল, তখন যে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হল, নব ব্রহ্মণ্যবাদের প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে সে সাম্রাজ্যের পতন হল। বিভিন্ন রাজবংশ কখনো বৌদ্ধমতাবলম্বী, কখনো হিন্দুধর্মের সহায়ক। ধর্মের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে রাজ্যবদলের এ ইতিহাস মধ্যযুগেও দেখা যায়। ইসলাম ধর্মপ্রসারের সঙ্গে সঙ্গে মুসলিম রাজশক্তি প্রবল হয়েছে, যেদিন মুসলমান সমাজের প্রাণশক্তি ক্ষীণ হয়ে এল, মোগল সাম্রাজ্যেরও অবসান ঘটল। বর্তমান যুগে ইংরেজ রাজত্বের প্রতিষ্ঠার সঙ্গে খৃষ্টিয় ধর্মপ্রসারের যোগ স্পষ্ট। শাসনশক্তিকে প্রতিরোধ করবার মনোবৃত্তি প্রবল হলে সাম্রাজ্যবাদ টিকতে পারে না। ধর্ম রাজভক্তির নামে সে প্রতিরোধমনোবৃত্তিকে দুর্বল করেছে বলে এদেশে কেবল রাজনীতির ক্ষেত্রে নয়, অর্থনীতি ও সমাজের ক্ষেত্রেও শাসনশক্তির অপ্রশ্ন স্বীকৃতি।

ইসলাম বা খৃষ্টিয় ধর্ম যেদিন ভারতবর্ষে প্রথম আসে, তখন সামরিক শক্তির সাহায্যে আসেনি। খৃষ্টধর্ম এদেশে এসেছিল খৃষ্টিয় প্রথম শতকে। ইসলাম কেরলে আসে হজরৎ মহম্মদের মৃত্যুর দশ বৎসরের মধ্যে। বহুদিন ধরে নীরবে ধর্মপ্রচার চলে কিন্তু ভারতবর্ষের ইতিহাসে তার স্বীকৃতি নেই বললেই চলে। প্রথমে সিন্ধুদেশে আরবশাসন, পরে দিল্লীতে তুর্কী রাজত্ব প্রতিষ্ঠার পরেই কিন্তু ভারতবর্ষের জীবনে ইসলামের প্রভাব প্রবলভাবে দেখা দিল। খৃষ্টিয় ধর্মের বেলা প্রথমে পর্তুগীজ শাসন, এবং বহু ওঠাপড়ার পরে ইংরেজ সাম্রাজ্য স্থাপনের ফলে দেশে খৃষ্টধর্মাবলম্বীদের গুরুত্ব বেড়ে গেল। রাজশক্তির প্রসারের সঙ্গে ধর্মের প্রভাব বিস্তার হয়েছে বলে অনেকের ধারণা যে ধর্মপ্রচার রাজশক্তির সাহায্যেই হয়েছিল। তার ফলে জাগতিক ও আধ্যাত্মিক প্রভাব ও শক্তির পারস্পরিক সম্বন্ধ আমাদের কাছে অস্পষ্ট হয়ে ধরা দিয়েছে। ইসলামের সত্যিকার তাৎপর্য মুসলমান রাজাবাদশা আমীর ওমরাহের ক্রিয়াকলাপে চাপা পড়ে গেছে। যুযুধান বিভিন্ন মুসলমান রাজা-বাদশার ব্যবহারই মানুষ লক্ষ্য করেছে, তাদের ক্রিয়াকলাপ বহুক্ষেত্রে ইসলাম-বিরোধী হলেও সাধারণের চোখে তারা যা করেছে তাই মুসলিম আদর্শ বলে গণ্য হয়েছে। ঠিক একই ভাবে এদেশ ইংরেজ শাসকশ্রেণীর আচার-ব্যবহার-বিশ্বাস-ভাবনাকে মানুষ খৃষ্টিয় ধর্মের পরাকাষ্ঠা মনে করেছে। ধর্ম এভাবে রাজশক্তির সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছে এবং রাজশক্তি নিজের প্রয়োজনে ধর্মকেও শাসনপদ্ধতির অঙ্গ হিসাবে ব্যবহার করেছে। শুধু ধর্ম-বিশ্বাস বলে নয়, দেশের শিক্ষাপদ্ধতিও সাম্রাজ্যবাদের প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয়েছে। শিক্ষার দ্বারা ব্যক্তির চরিত্র ও দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে ওঠে, এবং তার ফলে সমাজের সংগঠন ও মনোবৃত্তি কি হবে তাও নির্ধারিত হয়। মধ্য যুগেই হোক অথবা বর্তমান যুগেই হোক, সাম্রাজ্যবাদী শিক্ষা তাই প্রশ্নের চেয়ে স্বীকৃতি, বিদ্রোহের চেয়ে সম্মতির উপর বেশী জোর দেয়।

সাম্প্রতিক কালে শুধু ভারতবর্ষ বলে নয়, সমস্ত পৃথিবীতেই এক নীরব কিন্তু বিরাট মনোবিপ্লব ঘটেছে। বৈজ্ঞানিক প্রগতির ফলে চিরাচরিত উৎপাদন ও বণ্টনপ্রথা অচল হয়ে পড়ল। যন্ত্রের ব্যবহারে উৎপাদন যত বাড়তে লগল, উৎপাদিত সামগ্রীর বিক্রয়ের জন্য বণ্টনপ্রথার প্রসার তত অনিবার্য হয়ে পড়ল। উৎপাদনপদ্ধতির বিপ্লবকারী পরিবর্তনের ফলে চলাচল ও যানবাহনের বিস্ময়কর প্রগতি তাই আকস্মিক নয়। চলাচল ও যানবাহনের সৌকর্য যত বাড়তে লাগল, বিভিন্ন অঞ্চল ও বিভিন্ন দেশের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদান তত সহজ হয়ে উঠল। এই পরিপ্রেক্ষিতে ধর্ম ও সংস্কৃতির এক নতুন সম্ভাবনা সর্বত্র দেখা দিল। শহর ও গ্রামের মধ্যে যাতায়াত যত সহজ হয়ে এল, সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় জীবনে শহরের প্রভাব বাড়তে লাগল। শহরের মানুষ গ্রামের মানুষের তুলনায় চঞ্চল, গতিশীল ও পরিবর্তন-আকাঙ্ক্ষী। শহরের প্রভাব বাড়ায় সমাজে পরিবর্তনের গতি দ্রুততর হয়ে উঠল। রেলগাড়ি, পোস্টআফিস এবং ছাপাখানার মাধ্যমে শহর-গ্রামের ব্যবধান কমে এসেছিল, বর্তমান কালে রেডিও টেলিফোন মোটরগাড়ি হাওয়াই জাহাজের কল্যাণে সে পার্থক্য আজ প্রায় বিলীয়মান। সামাজিক রীতি ও ধর্মবিশ্বাস বদলের সঙ্গে সঙ্গে পূর্বের কর্তাভজা দৃষ্টিভঙ্গীর অবসান অনিবার্য হয়ে দাঁড়াল।

যানবাহনের ও চলাচলের এ পরিবর্তনে সমাজের যে রূপান্তর শুরু হয়েছিল, মধ্যবিত্ত-শ্রেণীর সম্প্রসারণে তার গতি ও বেগ তীব্রতর হয়ে উঠল। আমরা পূর্বেই দেখেছি যে মধ্যবিত্ত মনোবৃত্তিতে স্বীকৃতির চেয়ে বিদ্রোহের লক্ষণই বেশী স্পষ্ট, কোন কোন ক্ষেত্রে সে বিদ্রোহ এত ব্যাপক যে সমস্ত শাসন বা কর্তৃত্বকে অস্বীকার করে নৈরাজ্যে পরিণত হয়।

ক্ষমতাকে মেনে নেওয়ার যে মনোবৃত্তি বহুযুগ ধরে গড়ে উঠেছিল, এ নতুন পরিস্থিতিতে তাও টলে গেল। জনসাধারণের সকলের মনেই নতুনের প্রতি আগ্রহ দেখা দিল—তরুণ সম্প্রদায়ের মধ্যে যে এ প্রবৃত্তি আরো বেশী প্রবল হবে, তাতেও আশ্চর্য হবার কারণ নেই। ভারতবর্ষের সঙ্গে ইংরেজের যে সম্বন্ধ তার মধ্যেও যে অন্তর্দ্বন্দ্ব নিহিত ছিল, দিনে দিনে তা স্পষ্টতর হয়ে উঠল। রাজনৈতিক কারণে ইংরেজ মধ্যবিত্তশ্রেণীর সম্প্রসারণ চেয়েছে, কারণ মধ্যবিত্তশ্রেণীর সহায়তা ভিন্ন ভারতবর্ষের মতন বিরাট দেশের বিপুল জনসংখ্যাকে শাসন করা মুষ্টিমেয় ইংরেজের পক্ষে সম্ভব হত না। ইংরেজের অর্থনৈতিক স্বার্থ কিন্তু এ সম্প্রসারণের বিরোধী, কারণ ভারতীয় মধ্যবিত্তশ্রেণী সত্যিকার শক্তি সঞ্চয় করলে ইংরিজি ধনতন্ত্রের সঙ্গে তার প্রতিদ্বন্দ্বিতা অনিবার্য। ইংরেজের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থের দোটানায় ভারতবর্ষের মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় সুস্থ সহজ ভাবে গড়ে উঠতে পারল না। মধ্যবিত্তশ্রেণীর মানসিক এ অস্বস্তির অন্যতম প্রকাশ রাজনৈতিক আন্দোলন। প্রথমে এ আন্দোলন মধ্যবিত্তশ্রেণীর একটি ক্ষুদ্র অংশের মধ্যে সীমিত ছিল কিন্তু ধীরে ধীরে সে অসন্তোষ প্রথমে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের অধিকাংশ এবং পরে ভারতীয় জনতার বিপুল অংশকে ইংরিজি সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামী করে তুলল। ইংরেজ রাজত্বের শেষ যুগে চারিদিকে যে চাঞ্চল্য এবং পুরাতন আদর্শকে ভেঙে নতুন আদর্শ গড়বার চেষ্টা, তার উৎস এই দ্বন্দ্বের মধ্যেই মিলবে। ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদ আজ চলে গিয়েছে কিন্তু আজো ভারতীয় ধনতন্ত্রের পূর্ণবিকাশ হয়নি, সমাজতান্ত্রিক সমসমাজ তো এখনো কেবলমাত্র ভবিষ্যতের স্বপ্ন। তাই রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভ করেও ভারতীয় জনমানস এখনো বিক্ষুব্ধ, অশান্ত।

সাম্প্রতিক ভারতবর্ষে যে চাঞ্চল্য ও বিক্ষোভ, তা পৃথিবীব্যাপী অসন্তোষ ও বিদ্রোহের প্রতীক। যে সমস্ত ঐতিহাসিক শক্তি আজ সমাজের ভবিষ্যৎ নির্দেশ করছে, তাদের প্রভাবে শিক্ষা ও সমাজের গুরুবাদী মনোভাব টলে উঠেছে। বুদ্ধির স্বাধীনতা আহ্বানে প্রাচীন সংস্কারের প্রাচীর ভেঙে যায়, জোয়ারের প্রথম স্রোতে নতুন জলের সঙ্গে আবর্জনাও ভেসে আসে। জোয়ারের বেগ যত বেশী, ভাটার টানও তত প্রবল। তাই ভারতবর্ষে আজ প্রগতিশীল ও প্রতিক্রিয়াপন্থী শক্তি দুই-ই সমান প্রবল, দোটানায় জন-মানস বিভ্রান্ত, উদ্বেল। বহুযুগব্যাপী সামাজিক প্রক্রিয়ায় যে গুরুবাদী মনোবৃত্তি গড়ে উঠেছিল, তার বদলে বুদ্ধিনির্ভর স্বাধীন দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে তোলার সময়ে যে বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্নভাবে ভাববে, সমাজে অনিশ্চয়তা, চাঞ্চল্য ও বিদ্রোহ দেখা দেবে, তাতে আশ্চর্য হবার কি আছে?

বহুদিন ধরে ধীরে ধীরে যে পরিবর্তনের ধারা, তার পরিণতি অকস্মাৎ একদিন আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সে পরিবর্তন কিন্তু অকস্মাৎও নয়, আকস্মিকও নয়। বহুদিন ধরে অলক্ষ্যে নীরবে ব্যক্তি ও সমাজ বদলায়। ধারাবাহিকতার ফলে সে পরিবর্তন আমরা প্রথমে লক্ষ্য করি না কিন্তু যেদিন পরিবর্তনকে আর অস্বীকার করা চলে না, সেদিন অধিকাংশ লোক তাকে মেনে নেয়। যারা অভ্যাসের দাস, যারা সংস্কারের প্রভাবে নতুনকে গ্রহণ করবার শক্তি হারিয়ে ফেলেছে, শুধু তারাই এ পরিবর্তনকে বাধা দিতে চায়।

পরিবর্তনের প্রকৃতি সম্বন্ধে কিন্তু আমাদের ধারণা স্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন। সামাজিক আচার অনুষ্ঠান যতখানি বদলিয়েছে, সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গী ও বিশ্বাস ততখানি বদলায়নি। সমালোচনার মনোভাব সমাজে ছড়িয়েছে বটে কিন্তু আজও তা ভাসাভাসা, সমাজের মূল প্রশ্নের দিকে আজো তার দৃষ্টি যায়নি। বুদ্ধির প্রাধান্য যতখানি কথায় স্বীকার করি,

কাজে করি না। তাই প্রাচীনপন্থী বিশ্বাস ও আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গীর যুগপৎ প্রকাশ পদে পদে আমাদের বিস্মিত করে। বর্তমান যুগের ভারতবাসীর চিন্তায় কথায় কাজে একই সঙ্গে বহুযুগের বিভিন্ন ও কোন কোন বিষয়ে পরস্পরবিরোধী মনোভাবের পরিচয় মেলে। সর্বত্রই অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের যে অপূর্ব সংমিশ্রণ, তার ফলে অভিজ্ঞতার প্রত্যেক ক্ষেত্রে যে সমন্বয় ও সমাবেশ, তার বৈচিত্র্য কখনো বিস্ময়কর, কখনো বিভ্রান্তিকর।

জাতীয়তাবাদের নামে অতীতের অনেক কুসংস্কার কিভাবে পুনরুজ্জীবিত হচ্ছে, তা অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। এ রকম জগাখিচুড়ির সবচেয়ে প্রকৃষ্ট নিদর্শন সাম্যবাদ ও সাম্প্রদায়িকতাবাদের অদ্ভুত সম্মিলন। যে ব্যক্তির মুখে সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদের নামে হাজার ফুলঝুরি ছোটে, সেই ব্যক্তিই ধর্মের নামে কুসংস্কারকে অবাধ প্রশ্রয় দেয়। মানুষে মানুষে সমান অধিকার ও সকলের প্রতি সমব্যবহার সমাজতন্ত্রবাদের মূলকথা। ভারতবর্ষে এই মূলকথাকে বিকৃত করে ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির জন্য সমাজবাদের দোহাই দেওয়ার চেষ্টাও রোজ মেলে। যারা দুর্গত, যারা শোষিত তাদের প্রতি অত্যাচার বন্ধ করে শোষণহীন সমাজপ্রতিষ্ঠা সাম্যবাদের ঘোষিত লক্ষ্য। ভারতবর্ষে সাম্প্রদায়িক ও দলগত স্বার্থসিদ্ধির জন্য সাম্যবাদেরও বিকৃতি ঘটেছে, ফলে সমাজের অন্যায়-অনাচারের প্রতিকারের বদলে সেই সমস্ত অন্যায়, অত্যাচার আরো সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

একদিকে জাতির পুনর্জন্ম, অন্যদিকে সামাজিক কুসংস্কারের পুনরুজ্জীবন—এই দোটানায় ভারতবর্ষের সাম্প্রতিক জীবন বিভ্রান্ত। পূর্বের পরিচিত সমাজ আজ বিলুপ্ত অথবা বিলীয়মান। কর্তৃত্বের ভিত্তিতে সামাজিক জীবন নিয়ন্ত্রণ আজ প্রায় অসম্ভব। পূর্বের সমাজে গুরুবাদ ছিল, সঙ্গে সঙ্গে মানুষের জীবনযাত্রার নিশ্চয়তাও ছিল। আজ ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত এবং বহুক্ষেত্রে লক্ষ্যহীন। পুরোনো সমাজবন্ধনের মধ্যে ফিরে যাওয়ারও কোন সম্ভাবনা নেই। আজকের দিনে সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বন্ধনে বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন সমাজ যেভাবে পরস্পরের সঙ্গে গাঁথা, তাতে আজ কোন দেশ অথবা সমাজের পক্ষে বাইরের পৃথিবীকে অগ্রাহ্য বা অস্বীকার করবার পথ নেই। যে সব মানুষের সঙ্গে জীবনে কোনদিন দেখা হবে না, যাদের অস্তিত্বের কথাও আমরা সাধারণত ভাবি না, তারাও আজ আমাদের ব্যক্তিগত জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করছে। আমাদের অজান্তে যে সব সিদ্ধান্ত, আমাদের জীবনমরণও তাদের উপর আজ নির্ভরশীল। অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয় শক্তির ক্রীড়নক হিসাবে ব্যক্তিবোধ এর পূর্বে কোনদিন এত নিরুপায় বোধ করেনি। একদিকে বিপুল বিশ্বের ভার এবং অন্যদিকে ব্যক্তিবিশেষের অসহায়তা—তারই মধ্যে আজকার তরুণ সম্প্রদায় অনিশ্চিত বিদ্রোহে অজানা লক্ষ্যের দিকে চলেছে।

চিরদিনের শান্ত আত্মস্থ ভারতবর্ষ তাই আজ চাঞ্চল্য ও বিক্ষোভে ফেটে পড়ছে। ভারতবাসী আজ পরিচিত বন্দর ছেড়ে দুস্তর সাগর পাড়ি দিতে চায়। লক্ষ্য আজো স্পষ্ট নয় কিন্তু লক্ষ্যের জন্য আকুতি আজ অনস্বীকার্য। পরিবর্তন জীবনের ধর্ম, তাই প্রাচীন ও মধ্যযুগেও ভারতবর্ষে পরিবর্তনের বিরাম ছিল না। ধারাবাহিকতার ফলে পূর্বেকার সে পরিবর্তনে কিন্তু অতীত ও বর্তমানের মধ্যে ছেদ পড়েনি। গত দুই শতাব্দীতে, বিশেষ করে গত অর্ধশতাব্দীতে যে পরিবর্তন, তার প্রকৃতি একেবারে আলাদা। পূর্বযুগের সঙ্গে সমস্ত বন্ধনচ্ছেদ করে বর্তমান যুগ স্বয়ম্ভূরূপে দেখা দিয়েছে, এরকম দাবীও শোনা যায়।

কোন সমাজ বা কোন যুগই কিন্তু স্বয়ম্ভূ নয়, হতে পারে না। দুনিয়ায় একেবারে নতুন কিছুই নেই, সাম্প্রতিক ভারতবর্ষের যে সমস্ত অভিব্যক্তিকে একান্তভাবে নতুন মনে

হয়, বিচার করলে দেখা যাবে যে তাদেরও ইতিহাস দীর্ঘদিন ধরে গড়ে উঠেছে। তা সত্ত্বেও পুরাতনের সঙ্গে বর্তমানের পার্থক্য যে এক অর্থে নতুন, একথাও অস্বীকার করা যায় না। শুধু ভারতবর্ষ বলে নয়, সমস্ত পৃথিবীতেই গত দুই তিন শতকে পরিবর্তনের গতি ও পরিমাণ অভূতপূর্ব। ইতিহাসের আদিম কাল থেকে প্রায় দশ হাজার বছরেও যে সব বদল সম্ভব হয়নি, গত দুই তিন শো বছরে সেগুলি বাস্তবরূপ নিয়েছে। মানুষের সমাজে যে সব পরিবর্তন গত দুই তিনশো বছরে হয়েছে, তার তুলনায় পূর্বের দশ হাজার বছরের ইতিহাসকে গতিহীন স্থাবর সমাজের ইতিহাস বললে অত্যুক্তি হবে না। গত পঞ্চাশ বছরে পরিবর্তনের গতি আরো বেগবান হয়েছে। বর্তমান দশ বছরে যেসব পরিবর্তন আসে পূর্বে হাজার বছরেও তা সম্ভব হয়নি।

বর্তমান যুগের দুটি বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে লক্ষণীয়। একদিকে পরিবর্তনে গতিবেগ অপ্রত্যাশিতভাবে বেড়েছে এবং আজো বাড়ছে। অন্যদিকে, আজ এ পরিবর্তন কোন বিশেষ দেশকালে সীমিত নয়। আজ প্রত্যেক পরিবর্তনের ফল পৃথিবীব্যাপী। পূর্বে যে সমস্ত সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিকাশ, সেগুলি বিশেষ দেশে বিশেষ কালে বিশেষ সমাজে ঘটেছে, তাদের বিশ্বসভ্যতা বললে ভুল হবে। প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি মানুষের ইতিহাসে এত গৌরবময় অধ্যায় কিন্তু তার অভিব্যক্তি বৃহত্তর ভারতের বাইরে ছড়ায়নি। ইউনানী বা রোমক সভ্যতা ও সংস্কৃতি প্রধানত ভূমধ্যসাগরের তটভূমিতেই সীমাবদ্ধ। চীন সভ্যতাও সুপ্রাচীন কিন্তু চীনদেশের বাইরে তার সমসাময়িক প্রভাব কতটুকু? ইসলামের প্রভাবে আরব সভ্যতার প্রসার সে তুলনায় বেশী কিন্তু তবু সে যুগের আরব সভ্যতা বিশ্ব-সভ্যতার মর্যাদা দাবী করতে পারে না। বস্তুতপক্ষে বিশ্বসভ্যতা বিকাশের জন্য যে সামাজিক ও সাংগঠনিক প্রতিষ্ঠান অথবা উৎপাদনবন্টন চলাচলের যন্ত্রশক্তির প্রয়োজন, বর্তমান যুগের পূর্বে কোনদিন তাদের অস্তিত্ব ছিল না। প্রাকৃতিক শক্তিকে নিয়ন্ত্রিত করে মানুষ যেখানে পৌঁছেচে, তারই ফলে আজ প্রথমবার বিশ্বসভ্যতার পরিকল্পনা আমাদের পক্ষে সম্ভব।

সমস্ত মানুষের প্রতি সমব্যবহার এই বিশ্বব্যাপী সভ্যতার প্রথম অভিব্যক্তি। একই বিশ্বসমাজের অংশী হিসাবে একজন মানুষ আর একজনের উপর প্রভুত্ব করতে পারে না—সমসমাজ ভিন্ন এই বিশ্বসমাজ গড়া অসম্ভব।

॥ সমাপ্ত ॥
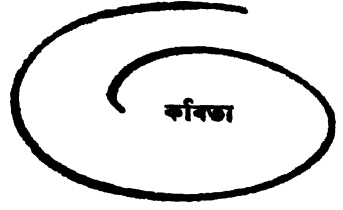
চোর

মৃগাঙ্ক রায়

পাকা চোরের মতো ছুটতে ছুটতে পালিয়ে গেল লোকটা।
আমি তখন জন্মান্ধের মতো একটি মেয়ের শঙ্কিত হাসির
দিকে তাকিয়েছিলাম, সূর্য তখন সবে পাটে বসেছে, হাওয়া
সাদা মসলিনের মতো মুখের ওপর এসে পড়ছে,
আকাশের মধ্যতালু থেকে পাক খেয়ে খেয়ে চিল নামছে,
মেয়েটির দৃষ্টি যেন তীরের ফলায় বিঁধে রেখেছে আমাকে।
আর সেই ফাঁকে লোকটা পালিয়ে গেল, মাঠ পেরিয়ে
গাছগুলো যেখানে গোল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে তারও ওপারে,
আকাশের ওপিঠে, অদৃশ্য হয়ে গেল। যতই ছুটি না কেন
তাকে আর ধরতে পারব না। যতই ডাকি না কেন তাকে
আর ফেরাতে পারব না। কেউ পারে নি। লোকটা পালিয়ে
গেলে আমার চোখের দৃষ্টি ফিরে এলো। দেখলাম,
বেশ্যার কপালে সিঁদুরের বড় গোল টিপের মতো
কলকাতার আকাশে চমৎকার চাঁদ উঠেছে॥

কাটে দিন, দেয়ালে ঢুকিয়ে সিঁধ

শক্তি চট্টোপাধ্যায়

দীর্ঘদিন তার কাছে, ছেলেবেলা থেকে তার কাছে
মানুষ হয়েছি আমি, তার পাশ ঢিবির উপরে
খেলেছি অনেক খেলা, কোষে বিষ করেছি লেহন
মরিনি, শিখেছি বাঁচতে, জিভ দেগে—গেরস্তের ঘরে

মানুষ হয়েছি আমি, একবার মানুষই থাকতে চাই।
ভেঙে টুকরো হতে চাই না, যাতে সে স্বচ্ছন্দে যাবে ভুলে
অর্থাৎ যেতেও পারে, সে তো নয় দৃষ্টিতে দারুণ
তুখোড় মায়াবী কেউ, অটুট ব্যক্তিত্বে কাছা খুলে.
যায় তার, এঁটে রাখে, কোনোমতে ভদ্রতারক্ষাই
জরুরি সমস্যা তার! আমি যে মানুষই থাকতে চাই—
এ তো পাঠশালে শিক্ষা, তারও পরে, ইস্কুলবাড়িতে
ভেতরের মনুষ্যত্ব বাইরে থাকে, বাহ্যত ফাঁড়িতে

কাটে দিন। দেয়ালে ঢুকিয়ে সিঁধ, ন্যায়নিষ্ঠ দেশে—
কুকুর-কেত্তনে ভাগ্য আড়ে ঠেকা দেয় রায়বেঁশে!

কালো একটা দাগ

সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

কালো একটা দাগকে নিয়ে বিষম বিব্রত আছি।
কাল বহুদিন পরে বাথরুমে আয়নায় মুখ দেখতে গিয়ে
আবিষ্কার করলুম বাঁ চোখের নিচেই একটা দাগ; খুবই ডাগর
এবং চক্রাকার; মনে হ'লো শরীরের
সমস্ত উদ্‌বৃত্ত রাত্রি অকস্মাৎ জমাট বেঁধেছে
ঐখানে চোখের নিচে!
তৎক্ষণাৎ আর কোথাও এমন আছে কিনা
ভালভাবে পরীক্ষা করার জন্য আমি
ডাক্তারি উদোম: এবং তখনই অনেকদিন পরে একা বিবেচনা করে
দেখলাম যথার্থ স্বাস্থ্য। তলপেটের খানিক
উপরে ক্রমশ ভারী হতে থাকা থলথলে বয়স স্পষ্টত
লক্ষ্য করে আমি আয়ুতে সন্দেহাকুল,
খুব ভাল অঙ্ক জেনেও সঠিক মনে করতে পারলাম না, যে
এককে দশকে ঠিক কতবার এ শরীরে ব্যবহার্য হয়েছে কামিনী।
আমি তন্ন তন্ন করে পুরুষের অবাধ্য সম্মুখ ভাগ খুঁজে
যখন,—না আর কোনো বিম্বিত দাগের কালো খুঁজে
পেলাম না, তখন আমার মনে হ'লো
চোখ, আমার এতদিনের প্রিয়
পৃথিবী দেখার গাঢ় দুটি কালো মণি
আর যেন তেমন একাগ্র নয়; তাই
নিম্নাঙ্গের সমস্ত আঁধার আজ এতটা উপরে উঠে চোখের নিচেই
বিশ্রী দাগ হয়ে থমকে গিয়েছে; আর এগোয়নি।
আমি কি কখনো আর সম্পূর্ণ স্বাধীন আয়নায়
নিজের প্রাচীন অঙ্গভঙ্গী
শিকারসাহসী করে তুলতে পারবো?
কি জানি! আমার ভয় করে
একদা শ্রীমান, এখন শ্রীযুক্ত হয়ে ওঠা এই
আশির পদবী নিয়ে আমার বিষম ভয় করে।

সময়

পবিত্র মুখোপাধ্যায়

সময়ের হাত ধরে চলিফিরি আমরা তো আমৃত্যু বালক
যেমত পিতার শক্ত মুঠোয় আবদ্ধ হয়ে রাস্তা পার হয়
বালক বালিকা
পিতা মুহূর্তের অসতর্ক হন না কখনো
পিতা হাতের মুঠোয়
আজন্ম মরণাবধি অস্তিত্ব আঁকড়ে রেখে উদাসীনদৈনিকে রাস্তার
পারাপার কোরে যান পালন করেন ন্যস্ত কর্তব্যের ভার

সময় সুদক্ষ জেলে
ভঙ্গুর অস্তিত্ব তাঁর অনাদিজলের গর্ভে ধরেছেন তিনি
জন্ম ও মৃত্যুর মধ্যে ব্যবধান কতো দীর্ঘ?
আবিশ্ব আবৃত
অভেদ্য জালের সুতো ছিঁড়ে যাবে কোন্ জলে নির্বোধ বালক
সর্বত্র ছড়ানো এই মহাজাল গুটোবেন তিনি
যেদিন সম্পূর্ণ চ্যুত হবে কক্ষপথ হতে পৃথিবী তাঁহার

আমি সময়ের কাছে নতজানু
তিনি পিতামহ
খেলা করছি বুকের উপরে যেরকম
খেলাচ্ছেন তিনি কতো রঙিন পুতুল রূপকথা
যতোদূর দৃষ্টি চলে তাহার সহিষ্ণু হাত চলে গেছে যোজন যোজন
বয়স? পৃথিবী জানে?
জানে সূর্য?
জানে কি এ মহাশূন্য?
সেই তো আদিম
পিতা সেই মহাজাগতিক জল সমুদ্র পৃথিবী
মৎস্যশিশু খেলা করছে তারই গর্ভে
খেলা সাঙ্গ হলে
তাহার অনন্ত দেহে মিশে যায় পুনর্বার জন্ম নেবে বলে

দেখা হয়ে যায়

দিব্যেন্দু পালিত

আকস্মিক দেখা হয়ে যায়।

রাস্তার দু'ধার জুড়ে মাল্যবান—
অথচ মানুষ কতো একা!
মানুষের ভিতর মানুষ
ঘুমের ভিতর স্বপ্ন; না-পাওয়া সমস্ত সুখ ঢেলে দেয় তৎপর আবেগে-
আমিত্বের মুখোমুখি দাঁড়াবার মতোন সময়ে
ভিক্ষার ঝুলির জন্য অনশ্বর স্মৃতি হাতড়ায়।

একদিন আকস্মিক দেখা হয়ে যায়—
ওড়ে বৈকালিক ধুলো, অদৃশ্য যদিও, গন্ধ অচেনা হাওয়ায়
শব্দের রূপান্ত থেকে উঠে আসে বিজন বছর।
'আ-রে, কি অবাক কাণ্ড! কতোদিন পরে দেখা হল!'
বলতে বলতে আসে ট্রাম অভিভাবকের মতো; সম্বল নিঃশ্বাস।

একদিন দেখা হবে এইভাবে, খুব আকস্মিক।
নির্দেশে ট্র্যাফিক থামবে, ব্ল্যাকআউট; মানুষের ভিতর মানুষ—
স্বয়ম্ভু স্বপ্নের মধ্যে পাওয়া যাবে সুশীতল হাত,
কোমরে ঘুন্‌সির মতো, শতছিদ্র, ভিক্ষার ঝুলি,
শব্দের নিহিত অর্থ ধরা পড়বে নির্নিমেষ চোখের চাওয়ায়—

স্মৃতিবাহকেরা শুধু হেঁটে যাবে অন্ধকার দিকে।

ঠাকুমাবুড়ি

বারটোল্ট ব্রেখ্ট

আমার ঠাকুরদা মারা যাবার সময় আমার ঠাকুমার বয়েস ছিল বাহাত্তর বছর। বেডেনের একটা ছোট শহরে ঠাকুরদার লিথোগ্রাফের ছোটখাট ব্যবসা ছিল। দুতিনজন সহকারী নিয়ে মৃত্যু পর্যন্ত ওই কাজই তিনি করেছেন। কোনো পরিচারিকা ছাড়াই ঠাকুমা একা ঘর-সংসারের কাজ করেছেন, পুরনো জীর্ণ বাড়িটা দেখাশোনা করেছেন এবং স্বামী, স্বামীর কর্মচারী ও নিজের ছেলেমেয়েদের জন্য রান্নাবান্না করেছেন।

ছোটখাট রোগা মহিলা ছিলেন ঠাকুমা। গিরগিটির দৃষ্টির ক্ষিপ্রতা ছিল তাঁর চোখে, তবে তাঁর কথা বলার ভঙ্গিটি ছিল মন্থর। তিনি সাতটি সন্তানের জননী হয়েছিলেন। আর্থিক সংস্থান স্বল্প হলেও সাতটির মধ্যে পাঁচটি সন্তানকে তিনি বাঁচিয়ে বড় করে তুলেছিলেন। সংসারের ভারে বয়েস বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি নিজে গুটিয়ে আরো ছোটখাট হয়ে যান।

তাঁর দুই মেয়ে আমেরিকা চলে যায় এবং তিন ছেলের মধ্যে দুজনও ওই শহর ছেড়ে চলে যায়। শুধু রুগ্ন কনিষ্ঠ পুত্র ওই শহরেই অন্যত্র বাস করতে থাকে। আমার সেই ছোটকাকা একটা ছোট ছাপাখানা এবং তার পক্ষে খুবই বড় একটি পরিবারের ঝক্কি নেন।

ঠাকুরদার মৃত্যুর পর ঠাকুমা সেই পুরনো জীর্ণ বাড়িটাতে সম্পূর্ণ একা হয়ে পড়েন। তাঁকে নিয়ে এখন কী করা হবে তা নিয়ে তাঁর ছেলেমেয়েদের মধ্যে চিঠি লেখালিখি চলল। একজন জানাল, তাঁকে তার বাড়িতে নিয়ে যেতে রাজী, কনিষ্ঠ পুত্র তার বউছেলেমেয়েসহ পুরনো পৈতৃক বাড়িতে গিয়ে উঠতে চাইল। কিন্তু ঠাকুমাবুড়ি এই ধরনের কোনো প্রস্তাবকে আমল দিলেন না। তিনি শুধু তাঁর সক্ষম সন্তানদের কাছ থেকে সামান্য মাসোহারা গ্রহণ করতে সম্মতি জানালেন। লিথোগ্রাফের ব্যবসার তখন দিন গিয়েছে, যন্ত্রপাতি বিক্রি হয়ে গিয়েছে জলের দামে, তাছাড়া ধারদেনাও হয়েছে।

তাঁর ছেলেমেয়েরা লিখলো: সে যা-ই হোক, তিনি তো আর একেবারে একা ওই বাড়িটাতে থাকতে পারেন না। তিনি তাঁর ছেলেমেয়েদের উদ্বেগ সম্পূর্ণ উপেক্ষা করলেন। তখন তারা অবস্থাটা মেনে নিল এবং প্রতি মাসে অল্পস্বল্প টাকা পাঠাতে লাগল। তারা অবশ্য ভাবল, আমার ছোটকাকা তো ওই শহরেই রয়েছে। ছোটকাকা তার ভাইবোনদের মা'র খবরাখবর জানাবার দায়িত্ব নিল। ঠাকুরদার মৃত্যুর পর ঠাকুমা যে-দুবছর বেঁচে ছিলেন সেই দুবছরে কী ঘটেছিল তা আমি জেনেছি বাবার কাছে লেখা ছোটকাকার চিঠি থেকে এবং পরে বাবা একবার ওই শহরে কাজে গিয়ে ঠাকুমার সঙ্গে দেখা করে ফিরে এলে তাঁর কাছেও শুনি।

ঠাকুমার বাড়িটা বেশ বড় এবং খালিই পড়েছিল। তবু তিনি ছোটকাকাকে সপরিবারে সেই বাড়িতে এসে থাকতে না দেওয়ায় ছোটকাকা শুরুতেই অসন্তুষ্ট হয় বলে আমার ধারণা। ছোটকাকার চার ছেলেমেয়ে এবং তার বাড়িতে ঘর ছিল মাত্র তিনখানা। ঠাকুমা তাঁর ছোটছেলের সঙ্গে কোনো ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রাখেননি। শুধু প্রতি রবিবার বিকেলে তাঁর নাতিনাতনীদের কফির আসরে ডাকতেন। ওই পর্যন্ত।

তিন মাসে দু-একবার তাঁর ছোটছেলের বাড়িতে যেতেন এবং পুত্রবধূকে জ্যাম তৈরি করতে সাহায্য করতেন। তিনি পুত্রবধূর কাছে কয়েকবার বলেছেন যে ছোটছেলের ওই বাড়িতে তাঁর হাঁফ ধরে যায়। কাকিমার কাছে শুনে বাবাকে একথা লিখবার সময় ছোটকাকা বিস্ময়বোধক চিহ্ন ব্যবহার না করে পারেনি।

আমার বাবা চিঠিতে জানতে চাইল : আমার ঠাকুমার দিনকাল এখন কেমন চলছে। ছোটকাকা তার জবাবে সংক্ষেপে জানাল : সিনেমা দেখে কাটাচ্ছেন।

বুড়ির ছেলেমেয়েরা এমন হতে পারে কখনো ভাবেনি। কারণ সিনেমা আজকে যা, তিরিশ বছর আগে তেমন ছিল না। গলিঘুঁজির মধ্যে জঘন্য দমবন্ধকরা ঘরে ছবি দেখানো হত। হত্যা ও প্রণয়লীলার করুণ পরিণতি বিষয়ে চটকদার প্রাচীরপত্র থাকত বাইরে। সত্যি বলতে, শুধু কাচিকাঁচারা আর অন্ধকারের সুযোগ নেবার জন্য প্রেমিকপ্রেমিকারা ওখানে যেত। ঠাকুমা একা-একা ওখানে গেলে তাঁর সবার চোখে পড়ে যাবার কথা।

এই সিনেমায় যাওয়ার সঙ্গে অন্য একটি প্রশ্ন জড়িত। প্রেক্ষাগৃহে প্রবেশমূল্য কম ছিল সন্দেহ নেই, তবু ব্যাপারটা মোটামুটিভাবে নিজের জন্য সুখ কুড়োবার প্রবৃত্তি চরিতার্থ করার সামিল এবং সেই কারণে 'টাকা ওড়ানোর' মতন। ঠাকুমার পক্ষে টাকা ওড়ানো সম্মান-জনক অথবা শোভন ছিল না।

তাছাড়া তিনি যে শুধু তাঁর কনিষ্ঠ পুত্রের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখতে অনিচ্ছা দেখিয়েছেন তা নয়, ওই ছোট শহরের কোন পরিচিতজনের সঙ্গেও সম্পর্ক রাখেননি। ছোট শহরে প্রায়শই আয়োজিত কফির আসরে তিনি কখনো যোগ দেননি। কিন্তু ঘনঘন এক মুচির জুতোর কারখানায় তিনি যেতেন। কারখানাটি ছিল এক দরিদ্র এবং কুখ্যাত পাড়ায়। বিশেষত বিকেলের দিকে ওখানে এমন সব চরিত্রের ভিড় জমে যেত যাদের ঠিক ভদ্র বলা যায় না—হোটেলের কর্মহীনা খাদ্যপরিবেশনকারিণী, ভ্রাম্যমাণ কারিগর ইত্যাদির দল। মুচি লোকটি ছিল মধ্যবয়সী। অনেক ঘাটের জল খেয়েও সে জীবনে কিছু করে উঠতে পারেনি। প্রায়ই নাকি সে মাতলামি করত। যা-ই হোক, ঠাকুমার সঙ্গী হবার যোগ্য সে ছিল না।

ছোটকাকা ঠাকুমার কাছে এই প্রসঙ্গ তুললে তিনি খুব ঠাণ্ডা গলায় বলতেন : 'ও জীবনের কিছুকিছু দেখেছে।' ওই পর্যন্ত। মুচির বিষয়ে ঠাকুমা কথা বাড়তে দেননি। অনিচ্ছুক হলে কোনো ব্যাপার নিয়ে তাঁর সঙ্গে আলোচনা করা সহজ ছিল না।

ঠাকুরদার মৃত্যুর মাস ছয়েক পরে ছোটকাকা বাবাকে লিখেছিল : তাদের মা একদিন অন্তরই সরাইখানায় যেতে আরম্ভ করেছেন।

এটা সত্যিই একটা খবর! যে-ঠাকুমা সারা জীবন এক ডজন লোকের জন্য রান্না করেছেন এবং নিজে সব সময় অপরের উচ্ছিষ্ট খেয়েছেন, তিনি এখন সামনে খাবারের প্লেট নিয়ে বসছেন সরাইখানায়! ঠাকুমার হল কী?

এর অল্প পরে আমার বাবাকে দরকারী কাজে ওই ছোট শহরের কাছে একটা জায়গায় যেতে হল। বাবা তার মা'র সঙ্গে দেখা করতে গেল। ঠাকুমা তখন বেরোচ্ছিলেন। তিনি বাবাকে দেখে ফিরে এলেন এবং ছেলেকে এক গ্লাস ভিনো ও একখানা বিস্কুট দিলেন। ধীরস্থির; বিশেষ চঞ্চলতা দেখালেন না তিনি অথবা চুপচাপ গম্ভীর হয়েও রইলেন না। আমাদের খোঁজখবর নিলেন, খুঁটিনাটির মধ্যে অবশ্য গেলেন না। জানতে চাইলেন, বাড়িতে বাচ্চাদের জন্যে যথেষ্ট চেরি আছে কিনা। এ ব্যাপারে মনে হল, তিনি ঠিক আগেকার মতোই আছেন। ঘরগুলো খুব পরিচ্ছন্ন এবং তাঁকে বেশ ভালই দেখাচ্ছিল।

একটিমাত্র লক্ষণ থেকে বাবা তার মায়ের নতুন জীবনের ইঙ্গিত পেল। ঠাকুমা ছেলের সঙ্গে কবরখানায় যেতে চাইলেন না। হালকাভাবে বললেন, 'তুমি একাই তো যেতে পারবে। এগারোর সারিতে বাঁ দিকে তৃতীয় কবর তোমার বাবার। আমাকে অন্য এক জায়গায় যেতে হচ্ছে।'

ছোটকাকা পরে বলেছিল, তাঁকে হয়ত সেই মুচির কাছে যেতে হয়েছিল। মায়ের বিরুদ্ধে ছোটকাকার তীব্র অভিযোগ ছিল। 'এখানে ছেলেমেয়েবউ নিয়ে আমি এই গর্তের মধ্যে পড়ে আছি, যে-কাজ পাই তা করতে পাঁচঘণ্টার বেশী সময় লাগে না, পয়সা পাই সামান্য, আমার হাঁপানিটা খুব বেড়েছে, অথচ ওদিকে বড়রাস্তার ওপর এমন বাড়িটা খালি পড়ে আছে।'

বাবা হোটেলে ঘর ভাড়া নিলেও আশা করেছিল, তার মা তাকে নিজের বাড়িতে ডাকবেন, অন্তত সৌজন্যের খাতিরে ডাকবেন। কিন্তু ঠাকুমা তেমন কিছু করলেন না। অথচ ঠাকুমার বাড়িতে যখন লোকজন ছিল, তিনি তাঁর ছেলের হোটেলে গিয়ে পয়সা নষ্ট করা পছন্দ করতেন না।

ঠাকুমা যেন পারিবারিক জীবন একেবারে শেষ করে দিয়েছেন এবং নিজের জীবনের সায়াহ্নে এসে নতুন নতুন পথে হাঁটতে শুরু করেছেন। আমার বাবার প্রচুর রসবোধ ছিল। তার ধারণা হয়, ঠাকুমা বেশ খোশমেজাজে আছেন। ঠাকুমা যা করতে চান তাই যেন করতে পারেন। বাবা ছোটকাকাকে বাধা না দিতে অনুরোধ করেছিল।

কিন্তু ঠাকুমা কী করতে চেয়েছিলেন?

তাঁর বিষয়ে পরের খবর, তিনি মস্ত একখানা ঘোড়ার গাড়ি ভাড়া করে এক বেস্পতি-বারে বেড়াতে বেরিয়েছিলেন। গাড়িটা এত বড় যে একটা পুরো পরিবারের জায়গা হয়। কখনো-সখনো আমাদের সবাইকে নিয়ে ঠাকুরদা ওই ধরনের ঘোড়ার গাড়িতে করে বেড়াতে বেরোতেন। তখন ঠাকুমা কিন্তু যেতেন না। ঘেন্নায় হাত ঘুরিয়ে বাড়ির মধ্যে চলে যেতেন।

পরের খবর : ঠাকুমা দূরের একটা অপেক্ষাকৃত বড় শহরে গিয়েছেন। তিনি গিয়ে-ছিলেন, সেখানকার ঘোড়দৌড়ের মাঠে।

অত্যন্ত শঙ্কিত হয়ে ছোটকাকা ঠাকুমার জন্যে ডাক্তার ডাকতে চাইল। বাবা ছোটকাকার চিঠি পড়তে-পড়তে মাথা নাড়ছিল। ছোটকাকার প্রস্তাবে বাবা সায় দিল না।

দূরের ওই শহরে ঠাকুমা একা যাননি। একটি কমবয়সী মেয়ে তাঁর সঙ্গে গিয়েছিল। ছোটকাকার চিঠি থেকে জানা গেল: মেয়েটি একটু বোকা, হোটেলের রান্নাঘরে কাজ করে এবং ওই হোটেলে ঠাকুমা একদিন অন্তর খেতে যান।

এর পর থেকে বোকাসোকা মেয়েটির বেশ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা।

মনে হয়, মেয়েটির ওপর ঠাকুমার অন্ধ অনুরাগ জন্মেছিল। তিনি তাকে সিনেমায় নিয়ে যেতেন, সেই মুচির কাছে নিয়ে যেতেন। এখানে বলে রাখা ভাল, পরে জানা যায়, ওই মুচি একজন সোস্যাল ডেমোক্র্যাট। গুজব রটেছিল, ঠাকুমা মেয়েটাকে নিয়ে সরাইখানার রান্নাঘরে বসে মদের গ্লাস সামনে নিয়ে তাস খেলতেন।

হাল ছেড়ে দেওয়ার ভঙ্গিতে ছোটকাকা চিঠিতে লেখে: 'হাবা মেয়েটাকে মা একটা টুপি কিনে দিয়েছেন। টুপির ওপর গোলাপফুলের নকশা। অথচ মা'র গীর্জায় যাবার ভালো পোশাক নেই।'

চিঠিতে ছোটকাকা আস্তে আস্তে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠছিল। ঠাকুমার 'অশোভন আচরণের' বিবরণ ছাড়া শেষের দিকে চিঠিতে আর কিছু থাকত না। বাকীটা আমি বাবার কাছে শুনেছি।

সরাইখানার মালিক এক চোখ টিপে ফিসফিস করে বাবাকে বলেছিল, 'আজকাল শুনছি আপনার মা খুব খোশমেজাজে আছেন।'

আসলে কিন্তু ঠাকুমা শেষ দিনগুলোতে অমিতব্যয়িতাকে প্রশ্রয় দেননি। যেদিন তিনি সরাইখানায় খেতে যেতেন না, সেই সব দিন তিনি ডিম, কফি এবং তাঁর প্রিয় বিস্কুট খেয়ে কাটিয়ে দিতেন। তবে একটা সস্তা ভিনো তিনি পান করতেন। দুপুর এবং রাত্রিতে খাবার সময় ছোট এক গ্লাস ভিনো নিয়ে বসতেন। একখানা শোবারঘর এবং রান্নাঘর তিনি ব্যবহার করতেন, কিন্তু পুরো বাড়িটা পরিষ্কার রাখতেন। তবুও, তাঁর ছেলেমেয়েদের অজানতে তিনি বাড়িটা বন্ধক দিয়েছিলেন। বাড়ি বন্ধক দিয়ে টাকা নিয়ে তিনি কী করে-ছিলেন কখনো ঠিকমতো জানা যায়নি। টাকাটা সম্ভবত তিনি মুচিকে দিয়েছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর সেই মুচি অন্য শহরে চলে যায় এবং হাতে-তৈরি জুতোর বেশ বড় ব্যবসা শুরু করে দেয়।

মনে হয়, ঠাকুমা পরপর দুটো আলাদা জীবনযাপন করেছিলেন। প্রথমে তিনি ছিলেন কন্যা, স্ত্রী ও মা এবং দ্বিতীয় জীবনে শুধুই একজন মহিলা, যাঁর কোনো বন্ধন ও দায়িত্ব ছিল না, সংস্থান পরিমিত হলেও সচ্ছলতা ছিল। তাঁর প্রথম জীবন ছিল সুদীর্ঘ, দ্বিতীয় জীবন মাত্র দুবছরের।

আমার বাবা জানতে পেরেছিল, তার মা শেষ ছ মাসে এমন সব প্রথাবিরোধী কাজ করেছিলেন, স্বাভাবিক মানুষ যা করে না। ঠাকুমা হয়ত গরমের সময় রাত তিনটেয় উঠে সেই ছোট শহরের জনশূন্য রাস্তায় হাঁটতে শুরু করলেন। ঠাকুমার নিঃসঙ্গতা লক্ষ্য করে স্থানীয় পাদ্রী হয়ত তাঁকে সঙ্গ দিতে এলেন, আর ঠাকুমা তাঁকে ডাকলেন সিনেমায় যেতে।

ঠাকুমা মোটেই নিঃসঙ্গ ছিলেন না। সেই মুচির আড্ডায় অনেক আমুদে লোক এসে জমতো আর নানারকমের গল্পগুজব হতো। নিজের সামনে ঠাকুমা ভিনোর বোতল রাখতেন এবং একটি ছোট গ্লাসে ঢেলে অল্পস্বল্প পান করতেন। অন্যান্যরা চিৎকার করে শহরের কর্তাদের কড়া সমালোচনা করত। নিজে তীব্র কিছু পান না করলেও ঠাকুমা মাঝে-মাঝে অন্যান্যদের কড়া মদ কিনে দিতেন।

হেমন্তের এক বিকেলে তাঁর শোবার ঘরে হঠাৎই ঠাকুমার মৃত্যু হল। মৃত্যুর সময় তিনি বিছানায় ছিলেন না, জানলার পাশে একটা খাড়া চেয়ারে বসেছিলেন। সেদিন সন্ধ্যেয় তিনি সেই বোকাসোকা মেয়েটিকে সিনেমায় যেতে ডেকেছিলেন। মৃত্যুর সময় সেই বোকা মেয়েটা তাঁর পাশে ছিল। তখন ঠাকুমার বয়েস চুয়াত্তর।

আমি ঠাকুমার একটা ছবি দেখেছি। ছবিখানা তাঁকে সমাহিত করার আগে শোয়ানো অবস্থায় তোলা। ছোটখাট একটি মুখ, অতিকুঞ্চিত ত্বক, পাতলা ঠোঁট, হাঁ করে আছেন। সব কিছুই ছোট, কিন্তু কোনো কিছুই সামান্য নয়। দীর্ঘকালের ক্রীতদাসত্বের এবং মাত্র দুবছরের স্বাধীনতার স্বাদ তিনি পুরোপুরি নিয়েছেন; জীবনের পাত্র নিঃশেষে পান করে গেছেন।

অনুবাদ: সুধাংশু ঘোষ

গল্পের নেপথ্যে

দীপেন্দু চক্রবর্তী

এক অর্থে ছোটগল্পও একটি পণ্য। পণ্যটি যখন আমাদের হাতে আসে, আমরা তার সৌন্দর্য উপভোগ করি, তার আকৃতি, প্রকৃতি, গুণাগুণ বিচার করি। কিন্তু পণ্যটির উৎপাদনপদ্ধতি কেমন ছিল, কি কি উপকরণ নিযুক্ত ছিল উৎপাদনে তা আমরা পাঠকেরা ঠিক জানতে পারি না; ফলে আমাদের বিচারক্ষেত্রের বাইরে থেকে যায় এই বিশিষ্ট সৃজনপ্রক্রিয়াটি। এই প্রক্রিয়াটি Kant-এর অনুকৃত ভাষায় 'অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়' বললে সাহিত্যের ক্ষমতাকে ছোট করা হয়। গল্পকার কেমন করে গল্পটা তৈরি করেছেন, তার স্মৃতি একেবারে লুপ্ত হয় না। যদিও আমরা জানি সাহিত্যসৃজনে ব্যস্ত মন ও তার পরবর্তী সময়ের মন এক নয়, তবু স্মৃতির সাহায্যেই মানুষ অতীতকে বর্তমানের সঙ্গে সম্পর্কিত করে। পেছনের দিকে তাকিয়ে লেখক তাই ইচ্ছে করলেই গল্পের নেপথ্য-গল্পকে উদ্ধার করতে পারেন। জীবন ও জগৎ তো একটাই, জীবনদর্শন একাধিক হলেও, তাই প্রায়শই একই ছাঁচে গল্প লেখা হয়, জন্ম হয় একই বিষয়ের গল্পের। কিন্তু গল্পটা এক হলেও গল্প লেখার গল্পটা এক নয় কোনো ক্ষেত্রে। স্থানকালপাত্রের কথা বাদ দিলেও কয়েকটি বস্তুর আকস্মিক সম্মেলনে গল্পের কাঁচামাল কারখানায় আসে, তারপর কল্পনা নামক একযন্ত্রে তা রূপান্তরিত হয় গল্পে। কিভাবে আসে, কখন আসে, এসব প্রশ্ন অবান্তর, কারণ শুধু লেখক বলতে পারেন কিভাবে এসেছিল, কখন এসেছিল। তা থেকে একটা সার্বিক সিদ্ধান্তে আসা ঠিক বাস্তবানুগ নয়।

লেখকমাত্রই জানেন গল্প লেখার ব্যাপারে শিক্ষকতা একেবারে অকেজো। কেমন করে ভালো গল্প ভালো হয় তা প্রমাণ করা যায়, কিন্তু কোন প্রক্রিয়া প্রয়োগে তা সফল হয় সেটা লেখকের নিতান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার। গল্পের শেষ আগে শুরু করা হবে, না শেষটা শেষেই; প্রেরণার উত্তেজনা না যেতে যেতেই গল্প লেখা উচিত না প্রেরণার পর গল্পের বীজটাকে বেশ কিছুদিন ধরে লালন করা দরকার; সকাল না রাত্রি, কোন্‌টা ভালো সময় লেখার পক্ষে; পরিমার্জন ও পরিবর্তন কি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ গল্প লেখার; একটানা লেখা না বিরতি, কোন্‌টা গল্পকে সজীব রাখে; এসব প্রশ্নে কোনো দুজন লেখক একমত হতে পারেন না। এমন কি একই লেখকের ক্ষেত্রে যেটা প্রথম গল্পে খেটেছিল দ্বিতীয়টাতে তা আর খাটে না। ফলত এই দাঁড়ায় যে সৃজনপদ্ধতি, কি সাহিত্যে, কি শিল্পে, কোনো আইনেরই অপেক্ষা রাখে না; শেষ বিশ্লেষণে, তা ব্যক্তিগত সৃজনশীলতার কাহিনী।

গল্প লেখার প্রাথমিক পর্যায়কে ভ্রূণাবস্থা বলা যেতে পারে। ঠিক যে ঘটনাংশ লেখকের মনকে একটা গল্পের সম্ভাবনা নিয়ে আঘাত করে তাকেই গল্পের ভ্রূণ বলব। কোনো শোনা কথা, কোনো অস্পষ্ট ছবি, কারো কাটা চিবুক, কারো কপালের বলিরেখা, ভিখিরির ভিক্ষে চাওয়া, পার্কে প্রেমিক-প্রেমিকার কথোপকথন, মিছিলের মুখ, যে কোনো ঘটনার মধ্যেই গল্পের বীজ থাকতে পারে। হেনরী জেম্‌সের মতে এটা হল the precious particle....the stray suggestion, the wandering word, the vague echo, at a touch of which the novelist's imagination winces as at the prick of some sharp point'। জেম্‌সের উপমাটি যে নিখুঁত তা আরো স্পষ্ট হয় যখন তিনি

গল্পের প্রথম আঘাতকে ছ‍ুঁচের তীক্ষ্ণ খোঁচার সাহায্যে বোঝান।

জইস্‌ ক্যারি একটি সুন্দর গল্প বলেছেন এ সম্বন্ধে। একবার ম্যানহ্যাটান দ্বীপের কাছে একটি বোটের ওপর প্রায় তিরিশ বছরের একটি মেয়েকে দেখেন তিনি। নোংরা পোশাক হলেও তার চেহারায় একটা জীবন উপভোগের আকাঙ্ক্ষা স্পষ্ট ছিল। কিন্তু তার কপালে বেশ কয়েকটি বলিরেখা ক্যারিকে চিন্তিত করেছিল! বন্ধুকে বললেন তিনি একটি গল্প লিখবেন। কিন্তু তারপর বিস্মৃতিতে হারিয়ে গেল কুঞ্চিত-কপাল মেয়েটি। বহুদিন পর সান্‌ফ্রান্‌সিস্‌কোতে তিনি এক ভোরবেলায় ঘুম থেকে উঠে দেখলেন তাঁর মাথায় একটি সুন্দর গল্প এসে গেছে। কিন্তু গল্পের নায়িকার কপালে ঐ রেখাগুলো কেন! অনেকক্ষণ পর হঠাৎ ভেসে উঠল ম্যানহ্যাটান দ্বীপের সেই মেয়েটির মুখ। আমরা জানি রবীন্দ্রনাথ কাবুলিওয়ালা লিখেছিলেন জনৈক কাবুলিওয়ালাকে দেখেই, তবে যথেষ্ট সচেতনভাবেই, ক্যারির মত অসচেতন হয়ে নয়। গোর্কি লিখেছিলেন 'আমার সহযাত্রী' একজন অজ্ঞাত-পরিচয় ব্যক্তির সঙ্গে আলাপ করে। 'চেলকাশ'-এর উৎপত্তি একজন ভবঘুরের মুখ থেকে শোনা গল্পে। ফক্‌নার স্বীকার করেছেন ওঁর গল্প শুরু হয় একটা চিন্তা বা idea, স্মৃতির খণ্ডাংশ বা কোনো মানসপ্রতিমা দিয়ে। ওঁর 'দি সাউন্ড অ্যান্ড ফিউরি' শুরু হয় একটি 'mental picture' দিয়ে—গাছের ফাঁক দিয়ে একটি মেয়ে তার দিদিমার শেষ যাত্রা দেখছে এবং সে তার ভাইদের বিবরণী দিচ্ছে ওপর থেকে। ফ্রাঁসোয়া সাগাঁ বলেন একটা চরিত্রই হল গল্পের ভ্রূণ। *Bonjour Tristesse*-ও তিনি শুরু করেছিলেন একটা চরিত্র নিয়ে। 'ক্ষুধিত পাষাণ' গল্পটির ভ্রূণ অবশ্য কোনো চরিত্র না, একটি প্রাচীন প্রাসাদ। মোরাভিয়া রোম নগরীর 'অ্যাড্রিয়ানা'কে দেখে দশ বছর পর লিখেছিলেন 'রোমের নারী'। মহিলাটি ওঁর গল্পের ক্ষেত্রে শুধু একটি স্ফুলিঙ্গ হিসেবে কাজ করেছিল, বাকীটুকু লেখকের কল্পনা। ফ্র্যাঙ্ক ও'কনর ও ডরথি পার্কারের কাছে যে কোনো দৃশ্যের চাইতে হঠাৎ কানে আসা একটি মন্তব্য অনেক বেশী আনে গল্পের অনুপ্রেরণা। ও'কনর বলেন, 'আপনি যদি সেই ধরনের লোকদের মত হন যারা রাস্তায় একটি মেয়ে দেখলেই তার চোখের রঙ, চুলের ঢঙ, এবং পোশাক কেমন তাই দেখেন তবে আপনি একটুও আমার মত না।' কারণ ওঁর শ্রুতি অত্যন্ত প্রখর এবং মানুষের কণ্ঠস্বর সম্বন্ধে উনি অত্যন্ত সচেতন। আইভি কম্পটন বার্নেট কিন্তু এ-সবে বিশ্বাস করেন না। 'আমি অপরিচিত লোককে তাকিয়ে দেখা বা তার কথা শোনা কোনোটাই করি না গল্পে কাজে লাগানোর জন্য'—তিনি বলেন। ওঁর বিশ্বাস তারা কোনো-ভাবেই কাজে আসতে পারে না। তবে গল্প তো একটা জায়গা থেকে শুরু করতেই হয়, ওঁর কাছে সেটা যেখানে সেখানে যেমন তেমন করে সম্ভব। হেনরী জেম্‌সের প্রায় সব গল্পই কোনো না কোনো উড়ে আসা বীজ থেকে উৎপন্ন। *The Spoils of Poynton*-এর ভূমিকায় উনি বলেছেন কোনো এক বড়োদিনের ভোজসভায় জনৈকা মহিলার এক উক্তি থেকেই বেরিয়ে এল তাঁর গল্প। ওঁর পূর্বসূরী ডিকেন্স যখন পিক্‌উইক্‌ পেপার্স লেখেন তখন কোনো ব্যক্তি বা মন্তব্য বীজ হিসেবে উড়ে আসে নি। ওঁর সদারসিক কল্পনা দিয়ে উনি হঠাৎ এই অদ্ভুত চরিত্রটিকে ভেবে ফেলেছিলেন। লোকমুখে শোনা গল্প থেকেও অনেক উৎকৃষ্ট গল্পের জন্ম হয়েছে। প্রভাত মুখোপাধ্যায় 'দেবী' লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথের মুখে একটি গল্প শুনে। জোসেফ্‌ কন্‌রাড 'নস্‌ট্রোমো' লিখেছিলেন খানিকটা শোনা গল্প থেকে, খানিকটা এক নাবিকরচিত গ্রন্থ থেকে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় একটি গল্পের ভেতর থেকেই বহু গল্প টেনে বের করতেন, এ কথা তিনি নিজেই স্বীকার করে গেছেন।

আমরা প্রায়ই খেয়াল রাখি না যে গল্পের বিষয়বস্তু নির্বাচনে মস্ত বড়ো ভূমিকা গ্রহণ করে যে সব জিনিস তার মধ্যে উল্লেখ্য হল কোনো একটি অবিস্মরণীয় ঘটনা যা লেখকের সমস্ত জীবনকেই প্রভাবিত করে। ইটালিয়ান লেখক সিলোন ভূমিকম্পে তাঁর দেশের লোকদের মরতে দেখেছিলেন চোখের সামনে, সেই ছবি তাঁর গল্পে বারবার ফিরে এসেছে। যুদ্ধ ও সংঘর্ষ দেখে দেখে হয়তো হেমিংওয়ের শিল্পীমনে ভয়ঙ্কর একটা মৃত্যুচেতনা জন্মেছিল, তাই তিনি বলেছেন 'ডেথ ইন্ দি আফ্‌টারনুন'-এ, "সব গল্পই মৃত্যুতে গিয়ে শেষ হবে যদি শেষ পর্যন্ত টেনে নিয়ে যাওয়া হয় আর যিনি তাতে বাধা দেন তিনি সত্যিকারের গল্পকার নন।' সমুদ্র-উপজাতি-জাহাজ-বিদ্রোহ-নাবিক জীবনের সব কিছু উপকরণই উপস্থিত মেলভিলের বইগুলোতে, যেমন জোসেফ্ কন্‌রাডের লেখাতেও।

গল্পের ভ্রূণাবস্থার পরেরটিকে 'getstatory period' বলেন অ্যাঙ্গাস উইলসন। এ সময়টা কল্পনার গর্ভে বেশ কিছুদিন ধরে ভ্রূণটি বিকশিত হতে থাকে। হেনরী জেম্‌সের গল্পগুলো পূর্ণাঙ্গরূপ নিতে অনেক সময় লাগত, আবার জর্জেস সিমেনন একদমই ধৈর্য ধরার পক্ষে নন, দুদিনের মধ্যেই উনি গল্প লিখতে শুরু করেন। কেউ কেউ গোটা পরিকল্পনাটা আগে সেরে নেন, কেউ আবার লেখেন আর ভাবেন। ভার্জিনিয়া উল্‌ফ রোজ সকালে তাঁর 'মথ্‌জ' লিখতে বসতেন এবং ভাবতেন কি লিখছেন, কেন লিখছেন, এবং কেমন করে লেখা উচিত। স্তাঁদাল ব্যালজাককে চিঠিতে জানিয়েছিলেন পরিকল্পনা করে গল্প লিখতে তাঁর ঘোর আপত্তি। প্রতিদিন ২৫/৩০ পাতা লিখে সব ভুলে যেতেন, আবার লেখার সময় সবটুকু পড়ে নিতে হত। 'What, what, what! How, how, how!' এমনিভাবেই ন্যাথেনিয়েল হথর্ন 'ডঃ গ্রিমশেস্ সিক্রেট' লিখতে গিয়ে ভাবতেন। ট্রলপ দুবছর অপেক্ষা করে 'দি ওয়ার্ডেন' লিখতে বসেছিলেন।

গল্প লেখার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সময়টুকুকে বলা যেতে পারে foetus-পর্ব।

এ সময় লেখকের একমাত্র অনুপ্রেরণাই তাঁর কাজকে নিয়ন্ত্রিত করে না, অভ্যাস সুযোগ ও নিতান্ত ব্যক্তিগত অভিরুচিও তাঁর কাজের নিয়ামক হয়। ট্রলপ তাঁর আত্মজীবনীতে বলেছেন যে ঘড়ি সামনে রেখে উনি প্রতি ১৫ মিনিটে ২৫০ শব্দ লিখে যেতেন। টলস্টয় সকালে লিখতেই পছন্দ করতেন। এ ব্যাপারে ওঁর গুরু ছিলেন রুশো। ওঁর ঋষিসুলভ দৃষ্টিতে সকাল হচ্ছে শুদ্ধচিন্তার উপযুক্ত সময়। ফ্র্যাঙ্ক ও'কনর মোপাশাঁর উপদেশানুসারে দ্রুতগতিতে লেখাই পছন্দ করেন। এ ব্যাপারে পয়লা নম্বরের দৃষ্টান্ত ব্যালজাক। সন্ধেবেলাতেই বিছানায় যেতেন তিনি, তারপর মাঝরাত পর্যন্ত ঘুমিয়ে উঠে পড়তেন। শুরু হত লেখা, চলতো কখনো কখনো পরের দিন অপরাহ্ণ পর্যন্ত। লেখার সময় কফি খাওয়াই ছিল একমাত্র বিরতি। তাঁর একটি উপন্যাস তিনি বাহাত্তর ঘণ্টার মধ্যে লিখে ফেলে প্রুফ্-শিটে আবার নতুন করে লিখেছিলেন। এছাড়া আছে লেখার উপকরণ ও পরিবেশ। কিপ্‌লিং-এর ঘন কালি ছাড়া চলত না। হেমিংওয়ে কুড়িটা পেন্সিল কেটে রাখতেন একসাথে। উইলা ক্যাথারের পক্ষে বাইবেল পাঠ একান্ত আবশ্যক। থর্নটন উইল্‌ডারের চাই নাতিহ্রস্ব ভ্রমণ। কেউ কেউ ইচ্ছাকৃতভাবেই কুসংস্কারপ্রিয়—যেমন ট্রুম্যান ক্যাপোট লেখার সময় হলুদ গোলাপ সামনে রাখতে চান না, ছাইদানে তিনটে সিগারেটের টুকরো একসাথে থাকলে তা চক্ষুশূল ওঁর কাছে, এমনকি শুক্রবারে উনি কোনো লেখা শুরু বা শেষ করেন না।

গল্প লেখার শেষ অংশ পরিমার্জন। কাটছাঁট অবশ্য সব গল্পের পক্ষে অপরিহার্য নয়, শেক্‌স্‌পীয়র পরিমার্জন তেমন করেন নি বলে জনসন কিঞ্চিৎ ক্ষোভই প্রকাশ করে-

ছিলেন। তিন তিনবার লিখেছিলেন মোরাভিয়া তাঁর 'রোমের নারী' উপন্যাস। জইস্ ক্যারিও ব্যাপকভাবে পরিশোধনের পক্ষপাতী। ফ্রাসোঁয়া সাগাঁ আবার এ ব্যাপারে মোটেই উৎসাহী নন। ডস্টয়ভ্স্কি আই. এস. অক্সাকভ্কে চিঠিতে জানিয়েছিলেন যে দিনরাত খেটে 'ব্রাদার্স কারামাজভ্' লেখার সময় যে সব পরিচ্ছেদের জন্য তিনি তিন বছর ধরে নোট করে গেছেন সেগুলোকে একেবারে বাদ দিয়ে আবার নতুন করে লিখতে হয়েছে তাঁকে। এ বিষয়ে অবশ্য ফ্লবেয়ারের জুড়ি নেই। প্রতিটি বাক্যগঠনের জন্যই তিনি অকাতরে সৃষ্টির যন্ত্রণা সহ্য করতেন, এক পৃষ্ঠার লেখাকে বাগে আনতে একাধিক দিন ব্যয় হয়ে যেত।

গল্প লেখার এই সাধারণ ও স্বাভাবিক প্রক্রিয়াটি আপন খেয়ালে চলতে পারে যদি লেখক স্বাধীনভাবে তাঁর সৃষ্টিকার্যকে সম্পাদন করতে পারেন। ব্যক্তিগত অভিরুচি ও অভ্যাস—যেমন একদিনে একটি গল্প-লেখা বা একমাসে একটি, ভেবে লেখা বা লিখতে লিখতে ভাবা—এই প্রক্রিয়াকে ব্যাহত করে না। ব্যাহত করে বাহ্যিক শক্তির অবৈধ প্রভাব। প্রকাশকেরা, দৃষ্টান্তস্বরূপ, চিরকালই লেখকের সৃজনপ্রক্রিয়াকে দারুণভাবে নিয়ন্ত্রিত করে এসেছে, আজকে আরো, বিশেষ করে বাংলাদেশে। এই বাইরের চাপে লেখকের ব্যক্তিগত স্বাভাবিক কর্মপ্রণালীটা বানচাল হয়ে যেতে বাধ্য। ফল যে সর্বসময়ই খারাপ হবে তা নয়, তবে ভালো হয় কদাচিৎ; সারা লেখায় তাই একটা অসুস্থ হাঁপানির আওয়াজ শোনা যায়। অ্যালেকজান্ডার ডুমা তাঁর 'দি হাঞ্চব্যাক অব নটরড্যাম' ছ মাসের মধ্যে লিখে ফেলেন এক প্রকাশকের চুক্তি রক্ষা করে। গোর্কি খুব তাড়াহুড়ো করে 'মা' শেষ করেছিলেন বলে যখন দুঃখ প্রকাশ করেন লেনিন তাঁকে বাধা দিয়ে বলেন বিপ্লবী পরিস্থিতিতে এই রকম স্বতঃস্ফূর্ত লেখার প্রয়োজন ছিল এবং লেখাটাও সেইজন্য সফল হয়েছে।

এখন, গল্প যখন শেষ, লেখক কি একবার পেছন ফিরে দেখবেন না ঠিক কোন পথ দিয়ে তিনি এসেছেন। ই. এম. ফর্স্টারের উত্তর মনে পড়ছে— "When the picture or symphony or lyric or novel (or whatever it is) is complete, the artist, looking back on it, will wonder how on earth he did it. And indeed he did not do it on earth." শিল্পী তাঁর সৃজনক্রিয়ার সময় যে ভিন্ন জগতের নাগরিক একথা সাধারণভাবে মানলেও একটা 'কিন্তু' থেকে যায়। তাঁর কাজের অনেকটাই তো সচেতন এবং তা আমরা তাঁর জবানিতেই পাই। আর এইখানেই সামাজিক ও অর্থনৈতিক শ্রেণীবিন্যাস একটা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করে।

গল্প লেখার গল্প কোথায় শুরু হয় কোথায় শেষ হয় তা আমরা অনুমান করতে পারি মাত্র, সঠিক ধরতে পারি না। এ গল্প বলতে পারেন একমাত্র গল্পকার নিজে। হয়তো গল্পটা ভ্যাস্কো পোপার 'দি স্টোরি অব এ স্টোরি'র মতই—যা শেষ হয় শুরু হওয়ার আগে, শুরু হয় শেষ হওয়ার পর। আসলে গল্প লেখার প্রক্রিয়াটি এত অন্তর্মুখী আভ্যন্তরীণ যে লেখকও সব সময় তাকে যথাযথ ধরতে পারেন না। তাই এ সম্বন্ধে সব কথা বলা হলেও বাকী থাকে অনেক। এ তো ফিল্মের সুচিন্তিত শুটিং নয় যে দর্শকদের আমন্ত্রণ করে দেখানো যেতে পারে কেমন করে গল্পের জন্ম হয়! এই অদৃশ্য, কখনো অবোধ্য রাসায়নিক প্রক্রিয়াটির দিকে ইঙ্গিত করেই বোধহয় অ্যাঙ্গাস উইলসন বলেছেন—"Fiction writing is a kind of magic, and I don't care to talk about a novel I'm doing because if I communicate the magic spell, even in an abbreviated form, it loses its force for me."

বনিতা

সুশীল রায়

[পরাশর পুরকায়স্থ পরিণত বয়সে বিপত্নীক হন। মস্ত বাড়িটা শূন্য। এক হাউস-কীপার আবশ্যক। কাগজে বিজ্ঞাপন দেন। কয়েকজন প্রার্থী এর আগে দেখা করে গিয়েছেন।......]

অলকা উকিল

দেয়ালঘড়িতে মৃদু আওয়াজ দিয়ে ঢংঢং শব্দে ছয়টা বাজল। পরাশর একবার ঘড়ির দিকে তাকালেন, তার পর দরজার পরদার দিকে। এক্ষুনি পরদা তুলে ফণিভূষণ একজন নতুন মানুষ এনে হাজির করবে বলে তিনি অপেক্ষা করতে লাগলেন। মিনিট-দুই কাটল, তবু কেউ এল না দেখে তিনি কলিং বেল টিপলেন।

ফণিভূষণ পরদা সরিয়ে ঘরে এল।

"কেউ আসে নি?" জিজ্ঞাসা করলেন পরাশর।

"এখনো আসে নি।"

"কার যেন আসার কথা? কি-যেন নাম?" টেবিলে রাখা দরখাস্তের দিকে তিনি তাকালেন।

"অলকা উকিল।" ফণিভূষণ বলল।

ফণিভূষণের কাছে একটা তালিকা দেওয়া আছে, নামটা তার জানা, তাই চট করে সে বলে ফেলতে পারল।

পরাশরবাবু কি-যেন ভাবতে লাগলেন। সন্ধ্যায় অন্য-কোনো কাজ তিনি রাখেন নি, আজ এবেলায় যদি কেউ না আসে তাহলে সময়টা তিনি কি করে কাটাবেন—এই যেন তাঁর ভাবনা। পরাশরবাবুর একটু বুঝি নেশাই ধরে গেছে, সকালবেলা প্রসন্ন বিশ্বাস নামের ঐ মহিলাটি নেশার কথা বলে-বলেই বুঝি তাঁর মাথার মধ্যে নেশার একটা ঝোঁক ধরিয়ে দিয়ে গিয়েছে।

কোনো নির্দেশ না পেয়ে ফণিভূষণ দাঁড়িয়েই আছে। হঠাৎ তা খেয়াল হতেই পরাশর-বাবু বললেন, "আচ্ছা, একটু দ্যাখো!"

ফণিভূষণ নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল।

একটু পরেই ফণিভূষণ আবার ঘরে ঢুকল।

"কি চাই?" পরাশরবাবুর দাঁত দিয়ে চুরুট কামড়ে ধরা ছিল, সেইভাবেই মুখ তুলে তিনি তাকালেন।

ঘড়ির দিকে ঘাড় ফিরিয়ে তাকিয়ে ফণিভূষণ বলল, "এসেছে।"

"এসেছে না, এসেছেন।" আঙুলের ফাঁকে চুরুট নিয়ে পরাশরবাবু বললেন, "নিয়ে এসো।"

ছয়টা বেজে দশ। পরাশরবাবু ঘড়ির দিকে তাকালেন।

একটু পরেই পরদা নড়ে উঠল, মেয়েটি ঘরে ঢুকে দূর থেকে দুই হাত এক করে বলল, "নমস্কার। আমার নাম অলকা উকিল।"

"নমস্কার। আসুন।"

মেয়েটি কাছে আসতেই বললেন, "বসুন।"

বসতে-বসতে মেয়েটি বলল, "দশ মিনিট দেরি হয়ে গেল।"

"তাই তো দেখছি।"

"আমি লেট হওয়া একদম পছন্দ করিনে।"

"আমিই কি পছন্দ করি বলে মনে করেছেন?"

মেয়েটি এবার একটু হাসতে চেষ্টা করল, বলল, "বদ অভ্যাস কারোই পছন্দ করা উচিত না। আর, আপনি তো করবেনই না।"

পরাশরবাবু মেয়েটির মুখের দিকে চেয়ে বললেন, "কেন, আমি যে পছন্দ করবই না, তা জানলে কী ক'রে?"

মেয়েটি বলল, "আপনি যে এম্প্লয়ার।"

পরাশরবাবু এর উত্তর দতে পারলেন না, বললেন, "দেরি হল কেন?"

"আগে এসেই পৌঁছে যেতাম। কিন্তু আধ ঘণ্টা লেট হল ট্রেন। যতই দেরি হচ্ছে ট্রেনের, বুকের ভিতরটা আমার ততই দুরদুর করছিল। হাওড়ায় নেমেই দৌড়। দৌড়ে এসে নিলাম বাস্। নামলাম এসপ্লানেডে, সেখান থেকে ছুটতে-ছুটতে আসছি।"

একনিশ্বাসে বলে গেল অলকা উকিল।

পঁচিশ-ছাব্বিশ বছর হবে বড়জোর। খুব স্মার্ট, আর খুব চটপটে। ছিপছিপে চেহারাটি বেশ ছিমছাম ক'রে সাজানো। ঠোঁটে খুব হালকা ক'রে গোলাপি রং লাগানো; কপালে বেশ বড় একটা গোলাপি টিপ। কপালের উপরে ফুরফুর ক'রে কয়েক গাছি চুল উড়ছে। পিছন দিকে গোলাকার মস্ত একটা এলোখোঁপা। পরনে গোলাপি পাড়ের হালকা সবুজ রঙের কাপড়, হাতে গোলাপি হ্যান্ড ব্যাগ।

সব গোলাপি। চোখে গোলাপি নেশা লাগারই কথা বটে। পরাশরবাবু কি-যেন ভাবছেন, এই রকম ভান ক'রে খুঁটিনাটি ক'রে দেখে নিলেন অলকা উকিলকে।

বললেন, "তুমি পারবে এ কাজ?"

"কোন্ কাজ?"

"যে কাজের জন্যে এসেছ।"

অলকা বলল, "না পারার কি আছে! আপনাকে দেখাশুনা করতে হবে, এই তো?"

কথাটা বলেই অলকা বলল, "কিন্তু আপনাকে একটুও দেখাশুনা করতে হবে না, দেখেই তা বুঝতে পারছি।"

"দেখেই এতটা বুঝে ফেললে? তোমার বুদ্ধি তো খুব তাজা।" পরাশরবাবু একটু বিরক্ত হয়ে এই কথা বললেন কিনা তা ঠিক বোঝা গেল না, আরো বললেন, "এত তাড়াতাড়ি তুমি বুঝি সব বুঝতে পার?"

অলকা সপ্রতিভ উত্তর দিল, বলল, "বুদ্ধি তাজা না। আমার চোখ কিন্তু খুব তাজা। আপনাকে দেখেই তাই ধরা যাচ্ছে।"

"তাই নাকি?"

"জানেন! আমি ভেবেছিলাম, আপনি নিশ্চয় একজন থুথ্থুরে বুড়ো হবেন। কিন্তু ঘরে ঢুকেই চমকে গেলাম। আপনাকে দেখেই চমকে গেলাম। আপনি কিন্তু খুব তাজা আছেন।"

পরাশরবাবু বললেন, "বিজ্ঞাপন বোধ হয় ভালো করে পড়নি? ওতে তো লেখা আছে 'স্বাস্থ্যবান কর্মক্ষম'।"

অলকা এতে অপ্রস্তুত হল না, বলল, "বিজ্ঞাপন বিশ্বাস করিনে। ওতে সব মিথ্যে কথা লেখা থাকে। আপনিও তো চেয়েছেন স্বাস্থ্যবতী চল্লিশ বছরের মেয়ে। কিন্তু আমার শরীরে স্বাস্থ্যও নেই, বয়সও আমার চল্লিশ হয়নি। আমার দূরের কথা, আমার মায়েরও বোধ হয় এখনো চল্লিশ হয় নি। বিজ্ঞাপনে বিশ্বাস করলে কি আমি দরখাস্ত করতে পারতাম?"

তা ঠিক। পরাশরবাবু চুরুটে আলগোছে একটু টান দিয়ে মাথা নাড়তে লাগলেন। বললেন, "তা হলে তুমি তো বেশ মেয়ে! বিজ্ঞাপনে বিশ্বাস করলে না, অথচ চলে এলে?"

"চলে আসতে ক্ষতি কি! আপনার চিঠি যেদিন পেলাম, সেইদিনই আরো বুঝলাম যে আমার আন্দাজ ঠিকই হয়েছে।"

"কিসের আন্দাজের কথা বলছ বলো তো!" পরাশরবাবু অলকার কথা ঠিক যেন ধরতে পারলেন না।

অলকা বলল, "বিজ্ঞাপনে যে সত্যি কথা লেখা থাকে না—এই আন্দাজের কথা বলছি। আপনি চল্লিশ বছরের জন্যে বিজ্ঞাপন দিলেন, কিন্তু ডাকলেন পঁচিশকে। দরখাস্তে নিশ্চয় আমার বয়স জানিয়েছিলাম—দেখুন-না কাইন্ড্লি।"

পরাশরবাবু দরখাস্তটিতে চোখ বুলালেন, বললেন, "হ্যাঁ। জানিয়েছ।"

উল্লসিত হবার মতন করে অলকা বলল, "তবেই দেখুন।"

"দেখছি তো। কিন্তু আমি বিপত্নীক কিনা, সে সম্বন্ধেও কি তোমার সন্দেহ আছে?"

"না না না।" অলকা মাথা নেড়ে জানাল, তার কানের রিং-দুটো দুলতে লাগল, বলল, "ওসব অবিশ্বাস করার মানে হয় না। বুঝতে পারা গিয়েছে যে, একজন ভদ্রলোকের একজন সঙ্গী দরকার হয়েছে।"

পরাশরবাবু কোন্ কথার কি উত্তর দেবেন, তাই যেন ভেবে পাচ্ছেন না। অবশেষে তিনি বললেন, "এখন কিছু কাজ করছ?"

"করছি। না করলে চলবে কেন।"

"কি কাজ করো?"

অলকা বলল, "দুধের কাজ।"

ত্রিবেণী থেকে আসছে অলকা উকিল। এত দৌড়ে এসেছে, এত ছুটে এসেছে—সে বলেছে বটে, কিন্তু তার মুখে কোনো ক্লান্তির ছাপ নেই। ক্লান্তির ছাপ নেই, কেননা, পরিশ্রম করার অভ্যাস তার আছে। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্তই প্রায় তাকে পরিশ্রম করতে হয়, না করে উপায় নেই। কত জায়গায় তাকে গিয়ে হাজির হতে হয় তার ঠিক নেই। তাই ভয়-ডর বলে সে কিছু জানে না। ভয় বলে কিছু যদি থাকত তাহলে এখানে একা সে কি আসতে পারত। বিজ্ঞাপনে যার এতটুকু বিশ্বাস নেই, সে কি রকম জায়গায় এসে পেঁছিবে, তারই কি কোনো স্থিরতা আছে? তবু সে এল। বিপদে যেমন পড়া যায়, বিপদ থেকে উদ্ধারও তেমনি পাওয়া যায়। সকলেই তো অভিমন্যু না। অভিমন্যুটা বীর হতে পারে, কিন্তু বুদ্ধি তার এতটুকুও ছিল না। সে ঢুকতে পারল, কিন্তু বের হয়ে আসতে পারল না।

কি কথা থেকে কি কথায় এসে পেঁছে গেল অলকা, পরাশরবাবু তা ধরতেই পারলেন না, বলে ফেললেন, "অভিমন্যু কে?"

ব্যাগ থেকে রুমাল বের করে নাকের ডগা একটু চুলকে নিয়ে, রুমালের আড়ালে একটু হেসে নিয়ে অলকা বলল, "সে কি, অভিমন্যুকে চেনেন না? মহাভারত বুঝি পড়েন নি?"

"ওঃ, তাই বলো! তুমি বুঝি পড়ে ফেলেছ মহাভারত?"

"মোটেও না। পড়াশুনা আমার একটুও ভালো লাগে না। আমার সব শোনা কথা।"

পরাশরবাবু হাসতে লাগলেন, বললেন, "অভিমন্যুটা তাহলে বেশ বোকাই ছিল। কি বলো!"

"ছিল বলে ছিল। ভয়ংকর বোকা ও।"

পরাশরবাবু বললেন, "অভিমন্যুর মত কোনো ছেলের সঙ্গে দেখা হয়নি তো?"

অলকা হাসতে লাগল, বলল, "সে কথা আর বলবেন না। অভিমন্যুতে এখন রাস্তা-পথ-ঘাট ভরা। খুব বীরের মত দেখতে লাগে সকলকে। ওরাও নিজেদের খুব বীরপুরুষ মনে করে। দেখেন নি তাদের। পাড়ায় পাড়ায় দেখতে পাবেন। চুলের কী কাজ, গোঁফের কী বাহার! আপনি তো ঘরে বসে কাজ করেন, তাদের দেখবেন কি করে। আমার কাজ পথে-পথে, হরদম তাদের দেখছি।"

"তাদের বুঝি বুদ্ধি কম?"

"বেশির ভাগেরই। বুদ্ধি কম না হলে অমন কিম্ভূতকিমাকার সাজে কি কেউ সাজে? বলুন। গায়ের চামড়ার মত প্যান্ট এঁটে থাকে শরীরে। প্যান্ট খোলা তো না, যেন পাঁঠার ছাল ছাড়ানো।"

খুব হাসতে লাগলেন পরাশরবাবু, হাসতে তিনি জানেনও, তাই বেশ জানান দিয়েই তিনি হাসতে লাগলেন।

অলকা বলল, "অত হাসছেন যে!"

ঘরের মধ্যে শব্দ শুনে পরদা সরিয়ে উঁকি দিয়ে ফণিভূষণ জিজ্ঞাসা করল, "কিছু বলছিলেন, সার্।"

"উঁহুঁ।" পরাশরবাবু মাথা নেড়ে জানালেন।

অলকা বলল, "উহুঁ কেন। একটু জল দিতে বলুন-না! গলা শুকিয়ে গেছে, যা ছুটে এসেছি!"

বেল টিপলেন পরাশরবাবু, সঙ্গে সঙ্গে হাঁক দিলেন, "বেয়ারা।"

উর্দি-পরা বেয়ারা পরদা ডিঙিয়ে সশরীরে প্রবেশ করল কামরায়, সেদিকে না তাকিয়ে আদেশ করার গলায় পরাশরবাবু বললেন, "ড্রিংকস লাও। সফ্ট্।"

ঠাণ্ডা গেলাশে আস্তে-আস্তে চুমুক দিতে-দিতে অলকা বলল, "আপনি খুব হাসতে পারেন কিন্তু। কিন্তু হাসছিলেন কেন?"

"তোমার কথা শুনে। তোমার অভিমন্যুদের কথা শুনে। ওরা যদি সাতজনে মিলে সপ্তরথী হয়ে তোমাকে ঘেরাও করে!"

"সে সাহস নেই।" ঠোঁট থেকে গেলাশ নামিয়ে অলকা বলল, "ওরা কেবল এক-একটা মন্তব্য ছুঁড়ে মারে। আজে-বাজে সব কথা জানে তো ওরা। সেইসব বলে।"

"তুমি কি বলো?"

"কিচ্ছু না। উত্তর দিই নে।"

"অর্থাৎ, তুমি থাকো নিরুত্তরা।" পরাশরবাবু হেসে মন্তব্য করলেন, বললেন, "কিন্তু ওদের হয়তো ইচ্ছে যে, তুমি হও উত্তরা।"

শেষ চুমুকে গেলাশটা শেষ করে অলকা বলল, "কথাটা বলেছেন ভালো। মহাভারত তবে পড়া আছে আপনার।"

"উঁহুঃ। ওসব শোনা কথা। উত্তরার নামও শুনেছি, অভিমন্যুরও।"

টেবিলের উপরে একদৃষ্টে চেয়ে পরাশরবাবু কি-যেন দেখছেন একমনে। অনেকক্ষণ তিনি চেয়ে আছেন ঐ দিকে। অলকা একটু উঁচু হয়ে চুরি করে দেখে নেওয়ার চেষ্টা করল। কিন্তু পরাশরবাবুর হাতের আড়াল থাকায় কিছু দেখতে পেল না।

মাথা তুলে অলকার দিকে চেয়ে তিনি বললেন, "বাসায় কে-কে আছ?"

"মা আছেন, ছোট এক বোন আছে, এক ভাই আছে।"

"তারা কি করে?"

"পড়ে। বোনটা বোধ হয় ক্লাস নাইন, ভাই ক্লাস ফোর।"

"বোধ হয় মানে?"

"ঠিক মনে পড়ছে না। নাইনও হতে পারে, টেনও হতে পারে।"

"সে বোনও কি তোমার মত দেখতে?"

অলকা হাসল, বলল, "না। আমার মতন এত সুন্দর না।"

"তুমি বুঝি সুন্দর দেখতে? কে বলল ও কথা?"

"কে আর বলবে। কেই-বা না-বলবে। আমি যে দেখতে সুন্দর তা আমি জানি।" একটু বুঝি শক্ত হয়ে বসেই বলল অলকা।

"ঐ জন্যেই বুঝি ফটোটা পাঠিয়েছ?"

"এতক্ষণ ওটাই দেখছিলেন বুঝি?"

"হ্যাঁ।" পরাশরবাবু বললেন, "কিন্তু ফটো পাঠানো ঠিক করো নি। ফটোটা তেমন ভালো হয় নি।"

"দেখুন। আপনিও তো স্বীকার করবেন যে, আমি দেখতে সুন্দর।" অলকা একটু থামল, বলল, "আমি ভীষণ সুন্দর দেখতে, তাই আমার ভীষণ কষ্ট।"

অলকার হাসিখুশি মুখটা হঠাৎ কেমন অন্ধকার হয়ে এল। পরাশরবাবু কোনো কথা বলতে পারলেন না। বেল্ টিপে বেয়ারাকে ডেকে ঘরের আরো দুটো আলো জেবলে দিতে বললেন।

ঘরে আলো জ্বলছিলই। ঘরে আলো ছিলই। বাড়তি দুটো আলো জ্বলে ওঠায় ঘর আলোময় হয়ে গেল। কিন্তু অলকার মুখের অন্ধকার এতেও ঘুচল না।

বছর সাতেক হল অলকার বাবা নিরুদ্দেশ। তার বোন আর ভাইকে বাবা ইস্কুলে ভরতি করেছেন; কিন্তু অলকার জন্যে লেখাপড়ার কোনো ব্যবস্থাই তার বাবা কখনো করেন নি। ঘরের কাজ করে আর পাড়ার বাড়িতে-বাড়িতে ঘুরে বেরিয়েই অলকার সময় কেটেছে। পাড়ার সকলেই তাকে খুব ভালোবাসত। সকলেই বলত, এর নাম অলকা না রেখে রাখা উচিত ছিল গোলাপ। কেননা, সে নাকি গোলাপের মতই দেখতে।

পাড়াশুদ্ধ সকলেই তাকে খুব ভালোবাসত, তাদের সঙ্গে সেও খুব ভালোই থাকত। কিন্তু একজন তাকে একটুও ভালোবাসত না। কেন যে এমন হত তা বুঝতেই পারত না অলকা। যতদিন সে ছোট ছিল, যতদিন সে কিছু বুঝত না ততদিন বেশ ভালোই ছিল অলকা। কিন্তু ক্রমে যখন বড় হল, যখন সব বুঝতে শিখল তখন থেকেই আরম্ভ হল তার কষ্ট। সেই কষ্ট আজও চলেছে।

কেউই যখন তার জন্যে কিছু করল না, তখন নিজের চেষ্টা নিজেকেই করতে হবে বলে সে ঠিক করল। কিন্তু কী-এমন কাজ আছে যা নাকি তার মতন লেখাপড়া-না-জানা একটা মেয়ে করতে পারে? কোনো কাজ শিখে নিয়ে তার পর সেই কাজ করা, সে তো অনেক সময়ের দরকার, আর তাতে ধৈর্যও লাগে অনেক। ছোট বয়স থেকে যখন কিছুই শেখা হল না, তখন আর-কিছু শিখে-টিখে কাজ নেই; এবার দরকার শুধু কাজ। তাই পরাশরবাবুর বিজ্ঞাপন দেখে তার খুব লোভ হল, তার মনে হল—এটা মন্দ না।

যে কাজ এখন সে করছে তাতেও বিশেষ-কিছু শিখে-টিখে নিতে হয় নি। সে এখন করছে দুধের কাজ। কিন্তু এতে যত-না পয়সা, খাটনি তার চেয়ে অনেক বেশি। আর, নিজেকে সাজিয়ে রাখার জন্যেও অনেক খরচ।

ত্রিবেণীর থেকে একটু দূরে, তার মানে, ত্রিবেণীর বেশ কাছেই, বাগাটি। সেখানে একটা মস্ত ডেয়ারি আছে। যত-না গোরু তার চেয়ে অনেক বেশি মোষ। কাগজে বিজ্ঞাপন নিশ্চয় দেখেছেন ঐ ফার্মের। বড়-বড় অক্ষরে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয় যে, এই ফার্মের দুধ খাঁটি, এবং সব দুধই নাকি গোরুর। এখানে যা ঘি হয় সবই নাকি গাওয়া ঘি।

"আমি এই ফার্মের রিপ্রেজেন্টেটিভ।"

এদিকে শ্রীরামপুর, ওদিকে ব্যান্ডেল। এই এলাকাটা অলকার। সে বাড়িতে-বাড়িতে গিয়ে অর্ডার জোগাড় করে। বাগাটির আপিসে এসে নতুন কাস্টমারদের নাম-ঠিকানা দাখিল করে। সেইসব ঠিকানার দুধ জোগান দেওয়া হয়।

ওই তল্লাট ঘিরে এখন অনেক কলকারখানার কাণ্ডকারখানা আরম্ভ হয়ে গিয়েছে। কারখানার কর্মীদের ও অফিসারদের জন্যে কত বড়-বড় বাড়ি উঠেছে। অনেক লোকের বসতি, বসতি আরো বেড়েই চলেছে। নতুন ধরনের ব্যবসার এটা নতুন ঘাঁটি।

কারখানার শ্রমিকশ্রেণী যারা তারা দুধের তেমন ভক্ত না। তারা অন্য জাতের পানীয় বেশি পছন্দ করে; অফিসারেরাও অবশ্য নানাজাতীয় ড্রিঙ্কস্ পছন্দ করেন, কিন্তু দুধও তাঁরা চান। বিশেষ করে তাঁদের গিন্নিরা। এই গিন্নিমহলেই ঘুরে-ঘুরে বেড়াতে হয় অলকাকে।

নতুন-নতুন অফিসারদের তাঁরা স্ত্রী, তাই তাঁদের চটকই আলাদা। যেমন সাজের ঘটা, তেমনি আড়ম্বর। সবার উপরে টেক্কা দেবার জন্যে সকলেরই খুব চেষ্টা।

এ সুযোগটা নিয়ে চলেছে অলকা। বেশ ভালো ভালো পার্টি সে পাচ্ছে, বেশ বড়-বড় অর্ডার।

সাজগোজের ঘনঘটার মধ্যেই তার চলাফেরা, সেইজন্যে তাকে নিজেকেও বেশ সেজেগুজেই থাকতে হয়। ভগবান রূপটা দিয়েছেন, সেই রূপকে একটু মেজেঘষে, মানান-সই কাপড়জামা দিয়ে জড়িয়ে সে তাদের আসরে গিয়ে উপস্থিত হয়। কাউকে বলে দিদি, কাউকে বলে বৌদি। সকলেই যেন তার সবচেয়ে বেশি আপনার, এই রকম ভঙ্গি করে তাদের সঙ্গে আলাপ করে, গল্পগুজব করে। আর, ঐ গোরুর দুধের অর্ডার জোগাড় করে।

অলকা বলল, "জেনেশুনে মোষের দুধকে গোরুর দুধ বলে চালাচ্ছি। আমি কি রকম মিথ্যেবাদী দেখুন। কিন্তু মিথ্যা বলি বলেই কাজ হয়। সত্যি কথা বললে কেউ ঐ দুধ নিতই না। বাঁচার জন্যে মানুষ কত মিথ্যা কথাই বলে, তাই না?"

পরাশরবাবু ওকে প্রবোধ দেবার জন্যেই বুঝি বললেন, "তাতে কি, মোষের দুধ তো অখাদ্য না। কত অখাদ্য জিনিসও তো খাদ্য বলে চালিয়ে দেওয়া হচ্ছে। তুমি তো তেমন-

কিছু করছ না।"

"না। তা করছি নে।"

একটু থেমে বলল, "ওরা নিজেরাও কিন্তু কম মিথ্যে না। ওরা যা সেজে থাকে ওরা কিন্তু তা না। লেখাপড়া জানিনে, তা না হলে ওদের নিয়ে মস্ত মহাভারত লেখা যেত। অনেক দ্রৌপদী কিন্তু দেখেছি।"

অলকা হাসতে লাগল ওই কথা বলে। হাসতে-হাসতে হঠাৎ আবার গম্ভীর হয়ে গেল।

"ও কি, থামলে কেন। বেশ মজার কথা তো বলছিলে, বেশ রসালো কথা আরম্ভ করেছিলে। একটু শুনি!"

অলকাও হাসার মতন করল, বলল, "কুলীমজুরদের যত দুর্নাম। কুলীকামিনীদের নিয়ে অনেক জঘন্য গল্প শোনা যায়, কিন্তু এই কুলকামিনীরা যে কি জিনিস, আপনাকে ধীরে-ধীরে বলব। আমি তো একেবারে ওদের অন্দরের লোক হয়ে গিয়েছি, আমি সব জানি। কিন্তু, কোনো পুরুষমানুষের সাধ্য নেই তাদের সব কথা জানে।"

পরাশরবাবু বললেন, "ধীরে-ধীরে আবার কবে বলবে। আজই শোনাও-না তোমার মজার গল্প।"

"আপনি তো আমাকে রাখছেনই। তখন যত ইচ্ছে শুনবেন।"

"অমন মজার কাজ ছেড়ে দিয়ে এই একটা বুড়োকে নিয়ে থাকতে কি তোমার ভালো লাগবে?" জিজ্ঞাসা করলেন পরাশরবাবু।

অলকা কিছুক্ষণ কি-যেন ভাবল, অনেকক্ষণ সে চুপ করে বসে রইল, তার পর বলল, "যে কাজ করছি তা শুনতে বড় মজা। কিন্তু ঘুরে-ঘুরে বেড়াতে-বেড়াতে শরীরটাও ভাজা-ভাজা হয়ে গেল। এখন তাই অন্যরকম কাজ চাই।"

তার বাবা নিরুদ্দেশ। অনেক ভার তার উপরে। দুই ভাই-বোনের লেখাপড়া, বাড়ির যাবতীয় খরচ; তার উপরে নিজেকে সাজিয়ে রাখার জন্যেও অনেক হাঙ্গামা। তার উপরে, ঐ যে হল অভিমন্যুদের কথা, ওরাও তো কম উৎপাত নয়। হঠাৎ ওদের মধ্যে থেকে বেরিয়েও তো পড়তে পারে একজন অর্জুন, সে হয়তো নিজের কৃতিত্ব দেখিয়ে তাকে অর্জন করে নিয়ে গেল, এবং অবশেষে তাকে বানিয়ে নিল একজন দ্রৌপদী। কিছু বলা যায় না। তাই সে এখন অন্যরকম কাজ চায়, একটু নিরাপদ কাজ।

"আমাকে তাহলে তুমি খুব নিরাপদ মনে করেছ বলে মনে হচ্ছে যেন।" হেসেই বললেন পরাশরবাবু।

অলকা বলল, "কাজটার কথা বলছি। আপনার কথা বলছিনে। আর, বিপদ বলে যদি মনে হয় তখন তার একটা ব্যবস্থাও নিশ্চয় করা যাবে।"

কথাটার মানে বুঝতে পারলেন না পরাশরবাবু। বিপদের আর ব্যবস্থাটা কি হবে। একেবারে একা যে থাকবে পরাশরবাবুর হেফাজতে, সে নিজে কী আর ব্যবস্থা করতে পারবে তা বুঝতেই পারলেন না তিনি। এসব সত্ত্বেও তাঁর কেমন-যেন মনে হচ্ছে, এই মেয়েটিকে পেলে তার ব্যবসার সুবিধে হতে পারে। এমন চালাক-চতুর চটপটে মেয়ে অনেক কাজের হবে। পাঁচজনের সঙ্গে গুছিয়ে কথা বলতে পারবে। বাইরে যাবার উপযুক্ত সঙ্গী যে এ হতে পারবে, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

পরাশরবাবুর চুরুট নিবে গিয়েছে, তিনি সেটা জ্বালাবার এখন আর চেষ্টা করলেন না। দেশলাইয়ের উপরে চুরুটটা অকারণেই কিছুক্ষণ ঘষলেন, তার পর বললেন, "শোনো।

তুমি বুদ্ধিমতী মেয়ে। সবই বোঝো। ধরো, তুমি এখানে রইলে। আমাকে দেখাশুনা করার কাজে তুমি বহাল হলে। সব সময় আমার সঙ্গে থাকতে হবে তো। ধরো, আমি হয়তো একটা বিশ্রীরকম ব্যবহার করে বসলাম তোমার সঙ্গে, তখন কি করবে? এ কথাটা ভেবে দেখেছ তো?"

"একেই তো বলে বিপদ। তার কথা তো আগেই হয়ে গেল। কিন্তু কি হলে কি হবে—সে কথা আগে থেকে বলা মুশকিল। অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা একটা-কিছু হবেই। তার জন্যে ভাবিনে। বেওয়ারিশ মেয়ে হয়ে যখন জন্মেছি, তখন সব-কিছুর জন্যে তৈরি থাকতে হবে।"

পরাশরবাবু এবার চুরুট জেবলে নিলেন, ধোঁয়া ছাড়লেন, বললেন, "তোমাকে দেখে আর তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে, আমি লিখতে জানলে তোমাকে নিয়ে কিছু-একটা লিখতাম।"

"কি লিখতেন? রামায়ণ, না, মহাভারত? কিন্তু ওকথা থাক্। লেখাটেখা কিছু হবে না, দরকারও নেই। আমার মতন হাজারটা মেয়ে পথে-পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তাদের কাউকে নিয়ে কেউ কিছু লিখছে না; যারা দেখছে তারা চুপ করে দেখছেই। যারা কিছু দেখছে না, তারা বানিয়ে-টানিয়ে যা-সব লিখছে তা সব মিথ্যে—আমার ডেয়ারি ফার্মের গোরুর দুধ সেসব। আমাকে রাখুন, যা হবার হবে, তাতে মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে না।"

পরাশরবাবু একটু মেয়েলি ভঙ্গিতে কথা বললেন, বললেন, "আমার কিন্তু ভীষণ ভয় করছে।"

"বুঝেছি। বলতে হবে না। আমাকে আপনার খুব পছন্দ হয়েছে।" অলকা পরাশরবাবুর মুখের দিকে চেয়ে একটু হাসল, বলল, "বলুন, ঠিক ধরেছি কিনা।"

"ঠিকই ধরেছ। কিন্তু আমি তোমাকে ঠিক ধরতে পারছি নে।"

"ওটা অত কঠিন কাজ কিছু না। ধরা দিলেই ধরতে পারবেন।" অলকা তার হাত-ঘড়ির দিকে তাকাল।

"ট্রেন ক'টায়?"

"দেরি আছে। অনেক ট্রেন আছে।"

"যদি বলি, আজ থেকেই থেকে যাও।"

আঁৎকে উঠল যেন অলকা, বলল, "ওরে সর্বনাশ। বাড়ির কোনো ব্যবস্থা না ক'রে, মাকে কিছু না জানিয়ে হঠাৎ থাকব বললেই কি থাকা যায়? বাবা চলে যাবার পর থেকে মা একবেলা ভাত খায়; মার রাত্রের খাবার জন্যে আমি রুটি নিয়ে যাই। আমি না গেলে মা না খেয়ে থাকবে।"

একটু চুপ করে থেকে বলল, "আর জানেন, আমার বোন আর ভাইটা এমন পাজি, আমি না ফেরা পর্যন্ত তারা ঘুমবে না। তাদের জন্যে আমি একটুও ভাবি নে, কিন্তু তারা কেন-যে আমার জন্যে ভাবে, আমি তাই ভাবি।"

এর আগে রুমাল দিয়ে একবার ডগা চুলকাতে তাকে দেখেছেন পরাশরবাবু, এবার তাকে দেখলেন তার চোখের কোণ পরিষ্কার করে নিতে।

মা-বোন-ভাইদের নিয়ে সে যদি এত বিব্রত, তাকে না হলে তাদের যদি এক রাত্রি না চলে, তাহলে তার পক্ষে পরাশরবাবুর কাজ করা তো সম্ভবই না। যে ধরনের এর সাজ-পোশাক, যে ধরনের এর চেহারা, যে ধরনের কথাবার্তা—তার সঙ্গে তার এই স্নেহ ও

আকর্ষণের গল্প যেন মানাচ্ছে না। মনে হচ্ছে, সবই বানানো। সবই মিথ্যা। সবই বুঝি বিজ্ঞাপন। সে যে একজন বেশ উঁচুদরের মমতাশীল মেয়ে, এইটে বুঝিয়ে পরাশরবাবুর মন নরম করে দিয়ে কার্যসিদ্ধি করাই তার মতলব—এমনও তো হতে পারে। ঠিকই কথা, ঠিক ধরতে পারছেন না তিনি এই অলকা উকিলকে।

"আমরা রাস্তার মেয়ে।" অলকা বলল, "আমাদের ঠিক বুঝতে পারে না অনেকে। ভাবে, সস্তা মেয়ে। ট্রেনের হ্যান্ডেল ধরতে গিয়ে ভুল করে তাই খপ করে হাত চেপে ধরে। ভিড় ডিঙিয়ে যাবার ছল করে গায়ে গা ঘষে দিয়ে যায়। মনে-মনে হাসি। আমাদের মুখে হাসির সেই আভাস দেখে ওরা ভাবে বাজি মাৎ করে নিয়েছে, রাজি হয়ে গিয়েছি আমরা।"

"তোমার মতন অনেক মেয়ে বুঝি এই কাজ করে?"

"কি, দুধের কাজ?" অলকা হেসে বলল, "ওই কাজ ছাড়া বুঝি আর কাজ নেই। কতজন চলেছে ট্রানজিস্টারের কারখানায়, কতজন চলেছে দরজির কাজে, কতজন ইস্কুল-মাস্টারি করতে।"

একটা অজানা বিরাট জগতের চেহারা ফুটে উঠল পরাশরবাবুর চোখের সামনে। অনেক দেখেছেন তিনি, কিন্তু আরও কত জিনিস যে তাঁর দেখা হয়নি তা যেন আন্দাজ করতে পারলেন। তিনি যেন স্পষ্ট দেখতে পেলেন, এই অলকা উকিলের বয়স অজস্র মেয়ে ট্রেনে-ট্রেনে ছুটে বেড়াচ্ছে জীবিকা সংগ্রহের জন্যে। তাদের ঘরেও নিশ্চয় আছে অলকারই মত মা ভাই বোন। তাদের জন্যেও রসদ সংগ্রহ করার জন্যে তাদের চেষ্টার কোনো ত্রুটি নেই।

অলকা বলল, "আছেন আরামে। এই বাড়ি, এই ঘর। এই আলো, এই পরদা, পায়ের নীচে পুরু এই গালিচা। আমার ভীষণ ইচ্ছে করছে, ভীষণ লোভই হচ্ছে বলা ভালো—আপনার এই আরামের আমি একটু ভাগ নিই।"

পরাশরবাবু এর কথা শুনে একটু চমকেই গেলেন, বললেন, "আরাম? আরামের ব্যবস্থা এখন দেখছ বটে। কিন্তু আমাকেও একদিন অনেক কষ্ট করতে হয়েছে।"

"হয়েছে বুঝি?" অলকা বলল, "বিশ্বাসই হয় না কিন্তু। তাছাড়া, পুরুষমানুষের আবার কষ্ট। কষ্ট কাকে বলে তা তারা জানে না। ও কথা বলা পুরুষমানুষদের একটা ফ্যাশান। আমি যেমন ফ্যাশান করেছি কাপড়ের পাড়ের রঙের সঙ্গে কপালের ফোঁটার রং ম্যাচ করে।"

"তুমি খুব সুন্দর কথা বলতে পার।"

"কথাই তো আমার কাজ। কথা বলতে পারি বলেই অনেক কাজ পাই।" একটু থেমে বলল, "এ কাজটাও পাব জানি।"

ইতিমধ্যে মেয়েরা এতটা এগিয়ে গিয়েছে, এ খবর যেন তাঁর জানা ছিল না। তাঁদের সময়ে মেয়েরা এভাবে পথে বের হতও না, হতে পারতও না। পরাশরবাবুর তাই বড় আশ্চর্য লাগছে। তিনি মনে-মনে কল্পনা করে দেখছেন, অলকাকে এখানে রাখলে কেমন হবে। একটু ভাবতে গিয়েই তাঁর সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। এখানে থাকার জন্যে এই মেয়েটার যেমন লোভ হচ্ছে বলে সে বলল, ওকে রাখার জন্যেও পরাশরবাবুর তেমনি লোভ হচ্ছে, এ কথা বলাই বাহুল্য।

ট্রেনে-ট্রেনে বাস্‌এ-বাস্‌এ দলে-দলে মেয়েদের চলাফেরা করা তিনি তেমন দেখে না থাকুন, কিন্তু তাঁর জীবনে তিনি মেয়ে তো কম দেখেননি। বেশ ভালোভাবে, বেশ অন্তরঙ্গ-

ভাবেই তিনি তাদের দেখেছেন—সেসব এখন স্মৃতি বটে; কিন্তু সে-স্মৃতির স্বাদ তো মধুরই।

পিপি— তাঁর কানের মধ্যে অস্ফুট একটা আওয়াজ বেজে উঠল। কিন্তু কণ্ঠস্বরটি কার তা অবশ্য তিনি ঠিক বুঝতে পারলেন না। হতে পারে—ওটা হয়তো একটা পাঁচমিশালী গলা।

তাঁর বয়স হয়েছে বটে, কিন্তু জীবনের কামনা-বাসনা তো শেষ হয়ে যায়নি। মেয়েটির মুখের দিকে বার-বার চেয়ে তিনি বার-বারই চোখ নামিয়ে নিচ্ছেন। মেয়েটা যে ভাবে বলল যে, এ কাজ সে পাবেই তা সে জানে—এতে তাঁর মনে হল যে, মেয়েটা বুঝি তার মনের কথাটা ধরে ফেলেছে। পরাশরবাবু তাই একটু উদাসীন হবার চেষ্টা করলেন।

কিন্তু বেশিক্ষণ উদাসীন হয়ে বসে থাকাও যায় না। মেয়েটা তাঁর উদাসীনতা দেখে হঠাৎ যদি উঠে চলে যায়, সেটাও তাঁর ভালো লাগবে না। একটু আগেই মেয়েটা ঘড়ি দেখেছে।

আর-কোনো কথা না পেয়ে পরাশরবাবু বললেন, "তোমার এক কাজ করা উচিত।"

"অনুচিত কি করে ফেলেছি কোনো কাজ?"

ইশ! কথা বলাই তো বড় মুশকিল করে তুলছে মেয়েটা। বিরক্তি প্রকাশ না করে পরাশরবাবু হাসলেন, বললেন, "অত অধৈর্য হোয়ো না। কথাটা আগে শোনো।"

একটু ন'ড়ে স্থির হয়ে বসার ভঙ্গি করে অলকা বলল, "বেশ। ধৈর্য ধরলাম তাহলে। এবার বলুন।"

"বলব? আবার কিছু মনে করবে না তো?"

"না। মন বলে আমাদের কিছু নেই। আপনি বলুন।"

বলবেন কি না-বলবেন ঠিক করতে পারছিলেন না পরাশরবাবু, নেভা চুরুটই একটু চুষলেন, ওতেই যেটুকু নেশা হবার তা হয়তো হল, চুরুটের রস জড়িয়ে নিলেন জিভে, অবশেষে বললেন, "বিয়ে করে ফেল একটা।"

খিল-খিল করে হেসে উঠল অলকা উকিল, বলল, "একটা কেন, হাজারটা বিয়ে করতে পারি। কিন্তু করে কে।"

"কেন, তুমি করবে।"

"তা তো করব, কিন্তু একহাতে কি তালি বাজে? আমি একা বিয়ে করলেই তো হবে না, একটা সঙ্গী চাই তো। গলায় মালা দিলেই তো হবে না, মালা বদল দরকার যে!"

"তেমন লোক বুঝি নেই পৃথিবীতে?"

"হয়তো আছে। অনেকই হয়তো আছে। তারাও হয়তো আমার মত মেয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছে, আমি খুঁজে বেড়াচ্ছি তাদের মত পুরুষ। ট্রেনের লাইনের মত সমান দূর দিয়েই দু পক্ষ ছুটে চলেছে, কোনো-এক জায়গায় তাদের মিলিয়ে দিচ্ছে না কেউ। এই ভাবেই স্টেশনের পর স্টেশন পেরিয়ে চলেছি আমরা।"

"বা। চমৎকার। অনেক বুঝে ফেলেছ দেখছি।"

"বুঝিনি। বুঝতে হয়েছে। বুঝতে বাধ্য হয়েছি।"

তারা রাস্তার মেয়ে, তারা সস্তা মেয়ে; তাদের মান আছে, মর্যাদা আছে, আশা আছে আকাঙ্ক্ষা আছে—এসব কে বিশ্বাস করবে। তাদের সঙ্গিনী করে পেতে চায় অনেকে, কিন্তু জীবনসঙ্গিনী যাকে বলে সেভাবে তাদের কেউ নিতে চায় না। পরাশরবাবু যদি ইচ্ছে করেন,

এবং তেমন সুযোগ যদি তাকে দেন, তাহলে সে তার নিজের জীবনের ঘটনাই তাকে বলবে। কত জন কত আশ্বাস দিয়ে কতভাবে ছলনা করার চেষ্টা করেছে তার সঙ্গেও। সময় মত সে বুঝতে পেরেছে বলেই সম্পূর্ণ শরীরটা ফাঁদের মধ্যে নিতে দেয়নি, তাই বেঁচে গিয়েছে।

"সম্পূর্ণটা না হলেও কিছুটা অন্তত তবে ফাঁদে পড়েছিল?" পরাশরবাবু একটু রসিকতা করার মতন করে বললেন।

অলকা বলল, "এ কথার উত্তর নিশ্চয় চাচ্ছেন না। এর উত্তর না-ই বা দিলাম, কি বলেন।"

পরাশরবাবু কিছু বলেন না। উত্তর একটু পেলে মন্দ হত না, আর, উত্তর দিতে অসুবিধে থাকলে, থাক্, দরকার নেই উত্তরের। তিনি যেটুকু বুঝতে পেরেছেন, তাই যথেষ্ট।

পরাশরবাবু বললেন, "ঐ জন্যেই তো বলি—বিয়ে করো।"

"কোনো বুড়োমানুষকে বিয়ে করতে বলছেন না নিশ্চয়?" অলকা চোখে অদ্ভুত কৌতুক ফুটিয়ে অদ্ভুত ভঙ্গিতে বলল কথাটা।

কথাটা একেবারে বুকে গিয়ে বিঁধল পরাশরবাবুর, তিনি একটু থতমত খেয়ে গেলেন, তারপর নিজেকে সামাল করে নিয়ে বললেন, "তা বলবই-বা কেন, আর, তা বললে তুমি শুনবেই বা কেন।"

"আমার মনের কথা আপনি কি করে জানলেন। আমি যে শুনবই না তা আপনাকে কে বলল?" ভুরু-দুটো একটু উপর দিকে তুলে উত্তর দিল অলকা।

কিন্তু ওসব কথা থাক্। যার থেকে এত কথা উঠে পড়ল পরাশরবাবু আবার সেই কথায় ফিরে এলেন। ওকে বোঝালেন যে, বিয়ে করাই তার উচিত। এখন বয়স আছে, চেহারা আছে—বিয়ে করে ফেলতে হলে এইটেই উপযুক্ত সময়। এর পর অনুতাপ করতে হবে। নিজের ছবি দেখে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলতে হবে। সবাইকে ডেকে দেখাতে হবে, দ্যাখ্, কী সুন্দর দেখতে ছিলাম আমি।

পরাশরবাবু যা বলছেন তা নাকি নতুন-কিছু না, এ রকম অনেক উপদেশ সে শুনেছে। কিন্তু তার ভয় করে। তার বাবার আচরণ দেখে তার ভয় আরো বেড়েছে। কথা নেই বার্তা নেই, এতগুলো বছর যার সঙ্গে ঘর করলি সংসার করলি, ছেলেপুলে হল, তাদের সকলের মায়া ত্যাগ করে দেশান্তরী হবার মানে? টনক নড়বার হলে অনেক আগে তা নড়ালেই হত, এতদিন বাদে কেন। এতগুলো মানুষকে সংসারে এনে তার পর নিজে উধাও? পুরুষদের আচরণ দেখে আশ্চর্যই হতে হয় কিন্তু।

এখন তার বয়স পঁচিশ। এখন সে দেখতে বেশ সুন্দর অবশ্যই। কিন্তু বয়স যখন তার আঠারো ছিল তখন নাকি আরো সুন্দর ছিল অলকা। তার আর-কোনো ত্রুটি নেই, কেবল লেখাপড়া সে জানে না, আর বাবার আদর সে পায়নি।

তার বিয়ের জন্যে তার মা ব্যস্ত হয়েছেন। এই নিয়ে বাবার সঙ্গে মায়ের প্রায়ই কথা-কাটাকাটি চলে। কিন্তু কি কথা নিয়ে এমন গোলমাল তা কিছুই বুঝতে পারে না সে। তার বিয়ের ব্যাপার নিয়ে কথা, সেইজন্যে সে একটু দূরে-দূরেই থাকে, ওসব কথায় কান করতে চায় না।

বিয়ে বললেই কি বিয়ে, পাত্র পাওয়া যাবে কোথায়। আজকালকার ছেলেরা নাকি রূপ তত চায় না, যত চায় গুণ। অলকার কোনোই গুণ নেই, না-জানে লেখাপড়া না-জানে গান-

বাজনা। সুতরাং বাবা বিয়ের ব্যাপারে কোনো চেষ্টা নাকি করতেই চান না।

একদিন অলকা কুয়োর জল তুলছে। রান্নাঘরে বাবায় মায়ে তখন তুমুল তোলপাড়।

বাবা চীৎকার করে উঠলেন, 'ও আমার কে, যে ওর জন্যে আমাকে মাথা ঘামাতে বলো! আমি নেই ওর মধ্যে।'

"আমি বাবার কেউ নই? শুনে আমি আকাশ থেকে পড়লাম। ইচ্ছে হল কুয়োয় ঝাঁপ দিয়ে পড়ি।"

অলকা কি তবে সত্যিই বেওয়ারিশ, অলকা ভেবে পেল না। বাবার ও কথা বলার মানে কি তা জানার কৌতূহল হল তার। তখন তার বয়স হয়েছে, বুঝতে শিখেছে সে। বাবা-মার কোনো কথায় যে মেয়ে কান দিত না, সেই তখন আরম্ভ করল সব কথায় কান পেতে থাকতে।

অলকা ঘড়ি দেখে উঠে পড়ল, বলল, "আজ এই পর্যন্ত থাক্। বাকিটা আর-এক দিন হবে।"

পরাশরবাবু আদেশ করার মত করে বললেন, "কোনো কাজ অসমাপ্ত রাখতে নেই, অলকা। কোনো কথা আধখানা বলতে নেই।"

অলকা বসে পড়ল। একটু চুপ করে রইল, তারপর বলল, "মায়ের বিয়ের পাঁচ মাস বাদে নাকি আমার জন্ম। কার দৌলতে আমি এত রূপ পেয়েছি বাবা তা জানেন না। বাবা তা জানতে চান।"

বাবার কেউ নয় কেন অলকা, সেইদিন সে তা জানতে পারল।

বাবা আর না বলল সে, তার মায়ের স্বামীই না হয় এবার থেকে সে বলুক। মায়ের চাপে পড়ে তবু তিনি নাকি অলকার বিয়ের জন্যে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন কাগজে, লিখে-ছিলেন—অলকা মুখস্থ করে রেখেছে বিজ্ঞাপনটা, লিখেছিলেন—

অষ্টাদশবর্ষীয়া আমার প্রকৃত সুন্দরী
কন্যার জন্য উপযুক্ত পাত্র চাই।
শ্রীঅমলেন্দু উকিল
পোঃ ত্রিবেণী, হুগলী

অলকা বলল, "দেখুন। কী মিথ্যা বিজ্ঞাপন। আমি যাঁর মেয়ে না, বিজ্ঞাপনে তিনি আমাকে মেয়ে বলেছেন। বিজ্ঞাপনের উপর আমার আর কোনো বিশ্বাস নেই।"

সেই বিজ্ঞাপন ছাপা হবার পর দিন থেকেই নাকি তার বাবা উধাও। সাত বছর হল তাঁর আর খোঁজ নেই।

অলকা বলল, "আমি বেওয়ারিশ। তাই একটু বেপরোয়া হয়ে গিয়েছি। যদি এলো-মেলো কোনো কথা বলে থাকি মাপ করবেন।"

পরাশরবাবুর আর-কিছুই যেন বলার নেই।

কিন্তু অলকার বলার কথা যেন ফুরাচ্ছেই না, উঠে দাঁড়াল সে, বলল, "আমি বাবার কেউ না হতে পারি, মা তো আমার মা, আমরা তিনজন তো এক মায়ের পেটের ভাই-বোন। তাই ডিউটি করতে চলেছি। আপনি বললেন তবু তাই আজ রাতটা আর থাকতে পারলাম না, কিছু মনে করলেন না তো?"

পরাশরবাবু অপ্রস্তুত হয়ে গেলেন।

"আজকের মত তবে আসি।" অলকা হাতজোড় করে নমস্কার করল, বলল, "আমার

কথা মনে রাখবেন কিন্তু।"

পরাশরবাবু কোনো উত্তর দিতে পারলেন না, কেবল দেখলেন—পর্দা সরিয়ে বিদ্যুতের আভার মত একটা সুন্দর অবয়ব অদৃশ্য হয়ে গেল।

মিস হাসনুহেনা

মুখের ডৌল অনেকটা ডল-পুতুলের মত। একেবারে গোলগাল। অনেক শিশুর জন্মদিনে এইরকম মুখের অনেক পুতুল উপহার দিয়েছেন পরাশরবাবু। সেইসব পুতুলের কোনো-একটা থেকে মাথাটা আলাদা করে নতুন একটা শরীরের সঙ্গে যোগ করে নিয়ে এই মূর্তিটা তাঁর সম্মুখে উপস্থিত হয়েছে বলেই যেন মনে হল পরাশরবাবুর।

নিজেকেই বুঝি একটু ব্যঙ্গ করে তিনি মনে-মনে বললেন, বা, এই রকম একজন সঙ্গী পেলে মন্দ হয় না তো! বেশ পুতুল-পুতুল খেলা করা যায় সারাদিন ধরে, সব কাজকর্ম বুঝি ছেড়ে দেওয়াও যায়।

আজ কি পরাশরবাবুর জন্মদিন? তাঁর সঙ্গে তামাশা করে, আর তাঁকে শিশু মনে করে কেউ উপহার-হিসেবে একে পাঠালো নাকি তাঁর কাছে?

গোলগাল মুখটি বেশ পালিশ করা। বেশ চকচক করছে। গালে গোলাপি আভা। চোখের নীচেটা একটু কালচে, বাসী কাজলের চিহ্নও আঁকা আছে চোখের কিনারে।

একটু ঢুলুঢুলু ভাব আছে সেই চোখে। ঠোঁটে রং মাখা। দুটি ভুরু খুব সন্তর্পণে বাঁচিয়ে কপালের মাঝখানে ছোট একটা কালো টিপ। ফর্সা কপালে যুগল ভুরুর সঙ্গে টিপটাও বেশ মানিয়েছে।

বেশ দামী বেনারসীর শাড়ি ঐ সুডৌল শরীরটাকে বেশ বেষ্টন করে ধরেছে। কিন্তু তার সঙ্গে ওই হাল্কা ওড়না তেমন-যেন মানাচ্ছে না। কিন্তু আলাদা ভাবে দেখলে মন্দ লাগছে না। মাথার উপর দিয়ে ঘুরে এসে ওই ওড়না জড়িয়ে ধরেছে ওর গলা। ওড়নার আড়ালে দু কানের দুটি লম্বা দুল দু টুকরো ছায়ার মতন দুলছে।

শরীরে স্বাস্থ্য আছে। এর বেশি বলার দরকার নেই। কিন্তু কোথায় যেন পরাশর-বাবু পড়েছিলেন একটা কথা। একটু ভাবলেন তিনি, একটু খুঁজলেন কথাটা। বেশি খুঁজতেও অবশ্য হল না। পেয়েও গেলেন। তাঁর মনে হল এখানে সেই শব্দটা ব্যবহার করা যেতে পারে। ঘটোধ্নী। চুম্বকপিণ্ডের মতন তাঁর দৃষ্টিকে আকর্ষণ করে ধরার আগেই তিনি দৃষ্টি নত করলেন। মসৃণ শরীর বেষ্টন-করা পিচ্ছিল পরিধেয় বরাবর নীচের দিকে নেমে এসে সে দৃষ্টি কিন্তু আটকে গেল কোমরের খাঁজে। এই জায়গাটা বেশ সরু। কিন্তু তখনি আবার বেশ স্থূল হয়ে অনেকটা যেন হুলুস্থুল করে নেমে গিয়েছে পরিধেয়টা পায়ের দিকে।

টেবিলের চারধার একটা নতুন ধরনের গন্ধে ভরে গিয়েছে। পরাশরবাবুর নাকে এই গন্ধটা বেশ নতুন লাগছে বটে, কিন্তু খুব যে মনোরম লাগছে এমন কথা তিনি বলতে পারবেন না। এতক্ষণে বুঝি খেয়াল হল পরাশরবাবুর, তিনি বললেন, "এ কি, দাঁড়িয়ে রইলেন কেন। বসুন।"

ঠোঁটের কিনারে হাসির রেখা ফুটে উঠল, মিস হাসনুহেনা চোখের কোণে অদ্ভুত কৌতুক তুলে বলল, "বসি। না বললে কি বসতে পারি। অনুমতি করবেন, তবে-না!"

সাধারণ ঐ চেয়ারে ঐ শরীরটা যেন ধরে না। দু-পাশের দুই হাতলে ভর রেখে বেশ আঁটো হয়ে বসল হাসনুহেনা।

পরাশরবাবুর বেশ মজা লেগেছে। তিনি তাঁর সামনের কাগজের দিকে চেয়ে কি-যেন পড়লেন, তার পর নিজের মনেই বলার মতন করে বললেন, "মিস হাসনুহেনা।"

চোখ তুলে চেয়ে ঈষৎ হেসে বললেন, "নামটা বেশ মিষ্টি।"

এ কথা শুনে কেবল প্রীত হওয়া নয়, বিগলিত হয়ে যাবার কথা। কিন্তু হাসনুহেনা একটু হেসে সোজাসুজি পরাশরবাবুর মুখের দিকে চেয়ে বলল, "শুনতে ভালোই লাগল। ভালো-লাগাটা অভ্যাস হয়ে গিয়েছে কিনা! কিন্তু বহুৎ পুরনো কথা। বিস্তর শোনা কথা।"

"অনেক শুনেছেন বুঝি?"

"অনেক। অনেক। কিন্তু আমাকে অমন আপনি-আপনি করছেন কেন। এটা কিন্তু একদম নতুন লাগছে।"

"নতুন লাগছে বুঝি?" পরাশরবাবু হাসলেন, "সবই পুরনো কথা বলব কেন। দু-একটা নতুন কথাও তো বলা দরকার। কেমন কিনা!"

"দরকার তো বটেই। মানুষ নিত্যই নতুন খোঁজে, নতুনের একটা কদর আছে বলেই-না! পুরনো নিয়ে পড়ে থাকতে কে চায় বলুন!"

পরাশরবাবু কিছুক্ষণ কি-যেন ভাবলেন, তার পর বললেন, "আপনি, থুড়ি, তুমি—তুমিও বুঝি চাও না পুরনো নিয়ে পড়ে থাকতে?"

"কী জানি!" হাসনুহেনা একটা হাই তুলতে গিয়ে থেমে গেল, তারপর বলল, "চাই কি না-চাই, তার আর যাচাই হল কোথায়? ফুরসৎ পেলেম কোথায়?"

কিন্তু ওসব কথা থাক্। এখন কাজের কথায় আসতে চান পরাশরবাবু। তাই তিনি বললেন, "যে কাজের জন্যে এসেছ, সে সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা মানে এক্স্‌পিরিয়েন্স, ইয়ে আর কি—সেসব কাজ জানা আছে তো?"

"আছে। জানা না থাকলে কোন্ ভরসায় এলাম!" বেশ আত্মবিশ্বাস নিয়ে বলল হাসনুহেনা।

আর, আসা মানেই তো আসা নয়। এই রকম সময়ে, সকালবেলা ন'টার মধ্যে এসে পেঁছনো, এটা কতটা কঠিন কাজ তা পরাশরবাবু বুঝতে পারবেন না। এই সময়টা তো তাদের কাছে গভীর রাত। এই সময়ে তারা অকাতরে ঘুমিয়ে থাকে। সারা শহরের ঘরে-ঘরে যখন রাত-নিশুতি, তাদের কাছে তখন সেই সময়টা দিন-দুপুর। তবু, এত সকালে সে যে এল, সে কি কেবল শুধু-শুধু। গরজ কি তার নেই? জানা কি নেই তার এই কাজ? খুব আছে, খুব আছে। যে ধরনের কাজের জন্যে এখানে আসা সেই কাজই তো তাদের নিত্যের কাজ। সেবা করা, যত্ন করা।

পরাশরবাবু যেন অবাক হয়ে গেলেন, কী বলে পুতুল-পুতুল-দেখতে এই মেয়েটা?

হাসনুহেনা হেসে বলল, "পুরুষমানুষ তো আমাদের খেলনা। তারা তো আমাদের হাতের পুতুল। তাদের যদি যত্ন না করি তাহলে তাদের দশা কি হবে বলুন।"

পরাশরবাবুকে একেবারে যে ভাবিয়ে তুলল এই মেয়েটা। সে কি তবে এখানে এসেছে একটি খেলনা নিয়ে খেলা করতে? মনে-মনে হাসতে লাগলেন পরাশরবাবু। হাসনুহেনাকে আরও ভালো করে দেখতে লাগলেন তিনি। এই রকম একজন রমণীর হাতে নিজেকে ছেড়ে

দিলে কি রকম মজার ব্যাপার হবে, তাই বুঝি ভাবতে লাগলেন তিনি। এক মুহূর্তের মধ্যে মনে-মনে কল্পনা করে নিলেন পরাশরবাবু যে, তিনি নিজেকে এর হাতে ছেড়ে দিয়েছেন সেই নিশুতি রাতে, যে সময়টা নাকি ওদের কাছে দিন-দুপুর। সমস্ত অঙ্গের ঐ শৌখিন সাজ খুলে ফেলে একটি সামান্য আটপৌরে শাড়িতে শরীর ঢেকে নিয়ে হাসনুহেনা তাঁকে যেন এসে বলছে, 'একটু দুধ দেব?' ওই কথা ভাবামাত্র পরাশরবাবুর শরীর যেন শিউরে উঠল। মুখ দিয়ে কেবল উচ্চারণ করলেন, "খেলনা।"

হাসনুহেনা হাসতে লাগল, তার কাঁধ-দুটো ঐ হাসির ধাক্কায় দুলে-দুলে উঠল, বলল, "কথাটা খুব মনে লেগেছে বুঝি?"

"মনে না, মাথায়। মাথায় একটা জোর ধাক্কা দিয়েছে। ভাবছি, তোমার হাতের খেলনা হয়েই যাব নাকি!" কথাটা শেষ করেই পরাশরবাবু বেশ শব্দ করে হেসে উঠলেন।

তাঁর হাসির শব্দ শুনে ফণিভূষণ দরজা পর্যন্ত ছুটে এসে উঁকি দিয়ে বলল, "কিছু বলছেন, সার্?"

"হ্যাঁ। জল। দু গ্লাস জল পাঠিয়ে দাও।"

পরাশরবাবুর কথা শুনে খিলখিল করে হেসে উঠল হাসনুহেনা, হাসি থামিয়ে বলল, "খুব তেষ্টা পেয়েছে বুঝি? দুই গেলাশ?"

"তুমিও তো খাবে।"

"বয়ে গেছে। জলের আবার খায় কি! তা ছাড়া, আমাদের অমন কথায়-কথায় তেষ্টা পায় না।" একটু থেমে হাসনুহেনা মুচকে হেসে বলল, "পুরুষমানুষ তো নই, ওদেরই ছাতি সব সময়ই ফাটছে। কথায়-কথায় শুধু তেষ্টা।"

দুটো শৌখিন গ্লাসে জল রেখে গেল বেয়ারা। গেলাস-দুটোর গা বেশ ঝাপসা।

হাসনুহেনা বলল, "সোডা নাকি? সোডা হলে খাই।"

"এটা সোডা না। জল।"

"তবে অমন ঘোলাটে দেখতে যে।"

"ঠাণ্ডা কিনা, তাই? সোডা খাবে? দিতে বলব?"

"না। দরকার নেই। সোডা খেয়ে-খেয়ে পেট পিছল হয়ে গিয়েছে। যতক্ষণ না খাই ততক্ষণই ভালো।"

ছোট ছোট চুমুকে পরাশরবাবু জল যেন খেলেন না, চাখলেন। হেসে বললেন, "তোমাকে কিন্তু আমার খুব পছন্দ হয়েছে।"

এ কথার বেশ মজাদার জবাব পাবেন বলে আশা করেছিলেন পরাশরবাবু, কিন্তু হাসনুহেনা কোনো উত্তর দিল না। স্তব্ধ হয়ে বসে রইল। মাথা নীচু করে বসে-বসে কে-যেন ভাবতে লাগল। অনেকক্ষণ চুপ করে থাকার পর বলল, "পছন্দ সত্যিই হয়েছে কিনা জানিনে। কিন্তু আপনি যেমন চেয়েছেন আমি তেমনটি কিনা বলুন। আপনি চেয়েছেন স্বাস্থ্যবতী, স্বাস্থ্য আমার আছে কিনা দেখুন। না, হাসির কথা না। আপনি চেয়েছেন সুশ্রী, আমি বোধ হয় তারও বেশি—আমি সুন্দরীও। আপনি চেয়েছেন নির্ঝঞ্ঝাট, আমার কোনো ঝঞ্ঝাট নেই। বয়স চেয়েছেন চল্লিশ, কিন্তু এইখানে আমার হার, আমার বয়স কিছু কম—এখন আমি চৌত্রিশ। কি, অমন করে চেয়ে রইলেন কেন। বলুন-না, পছন্দ সত্যিই হয়েছে কিনা!"

"বললাম যে, খুব পছন্দ হয়েছে। বিশ্বাস হল না?"

"না। অমন কথা সব্বাই বলে, প্রত্যেকে বলে। ওটা পুরুষদের মুখের লব্জ। বিশ্বাস করি নে। বিশ্বাস করার ভান করি। কিন্তু আপনার কাছে তো ভান করতে আসিনি! তাই জিজ্ঞাসা করছি, যা বললেন তা সত্যি কিনা!"

পরাশরবাবু নড়ে-চড়ে বসলেন, বললেন, "সে কথা পরে হবে। কিন্তু তুমি তোমার ঐ সুখের জীবন ছেড়ে এ কাজ নিতে চাও কেন, বলো তো! এতদিনের একটা অভ্যাস, তা ছাড়তে পারবে?"

খুব শক্ত প্রশ্নই করেছেন পরাশরবাবু। এ জীবন কি ছাড়া যায়? যায় না। ছাড়তে মায়া হয়, সেও একটা কথা বটে, কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা—ছাড়ার উপায় নেই। এই রকম জীবন নিয়ে যাদের জীবিকা, তাদের কাছে দোস্‌রা কোনো জীবিকার পথ নেই। কেউ তাদের নেয় না, কেউ তাদের চায় না।

এমন সুচারু আর সুন্দর মুখখানা, পুতুল-পুতুল দেখতে এই-যে মুখের আদল, সে মুখখানা হঠাৎ কেমন-যেন কালো হয়ে গেল। হঠাৎ কেমন বিষণ্ণ হয়ে গেল। লক্ষ করলেন পরাশরবাবু, কিন্তু কোনো মন্তব্য তিনি করলেন না।

হঠাৎ বলেই ফেললেন তিনি, "তবে এ জীবিকায় না এলেই পারতে। এতই যখন জ্ঞান।"

"উপদেশ দিচ্ছেন বুঝি আমাকে? কতজনের কত উপদেশই শুনলাম জীবনে। শুনে-শুনে কান পচে গেল।"

কথাগুলো বলছে বেশ চোখা-চোখা, পরাশরবাবুর গায়ে একটু-একটু তা বিঁধছে, কিন্তু তিনি এতে অস্বস্তি বোধ করছেন না। তিনি যেন প্রস্তুত হয়েই নেমেছেন, তিনি যেন প্রস্তুত হয়েই আছেন সব-কিছুর জন্যে।

পরাশরবাবু বললেন, "উপদেশ তবে থাক্‌। দেশ বলো। তোমার দেশ কোথায়? কবে এলে, কি করে এলে—"

"কোথায় এলাম? এই লাইনে?" যার মুখ একটু আগে ছিল বিষণ্ণ, সেই কিনা তার মুখের সেই কালো ছাপ মুহূর্তের মধ্যে মুছে ফেলে আশ্চর্য সুন্দর ভাবে হেসে উঠল, বলল, "আমার জীবনের কথা শুনতে চান মনে হচ্ছে যেন। জীবনের কথা সকলেই শুনতে চায়, যে আসে সেই শুনতে চায়। প্রায় রোজই বলতে হয় এককথা। বানানো কথা। জীবনের সত্যি কথা কি কখনো বলেছি, না, বলব। কখনোই না।"

"কেন। বলতে দোষ কি।"

দোষ নেই বটে, দরকারও নেই। পুরুষদের ওটা একটা ফ্যাশান। যেন কত ভালো-বেসে ফেলেছে, যেন কত দরদ; জীবনের কথা জেনে যেন একেবারে ধন্য করে দেবে, যেন একেবারে উদ্ধার করে নিয়ে যাবে। কত শপথ করে, কত আশা দেখায়, কত ভরসার কথা বলে। তারা যদি এতই মিথ্যে আর মেকি, তবে তাদের কাছে সাচ্চা কথা বলার দরকার কি! বানিয়ে-বুনিয়ে যেমন-তেমন কথা বলে পাঁচটা মিনিট তাদের ভুলিয়ে রাখতে পারলেই হল, তার পর তো তাদের আর হুঁশ থাকে না। মাতাল হয়ে হুঁশ হারায় যারা তাদের কথা আলাদা, কিন্তু মাতাল না হয়েও যারা হারায় তারা যে কি রকম মারাত্মক জন্তু তা বলে বোঝাতে পারবে না হাসনুহেনা।

হাসনুহেনার আগের নাম নাকি হেনা। যখন ভদ্রঘরের মানুষ সে ছিল তখন তার নামটাও ছিল ভদ্র; কিন্তু সে ঘর যখন ছাড়ল তখন বদলে নিল নামটা, একটু চটকদার করে

নিল নিজের নাম।

এসব লাইনে যেসব মেয়ে আসে তাদের জীবনের ঘটনা সবারই প্রায় নাকি এক। হাসনুহেনার মুখ থেকে তা না শুনে পরাশরবাবু নিজের ইচ্ছেমতন যদি বানিয়ে নেন তাহলেও তা বেশ মানিয়ে যাবে। আগে তাকে ভদ্রঘরের একটা মেয়ে মনে করে ধরুন, তার পর পল্লীর দাদার বা অন্যকারুর সঙ্গে তাকে জুড়তে দিন। তার প্রলোভনে তাকে ঘর থেকে বের করে আনুন। তারপর দোষ চাপান্ সেই পুরুষটার উপরে, সে তাকে বেইজ্জৎ করে তারপর তাকে ফেলে পালাক, কিংবা তাকে কোনো নষ্টমেয়ের জিম্মায় রেখে চম্পট দিক।—কিন্তু এসব ভুয়ো কথা। মেয়েরা এ পথে আসে বেশির ভাগই নিজের গরজে, কিসের গরজ সেটা তাও কি খুলে বলতে হবে? এ ঘরে কেউ নেই, খুলে বলতেই বা দোষ কি! কিন্তু দিনের আলোয় এমন মুখোমুখি বসে কেবল ঠাণ্ডা জল খেয়ে সে কথা নাকি বলা যায় না।

হাসনুহেনা আশ্বাস দিয়ে বলল, "কিন্তু, বলব, বলব। একদিন সব কথা আপনাকে খুলে বলব। এসব লাইনের সঙ্গে আপনার পরিচয় নেই বলে মনে হচ্ছে যেন!"

পরাশরবাবু নিজের জীবনকে একটা পরিষ্কার আর পরিচ্ছন্ন জীবন বলে দাবি করেন না, তাঁর জীবনে অনেক ঘটনা ও দুর্ঘটনা অবশ্যই আছে, কিন্তু যে লাইনের কথা হাসনুহেনা বলছে সে লাইনে কখনো তাঁর যাওয়া হয়নি। হয়তো সুবিধে হয়নি বা সুযোগ হয়নি কিংবা বেলাইনে চলে গিয়েছিলেন বলেই হয়নি যাওয়া। কিন্তু তা না হোক, মনে-মনে তিনি একটু হেসে ভাবলেন, তিনি না যান, কিন্তু সেই লাইনটিই তো এসে আজ বেশ হাজির হয়েছে তাঁর ডেরায়। বললেন, "পরিচয় নেই বলে আক্ষেপ হচ্ছে।"

"ঠাট্টা করলেন তো?"

ঠাট্টার মত শোনালো নাকি তাঁর কথা? পরাশরবাবু একট বিচলিত হয়ে উঠলেন, "না, না। ঠাট্টা না। মনে হচ্ছে অনেক-কিছু জানা যেত যদি পরিচয় থাকত।"

"ছাই জানা যেত। এক রাত্তির ওই তল্লাটে পায়চারি করে এলে কিছু জানা যায় না। ওখানকার মেয়েরা কাঁচিখুকি না। মনে হয়, প্রাণ উজাড় করে সব বলে যাচ্ছে, কিন্তু যা বলে তা ছাই।"

লোকে চাঁদে যাচ্ছে চাঁদ চিনতে—হাসিই পায় নাকি এই হাসনুহেনার। কিন্তু শহরের এই কয়েকটা পল্লীতে এই-যে বসে আছে চাঁদের হাট, তাদের চিনবে—এমন গরজ নেই কারও। বেলের উপর কাকেরা যেমন ঠোকর মেরে চলে আসে, ভিতরে ঢুকে তার শাঁস চিনতে চায় না, লম্পট পুরুষেরাও ঠিক অমনি। ওরা নাকি শুধু ঠুক্‌রে-ঠুক্‌রে বেড়ায়।

নিশ্বাস ফেলল হাসনুহেনা, বলল, "আমাদের কেউ চিনল না, এই আমাদের দুঃখ।"

কত মানুষ এল আর গেল তার বিশ বছরের এই জীবনে, তা কি হিসেব করে বলা যায়? যায় না। কত জ্ঞানী লোক এল, কত গুণী লোক এল। কত হীন লোক এল, কত নীচ লোক এল। কত শিক্ষিত এল, কত অশিক্ষিত এল। "কিন্তু জানেন, যখন নিরিবিলিতে তাদের নিজের রূপ প্রকাশ হয়ে পড়ে তখন সব এক। কোথায় যায় জ্ঞান, কোথায় যায় গুণ। অন্য ধরনের মানুষের সঙ্গে একেবারে একাকার হয়ে যায় তারাও।"

"নিজের অভিজ্ঞতা থেকে নিশ্চয় বলছ সব কথা।"

হাসনুহেনা হাসার মত ভঙ্গি করল, বলল, "না। অভিজ্ঞতা থেকে বলব কেন। সব আমার শোনা কথা।"

পরাশরবাবুও একটু হাসার চেষ্টা করলেন, বললেন, "ঠাট্টা করলে বুঝি আমাকে?"

"কী আশ্চর্য!" চমকে ওঠার মতন করল হাসনুহেনা, বলল, "কী আশ্চর্য! এমন আমার সাহস! ঠাট্টা করব আপনাকে? আমি না এখন আপনার দ্বারস্থ—আমি আপনার কাছে এসেছি কেন তা কি ভুলে গেছি আমি?"

কিন্তু হঠাৎ চাকরির দিকে এমন ঝোঁক হল কেন তার। যেভাবে জীবনের দিনগুলো তার কাটছে তা তো বেশ। কত বিচিত্র রকম মানুষের সঙ্গে দেখা হচ্ছে, লোভের বশে মানুষ কত নীচে নামতে পারে তা প্রত্যহ জানা যাচ্ছে। এ তো একটা বেশ উত্তেজনা—

বাধা দিয়ে হাসনুহেনা বলল, "প্রথম-প্রথম ঐ জিনিসটা বেশ ছিল কয়েক বছর—আপনি যাকে বললেন উত্তেজনা, সেই জিনিসটা। তারপর একই রকমের ভিড় রোজ, সেই ভিড় ঠেলতে ঠেলতে সর্বাঙ্গ ভোঁতা হয়ে গিয়েছে। এখন যা চলা তা অভ্যাসে চলাও বলতে পারেন, আবার কলের পুতুলের মতন চলাও বলতে পারেন।

"বুঝেছি, চাকরি তোমার একটা চাই-ই। কিন্তু ধরো, চাকরি তোমার হল না, তখন কি করবে?"

"আত্মহত্যা করব না নিশ্চয়।" একটু হেসেই বলল হাসনুহেনা, "কিন্তু, কিন্তু কী ভাবে বেঁচে থাকা যাবে তার পথ খুঁজব।"

"সেটা আবার কি রকম?" পরাশরবাবু একটু বুঝি আতঙ্কিতই হয়েছেন, সেইভাবে জিজ্ঞাসা করলেন কথাটা।

হাসনুহেনা খুব হাসতে লাগল, যেন বেশ একটা মজা হয়েছে। তার শরীর দুলে-দুলে উঠতে লাগল। হাসি থামিয়ে সে বলল, "নিজের পরিচয় লুকিয়ে ফেলব। আবার হেনা হয়ে যাব। হয়তো আপনারই পাড়ায় একটা ঘরভাড়া নেব। থাকব ভদ্র সেজে, আর গোপনে-গোপনে করব—"

"থাক্। বুঝেছি।" তাকে বাধা দিলেন পরাশরবাবু, বললেন, "পেটে-পেটে এইসব মতলব আছে বুঝি?"

বাঁচার জন্যে মানুষ কী না করে? মানুষের বাঁচার অধিকার তো আছে। যাদের ফিরিয়ে নেবার সাধ্য নেই কারও, সমাজে যাদের জায়গা হবে না—তারা নিজের মতন থাক্, এটুকু সুযোগও যদি কেড়ে নেওয়া হয় তাদের কাছ থেকে, তাহলে তারা কি করবে?

একে-একে অনেকের নাম করতে লাগল হাসনুহেনা। তাদের পল্লীর অনেক মেয়ের নাম। তারা নাকি একে-একে সবাই পালিয়েছে হল্লার ভয়ে। হল্লা কাকে বলে তাও বুঝি জানেন না পরাশরবাবু? সত্যি, এমন আনাড়ি লোক নিয়ে বড় বিপদেই পড়েছে হাসনুহেনা।

হাসনুহেনা বলতে লাগল অনেক কথা। তার মুখে এখন যেন কথার খই ফুটছে। অনেক জ্ঞানী-গুণী লোকের সঙ্গে তার দেখা হয়েছে, এমনি একজনের কথা সে বলতে লাগল, বলল, "দোহাই, নাম জিজ্ঞাসা করবেন না। তিনি খুব নামী লোক, খুব মানী লোকও। খুব নাম-ডাক তাঁর।"

এই ভদ্রলোক নাকি তার কাছে খুব যেতেন; তাদের মধ্যে এমন ভাব হয়ে গিয়েছিল যে, আশপাশের ঘরের মেয়েরা ঠাট্টা করে তাদের বলত—স্বামীস্ত্রী। তাঁর কাছ থেকেই একদিন হাসনুহেনা শুনেছে যে, যে-ব্যবসা করে সে খাচ্ছে সেইটেই নাকি পৃথিবীর সবচেয়ে পুরনো ব্যবসা। পৃথিবীতে অন্য কোনো জিনিসের কেনা-বেচা যখন আরম্ভই হয়নি, তখনই নাকি আরম্ভ হয়ে গিয়েছে পৃথিবীতে প্রথম এই কাণ্ড।

পরাশরবাবু বললেন, "হ্যাঁ, হ্যাঁ। জানি। একে তাই বলে ওয়ার্লড্স্ ওল্ডেস্ট ট্রেড।"

"ইংরেজি জানিনে। বাংলায় বলুন।"

পরাশরবাবু বললেন, "দুনিয়ার সবচেয়ে পুরনো বাণিজ্য। এবার ঠিক হল তো?"

সেই মানী ভদ্রলোকটি হাসনুহেনাকে অনেক জ্ঞান নাকি দিতেন। জ্ঞান তো দেবেনই, তিনি যে জ্ঞানী লোক। এই বাণিজ্যের পত্তন যে পৃথিবীতে হয়েছিল এটা নাকি পৃথিবীরই সৌভাগ্য। এতে নাকি সমাজ বেঁচে গিয়েছে। তা না হলে নাকি ভীষণ কাণ্ড হয়ে যেত। সমাজের প্রত্যেকটি খোপে খোপে নাকি ঢুকে পড়ত পাপ, ঢুকে পড়ত ক্লেদ। এই ব্যবসাটা আছে বলেই সমাজ নাকি নিজের মনে নিশ্চিন্তে থাকতে পারছে। কেননা, এটা-যে সেই সমাজ থেকে আলাদা করে রাখা আর একটি সমাজ। আসল সমাজের গায়ে আঁচ লাগছে না। কিন্তু—

হাসনুহেনা একটু থামল, বলল, "আসল সমাজ বেঁচে যাচ্ছে বটে, কিন্তু পুড়ে ছারখার হয়ে যাচ্ছে এই নকল সমাজটি। সে খোঁজ কিন্তু কেউ রাখে না। ঐ মান্য মানুষটিও বুঝি না।"

পৃথিবীকে বিষ থেকে রক্ষা করার জন্যে মহাদেব নাকি সব বিষ একাই শুষে নিয়েছিলেন? তাঁর গলার রং তাই নাকি বিষে-বিষে নীল হয়ে গিয়েছে? এইজন্যেই নাকি তাঁর নাম নীলকণ্ঠ?—অতশত জানে না হাসনুহেনা; কিন্তু এটা ঠিকই জানে যে, সমাজে-সংসারে যে ধরনের পুরুষেরা বাস করে তাদের বাসনার বসবাসের জন্যে যদি আলাদা বাসার বন্দোবস্ত না থাকত তাহলে তারা নিজেদের ঘরেই আগুন দিত এতদিনে। মানুষে নর্দমায় যেমন নোংরা ফেলে আসে, ঘরের আবর্জনা যেমন বাড়ির-বার করে দেয়, তেমনি যত নোংরা আর যত রাবিশ আসল সমাজের বাইরে রাখার জন্যে এই ব্যবস্থা—পৃথিবীর সবচেয়ে পুরনো এই বেচাকেনার কাণ্ড।

বিষে-বিষে শরীর বিষিয়ে ওঠে না তাদের—কেননা, অভ্যাস হয়ে গিয়েছে। কিন্তু মন বিষিয়ে ওঠে এক-এক সময়, এত অভ্যাস সত্ত্বেও। মন তার এখন খুবই বিষিয়ে উঠেছে নানা কারণে, তাই সে খবরের কাগজে বিজ্ঞাপনটি দেখেই একটা লম্বা আর্জি করেছে পরাশরবাবুর কাছে, তিনি রাখলে রাখতে পারেন, আর না যদি রাখেন তবে অন্য রাস্তা দেখতে হবে হাসনুহেনাকে।

"কি, আত্মহত্যা করবে নাকি?"

"আ, মরণ!" হাসনুহেনা বলে উঠল, "মরতে যাব কেন। নিজের হাতে নিজেকে মারতে নেই, ওতে পাপ হয়। অনেক পাপ করেছি, আর পাপের বোঝা বাড়াব কেন।"

"যা করছ তাকে পাপ বলে মনে করো বুঝি?"

"আমরা কে?" হাসনুহেনা উত্তর দিল, "আমাদের কি মন বলে কোনো জিনিস আছে, না, থাকতে হয়? যা নেই তা নিয়ে আবার কথা কেন। আপনারা কি মনে করেন? এটা পাপ—না?"

পরাশরবাবু এর কোনো উত্তর দিতে পারলেন না।

হাসনুহেনাই বলল, "যারা আমাদের নিয়ে পাপ করে তারাই বলে আমরা পাপী। আমরা আমাদের নিজের কথা কি কখনো বলেছি, না, বলতে পেরেছি?"

হাসনুহেনার চোখ-দুটো একটু যেন ছলছল করছে? এতে আশ্চর্য হবার অবশ্য কিছু নেই। ওরা হাসতেও যেমন পারে, দরকার-মত কাঁদতেও পারে তেমনি। কত রকম অভিনয়ই তো ওরা করে। কত নাটক, কত ড্রামা, কত তামাশা ওরা নিত্যই করে চলেছে।

ওসব নিয়ে মাথা ঘামানোর কোনো দরকারই নেই। তবু, তবু, পরাশরবাবু ওর মুখের দিকে চেয়ে বললেন, "ও কি, হঠাৎ চোখে কি হল?"

"কিছু না।" বলে আঁচলের কোণ দিয়ে চোখ-দুটো রগড়ে নিয়ে হাসনুহেনা বলল, "আপনার চোখে পড়ে গিয়েছে তবু, লজ্জা পেলাম। কিন্তু আমাদের চোখের দিকে কেউ তাকায় না, আপনিই বা অমন তাকাতে গেলেন কেন, লজ্জা নেই বুঝি আপনারও? আমাদের শরীরে বুঝি কেবল চোখ-দুটোই আছে, অন্যকিছু নেই দেখবার মতন?"

অনেকক্ষণ চুপ করে বসে রইল হাসনুহেনা। তাকে কোনো কথা বলতে না দেখে খুব অস্বস্তি বোধ করছেন পরাশরবাবু। চুপচাপ ওভাবে অকারণে মুখোমুখি বসে থাকা, এর কোনো মানে হয়?

খুব বিপদেই পড়ে গিয়েছেন পরাশরবাবু। এমন একটা খুবসুরত চেহারা চোখের সামনে থাকলে মন্দ লাগে না বটে, কিন্তু এটা রক্তমাংসের শরীর না হয়ে যদি একটা রঙিন ছবি হত তাহলে বেশ খুশিমনেই তিনি তাঁর শোবার ঘরের দেয়ালে টাঙিয়ে রাখতেন।

হঠাৎ হাসনুহেনা বলে উঠল, "আমাকে রাখলে আপনার কিন্তু কোনো লোকসান হবে না।"

"কি রকম?"

"ভদ্রলোকের ইজ্জৎ বাঁচাতে আমরা জানি। সে ট্রেনিং আমাদের আছে।"

পরাশরবাবু হেসে বললেন, "তুমি ইংরেজিও জান দেখছি।"

"ওটুকু জানি। দু-একটা কথাও যদি না জানব, তবে আপনাদের মানমর্যাদা রাখব কি দিয়ে? আর কীই-বা পুঁজি আছে! আর, আপনাদের মতন লোকের সঙ্গে কথাই-বা বলব কি করে!"

মানুষের মানমর্যাদা বাঁচিয়ে-বাঁচিয়ে চলতে-চলতেই তাদের জীবন নাকি কেটে যাচ্ছে। সারারাত যারা ফুর্তি হৈহুল্লোড় করে চলে গেল তাদের সম্বন্ধে সবই তো জানা হয়ে যায়, অনেক সময় তাদের হাঁড়িহেঁশেলের সব কথাও। কিন্তু আজ পর্যন্ত একজন মানুষকেও হাসনুহেনাদের মত কোনো নষ্ট মেয়েমানুষ তার ঘরসংসার নিয়ে বেকায়দায় কি কখনো ফেলেছে। যেসব বেবুদ্ধি লম্পটেরা নিজের ঘরসংসার নিজের ইচ্ছেয় ভাসিয়ে দিয়ে চলে এসেছে তাদের কথা বলছে না হাসনুহেনা। সে বলছে অন্যদের কথা। ইচ্ছে করলেই তারা চড়াও হয়ে মিথ্যেবাদী পুরুষদের মুখোশ খুলে দিতে পারে, তাদের বৌয়ের কাছে গিয়ে হাজির হতে পারে, হাজির হতে পারে তাদের আপিসে গিয়েও। কিন্তু তা তারা করে না।

এমনকি, বিস্তর-চেনা মানুষের সঙ্গে পথেঘাটে মুখোমুখি দেখা হয়ে গেলেও তাদের যেন চেনে না, এইভাবে মুখ ঘুরিয়ে চলে যায়। কিন্তু পুরুষরা এমন বেকুব কেন তা বুঝতেই পারে না হাসনুহেনা। এক রাত্তিরে এমনি এক পুরুষ এসে তেড়ে ধরেছিল তাকে, বলেছিল, 'কি, চিনতেই পারলে না সেদিন? সিনেমা দেখে ফিরছিলাম। হাতিবাগানের মোড়ে দেখি তরলিকা আর দীপ্তিকে নিয়ে ডগমগ করে চলা হচ্ছে।' তার এ কথার নাকি কোনো উত্তর দেয় নি হাসনুহেনা।

হাসনুহেনা বলল, "আমাদের লাইনের এটা নিয়ম। আমরা আমাদের চিনি। মানুষে আমাদের কী চোখে দেখে তা আমরা জানি। জানি বলেই আমরা সাবধানে চলি।"

একটু থেমে বলল, "আমরা যদি এতই ঘেন্নার, তবে আমাদের নিয়ে এত মত্ত হয় কেন মানুষেরা? তারা কি খ্যাপা, না, তাদের মাথায় কেবল গোবর?"

নিজের মাথায় একবার হাত বুলিয়ে নিয়ে পরাশরবাবু বললেন, "যাক্ গে। মাথামুণ্ডু ভেবে কি করবে। যে কাজ করছ, করে যাও।"

না। সত্যিই। মাথামুণ্ডু ভেবে কোনো লাভ নেই, যার যা কাজ তা করে যাওয়াই ভালো। যার যা কাজ তাকে তা করতে দেওয়াই ভালো। কিন্তু কেউ যদি এই কাজের বাধা হয়ে দাঁড়ায়, তবে তার প্রতিকার কি? পৃথিবীটাকে একেবারে পালিশ করে একেবারে পিরিচের মতন শৌখিন করে দেবার যাদের ইচ্ছে, তাদের সম্বন্ধে কী বলা যেতে পারে? পৃথিবীতে পাহাড়-পর্বত যেমন থাকবে, নদীনালা যেমন থাকবে, খানাখন্দও তেমনি থাকবে। এসব আছে বলেই পৃথিবীতে বাস করা যাচ্ছে। পাহাড় ভেঙে তার গুঁড়ো দিয়ে খানাখন্দ নদীনালা ভরাট করে নিলে সব বেশ প্লেন হয়ে যায়, সব বেশ সমতল, সব বেশ সমান। ধরা যাক, এসব করা গেল। তখন পৃথিবীর চেহারাটা কেমন হবে? হয়, একটা টেকো মাথার মতন দেখাবে, না হয় একটা বিরাট কৎবেলের মত। এরকম ন্যাড়া পৃথিবীতে বাস করতে বোধহয় কেউই চাইবে না। অন্তত এই রকম তো মনে হয় হাসনুহেনার।

কিন্তু, পরাশরবাবু ভাবছেন, এত কথাই বা এ শিখল কোথায়, আর, এত কথাই-বা হঠাৎ উঠল কেন। এসব কথার উত্তর তিনি পেলেন না বটে, কিন্তু এত কথা গুছিয়ে যে বলতে পারে তার সম্বন্ধে তাঁর একটু বিস্ময় হল। তাঁর মনে হতে লাগল—মানুষের জীবন ও তার জীবিকা নিশ্চয় দুটি আলাদা জিনিস। কত ট্র্যাজিডিই তো ঘটে সংসারে, মানুষ বাধ্য হয়ে যে জীবিকা নেয় তার জীবন তাতে কখনো সায় দিতে পারে না। তখন ঐ দুইয়ে চলে সংঘর্ষ। বসে-বসে মানুষ তার ট্র্যাজিডি নিয়ে রোমন্থন করে। তাঁর সম্মুখে কেবল স্থূল হয়ে নয়, হুলস্থূল হয়ে বসে আছে যে মানুষটি সেও বুঝি অমনি-একটা ট্র্যাজিডির ভিক্‌টিম। সমাজে আর সংসারে তার জন্যে একটা স্তর নির্দিষ্ট হয়ে গিয়েছে; কিন্তু আসলে সে কোন্ স্তরের জীব তা কে বলবে। নিজেকে নিয়ে নিশ্চয় ও অনেক ভেবেছে, নিজের জীবন নিয়ে আর জীবিকা নিয়ে। এত ভাবনার ফলেই বোধ হয় তার মুখ দিয়ে এত কথা বেরিয়ে গেল।

পরাশরবাবু চুরুট ধরালেন, ধোঁয়া ছাড়লেন। অবশেষে তিনি বললেন, "বেশ বলেছ।"

তারিফ শুনেও কোনো মন্তব্য করল না হাসনুহেনা। স্থির হয়ে বসে রইল। তার বসার রকম দেখে মনে হল তার বুঝি উঠবার আর ইচ্ছে নেই। সে যেন এখানেই থেকে যাবার জন্যে একেবারে তৈরি।

খুব অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন পরাশরবাবু। কিন্তু কিছুই তাঁর বলার নেই। আজকের মতন তাদের কথা যে শেষ হয়েছে তা জানান্ দেবার মতন কথাটাও তিনি ঠিক খুঁজে পাচ্ছেন না।

"শুনছি।" হাসনুহেনা গলাটা একটু পরিষ্কার করে নিয়ে বলল, "শুনছি, আইন করে নাকি বন্ধ করে দেওয়া হবে এই কাজ। তাহলে বেশ হবে।"

"ভালোই হবে তাহলে, কি বলো?" বেশ সহানুভূতির গলায় বললেন পরাশরবাবু, বললেন, "তাহলে তোমরা বেঁচে যাবে, সব আক্ষেপ দূর হয়ে যাবে তাহলে।"

কিন্তু পৃথিবীর সবচেয়ে পুরনো এই পাপকে ওভাবে মুছে দেওয়া সম্ভব কিনা সে বিষয়ে কিছু চিন্তা না করেই ঐ মন্তব্য করলেন পরাশরবাবু।

"তা যাবে। সব আক্ষেপ দূর হয়ে যাবে। আমরা মইয়ে চড়ে একটু উঁচুমহলে উঠে যাব। কিন্তু তার ফল কি হবে তা ভেবে দেখেন নি সেই জ্ঞানী মানুষটি।"

"কার কথা বলছ?"

"ঐ-যে, যিনি আমাকে অনেক জ্ঞান দিতেন। যিনি এখন একজন বিস্তর নামজানা লোক। বেদবাক্যের মতন জ্ঞান করে যাঁর কথা সকলেই।"

হাসনুহেনা কার কথা বলছে বুঝতে পারছেন না পরাশরবাবু, কিন্তু তাঁর নাম জানতে চাওয়াও তো ঠিক হবে না। সে নাম বলতে চায় না হাসনুহেনা।

সেই মান্য ব্যক্তিটি কিছুকাল থেকে নাকি বলে বেড়াচ্ছেন যে, এই ব্যাবসা বন্ধ করে না দিলে সমাজের নিস্তার নেই।

কাগজে-কাগজে তিনি এসব নিয়ে অনেক লিখে লিখে সবার টনক নড়িয়ে দিয়েছেন। তার ফলে সকলে হুঁশিয়ার হয়ে গিয়েছে, পাড়ায় পাড়ায় বেড়ে চলেছে হল্লা। যারা শান্তিতে নিজের নিজের কাজ করে যাচ্ছিল তাদের মনে ঢুকেছে অশান্তি। পাড়ায় পাড়ায় আরম্ভ হয়েছে হামলা। একে-একে সকলে ঘর ছেড়ে পালাতে শুরু করে দিয়েছে।

ছেলেছোকরা আর ক'জন যায় তাদের কাছে? যারা যায় তারা বেশির ভাগই বিবাহিত আর বয়স্ক। তাঁদের ঘরসংসার আছে। তাঁরা তাই একটু বেশি ভিতু। এইসব হল্লা আর হামলার ভয়ে তাঁদের যাতায়াত কমেছে।

"খদ্দের যদি না আসে তবে ঝাঁপ খুলে বসে থাকে কোন্ দোকানদার? আমাদের এখন দশা বড় মন্দ। এক আমলে যার ঘরের দরজায় লম্বা লাইন পড়ত, তার ঘরের কড়ায় এখন জং ধরছে, সেই কড়া এখন কেউ নাড়ে না।" একটা নিশ্বাস ফেলে বলল হাসনুহেনা।

মৌচাকে নাকি ঢিল পড়েছে। মৌমাছিরা পালাচ্ছে। পালাবার সময় হুল ফেলে দিয়ে যাচ্ছে না নিশ্চয়। এটা সবার মনে রাখা দরকার।

গৃহস্থপল্লীতে ঘর ভাড়া করে তারা নাকি বাস করছে বধূর বেশ ধরে। বধূ সেজেই থাকছে বটে তারা, কিন্তু তাদের কাজ নাকি চলেছে আগের মতনই, যে কাজকে ঐ জ্ঞানী ব্যক্তি বলতেন বার-বধূর কাজ।

একটু নড়ে বসে একটু যেন ঝাঁজ দিয়েই হাসনুহেনা বলল, "আমাদের ঘাঁটি যারা ভেঙে দিচ্ছে তাদের ঘাঁটি এবার আমাদের ভাঙবার পালা। পিঁপড়ের বাসাও নাকি মানুষে ভাঙতে চায় না। কিন্তু আমরা কি পিঁপড়ের চেয়েও অধম?"

অনেক দুঃখে, একেবারে অপারগ হয়েই নাকি সে এসেছে এখানে, পরাশরবাবুর কাছে। এখন, তিনি যদি দয়া করেন তবে সে খুশি হবে।

পরাশরবাবু কোনো উত্তর দিতে পারলেন না। তাঁর গলা বুঝি শুকিয়ে এসেছে। তিনি গেলাশটি মুখের কাছে নিয়ে ছোট একটা চুমুক দিলেন।

বাইরে রোদ নিশ্চয় এতক্ষণে ঝাঁঝাঁ করে উঠেছে। এই রোদে হাসনুহেনাকে যেতে হবে অনেক দূরে—গ্রে স্ট্রীটে।

"উঁহুঁ।" হাসনুহেনা বলল, "এবেলা এই পাড়াতেই থেকে যাব। আপনার বাড়ির কাছেই। কাল বিকেল থেকেই ওখানে আছি। আপনি কি ভেবেছেন এই সকালে আমি অতদূর থেকে দৌড়ে এসেছি?"

"না। কিচ্ছু ভাবি নি।" বেশ ভাবিত হয়ে বললেন তিনি।

বাড়ির নম্বর আপাতত না বলল, তবে, এর কাছেভিতেই তাদের চেনা তিন-চারজন মেয়ে এসে ঘর ভাড়া নিয়ে আছে। তাদেরই একজনের কাছে এসে একদিনের জন্যে সে উঠেছে। যদি পরাশরবাবুর কাজটা পেয়ে যায়, তবে সেও হবে এই পাড়ারই বাসিন্দে।

পরাশরবাবুর ভ্রূ কুঁচকে গেল। তিনি চিন্তা করতে লাগলেন; কে এসেছে এ তল্লাটে অল্পকাল আগে?

বললেন, "কে? মিসেস চাটার্জি? মিস মালবিকা নন্দী? মিসেস সোম?"

হাসনুহেনা হেসে বলল, "সোম মঙ্গল কি বুধ, সেসব বলব না। কিন্তু ওরা সবাই যে শনি তা জানবেন। আপনাদের সমাজে ঢুকেছে ওরা, এটাও জানবেন।"

একটু থেমে বলল, "আর, আমাকেও ঢুকতে হবে কোথাও-না-কোথাও। বাঁচতে তো হবেই।"

পরাশরবাবু হঠাৎ উঁচুগলায় ডাক দিলেন, "ফণিভূষণ—"

পর্দা ডিঙিয়ে ফণিভূষণ হাজির হতেই তিনি বললেন, "এ'কে একটু এগিয়ে দাও। আচ্ছা নমস্কার, একটু ভেবে দেখি। খবর দেব।"

তার শরীর আর শাড়ি সামাল করতে-করতে পর্দা পর্যন্ত গিয়ে ফিরে চেয়ে হাসনুহেনা বলল, "নমস্কার।"

কুমারী মমতা

সারাটা দিন বড়ই এলোমেলো ভাবে কেটে গিয়েছে পরাশর পুরকায়স্থর। আপিসের কাজেও বিশেষ মন বসেনি। কেবলই মনে হয়েছে ঐ মহিলাটির কথা। ফণিভূষণ তাকে কতদূর পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে এল, এ কথা জিজ্ঞাসা করার জন্যে বার-কয়েক তিনি বেশ অধীর হয়ে উঠেছেন, কিন্তু সামান্য একটা কথা জানবার জন্যে তাঁর এই ব্যাকুলতা-প্রকাশটা তাঁর বুঝি সাজে না। এটা তাঁর মর্যাদার পক্ষে ঠিক না।

নিজের মানমর্যাদা নিয়ে তিনি অবশ্য বিশেষ সচেতন না, অথচ পাঁচ রকম লোক নিয়ে কাজ করতে হলে অনেক সময়ই নিজেকে একটু অন্যরকম সাজিয়ে রাখতে হয়। অনেক ব্যাপারেই তাঁর কৌতূহল আছে, কিন্তু কী করা যাবে, অনেক ব্যাপারেই তিনি একটু উদাসীন সেজে থাকেন।

এই পল্লীর আশেপাশেই আছে নাকি হাসনুহেনাদের মতন আরো অনেক ফুল্ল ফুল; কেবল এ-তল্লাটে কেন—আরও অনেক গৃহস্থপল্লীতেও তারা নাকি ছড়িয়ে গিয়েছে। বা, তাহলে ব্যাপারটা তো জমেছে বেশ মন্দ না।

সমাজের একটা সেফ্‌টি ভাল্‌ব্ বলা হয়ে থাকে যে ব্যাপারটাকে তা ভেঙে দিলে সমাজের নিরাপত্তার দশা কি হবে? এসব নিয়ে ভাবুক লোকেরা যদি একটু ভাবেন, যদি একটু কাজ করেন, তবে-না হয়! মৌচাক ভাঙা হয় বটে, তারও একটা উদ্দেশ্য আছে, সেই চাক নিঙড়ে মধু লোটা হয়। কিন্তু এদের এই চাক ভেঙে দিয়ে কোন্ মধু যে পাওয়া যাবে তা একটু জেনে নেবার চেষ্টা করতে হবেই।

কাছাকাছি কোন্ বাড়িতে গিয়ে সে ঢুকল, সেটা বেশ কৌশল করে জেনে নিতে হবেই ফণিভূষণের কাছে। কিন্তু থাক্, এখন না। এই ইন্টারভিউ নেবার ঝঞ্ঝাটটা কেটে যাক, তারপর ধীর-স্থির হয়ে বসে জানার চেষ্টা করলেই হবে।

চারটের সময়ই আজ পরাশরবাবু তাঁর আপিস থেকে বেরিয়ে এসেছেন। গিয়ে পেঁাছেছিলেনও অনেক দেরিতে—বেলা এগারোটায়। আপিসে গিয়েও তাঁর কাজে খুব যেন মন বসল না। একটা অস্বস্তি ও অশান্তি কেন-যেন তিনি ভোগ করেছেন।

আপিসের লোকেরা তাঁকে নিয়ে কিছু বলাবলি করছে কিনা, সে খবর তিনি জানেন না বটে, কিন্তু অনুমান করেন কিছু-না-কিছু তারা বলছেই। বলুক। ফণিভূষণের টেবিলের কাছে কাজের অছিলায় অনেকেই গিয়ে যে মাঝে মাঝে হুমড়ি খেয়ে পড়ছে—তাও তিনি অনুমান করেন। কিন্তু ফণিভূষণ খুব শেয়ানা। চাকরি করতে সে জানে। মনিবকে নিয়ে কোনো আলোচনায় সে যোগ দেবার পাত্র নয়। তার সম্বন্ধে পরাশরবাবু ভালোমতই জানেন, সেইজন্যেই তো তিনি তাকেই বহাল করেছেন এই ব্যক্তিগত ব্যাপারে।

কিন্তু সে কথা অন্য। এখন যে আবার একজনের আসার সময় হয়ে এল। এর চিঠিটা আবার বেশ সংক্ষিপ্ত, এবং আরো নতুনত্ব এই যে, সেই ক্ষুদ্র চিঠিটা ইংরেজিতে লেখা। মেয়েটা নিশ্চয় পরাশরবাবুকে চমক লাগাবার জন্যে, কিংবা নিজের যোগ্যতা জাহির করার জন্যেই এই কৌশল নিয়েছে। তা নিক। অভিভূত হতে তিনি রাজি না। সব দেখেশুনে যাকে নেহাতই যোগ্য মনে হবে তাকেই তিনি বহাল করবেন।

একেবারেই একা তিনি। তাঁর জীবনের নিঃসঙ্গতা এই দু-তিন দিন বেশ দূর করে দিয়ে গেল ওরা। আরও দু-তিন দিন দেখতে-দেখতে কেটে যাবে। দূর থেকে তাঁর বন্ধু-বান্ধবেরা নিশ্চয় বেশ মজা মারছে। তারা হয়তো ভাবছে পরাশর ইতিমধ্যে বেশ কাবু আর বেশ ক্লান্ত হয়ে গিয়েছে। কিন্তু ক্লান্তি তাঁর অত সহজে আসে না। তা যদি আসত, তবে এই বয়সে তিনি ও রকম একটা প্ল্যান করে বসতেন না।

এবার যাঁর আসার কথা তাঁর চিঠিটার উপরে তিনি চোখ বুলাচ্ছেন। লাভ্‌লক্‌ প্লেস হচ্ছে তার ঠিকানা। পাড়াটা ভালো। সকালবেলা তিনি যে পাড়ার লোকের সঙ্গে একটি পুরো ঘণ্টা কাটালেন, এটা তেমন পল্লী নয়। এটা বনেদি পল্লী। সুতরাং ইংরেজিনবীশ যিনি আসছেন তিনিও নিশ্চয় বনেদিই হবেন।

ঘড়ির দিকে লক্ষ্য রাখেন নি তিনি। ছটা যে প্রায় বাজে তা দেখেনই নি। দরজার কাছে পায়ের শব্দ শুনে, ও পরদা একটু নড়তে দেখে মাথা তুলে তাকিয়ে পরাশরবাবু বললেন, "কি খবর ফণিভূষণ?"

ফণিভূষণ সংক্ষেপে বলল, "এসেছেন।"

কোটটা কাঁধের উপরে ঠিকমতন বসিয়ে নিতে-নিতে এক পলক ঘড়ির দিকে চেয়ে বললেন, "নিয়ে এসো।"

মুহূর্তের মধ্যে পরদার পরপার থেকে আবির্ভূত হলেন এক বিদেশিনী। চমকেই বুঝি গেলেন পরাশরবাবু। কিন্তু নিজেকে সামলে নিয়ে একটু উঠে দাঁড়াবার ভঙ্গি করলেন তিনি।

"গুড ইভিনিং মিস্টার পুরাকায়স্থ্‌।" বলতে-বলতে দীর্ঘ শুভ্র একটা হাত বাড়িয়ে দিলেন মিস মমতা।

উঠে দাঁড়িয়ে একটু ঝুঁকে পড়ে টেবিলের ওপার থেকেই হাত বাড়িয়ে দিয়ে ঐ শুভ্র করটি মর্দন করলেন পুরকায়স্থ।

সসম্ভ্রমে হেসে তাঁকে ইঙ্গিতে বসতে বললেন পরাশর, "প্লিজ—"

শরীরের দিকে তাকানো যায়, তাকাতে ইচ্ছেও করে; কিন্তু মুখের দিকে না। মুখটা অত্যন্ত অদ্ভুত রকমের বিশ্রী। কিন্তু শরীর বিস্ময়কর সুন্দর—যেমন গঠন, তেমনি গড়ন।

ভাঙা-ভাঙা বাংলায় কথা বলতে লাগল মিস মমতা। একটু হেসে বলল, "হামি বেঙ্গলি জানে।"

তা তো ঠিকই। বাংলা ভাষা যে রপ্ত করেছেন ইনি, তা তাঁর কথা শুনেই স্পষ্ট বুঝতে পারলেন পুরকায়স্থ।

মিস মমতা পরাশরবাবুকে বুঝিয়ে বললেন যে, তিনি একজন ফরেনার, কিন্তু তিনি একজন বাংলার বোঢ়ু।

বুকভরা মধু বঙ্গের বধূ—এই কথাটার তাৎপর্য কি, কবি এর দ্বারা ঠিক কি বলতে চেয়েছেন, তা জানেন না পরাশর। কিন্তু তাঁর যেন মনে হচ্ছে মিস মমতা সম্পর্কে কথাটা যেন ঠিক খাটে।

কিন্তু মুখভরাও মধু কেন একে দিলেন না ভগবান—এ কথা ভেবে ভগবানের উপর পরাশরের একটু রাগ হল।

বছর-তিন হল মিস মমতা নাকি এসেছে ইন্ডিয়ায়। ইন্ডিয়া সম্বন্ধে যে ড্রিম, যে কল্পনা তার ছিল, আসলে ইন্ডিয়া নাকি তারও বেশি রিমার্কেবল্। এই কানট্রিকে সে নাকি ভালোবেসে ফেলেছে, এখানকার পিপ্‌ল্‌কেও। বাট্—

পরাশরবাবু জানতে চাইলেন—কি, কেন, কি সেই কিন্তুটা।

মিস মমতা বলল, "বাট্, অ্যায়াম এ ফুল।"

সে নাকি একজনকে বিশ্বাস করে একেবারে বোকা বনে গিয়েছে, একেবারে বেকুব। "আয়্যাম নাউ স্ট্র্যান্ডেড্।"

উপদেশও নয়, অনুনয়ও নয়—মিস মমতার বলার ভঙ্গিই একটু আলাদা রকমের। সে তার অসুবিধের কথা বলছে, একটা শেল্টার না হলেই তার চলবে না—তাও জানাচ্ছে, অথচ কোনো করুণা যেন চাচ্ছে না। একজন ইন্ডিয়ান হয়ে পরাশরের কর্তব্য কি, তাই মনে করিয়ে দিচ্ছে বার-বার।

বার-কয়েক সে বলল, "প্রিন্স অব মহেঞ্জোদরো, প্রিন্স অব মহেঞ্জোদরো।"

সেটা আবার কি? জানতে চাইলেন পরাশর।

মিস মমতা তাঁর দু কাঁধ ঝাঁকি দিয়ে, দুই ভুরু নাচিয়ে নিজের ভাগ্যকে ভর্ৎসনা করার মতন করে বললেন, "হি ইজ মাই হাজব্যান্ড।"

সে কী কথা? এ কথার তো কোনো মানেই বুঝতে পারছেন না পরাশর। মহেঞ্জোদরোর রাজকুমার আবার কেউ আছে নাকি? যদি-বা থাকে, তবে এখন সে কোথায়? সেই ঐতিহাসিক ভগ্নস্তূপের নামের সঙ্গে নিজের নাম জুড়ে নিলে বেশ একটা রাজকীয় জাঁক হয় বটে; কিন্তু সেই জমজমাট লোকটি কে, এবং এখনই-বা সে কোথায়?

মিস মমতা সীলিং-এর দিকে চোখের তারা দুটো একটু তুলে সংক্ষেপে বলল, "গড নোজ। আই ডু নট নো।"

গলার স্বরটাও বেশ মিষ্টি। কিন্তু মুখটা অমন কেন, অমন আশ্চর্য রকম বিশ্রী কেন। এটা একটা আশ্চর্য ব্যাপারই বটে, যার শরীর ভিনাসের মতন, কিংবা তার চেয়েও অনেক অপরূপ, তার মুখ এমন ভীষণ ভয়ংকর আর বীভৎস হল কি করে! ঐ মুখের দিকে তাকানো যায় না। তাকাতে ভয় করে না অবশ্য; কিন্তু বলতে দোষ কি, একটু যেন ঘৃণার উদ্রেক হয়।

সকালে যে সুন্দরী এসেছিলেন, তাঁর চেহারার দিকে তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছে করে। আকর্ষণবোধ তেমন তা করলেও সেই চেহারা একটু যেন চোখকে টানে, মনকেও। এখন যে সুন্দরীটি তাঁর সামনে বসে আছেন তাঁর মুখের দিকে তাকাতে না পারলেও তাঁর শরীর

এমনই অদ্ভুত সুন্দর ছাঁচে ঢালাই করা যে, ভাবতে আশ্চর্য লাগে—ঐ শরীরের সঙ্গে ঐ মুখ যুক্ত করলেন কোন্ অর্বাচীন ঈশ্বর। ঐ মুখের উপরে সাধারণ একটি মুখোশ এঁটে নিলেই একজন অপরূপ সুন্দরী বলে গ্রাহ্য হয়ে যেতে পারত এই মিস মমতা। যাঁকে মনে-মনে পরাশরবাবু বললেন, প্রিন্সেস মহেঞ্জোদরো।

পরাশরবাবু ঐ শরীরের গঠন ও গড়ন দেখে প্রায় অভিভূত। তাঁর খুব আক্ষেপ হচ্ছে—এমন নিপুণ ও নিখুঁত একটি শরীর তিনি মাত্র একা দেখছেন। আরও পাঁচজনকে দেখাতে পারলে তাঁর যেন তৃপ্তি হত, শান্তিও হত।

কিন্তু, পৃথিবীতে কিছুতেই তৃপ্তি নেই, কিছুতেই শান্তি নেই। তাই, একটা অশান্ত ও অতৃপ্ত দৃষ্টিতে তিনি একবার তাকালেন মিস মমতার কাঁধের দিকে। গলার নীচের অংশ এক রকম, গলার উপরের অংশ একেবারে আলাদা রকম। বার-বার বিস্মিত হচ্ছেন পরাশর পুরকায়স্থ।

বিজ্ঞান তো কত কাণ্ডকারখানা করে চলেছে, মানুষের হৃদয়ই বদলে দিচ্ছে বিজ্ঞান। সেই বিজ্ঞান যদি একটি মৃত মাথা জুড়ে দিতে পারত এ ধড়ের সঙ্গে, তাহলে ধরায় সেটি একটি অভূতপূর্ব কাণ্ডই হত না কেবল, পৃথিবী হয়তো পেয়ে যেত একটি নতুন ক্লিয়োপেট্রা।

এটা কম ট্রাজিডি নয়। ব্যক্তিগত ট্রাজিডি তো বটেই, এটা পৃথিবীর পক্ষেও একটা বেদনাদায়ক ঘটনা—পৃথিবীতে এমন মানবী যে একজন আছে।

মার্কিন দেশের মেয়ে নাকি সে। তার জন্ম ক্লীভল্যান্ডে, এরী হ্রদের কিনারে। দশ বছর বয়স যখন তার তখন তার বাবা সংসার নিয়ে চললেন শিকাগোয়। সেও এল সেখানে, এরী হ্রদের কিনার থেকে এসে পৌঁছল মিসিগান হ্রদের ধারে। ওরি আশেপাশে তিনটি স্টেট—ইলিনয়, ইন্ডিয়ানা, ওহিয়ো। শিশুকাল থেকেই তার কেমন-যেন টান ইন্ডিয়ানার উপর। ছেলেবেলা থেকে হ্রদ দেখে-দেখে হ্রদের উপরেও টান তার অসীম। সেই হ্রদই ছিল তার কাছে সমুদ্রের সমান, সে ভাবতেই পারত না এর চেয়ে বড় জলের আধার আর কী হতে পারে। কিন্তু সে জানত তার দেশের দুই পাশে দুটি বিশাল সমুদ্র আছে—অ্যাটলান্টিক ও প্যাসিফিক। সেই দুই সমুদ্রের ওপারে আরও কত দেশ নাকি আছে, তাদের এই দেশেরই মত। তার ইচ্ছে হত সেইসব দেশ দেখতে।

আরও যখন বড় হল তখন একটা নাম সে শুনল—ভিভেকানন্দ্। তিনি নাকি একজন গ্রেট ইন্ডিয়ান, তিনি নাকি এসেছিলেন তাদের শিকাগোয়। তাঁর ছবি দেখেছে মিস মমতা—"ওঃ হাউ ম্যান্‌লি! হাউ ওয়ান্ডারফুল এ ম্যান হি ওয়াজ। হাউ ব্রিলিয়ান্ট!"

মিস মমতা একটু চুপ করে বসল। কোটরগত তার চোখ-দুটো সাপের গর্তগত দুটি উজ্জ্বল মণির মতন জ্বলছে। খড়্গের মত নাসিকা বিস্ফারিত হচ্ছে। মোটা-দুটি ঠোঁটের আড়ালে সামনের দুটো দাঁতের মাঝখানে অনেকটা ফাঁক বেশ দেখা যাচ্ছে।

মমতা বলল তখন থেকেই সে নাকি ভালোবেসে ফেলে ইন্ডিয়াকে। ইন্ডিয়ার জন্য তার মন ছটফট করত।

কিন্তু সে বুঝতে পারত তার স্বপ্ন কখনোই সফল হবে না। কারণ? মিস মমতা একটু হাসার মতন করে বলল, কারণ হচ্ছে তার এই ফেস, তার এই আগ্‌লি লুক!

ওর নিজের মুখ থেকেই ওর নিজের মুখমণ্ডলের কথা শুনে পরাশর খুব কষ্ট বোধ করলেন। আহা, বেচারী!

ফ্রম এ টিনি বাড্ যেমন ফুটে ওঠে গ্লোরিয়াস ফ্লাওয়ার, তেমনি তার সর্বাঙ্গ ক্রমশ বিকশিত পুষ্পিত হয়ে প্রস্ফুটিত হয়ে উঠল। যখন সে নিজের শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের দিকে তাকাত তখন সে নিজেই আশ্চর্য হয়ে যেত। বলতে দোষ কি, সে নাকি তাদের বয়সী অনেক মেয়ের শরীর পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে দেখে নিজের শরীরের সঙ্গে মেলাত। কারো বুজম্ সে দেখত বাক্সাম, কারো বা লাইক অ্যান অ্যাপ্ল্, বাট্—

হঠাৎ থেমে গেল মমতা। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল নিজের কথা ভেবে। সেইসঙ্গে তার বুক ফুলে উঠল।

অর্থাৎ অন্যদের সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে-মিলিয়ে দেখার আগ্রহ তার বেড়েই চলল। ওয়েস্ট্, থাই, হীপ, অ্যাংক্ল্, নী—ইত্যাদি শরীরের যাবতীয় অঙ্গ সে মিলিয়ে-মিলিয়ে মেপে-মেপে দেখত। দেখত আর বুঝতে পারত, শী ইজ সুপার্ব, শী ইজ ইউনিক। এটা তার গর্ব বটে, কিন্তু এইটেই তার দুঃখ।

"নোবডি লাইক্ড্ মী, বিকজ অব—" থেমে গেল মমতা, আবার নিশ্বাস ফেলে বলল, "বিকজ অব মাই ফেস।"

কিন্তু ফেসই কি মানুষের জীবনের একমাত্র কামনার জিনিস। তার মাইন্ড, তার বডি, তার সোল—এসবের কি কোনোই চাহিদা নেই পৃথিবীতে?

প্রথম-প্রথম তেমন কষ্ট সে বোধ করত না। তখন কষ্ট বোধ করত না এইজন্যে যে, তখন সে ঠিক বুঝতে পারেনি যে, কিজন্যে তার উপর কারো তেমন টান নেই। কিন্তু যখন সে বুঝতে পারল তখন সে একেবারে হেল্প্লেস।

লেখাপড়া সে শিখেছে। যতটা শেখা সম্ভব ততটা সে শিখেছে। কিন্তু কী হবে সেই লেখাপড়া দিয়ে, যার কোনো দাম নেই। "বিকজ অব মাই ফেস"।

সে বলে উঠল, "পিপ্ল্ শাডার্স্ টু লুক অ্যাট মী। থ্যাঙ্ক্ গড দ্যাট ইউ ডিড নট শাডার।"

পরাশরবাবু খুলে বললেন না যে তাঁর অবস্থা নিতান্ত অশোচনীয় নয়, তিনিও ভিতরে-ভিতরে কাঁপছেন। যদিও তাঁর এই কাঁপুনিটা তেমন মারাত্মক নয়। কেননা, এ মেয়ে তো তাঁর কাঁধে চাপবার জন্যে তাঁর কাছে আসেনি। সে এসেছে মাত্র ইন্টারভিউ দিতে। অন্য-কোনো চাহিদা নিয়ে নিশ্চয় আসেনি।

কিন্তু মমতার মনের মধ্যেও তো মমত্ববোধ থাকার কথা, এবং তা আছেও। সেইজন্যে তার আপনার বলে কাউকে পাবার জন্যে তার আগ্রহ এবং আকাঙ্ক্ষাও নিশ্চয় আছে। কিন্তু সেই আকাঙ্ক্ষা পূরণে তার কী পরিমাণ কষ্ট হয়েছে তা সে বলে বোঝাবে কী করে। শারীরিক কষ্ট তো আছেই, কিন্তু সে কথা ঘোষণা করে সে না বলল, সে বলতে চায় তার মানসিক কষ্টের কথা। কী হরিব্ল্ শক্ সে পেত যখন সে কারো কাছে কোনো আবেদন বা নিবেদন জানাতে গিয়ে সোজাসুজি রিজেক্টেড হয়ে যেত।

ডেটিং কথাটা কি জানেন পরাশরবাবু? মেয়েরা ডেট পায় তাদের দেশে। সেইদিন তারা গিয়ে মিলিত হয় তাদের বয়-ফ্রেন্ডের সঙ্গে। এ ব্যবস্থাটা বেশ চালু আছে তাদের দেশে। মেয়েরা আর ছেলেরা অবাধে তখন মেলা-মেশা করতে পারে—কোনো কিছুর বাঁধ বা বাধা তাদের মধ্যে তখন থাকে না।

যে মেয়ে ডেট পায় না, সে একজন রেচেড ক্রিচার। "আয়্যাম ওয়ান অব দেম, আয়্যাম ওনলি ওয়ান অব দেম পারহ্যাপ্স্।"

হঠাৎ যদি কোনো উইকে বা কোনো মান্থে কোনো মেয়ে ডেট পেল না, তখন সে তার মর্যাদা বাঁচাবার জন্যে ব্যস্ত হয়। কেননা এরকম ডেট না পাওয়া মেয়েদের ইজ্জতের পক্ষে মারাত্মক। তখন তারা আত্মসম্মান রক্ষার জন্যে নানারকম মিথ্যে কথা বলতে ও মিথ্যা ভঙ্গি করতেও বাধ্য হয়।

সুন্দরী মেয়েদের চাহিদা সব যুগে সব দেশেই বেশি। আমেরিকা এর ব্যতিক্রম নয়। তেমন সুন্দর দেখতে নয়, অথচ মাঝে মাঝে ডেট পায় এমন মেয়েদের মাঝে মাঝে কষ্টও কম পেতে হয় না।

এমন-একটি মেয়ে, তার নাম লোলা। সে যখন ডেট পেত না, তখন সে নাকি কেবলই বলে বেড়াত যে, টেলিফোনে-টেলিফোনে সে নাকি অস্থির। একবার এ ডাকছে তাকে একবার ও ডাকছে। তার চাহিদা যে খুব বেশি তা জানান্ দেবার জন্যে তার সে কী মর্মান্তিক অভিনয়! তার পর সন্ধ্যাবেলা চুল এলোমেলো করে দাঁড়িয়ে কত গল্প! কোন্ পার্কে গিয়েছিল, কীরকম মজা হল, কীরকম হল্লা হল, এবং কত-কী কান্ড হল—হাঁফাতে-হাঁফাতে তারই মিথ্যা বর্ণনার ঘটা।

ঐ গল্প শুনত মমতাও, মনোযোগ দিয়ে শুনত। বুঝতে পারত সে সব, নিজের কাছে সেটা অনেকটা সান্ত্বনার মতই তার ঠেকত বটে, কিন্তু সত্য হোক মিথ্যা হোক সব বিবরণ শুনে তার শরীর শিরশির করত। এবং এ ধরনের বর্ণনা যখন মিথ্যাকে ভিত্তি করে করা হয় তখন তা আরো জোরালো ভঙ্গিতেই করা হয়ে থাকে। ঘটনা সত্য হলে বর্ণনা একটু মাত্রা রেখেই করা হয়ে থাকে; কিন্তু লোলার বর্ণনায় কোনো মাত্রা না থাকায় শরীরের রক্ত যেন ফুটতে থকে। সব মাত্রা হারিয়ে ফেলতে ইচ্ছে করে তখন।

মমতার তখন ইচ্ছে করত কেউ এসে তাকে ক্রাশ করুক, ক্রুয়েল্লি টরচার করুক, সে তার সর্বাঙ্গ তার কাছে সারেন্ডার করে দিতে রাজি। বাট্—

কেউ নাকি আসে নি। যতই সে নিজেকে সমর্পণ করার জন্যে এগিয়ে গিয়েছে, ততই ছেলেরা সরে গিয়েছে তার কাছ থেকে। "উঃ, হাউ হরিব্ল্!"

ঠিক এই রকম এক সময়ে তার সঙ্গে পরিচয় হল ওর—প্রিন্স অব মহেঞ্জোদরোর।

তার নিজের নাম নাকি মরিয়ম। দিন-কয়েকের মধ্যেই সে বদ্‌লে নিল তার নাম। ইন্ডিয়ান প্রিন্সের সঙ্গে তার আত্মীয়তা, সে তাই তার ইন্ডিয়ান নাম করে নিল।

সেই ছেলেটি প্রায় তার সমান বয়সী। ত্রিশের কাছাকাছি। দুজনে গভীর প্রেমে পড়ে গেল। মমতার জীবনের এই প্রথম প্রেম।

ভেরা ব্রিটেনের টেস্টামেন্ট অব ইউথ বইটা তখন খুব পড়ত মমতা। সে বই একটা ব্যর্থ প্রেমের গল্প। নায়িকার প্রণয়ী যুদ্ধে গিয়ে নিহত হয়। প্রথম-বিশ্বযুদ্ধের কথা আছে সেই বইতে। খুব ভালো লাগত পড়তে, অনেক লাইন মুখস্থও হয়ে গিয়েছিল সে বইয়ের। মমতা তার থেকে দুটি ছত্র বার-বার উচ্চারণ করে শোনাত তার প্রিন্সকে—

হাগ মী, কিস্ মী, কল্ মী গার্টি,
ম্যারি মী কুইক্, আয়্যাম নিয়ার্লি থার্টি।

ঐ লাইন সে মনোযোগ দিয়ে শুনত, দুই হাঁটুর উপর থুৎনি ভর দিয়ে একটু-একটু হাসত, হাসতে-হাসতে হঠাৎ যেন ক্ষেপে উঠত। মমতাকে জাপটে ধরে তার শরীরের সমস্ত উত্তাপ মমতার সর্বাঙ্গে ছড়িয়ে দিত। "ওঃ, দ্যাট ওয়াজ হেভ্‌ন্, হেভেন্‌লি।"

কিন্তু এই হেভেন্ নিজে নেমে এসে তাকে ধরা দেয়নি। এই হেভ্‌ন্‌কে অর্জন করার

জন্যে অকথ্য চেষ্টা করতে হয়েছে তাকে। একদিন নয়, দুদিন নয়, দিনের পর দিন।

অনেক বিদেশী ছাত্র যায় আমেরিকায়। কেউ যায় পড়াশুনা করতে, কেউ ফুর্তি করতে, কেউ কিছু না করে নিজের কেরিয়ার তৈরি করে নিতে। আফ্রিকা থেকে, ফিলিপিন থেকে, কোরিয়া থেকে, জার্মানি ফ্রান্স পাকিস্তান আর ইন্ডিয়া থেকেও।

এই ইন্ডিয়ান ছাত্রটিকে সে তাদের ইউনিভার্সিটিতে দেখা মাত্র ঠিক করে ফেলল, যেমন করে হোক একে জয় করতেই হবে। তাই সে খুব সন্তর্পণে ওর পিছনে লেগে রইল। প্রথমেই বেশি এগিয়ে গেলে যদি তার মোহ কেটে যায়, সেইজন্যে সে কিছুদিন মোহময়ী হয়ে থাকবার চেষ্টা করল। যেন, কিছুই সে চায় না, যেন কারো সঙ্গে মিশবার তার ইচ্ছেই নেই। যেন একটু উদাসীন প্রকৃতির মেয়ে সে।

ফেস টু ফেস কখনো সে তার কাছে দাঁড়াত না। এর কারণ স্পষ্ট। কাৎ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকত, যাতে সে দেখতে পায় তার প্রোফাইল, তার শরীরের এলিভেশন ও কার্ভ। কখনো পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে থাকত, যেন দেখতে পায়—

"ইউ ফলো হোয়াট আই মীন?"

পরাশরবাবু মাথা নেড়ে জানালেন তিনি সব বেশ পরিষ্কার বুঝতে পারছেন।

এই ভাবে ক্রমশ সে ঐ ছেলেটির মন তার দিকে টানবার চেষ্টা করল। এবং, কিছু-কালের মধ্যেই তার যেন মনে হল সে একটু সফল হয়েছে।

তার সাফল্যের একটু ইঙ্গিত পেয়েই আরও বেশি উদাসীন হয়ে গেল মরিয়ম। এতে কাজ হল। ছেলেটা তার কাছে ঘেঁষবার জন্যে, তার সঙ্গে কথা বলার জন্যে একটু যেন ব্যাকুলই হয়ে পড়েছে এবার। কিন্তু তবুও অসাবধান হয়নি সে। তবুও কথা বলেনি তার সঙ্গে।

তাদের ইউনিভার্সিটির লাইব্রেরিটা খুব বড়। লাইন করে সাজানো উঁচু-উঁচু বইয়ের র‍্যাক। দুই সারি র‍্যাকের মধ্যে সংকীর্ণ প্যাসেজ। আলো বেশি আসে না এখানে—অন্ধকার-অন্ধকার দেখতে লাগে জায়গাটা। কোনো র‍্যাকের বই নামাবার সময় অবশ্য সেখানকার আলো জেবলে নেওয়া হয়। সেটা একটা বেশ রহস্যময় জায়গা। ছেলে-মেয়েরা এটাকে তাদের বেশ মনের মত জায়গা বলে মনে করে।

ছেলেটার নাম এন. ঘোষাল। পরে পুরো নামটা সে জেনেছে, নটরাজ ঘোষাল।

একদিন ইউনিভার্সিটির ডরমিটরির লাগোয়া কাফে থেকে নটরাজকে লাইব্রেরির দিকে যেতে দেখে, মরিয়মও ধীরে ধীরে রওনা হল সেই দিকে।

ঠিক তার প্ল্যান অনুযায়ী সে চলল। তার ইচ্ছে, স্পষ্ট আলোয় প্রথমেই তার মুখো-মুখি হওয়া ঠিক হবে না।

মরিয়ম ধীরে-ধীরে পায়চারি করতে-করতে র‍্যাকে-র‍্যাকে বই দেখতে লাগল। লক্ষ করল, একটু দূরে নটরাজ থমকে থেমে দাঁড়িয়ে আছে। তার দিকে এগোতে বুঝি ভরসা করছে না। মরিয়মই এগোতে লাগল ধীরে-ধীরে। যখন তার প্রায় কাছাকাছি এসেছে তখন মরিয়ম নটরাজের জড়তা কাটিয়ে দেবার জন্যে একটু উইশ করল।

তৎক্ষণাৎ এগিয়ে এল নটরাজ। এসেই তার প্রথম কথা, 'হাউ ডু ইউ ডু সুইটি।'

এমন কথা কখনো সে শোনেনি। 'কোয়াইট নাইস' বলেই সে নটরাজের আর-একটু কাছে এগিয়ে গেল।

আলো-অন্ধকার জায়গা। আলোর চেয়ে অন্ধকারের ভাগই বেশি। নিরিবিলি জায়গা।

ওরা অনেক গল্প করল দুজন। একটু বেড়াতে গেলে কেমন হয়, একটু ইয়টিং করলে কেমন হয়—ইত্যাদি অনেক জল্পনাকল্পনা করতে লাগল তারা। তারপর ঠিক হল তারা যাবে মিশিগান লেকের নির্জন কিনারে বেড়াতে। দিন-ক্ষণ সব ঠিক হয়ে গেল আধ ঘন্টার মধ্যেই।

এত সহজেই মরিয়মকে রাজি করানো যাবে তা ভাবেনি নটরাজ। তাই বার-বার তাকে দিয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিল।

'আর ইউ অ্যান ইন্ডিয়ান? আই লাভ ইন্ডিয়া, আই নো সো মেনি থিংস্ অ্যাবাউট ইন্ডিয়া। আই নো ইয়োর ভিভেকানন্দ্।"

'ইজ ইট?' নটরাজ বলল, 'ইউ নো অ্যাবাউট মহেঞ্জোদরো?'

ঐ জায়গার নাম মরিয়ম বিস্তর শুনেছে জেনে নটরাজ বলল যে, সে একজন কমনার হয়ে থাকতেই ভালোবাসে, সেইজন্যে সে তার ফেলো-স্টুডেন্টদের তার আসল পরিচয় কখনো বলেনি, মরিয়মও যেন কখনো না বলে। কেননা সে-পরিচয় জানলে সকলে তার সঙ্গে তেমন ইন্‌টিমেট্‌লি না মিশতে পারে।

কী সে পরিচয়?

নটরাজ বলল যে, সে একজন প্রিন্স—প্রিন্স অব মহেঞ্জোদরো।

নটরাজ বোধ হয় বিশ্বাস করতেই পারেনি যে, মরিয়ম তার প্রস্তাবে সত্যিই রাজি হয়ে গেছে, এবং কথা সে রাখবে। নির্দিষ্ট দিনে নির্দিষ্ট জায়গায় যেন সত্যিই মরিয়ম যায় তার জন্যে এই প্রলোভনের জাল নিশ্চয় ফেলেছিল নটরাজ। নটরাজ নিশ্চয় বুঝতে পারেনি যে, মরিয়মের আগ্রহও কিছু কম নয়, এবং এই জিনিসই তার কতটা কাম্য।

তারা গিয়েছিল। সেই লেকের কিনারে একটি নিভৃত নিকুঞ্জই বলা যায় জায়গাটাকে। তারা গিয়ে বসেছিল সেইখানে। লেকের জলের দিকে মুখ করে তারা বসেছিল। ঐ জলের ওপারে ঐ আর-এক দেশ—কানাডা। ঐ ভিন্ দেশের দিকে চেয়ে একটা ভিন্ ভুবনে চলে যাবার জন্যে মরিয়মের মনটা ছটফট করতে লাগল।

অনেকক্ষণ তারা বসে বসে অনেক স্বপ্নের আর সম্ভাবনার কথা বলতে লাগল। নটরাজ ছবি আঁকে—একজন বিখ্যাত আর্টিস্ট হবার তার ইচ্ছে। তার স্কেচ-বুকটা সে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিল। দুজনে পাতা উল্টে-উল্টে দেখতে লাগল সেই চিত্রাবলী। ছবি তার যত-না ভালো লাগল তার চেয়ে অনেক বেশি উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করতে লাগল মরিয়ম সেইসব ছবির।

মরিয়ম তার একটা স্কেচ আঁকার জন্যে অনুরোধ করল নটরাজকে। নটরাজ স্বীকৃত হল। কিন্তু একটু হেসে বলল, একটি বেদিং বিউটি আঁকতে চায় সে।

কথাটা বলে খুব হাসতে লাগল নটরাজ। হাসতে-হাসতে মরিয়মের মুখের দিকে চেয়েই হঠাৎ কেমন যেন বিষণ্ণ হয়ে গেল—কেমন স্যাড্, কেমন পেল্।

মরিয়ম বুঝতে পারল কারণটা, সে মুখটা ঘুরিয়ে বসল। কিছুক্ষণ ঐভাবে বসে থেকে অন্যদিকে মুখ করে জিজ্ঞাসা করল, 'ইউ ওয়ান্ট মী টু সুইম, ওয়ান্ট মী টু বেদ্?'

নটরাজ এবার হাসল। ওর হাসি দেখেই মরিয়ম বুঝতে পারল তার ইচ্ছেটা।

পরাশরের মুখের দিকে চেয়ে মরিয়ম থেমে গেল। অনেক কথা অনর্গল সে বলে গিয়েছে। নিজের মনের বিষাদের কথা দুঃখের কথা কষ্টের কথা এমন খোলাখুলি ভাবে আজ পর্যন্ত সে কখনো কারো কাছে বলতে পারেনি। আজ এমন-একজন শ্রোতা পেয়ে বেশ উৎসাহই যেন পেয়ে গিয়েছে সে, তাই তার মনের অর্গল একেবারে খুলে গিয়েছে।

ঝাঁপ দেবার আগে ঝুঁকে দেখে নেওয়া দরকার। কিন্তু ঝোঁকের মাথায় ঝুঁকে পড়ে দেখার কথা তার মনেই হয়নি। সে ঝাঁপ দিল।

সর্বাঙ্গের সমস্ত আবরণ ধীরে-ধীরে পরিহার করে লাইক অ্যান ঈভ সে উঠে দাঁড়াল, সে ঝাঁপ দিল জলে।

স্কেচ-বুক বুকের কাছে ধরে একদৃষ্টে তার দিকে চেয়ে বসে রইল নটরাজ। জলে সাঁতার দিতে লাগল মরিয়ম। কাঁচের মতন স্বচ্ছ জলে ভেসে বেড়াতে লাগল সে। নটরাজ কিছু আঁকল না, দুই চোখে অদ্ভুত বিস্ময় নিয়ে সে একদৃষ্টে চেয়ে রইল তার দিকে।

নটরাজ বেশিক্ষণ তাকে জলে থাকতে দিল না। জলের কিনারে গিয়ে হাত বাড়িয়ে তার হাত ধরে টানতে লাগল, বলতে লাগল, 'ভিনাস, ভিনাস'।

জল থেকে মরিয়মকে সে টেনে তুলে টানতে-টানতে নিয়ে চলল কিনার থেকে একটু দূরে। মরিয়ম শুধু চ্যাঁচাতে লাগল—'মাই হ্যাট, মাই হ্যাট'।

দৌড়ে গিয়ে তার জামাকাপড়ে চাপা-দেওয়া হ্যাটটি কুড়িয়ে নিয়ে এল নটরাজ। সেই হ্যাট দিয়ে মরিয়ম তার মুখ ঢেকে নিল। সোজাসুজি চোখে রোদ পড়ছে এই অছিলা করে কেবল সে বলতে লাগল, 'দি সান্, দি সান্'। আসলে কিন্তু নিজের মুখ চাপা দিয়ে রাখবার জন্যেই এই স্ট্র-হ্যাট সে চাপা দিয়েছে মুখে। সেই হ্যাটের ক্ষুদ্র ফাঁক দিয়ে সে দেখতে লাগল নটরাজকে। তাকে ভীষণ দেখাচ্ছিল, তাকে ভয়ংকর দেখাচ্ছিল, অসহ্য সুন্দর দেখাচ্ছিল তাকে।

"ইউ ফলো হোয়াট আই মীন?"

পরাশরবাবু মাথা নেড়ে জানালেন যে তিনি সব বেশ পরিষ্কার বুঝতে পারছেন।

এর পরের ঘটনা ছোট। তার শরীরের স্বাদ পেয়ে নটরাজ এখন প্রায় ম্যাড। মরিয়মের মুখের কথা তখন আর তার তেমন মনে নেই।

মাস-কয়েকের মধ্যে তারা ইউনাইটেড স্টেটস অব আমেরিকা ত্যাগ করে চলে এল রিপাবলিক অব ইন্ডিয়ায়।

প্রিন্স অব্ মহেঞ্জোদরোর সঙ্গে তার তখন বিয়ে হয়ে গিয়েছে: প্রিন্সেস হয়ে তখন সে আসছে তার নতুন সাম্রাজ্যে। মনে কত স্বপ্ন ছিল, কত কল্পনা।

বম্বেতে তারা নেমেছিল। সেখান থেকে ট্রেনে চেপে চলে এল ক্যালকাটায়।

কলকাতায় এসে মিউজিয়মের পাশের ঐ রাস্তায়—সদর স্ট্রীটে—একটা ছোট হোটেলে উঠল তারা।

দিনের পর দিন যেতে লাগল, মাসের পর মাস। হোটেলের বিল্ দিতে অনেক সময় অনেক অসুবিধে হত। মরিয়ম তখন নটরাজের আঁকা একগাছা স্কেচ নিয়ে মিউজিয়মের রেলিঙে সেগুলি টাঙিয়ে দাঁড়িয়ে থাকত। কাজ হত তাতে। একজন বিদেশিনীকে এইভাবে ছবি বেচতে দেখে অনেকে চড়া দামেও তা কিনে নিত।

ছবি বিক্রি হচ্ছে দেখে নটরাজের উৎসাহ বেড়ে গেল। সে ঘরে বসে ছবির পর ছবি আঁকত, আর মরিয়ম সেগুলি বিক্রি করার জন্যে বেরিয়ে যেত। কখনো এসপ্লানেড পর্যন্ত গিয়ে, কখনো আপিসে-আপিসে গিয়ে, কখনো-বা হোটেলে-হোটেলে গিয়ে।

এইভাবে আড়াই বছর কাটল। ইতিমধ্যে সে জেনে নিয়েছে হোয়াট ইজ মহেঞ্জোদরো অ্যান্ড হোয়াট ইজ নটরাজ।

তার পর ওয়ান ফাইন মর্নিং তাকে ফেলে নটরাজ উধাও হয়ে গিয়েছে।

"নাউ অ্যায়াম স্ট্র্যান্ডেড।"

দেশে ফিরে গেল না কেন, জিজ্ঞাসা করছেন পরাশর? সেটা তো সোজা। যদিও দেশে ফেরার মতন রেস্ত তার নেই, কিন্তু তাতে আটকাবে না। আমেরিকান এম্‌ব্যাসিতে গিয়ে সব অবস্থা জানালে তারা একটা ব্যবস্থা নিশ্চয়ই করবে।

কিন্তু দেশে ফিরবে সে কোন্ মুখে? দেশের লোককে সে কি বলবে? একজন প্রিন্সকে বিয়ে করে তার ভাগ্য একেবারে খুলে গিয়েছে—এটা তো তারা দেখেছে। এখন একজন পপার হয়ে সেখানে যাওয়া যায় না।

তার হাজব্যান্ড এখন নেই, তাই সে এখন নিজেকে বলে মিস। ইন্ডিয়াকে সে ভালোবাসে, তাই এখনো সে মমতা।

একজন ইন্ডিয়ান হয়ে তার বিষয়ে পরাশরের কিছু করার আছে কিনা পরাশরকে সে তা ভেবে দেখতে অনুরোধ করল। যে কাজের জন্যে পরাশর লোক চান, সে কাজ সে পারবে—এটুকু কনফিডেন্স তার উপর রাখলে পরাশর নাকি ঠকবেন না।

কোনো উত্তর দিতে পারলেন না পরাশর পুরকায়স্থ। মরিয়মের মুখের দিকেও চাইতে পারলেন না। মেয়েটার জন্যে তাঁর করুণা অবশ্য হল, মেয়েটা যে খুব বেকায়দায় পড়েছে, তাও বুঝলেন। অথচ তাঁর দ্বারা এর কি সুরাহা হতে পারে তা ভেবে পেলেন না তিনি।

পরাশর অবশেষে বললেন যে, তিনি ভেবে দেখবেন; আরও কয়েকজন ক্যান্ডিডেট আছে তাদেরও ইন্টারভিউ নিতে হবে। তারপর তিনি জানাবেন।

"প্লিজ ডু ইট্ আর্লি।" মরিয়ম বলল, কেননা লাভলক প্লেসে আর মাত্র পাঁচ দিন সে থাকতে পারবে, এক আমেরিকান পরিবারে সেখানে সে গেস্ট হয়ে আছে। তারপর কোথায় যাবে ঠিক নেই।

আচ্ছা। তাই হবে। তাড়াতাড়ি জানাবারই চেষ্টা করবে সে। কিন্তু, উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে পরাশর তাকে জানাল যে, তার দেশে ফিরে যাওয়াই কিন্তু সবচেয়ে ভালো।

চলে যাবার জন্যে তৈরি হয়েছিল মরিয়ম, থমকে থেমে বলল, "নো। আই কান্ট ডু দ্যাট টু সেভ মাই ফেস।"

হেমন্তবালা দত্ত

একেবারে গলদ্‌ঘর্ম হয়ে এসেছেন। দেখে মায়া হওয়ার আগে একটু বিরক্তই হলেন পরাশরবাবু।

চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ বছর বয়স হবে মহিলাটির। একেবারে গার্হস্থ্য চেহারা। হাত-দুটো টেবিলের উপরে রেখেছেন, পরাশরবাবু লক্ষ করলেন নখের ডগাগুলি একটু-একটু যেন ক্ষয়ে গিয়েছে।

পরনে চওড়া-পেড়ে শাড়ি। কিন্তু সিঁথি সাদা। কুমারী না বিধবা বোঝা কঠিন। যাক গে। একটা কিছু হলেই হল।

পরাশরবাবুর মন বিশেষ-যেন সুবিধের নয়। সকালে তাঁর ঘুম ভেঙেছে মন-খারাপ নিয়ে। আজ আর কারো সঙ্গে দেখা করার তাঁর যেন তেমন ইচ্ছে করছিল না। অথচ, দেখা না করে তো তাঁর কোনো উপায় নেই। তিনি যাঁদের আসার জন্যে সময় ও তারিখ

দিয়ে চিঠি দিয়েছেন তাঁরা এসে ফিরে যাবেন—এটা কোনো কাজের কথা নয়। তিনি তাই ধীরে-ধীরে তৈরি হয়ে নিলেন। ওরই ফাঁকে একবার তাঁর ফাইল উল্টে দেখে নিলেন। আজ যিনি এখন আসছেন তাঁর নাম শ্রীমতী হেমন্তবালা দত্ত। বয়স লিখেছেন প্রায় চল্লিশ। বহুকাল থেকে নাকি মাস্টারি করছেন।

পরাশরবাবু নিজের মনেই একটু হাসলেন, ভাবলেন, এরকম পাকা একজন মাস্টারনি রাখলে হয়তো তিনি সারাদিনই পরাশরবাবুর উপর মাস্টারি করবেন। পরাশরবাবু তখন কি করবেন? তিনি অনুগত ছাত্র হয়ে যাবেন। বেশ হবে, ঐ অছিলায় শিশুকালটা আবার ফিরে পাওয়া যাবে, সেকালের স্মৃতিটা মনের সঙ্গে আঠা হয়ে লেগে আছে, কিন্তু সেকালের স্বাদ ভুলে গিয়েছেন একেবারেই। সে স্বাদ আবার পেলে মন্দ হবে না।

সেই হেমন্তবালা দত্ত এসে পৌঁছেছেন কাঁটায়-কাঁটায় ঠিক ন'টায়। একেবারে গলদ্‌ঘর্ম হয়ে এসেছেন তিনি।

বললেন, "দেরি হয়ে যাবে ভয়ে ছুটতে-ছুটতে আসছি। ছেলেপিলেদের নিয়মানুবর্তিতা শেখাই, নিজেরাই যদি নিয়ম মেনে না চলি, সময় সম্বন্ধে সাবধান না হই, তবে—"

বালিগঞ্জ স্টেশন থেকে ট্রেনে চেপে বেলেঘাটা স্টেশনে নামেন, সেখান থেকে হেঁটে এসে ওঠেন ট্রামে, ট্রাম থেকে নেমে পড়েন ওয়েলিংটন স্কোয়ারে, যার নাকি এখনকার নাম সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার। এত নাম-বদল হচ্ছে, কলকাতার কী যে দশা হবে, একদিন কিছুই খুঁজে পাওয়া যাবে না। বলা যায় না, কোনো উৎসাহী মানুষের চেষ্টায় একদিন হয়তো কলকাতা শহরটারই নাম বদলে যাবে। নেহরু-নগর, গান্ধী-নগর, সুভাষ-নগর—একটা কিছু করে দিলেই হল।

ট্রাম থেকে নামেন ন'টা বাজতে পাঁচে। বুঝতে না পেরে একটু দূরেই নেমে পড়েন। সেখান থেকে নম্বর দেখে এগোতে এগোতে ভয় হল, বুঝি বাড়ি খুঁজে পেতে ন'টা বেজে যাবে। তাই প্রায় ছুটতে-ছুটতে এসেছেন। অবশ্য, মেয়েদের পক্ষে ছোটা যতটা সম্ভব।

বেশ চটপটে আর ছটফটে ধরনের চেহারা। খেটে-খাওয়ার মতই দেখতে।

পরাশরবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, "বিজ্ঞাপন তো নিশ্চয়ই দেখেছেন। ও ধরনের কাজ করার অভ্যাস আছে তো?"

"ও ধরনের মানে? এই, দেখা-শোনা করার? তা খুব আছে।"

"এর আগে এ রকম কাজ করেছেন কোথাও?"

হেমন্তবালা একটু ভাবলেন, ভেবে বললেন, "মেয়েদের কাজই তো এই। সেই কাজই তো করছি বলতে গেলে।"

"কোথায়?"

"ইস্কুলে। একপাল ছেলেপিলেকে সামলানো কম কথা নয়। এটা নিশ্চয় মানবেন। তা ছাড়া—"

কি-যেন বলতে গিয়ে থেমে গেলেন হেমন্তবালা। পরাশরবাবু তাঁর মুখের দিকে তাকালেন, বললেন, "কি-যেন বলছিলেন?"

হেমন্তবালা একটু থেমে বললেন, "জল খাব। কোথায় আছে ব'লে দিন, আমি গড়িয়ে নিচ্ছি।"

ঘণ্টা বাজালেন পরাশরবাবু, বেয়ারাকে জল দিতে বললেন।

জলে বড় একটা চুমুক দিতে গিয়েই হেমন্তবালা গরম চায়ে চুমুক দেওয়ার মতন

শিউরে উঠলেন, ঢোক গিলে নিয়ে বললেন, "ইশ্, ঠাণ্ডা বরফ। এক্ষুনি বরফ গলিয়ে নিয়ে এল বোধ'য়।"

পরাশর কোনো উত্তর দিলেন না।

কসবা থেকে আসছেন হেমন্তবালা। কসবার সুইনহো লেন থেকে। কসবা কি চেনেন পরাশরবাবু? আগে ছিল প্রায়-একটা গ্রাম। এখন প্রায়-শহর। বালিগঞ্জ স্টেশনের পরিচ্ছন্ন দিকটার নাম বালিগঞ্জ, অন্য দিকটা কসবা।

চেনেন কি না-চেনেন সে সম্বন্ধে তিনি কিছু বললেন না, কিন্তু কসবা তাঁর বিলক্ষণ জানা। কিন্তু সে কথা ব'লে কথা বাড়িয়ে লাভ নেই।

হেমন্তবালা এবার হেসে বললেন, "যে কথা বলতে গিয়ে থেমে গিয়েছিলাম—বুড়ো-মানুষের পরিচর্যা করার অভ্যাস আমার খুব আছে। আপনাকে দেখাশুনা করতে আমি খুব পারব। আমার উপর নির্ভর করলে আমার কাছে কাজ পাবেন।"

হেমন্তবালার বয়স যখন যোলো তখন তাঁর বিয়ে হয়। তাঁর স্বামীর বয়স তখন প্রায়-পঞ্চাশ—দোজবরে। আগের পক্ষের এক মেয়ে ও তিন ছেলে। সেই সংসারে বৌ হয়ে এল হেমন্ত। এতে তার ভাল হল কি মন্দ হল, তা তখন ভাবতেই শেখেনি হেমন্ত।

তারা থাকত ঢাকুরিয়ায়। তার বাবার একটা দর্জির দোকান ছিল ঢাকুরিয়া স্টেশনের কাছে। দোকানের নাম ছিল সাদামাটা—দর্জিঘর। টিমটিম করে চলত দোকান। বাবা ছিলেন খুব রুগ্ন, খুব খাটতে পারতেন না। খাটতে পারলে তাঁর কারবার নিশ্চয় বেশ ভালো চলত। ছাঁটকাটে বাবার হাত ছিল খুব পাকা।

যাঁর সঙ্গে হেমন্তবালার বিয়ে হয় তিনি বালিগঞ্জে গড়িয়াহাটার মোড়ে একটি জামা-কাপড়ের দোকানে কাজ করতেন। খানিকটা কাজের সূত্রেই তার বাবার সঙ্গে ঐ লোকটির পরিচয় ছিল। চারটি ছেলেমেয়ে রেখে লোকটির বৌ মারা গেছে; বাবা দেখতে যান। আর, সেই দিনই নাকি কথা পাকা হয়ে যায়। মাস-তিনেক পরেই বিয়ে হয় হেমন্তবালার।

এত তাড়াতাড়ি সব ঘটনা ঘটে গেল যে, হেমন্তবালা তখন কিছুই ভাবতেই পারল না। ঢাকুরিয়াতে কর্পোরেশন ইস্কুলে তখন সে পড়ছিল। তার কেন-যেন ইচ্ছে হত, সে আরও পড়াশুনা করবে। তাদের পাড়ার তার সমানবয়সী মেয়েদের মতন বড় ইস্কুলে পড়তে যাবে সে। তাদের মতন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন জামাকাপড় সে পরবে।

কিন্তু কি ক'রে হঠাৎ কি হয়ে গেল, তার জীবনটাই পালটে গেল একেবারে। দর্জির সংসার থেকে সে চলে এল, একটু হেসে বলল হেমন্তবালা, জামাকাপড়ের সংসারে।

ময়রা যেমন মেঠাই খায় না, তারাও তেমনি ভালো জামাকাপড় কখনো পরেনি। তার জন্যে সে দুঃখ করেনি অবশ্য কখনো, এখন এমনি বলছে সে গল্পটা।

ঠাণ্ডা হিম জল ইতিমধ্যে একটু গরম হয়ে থাকবে। হেমন্তবালা এক-চুমুকে সবটা জল খেয়ে কাপড়ের পাড় দিয়ে মুখ মুছল, বলল, "উ, শুকিয়ে গিয়েছিল বুকটা।"

প্রথম-দর্শনে তেমন মায়া হয়নি এর উপর পরাশরের, এখন এই কথাটা শুনে একটু যেন মায়াই হল, তাঁর বুকের ভিতরটা একটু যেন মোচড় দিয়ে উঠল। বললেন, "আর একটু জল দিতে বলি?"

"রক্ষে করুন। যা ঠাণ্ডা। দাঁত এখনো কনকন করছে। এখন বলুন, কবে থেকে আপনার কাজে লাগতে হবে।"

এক্ষুনি পরাশরবাবু কী ক'রে বলবেন সে কথা। কিন্তু তা প্রকাশ না ক'রে বললেন,

"সেটা পরে ঠিক করা যাবে।"

"তা তো বটেই। ভেবেচিন্তে ঠিক করাই ভালো।"

হেমন্তবালার ছেলেপিলে? না, কিছু হয়নি। ভগবান বাঁচিয়েছেন। সতীনের ছেলেদের সামলাতে-সামলাতেই তার রক্ত জল হবার দশা, এর উপরে যদি নিজের আবার কিছু থাকত, তাহলে অনাহারেই মরতে হত সংসার-সুদ্ধ।

তার সতীনের মেয়েটির বয়স তার চেয়ে কিছু বেশিই ছিল। তার বিয়ের দু বছরের মধ্যেই তাকে পার করা হয়ে গিয়েছে। কোন্নগরে বিয়ে হয়েছে। ভালোই আছে নিশ্চয়। মন্দ কোনো খবর হলে এতদিনে কানে ঠিক পেঁছে যেত কাকের মুখেই।

কে কার খবর নেয় এই বাজারে। সকলেই নিজের-নিজের ঝঞ্ঝাট নিয়ে হিমশিম খাচ্ছে। "আপনারা বেশ আছেন, এত বড় বাড়ি করেছেন, এমন সাজিয়ে-গুজিয়ে রেখেছেন। বেশ আরামেই আছেন। এমন বাড়ি বানাতে কি রকম খরচ তা আমরা ধারণাই করতে পারি নে।"

কিন্তু এসব কথা কেন। বেশ অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন পরাশর পুরকায়স্থ। এখানেই কথা শেষ ক'রে দিয়ে হেমন্তবালাকে বিদায় দিয়ে দিলেও হত, কিন্তু তার ভাগ্যে বরাদ্দ সময় যেভাবে ইচ্ছে সে খরচ করুক, এই রকম নির্বিকার ভঙ্গিতে বসে চুরট ধরাতে লাগলেন তিনি।

"আজকালকার ছেলেরা যা হয়েছে বলার নয়। কথায়-কথায় বিড়ি, মিনিটে-মিনিটে সিগারেট না হলেই তাদের চলে না।" হেমন্তবালা একটু থামল, তারপর বলল, "কিন্তু কোথা থেকে যে আসে সে খোঁজ রাখার দিকে মন নেই।"

তার তিনটি ছেলে হয়েছে তিন রকমের। সতীনের ছেলে এখন আর তাদের বলে না, এতদিনের অভ্যাসে ওরাই হয়ে গিয়েছে তার নিজের ছেলে।

বড়টি তো প্রায় হেমন্তবালারই বয়সী। এত বয়স হয়েছে, এখনো ছোকরাটি সেজে ঘুরে বেড়ায়। কখনো বলে চাকরি করছি, কখনো বলে চাকরি গেল। কী-যে করছে আর কোথায় যে যাচ্ছে তা জানারও উপায় নেই। পাড়ায় খুব দুর্নাম ওর। ঘেন্নারই কথা, হেমন্তবালা মাথা নীচু ক'রে বলল, তার সঙ্গে লোকে নাকি হেমন্তবালাকেও জড়িয়ে কথা বলে।

লোকে পাঁচকথা বলবে, তাদের মুখ বন্ধ করবে কে? ছেলেটার চালচলন যদি বেকায়দা হয়, তবে বদনাম লোকে দেবেই।

অন্য দুটিও মানিক। তাদের গুণের কথা বলে আর দরকার নেই। কসবা পাড়ায় তাদের না চেনে কে? ওদের মধ্যের বড়টা তো দু-বার জেলই খেটে এল। রাত-দুপুরে নাকি মালগাড়ির ওয়াগন ভাঙে। লোকে তো তাই বলে, সত্যিমিথ্যে সে জানে না, নিজে চোখে তো সে দেখেনি সেইসব আকাম করতে।

এইসব নিয়ে আছে হেমন্তবালা। বছর তিনেক হল মরেছে তার স্বামী। বাঁচাই গেছে বলতে গেলে—এমন কথা যদিও বলতে নেই মেয়েদের। কিন্তু না বলে উপায় কি। যে পুরুষের মুরদ কম, তার তোম্বি বেশি হয়েই থাকে। তোম্বি তো ছিলই, তার উপরে ছিল সন্দ-বাই।

তার জীবনের সর্বনাশ যা করার তা তো করেই গিয়েছেন তার বাবা, এক বুড়োর হাতে সঁপে দিয়েছেন তাকে। কিন্তু জীবনটা কি কেবল স্বামীর হাতেই সঁপে দিতে হবে, নিজের জীবন নিজে একটু গড়ে-পিটে কি নিতে নেই মেয়েদের? হেমন্তবালা সেই চেষ্টায় ছিল,

নিজেকে একটু গড়ে-পিটে নেবার জন্যে সে চেষ্টা করত।

সংসারের অবস্থা কি রকম ছিল তা নিশ্চয় আন্দাজ করতে পারছেন পরাশরবাবু। আজকাল নাহয় বেচাকেনা একটু বেড়েছে, গড়িহাট রোডের মোড়ে এখন সন্ধেবেলা লোক-গিশগিশ করে, কিন্তু পনেরো-বিশ বছর আগে ব্যবসার এমন রবরবা অবস্থা ছিল না, কর্মচারীদের মাইনে-পত্রও ছিল অনেক কম, তার উপরে সেই টাকা দেওয়া হত সুবিধে-মতন কিস্তিতে।

সংসার চলে না। অথচ সংসার তো চালাতে হবেই। আর, সংসার চালাবার ভার যার উপরে তারই তো যত-সব দায়, অন্যেরা তো কেবল টাকা ফেলে দিয়েই খালাশ।

কসবায় একজন দরদী লোক ছিলেন, বয়স বেশি ছিল না, কিন্তু তাঁর খাতির ছিল খুব। অনেকের অনেক উপকার তিনি করেছেন। তার উপর, শরীরের শক্তিও আগের মতন তাঁর নেই।

"তাঁর নাম নিশ্চয় শুনেছেন।"

"কি নাম?"

হেমন্তবালা বলল, "নামটা কিন্তু খুব সুন্দর। কৌস্তুভকান্তি সেন। কি, শুনেছেন নাকি নাম?"

পরাশরবাবু বললেন, "নামকরা লোক যখন তিনি তখন নিশ্চয় শুনেছি। কিন্তু এখন মনে করতে পারছি নে।"

"উনি আমার অনেক উপকার করেছেন। তাঁর দয়াতেই এখনো খেয়ে-প'রে কোনো-রকমে আছি।"

আজকাল তো বি-এ এম-এ পাস না করলে চাকরিই হয় না, কিন্তু বিশ বছর আগে তো এ দশা ছিল না। কৌস্তুভকান্তি তখন হেমন্তবালাকে ঢুকিয়ে দেন কর্পোরেশনের ফ্রি প্রাইমারি ইস্কুলে।

হেমন্তবালা হাসল, "সাহসও কম না আমার। কর্পোরেশন ইস্কুলের বিদ্যে যার সেই মাস্টারি করতে আরম্ভ করল।"

হেমন্তবালার বয়স তখন বিশ। তার বিয়ের চার বছরের মধ্যেই সে পেয়ে গিয়েছিল এই কাজ। এজন্যে সেন-বাবুর কাছে সে যে কতটা ঋণী তা সে বলে বোঝাতে পারবে না।

সেন-বাবু থাকেন ঘোষালপাড়ায়। তখন তাই থাকতেন। হেমন্তবালার স্বামী দোকানে বেরিয়ে গেলে সেও বেরিয়ে পড়ত। সে চলে যেত কৌস্তুভকান্তির কাছে। ঢাকুরিয়ার মেয়ে সে, কসবার বউ। ঢাকুরিয়া আর কসবা তো পাশাপাশি জায়গা। তাই সহজভাবে চলাফেরা করতে সে কোনো অসুবিধে বোধ করত না।

কিন্তু অসুবিধে হল ঐ বুড়োটাকে নিয়ে, হেমন্তবালা তার স্বামীর কথা বলছে। সেন-বাবুর কাছে যাচ্ছে জানতে পেরে বুড়োর সে কী মেজাজ, বলল, 'কি চাস্ তুই তার কাছে?'

প্রথম-প্রথম উত্তর দিত না হেমন্তবালা, পরে বলেছিল, 'চাকরি।'

বাড়ির বউ হয়ে তার আশ মেটেনি, সে সেন-বাবুর চাকরানি হতে চায়? এটা নাকি ভীষণ আস্পর্ধা হেমন্তবালার।

তার সমস্ত অবস্থা জেনে তার উপর নিশ্চয় মায়া হয়েছিল সেন-বাবুর, মুখে অবশ্য তিনি কোনো কথা বলেন নি। তার জন্যে কত জায়গায় কত চেষ্টা করেছেন তার কিছু কিছু

অবশ্য সে শুনেছে সেন-বাবুর কাছেই।

অবশেষে, যা ভাবতেই পারেনি তাই পেয়ে গেল হেমন্তবালা। সে পেয়ে গেল মাস্টারির কাজ।

একদিন একটা দরখাস্তের নীচে সেন-বাবু তাকে সই ক'রে দিতে বললেন। কলমটা ধরে সে সই করে দিল শ্রীমতী হেমন্তবালা বিশ্বাস।

সেন-বাবুর সেই কথাটা এখনো তার কানে লেগে আছে, জীবনে ভালো কথা সেইদিন সে প্রথম শুনল, সেন-বাবু বলেছিলেন, 'বা, তোমার হাতের লেখা তো বেশ খাসা।'

কর্পোরেশনের একজন ইস্কুল-ইন্সপেক্টরের সঙ্গে সেন-বাবুর খুব বন্ধুত্ব ছিল। সেন-বাবু দেশের কাজ আর দশের কাজ করতেন, তাই লোকে তাঁকে সম্মানও করত। তাঁর কথা রাখার চেষ্টা করত। তাঁর দৌলতে বরাত খুলে গেল হেমন্তবালার। কিন্তু সেন-বাবু বলতেন, তাঁর নাকি তেমন কোনো হাত নেই, হেমন্তবালা কাজটা পেয়েছে তার হাতের লেখার গুণেই।

কথাটা বোধ হয় ঠিক। পরাশরবাবু দরখাস্তে একবার চোখ বুলিয়ে নিলেন। সত্যি, বেশ হাতের লেখা। তাঁর এখন ঠিক মনে পড়ছে না, তিনি অতগুলি দরখাস্তের মধ্যে থেকে এটাকে যখন বেছে নিয়েছিলেন তখন হয়তো ঐ হস্তাক্ষর দেখেই বাছাই করেন।

"চাকরি নিলাম। সাহাপুরের ইস্কুলে যোগ দিতে হবে। কেওড়াতলা শ্মশানের কাছে সেই ইস্কুল। চাকরি জুটিয়েছি জেনে বুড়োটা খুব খুশি হল বটে, কিন্তু একা ছাড়তে চাইল না আমাকে। তাই আমাকে দিয়ে আসার ও নিয়ে আসার ভার পড়ল তার বড় ছেলেটির উপর।"

খালি-পায়ে ইস্কুলে যাওয়া যায় না, কিন্তু চটি পরাও তখন একটা নিন্দার কাজ। তাই চটিজোড়া হাতে নিয়ে শাড়ির নীচে হাত রেখে বালিগঞ্জ স্টেশন পর্যন্ত, তারপর পায়ে দিতে হত চটি।

সঙ্গে-সঙ্গে চলত জনার্দন। বুড়োটা তাকে হেমন্তবালার পাহারাদার বানিয়ে দিল। তার রোজকার কাজ এখনো এই। সে আমার সঙ্গে লেগেই আছে।

সেন-বাবুর সঙ্গে কোথাও দেখা হয়েছে কিনা, এখবর বুড়োর রোজ নেওয়া চাই জনার্দনের কাছে।

জনার্দন তাকে ইস্কুলে পেঁৗছে দিয়ে বাড়ি ফিরে আসত না। কাছে-ভিতেই অপেক্ষা করত। এতটা রাস্তা হেঁটে ফিরবে, আবার হেঁটে আসবে কেন, তার যখন কোনো কাজও নেই তখন অপেক্ষা করাই ভালো।

বেশির ভাগ দিনই নাকি সে শ্মশানে বসে থাকত। ওতে নাকি সময় বেশ কাটে। একদিন সে বলল, 'জানো? আজ একটা খুব সুন্দর বউকে নিয়ে এসেছিল। আমার চোখের সামনে সে পুড়ে-পুড়ে ছাই হয়ে গেল। বউটা অনেকটা তোমার মত দেখতে।'

বাইরে থেকে আগুন লাগিয়ে যাদের পোড়ানো হয় তাদের পোড়াটা মানুষ দেখতে পায়। কিন্তু ভিতরে-ভিতরে জ্বলতে থাকে যাদের আগুন তাদের পোড়ানি কেউ দেখে না।

ইস্কুলে যাবার আগে সংসারের সমস্ত কাজ সেরে রেখে যেতে হয়। রান্না করা, বাটনা বাটা, বাসন মাজা, কাপড়কাচা—সবই। এখন পর্যন্ত ওইভাবেই চলেছে তার জীবন।

নখের ডগাগুলি ক্ষয়ে গেছে, আবার লক্ষ্য করলেন পরাশরবাবু। হয়তো বাটনা বেটে-বেটে ও বাসন মেজে-মেজে ঐ দশা হয়েছে নখের। পরাশরবাবু হেমন্তবালার মুখের দিকে

তাকালেন।

জিজ্ঞাসা করলেন, "সেই জনার্দন আজও নিশ্চয় এসেছে সঙ্গে।"

"না। বলেছি, আজ আমার ছুটি। ওকে ভোরবেলা পাঠিয়েছি কোন্নগরে—ওর বোনের কাছে। বাধ্য আছে, কথা শোনে।"

পরাশরবাবু কি বুঝলেন উনিই জানেন, তিনি ধীরে ধীরে মাথা নাড়তে লাগলেন।

"আমি ওদের না জানিয়ে ওদের কাছ থেকে পালাতে চাই, তাই এ-ব্যাপারটা ওদের জানতে দিতে চাইনে।"

"আর, সেন-বাবু? তাঁকেও গোপন ক'রে নাকি?"

"না। গোপন করার কি আছে। তাঁকে না জানিয়ে কোনো কাজ করব না।"

সেন-বাবুর সঙ্গে দেখা তার হত। তিনি দেশের কাজ করেন, দশের কাজ করেন। কোনো-না-কোনো কাজ নিয়ে তিনি সরাসরি চলে আসতেন ইস্কুলে—হেডমিস্ট্রেসের সঙ্গে তাঁর পরিচয়, ইন্সপেক্টরের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব, ইস্কুলে চলে আসায় তাই তাঁর কোনো বাধা হত না। না না না, জনার্দন টের পাবে কি ক'রে, সে হয়তো তখন শ্মশানের চিতায় চেয়ে চেয়ে দেখছে ঐ আগুনে কে কে পুড়ে ছাই হচ্ছে।

কিন্তু ও নিজেও যে ওর জীবনকে পুড়িয়ে পুড়িয়ে ধীরে ধীরে ছাই করে ফেলছে তা ও জানেই না। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর ঐ একই কাজ ক'রে চলেছে সে। নিজের ভবিষ্যৎ ভাবেনি।

"ভাবুন, জীবনে আর কোনো কাজ করল না ও, আর কোনো কাজের চেষ্টাও না। এখন বয়স হয়ে গিয়েছে, এখন আর ওকে কাজ দেবে কে?" একটু থেমে হেমন্তবালা বলল, "আপনার কারখানায় অমন বয়সী লোক নেন না?"

পরাশরবাবু বলে উঠলেন, "আমরা বয়স দেখিনে, আমরা দেখি যোগ্যতা।"

হেমন্তবালা বিনীতভাবে বলল, "তার কথা বলতে আসিনি বটে, কিন্তু সুযোগ পেলে ও কিন্তু যোগ্য হতে পারবে।"

হেমন্তবালার জন্যেই ওর জীবন নষ্ট হল, এই জন্যেই তিনি তার কথা ভাবছেন, তার চরণদার হয়েই জীবন কাটিয়ে দিল বেচারা।

ওর কেমন একটা অভ্যাস হয়ে গেছে, কেমন একটা নেশা। সকাল হওয়া মাত্র ব্যস্ত হয়ে ওঠে, তৈরি হতে থাকে। ইস্কুল ছুটি থাকলে ও ছটফট করে, কিছু একটা কাজ চায়। এবং তখন যে-কোনো ফরমাশ করলেই আর বিরুক্তি করে না, তখনই সেই কাজ করতে ছোটে। "খুব বিশ্বাসী ও, খুব বিশ্বস্ত।"

তা নিশ্চয়ই হবে। নইলে টানা কুড়ি বছর ধরে একই কাজ একইভাবে কি কেউ করে যেতে পারে। আর, এটা এমন কাজ যার নাকি কোনো মাইনে নেই, যার কোনো দক্ষিণা নেই।

প্রায়-সমবয়সী ওরা দুজন। পাশাপাশি হেঁটে-হেঁটে একসঙ্গে তারা বড় হয়ে উঠল। এতদিন এভাবে একত্র থাকলে একটু মমতা জন্মানোই স্বাভাবিক।

কিন্তু লোকে নাকি ওসব বোঝে না, তারা যা-খুশি তাই ইঙ্গিত করে। বুড়োটা মারা যাবার আগে একটু চাপা গলায় করত, এখন গলা একটু বেড়েছে।

আর-দুটির কথা তো বলেছে। সে দুটি তো মানিক। কোনো কাজকর্ম করে না, কিন্তু ভালো-ভালো জামাপ্যাণ্ট পরে, হাতে রিস্টওয়াচ বাঁধে। তাদের সিঁথির নানান কায়দা।

ওদের নিয়ে খুবই মুশকিল হয়েছে, ওরা কথা শোনে না। গ্রাহ্য করে না। অনেক

রাত্রে বাড়ি ফেরে, কোথায় কি ক'রে বেড়ায় কিছুই জানা যায় না।

সবই শোনা কথা হেমন্তবালার। ছোটটা নাকি হাতসাফাইয়ে ওস্তাদ। দোকানে ভিড় দেখে নাকি ঢোকে, আর, ফাঁক বুঝে হাতসাফাই করে। মারধোরও নাকি খায় রাস্তার লোকের কাছে। নাকমুখ ফুলিয়ে বাসায় ফেরে। জিজ্ঞেস করলে বলে, খেলতে গিয়ে লেগেছে।

আচ্ছা, মালগাড়ি ভাঙাটা খুব লাভের ব্যবসা নাকি? এত ঝুঁকি যে নেয় সেজ ছেলেটা, তার মানেটা কি? রেল লাইনের ধারে ধারে বন্দুকধারী পুলিশরা নাকি থাকে পাহারায়। দিনকতক আগে গড়িয়াহাট লেবেল ক্রসিং-এর কাছে পঞ্চাননতলার বস্তির একটা ছেলে পুলিশের গুলি খেয়ে নাকি মারাই গিয়েছে। শুনে বুক কাঁপতে থাকে হেমন্তবালার। কবে যে সনাতনের কি হবে—এই তার ভাবনা। দেশের সরকার যদি ইচ্ছে করে তাহলে এদের ভালো ক'রে দিতে পারে না?

এরা তাকে গ্রাহ্য করে না, মানেও না—সবি সত্যি। কিন্তু এদের সংসারে এতদিন থেকে, রেঁধে-বেড়ে এদের খাইয়ে এদের উপরে তার একটা মায়া তো জন্মে গিয়েছে। এই মায়ার জন্যেই সে কষ্ট পাচ্ছে, তা না হলে কি আর? সে কি জানে না যে, ওরা তার কেউ নয়?

এক-এক সময় ভাবে হেমন্তবালা, সত্যি, ওরা তার কে। যে বুড়োর সঙ্গে তার বিয়ে হয়েছিল, কিন্তু কোনো সম্পর্ক ছিল না, ওরা তো তার ছেলে। তবে, ওদের নিয়ে হেমন্তবালার এই মাথাব্যথা কেন।

ওটা বুঝি মেয়েদের স্বভাব। পরের জন্যে বড্ড বেশি মাথা ঘামায় মেয়েরা। কথাটা ঠিক না? মেয়েরা অকারণে মাথা ঘামায় না?

এত-যে নচ্ছার, এত-যে হতচ্ছাড়া, এত-যে বাউণ্ডুলে, তবু একটা গুণ ওদের আছে। সেটা স্বীকার করবে হেমন্তবালা। যেমন নোংরা হোক, যেমন ঘিঞ্জি হোক, যেমন স্যাঁতসেঁতে হোক—তবু নিজের ঘরের উপরে টান তাদের খুব। বাইরে যা-ই করে বেড়াক, ঘরে তাদের ফেরা চাই-ই।

সনাতনকে পাড়ার লোকে বলে হীরো। সিনেমার হীরোদের মতন ওর চালচলন। মাথার চুলে বাহাদুরি খেলিয়ে, লম্বা জুলপি ঝুলিয়ে, অদ্ভুত কাটের জামা গায়ে দিয়ে, ঘাড় একটু শক্ত ক'রে হন্‌হন্‌ করে সে হেঁটে যায়। পাড়ার লোকের সঙ্গে বেশি কথা বলে না। কোথায় যায়, কেউ জানে না। ও নাকি সিনেমার হীরো হবে। একটা ছবিতে নাকি সে নেমেওছে। একটা ভিড়ের দৃশ্যে।

এত-যে বদনাম ওদের, তবু আরও একটা গুণ ওদের আছে। পাড়ার মেয়েদের জ্বালাতন করে না ওরা। ওরা যা করে সবই বাইরে-বাইরে। তাই ধরা-ছোঁয়ার বাইরে আছে দুই ভাই। অথচ পুলিশ নাকি লেগে আছে ওদের পিছনে।

'পুলিশ কেন রে' জিজ্ঞাসা করলে সাফ জবাব দিয়ে চলে যায়, বলে, 'ওরা ফুলিশ'।

'এত জামাকাপড় পাস কোথায় রে' বললে বলে, 'রোজগার করা জানতে হয়, তোমার খাই ব'লে তোমার পরব? আমরা পুরুষমানুষ না?'

পুরুষমানুষই যদি, সংসারে তবু কিছু দিলে ভালো হয় না? একজনের মাস্টারির টাকা দিয়ে চারজনের খাওয়াটা কুলোয় না, তার উপর জামাকাপড় তা অন্তত দুজনের জন্যে কিনতেই হয়, জনার্দনের ও হেমন্তবালার নিজের।

মেজটা, অর্থাৎ পঞ্চানন কথা বলে কম, কিন্তু স্টাইল তার সবচেয়ে বেশি। দামী জিনিস ছাড়া পরে না, হাতে দামী ঘড়ি।

বস্তির মতন এমন-একটা ঘর থেকে ঐ রকম রাজপুত্র সেজে বের হলে লোকের চোখে তা লাগবেই। লাগেও।

চোর জোচ্চোর বাটপাড় পকেটমার—ইত্যাদি যা খুশি তাই বলে। চেঁচিয়ে তো বলে না, তাই ওদের কানে তা যায় না বটে, কিন্তু হেমন্তবালার কানে তা যায়।

কৌস্তুভকান্তিকে সব বলেছে হেমন্তবালা। বলেছে, এর মধ্যে আর থাকা যায় না।

হঠাৎ প্রশ্ন করলেন পরাশর, "কি বললেন সেন-বাবু?"

মাথা নীচু ক'রে বসল হেমন্তবালা, উত্তর দিল না।

"এখানে যে দরখাস্ত করেছেন, সে কথা তিনি জানেন?" পরাশরের এই দ্বিতীয় প্রশ্ন শুনে হেমন্তবালা মাথা নাড়ল, বলল, "না।"

"যিনি এত উপকার করলেন তাঁকে না জানিয়ে—"

হেমন্তবালা বলল, "জানলে যদি বাধা দেন এই ভয়ে বলিনি। কিন্তু কাজটা হয়ে গেলে তাঁকে নিশ্চয় জানাব। তখন তাঁর সঙ্গেও আপনার আলাপ হবে। দেখবেন, দেবতার তুল্য মানুষ।"

আশায় রইলেন পরাশরবাবু। দেবতার তুল্য মানুষ তিনি কম দেখেন নি, দেবীর তুল্য নারীও দেখেছেন অনেক। আর নতুন কাউকে দেখার সাধ তাঁর নেই। কিন্তু হঠাৎ যদি এসেই পড়ে চোখের সামনে, তখন না দেখে উপায়ও নেই অবশ্য। তেমন অবস্থা হলে কৌস্তুভকান্তিকেও তিনি দেখবেন।

দেশের ও দশের কাজ নিয়েই যারা মেতে থাকে তাদের সময়ই হয় না নিজের কথা ভাবার। তাদের দশাও তাই ধীরে-ধীরে দুর্দশায় দাঁড়ায়। সেন-বাবুর অবস্থা এখন তেমনি। তাঁর কথা ভাবলে কষ্ট হয়। তাঁর জন্যে হেমন্তবালা কী-যে করবে তা ভেবেই পাচ্ছে না।

এর মধ্যে আর-একটা কাণ্ড বেধেছে। আজকালকার মেয়েরা যে এত বেকুব হয়ে গিয়েছে কী ক'রে ভাবাই যায় না। মাসখানেক হবে, মেজ ছেলেটা, ঐ পঞ্চাননটা একটা মেয়েকে এনে তুলেছে বাসায়। মেয়েটি নাকে নাটক ক'রে বেড়ায়। দেখতে খাসা। সাজ-গোজ করতে জানে। চালাক-চতুরই মনে হয়, অথচ—

"পঞ্চানন নাকি তাকে বিয়ে করবে। পঞ্চানন না হয় চোর, ঠগ, কিন্তু মেয়েটা কি ভরসায় চলে এসেছে তাই ভাবি।"

"পুরুষরাই একমাত্র চোর হবে ঠগ হবে? তা তো হয় না। ঐ মেয়েটাও যে সাধু ও সাধ্বী কে বলল?"

পরাশরের কথা শুনে চমকে উঠল হেমন্তবালা, অন্তত চমকে ওঠার মতন ভঙ্গি করল, বলল, "তাই বুঝি? কিন্তু সে খেয়াল তো আমার হয়নি। এমনিতে কথায় বার্তায় বেশ ভালো। কিন্তু চালচলন একটু বেকায়দা অবশ্য।"

কিছুক্ষণ কি-যেন ভাবল হেমন্তবালা। তার নাকি হাঁফ ধ'রে আসছে। সে আর পারবে না ওখানে থাকতে।

অন্য-একটা বাসায় সে চুপ ক'রে উঠে যেতে পারে অবশ্য। তার নামে অনেক দুর্নাম তো আছে, আরো না হয় দুর্নাম রটবে। তার জন্যে সে আর ভাবে না। কিন্তু অন্য বাসায় চলে যেতে তার বড় ভয়। একা-একা থাকতে তার বড় আতঙ্ক।

পরাশরবাবু কিছুক্ষণ তার চোখের দিকে চেয়ে বললেন, "ভয় কেন?"

"জনার্দন।" ঐ নামটা উচ্চারণ করেই থেমে গেল হেমন্তবালা।

ঘরটা যেন হঠাৎ কেমন থমথমে হয়ে গেল। এর পরে আর কোনো কথাই কেউ বলতে পারল না কিছুক্ষণ।

"সত্যি, কি মায়া, কী মোহ! নিজের জীবন নষ্ট ক'রেছে, অন্যের জীবনও বুঝি নষ্ট করতে চায় ও।" দু-চোখ ছলছল করে উঠল হেমন্তবালার।

পরাশরবাবু বোধ হয় কিছু বুঝলেন, কিন্তু কি বুঝলেন, সে কথা মুখ ফুটে আর বললেন না।

"কিন্তু আপনার মতন একজন লোকের আশ্রয় যদি পাই তাহলে বেঁচে যাই।"

"আমি যে নিরাপদ আশ্রয় তাই-বা বলল কে?' গম্ভীর গলায় বললেন পরাশরবাবু।

উজ্জ্বল দুটি চোখ তুলে পরাশরবাবুর চোখের দিকে স্তব্ধ হয়ে চেয়ে রইল হেমন্তবালা। তারপর বলল, "সেটা পরে বোঝা যাবে।"

"তাই তাই তাই!" পরাশরবাবু উঠে দাঁড়ালেন।

হেমন্তবালা নমস্কার করে বিদায় নিল।

[ক্রমশ]

জেমস প্রিন্সেপ

কল্যাণকুমার দাশগুপ্ত

১৫ জানুআরি ১৭৮৪ সাল : উইলিঅম জোন্সের নেতৃত্বে কলকাতায় এশিয়াটিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হলো। উদ্দেশ্য, এশিয়ার ইতিহাস, পুরাকীর্তি, শিল্পকলা, বিজ্ঞান, সাহিত্য প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে অনুসন্ধান। সোসাইটির সংস্থাপনে জোন্সকে সক্রিয় সাহায্য করেছিলেন সাম্রাজ্যবাদীরূপে নিন্দিত তৎকালীন গভর্নর-জেনারেল ওআরেন হেস্টিংস।[১] জোন্স এবং তাঁর সহাধ্যায়ীরা বিপুল উৎসাহে ভারতবর্ষ এবং এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলের পুরাবৃত্ত গবেষণায় মগ্ন হলেন। ১৭৮৮ সালে *Asiatick Researches* বেরোল সোসাইটির মুখপত্র রূপে, পুরাবিদ্ প্রাজ্ঞদের রচনার ঐশ্বর্যে মুখপত্রটি ক্রমেই বিদ্বজ্জনদের অবশ্যপাঠ্য হয়ে দাঁড়াল। ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দে এশিয়াটিক সোসাইটিতে মিউজিয়াম স্থাপিত হলো, দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে পুরাবস্তু এসে স্থান পেতে লাগল এই সংগ্রহশালায়। তিন দশকের মধ্যে ভারতবিদ্যা তথা প্রাচীতত্ত্ব শক্ত জমির উপর দাঁড়াবার সুযোগ পেল।

এই তিন দশকের গবেষণা প্রধানত পূর্বজদের সাহিত্যকীর্তিকে কেন্দ্র করেই চলেছে। অর্থাৎ প্রাচীন সাহিত্যের পঠন-পাঠন ও অনুবাদ ছাড়া অন্যবিধ পুরাবস্তু-সংক্রান্ত অধ্যয়নের কথা জোন্স ও তাঁর সহকর্মীরা বিশেষ ভাবেন নি। জোন্স স্বয়ং 'শকুন্তলা', 'গীতগোবিন্দ' এবং 'মনুস্মৃতি'র অনুবাদ করেন, প্রকাশকাল যথাক্রমে ১৭৮৯, ১৭৯৩ ও ১৭৯৪। জোন্সের সঙ্গেই উল্লেখনীয় 'ভগবদ্‌গীতা'র অনুবাদক চার্লস উইলকিন্স, পাশ্চাত্ত্য লেখকদের মধ্যে যিনি সর্বপ্রথম একটি ইউরোপীয় ভাষাতে সংস্কৃত গ্রন্থ রূপান্তরণের কৃতিত্ব দাবি করতে পারেন; ১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দে 'ভগবদ্‌গীতা'র ইংরেজী অনুবাদের মাধ্যমে উইলকিন্স পাশ্চাত্ত্য জগতে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের দ্বারোদ্‌ঘাটন করেন। জোন্স, উইলকিন্স প্রমুখ ভারতবিদ্‌দের সাহিত্যগত গবেষণা নিঃসন্দেহেই প্রশংসনীয় ও স্মরণযোগ্য, কিন্তু সাহিত্যের মতো লেখ, মুদ্রা এবং স্থাপত্য-ভাস্কর্যাদি শিল্পকীর্তির সন্ধান ও অধ্যয়নও যে সমান গুরুত্বপূর্ণ এ চিন্তা তখনও ভারতসন্ধীদের বিশেষ নাড়া দেয় নি। প্রাচীন লেখ, মুদ্রা ইত্যাদি তাঁদের চোখে পড়ে নি তা নয়, এলোরা, তাজমহল তাঁদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে নি তা নয়, কিন্তু ঐসব প্রত্যক্ষ বাস্তব প্রত্ন উপাদানের গুরুত্ব নিয়ে তাঁরা

---

[১] ডক্টর স্যামুয়েল জনসন ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে মার্চ, ওআরেন হেস্টিংসকে একটি চিঠি লেখেন। চিঠিতে তিনি হেস্টিংসকে বিজিত দেশের প্রাচীন ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্ব বিষয়ে উৎসাহিত করেন। ব্রিটিশ মিউজিয়ামে সংরক্ষিত তাঁর এই চিঠির প্রাসঙ্গিক অংশ নিচে উদ্ধৃত হলো:

. . . . I can only wish for information, and hope that a mind comprehensive like yours will find leisure amidst the cares of your important station to enquire into many subjects of which the European world either think not at all, or thinks with deficient intelligence and uncertain conjecture. I shall hope that he who once intended to increase the learning of his country by the introduction of the Persian language, will examine nicely the tradition and histories of the East, that he will survey the remains of its ancient edifices, and trace the vestiges of its ruined cities; and that at his return we shall know the arts and opinions of a race of men from whom very little has been hitherto derived.

ব্রিটিশ মিউজিয়ামে রক্ষিত, Additional manuscripts no. 29196. ন্যাশনাল আর্কাইভসের সৌজন্যে; ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের মুখপত্র *Ancient India* নবম খণ্ডের (১৯৫৩) ১নং প্লেট দ্রষ্টব্য।

বিশেষ ভাবেন নি। এলোরা, কানহেরি, তাজমহল প্রভৃতি স্থাপত্যকীর্তিগুলির বিজ্ঞানসম্মত বর্ণনার প্রয়োজনীয়তা তাঁরা বিশেষ অনুভব করেন নি, ফলে গত শতাব্দীর প্রথম তিন দশকে এইসব শিল্পনিদর্শনের মাপজোখের হিসাব বিরল, নক্‌শা তো নেই-ই। এবং এই কারণেই আলেকজান্ডার কানিংহামের মতো সার্থক প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌ আঠারো-উনিশ শতকের ভারতবিদ্‌দের 'সীমা-সংকীর্ণ প্রত্নতাত্ত্বিক'রূপে বর্ণনা করেছেন।

অথচ সাহিত্য-বিধৃত উপাদানের চাইতে অধিকতর নির্ভরযোগ্য প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান—লেখ, মুদ্রা, শিল্পকীর্তিতে যার প্রমাণ বিস্তৃত ও বিবৃত। এইসব প্রত্যক্ষ বাস্তব প্রত্ন উপাদানের নিয়মায়ত সমীক্ষা ও অধ্যয়নের জন্য ভারতবিদ্যায় উৎসাহীদের আরও কিছুদিন অপেক্ষা করতে হয়েছিল। তাঁদের সে অপেক্ষা দীর্ঘতর হতো, কিন্তু তা হতে দেন নি জেমস প্রিন্সেপ। উনিশ শতকের তৃতীয় দশকেই তাঁর দীপ্ত আবির্ভাবে ভারতীয় প্রত্নতত্ত্বচর্চার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হলো। অশোক-লিপির পাঠোদ্ধারকারী জেমস প্রিন্সেপ 'ভারতীয় প্রত্নতত্ত্বের জনক'রূপে স্বীকৃত, তাঁর এই স্বীকৃতি অযথার্থ নয়।

১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দের ২০ আগস্ট জেমস প্রিন্সেপ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা জন প্রিন্সেপ ছিলেন লন্ডনের অল্ডারম্যান। লর্ড সিডমাউথ এবং উইলিঅম পিটের আমলে তিনি পার্লামেন্টের সদস্যও ছিলেন। তিনি কিছুদিন ভারতবর্ষে ছিলেন এবং শোনা যায় ভারতবর্ষ, ইটালি ও ইংল্যান্ডে ব্যবসা-বাণিজ্য করে যথেষ্ট অর্থোপার্জন করেছিলেন।

স্কুল-কলেজের প্রথাগত শিক্ষা পান নি প্রিন্সেপ, মাত্র দুবছর তিনি স্কুলে পড়েছিলেন; পরিবর্তে স্থাপত্য, রসায়নশাস্ত্র, মুদ্রাবিজ্ঞান প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করার সৌভাগ্য ঘটেছিল। চিত্রকলা ও সংগীতেও তাঁর প্রবণতা ছিল। জিজ্ঞাসা, পর্যবেক্ষণশক্তি এবং অধীত বিষয়ের সহজ ও দ্রুত আত্তীকরণক্ষমতার মতো মনীষার মূল লক্ষণগুলি অল্প বয়সেই তাঁর মধ্যে আত্মপ্রকাশ করেছিল। যান্ত্রিক কলাকুশলতাও প্রিন্সেপের কম ছিল না। তাঁর উদ্ভাবনী ক্ষমতা ছিল প্রায় অসাধারণ। শোনা যায়, ছোটবেলায় তিনি ৬ ইঞ্চি মাপের একটি চমকপ্রদ গাড়ির মডেল তৈরি করেছিলেন। গাড়িটিতে স্প্রিং, ল্যাম্প, দরজা-জানালা, ওঠা-নামার সিঁড়ি ইত্যাদি সবই ছিল এবং ঐ দরজা-জানালাগুলি খোলা বা বন্ধ করা যেত। পরবর্তী কালে কলকাতার টাঁকশালে কাজ করার সময় তিনি স্বহস্তে এমন একটি নিক্তি তৈরি করেছিলেন, যার দ্বারা এক গ্রেনের তিন হাজার ভাগের এক ভাগ পর্যন্ত নির্ধারণ করা যেত। বলা বাহুল্য, সরকার এটি তাঁর কাছ থেকে কিনে নিয়েছিলেন।

জেমস প্রিন্সেপ লন্ডনের রাজকীয় টাঁকশালার অ্যাসে মাস্টার শ্রীযুক্ত বিগুলের কাছে কিছুদিন শিক্ষানবিশী করেছিলেন। বিগুলের সার্টিফিকেট সঙ্গে নিয়ে তিনি ভারতবর্ষের পথে পাড়ি দিতে মনস্থ করলেন। ১৮১৯ সালে মাত্র কুড়ি বৎসর বয়সে ছোট ভাই টমাসের সঙ্গে তিনি এ দেশে এলেন। সে সময় ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানির অধ্যক্ষ ছিলেন প্যাটার্সন, তিনিই প্রিন্সেপকে কলকাতা টাঁকশালার সহকারী অ্যাসে মাস্টারের চাকুরি দিয়ে আনিয়েছিলেন। অশোক-লিপির পাঠোদ্ধারে প্রিন্সেপের এই চাকুরি বিশেষ সহায়ক হয়েছিল। কেন সে কথা বলছি।

সে সময় কলকাতা টাঁকশালার অ্যাসে মাস্টার ছিলেন স্বনামপ্রসিদ্ধ সংস্কৃত পণ্ডিত

হোরেস হেম্যান উইলসন।[১] উইলসনের সংস্পর্শে আসার ফলে জেমস প্রিন্সেপের মনে প্রাচীন ভারতবর্ষের ইতিহাস ও সংস্কৃতি সম্পর্কে জিজ্ঞাসার উন্মেষ ঘটে। উইলসনের মাধ্যমেই এশিয়াটিক সোসাইটির সঙ্গে তাঁর সংযোগ সাধিত হয়। এশিয়াটিক সোসাইটিতে তখন প্রাচীন ভারতের তথা সারা প্রাচ্য দেশের ইতিহাস ও সংস্কৃতি সম্পর্কে যে নানামুখী গবেষণা চলছিল, জেমস প্রিন্সেপ তাতে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণে অগ্রণী হলেন।

যাই হোক, প্রিন্সেপের কাজে যোগদান করার কিছুদিন পর উইলসনকে বেনারসের টাঁকশালার পুনর্গঠনের জন্য বেনারস যেতে হলো। তাঁর অনুপস্থিতিতে অ্যাসে সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ করতেন প্রিন্সেপ, অল্পদিনে তিনি এমনই আস্থা অর্জন করেছিলেন উইলসনের। তারপর উইলসন ফিরে এলেন কলকাতায়, প্রিন্সেপ গেলেন বেনারস, একেবারে সেখানকার টাঁকশালার অ্যাসে মাস্টার তথা অধ্যক্ষ হয়ে (অক্টোবর, ১৮২০)। জলপথে গেলেন প্রিন্সেপ, যাওয়ার সময় জাহাজে বসে ছবি আঁকলেন বেশ কিছু। পুরনো ঘিঞ্জি শহর বেনারসও চিত্রশিল্পী জেমস প্রিন্সেপের দৃষ্টিতে ধরা পড়লো: 'ভিয়ুজ অ্যান্ড ইলাস্ট্রেশানস অফ বেনারস' গ্রন্থে সেকালের বেনারসের পথঘাট, বাড়িঘর ও নৈসর্গিক দৃশ্যাবলীর অনেক ছবি সংকলিত হয়েছে।

১৮৩০ সালে বেনারসের টাঁকশাল উঠে গেল, প্রিন্সেপ ফিরে এলেন কলকাতায়, পুরনো উপরওয়ালা ডক্টর উইলসনের অধীনে উন্নততর ডেপুটি অ্যাসে মাস্টারের পদে যোগ দিলেন। এই সময় থেকেই ভারতবর্ষের পুরাবৃত্ত সম্পর্কে প্রিন্সেপের জিজ্ঞাসা ক্রমশ বাড়তে থাকে এবং উইলসনের মাধ্যমে এশিয়াটিক সোসাইটির সঙ্গে সংযুক্ত হবার পর থেকে তিনি সরকারী কর্মজীবনের বাইরে অধিকাংশ সময় ভারততত্ত্ব-চর্চায় অতিবাহিত করতে লাগলেন।[২] এই-জন্যই বলেছি, ডক্টর উইলসনের সঙ্গে জেমস প্রিন্সেপের সংযোগ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, টাঁক-শালার অ্যাসে দপ্তরের কর্মচারীর 'ভারতীয় প্রত্নতত্ত্বের জনক' হওয়ার মূলে ডক্টর উইলসনের

---

[১] ডক্টর হোরেস হেম্যান উইলসন (১৭৮৬-১৮৬০) মেঘদূত (১৮১৩), বিষ্ণুপুরাণ (১৮৪০) এবং ঋগ্বেদ (১৮৫০-৬০, ছ'খণ্ডে সম্পূর্ণ)-এর সটীক অনুবাদ প্রকাশ করেছিলেন। তিনি মেকলে এবং রাম-মোহন রায়কে বিরোধিতা করে বলেছিলেন, ভারতবর্ষে ইংরেজীর পরিবর্তে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের চর্চা হওয়া উচিত। টাঁকশালার চাকরি ছেড়ে দিয়ে উইলসন পরে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের 'বডেন অধ্যাপক'-এর পদ অলংকৃত করেছিলেন।

[২] ১৮৩২ সাল থেকে প্রিন্সেপ 'জার্নাল অফ দি এশিয়াটিক সোসাইটি'র দায়িত্ব নেন। এই সময় থেকে ১৮৩৮ পর্যন্ত এই মুখপত্রে প্রিন্সেপের অনেক রচনা প্রকাশিত হয়। নিচে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য রচনার তালিকা দেওয়া হলো। ১-১৬ সংখ্যক রচনাগুলি *Essays on Indian Antiquities* (Ed. by E. Thomas, 2 vols., London, 1858) গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে।

[1] On the ancient Roman coins in the Cabinet of the Asiatic Society.

[2] On the Greek coins in the Cabinet of the Asiatic Society.

[3] Notes on Lieutenant Burnes' coins, Syrian coins, Bactrian coins, Sassanian coins (cont).

[4] Bactrian and Indo-Scythic coins (cont).

[5] Discovery of a subterranean town near Behat in the Doab of the Jamma and Ganges.

[6] Coins and relics discovered by M. Ventura in the Tope of Manikyâla.

[7] On the coins and relics discovered by General Ventura.

[8] Further information on the Tope of Manikyâla.

[9] Further notes on Bactrian and Indo-Scythic coins.

[10] On the connection of various ancient Hindu coins with the Grecian or Indo-Scythic series.

[11] Notices of ancient Hindu coins.

এবং এশিয়াটিক সোসাইটির সাহায্য ও অনুপ্রেরণা অবিস্মরণীয়।

১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে ডক্টর উইলসন অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক-পদে নিযুক্ত হবার পর জেমস প্রিন্সেপ টাঁকশালার অ্যাসে মাস্টারের পদে উন্নীত হন এবং মিন্ট কমিটির সেক্রেটারি হিসাবেও তাঁকে কাজ করতে বলা হয়। তাঁর উদ্যম ও কর্মক্ষমতায় মুগ্ধ হয়ে কোম্পানির কর্তৃপক্ষ তাঁকে কমিটি অফ এডুকেশানের সদস্য মনোনীত করেন এবং শিক্ষা-উপদেষ্টা হিসাবে বিভিন্ন সরকারী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট করেন। এ সময় প্রিন্সেপ এশিয়াটিক সোসাইটির সেক্রেটারি পদেও নির্বাচিত হন। বস্তুত ১৮৩২ থেকে ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বিস্তৃত সময় জেমস প্রিন্সেপের কর্মবহুল জীবনের উজ্জ্বলতম অধ্যায়। প্রিন্সেপের সারস্বত সাধনার সূত্রপাত ও সিদ্ধিতে দীপ্যমান এই কালসীমা ভারতবৃত্ত-চর্চার ইতিহাসেও অবিস্মরণীয়।

১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দের ২০ এপ্রিল মস্তিষ্ক রোগে আক্রান্ত হয়ে মাত্র চল্লিশ বছর বয়সে জেমস প্রিন্সেপ মৃত্যুবরণ করেন।

প্রত্নতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক হিসাবে জেমস প্রিন্সেপ-এর সর্বপ্রধান কৃতিত্ব অশোক-লেখর পাঠোদ্ধার। ১৮৩৪ থেকে ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে তাঁর এই পাঠোদ্ধারের ইতিহাস বিধৃত।[১] শোনা যায়, ন্যূনাধিক এই চার বছরে প্রায় প্রতিদিন সকালে তিনি ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সংগৃহীত পুরনো শিলালেখগুলির ছাপ (এস্টেম্পেজ) সামনে খুলে বসে থাকতেন, নিবিষ্ট মনে অপলক চোখে চেয়ে থাকতেন ছাপের অচেনা অক্ষরগুলির দিকে। প্রাচীন এই অক্ষরগুলি যে-হরফে বা লিপিতে লেখা তার নাম 'ব্রাহ্মী'।

অবশেষে একদিন সাঁচী (বর্তমান মধ্যপ্রদেশের অন্তর্গত) অঞ্চলের বিখ্যাত বৌদ্ধ-

[12] New varieties of Bactrian coins.

[13] New varieties of Mithraic or Indo-Scythic series of coins and their imitations.

[14] New types of Bactrian and Indo-Scythic coins.

[15] Specimens of Hindu coins descended from the Parthian type.

[16] Legends of the Saurastra group of coins deciphered.

[17] Inscription on the Iron Pillar at Delhi, *Journal of the Asiatic Society of Bengal* (henceforth JASB) 1834, Vol. III.

[18] Various ancient inscriptions, *JASB*, 1836, Vol. V.

[19] Various ancient inscriptions, *JASB*, 1837, Vol. VI.

[20] Note on the facsimiles of inscriptions from Sanchi near Bhilsa, *Ibid*.

[21] Interpretation of the most ancient of the inscriptions on the pillar called the Lat of Feroz Shah, near Delhi, *Ibid*.

[22] Note on an inscription at Udaygiri and Khandagiri, Cuttack, *Ibid*.

[23] Discovery of the name of Antiochus the Great in the edicts of Asoka, King of India, *JASB*, 1838, Vol. VII.

[24] On the edicts of Piyadasi or Asoka, the Buddhist monarch of India, preserved in the Girnar Rock in the Gujerat Peninsula and on the Dhauli rock in Cuttack, with the discovery of Ptolemy's name therein, *Ibid*.

[25] Notice of antiquities discovered in the Eastern Division of Gorakhpur, *Ibid*.

[26] Inscription on Jain images from Central India, *Ibid*.

[১] প্রিন্সেপের নিজের ভাষায় বিবৃত এই আবিষ্কারের ইতিহাসের জন্য *Journal of the Asiatic Society of Bengal*, Vol. VI, pp. 460-77, 566-609 দ্রষ্টব্য।

স্তূপের ছোট ছোট নিবেদন-লেখগুলির (ভোটিভ রেকর্ড) ছাপ পরীক্ষা করতে গিয়ে দেখলেন, নিবেদন-লেখগুলি[১] একই চেহারার দুটি অক্ষর দিয়ে শেষ হচ্ছে। তখন তিনি অনুমান করলেন, এগুলি স্বয়ংসম্পূর্ণ বড় কোন লেখার অংশ নয়; এগুলি হয় কোন মৃত্যু-সংবাদ, নয়তো কোন ভক্ত বা সাধকের দেবতার উদ্দেশ্যে নিবেদনাত্মক বিজ্ঞপ্তি। অর্থাৎ কোন ভক্ত দেবোদ্দেশে তাঁর ভক্তি-অর্ঘ্য নিবেদনের সূত্রে পাথরে তাঁর নাম খোদাই করে গেছেন। যাই হোক, ভেবেচিন্তে শেষের অনুমানটিই তিনি গ্রহণ করলেন : লেখগুলি নিবেদনাত্মক বিজ্ঞপ্তি ছাড়া অন্য কোন কিছু নয়।

নিবেদন-লেখগুলিতে আরও একটি ব্রাহ্মী অক্ষরের নিত্য উপস্থিতি বিদেশী পণ্ডিতটির দৃষ্টি আকর্ষণ করল। দিন দুই আগে সৌরাষ্ট্রে (বর্তমান গুজরাটে) প্রাপ্ত মুদ্রায় উৎকীর্ণ অক্ষরটি তিনি 'স' বলে প্রতিপন্ন করেছেন। এই 'স' আর কিছুই নয়, ব্যক্তি-বিশেষের নামের সঙ্গে যুক্ত ষষ্ঠী বিভক্তির চিহ্ন পালি-প্রাকৃতের 'স'—সংস্কৃতের 'স্য' অর্থাৎ অমুক-'স' (পালি-প্রাকৃতে) অমুক-'স্য' (সংস্কৃতে)।

প্রিন্সেপ আরও লক্ষ্য করলেন, উপরি-উক্ত একই ধরনের অক্ষর দুটির প্রত্যেকটির মাঝে ও শেষে একটি করে চিহ্ন আছে। চিহ্ন দুটি কী হতে পারে? বিদেশী গবেষক ভারতীয় পণ্ডিত-বন্ধু রত্নপালের সঙ্গে আলোচনা করে স্থির করলেন, লেখগুলি যখন নিবেদনাত্মক, তখন চিহ্নসহ অক্ষর দুটির পাঠ হবে 'দানং' (অক্ষর দুটি 'দ' ও 'ন' এবং চিহ্ন দুটির একটি আকার ও অপরটি অনুস্বার) এবং অপর অক্ষরটি 'স' অর্থাৎ '......স দানং', মানে স-এর আগে ভক্তের নাম, 'অমুক-স দানং'।

নিবেদন-লেখ ছাড়া সৌরাষ্ট্র অঞ্চলের প্রাচীন মুদ্রায় উৎকীর্ণ লেখাবলিও তিনি পরীক্ষা করলেন। জে. আর. স্টুআর্ট-এর পাঠানো ২৮টি মুদ্রার ছাপ[২] থেকে তিনি যে দুটি লেখর পাঠোদ্ধার করেছিলেন, ১৮৩৭-এর ১২ মে তারিখে আলেকজান্ডার কানিংহামকে লেখা চিঠিতে[৩] উদ্ধৃত সে লেখা দুটি হলো:

রজ কৃত্তমস রুদ্রসহস স্বামি জহতমপুত্রস

রজ্ঞ কৃত্তমস্য সগদংত রজ রুদ্রসহস পুত্রস্য

সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে বলছেন, 'মুদ্রাগুলির প্রত্যেকটিতে মুদ্রাপ্রবর্তকের পিতার নাম বিদ্যমান এবং এইভাবে আমরা আট কিংবা দশজন রাজার নাম পাচ্ছি, যাঁরা গুপ্ত-সম্রাটদের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন।' চিঠিতে তাঁর পাঠ ছাপাবার ব্যগ্রতাও দেখা যাচ্ছে। কয়েকদিন আগে অন্য একটি মুদ্রায় 'বিজয়মিতস' অর্থাৎ 'বিজয়মিত্রস্য' লেখর পাঠোদ্ধারে তাঁর সাফল্যের

---

[১] সেকালে বৌদ্ধ পুণ্যার্থীরা তীর্থস্থানগুলিতে মূল স্তূপের আকৃতিতে ছোট ছোট স্তূপ উৎসর্গ করতেন। এইগুলিকে 'ভোটিব' বা নিবেদন-স্তূপ বলা হয়। বেশিরভাগ স্তূপে দাতার নাম থাকত।

[২] 11th May 1837.—"Here are two plates addressed to me by Harkness on the part of J. R. Steuart, quarto engravings of 28 Saurashtra coins, all Chaitya reverses, and very legible inscriptions, which are done in large on the next plate. Oh! but we must decipher them! I'll warrant they have not touched them at home yet. Here to amuse you try your hand on this" (here follows a copy of three of the coin legends, with the letters forming the words *Rajnah* and *Kshatrapasa*, each of which occurs twice, marked, respectively, 1, 2, 3, 4, 5, 6, shewing that he had begun to analyze them the same day).

[৩] 12th May, 7 o'clock, a.m.—"You may save yourself any further trouble. I have made them all out this very moment on first inspection. Take a few examples (here follow both the original legends and the Nagari renderings).

কথাও জানাচ্ছেন। দুদিন বাদে লেখা ১৪ মে-র একটি চিঠিতে[১] তিনি জানাচ্ছেন, 'রুদ্রসহ'-র পিতার নাম 'জনদম' ('জহতম' যা আগে পড়েছিলেন তা নয়); তাছাড়া 'অত্রিদাম্নঃ', 'বীরদাম্নঃ', 'বিশ্বসহস্য' প্রভৃতি নামগুলির প্রত্যেকটি ষষ্ঠী বিভক্তিচিহ্নযুক্ত অর্থাৎ মূল নামগুলি যথাক্রমে 'অত্রিদাম', 'বীরদাম', 'বিশ্বসহ' ইত্যাদি, 'পুত্রস্য'-এর সঙ্গে যুক্ত হলে মূলনামগুলির ষষ্ঠী বিভক্তিচিহ্ন অবলুপ্ত হয়। তারপর আর-একটি মুদ্রালেখর পাঠোদ্ধার করলেন, এ মুদ্রাও সৌরাষ্ট্র অঞ্চলের:

শ্রীবমসগ দেব জয়তি—ক্রমদিত্য পরমেশ

এই পাঠোদ্ধারে উৎফুল্ল প্রিন্সেপ তাঁর আনন্দকে যেন ধরে রাখতে পারছেন না। কানিংহামকে চিঠির শেষে লিখছেন: 'চলো ভাই, জলদি পৌহুঁন্ছোগে।'

লক্ষ্যাভিমুখে জলদিই পৌঁছেছিলেন প্রিন্সেপ, অশোক-লেখর প্রায় সম্পূর্ণ পাঠোদ্ধার করতে তাঁর বেশি সময় লাগেনি। যে-সমস্ত অক্ষর তিনি পাঠ করেছিলেন, তাদের পাঠমান আরোপ করে তিনি দিল্লীর অশোক-লেখ পড়ে ফেললেন। তিনি আরো লক্ষ্য করলেন, দিল্লীর অশোক-লেখর অক্ষর এলাহাবাদ, ধৌলি (উড়িষ্যা) এবং গিরনারের (কাথিয়াওয়াড়) অশোক-লেখর অক্ষরের সঙ্গে অভিন্নপ্রায়। কিছুদিনের মধ্যে তিনি গিরনারস্থ অশোক-লেখর পাঠোদ্ধার করলেন। এন্টিয়োকাস, টলেমি, মেগাস এবং অ্যান্টিগোনাস নামক চারজন বিদেশী রাজার (এঁদের সঙ্গে অশোক মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন) নাম তিনি ঐ প্রস্তর-লেখতে আবিষ্কার করলেন। পরে উত্তর-পশ্চিম ভারতের সাহবাজগারহি ও মানসেরাতে আবিষ্কৃত খরোষ্ঠী হরফে (উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে প্রচলিত) লেখা অশোক-লেখ থেকে 'অলিক-সুদর' এবং কালসিতে (দেরাদুন অঞ্চলে) আবিষ্কৃত ব্রাহ্মী লেখ থেকে 'অলিক্যসুদর' অর্থাৎ আলেকজান্ডার নামে পঞ্চম রাজার নাম জানা যায়।

শুধু ব্রাহ্মী লিপি নয়, খরোষ্ঠী লিপির (এই লিপি দক্ষিণ থেকে বামে প্রবহমান) পাঠোদ্ধারেও প্রিন্সেপের দান স্মরণীয়রকমে অসামান্য। খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় ও প্রথম শতাব্দীতে উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম ভারতে কিছু গ্রীক বা যবন রাজা আধিপত্য বিস্তার

1 to 4—*Raja Krittamasa Rudra Sahasa Swāmi Jahatama putrasa.*
5 to 8—*Raja Krittamasya Sagadamta Raja Rudra Sahasa putrasya.*

And thus every one of them gives the name of his father of blesed memory, and we have a train of some eight or ten names to rival the Guptas!! Hurra! I hope the chaps at home wont seize the prize first. No fear of Wilson at any rate! I must make out a place of the names on ours added to Steuart's, and give it immediate insertion. It is marvellously curious that, like the modern Sindhi and Multani, all the mātrās, or vowels, are omitted, and the Sanskrit terminations *sya*, etc., Pali or vernacularized. This confirms the reading which I had printed only a day or two ago, *Vijaya Mitasa* for *Mitrasya*, of Mithra, identifying him and the devise with our OKPO bull coin! Bravo, we shall unravel it yet."

Here we see that, although he had mastered the greater part of these legends almost at first sight, yet the readings of some of the names were still doubtful. But two days later he writes as follows:

[১] Sunday (postmark, May 14, 1837).—"Look into your cabinet and see what names you have of the Saurashtra series.. Steuart's list is as follows:

Rajas Rudra Sah, son of Swami Janadama.
,, *Atra Dama* ,, Rudra Sah. etc. etc.

"The Sanskrit on these coins is beautiful, being in the genitive case after the fashion. We have *Rājña* for *Raja, Atri-Dāmnah* for *Atri-Dāma, Vīra-Dāmnah* for

করেছিলেন। তাঁদের মুদ্রাগুলির একপিঠে গ্রীক, অন্যদিকে আঞ্চলিক লিপি খরোষ্ঠীতে একই অর্থবহ লেখ উৎকীর্ণ হতো। প্রিন্সেপ গ্রীক জানতেন, সুতরাং গ্রীক লেখর প্রাকৃত অনুবাদের লিপি খরোষ্ঠীর পাঠোদ্ধার তাঁর পক্ষে দুরূহ হবে না মনে করে তিনি মুদ্রালেখ-গুলিতে মনঃসংযোগ করলেন। তাঁর এ কাজে সহায়ক হয়েছিল পূর্বাচার্য ম্যাসন-এর প্রয়াস, কারণ ম্যাসন-ই প্রথম 'মিনদ্র' (অর্থাৎ মিনান্ডার), 'অপলদত' (অর্থাৎ অ্যাপোলোডটস), 'এরমেও' (অর্থাৎ হারমিউস), 'ব্যাসিলেওস' (অর্থাৎ মহারাজা) এবং 'সোটেরস্' (অর্থাৎ 'ত্রতর' (অর্থাৎ 'ততরস') প্রভৃতি শব্দগুলি পড়েছিলেন।[১] প্রিন্সেপ সবশুদ্ধ ১২ জন গ্রীক রাজার নাম এবং ৬টি উপাধি পড়ে ফেলেছিলেন। প্রিন্সেপ মোট ৩৩টি খরোষ্ঠী ব্যঞ্জনবর্ণের মধ্যে ১৬টি অর্থাৎ প্রায় অর্ধেক বর্ণ এবং ৫টি স্বরবর্ণের (অ ই উ এ ও) ও ৪টি ই-উ-কারাদি মাত্রার মধ্যে ৩টি স্বরবর্ণ ও ২টি ই-কারাদি মাত্রা আবিষ্কার করেছিলেন। আকস্মিকভাবে অসুস্থ না হয়ে পড়লে হয়তো তিনি প্রায় সব ক'টি খরোষ্ঠী অক্ষরই পড়ে ফেলতে পারতেন। তাঁর আরব্ধ ও অসমাপ্ত কাজ তাঁর উত্তরসূরীরা শেষ করেন।

সংক্ষেপে, বিশ্বের স্মরণীয় ও মহান সম্রাটদের অন্যতম অশোক সম্পর্কে আমরা কিছুই জানতে পারতাম না, যদি না ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রাপ্ত তাঁর লেখগুলির পাঠোদ্ধার হতো। মৌর্যযুগের ভারতবর্ষের ইতিহাস রচনায় অশোক-লেখর অসাধারণ মূল্য নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না। দৃষ্টান্তস্বরূপ, পশ্চিম এশিয়ার পাঁচজন রাজার সঙ্গে অশোক বন্ধুত্ব স্থাপন করেছিলেন, তাঁদের রাজ্যে শান্তি ও মৈত্রীর দূত পাঠিয়েছিলেন, এই গুরুত্ব-পূর্ণ সাংস্কৃতিক তথ্য কী জানা যেত, যদি না অশোক-লেখ পড়া হতো?

আলোচ্য লেখমালায় বর্ণিত 'দেবতাদের প্রিয় প্রিয়দর্শী'ই যে সম্রাট অশোক এবং এই সম্রাট পশ্চিম এশিয়ার গ্রীক বা যবনরাজ দ্বিতীয় অ্যান্টিয়োকাস থিওস (২৬১—৪৬ খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দ) ও দ্বিতীয় মিশরের টলেমি ফিলাডেলফোস (২৮৫—৪৭ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ)-এর সমসাময়িক—এই দুই তথ্য নিঃসন্দিগ্ধরূপে প্রতিপন্ন করে প্রিন্সেপ ভারতের ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্বকে শক্ত জমির উপর স্থাপন করেছেন। তাঁর এই কীর্তি স্মরণীয় ও সুবিদিত। কিন্তু এছাড়া আরও একটি ক্ষেত্রে প্রিন্সেপের ভূমিকা পথিকৃতের, যে-ভূমিকা অপেক্ষাকৃত অজ্ঞাত : জেমস প্রিন্সেপ সরেজমিন তদন্ত এবং প্রত্নস্থল ও প্রত্নদ্রব্যের পর্যবেক্ষণভিত্তিক নক্শা প্রণয়নের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন; এবং শুধু কথাতেই ক্ষান্ত থাকেন নি, স্বয়ং তা কাজে সপ্রমাণ করেছিলেন।

Vīra-Dāma, Viswa Sahasya and *Viswa Saha,* which are all confirmed by the real name losing the genitive affix when joined to *Putrasya.*

"I have made progress in reading the Peacock Saurashtrans—

Sri bama saga deva jayati

——————kramaditya parameśa.

"Chulao bhai, juldee puhonchoge!"

এই চিঠিগুলি সম্পর্কে কানিংহামের মন্তব্য (*Archæological Survey of India,* Reports, p.x):

In these lively letters we see that the whole process of discovery occupied only three days, from the first receipt of Steuart's plates to the complete reading of all the legends. Nothing can better show the enthusiastic ardour and unwearying perseverance with which he followed up this new pursuit than these interesting records of the daily progress of his discoveries. When I recollect that I was then only a young lad of twenty-three years age, I feel as much wonder as pride that James Prinsep should have thought me worthy of being made the confidant of all the great discoveries.

১ *Journal of the Asiatic Society of Bengal,* 1835, p. 329.

৪

প্রাচীন ভারতীয় লেখ, মুদ্রা ইত্যাদি বিষয় ছাড়া ফসিল-প্রাণীর নিদর্শন সম্পর্কেও প্রিন্সেপ বিশেষ উৎসাহী ছিলেন। ডক্টর হিউ ফ্যাকোনার এবং পি. টি. কটলি নামে দুজন বিজ্ঞানী উত্তর ভারতে বহু প্রাচীন ফসিল-প্রাণীর নিদর্শন আবিষ্কার করেছিলেন। প্রিন্সেপ এই ফসিলগুলি সম্পর্কে এশিয়াটিক সোসাইটির জার্নালে কয়েকটি আকর্ষণীয় প্রবন্ধ প্রকাশ করেছিলেন। ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব এবং ফসিল-প্রাণিবিদ্যা ছাড়া জ্ঞান-বিজ্ঞানের অন্যান্য ক্ষেত্রেও জেমস প্রিন্সেপ মনঃসংযোগ করেছিলেন। জীবনের প্রারম্ভে তাঁর অধ্যয়নের বিষয় ছিল স্থাপত্য। তারপর ভারতবর্ষে আসার আগে রসায়ন-শাস্ত্রে জ্ঞানার্জন করে তিনি কিছুকাল লন্ডন টাঁকশালার অ্যাসে মাস্টারের অধীনে শিক্ষানবিশী করেছিলেন। সারা দেশে প্রচলিত মুদ্রা-মানের সংস্কার করে প্রিন্সেপ ওজন ও মাপের সমতা এনেছিলেন। প্রিন্সেপের আগে মুদ্রার ওজনে ও মাপে তারতম্য থাকত, আর সারা দেশে প্রচলিত মুদ্রা-মানে সমতাও ছিল না। প্রিন্সেপ এই সমস্ত ত্রুটি দূর করতে সমর্থ হয়েছিলেন।

সর্বশেষে, জেমস প্রিন্সেপের অসাধারণ সংগঠন-ক্ষমতা ও কর্মনৈপুণ্যের উল্লেখ করতে হয়। তিনি এশিয়াটিক সোসাইটির সেক্রেটারী থাকাকালীন প্রতিষ্ঠানটির নানাবিধ উন্নতি হয়েছিল। তাঁর সময়ে এশিয়াটিক সোসাইটির সভাকক্ষ নিয়মিত অধিবেশন আলোচনা-সভা ইত্যাদিতে মুখর হয়ে থাকত। ১৮৩২ থেকে ১৮৩৮ সাল পর্যন্ত এশিয়াটিক সোসাইটির জার্নালগুলি দেখলে বোঝা যায় কত বিভিন্ন বিষয়ে কত মূল্যবান আলোচনাই না তখন এশিয়াটিক সোসাইটিতে হয়েছিল।

জনকল্যাণমূলক অনেক কাজও প্রিন্সেপ করেছিলেন। বেনারসে থাকার সময় তিনি সেখানকার পথঘাটের অপ্রশস্ততার প্রতি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তাঁর পরামর্শক্রমে সরকার পথঘাটগুলি যথাসম্ভব প্রশস্ত ও উন্নত করেন। শহরের জনস্বাস্থ্যের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া হয়: জল-নিষ্কাশন ব্যবস্থার পরিবর্তন এবং সামগ্রিকভাবে শহরটিকে পরিচ্ছন্ন রাখার ব্যবস্থা করা হয়। প্লাবনের হাত থেকে শহরকে বাঁচাবার জন্য কর্মনাশা নদীর উপর একটি উঁচু প্রস্তর-সেতু তৈরি হয়। তাছাড়া আওরঙ্গজেবের মসজিদের ছোট ছোট বিপজ্জনক মিনারগুলির সংস্কার করা হয়। এই সময় প্রিন্সেপ বেনারসের প্রধান প্রধান রাস্তা ও বাড়িগুলির নিখুঁত নক্‌শা ও ছবি এঁকেছিলেন, যেগুলি তাঁর পূর্বোল্লিখিত 'ভিয়ুজ অ্যান্ড ইলাস্ট্রেশানস অফ বেনারস' গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। তাছাড়া আজ থেকে প্রায় দেড়শো বছর আগে যখন লোকগণনার আধুনিক পদ্ধতি জানা ছিল না, তখন প্রিন্সেপ আশ্চর্য দক্ষতায় বেনারসের লোকগণনা[১] করেছিলেন এবং নিজের কাছে চমৎকার হিসাব রেখেছিলেন। প্রত্নতত্ত্বের নিতান্ত শৈশবাবস্থায়, সন-তারিখের হিসাবে ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে প্রিন্সেপ বেনারসের নগর-পরিকল্পনার এবং রাস্তাঘাটের ও বাড়িঘরের কয়েকটি নিখুঁত নক্‌শা এঁকেছিলেন। প্রসঙ্গত এ কথাও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, ভারতীয় প্রত্ন-সন্ধানীদের মধ্যে প্রিন্সেপই প্রথম 'ফীল্ড আর্কিওলজি' বা 'ক্ষেত্রীয় প্রত্নতত্ত্ব' শব্দবন্ধের প্রবর্তন করেন;[১] পুরাতন সভ্যতা ও সংস্কৃতির আবিষ্কারে ক্ষেত্রীয় প্রত্নতত্ত্বের ভূমিকার গুরুত্ব আজ বিশদ ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না। অ্যাসে মাস্টারের দায়িত্বপালনে এবং পুরনো লেখমালার পাঠোদ্ধারে অধিকাংশ

[১] এই লোকগণনার পরিচিতিমূলক নিবন্ধের জন্য ১৮৩২ সালের *GASB.* দ্রষ্টব্য।
[১] *Archæological Survey of India* Report (ed. A. Cunningham), Vol. I, p. 19.

সময় অতিবাহিত হওয়ার জন্য প্রিন্সেপ নিজে সরেজমিন অনুসন্ধানের মাধ্যমে প্রত্নস্থল ও প্রত্নবস্তুর আবিষ্কারে মুখ্য অংশ গ্রহণ করতে পারেন নি, কিন্তু জেনারেল ভেন্টুরা ও কোর্টের মতো সহকর্মী ও সহকর্মীদের উৎসাহ দিয়েছিলেন। ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে ভেন্টুরা ও কোর্ট পশ্চিম পাঞ্জাবের মানিকিয়ালায় এবং ১৮৩৩ ও ১৮৩৪ সালে অন্যান্যরা সিন্ধু-বিতস্তা অঞ্চলে স্থাপত্য ও ভাস্কর্যনিদর্শন এবং মুদ্রা ও লেখমালা আবিষ্কারের মাধ্যমে প্রাচীন ভারতের ইতিহাস রচনার বহু মূল্যবান উপাদান সংগ্রহ করেন। উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম ভারতে কুষাণজাতির রাজাদের আধিপত্য এইসব আবিষ্কারে সপ্রমাণ হয়। গবেষণার সমৃদ্ধি ও অগ্রগতির জন্য সরেজমিন অনুসন্ধানের সঙ্গে আবিষ্কৃত প্রত্নবস্তুর পরিশ্রমী ও নিবিড় অধ্যয়নের সনিষ্ঠ সমন্বয় যে কতখানি গুরুত্বপূর্ণ প্রিন্সেপ সে দিকে তাঁর সহকর্মীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। তবে একালে সরেজমিন প্রত্নসন্ধানী বলতে যা বোঝায় প্রিন্সেপ ও তাঁর সহকর্মীরা তা ছিলেন না, হওয়া সম্ভবও ছিল না। সরেজমিন অনুসন্ধানের মাধ্যমে একটি সভ্যতার উৎস ও গতিপ্রকৃতি নির্ধারণের প্রয়াসের চাইতে মিউজিয়ামের বৈভববৃদ্ধির দিকেই তাঁদের অধিকতর আকর্ষণ ছিল।

আজ থেকে প্রায় দেড়শো বছর আগে জেমস প্রিন্সেপ হয়তো অনেক কিছুই করতে পারেন নি, কিন্তু তিনি যা পেরেছিলেন গুণগত বিচারে তার মূল্য অসাধারণ। কানিংহামের সাক্ষ্য থেকে জানতে পারি, প্রিন্সেপ দৈনিক প্রায় বারো থেকে ষোল ঘণ্টার মতো খাটতেন। এবং তাঁর স্বল্পায়ু জীবনের কথা স্মরণে রাখলে পরিমাণগত বিচারেও তাঁর গবেষণা বিস্ময়কর। জন্মসূত্রে বিদেশী হয়েও ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রতি তিনি সহানুভূতিশীল ছিলেন এবং যথার্থ মনীষীর মতো এ দেশের ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহ ও বিশ্লেষণে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। অশোক-লেখর পাঠোদ্ধারের মাধ্যমে তিনি ভারতবর্ষের ইতিহাসের দ্বারোদ্ঘাটন করেন, ভারতীয় প্রত্নতত্ত্বকে সন-তারিখের শক্ত জমিনের উপর দাঁড়াতে সাহায্য করেন। ফীল্ড আর্কিওলজি বা ক্ষেত্রীয় প্রত্নতত্ত্বের একালীন সংজ্ঞা ও প্রয়োগপদ্ধতি তাঁর জানা ছিল না সত্য, কিন্তু ফীল্ড আর্কিওলজির যা ভিত্তি সেই সরেজমিন অনুসন্ধানের মাধ্যমে সভ্যতার বাস্তব নিদর্শন সংগ্রহ সম্পর্কে তাঁর সচেতনতা প্রশংসার দাবি রাখে। প্রসঙ্গত স্মরণীয়, জেমস প্রিন্সেপ ছিলেন বিজ্ঞানের ছাত্র, কর্মজীবনে টাঁকশালের অ্যাসে মাস্টার, এবং কৈশোরে অর্জিত স্থাপত্যবিদ্যার জ্ঞান পরবর্তী জীবনে বিস্মৃত হন নি। অর্থাৎ মৌলত বিজ্ঞানমনস্ক ছিলেন বলে তাঁর প্রত্নতত্ত্বগত গবেষণাপদ্ধতি ছিল বৈজ্ঞানিক। বিনাতথ্যে কোন কিছু প্রমাণের চেষ্টা বা নিছক অনুমানের উপর নির্ভরশীল কোন রকম মন্তব্য প্রকাশের প্রয়াস তাঁর রচনাবলীতে দুর্লভ। বরং তিনি তাঁর সহকর্মীদের বারবার বলতেন যেমন দেখবে, তেমন লিখবে; তোমার উপাদান যা বলছে তুমি তাকেই বিশ্বাস্যভাবে উপস্থিত করবে। তাঁর একটি স্মরণীয় প্রাসঙ্গিক উক্তি[১] :

What the learned world demand of us in India, is to be quite certain of our data, to place the monumental record before them exactly as it

[১] *Journal of the Asiatic Society*, 1838, p. 227 প্রায় দু-দশক পরে গভর্নর-জেনারেল লর্ড ক্যানিং-ও অনুরূপ সুরে বলেছিলেন :

now exists, and to interpret it faithfully and literally as the document says itself, 'without exaggeration and without extenuation'.

এই উক্তিতে বিজ্ঞানী প্রিন্সেপকে খুঁজে পেতে বিন্দুমাত্র কষ্ট হয় না।

বিজ্ঞানমনস্ক প্রিন্সেপ নিরাবেগ ও মননসর্বস্ব ছিলেন না। মানুষের প্রতি তাঁর ভালোবাসা ছিল অপার, সমবেদনা ও উপচিকীর্ষা ছিল তাঁর চরিত্রের সহজাত। বিদ্যা মানুষকে বিনয়ী করে এই প্রবাদবচনের তিনি ছিলেন জীবন্ত উদাহরণ। যে-ধরনের ঈর্ষা ও পরশ্রীকাতরতা মাঝে মাঝে বিদ্বজ্জনকে আক্রমণ করে, প্রিন্সেপ সেই ঈর্ষা ও পরশ্রীকাতরতায় কখনও আক্রান্ত হন নি। তাঁর চিত্তের ঔদার্য ছিল বিস্ময়কর, নিজের ত্রুটি সংশোধনে যেমন নিঃসংকোচ ছিলেন, তেমনই অন্যের সাফল্যকে নিজের বলে মনে করতে পারার মতো এক আশ্চর্য মহত্ত্বও ছিল। তাঁর চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে সমসাময়িক অন্য এক পণ্ডিতের অভিমত প্রাসঙ্গিক ও নির্ভরযোগ্য বিবেচনায় উদ্ধৃত করি:[২]

He has left abundant proofs behind him to establish that he was one of the most talented and useful men that England has yet given to India. Of his intellectual character, the most prominent feature was enthusiasm—one of the prime elements of genius; a burning, irrepressible enthusiasm, to which nothing could set bounds and which communicated itself to whatever came before him.

...To this enthusiasm was fortunately united a habitude of order, and power of generalization, which enabled him to grasp and comprehend the greatest variety of details. His powers of perception were impressed with genius—they were clear, vigorous and instanteneous.

...It was in the conduct of this *journal,* that the amiable and good qualities of the man were most apparent and of most benefit to the public.

...His purse, too, was freely opened where occasion required.

...Never was there a mind more free from the paltry and mean jealousies which sometimes beset scientific men. The triumph of others seemed to give him as much pleasure as if achieved by himself...There was a charm, too, about his writings, which it is rare to meet with; he hunted after truth, and cared not how often or how notoriously he stumbled upon error in the pursuit....He was utterly devoid of that intolerance of being found in error and loathness to recant which often

* What is aimed at is an accurate description, illustrated by plans, measurements, drawings or photographs and by copies of inscriptions, of such remains as most deserve notice, with the history of them so far as it may be traceable, and a record of the traditions that are preserved regarding them.

২ Dr Hugh Falconer, *Colonial Magazine,* December 1840.

beset meaner minds.

বস্তুত, জেমস প্রিন্সেপের মতো একাধারে জ্ঞানতপস্বী, কর্মকুশল ও পরিশ্রমী সংগঠক, জনসেবক এবং সর্বোপরি মহান মানুষের এমন মূর্ত সমন্বয় বিরলদর্শন। গবেষক হিসাবে তিনি অসামান্য, বলতে গেলে তিনিই ভারতবর্ষের ইতিহাসের ভিত্তি স্থাপন করে গেছেন। তাঁর সময় থেকে ভারততত্ত্ব ও ভারতীয় প্রত্নবিদ্যা অনেক দূর অগ্রসর হয়েছে, কিন্তু প্রিন্সেপ চিরকালই পথিকৃৎ ভারততাত্ত্বিকের সম্মান পাবেন। ইংরেজ আমাদের কাছ থেকে নিয়েছে অনেক, কিন্তু জেমস প্রিন্সেপ এবং তাঁর সহকর্মী ও অনুবর্তীদের মাধ্যমে ভারতবর্ষকে যা দিয়েছে তার পরিমাণ অল্প নয়। জেমস প্রিন্সেপের নামে কলকাতায় একটি রাস্তা ছিল, আমাদের কর্তাদের স্বদেশীয়ানার আতিশয্যে ইতিমধ্যেই তার একটি অংশের নামবদল ঘটেছে, হয়তো অদূর ভবিষ্যতে বাকি অংশ থেকেও তাঁর নাম মুছে যাবে। গঙ্গাতীরে এখনও একটি ঘাট টিমটিম করে তাঁর স্মৃতি বহন করছে, হয়তো একদিন সে ঘাটেরও নতুন নামকরণ হবে। কিন্তু যথার্থ শিক্ষিত ভারতবাসী কখনও জেমস প্রিন্সেপকে ভুলবেন না, প্রিন্সেপের স্মৃতির পক্ষে এইটিই সান্ত্বনার ও ভরসার কথা।

আয়নায় মুখ

শিশির লাহিড়ী

রেণুপদ বড় ভীতু মানুষ। এমন ভীতু বড় একটা চোখে পড়ে না। অবশ্য বাইরের চেহারা দেখলে রেণুপদর ভয়ের কোন চিহ্ন ধরবার জো নেই। আধো-কাঁচাপাকা চুলে মাথা ভর্তি, বড় বড় চোখে মোটা ফ্রেমের মোটা কাঁচের চশমা, ঢেউতোলা দু-থাক থুতনি, ঠোঁট সামান্য বাঁকা রেণুপদর, দেখলেই মনে হয় কিছু হাসি বাসি পানের ছোপের মত লেগে আছে।

অথচ রেণুপদর মত এত অসুখী, এত অসহায় প্রাণী ত্রি-জগতে নেই। জলের চোরা স্রোতের মত সর্বক্ষণই একটা ভীষণ ভয়ের স্রোত, ঠিক হৃৎপিণ্ডের নিচে অম্বলের জ্বালায় দিনরাত টিকটিক করে, খেয়ে স্বস্তি নেই রেণুপদর, ঘুমিয়ে শান্তি; রেণুপদর দিনে জ্বালা রাতে ক্লান্তি।

ঘুমের-ঘোরে-বোবায়-ধরা মানুষের মত রেণুপদ কতদিন গোঁ-ও-গোঁ করে ওঠে, ঘামে সারা শরীর ভেজে, চোয়াল আটকে যায়। সুরঙ্গমার ঘুম ভেঙে যায়।—এই! কি হল? কি হল? সুরঙ্গমা উঠে রেণুপদর চেতনা ফিরিয়ে আনতে সাহায্য করে, গরমের দিন হলে মাথায় বাতাস দেয়, শীতের দিন হলে চুলে সান্ত্বনার হাতে বিলি কেটে দেয়। রেণুপদর ঘুমের বড় বড় অবাক চোখ টলটলে দেখায়, বিস্মিত রেণুপদ প্রথমেই জিজ্ঞাসা করে, আমার কি হয়েছিল? পরেই আবার পিঠোপিঠ বলে, আমায় একটু জল দেবে সুরো।

সুরঙ্গমাকে বিছানা ছেড়ে নামতে হয়, কুঁজোর থেকে জল গড়িয়ে আনতে হয়। সে জলটাকে একনিশ্বাসে পান করে রেণুপদ তৃপ্তির ঢেকুর তোলে, যেন অন্তর্লীন ভয়টাকে বাষ্প করে বার করে দিলে রেণুপদ, তারপর বলে, তোমার ঘুমটা ভাঙিয়ে দিলাম তো!

মিনুর জন্যে আজকাল ঘরের হালকা ফিরোজা রঙের আলোটা জ্বালিয়ে রাখতে হয়। সে আলোতে সুরঙ্গমার টেপা মুখের মৃদু হাসি ধরা পড়ে না।—এই বাইশ বছরের বিবাহিত জীবনে এমন একটা রাতও যায়নি সুরঙ্গমার, যে রাতে একবার না একবার উঠতে হয়েছে। অবশ্য প্রথম প্রথম এ ভাঙা ঘুমে ভালই লাগত, তখন রেণুপদর রক্তে যৌবনের জোয়ার ছিল। ঘুমভাঙা রেণুপদ নতুন উন্মাদনায় আবার কয়েক মুহূর্ত আদরে আদরে ভরিয়ে তুলত। এখন রক্তে নেশার রঙ ফিকে হয়ে এসেছে, সুরঙ্গমার শিথিল শরীরে মাংসল প্রাচুর্য ঠিক আর তেমনভাবে আবেগের জল কাটে না, এখন দুজনে পাশাপাশি দুটো কোলবালিশের মত অনড়, হাতে-হাত-রাখা রেণুপদ সুরঙ্গমার উষ্ণ সান্নিধ্যে নিশ্চিন্ত নির্ভরতার সাহচর্য খোঁজে, কখন ঘুম টিপি টিপি পায়ে এসে চোখের পাতা টিপে টিপ দিয়ে যায়। রেণুপদরা আবার ঘুমিয়ে পড়ে।

মুখে হাসি, নাকের পাটা ঈষৎ তোলা, সুরঙ্গমা মাঝে মাঝে বলে, তোমার মত ভীতু মানুষ জন্মে দেখিনি।—কি ভয় বাপু!

রেণুপদ ঠিক প্রতিবাদ করে না, কেমন যেন অস্বীকার করতে চায়।—ভয় কোথায় দেখলে?

উপচে-পড়া হাসিতে সুরঙ্গমার গাল থিকথিক করে কাঁপে।—বর্ণচোরা তুমি; ভয় কি আর তোমার দেখা যায়। যে বোঝে সে ঠিকই বোঝে। মা বুঝতেন আমিও বুঝি। মনে

মনে যখন তুমি ভয় পাও তখন ভয়-তরাসে কচিছেলের মত তোমার চোখের তারা কেমন এলিয়ে আসে, ঠোঁট ঝুলে পড়ে, আর তোমার এই চাপা রঙ্‌ও বাপু কেমন ফ্যাকাসে হয়ে ওঠে। এক-এক সময় আমার এমন হাসি পায়!

ও হাসি তোমার সব সময় পায় সুরো।—তুমি তো হেসেই সারা।

তা হাসব না কেন? তোমার মত কি পুতুপুতু করে, ভয়েভয়েই জীবনটা কাটাতে হবে? বাব্বা! কি মানুষ তুমি! হাসতে ভয়, কাশতে ভয়! পুরানো কিছু সুখস্মৃতির স্বাদ মুখে উঠে আসে সুরঙ্গমার।—সেসব দিনের কথা মনে পড়লে এখনও কুলকুল করে হাসি আসে। আমাকে ছুঁতে তোমার ভয় করত পাছে কিছু মনে করি, আবার ছুঁয়েও ভয় যেত না ভাবতে, সুখী হলাম কি হলাম না।

এসব কথায় রেণুপদ আজকাল লজ্জা পায়। থাক। পুরানো কাসুন্দি আর ঘাঁটতে হবে না।

পুরানো কাসুন্দি না ঘাঁটলেও চলে, কিন্তু কমলি নেহি ছোড়তি। ভয় তো মন থেকে যায় না রেণুপদর। গাড়ি চড়তে ভয় পাছে অ্যাক্‌সিডেন্ট হয়, গাড়ি থেকে নামতেও ভয় পাছে গাড়ি ছেড়ে দেয়। মাইনের টাকা আনতে ভয় পাছে পিক্‌পকেট হয়, আবার ফুরিয়ে গেলেও ভয় কি করে সংসার চলবে! ভয়! ভয়! ভয়! ভয়ের একটা দিশাহারা বৃত্তে অনবরত পাক খেতে খেতে রেণুপদ এক-এক সময় নাভিশ্বাসে মৃত্যুর চৌকাঠে পা রাখে, এই জীবন, এই অস্তিত্ব সব তেঁতো হয়ে ওঠে, মুখের স্বাদ টকে যায়।

বিয়ের ঠিক পরপর রেণুপদ ভেবেছিল ডাক্তার দেখাবে। কেন এই ভয়? কি জন্যে? এই ভয়ের উৎসটা কোথায়? মনের কোন্ গিরিগুহায় এই ভয়ভয় ভাবটা বাঘের মত চোখ মটকে ওৎ পেতে বসে আছে সেটা জানতে ইচ্ছে হয়। হয়ত সে খবরটা পেলে ডাক্তাররা সেই গুহাটার মুখ বন্ধ করে দিতে পারবে, চিরকালের মত ভয়ের হাত থেকে মুক্তি পাবে রেণুপদ। রেণুপদ তখন নির্ভয় নির্ভার হাসিখুশির জগতে গলা-ফোলানো পায়রার ঘাড়-বাঁকানো পদক্ষেপে হাঁটবে; বাজ নেই, আকাশের সীমানাও হাতের মুঠোয়, সেখানে নিশ্চিন্তে উড়ে উড়ে বেড়াবে রেণুপদ।

কিন্তু সেখানেও ভয়। ডাক্তারে যদি না পারে। যদি বলে, না মশাই, আপনার এ রোগ সারবার নয়। আমরণ এই ভয়টুকু নিয়েই আপনাকে কাটাতে হবে, মরলেও ভয় যাবে না আপনার। আপনি একটা ছেঁদো, বাজে, অত্যন্ত ভীতু লোক মশাই,—কীটস্য কীট! আপনার চিকিৎসা করা দুঃসাধ্য, আপনার ভয় তাড়ানো ভূতের মাথার চুল সোজা করার মত বিদ্‌ঘুটে ব্যাপার। ওসব আমরা পারব না।

হয়ত কেউ রাজি হল।—ঠিক আছে। সারিয়ে দেব। তারপর দুহাতে টাকা লুটতে থাকে, সপ্তাহে দু-তিন দিন যাচ্ছেন তো যাচ্ছেনই, ওষুধ খাচ্ছেন তো খাচ্ছেনই, টাকা দিচ্ছেন তো দিচ্ছেনই। তারপর সারল না। ভয়, ভয়ই রয়ে গেল, টাকা চলে গেল। তখন কি হবে? কি হবে?

শেষ অবধি ডাক্তার দেখানো হয়ে উঠল না রেণুপদর। সেই যে জ্যোতিষে বলেছিল; আপনার মশাই শনি চন্দ্র, একই রাশিতে, একই নক্ষত্রে, আপনাকে চিরকালই পুতুপুতু করে কাটাতে হবে। আপনার সুখেও স্বস্তি নেই, স্বস্তিতেও সুখ নেই, আপনার পালাবার পথ নেই মশাই, পালাবার পথ নেই। আপনি জটেবুড়ির জঙ্গলে পড়ে আছেন, এদিককার জঙ্গল ছাড়াবেন তো ওদিককার জঙ্গল এসে আপনার মুখ ঢেকে দেবে, ওদিককার জঙ্গল পেরিয়ে

এলে,—এদিককার জঙ্গল আছে, জঙ্গলের তো আর শেষ নেই। আর সে জঙ্গল আপনার মনের রক্তবীজের ঝাড় দিনরাতই তৈরি করছে মশাই, অল-দি-টাইম।

অল-দি-টাইম। সব সময়। সব সময়ই এই ভয়। কখনসখনও মা'র কথা মনে পড়ে রেণুপদর। মা বলতেন,—তুই যে কি রকম ছিলি রেণু কি বলব। তখন আমি কচি-মা। এই খিলখিলে-হাসি ছেলে ঘুম পাড়িয়ে শুইয়ে দিয়ে এলুম, এই সে ছেলে ভয়ে-ককিয়ে গলায় গগলি উঠে যায় যায়। বাপ-মা শিক্ষে দেয়নি বলে, কতদিন যে তোর ঠাক্‌মার কাছে নাকানি-চুবুনি খেয়েছি কি বলব।

মা'র কথা মনে পড়লে হাসিও পায়, দুঃখও হয়। মা'র শতেক খোয়ার হয়েছে। দুবছর অবধি হাঁটতেই শেখেনি রেণুপদ। খুব একেবারে ছেলেবেলার কথা মনে নেই, সাত-আট বছর থেকে একটু একটু আছে। বড় পিসিদের বাড়ি কি একটা ব্যাপারে সবাই গিয়েছিল, কোন একটা শ্রাদ্ধটাদ্ধর ব্যাপারে। শহর ছাড়িয়ে অনেকটা মাঠের মধ্যে দিয়ে গেলে তবে পিসিদের গ্রাম। গ্রামে পেঁাছবার আগেই সন্ধ্যে হয়ে এল। সরু মেঠো পথ দিয়ে যাতায়াত। তখন গ্রীষ্মকাল, চৈত্র মাস বোধহয়। বাবা বললেন, শুনছো, একটু দেখেশুনে চল। এই গরমে ওনারা এখন হাওয়া খেতে বেরোন, দেখো ঘাড়ে আবার পা দিও না যেন।

রাতে সাপের নাম করতে নেই, তাই বাবা নাম করেন নি। রেণুপদরা ছেলেবেলায় রাত্রে সাপকে লতা বলত। লতা বলেও রেণুপদর ভয় কাটত না। কি জানি বাবা ওরা তো মায়াবী, মা মনসার চর, যদি কোন রকমে বুঝতে পারে তাহলে আর রক্ষে নেই, একেবারে ফোঁস। একটি কামড় দেবে আর লখিন্দরের মত ঢুলে পড়বে, হাজার রোজা ডাক আর ডাক্তার ডাক, তোমাকে বাপু কালে খেয়েছে, যেতেই হবে।

সেই যে পিসিমার বাড়ি, পিসতুতো ভাই বলল—জানিস রেণু, ঠাকুদ্দাটা মরে মাইরি ভূত হয়েছে। তা ঠাকুদ্দার আর দোষ কি! ত্রি-পাদ দোষ পেয়েছে, ভরা মঙ্গলবার, অমাবস্যে, তার ওপর মরবার সময় হেগে মরেছে।—ওই যে জোড়া তালগাছ দেখছিস, ওই জোড়াতালের গাছে দুপা দিয়ে মাঝরাত্তিরে বাবু নাকি দুলে দুলে হাওয়া খায়, খোনা গলায় চিৎকার করে—বঁড়োঁ তেঁষ্টা পেঁয়েছেঁ। আঁমায় এঁকটু জঁল দেঁ।

এতক্ষণ সাপের ভয় ছিল, রেণুপদ হাতড়ে-হাতড়ে দেখে-দেখে পা ফেলছিল, শোবার আগেও সাতবার হাত বুলিয়ে বুলিয়ে বিছানা ঝেড়ে নিয়েছে, এখন তার ওপর জুটল ভূতের ভয়। সারারাত দুচোখের পাতা এক করতে পারল না রেণুপদ। চোখ বন্ধ করলেই দেখে তালগাছদুটো ধনুকের মত বেঁকে মাটি ছুঁচ্ছে আবার বেতের মত লিকলিক করতে করতে সিধে হয়ে যাচ্ছে। ভয়ে আমশি হয়ে গেল, দুদিনের দিন এক-গা জ্বর নিয়ে বাড়ি ফিরেছিল।

স্কুলের জীবনেও অনেক বিপত্তি গিয়েছে। রেণুপদ ক্লাসের মনিটর ছিল, দুষ্টু ছেলেদের নাম খাতায় টুকে মাস্টারমশাইকে দিতে হত। মাস্টারমশাই তাদের সাজা দিতেন, নীল ডাউন হয়ে দুহাতে দুখানা থানইট, কারো বা পিঠে বেত পড়ত। এক-এক জনকে সাজা দিতেন মাস্টারমশাই আর রেণুপদ ককিয়ে উঠত। ছেলেরা চোখ পাকাত, বলত, প্যাঁক দেওয়া বার করছি। তা কি করবে রেণুপদ, সবই ভাগ্য, মাস্টারমশাইকে ভয়, নাম না টুকলে মার, আর টুকলেও ভয় ছেলেদের হাতে আড়ং ধোলাই। রেণুপদর সবই শাঁখের করাত, যেতেও কাটে, আসতেও কাটে। কলেজেও তাই। কলেজের ছেলেরা মিছিল করত, সভা করত, রেণুপদ ভয়ের তাড়নায় সে মিছিলে সামিল হত, সভায় যোগ দিত। না গেলে ছেলেরা দুয়ো দেবে। কেউ বলবে স্পাই! ইনফরমার! কেউ বলবে পা-চাটা দালাল। লাইন থেকে তাক্-

মাফিক কেটে পড়ত রেণুপদ, কখনও কখনও সভা থেকে। ওদিকেও ভয় আছে,—ভীষণ ভয়। বাঘে ছুঁলে আঠার ঘা, শেষকালে পুলিস যদি ঠাণ্ডী-গারদে পোরে, তাহলে তো বাবার চাকরি নিয়েই টানাটানি, ভাতে মারবে পুলিস। রেণুপদ ভয়ে কালিয়ে যেত, ব্রণ খুঁটত গালের। রেণুপদর তখন গালে ডুমো ডুমো ব্রণ, বন্ধুরা বলত, শরীরে কাম জাগলে ব্রণ ফোটে।

তা ঠিকই, বন্ধুদের কথা বোধহয় ঠিক। ওরই এক বন্ধুর বোন রানী না শিবানী, কি যেন নাম। কালো চেহারা, বাঁধুনি ভাল, খরখর করে হাসত, টকটক করে কথা কইত। মাঝে মাঝে তাকে স্বপ্নে দেখত রেণুপদ। স্বপ্নে একেবারে উলঙ্গ হয়ে আসত রানী, ঘুমের মধ্যে রেণুপদ আশ্চর্য সুখের সঙ্গে অদ্ভুত ভয় পেত, শরীর কান্না হয়ে গলে যেত। ঘুম ভাঙলে সারা সকাল মরমে মরে থাকত, ভাবত মুখ দেখে কোনদিন মনের কথা ধরে ফেলবে রানী, তারপর আঙুল তুলে তাকে ছি-ছিক্কার দেবে।—তুমি এই রেণুদা! তোমার চোখে পাপ, মনে কাম। তোমার গালে ব্রণ, তুমি স্বপ্নে আমায় ন্যাংটো করে ছাড়।—ছিঃ!—ছিঃ! ছিঃ—ছিঃটা ভোঁ ভোঁ করে বাজত, ভয়ে জিব শুকিয়ে গলার মধ্যে ঢুকে যেত, মুখের কথা আটকে আসত রেণুপদর, নিজের অজান্তে তোতলা হয়ে যেত কখন।

যাও, যে ট্রামটা আসছে, সেটার দড়ি কেটে পুড়িয়ে এস। কে যেন বলল, হাতে পেট্রল দিল খানিক,—যাও।—গো। মেদিনীপুর তখন স্বাধীন, কলকাতায় তখন কালো-কালো হোঁৎকা-হোঁৎকা নাক-চ্যাপ্টা সব কাফ্রি আর সাদা সাদা সব সাহেব সোলজার। প্রাণের ভয় নেই, লাজলজ্জা নেই। খোলামেলা পুকুরে জন্মদিনের পোশাকে চান করে, রাস্তায় গাড়ি থামিয়ে মেয়েদের তুলে নিয়ে যায়। গান্ধীজী ডাক দিয়েছেন,—করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে! গ্রামে গ্রামে রেললাইন উপড়ে ফেলা, পোস্টাপিস পোড়ানো। সারা ভারতবর্ষে আগুন। ছেলেদের মনে আগুন, মেয়েদের মনে আগুন, কেবল রেণুপদর মনের আগুন ভয়ের ছাই-ছাপা, আছে কি নেই বোঝা যায় না।

যাও।—গো। এগোলেও কাঁটা, না এগোলেও কাঁটা, হেঁটোয় কাঁটা মাথায় কাঁটা, কাঁটা ওপরে নিচে। রেণুপদর পা মাটিতে আটকে গেছে, কেউ যেন ঠেলে দিল,—গো। মুখ থুবড়ে পড়তে পড়তে রেণুপদ দেখল, দমক দেওয়া একটা কাশির চাপে হৃৎপিণ্ডটা থলথল করতে করতে বাইরে বের হয়ে এল। রেণুপদ কোন রকমে সেটাকে কোঁচার খুঁটে বেঁধে নিয়ে মরা শরীরটাকে টানতে টানতে ছেঁচড়ে ছেঁচড়ে নিয়ে চলল। কোন অনুভূতি নেই, রেণুপদর হাত কাঠের, পা কাঠের, রেণুপদ কাঠ-মানুষ। রাইফেলের গুলি চলছে, লোক পড়ছে, রেণুপদ হাত তুলল, পেট্রলের শিশি ছুঁড়তে গিয়ে ভেঙে ফেলল, কারা কোথায় কখন দড়ি কাটল, আগুন জ্বালল, কাঠের চোখ আগুনের আভায় ঝলসে উঠল, রেণুপদ পড়ে গেল, মুখ থুবড়ে পড়ে দুহাতে হৃৎপিণ্ডটাকে আঁকড়ে ধরে কাঁদতে লাগল।

দুদিন বাদে জ্ঞান হল। কারা যেন বলল,—সাবাস! সাবাস বলে কে পিঠে আদরের থাপড় মারল। সে থাবড়ানোটাকে মার ভেবে মাথা নিচু করে নিজেকে লুকুতে চাইল রেণুপদ, ভয়ে কাঁচুমাচু।

দিনকয়েক বাদে রানীর সঙ্গে দেখা। রানী বলল,—বাব্বা! তুমি নাকি মস্ত বীর! হিরো হয়ে গেছ রেণুদা!

রেণুপদ পায়ের কাটা দেখাচ্ছিল, হাতের ছড়া। রানী ঝুঁকে দেখছিল। রানীর বুকের জোড়া চাঁদের কাস্তের মত একটুকরো ফালি দেখতে পাচ্ছিল রেণুপদ। ট্রামের মত ওখানেও আগুন দিতে অদৃশ্য কে আদেশ করল,—যাও।—গো।

পেট্রলের মত মনে কামের তেল নিয়ে রেণুপদ এগিয়ে গেল। তারপর দেখল ভয়ে হৃৎপিণ্ডটা আবার চলকে বাইরে বেরিয়ে এসেছে। রানী সেদিকে নাক কুঁচকে গা-ঘিন-ঘিন গলায় বলল,—ওটা কি?

—আমার হার্ট।

কি বিশ্রী! কি নোঙরা! ভয়ে কুঁকড়ে এতটুকু হয়ে আছে। কিম্ভূতকিমাকার! গায়ে একটা ঢেউ তুলে রানী উঠে পড়ল,—বাব্বা! আমার গা ন্যাকার ন্যাকার করছে। বমি হবে।

রেণুপদ কাঠ-কাঠ গলায় বলল, রানী! তুমি বমি কোরো না, আমি তোমাকে ভালবাসি। তোমার জন্যে আমি হন্যে কুকুর হয়ে আছি।

রানী হেসে উঠল। ঝড়ের দোলার মত সে হাসি কিতকিত থেকে খিলখিল হয়ে গেল। রানী বলল, বেশ! আমার বাবা-দাদাকে বলি, এবার একটা চেন কিনে দাও, আমি একটা কুকুর পুষবো।

রেণুপদ ভয়ে আর্ত চিৎকার করে উঠল।—না।—না।—না।—না, রানী, না!

সে চিৎকারটা এখনও শুনতে পায় রেণুপদ।—না।—না।—না। রেণুপদ বড় ভীতু মানুষ। এই ভয়টাই রেণুপদর জীবন, অস্তিত্ব। এ ভয় যেদিন থাকবে না, রেণুপদ ভাবল, সেদিন রেণুপদ বুঝবে, রেণুপদ মরে গিয়েছে।

মা-মরা এই নাতনিটাকে নিয়ে রেণুপদর যত জ্বালা। সেই একটাই যা মেয়ে হয়েছিল নিজের, আর ছেলেপুলে হয়নি সুরঙ্গমার, নাড়ি উল্টে ভেতরে ভেতরে কি একটা গণ্ডগোল পাকিয়েছিল সুরঙ্গমা। যাক্, হয়নি তাই সর্বরক্ষে, নইলে হয়ত মরেই যেত রেণুপদ। সুরঙ্গমা মা হিসেবে অ্যালবেলে। মেয়ে কাঁথা ভিজিয়ে শুয়ে আছেই তো আছে, মা'র কোন সাড় নেই। আরে, কচি মেয়ে, দুধের শিশু, যদি ঠাণ্ডা লেগে যায়, তাহলে বুকে সর্দি বসতে কতক্ষণ? আর, একবার সর্দি বসলে রক্ষা করা যাবে মেয়েকে? রাত্রে উঠে মেয়ের কাঁথা বদলাতে হত নিজেকে। মেয়েকে হাতে তুলে বিপদে পড়ত রেণুপদ, ঘুমন্ত মেয়ে, কেমন ন্যাকপ্যাক করত, মনে হত এখুনি বুঝি মট্ করে ঘাড়টা মটকে যাবে। দুরু দুরু বুকে কোন রকমে যদি কাজ সারল তো বিপদ গেল না, রাতে কি রকম শব্দ করত, নাকের কাছে মাঝে মাঝে হাত তুলে দেখত নিশ্বাস পড়ছে তো! সেই দেখতে গিয়েই রেণুপদ একদিন দেখল সুরঙ্গমা মেয়ের বুকে আদুল এক পা তুলে ভাম হয়ে ঘুমুচ্ছে, মেয়েটা কেমন কপ্-কপ্ আওয়াজ করছে। ভয়ে সেইমুহূর্তেই নীল হয়ে গেল রেণুপদর মুখ, মনে হল নিজের নিশ্বেস টলগুলির মত জমে গিয়ে নাকের ফুটো বুঁজিয়ে দিচ্ছে, রেণুপদর দম আটকে আসছে।

রেণুপদ তখন ভাবত মেয়েটা তাড়াতাড়ি বড় হলেই বুঝি ঝামেলা মিটবে। কিন্তু মেয়ে বড় হতে-না-হতেই হাতে-পায়ে দুষ্টু হয়ে উঠল, রেণুপদর ভয় আরও ধুকপুকে হতে থাকল। দেখতে-না-দেখতে হুট করে মেয়ে বের হয়ে যায়, চোখের পলকে ছাতে ওঠে, ছুট্টে বাইরে গাড়িচলা রাস্তায় পা বাড়ায়। ভয়ে রেণুপদ অস্থির হয়ে ওঠে, সুরঙ্গমার সঙ্গে খিটিমিটি লাগে।

রেণুপদর কথায় সুরঙ্গমা রেগে যায়।—হাত-পা থাকলেই কাটে-কোটে ভাঙে। আদিখ্যেতা! মেয়েকে আমি দিনরাত বুঝি আগলে আগলে থাকব? আমার কাজ নেই, না?

কখনও বলত, অতই যদি ভয়, তবে একটা কাঁচের জারে পুরে রাখলেই পার।

মেয়ে বড় হল, স্কুলে গেল। রেণুপদ নিজে দিয়ে আসত মেয়েকে, নিয়ে আসত সুরঙ্গমা। কিন্তু সুরঙ্গমার ওপর এসব ব্যাপারে বিশ্বাস রাখতে পারত না রেণুপদ।—কি জানি যা গে'তো, হয়ত আনতে যেতে ভুল করেছে। প্রথমটা এই আনতে ভুল করার প্রসঙ্গটা সামান্য হয়ে দেখা দিত। একটু পরেই ভয়ে আঁৎকে উঠত রেণুপদ, অ্যাঁ! ভুলে গেছে! তাহলে কি হবে? কার সঙ্গে আসবে মেয়েটা? যদি আসতে না পারে? যদি পথ হারিয়ে ফেলে?

মাঝে মাঝে ছুটি-ছাটা হবার আগেই রেণুপদ বাড়ি এসে হাজির। কি ব্যাপার? অফিসের কে-না-কে বলেছে ওদের পাড়ার দু' দুটো ছোট ছোট ছেলেমেয়ে নিপাত্তা। লবেঞ্চুষ দেবার লোভ দেখিয়ে ছেলেধরায় ধরে নিয়ে গিয়েছে। সুরঙ্গমা এসব দেখে শুনে হাসত। —আর, ঢং দেখে বাঁচি নে। মেয়ে যেন উনি ঘরে পুষে রাখবেন, পরের বাড়ি পাঠাতে হবে না? একদিন রেণুপদর বাড়াবাড়িতে রেগে সুরঙ্গমা মানত দিয়েছিল, মাইরি! আর জন্মে মরে যেন তোমার মেয়ে হয়ে জন্মাই। বউ হয়ে তো জন্মটাই বৃথা গেল।

সেই মেয়ের সকাল সকাল বিয়ে দিল রেণুপদ। চোদ্দ পেরিয়ে সবে পনেরোয় পা দিয়েছে, শরীর-টরীর ভেঙে গড়তে শুরু করেছে সবে, কৈশোর-লাবণ্য যৌবনশ্রীতে খোয়া যাচ্ছে তখন।

সুরঙ্গমা বেঁকে বসেছিল। বলেছিল, মানে হয়?

মানে তো হয় না। রেণুপদ নিজে বোঝে। কিন্তু কি করবে? ভয়টা যে মনটাকে কুরুনি দিয়ে দিনরাত কুরছে। ভয়। নানারকমের ভয়। মেয়েদের প্রলোভনের ভয়, অবিবেচনার ভয়, প্ররোচনার ভয়। বিয়ে দিয়েই যেন বড় ভয় গেল রেণুপদর! ভয় তখন অন্য একটা ভয়কে হাত-পা মেলে জড়িয়ে ধরল।—এই কচি মেয়ে! যদি কিছু হয়? এইটুকু মেয়ে, তখন কি করবে?

দশ মাসের মাস মেয়েকে হাসপাতালে নিয়ে গেল রেণুপদ, দুদিন পরে একতাল মাংস কোলে করে নিয়ে ফিরল সুরঙ্গমা। সুরঙ্গমা বলত, গাছ নেই তবু গাছের ফল। এই ফলটাকে নিয়ে যে কদিন বাঁচা। আমার চেয়ে ওর দাদুর বাঁচা। এমনিতেই তো ভয়ে-ভয়েই লোকটা মরমর, এখন যদি একটু বেঁচে ওঠে, নড়েচড়ে বেড়ায়।

সেই পনেরো বছর আগের পুরানো ভয়ের রোগটা আবার ছেঁকে ধরল রেণুপদকে। রাত্রের ঘুম মাথায় উঠল। মেয়েটা যেমন পাজী তেমনি ঠ্যাটা। বুকের-দুধ-না-পাওয়া মেয়েটা সারারাত জ্বালিয়ে মারে। রেণুপদ বলে, ওগো শুনছ, দাও না একটু বোঁটাটা গুঁজে দাও না মুখে, একটু ঠাণ্ডা হোক।

হ্যাঁ! ছোবড়া চুষে শান্ত হবে? সবাই তোমার অশ্বত্থামা তো, পিটুলিগোলা দুধ বলে খাইয়ে দিলেই চলবে! রেগে চড়টা-থাপড়টা মারে সুরঙ্গমা, আহা! মেয়ে যেন আমার স্বর্গে বাতি দেবে।

একটু চ্যাপ্টা ভুটিয়া ভুটিয়া মুখ, নাক চাপা, বড় বড় চোখ, ফর্সা রঙ, একমাথা কোঁকড়া কালো চুল, সাদা সাদা দুধে দাঁত, মাঝে মাঝে দাঁত বের করে হাসে।

রেণুপদ ভোলা-চোখে তাকিয়ে থাকে। জীবনটার একটা মানে খুঁজে পাচ্ছে, বাঁচতে কেমন ভাল লাগছে। এই ভয়-ভাবনা-চিন্তা-উদ্বেগ নিয়ে বেশ নতুন নতুন মনে হচ্ছে।

রেণুপদর ঘাড় ধরে ঝুলে পড়ে মিনু। দাদু ঘোড়া হবে? আধো-আধো মিষ্টি-

মিষ্টি কথা,—দাদু ঘোড়া হও না,—দাদু!

কোমর ধরে ঝুলছে, পিঠে লাফিয়ে উঠছে। রেণুপদ মানা করে,—উহুঁ হুঁ! পড়ে যাবি মিনু। লাগবে।

মিনু সাদা সাদা দাঁত বের করে শব্দ করে হাসে।—দাদু ভীতু!

রেণুপদ কথা চাপা দেয়। মাথার চুলে আঙুল ডুবিয়ে নাড়তে নাড়তে বলে, নারে, তোর লাগবে যে।

ঝাঁকড়া মাথার একমাথা চুলের মত, কচি গলায় একগলা হাসি হাসতে হাসতে মিনু সুর তোলে,—ওমা। দাদু কেমন ভীতু।—ভীতু।

রেণুপদ অসহায় বোধ করে। মেয়েটা যখন সুর তুলে, ওমা দাদু কেমন ভীতু, দাদু কেমন ভীতু বলে, সুরঙ্গমা মুখে কাপড় চাপা দিয়ে খিলখিল করে হাসে, তখন পলকে প্রলয় ঘটে যায়। নিজের সমস্ত অস্তিত্বটা সেই পুরানো পরিচিত ভয়ের বৃত্তে ঘুরতে ঘুরতে টাল খায়, রেণুপদর কপালে বুকে ঘাম বিজবিজ, চোখ এলিয়ে আসে।

সুরঙ্গমা মেয়ে আদর করতে করতে বলে,—কেমন জব্দ! এ জব্দটাকে যে মনে মনে উপভোগ করছে সুরঙ্গমা এমন বোধ হয়, যত বলে কেমন জব্দ, তত যেন মিনুর সাহস বাড়ে। মিনু তত হাতে তালি দেয়,—এ মা! দাদু কেমন ভীতু—ভীতু!

একদিন বুঝি রেগে গিয়েছিল রেণুপদ। রেগে একটা চড় বসিয়ে দিয়েছিল। মেয়েটা চিৎকারে কঁকিয়ে ওঠে। সুরঙ্গমার মুখ থমথমে।—এটুকু মেয়ের গায়ে হাত তুলতে তোমার লজ্জা হল না। সুরঙ্গমা বলেছিল—ঠিক আছে। যাদের জিনিস তাদেরই আমি দিয়ে আসব। আমি কেন নিমিত্তের ভাগী হতে যাই!

রেণুপদ এতোটুকু হয়ে গিয়েছিল। সুরঙ্গমা চড়টা-আশটা মারলে দোষ নেই, রেণুপদ একটু ঠুক করলেই মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যায়। আরে, রেণুপদ কি পর! মেয়েদের মনের খবর ভগবান বোঝে না, রেণুপদ তো ছার! এই বুড়ো বয়সে সুরঙ্গমার অনেক মান অভিমান হয়েছে, শেষে দুম করে যদি মেয়েটাকে ফিরিয়ে দিয়ে আসে, বলে সুবল তোমার জিনিস নাও, আমি চলি। তাহলে কি করবে রেণুপদ? কি করবে?

মিনুটাও সব বোঝে। দুষ্টু সরস্বতী একেবারে। খাবেদাবে, দুষ্টুমি করবে, পড়বে না শুনবে না, ক'দিন ধরে আবার বায়না নিয়েছে, দাদু ট্যাক্সি চাপব; চেপে বেড়াব।

ট্যাক্সিতে বড় বেশি ভয় রেণুপদর। পারতপক্ষে রেণুপদ ট্যাক্সি চাপে না। বাসে যেতেই হাতের মুঠোয় মনটাকে নিয়ে চলাফেরা করতে হয়, ট্যাক্সিতে তো কথাই নেই। ওরা বড় জোরে চালায়, রাস্তার দিকবিদিক মানে না, বাচ্ছা বুড়ো কিছুই রেয়াৎ করে না। কাগজ খুললেই ট্যাক্সি অ্যাকসিডেন্টের ব্যাপার চোখে পড়ে, চাপা দেবার খবর পাওয়া যায়। কি আশ্চর্য! কেমন যেন মৃত্যুভয় এসে বিভ্রান্ত করতে থাকে রেণুপদকে। যত রাজ্যের মৃত আত্মীয়-স্বজন, লোকজনের ছায়া ভাসে। কেন এমন হয় বলতে পারে না রেণুপদ, যত জোর চলে গাড়ি, তত যেন ভয়টা সঁচের মত সুরু ফলায় বিদ্ধ করতে থাকে। কোন কারণ নেই, অহেতুক। হাজার হাজার লোক গাড়ি চাপে, তবু কেন যেন কিছুতেই ভয়ের বিষণ্ন বিষাদের আবহাওয়া থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে পারে না রেণুপদ। মনে হয় ঘাড়ের ওপর যম ঝুঁকে পড়ে দেখছে, ঠিক সময় হলেই দণ্ডটি খুলে ধরবে আর প্রাণবায়ুটুকু টেনে নিয়ে যম দণ্ডের ডালা বন্ধ করে চলে যাবে। রেণুপদ একবার হয়ত উঃ-আঃ করবে, একবার হয়ত চিৎকার করে উঠবে, কিন্তু মরতে রেণুপদকে হবেই। মরণ ছাড়া গতি নেই।

রেণুপদ ট্যাক্সি চাপার কথা হেসে উড়িয়ে দেয়। মিনুকে আদর করতে করতে বলে।—দূর বোকা মেয়ে, ট্যাক্সি চেপে কি হবে? আমি তোকে খেলাপাতি কিনে দিচ্ছি, পাখিটাখি। পুতুলটুতুল আনছি। পুতুলের বিয়ে দে, আমরা সব নেমন্ত খাব।—কত রকমের খাবার। দই-মিষ্টি-হালুয়া-গালুয়া।

মিনু কথা শোনে না, ঘাড় নাড়ে। ও দাদু ট্যাক্সি চাপব। একদিন চাপাও না।

সুরঙ্গমা হাসে।—সেই মানুষ কিনা। বিয়ের পর থেকে আমাকেও একদিন চাপিয়েছে। চাপালে ওই ট্রাম,—বড় জোর ফিটন। ট্যাক্সি চাপলে তোর দাদু ফিট হয়ে যাবে মিনু।—এমন ভীতু মানুষ আমি ভূ-ভারতে দেখিনি বাবা।

সত্যি রেণুপদ ভীতু। এ যে কি ধরনের ভয় বোঝানো যায় না, কেমন করে বোঝাবে রেণুপদ, মনের সেই শঙ্কা, সেই শিহর, সেই ঘাম-ঘাম জ্বালা-জ্বালা ভাব, সেই স্বস্তি নেই শান্তি নেই ভাব। রেণুপদকে পেটে নিয়ে মা বোধ হয় খুব ভয় পেত? সেই ভয়-তরাসে ভাবটা রেণুপদর নাড়িতে নাড়িতে, শিরায় শিরায়, আনন্দে ভয় শোকে ভয়, হাসিতে ভয় দুঃখে ভয়। ভয় সর্বত্র, অনির্দেশ্য এক অন্য অনুভূতি।

রাত্রে ঘুমের মধ্যে মেয়েটা শুয়ে শুয়ে ফোঁপায়।—দাদু ট্যাক্সি চাপব। দাদু। ভুল বকে; ঠোঁট ফুলিয়ে ফুলিয়ে কাঁদে।

সুরঙ্গমা কিছু বলে না। মাঝে মাঝে কেমন চোখ তুলে তাকায়। সে চোখে ধিক্কার থাকে, ছি-ছিক্কার থাকে. রেণুপদর লজ্জা হয়, দুঃখ হয়, ভয়ও হয়। সুরঙ্গমা যদি মিনুকে ফিরিয়ে দিয়ে আসে, বলে এই নাও সুবল তোমার জিনিস জিম্মে করে দিলুম, আমি আর পারব না। ওর দাদু তো মানুষ নয়, জন্তু, ওর আওতায় আমি কেমন করে মেয়েকে বাঁচাব।

কিন্তু রেণুপদরও তো নিজের ভয় আছে। ভগবান না করুন, হঠাৎ ধরো কিছু হল, ট্যাক্সি অ্যাকসিডেন্ট করল, না হয় কিছু একটা করল। মেয়ে নিয়ে গেল রেণুপদ, ফিরল শূন্য হাতে। তখন কি হবে? সুবল এসে দাঁড়ায়, বলে, বাবা, আমার মেয়েকে ফিরিয়ে দিন। ঐ আমার একটি মেয়ে, রেখার স্মৃতি। তা হলে কি করবে রেণুপদ? কি উত্তর দেবে? কি বলবে? কাঁদবে? কাঁদবে শুধু?

তোমার মনটা সব সময় কু নেয়। সুরঙ্গমা বলে। বলে খালাস মেয়েমানুষ। কিন্তু রেণুপদ তার কি করতে পারে? কু নিলে কি করবে রেণুপদ? সকলের মনই যে সবসময় সু নেবে এমন কি আইন আছে?

আইন নেই সত্যি। বায়নারও তো আইন নেই। ছেলেমানুষ মেয়ে বায়না করতে করতে ছোঁক ছোঁক করতে করতে জ্বরে পড়ল। রেণুপদ ঝুঁকে কপালে হাত দিয়ে জ্বর দেখতে যাচ্ছিল, সুরঙ্গমা রেগে ঠেলে হাতটা সরিয়ে দিল।—থাক। আর ভাবন করতে হবে না। তুমি আমার মেয়ের গায়ে হাত দেবে না বলছি, সুরঙ্গমা বলল,—তাহলে আমি দিব্যি দেব, মরণ দিব্যি! তারপর খানিক কাঁদল সুরঙ্গমা।

সামান্য জ্বর, দুদিনের দিন ছেড়ে গেল। সিঙিমাছ কাঁচকলার ঝোল দিয়ে দুটি ঘুটের জ্বালের পোরের ভাত মেখে খেতে খেতে মিনু রেণুপদর মুখের দিকে তাকিয়ে ফিক করে হেসে ফেলল।—দাদু! আমি সেরে গিছি। এবার কিন্তু ট্যাক্সি চাপব।—কাল।

রেণুপদ হাসতে চেষ্টা করল, হাসিটা খটাসের হাসির মত শুক্‌নো খটখটে। রেণুপদ ঢোক গিলল,—কাল নয়, পরশু।

—হ্যাঁ দাদু! কাল। মিনুর স্বর টানা-টানা, আব্দারে মাখা।

—না মা, পরশু। পরশু তো ছুটি আছে।

সুরঙ্গমা হাসল।—কাল পরশু করেই পালাও। বুড়ো খোকার বেহদ্দ।

রেণুপদ খি-খি করে হাসল।—তুমি যাবে নাকি?

—আমি না গেলে বুঝি ভয় কাটছে না তোমার?

—না তা নয়। রেণুপদ নিজেকে চাপতে চাইল,—তোমরা যা ভাব আমি তা নই. অত ভীতু নই আমি। আমি সাবধানী। সুখসুবাদে ঝঞ্ঝাট বাধিয়ে ম্যাও ঠেলতে রাজি নই।

সুরঙ্গমার ভারি গাল থিকথিক হাসিতে কাঁপতে থাকল।—বুকে হাত দিয়ে কথা বল। মাগো! কি মিথ্যুক!

দিনটা কাটল, রাতটাও কাটল। রেণুপদ ট্যাক্সি চাপার কথাটা মনে করতে চাইছিল না। সে দেখা যাবে'খন, দেখা যাবে, এমন ভাবছিল। কিন্তু ভাবনাটা যে খেজুরকাঁটার মত, একবার ফুটে চলতে শুরু করলে সামলানো দায়, শরীর এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় করে ঘুরে বেড়ায়। রেণুপদর অস্বস্তি লাগছে, চিন্তা না করলেও চিন্তা, মন খচ-খচ করতে শুরু করেছে। এ মনের একবার যদি নাগাল পেত রেণুপদ তাহলে সেটুকু ছুরির ডগা দিয়ে তুলে ফেলে দিত, যন্ত্রণা মিটত।

মিনুকে সাজাচ্ছিল সুরঙ্গমা। সুন্দর একটা ফ্রক পরেছে মিনু, পায়ে লাল জুতো, মাথায় লাল ফিতের প্রজাপতি ক্লিপে আঁটা, মিনুকে ছবির মত দেখাচ্ছিল।

মিনুর থুতনিতে হাত ছুঁইয়ে চিককটে চুমু খেয়ে সুরঙ্গমা বলল,—দাদু যা বলবে, শুনো, লক্ষ্মী মা আমার। তারপর রেণুপদর দিকে তাকিয়ে হাসল।—একটু হাসিমুখে যাও বাপু, একেবারে যে বলির ইয়ের মত দেখাচ্ছে।

রেণুপদ ভয় ঢাকতে খ্যা-খ্যা করে হেসে উঠল।—নামটা বলতে মুখে বড় আটকাল, না?

হাতের থাবায় ভর রেখে মাটি ছেড়ে উঠতে উঠতে সুরঙ্গমা বলল,—হাজার হোক স্বামী। অতবড় কথাটা তোমাকে কি করে বলি বল! তারপর আবার বলল, কিছু চাই? টাকা-কড়িটড়ি?

—এক গ্লাস জল দাও সুরো।

জল এনে সুরঙ্গমা হাসতে হাসতে বলল,—অত যদি ভয় পাও, না হয় ফিটনেই ঘুরে এসো খানিক।

রেণুপদ জলে চুমুক দিয়ে ঢোক গিলল।—ভয় পাচ্ছি কোথায়?

সুরঙ্গমা যেমন হাসছিল তেমনি হাসল।—আয়না আনব?

মিনু এসে আঙুল ধরল, তার পরই আঙুল ছেড়ে হাত পুঁছল জামায়।—এ দাদু, ঘাম।

রেণুপদ হাতের ঘাম পুঁছল। ঘাম পুঁছে কি হবে, আবার তো হাত ঘামবে।

বুড়ো শিখ ট্যাক্সিঅলা।—কাঁহা জায়েগা?

রেণুপদ মিনুর দিকে তাকিয়ে হাসতে চেষ্টা করল।—এ ছোটা দিদিমণি সফর করনে মাংতা হ্যায়, ঘুমানে হোগা।—যদ্দুর চোখ যাতা তদ্দুর ঘুমানে হোগা।

গাড়ি চাপতে চাপতে মিনু হাসল।—দাদু তুমি ভীতু নও।—দিদু মিছে বলেছে।

গাড়ি চলছিল। বিকালের এ পড়ন্ত আলোয় কিছুক্ষণ অন্যমনস্কের মত বসে রেণুপদ নিজেকে ঠিক করে নিচ্ছিল। ভিড়ের এ রাস্তায় সকলের ব্যস্ততা, অন্য গাড়ির হর্ন বাজছে, সাৎ করে কেউ বের হয়ে যাচ্ছে পাশ কাটিয়ে, কেউবা পাশ দিতে বলছে, জোরে হর্ন দিয়ে।

রেণুপদ চোখ বুঁজে কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল,—ঠিক বলেছিস। দিদু মিছে বলেছে। তোর দিদু আমায় ভালবাসে না।

মিনু অবিশ্বাসের মুখ তুলল। একটু ঘনিষ্ঠ হয়ে কাছে সরে এল। তারপর পাখি-পড়ার মত বলল,—না গো। ভুল। দিদু আমায় বলেছে তোর দাদুটা ভীতু যা। নইলে মানুষ ভাল।

রেণুপদ পাকামি শুনতে শুনতে চোখ বড় বড় করে তাকাল। তারপর বলল,—ড্রাইভারজী ধীরে।

এতক্ষণে অনেক ফাঁকা রাস্তায় এসে পড়েছে। ধীরেই গাড়ি চলছিল, এখন এ ফাঁকা রাস্তায় আরও ধীর মন্থর, গাড়িটা যেন জোর কদমে হেঁটে হেঁটে যাচ্ছিল। বিকালের আলো মরে আসছে, আকাশে সন্ধ্যার বিষণ্ণতা। মিনু এক সময়ে বলল,—একদম বাজে গাড়ি। জোরে চলতে পারে না।

আমি মানা করলুম, রেণুপদ বলল, বেশি জোরে যাওয়া ভাল নয়।

অল্প কয়েক মুহূর্ত চুপ করে বসে রইল মিনু তারপরে বলল, আর একটু জোরে চালাতে বল দাদু।

রেণুপদ ঘাড় নাড়ল। না।

চোখের কোণ দিয়ে রেণুপদকে যেন পরিমাপ করল মিনু তারপর হাতের তালি বাজিয়ে সুরে সুরে বলে উঠল,—এ মা! দাদু ভীষণ ভীতু! দাদু ভীষণ ভীতু!

রেণুপদ রাগ করতে চাইছিল, মেয়েটা সুরোর আদরে আদরে বেচাল হচ্ছে, অথচ ঠিক রাগ করতে পারছে না। বুড়ো ড্রাইভার কি বুঝল কে জানে, গাড়ি একটু জোর ছোটাল। রেণুপদ বলল, আস্তে।

মিনু হাসছিল। হাসতে হাসতে সুর করে বলছিল,—এ মা! দাদু ভীষণ ভীতু!

ড্রাইভার মুখ ফেরাল।—বাচ্ছা হ্যায় বাবু, যানে দিজিয়ে।

গাড়ির গতি বাড়ছিল। কাঁচের জানালায় হাওয়া ঝমঝম, পিচের রাস্তায় শব্দ চপচপ। রেণুপদ চশমার ফাঁকে ভাল করে তাকাতে পারছে না, অন্ধকারটা আরও একটু কালো হয়ে নামছে। একবার আলো জ্বালল ড্রাইভার, আবার নেভাল, হর্ন দিল, সজোরে ব্রেক কষল একবার, তারপর আকাশে ওড়া চিলের মত ডানা মেলে দিয়ে হাওয়ায় উড়িয়ে নিয়ে চলল। ঝড়ের মত বাতাসের গর্জন, চাকার শব্দ আর বিচ্ছিন্ন করা যাচ্ছে না, কেমন একটানা চ-প-র চ-প-র শব্দ উঠছে, রেণুপদ বোধ করল পিয়াজের ফুলের মত ভয়টা কখন যেন মনের মধ্যে ফেটে ছড়িয়ে পড়েছে, একটা তীব্র ভয়াল ঝাঁঝে চোখ দিয়ে জল পড়ছে, দৃষ্টি আবছা, রেণুপদ কিছুই দেখতে পাচ্ছে না, কেবল ক্ষীণ একটু হাসির শব্দ কানে আসছিল।

শেষে হাসির শব্দটাও ভয়ের কান্নার মত গোঙানো হয়ে গেল।—একটু দেখেশুনে চল, ঘাড়েটাড়ে পা দিও না যেন। রাত্রে আবার সাপকে লতা বলতে হয়। এই জানিস দাদুটা মরে ভূত হয়েছে মাইরি। আর হবে না কেন? ত্রি-পাদ দোষ পেয়েছে। একে মঙ্গলবার, তায় আমাবস্যে, তার ওপর মরবার সময় হেগে মরেছে দাদুটা।—শালা ইনফরমার, স্পাই! পা-চাটা দালাল!—বাব্বা! কি ভীতু মানুষ! এমন মানুষ আমি বাপের জন্মে দেখিনি।—ওটা কি? কি গো?

—আমার হার্ট!—এমা! কি বিশ্রী! আমার গা ন্যাকার ন্যাকার করছে! বমি হবে।

হড়হড়ে একটা বমির বেগ রেণুপদর নাইকুণ্ডল থেকে শিষ হয়ে কণ্ঠ অবধি ঠেলে

উঠল, টকটক ভাব, কুৎসিত অম্বুলে-গন্ধ। রেণুপদ কোন রকমে গলা চিপল। চিপে দম বন্ধ করে বমির উদ্গারটুকু বন্ধ করতে চাইল। বমিরা বুঝি ঘাম হয়ে গেল। রগে-কপালে বুকে-পিঠে বিজবিজে ঘাম, সরু একটা ঘামের রেখা নাইকুণ্ডল বেয়ে নিচের দিকে নামছে, সুড় সুড় করছে তলপেট। রেণুপদর পেটের পটি চুলকোচ্ছে, হাতটা তুলতে গেল রেণুপদ, হাত ভারি কাঠের মত, অসাড় অবশ, হাত নাড়তে পারছে না রেণুপদ।

দ-এর মত বসা, রেণুপদর মাথা গাড়ির গতিতে টিলটিল করে নড়ছে, একটা অস্পষ্ট কম্পনের মত অনুভব করছে রেণুপদ, সে কম্পনটা যেন রক্তবহা নাড়িগুলো থেকে আসছে, চোখ নড়ছে। সাদা জমিতে কালো দুটো মণি, ঠিক ঠাওর পাচ্ছে না,—একবার আলো জ্বলল, আবার নিভল, তীব্র একটা দমকা বাতাসের হল্কা এসে লাগল গালে। রেণুপদর মুখ একটু একটু করে ফাঁক হচ্ছিল, ঠোঁটের কোণে দাঁত দেখা যাচ্ছে, দাঁতের গোড়ায় ভিজে রস নেই, জিব শুকনো, গলায় একটা শুপুরি আটকে আছে। রেণুপদ বোবার মত মুখ ঘোরাল। গাড়িটা গচ্ছায় পড়ে কাৎ হল, আবার উঠে চলকে চলতে শুরু করেছে, হর্ন বাজল, লুকানো কোন কোটর থেকে বিজলী হর্নের বিচিত্র শব্দটা বড় বেশি তীব্র বড় চিকন বোধ হল। চিকন সে তীব্র শব্দটা ছুরির ফলার মত রেণুপদর মনটাকে ফালা ফালা করে ফেলছে।

রেণুপদর মনে হল সে আঁ-আঁ করছে। কিন্তু ডাকটা যেন গলা অবধি পৌঁছল না, কণ্ঠনালির কাছ থেকে গোঁৎ খেয়ে নিচের দিকে নেমে গেল, তার পরই কোলাহল করে হৃৎপিণ্ডে চাপ দিচ্ছে, চাপ দিচ্ছে। আরও জোরে, আরও জোরে। আর একটু!—আর একটু! তা পরই বোধহয় বের হয়ে আসবে হৃৎপিণ্ডটা। থলথলে গলগলে, সেই নোঙরা, ভীতু ভীতু, অদ্ভুত কিম্ভুতকিমাকার হৃৎপিণ্ডটা।

রেণুপদ বোবা চোখ তুলল। মিনু অনেক কাছে, একেবারে কোলের কাছে। মিনুর মুখটা যেন আয়না। সে আয়নায় রেণুপদ নিজের মুখ দেখতে পাচ্ছিল। মিনুর হাসি-হাসি, হাত-তালি-দেওয়া মুখের আয়নাটা জ্বলছে, আর সে আয়নায় নিজের চিকমিকে ছায়া দেখছিল রেণুপদ। অন্ধকারে ভিজে কালো নোঙরা বেড়ালছানার মত মুখ। কি কুৎসিত! কি বিশ্রী!—কি জঘন্য! কি ইতর দেখতে ছায়াটা।

নিজেকে যত দেখছিল, তত যেন ক্লিষ্ট, ক্লীব মনে হচ্ছিল নিজেকে।—না। না।—না! মিনু না! রেণুপদ হাতের থাবা দিয়ে মিনুর চোখদুটো ঢেকে দিল, মুখ আড়াল করল, না! মিনু না!—এই ভয়টাই আমার জীবন, এই ভয়টাই আমার অস্তিত্ব। এ ভয়কে তোমার ভয় দেখানো ঠিক নয়, তাহলে আমি মরে যাব।

মিনু মুখ সরিয়ে দাদুর দিকে অবাক চোখ তুলে তাকাল। তারপর দুষ্টুমির হাসিতে খিল খিল করে হাসতে হাসতে সুরেলা গলায় বলে উঠল,—এ মা! দাদু কেমন ভীতু! দাদু কেমন ভীতু!

হাতের থাবাটা মুঠো হয়ে যাচ্ছিল। রেণুপদ স্বপ্নের ঘোরে কথা কয়ে উঠল, না আমি ভীতু নই! রেণুপদর গলার স্বর হিংস্র, আঙুলের নখ হিংস্র, থাবার জোর হিংস্র, রেণুপদ মিনুর মুখের হাসি, গলার স্বর হিংস্র হাতে মুছে দিতে চাইছিল।

মিনুর হাসি গোঙানি হয়ে যাচ্ছে, গলাটা বোধহয় একটু লম্বা বোধ হচ্ছে, রেণুপদ যেন অস্পষ্ট শুনছিল, কেউ কোথাও তাকে আর্ত ভীত একটা স্বরে ডাকছে,—দা-দু!—দা-দু-উ-উ-উ-!

শিরায় রক্ত চলকে উঠল, আচমকা সামান্য শ্লথ হয়ে এল রেণুপদর মুঠি। আর একটু,

আর সামান্যতম একটু সময়, নিশ্বাসের বুদ্বুদ ফেটে চৌচির হয়ে যাবে, খাবিখাওয়া ঠোঁটের ফাঁকে কপ্ কপ্ শব্দ হবে একবার দুবার, তারপর সব শেষ। সব শেষ। ভয়ের আয়নাটা টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়বে, নিজেকে দেখতে পাবে না রেণুপদ। রেণুপদ আর ভয় পাবে না।

জ্বরের ঘোরে ভুল বকার মত ভুল বকল রেণুপদ।—এই নাও সুরো, তোমার মেয়ে নাও। ধরো! ধরো!

'ধরো', বলতে বলতে মিনুকে ধরে কোলের ওপর তুলে নিল রেণুপদ, মিনুর মুখ ফাঁক, হাঁ করে নিশ্বাস টানছে মিনু, চোখ কপালে, ঘামে ভেজা শরীর তখনও একটু একটু কাঁপছে। রেণুপদ মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ল, আয়নায় মুখের ছায়া। ঐ তো, এমুখে ভয় নেই।—হাওয়া! আর একটু হাওয়া!—বাতাস চাই, বাতাস!—রেণুপদ ভাবল। বুকের ওপর মিনুকে জড়িয়ে নিয়ে, কান্না কান্না গলায় বলল রেণুপদ,—তোর লেগেছে মানি! তোর লেগেছে! একটা হা-হা দীর্ঘশ্বাসের মত রেণুপদর সে কান্নাটা হাওয়ার ঝাপ্‌টায় ভেসে গেল। তারপর হিংস্র গলায় দাঁতে দাঁত দিয়ে বলে উঠল রেণুপদ,—ড্রাইভারজী! আউর জোর! আউড় থোড়া।—হাওয়া চাহিয়ে! হাওয়া!

আধুনিক সাহিত্য

উত্তর-ইউলিসিস্ যুগে ইংরেজী সাহিত্যে রচনাশৈলী নিয়ে বৈপ্লবিক নিরীক্ষামূলক উপন্যাসের ধারা শেষ হয়ে গিয়েছে বলে মনে করা গিয়েছিল। তিরিশের পর যাঁরা প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন, যেমন গ্রেহাম্ গ্রীন্, ঈভ্‌লীন ওঅ, আইভি কম্‌প্‌টন বার্নেট্ প্রমুখ ঔপন্যাসিক, তাঁরা সকলেই আধুনিক (অর্থাৎ জয়েস্ অবধি) ও সাবেকী কায়দা মিশিয়ে লিখেছেন : উপন্যাসের আঙ্গিক নিয়ে একেবারে নতুন কিছু করা বোধহয় আর যায় না, এটা প্রায় স্বতঃসিদ্ধ সত্য।

কিন্তু, একেবারে নতুন না হোক্, একেবারেই নতুন যে কিছু করা যায় না, একথা মনে করারও কোনো কারণ নেই। আধুনিক ও প্রাচীন, দুই ভঙ্গীর বিভিন্ন মাত্রায় মিশ্রণের মধ্যে দিয়েই উত্তরতিরিশের উপন্যাসে নতুন পদ্ধতি তৈরি হচ্ছে। যাঁদের একটু আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, সেই লেখকদের মধ্যেই এই লক্ষণ দেখা যায়। গ্রেহাম্ গ্রীন্ তো এর এক বিশিষ্ট উদাহরণ, হেন্‌রী গ্রীন্ আর একজন, পরবর্তীকালের লরেন্স্ ডারেল্ নিশ্চয়ই উল্লেখযোগ্য—নামের তালিকা আর বাড়ানো নিষ্প্রয়োজন। এই ষাটের দশকেও এই বৈশিষ্ট্য সমানে চলছে।

যদিও তিনি উদীয়মানা লেখিকা, পূর্ণ প্রতিষ্ঠাপ্রাপ্তা নন, সমকালীন ঔপন্যাসিকদের মধ্যে অ্যান্ কুইনের লেখায় এই বিশেষত্ব খুবই প্রতীয়মান। 'প্যাসেজেস' তাঁর তৃতীয় উপন্যাস, এবং তাঁর প্রথম উপন্যাস লিখেই তিনি দুটি ফেলোশিপ্ পেয়েছিলেন। বর্তমান বইটিতে তাঁর লেখার ভঙ্গী বয়ঃপ্রাপ্তি ও সাবলীলতা দুই-ই অর্জন করেছে।

"প্যাসেজেস্" আঙ্গিক ও বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে একটি জটিল উপন্যাস। দুটি চরিত্র—এক ত্রিশোত্তীর্ণা মহিলা ও তার প্রেমিক, এক ইহুদী; এদের কোনো নাম দেওয়া নেই। অন্য চরিত্ররা অবান্তর—নেই বললেই চলে। স্থানও নাম-না-করা—রাজনীতি ও বিপ্লব-অধুষিত কোনো অঞ্চল (কিন্তু রাজনীতির সঙ্গে গল্পের কোনো সম্পর্ক নেই), সম্ভবত ভূমধ্যসাগরীয়, গ্রীস বা ইটালীর কাছাকাছি কোনো অনগ্রসর জায়গা হওয়া খুবই সম্ভব, কিন্তু আবার ল্যাটিন্ অ্যামেরিকা বললেও আপত্তি করবার কিছু বিশেষ থাকে না। কোনো এক বছরে জুন থেকে নভেম্বর মাসের মধ্যে নায়ক ও নায়িকা তিনটি শহরের মধ্যে দিয়ে যাত্রা করছে, প্রত্যেকটিতে কিছুদিন করে দিন কাটিয়ে; অবশেষে তারা আর এক শহরের দিকে যাত্রা করবে। এর মধ্যে তাদের ক্রিয়াকলাপ হচ্ছে বিভিন্ন লোকের সাহচর্যে আসা, প্রেম করা (নিতান্ত জৈবিক)—পরস্পরের সঙ্গে আবার অন্যদের সঙ্গেও বটে, বিভিন্ন পার্টিতে বা শুধুমাত্র পথেই যাওয়া-আসা করা, মহিলাটির হারানো ভাইয়ের খোঁজ করা, ও পুরুষটির কিছু কিছু রহস্যজনক নোট করা। এর মধ্যে প্লট নেই, "গল্প" নেই; বস্তুত কোনো কিছুই ঘটছে না বা তারা কোনো কিছুই করছে না, যাতে পরিস্থিতির কোনো পরিবর্তন হয়। আসলে, এগুলি নয়, মানসিক ক্রিয়াকলাপই কাহিনীর মালমশলা। ঘটনা হিসেবে আমরা যা প্রকৃতপক্ষে পাই, তা হচ্ছে চরিত্র দুটির চিন্তা, স্মৃতি, কল্পনা, স্বপ্ন, ও ফ্যান্‌টাসি। এসবের মধ্যে বিষয়বস্তু বলে যা ফুটে ওঠে তা নায়কের নিজেকে নিয়ে নানাভাবে ঘুরিয়ে-

ফিরিয়ে আত্ম-অন্বেষণ ও নায়িকার ভাইকে খোঁজার অবসেশন এবং নিজের কল্পনার জগৎকে রূপায়িত করার অসার্থক প্রয়াস। অতএব উপন্যাসটির সামগ্রিক বিষয়বস্তু হচ্ছে অন্বেষণ—চরিত্র দুটির (এবং আমাদের) সমকালীন বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে তা মোটের ওপর দাঁড়াচ্ছে শূন্যতার অনুসন্ধান : এই অনুসন্ধান তাদের গড়িয়ে অন্তহীন ভ্রমণের দিকে নিয়ে যাচ্ছে।

যে ভাবে কাহিনীর সারাংশ দেওয়া হল, অত সহজে কিন্তু গল্পটিকে পরিবেশন করা হয়নি। একশো বারো পাতার উপন্যাসটি চার ভাগে ভাগ করা : প্রথম ও তৃতীয় ভাগ নায়িকার জবানবন্দীতে লেখা, দ্বিতীয় ও চতুর্থ নায়কের—এই ভাগগুলি পরস্পরকে কাউন্টারপয়েন্ট করছে, যার দরুন গল্পটির দ্বৈত আকর্ষণও পরিষ্কারভাবে ফুটে উঠেছে। বড় কথা হচ্ছে এই যে বিভিন্ন ভাগগুলির পারম্পর্য ও কাহিনীর অংশগুলির পারম্পর্য এক নয়। দ্বিতীয় ভাগের বিষয়বস্তু প্রথম ভাগের বিষয়বস্তুকে সময়ের দিক দিয়ে অনুসরণ করছে না, অন্য ভাগদুটির বেলায়ও তাই। যেমন, উপন্যাসটি আরম্ভ হচ্ছে প্রথম শহরে—অল্প কিছু সময়ের পরে নায়ক-নায়িকা ট্রেনে করে দ্বিতীয় শহরে গিয়ে দিন কাটাচ্ছে। দ্বিতীয় ভাগটি আরম্ভ হচ্ছে প্রথম শহরে উপন্যাসটি আরম্ভ হওয়ার আগের দিনগুলির অভিজ্ঞতা দিয়ে (কিন্তু এর মধ্যে কোনো চেষ্টাকৃত ফ্ল্যাশ্‌ব্যাক নেই); অর্থাৎ গল্প আরম্ভ হচ্ছে দ্বিতীয় ভাগ থেকে আর কাহিনী প্রথম ভাগ থেকে। বস্তুত, কাহিনীটির গতি কর্কটপ্রকৃতি, সোজাসুজি নয়, যার দরুন বিভিন্ন ভাগগুলি পাশাপাশি মিলিয়ে পড়লেই তবে গল্পটি বোঝা যায়। যেমন, এক নজরে দেখলে মনে হয় চরিত্র দুটি একই শহরে বরাবর আছে। চতুর্থ ভাগে নায়কের লেখাতে এক জায়গায় পাওয়া যাচ্ছে, "Two weeks in the city and we seem to be neither going forward nor back." কোন্ শহর? পাতা উলটে উলটে বোঝা যায় এটি সেপ্টেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহের পরে লেখা। দ্বিতীয় ভাগে আমরা পাচ্ছি যে অগাস্টের মাঝামাঝি থেকে শেষ অবধি তারা দ্বিতীয় শহরে কাটাচ্ছে। ছোট্ট, চোখে না পড়ার মত ঘোষণাটি (অন্য কোনো ইঙ্গিত নেই) থেকে জানা গেল তারা এখন তৃতীয় শহরে আছে। আবার, চতুর্থ ভাগে নায়কের একটি পক্ষাঘাতগ্রস্ত মেয়েকে ধর্ষণ করার যে স্বপ্ন আছে, তার উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে তিরিশ পৃষ্ঠা আগে তৃতীয় ভাগে নায়িকার জবানবন্দীতে, যা থেকে বোঝা যায় এই ভাগের ঘটনাবলীও তৃতীয় শহরে ঘটছে: এই থেকে আবার জানা গেল যে নতুন যাত্রার প্রস্তুতিতে তৃতীয় ভাগের সমাপ্তি চতুর্থ ভাগের ও উপন্যাসের অনুরূপ সমাপ্তিরই ঘোষণা। এইভাবে কাহিনী ও সময়ের বিন্যাস উপন্যাসে নতুন নয়, কন্‌রাড্ থেকে আরম্ভ করে অনেক লেখকই এই ভঙ্গীতে লিখেছেন, কিন্তু চরিত্রদের একই বৃত্তে চলাফেরা করার ইলিউশন্ রেখে সূক্ষ্মভাবে কাহিনীকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কায়দা কিছুটা অভিনব, এবং নিশ্চয়ই খুবই চতুর।

এই সমস্ত ঘটনাই উপস্থাপিত করা হয়েছে মনোজগতের টুকরো-টুকরো ঢেউয়ের মাধ্যমে। চলতি অস্বচ্ছ ধারণা অনুযায়ী 'প্যাসেজেস্'-কে চেতনাপ্রবাহ উপন্যাস বলা যেতে পারতো। অসম্পূর্ণ বাক্যসমষ্টি, অন্তর্জগতের আলোড়ন, ভাবে পারম্পর্যের অভাব, তার সঙ্গে আগে যা দেখিয়েছি, সবই ওই জাতীয় উপন্যাসের লক্ষণ। কিন্তু তা সত্ত্বেও উপন্যাসটি চেতনাপ্রবাহ ভঙ্গীতে লেখা নয়, এর কথন-ভঙ্গী সাবেকী পদ্ধতির কিছু পরিবর্তিত সংস্করণ। দুটি পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। নায়িকার জবানবন্দী দুটির ভিত্তি আত্ম-জীবনীর কায়দায় লেখা গল্পের ভঙ্গী। বর্তমান কয়েকটি মুহূর্ত থেকে সে অতীতের

অভিজ্ঞতাকে পর্যবেক্ষণ করে চলেছে। এখানে স্মৃতিই বড় কথা—স্ট্রীম্‌ অফ্‌ কন্‌শাস্‌নেস্‌ ভঙ্গীর সঙ্গে যাতে ক্রমান্বয়ে ধাবমান বর্তমান মুহূর্তের মানসিক ধারাকে প্রকাশ করা হয়, এখানে তফাত। কিন্তু, যে অভিজ্ঞতাগুলিকে সে পর্যবেক্ষণ করছে, সেগুলি তার বর্তমান খাপছাড়া মানসিকতাতে পরিব্যাপ্ত, যে জন্যে তার কাহিনীটি মনস্তাত্ত্বিক রূপ নিয়েছে। নায়ক-লিখিত ভাগগুলি তার এক বিশেষ ধরনের ডায়েরি থেকে খুশীমত উদ্ধৃত করা। এই ডায়েরিতে দিনের খুঁটিনাটি লিপিবদ্ধ করা নেই, এখানে ডায়েরি-লেখক তাঁর মনের বিভিন্ন পর্যায়কে নিরীক্ষণ করে টুকরো টুকরো প্রতিচ্ছবি তুলে ধরছেন—স্বপ্ন, সচেতন চিন্তা ও কল্পনার রূপে। ডায়েরির প্রতিটি লেখার পাশে পাশে বিভিন্ন ফ্যান্‌টাসির টীকা করা আছে, যাতে ওই সময়ে নায়কের মনের বিভিন্ন স্তরের কার্যকলাপ একই সঙ্গে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। দুজনকে দুটি বিভিন্ন কাহিনী-কথন-পদ্ধতি দেওয়ার যুক্তিসঙ্গত তাৎপর্য রয়েছে : নায়িকা স্মৃতির মধ্যে বাঁচতে চাইছে, কারণ বর্তমান থেকে সে কিছু পাচ্ছে না, তাই তার অতীত-চারণ; নায়ক নিজের চিন্তা-ভাবনা নিয়ে একলা থেকে বাঁচবার অর্থ পাবার চেষ্টা করছে, তাই সে ডায়েরি লিখছে।

দুটি পদ্ধতির মধ্যেই একটা সাধারণ বিশেষত্ব আছে: কথনের 'পুরুষ'-পরিবর্তন। উভয়েরই কথনের ভিত্তি 'আমি', কিন্তু তা থেকে প্রথম পুরুষে চলে যাচ্ছে। এ ধরনের পরিবর্তন চেতনা-প্রবাহের লেখাতে প্রচুর পাওয়া যায়, কিন্তু আত্মজীবনীমূলক বা ডায়েরি-লেখাতে অপ্রত্যাশিত। যথা, নায়িকা এক জায়গায় লিখছে, "*I* remained in an upright position, and saw *her* body (নিজের দেহ) unfold from the dress." নায়ক নিজেদের সম্পর্কে হঠাৎ লিখছে, "*They* couldn't bear it a moment longer. *They* knew *they* were being followed." প'ড়লে মনে হয় যে তৃতীয় কোনো ব্যক্তি সহসা মাঝে এসে এদের দেখছে, অথবা এরা দুজনে তৃতীয় কোনো ব্যক্তিকে (বা ব্যক্তিদের) দেখে তার কার্যকলাপ লিপিবদ্ধ করছে—যে দুটি সম্ভাবনাই অবান্তর। আসলে এই কায়দায় লেখার কারণ তাদের মানসিক জটিলতা। উভয় চরিত্রই schizophrenic, দ্বিধাবিভক্ত ব্যক্তিত্ব থেকে ভুগছে (এই ব্যাধিরই প্রকাশ পাওয়া যায় তাদের উদ্ভট্‌ ফ্যান্টাসিতে), যার জন্যে প্রত্যেকেই ক্ষণে ক্ষণে নিজের এই অংশকে দূরে প্রক্ষেপ করে তাকে দেখছে যেন; কিন্তু আবার এই কায়দায় পাঠককে বিমুক্ত, বাস্তবদৃষ্টিতে তাদের দেখতেও সাহায্য করছে।

উপন্যাসটির অন্যতম লক্ষণীয় বিশেষত্ব তার প্যারাগ্রাফ্‌-বিন্যাস। এগুলির স্পেসিং কবিতার সাজানো স্তবকের মত। উপন্যাসটির কাব্যগুণ আরো পাওয়া যায় তার ভাষাতে—কাটা-কাটা, কিন্তু উজ্জ্বল, একমুখী, কল্পনাঘন।

বইটির রচনাশৈলীকে কখনো কখনো একটু অধিক মাত্রায় কৃত্রিম বলে মনে হয়। মাঝে মাঝে মনে হয় এতটা কারিকুরি প্রয়োজন ছিল না—যেন লেখিকার প্রয়োজনেই, লেখার প্রয়োজনে ততটা নয়, এগুলি করা হচ্ছে। সবচাইতে আকর্ষণীয় বইটির নামকরণ। 'প্যাসেজেস্‌', বিভিন্ন অর্থে প্রযোজ্য: নায়ক ও নায়িকার ভ্রমণ; তাদের যাত্রাপথ; আরো গভীর অর্থে, তাদের জীবনের মধ্যে দিয়ে যাত্রা; গতিশীলতা; সংঘাত—মনের সঙ্গে মনের, মনের সঙ্গে বাস্তবের, নিজের সঙ্গে নিজের; বাক্যসমষ্টি বা অনুচ্ছেদ।

অমিতাভ সিংহ

Passages. *By* Ann Quinn. Calder & Boyars. London. 25*s*.

স মা লো চ না

Portnoy's Complaint. *By* Philip Roth. Jonathan Cape. London. 30*s.*

বিচ্ছিন্নতাবোধ আধুনিক মানসতার একটি বিশেষ চরিত্রলক্ষণ। আমেরিকাবাসী ইহুদী লেখক ও বুদ্ধিজীবীর বিচ্ছিন্নতাবোধ কিন্তু দ্বিস্তরবিশিষ্ট—প্রথম, আধুনিক মানুষ হিসেবে তাঁর বিচ্ছিন্নতা, দ্বিতীয়ত, তাঁর ধর্মভিত্তিক বিচ্ছিন্নতা। কোনো কোনো সমাজ-তাত্ত্বিক মনে করেন যে, আমেরিকান ইহুদীরা পড়াশুনো নিয়ে যে এতো ব্যাপৃত থাকেন বা নিজের নিজের ব্যবসায় তাঁরা যে এতো পারঙ্গম তার অন্যতম কারণ হলো যে তাঁরা সূক্ষ্মভাবে অনেক সামাজিক সুযোগসুবিধে থেকে বঞ্চিত—অর্থাৎ, তাঁদের আর্থিক ও পারমার্থিক প্রগতি পরোক্ষভাবে সামাজিক অস্বাচ্ছন্দ্যের বাধ্যতামূলক ফলশ্রুতি। অধিকাংশ ধনী নিগ্রোও যে সবচেয়ে দামী গাড়িটি চ'ড়ে লোকসমক্ষে ঘুরে বেড়ান, এই প্রদর্শনী-বৃত্তির কারণও বহুলাংশে একই সমাজব্যবস্থার মধ্যে নিহিত।

ফিলিপ রথের আলোচ্য *Portnoy's Complaint* বইটির নায়ক স্পষ্টভাবে কাতরোক্তি করেন: Doctor Spielvogel, this is my life, my only life, and I am living it in the middle of a Jewish joke! I am the son in the Jewish joke—*only it ain't no joke!* Please, who crippled us like this? Who made us so morbid and hysterical and weak? এই আবেদন ও অভিযোগ যে বহুলাংশেই আন্তরিক সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই, কিন্তু গ্রন্থটির মূল তাৎপর্য যে কোথায় তা কখনোই স্পষ্ট বোঝা যায় না। থীম হিসেবে ইহুদী মনোবিকলনের প্রতিবেদন একটি উল্লেখযোগ্য বিষয়, কিন্তু আমাদের সর্বতোভাবে যা মনে থাকে তা হলো জনৈক ইহুদী যুবকের যৌন-জীবনের ইতিহাস। রথ অবশ্য বইটিকে সাজিয়েছেন খুব চতুরভাবে—পুরো ঘটনাংশই একজন ডাক্তারের কাছে তাঁর কোনো রোগীর স্বীকারোক্তি, সুতরাং যৌনপ্রসঙ্গ মাত্রই সাতখুন মাপ। আমি বলতে চাইছি যে বইটির থীম ও কাঠামোর প্রকৃতি এবং যেভাবে সম্পূর্ণ বিষয়টি লেখা হয়েছে তার মধ্যে একটা গুণগত পার্থক্য ঘটে গেছে—বর্ণিত অভিজ্ঞতা এতোই স্বয়ংসম্পূর্ণ যে শেষ পর্যন্ত বর্ণনাই একটি স্বতন্ত্র মানসতার সমানুপাতিক হয়ে উঠেছে। *Portnoy's Complaint*-এর প্রধান দুর্বলতা ও আকর্ষণ কিন্তু এখানেই।

একজন লাজুক, বুদ্ধিমান, কামপীড়িত কিশোর আস্তে আস্তে কিভাবে যুবক হয়ে উঠলো—বইটির মূল ঘটনা হ'লো এই। প্রথমাংশে লেখক দেখাতে চেয়েছেন যে সর্বশক্তিমতী ইহুদী জননীই ইহুদী মনোবিকলনের প্রধান আভ্যন্তরীণ কারণ—এবং এ-বিষয়ে তিনি অত্যন্ত নিরাসক্তভাবে একটির পর একটি অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছেন। (রথের অন্যান্য উপন্যাসেও নায়কের বাবা-মার ভূমিকা উল্লেখযোগ্য—যেমন *Letting Go* বইটিতে, তবে আগের এই উপন্যাসে পুরো লেখনভঙ্গিই তুলনামূলকভাবে এতো বেশি মার্জিত যে বইটির স্বাদ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।) লেখকের বক্তব্য হ'লো যে, অস্বস্তিকর সামাজিক ও পারিবারিক পরিবেশ থেকে নিজেকে বাঁচাতে গিয়েই তাঁর নায়ক প্রথমাবধি এতো শিশ্নপরায়ণ। বইটির

কোনো কোনো ঘটনা খুবই ন্যক্কারজনক, কিন্তু সব মিলিয়ে একটা চাপা কৌতুকবোধ সর্বত্র বিচ্ছুরিত হয়েছে। কোনো কোনো অশ্লীল দৃশ্য বিশুদ্ধ তামাসার জোরে উৎরে গেছে মনে হয়—প্রিয়বান্ধবী "মাংকি"-র সঙ্গে পোর্টনয়ের যৌনবিহারও একাধারে অশ্লীল এবং হাস্যোদ্দীপক। এমনকি, ওরা দুজনে যখন একজন লাতিন আমেরিকান বারবনিতার সঙ্গে উদ্ভটভাবে কামচর্চায় রত, তখনো পাঠকের পক্ষে সর্বদা হাস্যরোধ করা সম্ভব নয়। কিংবা, বইটির একেবারে শেষের দিকে "ভাসারের" জনৈকা বিদুষী মেয়ের সঙ্গে পোর্টনয়ের যৌন-সম্পর্কও খুবই কৌতুকোজ্জ্বল: পোর্টনয়ের কোনো বিশেষ ধরনের কামসম্ভোগ-বাসনাকে মেয়েটি দীর্ঘকাল ধ'রে বাধা দিয়ে এসেছিলো, কিন্তু মোৎসার্ট শোনার পর সে হঠাৎ রতি-রঙ্গিণী হ'য়ে উঠলো—"that lovely willing girl! convinced by Mozart to go down on Alex!"

ইহুদীমাত্রই ভবঘুরে। পোর্টনয়ও তাই। এবং শেষাবধি তাকে ইস্রাইলে যেতে হলো। একদা-ফিলাডেলফিয়া-বাসিনী, রুক্ষস্বভাব, ইহুদী তরুণী নাওমিকে জোর ক'রে ভোগ ক'রতে গিয়ে রমণীবল্লভ পোর্টনয় হঠাৎ হীনবীর্য হয়ে পড়লো। এই নাওমি চলনে বলনে চেহারায় আবার অনেকটা পোর্টনয়ের মায়ের মতো। বলাবাহুল্য, পিতৃভূমি ইস্রাইলে ইহুদী যুবকের এই শারীরিক মৃত্যু একটি বিশুদ্ধ প্রতীকী ঘটনা।

বিচ্ছিন্নতা, অসামাজিকতা, এবং "absurdity", সাম্প্রতিক জীবনের এই তিনটি সূত্র যে কতো পরস্পরসংলগ্ন, *Portnoy's Complaint* প'ড়ে সে-বিষয়ে আমাদের ধারণা স্পষ্ট হয়। আরো স্পষ্টতরভাবে যা মনে থাকে, তা হলো লেখকের নিঃসংকোচ প্রদর্শনীবৃত্তি।

প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত

বাঙ্গালীর রাষ্ট্রচিন্তা—সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়। সুবর্ণরেখা। আঠারো টাকা।

বাঙ্গালী যে আত্মবিস্মৃত জাতি রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে তার সবথেকে স্পষ্ট পরিচয় মেলে। আধুনিক ভারতীয় সামাজিক এবং রাজনৈতিক চিন্তাধারার ইতিহাসকার লিখেছেন যে ১৮১৮ সালে পশ্চিমে মারাঠাদের সৌভাগ্যসূর্য অস্তমিত হোল এবং পূর্বে কলিকাতায় নবজাগরণের ঊষার আলোক দেখা দিল। লেখক তৃতীয় পাণিপথ সমরে বৃটিশের নিকট মারাঠাদের পরাজয় এবং কলিকাতায় হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠার কথাপ্রসঙ্গেই উক্ত মন্তব্য করেছিলেন। ভারতবর্ষে প্রথম ইংরেজী কলেজে শিক্ষালাভের সুযোগ পেয়ে কিছুসংখ্যক বাঙ্গালী সরকারী চাকুরী লাভ করায় উচ্চমধ্যবিত্ত বাঙ্গালীর মনে নিজেদের প্রগতি এবং অন্যান্যদের পশ্চাৎপদ অবস্থা সম্পর্কে সন্দেহ করবার অবকাশ রইলো না। যতদিন পর্যন্ত পূর্ণ স্বাধীনতার কথা আমরা ভুলে থাকতে পেরেছিলাম ততদিন সরকারী চাকুরীতে স্থান পাওয়া যদি জীবনের উন্নতির চরম সোপান বলে মনে হয়ে থাকে তাতে অবশ্য বিস্মিত হবার-মত কিছু ছিল না। কিন্তু ইতিহাসের গতি বিচিত্র। ভারতের অন্যান্য স্থানে ইংরেজী শিক্ষার প্রচলনের ফলে এবং হিন্দু ভিন্ন অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদেরও ইংরেজী শিক্ষা গ্রহণের ফলে অনতিবিলম্বেই সরকারী চাকুরীর ক্ষেত্রে তীব্র প্রতিযোগিতা দেখা দিল। এই প্রতি-

যোগিতায় সাফল্যলাভের জন্য কেবল বুদ্ধি এবং কেতাবী চিন্তাই যথেষ্ট ছিল না। এই প্রতিযোগিতায় সাফল্যলাভের জন্য সর্বাপেক্ষা বেশি প্রয়োজন ছিল রাজনৈতিক চেতনার। বাঙ্গালীর যদি কোন রাষ্ট্রচেতনা থেকেও থাকে তবে তা স্পষ্টতই সময়ের প্রয়োজনের তুলনায় নিতান্তই অপ্রতুল ছিল—যার ফলে প্রথম ধাক্কাতেই বাঙ্গালী তার ভৌগোলিক অখণ্ডতা হারালো। বাংলা বিভাগ অবশ্য ১৯১১ সালে রদ হোল; কিন্তু বাঙ্গালী তার ভৌগোলিক অখণ্ডতা ফিরে পেলো না। কোন জাতির খণ্ডাবস্থা সেই জাতির উন্নতির পরিচায়ক নয়; তাই পৃথিবীর সর্বত্রই দ্বিখণ্ডিত জাতিরা বিশেষ অসুখী। বাঙ্গালীও আজ খণ্ডিত এবং বিচ্ছিন্ন—অর্থাৎ পরাজিত।

বাঙ্গালীর বর্তমান দুর্গতি এবং ক্রমবর্ধমান পশ্চাৎপদ অবস্থার কারণ রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে বাঙ্গালীর পরাজয়। নিঃসন্দেহে অধিকাংশ বাঙ্গালীই মনে করেন যে বাঙ্গালীই ভারতীয় রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তাধারার অগ্রদূত। কয়েকজন অবাঙ্গালী মনীষীর স্তোকবাক্য, 'What Bengal thinks today, the rest of India thinks tomorrow'—বাঙ্গালীকে এই আত্মপ্রবঞ্চনায় সাহায্য করেছে। বস্তুত বাঙ্গালী অন্যান্য ভারতীয়দের তুলনায় আগে পাশ্চাত্য চিন্তাধারার সংস্পর্শে আসলেও জাতিগতভাবে তার থেকে বিশেষ লাভবান হয়নি। যার ফলে দেশ হিসাবে ভারত স্বাধীন হলেও জাতি হিসাবে বাঙ্গালী দ্বিখণ্ডিত, অবমানিত এবং অবহেলিত হয়ে রইলো। বাঙ্গালীর জাতি হিসাবে পতনের পরিচয় উভয় বাংলাতে সমভাবে বিদ্যমান। ভারতে বাঙ্গালীরা সংখ্যায় নগণ্য—পঞ্চাশ কোটীর মধ্যে পাঁচ কোটীও নয়। ভারতীয় গণতন্ত্রে সংখ্যার প্রাধান্য। প্রতি পদক্ষেপে বাঙ্গালী আজ লাঞ্ছিত।

যদি সংখ্যাল্পতা ভারতে বাঙ্গালীদের পশ্চাৎপদতার একটি কারণ হয়ে থাকে, তবে পাকিস্তানের বাঙ্গালীদের ক্ষেত্রে সে কারণ অনুপস্থিত। পাকিস্তানে বাঙ্গালীরাই একক সংখ্যাগরিষ্ঠতার অধিকারী। কিন্তু তা সত্ত্বেও পাকিস্তানে বাঙ্গালীদের দুরবস্থা একই প্রকার—ক্ষেত্রবিশেষে হয়তো কিছু বেশিই বটে। এইখানেই বাঙ্গালীদের ঐতিহাসিক পরাজয়ের পরিচয়। একথা সত্য যে পাকিস্তানে ভারতের ন্যায় গণতন্ত্রের প্রচলন নেই। কিন্তু গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা এবং প্রচলনও তো জাতিরই কর্তব্য। যেখানে গণতন্ত্রের অনুপস্থিতি বাঙ্গালী স্বার্থের বিপক্ষে যায় সেখানে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় ব্যর্থতা, বাঙ্গালীর জাতীয় ব্যর্থতারই পরিচায়ক। বাঙ্গালী হিন্দু হয়েও যে দুরবস্থায় রয়েছে, মুসলমান হয়েও সেই একই দুরবস্থায় রয়েছে। এই অবমাননাকর চরম রূপ দুই বাংলার মধ্যে সাংস্কৃতিক সম্পর্কের তৃতীয় শক্তি কর্তৃক বিচ্ছেদ।

রাজনীতির আসল বক্তব্য রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অধিকারে। দুঃখের সঙ্গে একথা বলতে হয় যে বাঙ্গালীর রাষ্ট্রচিন্তায় এই আসল বক্তব্যটিই অনুপস্থিত। তার কারণ রামমোহন রায় থেকে আরম্ভ করে আজ পর্যন্ত যতজন বাঙ্গালী লেখক এ বিষয়ে লিখেছেন তাঁরা কেউই বাঙ্গালীরা কোন রাষ্ট্রের কর্ণধার হবে একথা চিন্তাও করেননি। অবশ্য তাঁরা হয়তো স্পষ্টভাবে একথা বলেননি যে বাঙ্গালীরা চিরকাল পরাধীন থাকবে; তবে বাঙ্গালীদের চিরপরাধীন থাকার ভিত্তিতেই তাঁরা তাঁদের বক্তব্য বলেছেন। রামমোহন ভারতে বৃটিশ সরকারের স্থায়িত্ব ধরেই নিয়েছিলেন! এটা যে কেবল একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, বরং রামমোহনের সামগ্রিক চিন্তাধারার একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ তার আর একটি প্রমাণ সর্বভারতীয় ভাষা হিসাবে রামমোহন কর্তৃক হিন্দীর সমর্থন। রামমোহনের সময় বাংলা ভাষা

ও সাহিত্যের অবস্থা নিতান্তই পশ্চাৎপদ ছিল সন্দেহ নেই; কিন্তু হিন্দী ভাষা ও সাহিত্য কি বাংলা থেকে বেশি এগিয়ে ছিল? তখনও বিহার ও উত্তরপ্রদেশের অনেকেই হিন্দী বলতেন না। অথচ তা সত্ত্বেও রামমোহন কোন্ যুক্তিতে হিন্দীর প্রচারের জন্য উৎসাহী ছিলেন? এর কারণ খোঁজা কঠিন নয়। রামমোহনের দৃষ্টিতে ভারতে বৃটিশ প্রভুত্ব সম্পূর্ণ না হলেও মোগল রাজত্ব সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ছিল। মোগল দরবারের ভাষা বাংলা ছিল না। হিন্দুস্তানী (যা রামমোহন চালাবার চেষ্টা করেছিলেন) মোগল দরবারের প্রচলিত ভাষারই অপভ্রংশ। রামমোহন বাঙ্গালীকে রাষ্ট্রের কর্ণধাররূপে কল্পনা করতে পারেননি (বাঙ্গালী-দের তদানীন্তন দুর্দশার কথা স্মরণ রাখলে রামমোহনের এ অক্ষমতাতে বিস্মিত হবার কিছু নেই), কাজেই তিনি বাঙ্গালীদের ভাষাকেও রাষ্ট্রভাষা হিসাবে কল্পনা করতে পারেননি। প্রথম আধুনিক বাঙ্গালীর রাষ্ট্রচিন্তার এইখানেই মৌলিক দুর্বলতা। দুর্ভাগ্যের বিষয় রামমোহনের পরবর্তী কোন বাঙ্গালীই রামমোহনের এই মৌলিক দুর্বলতা কাটিয়ে উঠতে পারেননি। তাঁরা কেবল রামমোহনের বক্তব্যের পুনরুক্তি করেছেন।

বাঙ্গালীদের রাষ্ট্রচিন্তার প্রধান গলদ রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য এবং স্বাধীনতার অর্থ সম্পর্কে সচেতনতার অভাব। একথা অনেকেই মানতে রাজী হবেন না। তাঁরা বলবেন যে রামমোহন রায় ব্যক্তিস্বাধীনতা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা এবং প্রতিনিধিমূলক সরকার ইত্যাদি বিষয়ের গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। কিন্তু সেই আলোচনার মধ্যে সে ধরনের বিশ্বাস ছিল না যে বিশ্বাসের ফলে জাতি স্বাধিকার লাভ করতে পারে। Audacity, audacity and yet more audacity বলেছিলেন ফরাসী বিপ্লবের নায়ক; অর্থাৎ স্বাধিকারপ্রমত্ততা ব্যতিরেকে স্বাতন্ত্র্য অসম্ভব এই কথাই তিনি বলতে চেয়েছিলেন। কিন্তু বাঙ্গালীদের রাষ্ট্রচিন্তাতে এই স্বাধিকারপ্রমত্ততারই একান্ত অভাব। অর্থাৎ কোন শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী চিন্তানায়কই আজ পর্যন্ত বাঙ্গালীদের স্বাধীন অস্তিত্বের চিন্তা করতে পারেননি। যদি সাড়ে পাঁচ কোটী ইংরেজ, আট কোটী জার্মান এবং আরও অল্পসংখ্যক ফরাসীরা স্বতন্ত্র রাষ্ট্র হিসাবে থাকতে পারে, আট কোটী বাঙ্গালী কেন থাকতে পারে না এ প্রশ্নের উত্তর কোন বাঙ্গালী চিন্তানায়ক দেবার চেষ্টা করেননি। অর্থাৎ এ'রা ধরেই নিয়েছেন যে বাঙ্গালীদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকা সম্ভব নয়। হয়তো তাতেও বাঙ্গালী রাষ্ট্রচিন্তকদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করবার বিশেষ কিছু থাকতো না যদি তাঁরা বহুধর্মাবলম্বী এবং বহু-ভাষাভাষী ভারতে বাঙ্গালীদের ভূমিকা কী হবে সে সম্পর্কে সচেতন থাকতেন। ধর্ম এবং ভাষার বিভিন্নতার সমস্যা এইসকল বাঙ্গালী চিন্তানায়কের দৃষ্টি এড়িয়ে গিয়েছিল। এমনকি সামাজিক এবং অর্থনৈতিক অসাম্যের বিষয়টিও তাঁদের আলোচনায় বিশেষ স্থান পায়নি। অর্থাৎ জাতি হিসাবে বাঙ্গালীর যে সমস্যা সে সম্পর্কে কোন চেতনাই বাঙ্গালীর রাষ্ট্র-চিন্তায় ছিল না। এই ভ্রমাত্মক চিন্তাধারার দরুন বাঙ্গালীর সকল রাজনৈতিক আন্দোলন ব্যর্থ হয়ে গেল।

বাংলা ভাষা বিশ্বে তার উপযুক্ত সম্মান পাচ্ছে না কেবল একটিমাত্র কারণে; তা হোল এই যে বাংলাভাষার পিছনে কোন রাষ্ট্রক্ষমতার সমর্থন নেই। এখানেই স্বাধীনতার লক্ষ্য এবং রাষ্ট্রক্ষমতার অধিকারের প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা। স্বাধীনতার অর্থ কি যদি না সেই জাতি তার নিজের ভাষায় সকল সরকারী কাজকর্ম চালাতে পারে? বাংলাভাষার ব্যবহার আজ ক্রমশই সঙ্কুচিত হচ্ছে। বৃটিশ আমলেও যে যে স্থলে বাংলাভাষার ব্যবহার হোত স্বাধীনতার পর আজ আর তা হচ্ছে না (আমি ভারতের কথাই

বলছি); ফলে কেবলমাত্র বাংলা শিখে আগে একজন বাঙ্গালীর পক্ষে যে ব্যাপকতর ক্ষেত্রে কাজ করা সম্ভব ছিল আজ আর তা সম্ভব হচ্ছে না। এক পুরুষ আগেও যত অবাঙ্গালী বাংলা শেখার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করতেন আজ তার শতাংশের এক অংশও সে প্রয়োজন অনুভব করে না। স্বাধীনতার পর ভারতের অন্যান্য ভাষা ও সাহিত্য যে হারে অগ্রগতি লাভ করেছে বাংলাতে স্পষ্টতই তার থেকে অনেক স্বল্পহারে হয়েছে।

বাঙ্গালীর ক্ষেত্রে স্বাধীনতার এই বিরূপ ফলের কারণ বাঙ্গালীর রাষ্ট্রচিন্তার—বাস্তবতাবোধের অভাব। বাঙ্গালীর রাষ্ট্রচিন্তা মুখ্যত সমসাময়িক ইউরোপীয় চিন্তাধারার প্রতিফলন—unthinking reflection. ইংরাজী শিক্ষার একটা মহৎ দোষ (যা আজও অনেক ক্ষেত্রে বর্তমান) হোল এই যে তাতে কেবল যে শিক্ষার মাধ্যমই ইংরাজী তা নয়, মাধ্যমের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার বস্তুও পাশ্চাত্য। ফলে আমাদের নিজেদের দেশ, জাতি, ভাষা, এবং অর্থ-নীতি ও সমাজনীতি সম্পর্কে আমরা যতটা জানতে পারি, তার থেকে বেশি জানতে পারি পাশ্চাত্য সাহিত্য, দর্শন, রাজনীতি, অর্থনীতি এবং সমাজনীতি সম্পর্কে। প্রত্যেক দেশের এবং জাতির চিন্তাধারার মধ্যেই একটা সর্বজনীন সুর আছে; সঙ্গে সঙ্গে ঐ দেশের অবস্থা অনুযায়ী একটি বিশিষ্ট সুরও আছে। কোন দর্শন বা নীতির বৈশিষ্ট্য বিচার করতে হলে সর্বজনীন' সুর অপেক্ষা ঐ বিশিষ্ট সুরের প্রতিই দৃষ্টি দিতে হবে। আমরা পাশ্চাত্যের সর্বজনীন আদর্শ গ্রহণ করেছিলাম—কিন্তু তার সঙ্গে ভারতের বিশিষ্টতার যোগস্থাপন করতে পারিনি। ফলে যদিও আমরা লেখায় এবং বক্তৃতায় উদার নীতির প্রচার করেছি কার্যত হিন্দু-মুসলমান আলাদা রয়েছে—ভাষাগত বিভেদ দেখা দিয়েছে। বহু শত বৎসর পরাধীন থাকার পর বাঙ্গালী স্বকীয় ক্ষমতায় একেবারেই অবিশ্বাসী হওয়ায় বাঙ্গালী চিন্তানায়করা কেবল পাশ্চাত্যের সর্বজনীন নীতিগুলিই আওড়েছেন; কিন্তু ভারতীয় অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সেই নীতিগুলির প্রয়োগ কী করে সম্ভব সে সম্পর্কে কিছুই বলেননি। শ্রীগঙ্গোপাধ্যায়ের বইয়ে যে কজন বাঙ্গালী মনীষীর জীবন এবং দর্শনের আলোচনা করা হয়েছে তাঁরা কেউই আলোচনা করেননি যে বহুভাষিক এবং বহুধার্মিক ভারতবর্ষে জাতিগত স্বায়ত্তশাসনের নীতি কীভাবে কার্যকরী হবে। মুশ্লিম লীগের মিঃ জিন্না এ প্রশ্ন তুলেছিলেন। তার জবাব না দেওয়ায় দেশ একবার ভাগ হয়েছে। আজও তার জবাব খুঁজে না পাওয়ায় মহারাষ্ট্রে "শিবসেনা", তামিলনাদে "আমরা তামিল" আন্দোলন সকলকে শঙ্কিত করেছে এবং বাংলার পার্শ্ববর্তী রাজ্যে কোন প্রতিষ্ঠানে কতজন বাঙ্গালী কাজ করছেন তা গোনার ফলে সেখানকার বাঙ্গালীর মনে আশঙ্কা জাগছে।

"বাঙ্গালী"র রাষ্ট্রচিন্তা সম্পর্কে এ ধরনের কোন বই আগে বোধহয় প্রকাশিত হয়নি। সেদিক থেকে শ্রীগঙ্গোপাধ্যায়ের বইখানি বাংলাসাহিত্যে একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন। যে অধ্যবসায়, নিষ্ঠা এবং মননশীলতা নিয়ে তিনি এই বইটি লিখেছেন তা প্রশংসার যোগ্য। লেখকের সামনে সব চেয়ে বড় সমস্যা ছিল ভাষার। বাঙ্গালীরা তাদের রাষ্ট্রচিন্তা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ইংরাজীতেই লিপিবদ্ধ করেছেন। বাংলায় সেই সকল চিন্তাধারা নিয়ে আলোচনা করা সহজসাধ্য নয়। তিনি প্রতি ব্যক্তির চিন্তাধারা কয়েকটি পূর্ব-নির্ধারিত বিষয় অনুযায়ী আলোচনা করে এই সকল বিশিষ্ট চিন্তাবিদদের চিন্তাধারার মধ্যে ঐক্য এবং পার্থক্য অনুধাবন করবার সুযোগ দিয়েছেন।

শ্রীগঙ্গোপাধ্যায় দেখাবার চেষ্টা করেছেন কীভাবে বাঙ্গালী চিন্তানায়কদের ওপর সমসাময়িককালে ইউরোপে প্রভাবশীল চিন্তানায়কদের প্রভাব পড়েছে। এই বিশ্বজনীনতা

বাঙ্গালীমানসকে সমৃদ্ধ করেছে সন্দেহ নেই। কিন্তু এই পাশ্চাত্য বিশ্বজনীনতার মধ্যে অসম অবস্থার মধ্যে বিভিন্ন জাতির এবং ধর্মের মধ্যে মৈত্রীর কোন চাবিকাঠি ছিল না। হিন্দু লেখকগণ গণতন্ত্র সম্পর্কে খুবই লিখেছেন সত্যকথা; কিন্তু বাংলাদেশের অগণ্য চাষীদের (অবিভক্ত বাংলায় যাদের অধিকাংশই ছিল মুসলমান) সম্পর্কে কিছু বলার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেননি। হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে দ্বন্দ্ব এবং অবিশ্বাস যখন বাংলার রাজনৈতিক আবহাওয়াকে বিষাক্ত করে তুলেছিল, তখন হিন্দু লেখকদের এবং চিন্তানায়কদের কেউই এ সমস্যা সমাধানের জন্য তাঁদের চিন্তাশক্তিকে নিয়োগ করেননি। মুসলমানদের পশ্চাৎপদ অবস্থা সম্পর্কে উল্লেখ করে হিন্দুদের ন্যায়বিচারে মুসলমানদের আস্থা রাখার জন্য উপদেশ দেওয়া ছাড়া হিন্দু লেখকগণ যে আর বিশেষ কিছু করেছিলেন তা মনে হয় না। শ্রীগঙ্গোপাধ্যায়ের বইয়ে বারোজন বাঙ্গালী চিন্তানায়কদের বিষয়ে লেখা হয়েছে : রামমোহন রায়, অক্ষয়কুমার দত্ত, কেশবচন্দ্র সেন, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিপিনচন্দ্র পাল, স্বামী বিবেকানন্দ, শ্রীঅরবিন্দ, চিত্তরঞ্জন দাশ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সুভাষচন্দ্র বসু এবং মানবেন্দ্রনাথ রায়। এঁদের মধ্যে বাংলাদেশে হিন্দু-মুসলমান সমস্যার রাজনৈতিক দিক সম্পর্কে কেবলমাত্র দুইজন অবহিত ছিলেন বলা যেতে পারে—দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন এবং কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ। (সুভাষচন্দ্র কার্যক্ষেত্রে দেশবন্ধুর নীতিকে অনুসরণ করার আংশিক প্রয়াস পেয়েছিলেন)। ১৯২৩ সালে দেশবন্ধু বাংলার মুসলমান নেতৃবৃন্দের সঙ্গে যে চুক্তি করেন তার বিষয়গুলি ছিল নিম্নরূপ (শ্রীগঙ্গোপাধ্যায়ের বই থেকে উদ্ধৃত):

"১। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় (Bengal Legislative Council—তখন Assembly আর Council আলাদা ছিল না) হিন্দু-মুসলমান নির্বাচন লোকসংখ্যানুপাতে হইবে। কিছুকাল পর্যন্ত ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় নিজ নিজ প্রতিনিধি নির্বাচন করিবেন।

২। ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড, লোকাল বোর্ড ইত্যাদিতে ৬০ ও ৪০ অনুপাতে প্রতিনিধি নির্বাচিত হইবে, অর্থাৎ যেখানে মুসলমানের সংখ্যা বেশি সেখানে শতকরা ৬০ জন মুসলমান এবং হিন্দুর সংখ্যা বেশি হইলে শতকরা ৬০ জন হিন্দু নির্বাচিত হইবেন।

৩। বাঙ্গালার মুসলমানগণ লোক-সংখ্যানুপাতে চাকুরী পাইবেন।

৪। আইনের দ্বারা ধর্মসংক্রান্ত কোন বিষয় বন্ধ হইবে না। যে-সম্প্রদায়ের ধর্মসংক্রান্ত বিষয়ে কোন কিছু নূতন নিয়ম প্রবর্তিত হইবে, সে-সম্প্রদায়ের শতকরা ৭৫ জন লোক অনুমোদন করিলে তবে উহা হইতে পারিবে।

৫(ক)। ধর্মের জন্য যদি গোহত্যা প্রয়োজন হয় তবে হিন্দুগণ উহাতে বাধা দিতে পারিবেন না। আর মুসলমানগণও হিন্দুর প্রাণে ব্যথা লাগে এমনভাবে অথবা এমন স্থানে গোবধ করিবেন না।

(খ) নামাজ পড়িবার সময়ে মসজিদের সম্মুখে সঙ্গীত হইতে পারিবে না।"

মনে রাখা দরকার যখন এই চুক্তি সম্পাদিত হয় তখন মুসলমানরা বাংলাদেশে সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল এবং যদি পূর্ণ গণতন্ত্র থাকতো তবে তারাই সরকার গঠন করতে পারতো এবং যা খুশি করতে পারতো। গণতন্ত্রের দিক থেকে বিবেচনা করলে বাংলাদেশে সংখ্যালঘু হিন্দুদের পক্ষে এ চুক্তি একটা রক্ষাকবচের মতো কাজ করতো। কিন্তু রাষ্ট্রচেতনার অসম্পূর্ণতার দরুন বাঙ্গালী হিন্দুরা এ চুক্তিতে অসন্তোষ প্রকাশ করলেন এবং চিত্তরঞ্জনের মৃত্যুর পর ১৯২৬ সালে এই চুক্তিকে অস্বীকার করেন। আজ অর্ধশতাব্দী পরে চিত্তরঞ্জনের

রাজনৈতিক দূরদর্শিতার প্রকৃতি সম্পর্কে সম্যক উপলব্ধি করা সম্ভব। ভারতীয় সংবিধানে পশ্চাৎপদ জাতিগুলিকে (Scheduled Castes and Tribes) বিশেষ সংরক্ষণ দেওয়া হয়েছে। বাংলা দেশের মুসলমানরা যে অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিক দিক থেকে পশ্চাৎপদ ছিল (এবং এখনও আছে—পূর্ব পাকিস্তানের দূরবস্থা যার সাক্ষ্য বহন করছে) সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কাজেকাজেই তাদের জন্য কোন সংরক্ষণমূলক নীতি স্বীকার করা অন্যায় ছিল না, সম্ভবত তা রাজনৈতিক দূরদর্শিতারই প্রমাণ ছিল। আজও বিশেষ ধর্মাবলম্বীদের সমর্থন ছাড়া ধর্মবিষয়ক কোন সংস্কার সম্ভব হয় না। যেমন ১৯৫৫ সনে আইন করে হিন্দু পুরুষদের বহুবিবাহপ্রথা রদ করা হলেও, মুসলমানদের ক্ষেত্রে তা সম্ভব হয়নি; কারণ মুসলমান নেতৃবৃন্দ তাঁদের ধর্মের সংস্কারের বিরোধিতা করেন। ধর্মের নামে দেশভাগ করার পরও যদি ধর্মীয় সংস্কার এভাবে রদ করতে হয়, তবে দেশবিভাগ না করার জন্য এই সমঝোতা করাতে কি কোন দোষ ছিল? কিন্তু হিন্দু নেতৃবৃন্দের মানসিক সঙ্কীর্ণতার দরুন তাঁরা চিত্তরঞ্জনের নীতির মূল্য বুঝতে পারেননি। ফলে হিন্দু-মুসলমানের সম্মিলিত রাজনৈতিক কর্মপদ্ধতি গ্রহণ বাস্তবে অসম্ভব হয় ও যার অনিবার্য ফলস্বরূপ আসে দেশ, এবং বাংলাদেশ, এবং বাঙালী জাতি, বিভাগ।

আজ থেকে আটান্ন বৎসর পূর্বে ১৩১৮ বঙ্গাব্দে রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'হিন্দুবিশ্ববিদ্যালয়' শীর্ষক বক্তৃতায় বলেছিলেন, "আধুনিক কালের শিক্ষার প্রতি সময় থাকিতে মনোযোগ না করায় ভারতবর্ষের মুসলমান হিন্দুদের চেয়ে অনেক বিষয়ে পিছাইয়া পড়িয়াছে। সেখানে তাহাকে সমান করিয়া লইতে হইবে। এই বৈষম্যটি দূর করিবার জন্য মুসলমান সকল বিষয়েই হিন্দুর চেয়ে বেশি দাবি করিতে আরম্ভ করিয়াছে। তাহাদের এই দাবিতে আমাদের আন্তরিক সম্মতি থাকাই উচিত।..." (রবীন্দ্ররচনাবলী ১৩শ খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, পৃঃ ১৮৩)। চিত্তরঞ্জনের চিন্তাধারার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের চিন্তাধারার ঐক্য অনুধাবনযোগ্য। রবীন্দ্রনাথ রাজনীতিবিদ ছিলেন না। বোধহয় মানবদরদী ছিলেন বলেই তিনি হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের আসল রূপটি দেখতে পেয়েছিলেন। যেসকল হিন্দু মুসলমানদের স্বাতন্ত্র্যের আন্দোলনকে অল্পসংখ্যক লোকের নষ্টামি বলে তাচ্ছিল্য করতো তাদের যুক্তি খণ্ডন করে রবীন্দ্রনাথ বলেন: "কিছুকাল পূর্বে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে এই স্বাতন্ত্র্য-অনুভূতি তীব্র ছিল না। আমরা এমন একরকম করিয়া মিলিয়া ছিলাম যে আমাদের মধ্যেকার ভিন্নতাটা চোখে পড়িত না। কিন্তু স্বাতন্ত্র্য-অনুভূতির অভাবটা একটা অ-ভাবমাত্র, ইহা ভাবাত্মক নহে। অর্থাৎ আমাদের মধ্যে সত্যকার অভেদ ছিল বলিয়াই যে, ভেদ সম্পর্কে আমরা অচেতন ছিলাম তাহা নহে—আমাদের মধ্যে প্রাণ-শক্তির অভাব ঘটিয়াছিল বলিয়াই একটা নিশ্চেতনতায় আমাদিগকে অভিভূত করিয়াছিল। একটা দিন আসিল যখন হিন্দু আপন হিন্দুত্ব লইয়া গৌরব করিতে উদ্যত হইল। তখন মুসলমান যদি হিন্দুর গৌরব মানিয়া লইয়া নিজেরা চুপচাপ পড়িয়া থাকিত তবে হিন্দু খুব খুশি হইত সন্দেহ নাই, কিন্তু যে কারণে হিন্দুর হিন্দুত্ব উগ্র হইয়া উঠিল সেই কারণেই মুসলমানের মুসলমানি মাথা তুলিয়া উঠিল।......আজ আমাদের দেশে মুসলমান স্বতন্ত্র থাকিয়া নিজের উন্নতি সাধনের চেষ্টা করিতেছে। তাহা আমাদের পক্ষে যতই অপ্রিয় এবং তাহাতে আপাতত আমাদের যতই অসুবিধা হউক, একদিন পরস্পর মিলন সাধনের ইহাই প্রকৃত উপায়......।"

রবীন্দ্রনাথ এবং চিত্তরঞ্জন হিন্দু-মুসলমানের মধ্যকার পার্থক্য সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন। মুসলমানের স্বতন্ত্র আন্দোলনের প্রকৃত স্বরূপ সম্পর্কে তাঁদের মনে

কোন ভুল ধারণা ছিল না। তাঁরা বুঝতে পেরেছিলেন যে বৃটিশ রাজত্বের অধিকাংশ সুবিধা-ভোগী হিন্দুদের কর্তব্য আপাতত কিছু ত্যাগ স্বীকার করেও মুসলমানদের সঙ্গে থাকা যাতে মুসলমান এবং হিন্দুর মধ্যে প্রকৃত মানসিক সৌহার্দ্য গড়ে ওঠে—যে সৌহার্দ্য ছাড়া হিন্দু বা মুসলমানের পক্ষে বৃটিশের বিপক্ষে তাদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করা কঠিন হবে। মুসলমান নেতৃত্বের সঙ্গে হিন্দু নেতৃত্বের মিলন কিন্তু তাও হোল না। হিন্দুরা যদিও এজন্য মুসলমানদেরই দোষী করেছেন তবে ইতিহাসের সাক্ষ্য সব সময়েই যে হিন্দুদের পক্ষে যায় না আজ ভারতের অনেক হিন্দু বুদ্ধিজীবী তা আস্তে আস্তে বুঝতে আরম্ভ করেছেন। কিন্তু হিন্দু-মুসলমানের প্রকৃত মৈত্রী কীভাবে সম্ভব তা কি হিন্দু কি মুসলমান নেতৃবৃন্দ এখনও বলতে পারেন না। এখানেই আমাদের জাতীয় সঙ্কটের বর্তমান স্বরূপ। ধর্মের নামে দেশ ভাগ করার বাইশ বৎসর পরও এ সমস্যার আমরা কোনও সমাধান করতে পারিনি—না ভারতে, না পাকিস্তানে।

সৌরেন্দ্রমোহন এই বইখানি লিখে প্রত্যেক বঙ্গভাষীর কৃতজ্ঞতা অর্জন করেছেন। কিন্তু এই বইটিরও একটি বিরাট ত্রুটি রয়েছে, তা হচ্ছে কোন মুসলমান বাঙ্গালী নেতার চিন্তাধারার কথা এতে নেই। কী কারণে ফজলুল হক প্রমুখ মুসলমান নেতৃবৃন্দ কংগ্রেসে থাকতে পারেননি তা বোঝা প্রত্যেক বাঙ্গালীর পক্ষে আজও বিশেষ প্রয়োজন। আমরা যেন আজও "বাঙ্গালী" এবং "মুসলমান"-এর মধ্যে পার্থক্য না করি—কবিগুরুর সাবধানবাণী স্মরণ রেখে আমাদের "বাঙ্গালী" থেকে "মানুষ" হওয়ার চেষ্টা করা প্রয়োজন। তার জন্য প্রথম প্রয়োজন আত্মোপলব্ধি—অন্তত আমরা কারা বাঙ্গালী সে সম্পর্কে সম্যক্-রূপে অবহিত হওয়া। পূর্বপাকিস্তানে যে মুসলমান বাংলাভাষার সম্মানের জন্য প্রাণ দিচ্ছে সে কি বাঙ্গালী নয়? বাঙ্গালী কি শুধু সেই যে জাতীয় ঐক্যের আত্মপ্রবঞ্চনার আড়ালে ভারতে বাংলাভাষার শত অমর্যাদা সহ্য করে যাচ্ছে? একথা বললে বোধ হয় খুব ভুল হবে না যে যে-সকল মনীষীর চিন্তাধারা শ্রীগঙ্গোপাধ্যায়ের গ্রন্থে বিধৃত হয়েছে অধিকাংশ বাঙ্গালীদের (অর্থাৎ মুসলমানদের) মধ্যে তার প্রভাব স্বাধীনতা-পূর্ববর্তীযুগে অতি অল্পই ছিল (যদিও আজ সে প্রভাব বাড়ছে)। "বাঙ্গালীর রাষ্ট্রচিন্তা" গ্রন্থে অধিকাংশ বাঙ্গালীর মনকে যে চিন্তাধারা প্রভাবিত করেছিল তার অনুল্লেখ একটি বড় ত্রুটি। এ ত্রুটি আরও বেশি মারাত্মক হয়েছে এই কারণে যে বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনে অপূর্ণতা দূর হয়নি অর্থাৎ বাঙ্গালীর অতীত রাষ্ট্রচিন্তার মধ্যে একটি গুরুতর গলদ ছিল যা দূর করার কাজ সামনে পড়ে আছে। যদি অতীতের মানসের প্রকৃত রূপটির পরিচয় আমরা না পাই তবে বর্তমানের এ কাজ সুসম্পন্ন করা আমাদের পক্ষে বিশেষ কঠিন হবে।

বাঙ্গালীর সামনে আজ দুটি প্রধান রাষ্ট্রীয় কর্তব্য রয়েছে : বাঙ্গালীর জাতীয় ঐক্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা এবং বাঙ্গালীর জীবনের শতসহস্র অভাব অভিযোগ দূর করা। এই দুইটি কর্তব্য সম্পাদনের মধ্যে কোন স্ববিরোধিতা নেই; বস্তুত একটি ছাড়া অপরটি কল্পনাও করা যায় না। অতীতে বাঙ্গালীর রাষ্ট্রচিন্তা বাঙ্গালীকে জাতি হিসাবে আত্ম-প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করতে ব্যর্থ হয়েছে। বাঙ্গালীর বর্তমান রাষ্ট্রচিন্তার ভিত্তি স্বভাবতই হবে বিশ্বজনীনতা, সাম্য এবং মৈত্রী—এদিক থেকে অতীতের চিন্তানায়কদের শিক্ষা আমাদের কাছে আজও মূল্যবান।

সুভাষচন্দ্র সরকার

এই জন্ম, জন্মভূমি—মণীন্দ্র রায়। মনীষা। কলকাতা ১২। মূল্য দুই টাকা।

মুখ্যত লিরিক কবি যখন এপিক-ধর্মী কবিতায় হাত দিতে চান, তখন প্রায় ক্ষেত্রেই তাঁর একূল-ওকূল দুকূল যায়। প্রসঙ্গটা তুলছি, কারণ "এই জন্ম, জন্মভূমি"-কে সরাসরি এপিক-ধর্মী প্রয়াস বললে যদিও অতিরঞ্জনের দায়ে পড়া যেতে পারে, কবিতাটির বিষয় ব্যাপ্ত ও গভীর, তা অন্তত এপিক-লক্ষণাক্রান্ত। মণীন্দ্র রায়কে মুখ্যত লিরিক কবি বলেই জানি, এবং সেটা কিছু অশ্রদ্ধেয় নয়, তাই বর্তমান গ্রন্থে তাঁকে দুই নৌকায় শঙ্কাকুল পা রেখে চলতে দেখা যেত—কিন্তু সেটা হয়নি, সে-সংকট তিনি অনেকাংশে উত্তীর্ণ হয়েছেন।

"এই জন্ম, জন্মভূমি" একটি ক্ষুদ্র গ্রন্থ, পাঁচ ভাগে বিভক্ত ও সবসুদ্ধ ছোট-বড় ৫৫৯-টি অসম পঙক্তির একটি দীর্ঘ কবিতা মাত্র। এরকম প্রয়াস মণীন্দ্র রায়ের এই প্রথম নয়, তাঁর পূর্ববর্তী "মোহিনী আড়াল"-এও দেখেছি। তবে ব্যক্তিগতভাবে বলতে পারি, বাঁধুনির দিক থেকে "মোহিনী আড়াল"-এর চেয়ে আলোচ্য কবিতাটির ভাব ও শরীরগত ঐক্য আমার কাছে আরো সহজে গ্রহণযোগ্য মনে হয়েছে। এমনকি সে-ঐক্যের সূত্রটা এতটা বেশী যে কখনো কখনো এইরকম ধারণা হওয়াও অস্বাভাবিক নয়, যে-পাঁচটি বিভাগের উল্লেখ করেছি, চাইলেই সেগুলির প্রত্যেকটিকে এক-একটি স্বতন্ত্র কবিতা হিসেবে পড়া যায়। অর্থাৎ এক বিভাগ থেকে অন্য বিভাগে ভাব বা বক্তব্যের চোখে পড়ার মতো কোনো উত্তরণ নেই—প্রায় হুবহু একই জিনিস ঘুরে ফিরে বার বার বলা। এটি ত্রুটি বলে চোখে পড়তই, যদি না সব বিভাগেই তিনি নতুনত্বের আমেজ আনতে সক্ষম হতেন, যা তিনি হয়েছেন—এই নতুনত্ব তিনি এনেছেন একই বিষয়বস্তুকে নতুন-নতুন কাপড় পরিয়ে, কখনো তাকে নিত্যনতুন নিসর্গের পরিপ্রেক্ষিতে দাঁড় করিয়ে, শুধু ভাষাতেই নয়, ব্যঞ্জনায় রূপান্তর ঘটিয়ে। এটা বিভ্রম, হয়তো মায়া মাত্র, মানছি, কিন্তু সেটা সার্থকভাবে উপস্থাপিত করার কৃতিত্ব নিশ্চয় আছে।

কবিতার নিছক শারীরিক গঠনের দিকটায় এতটা নজর দিলাম। কারণ মণীন্দ্র রায়ের প্রসঙ্গে সেটার দরকার আছে—এ-কবি অন্যান্য বহু লিরিক কবির সমগোত্রীয় তেমন নন, ইনি দক্ষ শিল্পী। বহুকাল ধরে দেখছি, পঙক্তি সাজানোয় বা শব্দ-চয়নে বা বিষয়বস্তুকে একটি বিশেষ বাচনভঙ্গীতে মণ্ডিত করায় এঁর একটি নিষ্ঠার ভাব আছে। তবে গঠনের দিকটাতেই যেন সমস্ত নজর চলে না যায়, কারণ বক্তব্যের দিকটাও তো আছে, এবং সেটাই আসল। সে-প্রসঙ্গে মূল কথা হল এই যে বক্তব্যহীনতার চটুল অগভীর জলে আজ যখন বাংলা কবিতার একটা মোটা অংশ ক্রমশই ফ্যাকাশে হয়ে আসছে, তখন কবিতার সে-নির্যাতনের বিরুদ্ধে যাঁরা লড়াই চালিয়ে চলেছেন, তাঁদের গোষ্ঠীতে মণীন্দ্র রায় একটি উজ্জ্বল নাম। সামাজিক ব্যক্তি হিসেবে কবির দায়িত্ববোধে তিনি চিরকালই সচেতন। আরো সুখের কথা হল এই যে ইদানীং তাঁর উক্তিগুলি যেন ক্রমশই বেশী পরিস্ফুট হয়ে উঠছে, ক্রমশই বেশী খোলসমুক্ত, আরেকটু বেশী সহজ, আন্তরিকতায় আরেকটু বেশী চিহ্নিত।

"এই জন্ম, জন্মভূমি"-র বিষয়বস্তু হল আমাদের জন্ম ও জন্মভূমির এই বিশিষ্ট সময়, যখন "দেশে ও বিদেশে, দেশে দেশে, ভেঙে পড়ছে স্থিতাবস্থা, বদলে যাচ্ছে মনের ভূগোল", যখন "একটা দিনের স্নায়ুকেন্দ্রে কী তুমুল তোলপাড়"। এরই মধ্যে কবি ডাক দিচ্ছেন তাঁর দেশবাসীকে, বিশ্বাসের অঙ্গুলি-সঙ্কেতে, "এখানে এসো, আমার পায়ের মাটিতে দাঁড়াও......আমার মনের জানালে তাকাও, দেখ, সময়-রেখার ভাষাগুলি কেমন

অমোঘ।" "আমি" কেন? কারণ

তবু, আমি স্বপ্ন,
আমি নিয়ত নির্মাণ,
আগুনে পাথরে দ্রোহে খুঁজি শুধু সময়ের গ্রন্থি।
শতাব্দীর শেষে, কিংবা কয়েক শতাব্দী
পার হয়ে মানবযাত্রার
আলো-অন্ধকারে, ঝড়ে, রুদ্র বহুভঙ্গ,
আমি কবি, কী থাকে আমার,
এই জন্ম, জন্মভূমি, এই
চেতনারই বিস্ফোরণে তরঙ্গে তরঙ্গ—
মানুষে মানুষ, প্রশ্ন, দিগন্ত উৎসার।

আবার বিশ্বাসেরই মাঝে মাঝে পারিপার্শ্বিক নিয়ে আশ্চর্য শ্লেষোক্তি, যা হয়তো এই কবির একটি অনন্যসাধারণ গুণ—যেমন,

আর ওদিকে ছেলেটা বিদগ্ধ,
পদ্য লিখছে খালাসীটোলায়,
ক'রাউন্ড নীট্-এর দোলায়
মধ্যরাতে ঘুষোঘুষি, রক্ত......

আর ওদিকে মেয়েটা আইবুড়ো,
হেসে হেসে বলে সে—অসভ্য!
মুখে রঙ, ফাঁপা চুলে চুড়ো,
খালি ফ্ল্যাটে শোনা যায় লভ্য;

আর লোকটা নিজেও কি হঠাৎ
কোনোদিন, প্রায় বেওয়ারিশ,
কার্জন পার্কের অন্ধকারে
শোনে নি সে অনুচ্চে...মা-লি-শ্!

আমার মনে হয়েছে, বিশ্বাস যার, শক্তি যার, শ্লেষ তার শোভা পায় না। তবে ত্রিশঙ্কু মধ্যবিত্ত আজ ক্রমশই নপুংসক বলে শ্লেষ ভিন্ন তার গতি নেই, হয়তো আমাদের কারুরই গতি নেই। মনে হয়, এই অসহায় অবস্থা সম্পর্কে কবি নিজেও সচেতন—নইলে নিজের সম্বন্ধে এই স্বীকারোক্তি তাঁর দুঃসাধ্য ঠেকত :

আমি কলকাতায় আছি;
পাঁচফুট ছ'ইঞ্চি এই শরীর
অপটু, অকেজো, ন্যুব্জ;
কতো না বিরোধী ভয়ে মন
অপদস্থ; আমি ব্যতিব্যস্ত
স্নায়ুর পীড়নে, দ্বন্দ্বে,
চরিত্রহননে; আমি আছি

চৌকোনা ইঁটের এই খাঁচায়;
ছটফট ছটফট উদয়াস্ত
হাড়হদ্দ জেনেশুনে, তবু,
বেঁচে আছি সে কোন বাঁচায়?

মুস্কিল এই যে "এখানে এসো" বললেই তো কাউকে আনানো যাবে না। জনতার সঙ্গে কবির সম্পর্ক হবে কী, সেটা তো কবি একতরফা ঠিক করে দিতে পারেন না, কারণ সে-সিদ্ধান্তের একটা মোটা অংশের ভার নেবে জনতাই, অন্য মোটা অংশের ভার নেবে ইতিহাস। কবিরও একটা বক্তব্য থাকবে, নিশ্চয়ই—তবে কবি আজ এই ধ্বংসোন্মুখ মধ্যবিত্ত সমাজে ক্রমশই এক অসহায় জীব, যে-অসহায়বোধের অকপট সাহসোক্তি এই কাব্যে।

লোকনাথ ভট্টাচার্য

মধ্যরাত—দিব্যেন্দু পালিত। চতুষ্পর্ণা প্রকাশনী। গাতা ৯। মূল্য ছয় টাকা।
ভেবেছিলাম—দিব্যেন্দু পালিত। সুরভি প্রকাশনী। ৯। মূল্য ২·৫০ পয়সা।

গত শতকের শুরুর এক ইংরেজ কবি বলেছিলেন: আমাদের একান্ত ব্যক্তিগত বাসনাকামনা এবং সময়ের অনিবার্য নির্মম নৈর্ব্যক্তিক ধাবমানতার দ্বন্দ্ব থেকে মানুষের জীবনের সব ট্রাজেডি উৎসারিত। অন্য একটি কথা সেই কবি চিঠিপত্রে অর্থাৎ গদ্যে কখনো বলেন নি, অথচ তাঁর শ্রেষ্ঠ কবিতাগুলিতে কথাটি সম্পৃক্ত। সেই কথাটি হল: যার মনের তার সামান্য আঘাতে ঝঙ্কার তোলে, এই সমাজের কাঠামোয় তার প্রত্যেকটি মুহূর্তে বিচ্ছিন্নতাবোধের যন্ত্রণা এবং তার দিনরাত্রি কাটে সচেতনভাবে অথবা অবচেতনায় সেই নৈঃসঙ্গ্য বা বিচ্ছিন্নতা-বোধ অতিক্রমণের প্রায়শই ব্যর্থ প্রয়াসে। দুহাত বাড়িয়ে শূন্যতা ছাড়া আর কিছুর স্পর্শ না পেয়ে ক্রমান্বয়ে সে গভীরতর শূন্যতায় ডুবে যায় অথবা সে বিদ্রোহ করে, দিনযাপনের এই নকশা ছিঁড়ে ফেলতে চায়। তখন তার প্রাত্যহিক জীবনের পথগুলো অচেনা হয়ে পড়লে, তার আচরণে অসংলগ্নতা দেখা গেলে, তার পরিচিতজন বিস্মিত এবং আহত।

গত শতকেই শিল্পী যখন দেখলেন এই বণিক সভ্যতায় তাঁর সামাজিক প্রভাব নিঃশেষ, তাঁর আত্মাভিমান তীব্র আঘাত পেল। তখন থেকেই শিল্পীরা, লেখকরা, তাঁদের শিল্পকর্মে প্রধান চরিত্র রূপে উপস্থিত। লেখকের আত্মপ্রকাশের সব থেকে ধারাল অস্ত্র উপন্যাস। তাই গত শতকের আগের উপন্যাসে অথবা উপন্যাসের লক্ষণযুক্ত রচনায় প্রধান চরিত্র রূপে শিল্পীর আবির্ভাব প্রায় চোখেই পড়ে না। তারপর থেকে তাঁরা এলেন এবং তাঁদের সঙ্গে এল সেই অনিবার্য নৈঃসঙ্গ্য অথবা বিচ্ছিন্নতাবোধ এবং সেই বিচ্ছিন্নতাবোধ অতিক্রমণের প্রায়শই ব্যর্থ প্রয়াস। এ পরবাসে নিজের অস্তিত্বের চরিতার্থতা খুঁজতে গিয়ে লেখক অন্তর্মনের গভীরে ক্রমান্বয়ে দীর্ঘতর সিঁড়ি নামিয়ে দিলেন। সুতরাং সংগত কারণেই একালের উপন্যাস নৈঃসঙ্গ্য ও শূন্যতাবোধ দ্বারা আক্রান্ত। পাঠকের অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, যখনই লেখক তাঁর কেন্দ্রীয় চরিত্রকে এই শূন্যতাবোধ অতিক্রমণের প্রয়াসে যে-কোন ধরনের বিদ্রোহের পথে সাফল্যের সামান্যতম ইঙ্গিতও দিয়েছেন, তখনই তিনি পাঠকের পুজো পেয়েছেন। হয়ত এর কারণ, সংবেদনশীল পাঠকও শূন্যতাবোধ দ্বারা আক্রান্ত এবং আক্রান্ত

বলেই ওই সাফল্যের সামান্যতম ইঙ্গিতের মধ্যেও একটা আশ্রয়ের ভূমি খুঁজে পান। কিন্তু বিচ্ছিন্নতাবোধে জর্জরিত লেখকের কোন একটা দৃঢ় বিশ্বাস না থাকলে সফলতার সামান্যতম ইঙ্গিত দেওয়াও কপটতা। অথচ, মুশকিল এই, একালের অনেক লেখকের তেমন কোন বিশ্বাস নেই এবং নেই যে, তার জন্য চমকে উঠবারও কিছু নেই।

দিব্যেন্দু পালিতের আলোচ্য উপন্যাস দুটি পড়বার পর পাঠকের মনে এসব কথা আসবে। "মধ্যরাত" প্রসঙ্গে হয়ত ততটা নয়, তবে "ভেবেছিলাম" পড়বার পর এসব কথা মনে আসবেই, কারণ লেখকই সেখানে কেন্দ্রীয় চরিত্র। ব্যক্তিগতভাবে আমার কিন্তু প্রথমে "মধ্যরাত" পড়বার পরও এসব কথা মনে এসেছিল। দেখাই যাচ্ছে "মধ্যরাত"-এর নায়িকা তপতী শিল্পী নয়, লেখিকা নয়, তার মধ্যে লেখকের নিজের চরিত্রও প্রতিফলিত নয়। তথাপি এসব কথা মনে আসবার কারণ, নৈঃসঙ্গ্য ও বিচ্ছিন্নতাবোধ দিয়ে তপতীর মন তৈরি। তপতীর সেই বিচ্ছিন্নতাবোধ অতিক্রমণের প্রয়াস এই উপন্যাসের গল্পাংশ।

মধ্যবিত্তের স্বর্ণযুগেই মধ্যবিত্ত তার শূন্যতা উপলব্ধি করেছে। স্কুলের চাকরি ছাড়তে পারল তপতী, অধ্যাপিকা হতে পারল। কাকার বাড়ির সংকীর্ণ পরিধি থেকে চলে এল তার মতন অনেক মেয়ের বাসস্থান নষ্টনীড়ের উদার বিস্তৃতিতে। তার মনে নতুন সম্বন্ধপাতের আশা, বিচ্ছিন্নতাবোধ অতিক্রমণের সম্ভাবনা। মিশল নষ্টনীড়ের মেয়েদের সঙ্গে, চাকরি পেতে সাহায্য করেছিল যে-নীতীশ তার সঙ্গে সম্পর্কের সুতোটা ক্রমান্বয়ে কিছু অবয়ব পেল। তবু নৈঃসঙ্গ্য কাটল না।

বলেছি, তপতীর মধ্যে লেখকের নিজের চরিত্র প্রতিফলিত নয়। কথাটা পুরোপুরি সত্যি নয়। কয়েকবার তপতীর মধ্যে লেখকের চরিত্র দুর্লক্ষ্য মনে হয় না। নায়িকার চরিত্রে নিজের মনের প্রতিফলনে লেখকের অনিচ্ছা কেন? প্রশ্নটার উত্তর খুঁজতে গিয়ে মনে হল, তরুণ লেখকদের বিরুদ্ধে একটি সোচ্চার অভিযোগ বিষয়ে দিব্যেন্দু পালিত একটু বেশী সচেতন। অভিযোগটি হল, তরুণ লেখকদের উপন্যাসগুলি প্রায়শই মূলত ছোটগল্পের সম্প্রসারিত রূপ। সুতরাং লেখক ব্যাপক অর্থে অবজেকটিভ হতে চেয়েছেন। ব্যাপারটা আমার এক ধরনের আপস মনে হয়।

ঘটনা সাজানোয় এবং শব্দপ্রয়োগেও কিছুটা আপসের প্রবণতা লক্ষ্য করেছি। নীতীশের অনুপস্থিতিতে তার মায়ের অসুখের ঘরে তপতীর প্রবেশ এবং পরে সেখানে নীতীশ ফিরে এলে তার সঙ্গে তপতীর দেখা হওয়া সম্পূর্ণ স্বাভাবিক হলেও, ঘটনাটি বাঙলা উপন্যাসে বড় পুরনো। বৃহত্তর পাঠকসমাজের খাতিরে এই ধরনের আপসের প্রবণতা আমাকে মুগ্ধ করে না। বইটিতে লেখকের গদ্য পরিচ্ছন্ন, কিন্তু ঋজু তীক্ষ্ম ইঙ্গিতময় মিতভাষিতার লক্ষণাক্রান্ত পঙক্তি খুঁজতে হয়।

কঠিন দৃষ্টিতে দেখলে নীতীশের চরিত্র উপস্থাপনের মধ্যেও সেই আপসের প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। প্রথম দৃষ্টিপাতে মনে হতে পারে, নীতীশ নির্মম নির্মোহ, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাকে রোমান্টিকতার কুয়াশায় প্রচ্ছন্ন রাখা হয়েছে।

"ভেবেছিলাম" উপন্যাসটিতে লেখকের আপসহীনতা নিখাদ। লেখক স্বয়ং গ্রন্থের নায়ক। অন্য কারো মধ্যে নিজেকে প্রতিফলিত করে তির্যকভাবে আত্মপ্রকাশের রীতি গ্রহণ করা হয় নি। সব কিছু সরাসরি উদ্ঘাটিত। বইটির নায়ক ভাবছে, সে চাকরি পেয়ে খুশী, তার পরিপার্শ্ব মধুর। খানিক পরেই অবশ্য বুঝতে পারল, চাকরি পেয়েও সুখ নেই, সুখ কোথাও নেই। নৈঃসঙ্গ্য ও বিচ্ছিন্নতাবোধ অতিক্রমণের চেষ্টা সফল হচ্ছে না। সহকর্মীদের,

পুরনো বন্ধুদের, প্রেমিকা বিনতাকে দুহাতের মধ্যে ধরতে চেয়েও শুধুই শূন্যতার স্পর্শ। এবং চাকরি পেয়ে যেমন সত্যিকার সুখ নেই, তেমনি চাকরি গেলেও সত্যি দুঃখ কোথায়? সেই বহু ব্যবহারে ঈষৎ জীর্ণ কথাটিই বলতে হয়, বিপন্ন বিস্ময় ছাড়া এই নায়কের চাকরি পাবার আগে, চাকরি পেয়ে এবং চাকরি যাবার পর আর কিছু নেই। আসলে একালের অনেক গল্প-উপন্যাসেরই কেন্দ্রীয় চরিত্রগুলি নানারূপে জীবনানন্দ দাশের 'আট বছর আগের একদিন' কবিতায় উপস্থিত।

সম্বন্ধপাতের চেষ্টায় নায়কের ব্যর্থতার পর যে বিদ্রোহ, তার ফলে তার আচরণে বিস্ময়কর অসংলগ্নতা, পরিচিত আচরণবিধির নিরিখে অবিশ্বাস্য উচ্ছৃংখলতা দেখা দিতে পারে। একালের দুচারখানি উপন্যাসে সেই অসংলগ্নতা উপস্থাপনে পাঠককে দারুণ চমক দেবার প্রবণতা লক্ষ্য করেছি। একে হয়ত আপস বলা ঠিক নয়, হয়ত লোভ বলা উচিত। "ভেবেছিলাম" বইটিতে সেই লোভকেও প্রশ্রয় দেওয়া হয় নি।

সুধাংশু ঘোষ

সোনার কাঠি রুপোর কাঠি— শ্যামাপ্রসাদ সরকার সম্পাদিত। রূপম। কলিকাতা ১২। মূল্য তিন টাকা।

পাতার বাঁশী— শ্যামাপ্রসাদ সরকার সম্পাদিত। এভারেস্ট বুক হাউস। কলিকাতা ১২। মূল্য তিন টাকা।

একথা ঠিক যে বাংলা শিশু-সাহিত্যের স্বর্ণযুগ এখন আর নেই। রবীন্দ্রনাথ-অবনীন্দ্রনাথ-যোগীন্দ্রনাথ সরকার-উপেন্দ্রকিশোর-দক্ষিণারঞ্জন মিত্রমজুমদার-সুকুমার রায়—এ যেন একেবারে চাঁদের হাট। এই চাঁদের হাট অনেকদিন ভেঙে গেছে। শিশু-সাহিত্য প্রকাশের জন্য প্রথম শ্রেণীর পত্রিকার অভাব। প্রকাশকেরা এ ব্যাপারে নিরুৎসাহ, অথচ, অজস্র শিশু বা কিশোর-পাঠক প্রতি বৎসরই নতুন বই পড়বার জন্য তৈরী হচ্ছে।

অবস্থাটা শোচনীয় সন্দেহ নেই। কিন্তু একেবারে হতাশ হবার কারণও নেই। এ-যুগেও কেউ কেউ প্রথম শ্রেণীর শিশু-সাহিত্য রচনা করে চলেছেন। এবং কোন লাভের আশা না রেখেই তাঁরা একাজে হাত দিয়েছেন। অবনীন্দ্রনাথ-উপেন্দ্রকিশোর বা সুকুমার রায়ের ধারাকে যাঁরা আপ্রাণ এগিয়ে নিয়ে চলেছেন তাঁদের সংগে বর্তমানকালের সাবালক পাঠকদের অনেকেরই যোগাযোগ নেই। অথচ এই যোগাযোগ হওয়াটা নানা কারণেই গুরুত্বপূর্ণ। শিশু-সাহিত্যের পাঠক কেবলমাত্র শিশুরাই নয়। পৃথিবীর সমস্ত শ্রেষ্ঠ শিশু-সাহিত্যের পাঠক-দের মধ্যে বয়স্কদের সংখ্যা কম নয়। প্রত্যেক সাবালক মানুষের মনের মধ্যেই একটি শিশু লুকিয়ে থাকে। সেই লুকোনো শিশুটি সর্বদাই গল্প শুনতে উৎসুক। সেই গল্প কখনওবা রূপকথার, কখনওবা কৌতুকরসের আবার কখনওবা তা বিশুদ্ধ 'ননসেন্স' রচনা। শ্যামাপ্রসাদের দুটি সংকলনগ্রন্থেই এরকম অনেক অসাধারণ কাহিনী আছে। পুরোনো মহারথীদের সংগে এযুগের নামজাদারা হাত মিলিয়েছেন এতে। শিশু-সাহিত্যের দুটি গৌরবময় যুগকে দুটি সংকলনের মাধ্যমে তুলে ধরবার জন্য সম্পাদককে প্রশংসা করতে হয়।

"সোনার কাঠি রূপোর কাঠি" প্রকৃতপক্ষে রূপকথাধর্মী রচনার সংকলন। সংকলক ভূমিকায় বলেছেন, 'মায়ের কোলে রূপকথার গল্প শুনতে শুনতে খোকনের চোখে ঘুম আসে' —এই নিদ্রালু পটভূমিতেই সংকলনের অধিকাংশ রচিত। তরোয়াল হাতে রাজপুত্র যুগ-যুগান্তর ধরে সোনার কাঠি রূপোর কাঠি সরিয়ে ঘুমন্তপুরী থেকে বন্দিনী রাজকন্যাকে উদ্ধার করতে চলেছে—এই হচ্ছে রূপকথার চিরকালের কাহিনী। আর এই কাহিনী দক্ষিণারঞ্জন মিত্রমজুমদারের কাজলজল এবং অবনীন্দ্রনাথের চিরস্মরণীয় ক্ষীরের পুতুলে যে মুন্সিয়ানার সঙ্গে বর্ণিত হয়েছে তা ভালো লাগবে না এমন কোন বয়স্ক পাঠক খুঁজে পাওয়াই শক্ত। সেইসঙ্গে উপেন্দ্রকিশোরের মজন্তালী সরকার। আধুনিক রূপকথা লিখেছেন দুজন—অন্নদাশঙ্কর আর লীলা মজুমদার। আধুনিক যুগের ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমী নানা বিপদ-আপদের মধ্যে রাজপুত্রের রাজকন্যালাভে সন্দিহান হয়ে ওঠে। অতএব, রাজপুত্রকে তাদের নির্দেশ—তবে আর কাজ নেই তেপান্তরে। ঘরের ছেলেকে বলি ফিরতে ঘরে। কৌতুকের খোঁচা না থাকলে শিশু-সাহিত্য জমে না—এটা অন্নদাশঙ্কর যেমন জানেন তেমনি জানেন লীলা মজুমদার। তাঁর মধুমালতী না পড়লে রূপকথার একটা দিক যেন অজানাই থেকে যেত। 'দুরকম পরী হয়। এক নম্বর পরীরা মধু খায় আর দু নম্বর পরীরা গন্ধকের ধোঁয়া খায়, তিতির পাখীর মাংস পরীরা খায় না'—একথাটা সত্যি আমরা কেউ জানতাম না। প্রেমেন্দ্র মিত্র, সরোজকুমার রায়চৌধুরী ও মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের লেখাও সার্থক।

"পাতার বাঁশী" আর একধাপ ওপরের শিশু, বলা চলে কিশোরদের সংকলন। "পাতার বাঁশী" বাজিয়ে চিরকালের শৈশবের যেখান থেকে যাত্রা শুরু সেই পথের অপরূপ বর্ণনা এ-সমস্ত রচনায়। এই সংকলনেও সম্পাদকের রচনা-নির্বাচনের মুন্সিয়ানা চোখে পড়বে। অবনীন্দ্রনাথের অসাধারণ চট্‌জলদী কবিতা দিয়ে সংকলনের শুরু—'সত্যযুগে সব কিছুই ছিল সত্যসন্ধ। প্যাঁজও ছিল, রসুনও ছিল, কিন্তু ছিল না গন্ধ।' এ লেখা বাংলাদেশে আজ পর্যন্ত একজনই লিখতে পারেন। রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিশু-সাহিত্য রচনায় হাত কতটা পাকা ছিল তাঁর 'শিকার কাহিনী' তার প্রমাণ। উপেন্দ্রকিশোরের কুঁজের গল্প, অমিয় চক্রবর্তীর তিনটি কবিতা, প্রেমেন্দ্র মিত্রের রকেট ছোড়া ছড়া, সত্যজিৎ রায়ের মেছোগান, জ্যোতির্ময় গঙ্গোপাধ্যায়ের ছড়া—সবকিছুই মনমাতানো রচনা। আর সবার উপরে আছে লীলা মজুমদারের স্বয়ম্বর যেখানে 'আধখাওয়া একটা চপের উপর দিয়ে কাঞ্চনমালা তাঁর গলা থেকে ফুলের মালা খুলে শ্যামলকুমারের গলায় পরিয়ে দিয়ে বললেন, 'দূর স্বয়ম্বর-টয়ম্বর একটা বাজে ব্যাপার।' কনিষ্ঠতম শ্যামাপ্রসাদ সরকারের গদ্যের হাতটি বেশ ভালো তৈরী হচ্ছে—'আকাশে রোদ্দুর, মাটিতে বৃষ্টি, তিনকন্যেকে বিয়ে করে শিবঠাকুর নৌকা ছেড়ে নামতেই রাজকন্যে ছুটে এলো, হেই মামা তোর পায়ে পড়ি, বউ এনে দে খেলা করি'—এজাতীয় গদ্য পূর্বসূরীদের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

এমনি সব রচনা নিয়ে সংকলন দুটি। শিশু-সাহিত্যের বাজারে আকাল হলেও মনে হয় এ বই দুটো সব ঘরেই থাকা উচিত। তবুও দু-একটি কথা থেকে যায়। সুকুমার রায়ের অন্য কোন লেখা নেওয়া যেত না? দু-এক জন লেখককে পল্টানো যেত না?

বিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্য

ইব্‌লিসের আত্মদর্শন—পবিত্র মুখোপাধ্যায়। কবিপত্র প্রকাশ ভবন। কলিকাতা ২৬। মূল্য দুই টাকা।

"দর্পণে অনেক মুখ", "হেমন্তের সনেট", এমনকি "আগুনের বাসিন্দা" কাব্যগ্রন্থেও এক বিষাদাশ্রিত জীবনবোধ পবিত্রকে রোমান্টিকদের মতো সহনীয় দুঃখে জর্জর করে তুলেছে। কেবলমাত্র উজ্জ্বল ব্যতিক্রম "শবযাত্রা"। এই দীর্ঘ কবিতাটিতে আমরা লক্ষ্য করেছি পবিত্রর কবিতা রোমান্টিকভূমি থেকে যাত্রা করেছে ক্লাসিক পন্থায়। তাই "শবযাত্রা" রোমান্টিক হয়েও শেষ পর্যন্ত ক্লাসিকধর্মী। "শবযাত্রা"র অনেক পরবর্তীকালের কবিতাসমষ্টির সমাহার "আগুনের বাসিন্দা"। এতে তাঁর বেদনাবোধ ও অতীতচারিতা যেমন আমাদের মুগ্ধ করে, তেমনই এক ধ্রুপদী সত্তার দ্বন্দ্ব লক্ষ্য করেও আমরা খুশী হই। এই দুই বিপরীত দ্বন্দ্বেরই ফসল হয়তো "ইব্‌লিসের আত্মদর্শন"। এর বীজ অনেকদিন আগেই উপ্ত হয়েছিল "শবযাত্রা" কাব্যগ্রন্থটিতে।

'ইব্‌লিসের আত্মদর্শন'কে কোনো নামকরণে চিহ্নিত না করে উৎসর্গপত্রের উদ্ধৃতি অনুযায়ী বলা ভালো 'বিষাদলীন অনুভূতিমালা'। ইতিহাসের উত্তরাধিকার এবং প্রখর কালচেতনা যেমন এতে স্পষ্ট পদধ্বনি রেখে যায়, তেমনই সমগ্র সমাজনীতি, রাষ্ট্রীয় অনুশাসনের বন্ধন, অস্তিত্বের অসারতা এক তীব্র সংশয় আর সন্দেহে আন্দোলিত। পবিত্র এখানে ঠিক সংস্কারপন্থী কোনো প্রবক্তার ভূমিকা নেননি, অভিজ্ঞতায় জারিত তাঁর অস্থির অস্তিত্ব তাঁকে বিদ্রোহী করে তুলেছে, আশ্রয়ের নিবিড় পটভূমিতে অবলম্বনহীনতার দুঃখ তাঁকে বিষাদগ্রস্ত করেছে, কিন্তু চূড়ান্ত নির্বেদ নেমে আসার আগে, মৃত্যুকে 'কণ্ঠলগ্ন সবচেয়ে প্রিয় অনুভব' বলে মনে হলেও তিনি শেষ পর্যন্ত জীবনপলাতক হতে পারেন নি, গভীরতর এক বোধের তিমিরে ডুবে যাবার অঙ্গীকার করেছেন।

আলোচ্য কাব্যগ্রন্থটিতে কবির অস্তিত্ব-অনস্তিত্বের দ্বন্দ্ব কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। পূর্ববর্তী কাব্যগ্রন্থ 'আগুনের বাসিন্দা'র 'প্রকীর্ণ কবিতাবলী', 'বিষাদাশ্রিত কবিতা' ও 'আগুনের বাসিন্দা' অংশের অনেক কবিতাতেই আমরা তা লক্ষ্য করেছি। কিন্তু বর্তমান গ্রন্থে তাঁর বক্তব্যের ধার খুবই গুরুতর। তাঁর মূর্তি যেন এখানে অনেক বেশী ভগ্ন, নিঃশেষিত, জ্বলন্ত ও নিঃসঙ্গ। ফলত, জন্মলগ্নেই তাঁর মনে হয়, 'হাড়িকাঠে মাথা পেতে পড়ে আছি মরণ অবধি।' আঠাশ বছর এই দীর্ঘসময়ের সিঁড়ি ভাঙতে ভাঙতে দীর্ঘ সাতষট্টির শেষ গোধূলিতে তাঁর 'গোড়ালি কঠিনতর হতে হতে ক্ষুর হয়ে গেছে।' তাঁর স্বপ্ন ছিল 'মানুষের ইতিহাস অসংখ্য সূর্যের দেশে চলমানতার ইতিহাস হবে।' কিন্তু—'আমি শরশয্যায় শুয়েও/আজন্ম প্রতীক্ষা করে অবশেষে দেখি পথ সূর্যাস্তে মিশেছে/দেখি লোকোত্তর কোনো সম্ভাবনা প্রতিশ্রুতি মানুষের বুকে/নেই ছিটেফোঁটা।' ব্যথাহত, আশা-প্রবঞ্চিত তাঁর কাছে ইতিহাসের এই শিক্ষা রাত্রির অন্ধকার নিয়ে আসে। সেখানে সূর্য চিরকালের মতো রাহুগ্রস্ত। 'সূর্য দীর্ঘকাল ভুগে ভুগে অস্তাচলগামী/আঁধারই আশ্রয়।' তাঁর অভিজ্ঞতালব্ধ বিশ্বাস 'রাত্রি বর্তমান শতকের অনন্য নিয়তি।' নিয়তিনিগৃহীত কবি তাই দরজা-জানলাহীন এক অন্ধকূপে বসে আমৃত্যু নির্বাসন দণ্ড ভোগ করে যাচ্ছেন, মুক্তির কোনো পথই খোলা নেই, কেবল তাঁর বিদ্রোহী মনে জ্বলছে দশকোটি চিতা যা, 'নেবে না কখনো/নিবুবে না কোনোদিন/জন্ম হতে হৃৎপিণ্ডের তলে।' অত্যন্ত বিষাদলীন কণ্ঠে তাঁকে এই বলতে শুনি, 'সকলে হনন করে অন্ধকার/আমি/নিজেকে হনন করে অন্ধকার

হতে চেয়ে মুখ/বুকের উদ্যান করি ছিন্নভিন্ন ছোরার ফলায়/সূর্যকে সমাধি দিয়ে/ক্ষুধার্ত রাত্রির বুকে নিয়েছি আশ্রয়।'

কিন্তু সংশয় আর দ্বন্দ্বের প্রশ্ন সেখানেই যেখানে পরিত্রাণের প্রশ্ন। 'আমি কোথায় পালিয়ে পাবো পরিত্রাণ?'—পবিত্রকে একথাটিও তাই ভাবতে হয়েছে। কেননা স্বাধীন আত্মা নিষেধের লক্ষ পাকে বাঁধা। তাই তাঁর প্রশ্ন 'আমি কোন্‌দিকে যাবো?' কেননা, 'যে কোনো সূর্যের পথ রুদ্ধ করে/বিন্ধ্যপর্বতের স্থলচূড়া।' 'ঈশ্বরের সাম্রাজ্যের পরিখা প্রাচীর/সবখানে।' সময়ের গোপন নির্মাণে আমরা সকলেই যেন তাই সরীসৃপের মতো বুকে হেঁটে অস্তিত্ব বজায় রাখছি। পবিত্রর ধ্রুব বিশ্বাস, জন্মের অনেক আগেই নিয়ন্ত্রিত অদৃশ্য শৃঙ্খলে 'ভ্রূণের চারপাশে উঠছে লোহার প্রাচীর/পৃথিবীর ইচ্ছা তুমি/তোমার ইচ্ছার বুকে মন্দার পর্বত।' ক্রমশ অস্তিত্বের বিশ্বাস এভাবে ভেঙে যাচ্ছে, পরাজয় মেনে নিচ্ছে নিখিল নাস্তির কাছে। ফলত, আনন্দরূপ কোনো সত্তার সন্ধানে তিনি খুঁজে ফিরছেন 'বুকের তলায় কোনো অক্ষত সাম্রাজ্য আছে কিনা।' পরিবর্তে 'শাবলের মুখে বিঁধে উঠে আসে নোনাধরা মস্তিষ্কের খুলি/ক্ষয়িত পাঁজর, জানু গোড়ালির অস্থিসন্ধি/বুকের খাঁচার অবশেষ' ইত্যাদি। অক্ষম মানুষের দয়াহীন অসহায়তা কখনো পারে না আনন্দের তলানি এনে দিতে। তার দুই হাতেই যে গলিত কুষ্ঠের ব্যাধি। তাই 'কোনো প্রতিশ্রুতি নেই হাতের মুঠোয়/কোনো প্রতিশ্রুতি নিয়ে বোধিবৃক্ষ/শ্বেতচ্ছত্র ধরেনি শিয়রে।' ঈশ্বরের অলৌকিক দুয়ার বা মৃত্যুতে নয়, আর্তনাদেও নয়, প্রজ্ঞার আলোকে আহরিত বোধ আর চৈতন্যের শুদ্ধজাগরণের কাছেই আমাদের শেষপাঠ নিতে হবে। পরিণামে পবিত্র নিজেও এই ইঙ্গিত বেশ স্পষ্টাক্ষরে ব্যক্ত করেছেন 'আত্মসমর্পণের সান্ত্বনা। অন্ধেরই মানায়/আমি হাত পেতে সোনেরিল ট্যাবলেট নেব না। বিষে বা আফিমে শিরা উপশিরা মগজের ঘিলু/নিষ্ক্রিয় করার পর/রেজারেকসনের পুণ্যকাহিনী শুনবো না। চূড়ান্ত বোধের চুল্লি জেবলে রেখে রাত্রিদিন শরীর পোড়াবো।'

মৃণাল দত্ত

একাত্রিংশত্তম বর্ষ তৃতীয় সংখ্যা

চতুরঙ্গ

কার্তিক-পৌষ ১৩৭৬

হীরেন্দ্রনাথ দত্ত

দেবীপদ ভট্টাচার্য

রোজ খবরের কাগজ খুলে কত ব্যক্তির বা প্রতিষ্ঠানের শতবর্ষপূর্তি উৎসব পালনের সংবাদ পাই। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হীরেন্দ্রনাথ দত্তের ন্যায় বরণীয় বাঙালীর জন্মশতবর্ষপূর্তি উৎসব বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত হল না। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় যার পরিণত রূপ, সেই 'জাতীয় শিক্ষা পরিষৎ' তাঁর স্মরণসভা আহ্বান করেছিলেন। কিন্তু 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ' যার জন্মকাল থেকে হীরেন্দ্রনাথ আমৃত্যু নিবিড়ভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন, তাঁরা তাঁর স্মরণার্থে একটি সভার আয়োজন পর্যন্ত করেননি। অথচ উনবিংশ শতকের শেষপাদ থেকে বিংশ শতকের চার দশক অবধি হীরেন্দ্রনাথ বাংলাদেশের সর্বক্ষেত্রে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে রেখেছিলেন। লক্ষ্মী ও সরস্বতীর যুগ্ম আশীর্বাদ খুব কম লোকের ললাটকে স্পর্শ করে —হীরেন্দ্রনাথ সেই দুর্লভ সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন।

উত্তর কলকাতার বিখ্যাত কায়স্থ পরিবারে চোরবাগানের দত্ত বংশে ১৮৬৮ সালে ১৯ জানুয়ারি হীরেন্দ্রনাথের জন্ম। তাঁর বাবা দ্বারকানাথ দত্ত (মৃত্যু—১৮৮৮) বহুকাল ধরে কলকাতার নামকরা বিদেশী বণিক প্রতিষ্ঠান রেলি ব্রাদার্সের 'মুৎসুদ্দি' ছিলেন। তিনি প্রভূত অর্থ উপার্জন করেন এবং চোরবাগানের বাড়ি থেকে উঠে এসে হাতিবাগানে জমি কিনে নিজের বাড়ি তৈরী করান। দ্বারকানাথের চার ছেলে ধীরেন্দ্র, হীরেন্দ্র, অমরেন্দ্র ও বিজয়েন্দ্র। এ'দের মধ্যে হীরেন্দ্র ও অমরেন্দ্র সর্বজনপরিচিত, কিন্তু সম্পূর্ণ বিপরীত দিক থেকে। হীরেন্দ্রনাথ মেধাবী, বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতীছাত্র, চরিত্রবান, জ্ঞান-তাপস আর অমরেন্দ্রনাথ 'ক্লাসিক' রঙ্গমঞ্চের খ্যাতনামা অভিনেতা ও নাট্যকার, চরিত্রবলের অধিকারী তিনি ছিলেন না।

প্রাতঃস্মরণীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত মেট্রোপলিটন ইন্‌সটিট্যুশন থেকে ১৫ টাকার বৃত্তিসহ হীরেন্দ্রনাথ এন্‌ট্রান্‌স পরীক্ষা পাশ করেন। ১৮৮৮ সালে তিনি প্রেসিডেন্‌সি কলেজ থেকে ইংরেজি, সংস্কৃত ও দর্শনে প্রথম শ্রেণীর ট্রিপল অনার্স নিয়ে বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৮৮৯ সালে তিনি এম. এ. পরীক্ষায় ইংরেজিতে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করেন। ১৮৯১ সালে মাত্র ২৩ বছর বয়সে তিনি একাই

প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি লাভ করেন। আইন পরীক্ষায়ও তিনি সর্বোচ্চস্থান লাভ করেছিলেন। অতএব দেখা যাচ্ছে দুশ্চর সাধনায় সরস্বতীর শ্বেতকমল তাঁর করতলগত হয়েছিল। পরবর্তীকালে আইন ব্যবসায়ে লিপ্ত হলেও জ্ঞানসমুদ্রে অবগাহন ছিল তাঁর নিত্যকর্ম।

ছাত্রজীবনে অর্থাৎ এনট্রান্স পরীক্ষার কিছু পরে ১৮৮৫ সালে ১৭ বৎসর বয়সে হীরেন্দ্রনাথের বিবাহ হয় পটলডাঙ্গার বিখ্যাত বসুমল্লিক বংশের প্রবোধচন্দ্রের একমাত্র কন্যা ইন্দুমতীর সঙ্গে। হীরেন্দ্রনাথের চার ছেলে ও চার মেয়ে। তাঁর দ্বিতীয় সন্তান কবি-সমালোচক সুধীন্দ্রনাথ ১৯০১ সালে অক্টোবর মাসে জন্মলাভ করেন। ১৮৯৪ সালে ছাব্বিশ বছর বয়সে হীরেন্দ্রনাথ কলকাতা হাইকোর্টে সলিসিটররূপে যোগদান করেন ও 'এইচ. এন. দত্ত এন্ড কোং' নামে নিজের সলিসিটর-ফার্ম প্রতিষ্ঠা করেন। আইন ব্যবসায়ে তাঁর খ্যাতি সম্পর্কে স্যর রাসবিহারী ঘোষের মতো আইনজীবীও বলতেন "হীরেন দেখছে, আমার আর দেখবার দরকার নেই।" (ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, 'হীরেন্দ্রনাথ দত্ত', পরিচয়, অগ্রহায়ণ ১৩৪৯)।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, জাতীয় শিক্ষা পরিষৎ ও শান্তিনিকেতন-বিশ্বভারতী এই তিনটি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে হীরেন্দ্রনাথ আমরণ ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। এই যোগের মূল কারণ তাঁর অকৃত্রিম স্বদেশপ্রীতি। স্বদেশানুরাগ তথা স্বদেশগর্ব তাঁকে প্রেরণা দেয় সংস্কৃত চর্চায়, বেদান্ত অধ্যয়নে, থিয়সফি অনুশীলনে, বারাণসীতে সেনট্রাল হিন্দু কলেজ স্থাপনে অকুণ্ঠ সহযোগিতায়।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ-এর প্রথমে নাম ছিল Bengal Academy of Literature এবং এর প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন তখনকার রাজস্ব বিভাগের একজন ফরাসী কর্মচারী লিওটার্ড। শোভাবাজারের রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেবের ভবনে এই সমিতি প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়। উমেশচন্দ্র বটব্যালের (১৮৫২-৯৮) পরামর্শে ১৮৯৪ সালে ইংরেজি নামের পরিবর্তে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ নাম হয়। হীরেন্দ্রনাথ ১৮৯৩ সালে ২৩ জুলাই তারিখে Bengal Academy of Literature প্রতিষ্ঠার সময় থেকে তাঁর মৃত্যুকাল ১৯৪২ সাল অবধি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সর্বতোভাবে যুক্ত ছিলেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সেবা করাকে স্বদেশসেবা বলেই সেকালের শিক্ষিত বাঙালী সমাজের বৃহদংশ মনে করতেন। হীরেন্দ্রনাথ নিজের বুদ্ধি, শ্রম ও অর্থ দ্বারা বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির এই পীঠভূমিকে সংরক্ষণ ও সংবর্ধন করেন। কৃত্তিবাসী রামায়ণের 'আদি' ও 'উত্তরাকান্ড' সম্পাদন করে তিনি সাহিত্য পরিষৎ থেকে প্রকাশ করেন। নোবেল প্রাইজ প্রাপ্তির পূর্বে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ যে রবীন্দ্র-সংবর্ধনার আয়োজন করেন তার অন্যতম প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন হীরেন্দ্রনাথ।

'জাতীয় শিক্ষা পরিষৎ' (ন্যাশনাল কাউনসিল অব এডুকেশন) গঠিত হয় মূলত বঙ্গভঙ্গ বা 'স্বদেশী' আন্দোলনের ফলে। ১৯০৫ সালে ২২শে অক্টোবর তারিখে 'স্টেট্‌স্‌ম্যান্' পত্রিকায় এই তথ্য প্রকাশিত হয় যে কার্‌লাইল সার্‌কুলার জেলার ম্যাজিস্ট্রেট এবং কলেজ ও স্কুল কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরিত হয়েছে। ঐ সার্‌কুলারে ছাত্রদের কোনো রকম রাজনৈতিক কার্যকলাপে যোগদান নিষিদ্ধ হয়। তার ফলে অ্যান্টি-সার্‌কুলার সোসাইটি

গঠিত হয় ও দেশব্যাপী তীব্র আলোড়ন দেখা দেয়। কার্জনের বঙ্গবিভাগ প্রস্তাবের বিরুদ্ধে আন্দোলন ১৯০৩ সালের ডিসেম্বর থেকেই শুরু হয়। ১৯০৫ সালে ঐ আন্দোলন ব্যাপক রূপগ্রহণ করে।

এই সূত্রে আচার্য সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের (১৮৬৫-১৯৪৮) প্রতিষ্ঠিত 'ডন সোসাইটি'র (প্রতিষ্ঠাবর্ষ ১৯০২) ভূমিকাও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। জ্ঞানার্জন, দেশসেবা ও উচ্চমানের নৈতিক চরিত্রগঠন—'ডন সোসাইটি'র সভ্যদের মুখ্য আদর্শ ছিল। 'জাতীয় শিক্ষা'র কথা দেশে সেদিন অনেকেই ভাবছিলেন, বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলন সেই 'জাতীয় শিক্ষা'র দাবিকে জোরদার করে তুলল। কার্লাইল ও পেড্লারের সার্কুলার জ্বলন্ত অগ্নিতে যেন ঘৃতাহুতি দিল। ১৯০৫ সালের ৯ নভেম্বর তারিখে পান্তির মাঠে (ফিল্ড অ্যান্ড অ্যাকাডেমির মাঠও বলা হত) অনুষ্ঠিত বিরাট জনসভায় পটলডাঙার বসুমল্লিক বংশের সুবোধচন্দ্র ঘোষণা করেন যে জাতীয় শিক্ষাসত্রে তিনি এক লক্ষ টাকা দান করবেন। দেশবাসী সেই মুহূর্তে তাঁকে 'রাজা' উপাধিতে ভূষিত করে। বিবাহসূত্রে হীরেন্দ্রনাথ এই পরিবারের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন, এখন স্বদেশসেবায় তিনি হেমচন্দ্র ও সুবোধচন্দ্রের সহকর্মী হলেন। এই সভায় হীরেন্দ্রনাথ 'কার্লাইল সার্কুলার'-এর বিপক্ষে ও 'জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়' স্থাপনের পক্ষে ওজস্বিনী বক্তৃতা করেন। ১২ নভেম্বর তারিখে 'ডন সোসাইটি'র ছাত্রসভায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বক্তৃতা করেন। বক্তৃতাপ্রসঙ্গে হীরেন্দ্রনাথ বলেন,

> "কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় একরকম গোলাম তৈয়ারী করিবার কারখানা। দিন দিন সেখানে যে সকল বিধিব্যবস্থা প্রবর্তিত হইতেছে তাহা আমাদের মনুষ্যত্বলাভের বা জাতীয় ভাব উন্মেষের পক্ষে অনুকূল নহে। ছাত্রসমাজ অটল থাকিলে এবার জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের খুব সম্ভাবনা আছে। যদি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়, তবে তিনি ওকালতী ব্যবসা পরিত্যাগ করিয়া তাহাতে অধ্যাপনা করিতে প্রস্তুত আছেন।" (ভান্ডার, অগ্রহায়ণ ১৩১২)

এই আন্দোলনের ফলে স্যার আশুতোষ চৌধুরী (১৮৬০-১৯২৪) বাংলাদেশের গণ্যমান্য ব্যক্তিগণের কাছে চিঠি লেখেন একটি সম্মেলনে মিলিত হয়ে 'জাতীয় শিক্ষা পরিষৎ' গঠনের জন্য। আশুতোষ চৌধুরী মহাশয়কে এই আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত করেছিলেন হীরেন্দ্রনাথ। আশুতোষের এই আহ্বানে ১৬ নভেম্বর তারিখে (১৯০৫) পার্ক স্ট্রীটস্থ বেঙ্গল ল্যান্ডহোল্ডার্স অ্যাসোসিয়েশন অফিসে বাংলাদেশের খ্যাতনামা ব্যক্তিবর্গ মিলিত হয়ে 'জাতীয় শিক্ষা পরিষৎ' গঠন করেন। স্থির হয়, সাহিত্য, বিজ্ঞান ও যন্ত্রশিল্প এই তিন ধারায় শিক্ষাকার্য পরিচালিত হবে 'on National lines and under National control'. এই পরিকল্পনা কার্যে পরিণত করবার জন্য যে অস্থায়ী কমিটি গঠিত হয় তার মধ্যে হীরেন্দ্রনাথ ছিলেন। সেই জন্মমুহূর্ত থেকে হীরেন্দ্রনাথ 'জাতীয় শিক্ষা পরিষৎ'কে আড়াইশো টাকা করে মাসিক আর্থিক সহায়তা দান করেছেন। তিনি এই প্রতিষ্ঠানকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। শিক্ষা পরিষদের চরম অর্থ-সংকটের কালে তাঁরই চেষ্টায় স্যার রাসবিহারী ঘোষের উইল থেকে চোদ্দ লক্ষ টাকা পাওয়া সম্ভব হয়।

৩

শান্তিনিকেতন-বিশ্বভারতীর সঙ্গেও তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের প্রতিষ্ঠা ও তার পরবর্তী কার্যসূত্রে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। রবীন্দ্রনাথ বিংশ শতকের সূচনায় বোলপুরে শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্য আশ্রম বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন (১৯০১)। প্রাচীন ভারতের গুরুগৃহশিক্ষা, ব্রহ্মচর্যাশ্রম যাপন রবীন্দ্রনাথকে বিশেষ-ভাবে প্রভাবিত করেছিল। প্রাচীন ভারতকে রবীন্দ্রনাথ যে-ভাবে উপলব্ধি করেছিলেন, সেই আদর্শেই তিনি তাঁর আশ্রম বিদ্যালয়কে গড়ে তোলেন। আর্যসমাজের স্বামী দয়ানন্দ তাঁর 'গুরুকুল আশ্রম-বিদ্যালয়'কে অনুরূপভাবে গড়ে তুলবার প্রয়াসী হন। ভারতে থিয়সফি আন্দোলনের নেত্রী অ্যানি বেসান্ত বারাণসীতে যে সেন্ট্রাল হিন্দু কলেজ স্থাপন করেন (প্রতিষ্ঠাবর্ষ ১৮৯৭) তারও আদর্শ ছিল প্রাচীন ভারতের অনুধ্যানের সঙ্গে "to inculcate high ideals of religion, morality, patriotism and public duty". সরকারের কাছ থেকে এই বিদ্যায়তন কোনও আর্থিক সহায়তা লাভ করেনি। হীরেন্দ্রনাথ এই বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাকাল থেকে যুক্ত ছিলেন, তাঁর বড়ো ও মেজো ছেলে সুধীন্দ্র ও হরীন্দ্রকে সেখানে শিক্ষার্থী রূপে প্রেরণ করেন। পরে এই বিদ্যালয় পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যজী প্রতিষ্ঠিত বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত হয়।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিদ্যালয় স্থাপনের অব্যবহিত পরে আর্থিক সংকটের সম্মুখীন হন। তাঁর সহধর্মিণীর মৃত্যুর পর হীরেন্দ্রনাথকে রবীন্দ্রনাথ এক পত্রে একটি আশ্রমবালকের বাৎসরিক ব্যয়ভার বহন করতে (অর্থাৎ দেড়শো টাকা দান করতে) অনুরোধ করেন এবং হীরেন্দ্রনাথ সানন্দে সে অনুরোধ রক্ষা করেন। ব্রহ্মচর্যাশ্রম পরিচালনা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ হীরেন্দ্রনাথকে লেখেন:

> "...যথার্থভাবে পরামর্শ দিবার লোক অতি অল্পই আছে। আপনার দেশানুরাগ ও বিবেচনাশক্তির উপর আমার আন্তরিক নির্ভর আছে বলিয়াই আপনাকে সহায় পাইবার জন্য আমি ব্যগ্র হইয়াছি।..." [অপ্রকাশিত পত্র থেকে উদ্‌ধৃত]

পরবর্তীকালে যখন রবীন্দ্রনাথ 'বিশ্বভারতী' প্রতিষ্ঠার সংকল্প করেন (১৯২১) পূর্ব-পশ্চিমের মিলনসাধনার বেদীরচনার জন্য, তখনও হীরেন্দ্রনাথের সহায়তা গ্রহণ করেন। 'বিশ্বভারতী'র ট্রাস্ট ডীডের ড্রাফট তাঁরই করা। ঐ দলিলে স্বাক্ষর করেন তিন জন— রবীন্দ্রনাথ, নীলরতন সরকার ও হীরেন্দ্রনাথ দত্ত (১৬ মে, ১৯২২)। বোর্ড অব ট্রাস্টিজ্ বা 'ন্যাসিক সভা'র Representative Trustees হিসাবে নাম পাই—নীলরতন সরকার, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এবং প্রমথ চৌধুরীর। হীরেন্দ্রনাথ মৃত্যুকাল পর্যন্ত বিশ্বভারতীর সেবা করেছেন।

৪

জাতীয় কংগ্রেসের (প্রতিষ্ঠাবর্ষ ১৮৮৫) সঙ্গে হীরেন্দ্রনাথ ১৯২০ সাল পর্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। কিন্তু অ্যানি বেসান্ত যখন কংগ্রেস ত্যাগ করেন হীরেন্দ্রনাথও তখন সরে আসেন। ১৯২১ সাল থেকে গান্ধীজীর নেতৃত্বে যে অসহযোগ-আন্দোলন আরম্ভ হয়, হীরেন্দ্রনাথের ন্যায় মডারেট-পন্থীরা স্বভাবতই সে-আন্দোলনে যোগ দিতে চাননি।

না দিলেও তাঁর দেশপ্রেমে কোনো খাদ ছিল না। পরবর্তীকালে তিনি মালব্যজীর মতো হিন্দু মহাসভার দিকে এগিয়ে যান। সেজন্য তিনি সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদের (Communal Award) ঘোর বিরোধী ছিলেন। শ্রীমতী বেসান্ত-এর প্রসঙ্গে থিয়সফি-আন্দোলনের কথা অনিবার্যভাবে এসে এড়ে। হীরেন্দ্রনাথ শ্রীমতী বেসান্তকে "Mother" বলে সম্বোধন করতেন। ১৮৯৪ সালে ১১ জানুয়ারি কলকাতা টাউন হলে থিয়সফিক্যাল সোসাইটির এক সভা হয় শ্রীমতী বেসান্তের সভানেত্রীত্বে। থিয়সফি-আন্দোলনের মাদাম ব্লাভাস্কির (১৮২১-৯১) সহকর্মী কর্নেল অলকট (১৮৩২-১৯০৭) ঐ সভায় উপস্থিত ছিলেন, হীরেন্দ্রনাথও ছিলেন। হীরেন্দ্রনাথ এর পর থিয়সফিস্ট আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হন। থিয়সফি-সংক্রান্ত রচনা তাঁর বিখ্যাত বই 'Theosophical Gleanings' (১৯৩৮) গ্রন্থে আছে। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তিনি এই প্রতিষ্ঠানের নানা দায়িত্বশীল পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

হীরেন্দ্রনাথ শুধু বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এক কর্মযোগী ছিলেন—এই পরিচয় তাঁর চরিত্রের একটি দিক। বেদান্ত ও বৈষ্ণব দর্শনচর্চায়, তুলনামূলক দর্শন-জিজ্ঞাসায় তাঁর দান শিরোধার্য। সংস্কৃত, পাশ্চাত্ত্য সাহিত্য ও মাতৃভাষায় রচিত সাহিত্যে তাঁর অনুরাগ ও অনুপ্রবেশ বিস্ময়কর। তাঁর 'কালিদাস ও সেক্সপীয়র' প্রবন্ধটি যৌবনের রচনা, তুলনামূলক সাহিত্য সমালোচনার দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর পিতৃদেবের পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যচিন্তা সম্পর্কে লিখেছেন:

> "তাঁর কাছে সেক্সপীয়র পাঠ আমার কৈশোরের এক অবিস্মরণীয় অভিজ্ঞতা, এবং তাঁর ব্যাখ্যা শুনে 'দি এন্সেন্ট ম্যারিনার'কে বারো বছর বয়সে কাব্যের যথার্থ নির্যাস বলে মনে হয়েছিল। স্বভাবতই উত্তর-ভিক্টোরীয়দের প্রতি আমার তুলনায় ছিলেন নিরুত্তাপ; বার্নাড শ'র বিদ্রূপে সায় না দিয়ে বরং শ'কেই বিদ্রূপ করতেন। তবু আজ থেকে অনেক বছর আগেই তিনি আমাকে জানিয়েছিলেন যে ইবসেনের আসন প্রকৃত বিদ্রোহীদের মধ্যে নয়। 'দি গোস্টস্' অথবা 'দি ওয়াইল্ড ডাক'কে তিনি ধ্রুপদী নাটক বলে গণ্য করতেন, কারণ তাদের কাহিনী এমন এক ট্র্যাজিডি থেকে উদ্ভূত যা নিয়তির পুতুলখেলায় যবনিকা ওঠার অনেক আগেই সংঘটিত হয়েছে।"

এই মন্তব্যগুলি হীরেন্দ্রনাথের পাশ্চাত্ত্য সাহিত্য সম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গিকে আমাদের কাছে স্পষ্ট করে তোলে এবং তাঁর সম্পর্কে অনেক ভ্রান্ত ধারণার নিরসন ঘটায়। এই প্রসঙ্গে আরেকটি দিকের কথা বলা দরকার। হীরেন্দ্রনাথ সাহিত্যপাঠে ও আলোচনায় কীরকম মুক্তদৃষ্টি ছিলেন তার উল্লেখ করেছেন তাঁর মেজো ছেলে হরীন্দ্রনাথ:

> "কাশীতে বিশেষভাবে সংস্কৃত শিক্ষা করবার পরও বাবা নিজে পরবর্তীকালে কালিদাস পড়িয়েছেন। হরিচরণ কাব্যতীর্থের কাছে দীর্ঘদিন দাদা কাব্য-অলঙ্কার পড়েছেন এবং বাবার নির্দেশ ছিল যে সিলেবাস বহির্ভূত হলেও কোন আদিরসাত্মক পংক্তি যেন পড়বার সময় পণ্ডিতমশায় বাদ না দেন। শিক্ষা সম্বন্ধে এমন মুক্ত ধারণা থাকায় আমাদের পড়াশুনো খুব সুস্থ আবহাওয়ায় চলেছিল।" (উত্তরসূরী, শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৬৭)

অনেকের হয়তো জানা নেই হীরেন্দ্রনাথ এক সময় কবিতা লিখতেন। সনেটে তাঁর হাত ভালো ছিল। একটি সনেট সেজন্য উদ্ধৃত করবার প্রয়োজন বোধ করছি:

কালিদাস

কল্পনা! জাগিয়া কিবা দেখিনু স্বপন!
নক্ষত্রখচিত নীল, লক্ষ্মী পূর্ণিমার
অনন্ত আকাশ তলে, চিরসুকুমার,
অনন্ত মাধুরীময় ত্রিদিব-ভুবন!
ফুটিয়া ঝরে না সেথা কুসুমরতন,
কোকিল কুহরি গাহে নিত্যনবতান,
তটিনী উছলি ধায় তুলিয়া সুতান,
শোভে চিরবসন্তের মঞ্জু কুঞ্জবন!
সুরভিত বহে বায়ু মধুরে স্বনিয়া!
পদ্মযোনি যেন—ফুল্ল-কমল-আসনে,
এ শোভা ভুবন মাঝে, পুরুষ বসিয়া
গড়িছে সুন্দর বিশ্ব—প্রতিভা নয়নে
মহান্ মহিমা সিন্ধু উথলে বয়নে—
সৌন্দর্যের পরমাণু চুনিয়া চুনিয়া॥ (জন্মভূমি, বৈশাখ ১৩০০)

নিরামিষাহারী, নিরহংকার, বৈষ্ণবচরিত্র হীরেন্দ্রনাথ ছিলেন একজন খাঁটি সংস্কৃতিমান বা কাল্‌চার্ড ব্যক্তি। ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এ-প্রসঙ্গে লিখেছেন—

"যে cool wisdom না হলে কালচার আসে না, হীরেনবাবুর মধ্যে, তাঁর প্রত্যেক ব্যবহারে এই cool wisdom ছিল, তাঁর রচনায়, তাঁর বক্তৃতায় ও তাঁর আচরণে।"
(পরিচয়, অগ্রহায়ণ ১৩৪১)

অতুলচন্দ্র গুপ্ত হীরেন্দ্রনাথের তিরোধানের পর লিখেছিলেন—

"Hiren Babu's death has made me realise clearly that the Bengal of our time is coming to an end. He played no small part in creating the new Bengal of the Swadeshi days. In Hiren Babu one found the combination of thought and action necessary for the India of the future." (*Visva-Bharati Bulletin,* Oct. 1942).

তাঁর জীবন, কর্ম ও চিন্তাধারা থেকে দেখা যাবে এই উক্তি অতিশয়োক্তি নয়।

রিচ্যুআল

অ মজুমদার

তিনজনে তিন কোণ আর অশোক

আর ঠিক সেজন্যই চতুষ্কোণ নয় কারণ অশোক একা আর নিচে

আর এখনই তা জানা গেলো যেমন অশোককে কফি দিতে গেলো উর্মিলা আর ডেকে আনতেও।

ঠিক তিনজনই বিকাশ উর্মিলা শর্মিলা আর তিনজনেই আছে কারণ ঘরটাও উর্মিলার সাজানো হয়তো ছিলো নিজের হাতে নয় বা কিন্তু ডিজাইনটা আর তা সবেই স্ত্রীআচার আর বাসরঘরই বটে এবং মডার্নও যেমন গায়নোকোলজিস্টকে বললে উর্মিলা আমার আরও আগেই এমনকি আমেরিকাতেও কোত্রভুদের মধ্যে মডার্নই শর্মিলার তবু উনিশ হলো।

এবং দুধরঙের জমিতে এখানে ওখানে সোচারবুটি সোনার দাঁতের নিচে চওড়া লাল পাড় যেমন শান্তিপুরীর হাতে পারে আর যখন সে পাড় খসে খসে মুক্তোর চিরুনি খোঁপায় যদিও হয়তো উর্মিলা বলবে সে কি! আর ডবল অবাক হবে বা।

সোফাটার উপরে শর্মিলা ধীরে ধীরে উঠে বসলো। তার নিজের নখগুলোতে চোখ পড়লো যার রং গোলাপী। অবশ্য এখনই অত ধীরে ধীরে উঠে বসার কোন যুক্তিই নেই উর্মিলাই বলেছে। যেমন এই কষ্টের কথাই ধরো, শর্মিলার মুখ সাদা হ'তে হ'তে টাল সামলে নিলো, এখন আর নেই।

দেয়ালটা ঘি রঙের। নতুবা একটা সাদা দুপুর যেন ঘর জুড়ে স্তব্ধ হয়ে আছে। আর এটা স্তব্ধ দুপুরই যদিও সাদা কিন্তু পাখীর ডানা নয়—অনেক দূর ছড়ানো ঢেকে দেয় এমন পাখীর ডানা। আর, না, এখন আর নেই, কিন্তু তখন মনে হয়েছিলো এই সব শেষ।

সেখানাও বেনারসীই ছিলো, আর তা মাত্র বিশেষ অর্ডার দিলেই হতে পারে। কাছে থেকেও বোঝা যায় না, এখন যাচ্ছে যে অর্ডার না দিয়ে হয়নি, যদিও তখন শর্মিলা সব সময়ে সঙ্গে থাকলেও জানা যায় নি যে কখন অর্ডারটা দেয়া হয়েছিলো যদিও শর্মিলার জানা ছিলো নিজেরখানা ঠিক কি ডিজাইনের হবে।

হয়তো কথাটা রহস্যজনক, কিন্তু পাশে একটু বসেই হাতের উপরে হাত রেখে বললো, বিকাশও এসেছে, পার্ক করছে; অশোককেও দেখলুম রাস্তা পার হবার জন্য বাড়ির দিকে মুখ করে ও ফুটপাতে; এটা কিছুই নয়, সব মেয়েরই হয়ে থাকে। হয়তো কথাটা রহস্যজনক। এ কষ্টের আগামাথা সবই জানে উর্মিলা আর সে যে জানে তা শর্মিলা জানতো না। যেমন উর্মিলার চুল বাঁধার ব্যাপারটা। কাছে থেকেও বোঝা যায় না কখন সেটা নিমেষে একটা খোঁপা হয়ে উঠলো এমন যে শর্মিলা সামনে থেকেও চুলে চিরুনির টান টান দেখতে দেখতেও ধরতে পারে না। যেন রহস্যই নতুবা যেন না-ভেবে কেনা অন্য অনেক সাদামাটা শাড়িও অমন মানায় কি করে?

শর্মিলার এ শাড়িটা অবশ্য সবুজ আর সিফনের আর পাটভাঙাও বটে আর ল্যাপটানো ঘুমের ঘোরে।

আর ঠানদিদি বলেছিলো,—মল নেই কেন?

ঊর্মিলা বললো,—বিয়ে যে মেয়ের—

ঠানদিদি বললো,—আমার মেয়েকেই তা বেশী মনে হচ্ছে।

ঊর্মিলা হাসলো আর বললো,—মরণ তোমার ছোটকাকী

আর বেনারসীর ঘোমটা খসে খসে সোনার চিরুনিও খোঁপার। আর সে সবই ছিলো স্ত্রীআচার, আর ঠানদিদিও তা বলেছিলো। ঝিরঝির করে হেসেছিলো সে।

দোতলা থেকে নেমে গিয়ে গিয়ে একতলার ঘর, ছাতে আর দোতলায় নিমন্ত্রণের ভিড়, আলোটা মৃদু এবং রঙীনও, সেটাই বাসরঘর।

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দুপুরের এই মাদা রঙটা হয়তো সত্য নয়। শর্মিলা হাই তুললো বাঁ হাতের পিছন দিকটা মুখের সামনে রেখে। হাতে হাত রেখেই বুঝেছিলো ঊর্মিলা আর বলেছিলো এই ছোট্ট সাদা শাড়িটা, এতেই হবে। আর শাড়িটাও ঊর্মিলাই এনেছিলো তার সে রং-চটা চামড়ার ব্যাগেই। অবশ্য এই আদ্দির সেমিজটাও হয়তো ঊর্মিলারই যা এখন তার গায়ে। আর এখন কষ্টও নেই।

আর লজ্জারও নয়। ক্লিনিকের গায়কোনলজিস্ট হয়তো পুরুষ, কিন্তু তুমিই সব চাইতে মূল্যবান। আর এটা মারজিন্যাল কেস্। হয়তো হয়তো শেষ পর্যন্ত গায়কোন-লজিস্ট—আর তা হলেও, আজই জানা যাবে, ছটা বাজতেই অ্যাম্বুলেন্স আসবে, তা হলেও সাদা উজ্জ্বল আলোর নিচেই টেবল, আর কষ্টবোধ তখন থাকে না, আর নতুবা এতো রোগ নয়, ঝিরঝির করে হেসেছিলো ঊর্মিলা, পাথরের দরজা, শ্বেতপাথরের দরজাই যেন বুঝেছো? আর একটু জল খাও।

আর তারপরেই ঘুমিয়ে পড়েছিলো সে নিজে, শর্মিলা।

দুপুরটা প্রকৃতপক্ষে, না, শর্মিলা বুঝলো, এটা, হাত মুঠ করলো সে শক্ত করে, না, এটা কষ্ট নয় আগে যেমন হয়েছিলো। তখন বরং জলই চোখে আর ভয়ও, দুপুরটার রঙ তো আর মাদা হয় না, বরং অনেকক্ষণ পরে আবার যেন শ্লোগান দেবে কিংবা আড়মোড়া ভাঙলো হাই তুলে।

বরং হাই তুললো শর্মিলা আর হাসলো।

অবশ্য এ দুপুরে তেমন শক্ত আলো নয় যা একটা শ্বেতপাথরের টেবলে পড়তে পারে, তা হলে সোফার ছিটটায় তুলোর পাতা আর তুলোর ফল আঁকা যদিও লতানে ভাবটা আমদানি করা, ঘি রঙের জমিতে মেটে রঙের তুলোর পাতা আর ফল আর মাঝে মাঝে সবুজ রঙের পাঁচ-সাতটি করে সমান্তরাল—

প্রকৃতপক্ষে অনেকটা সময় ঘুমিয়েছে সে।

আর কফির কাপটাও দেখো, খুবই পরিচিত, আর ছোট, না এটা শর্মিলার নিজের সংসারের, অর্থাৎ তার এই অ্যাপার্টমেন্টের, বিকাশ আর তার নতুন সংসারের নয়। তা হলে অবশ্য ঊর্মিলাই এনেছে এবং তা হলে সেই রঙ-চটা চামড়ার সুটকেসেই যার মধ্যেই তার এখনকার গায়ে আদ্দির সেমিজটাও এসেছে।

বরং হাই তুললো শর্মিলা আর হাসলো। কফির কাপটা টেনে নিলো সোফার উপরেই নামালো, টিপয়ে নয়।

কফির কাপটা তুলে নিলো সে আর তার উপর দিয়ে কানা ঘেঁষে চেয়ে দেখলো, হ্যাঁ এঘরের অন্য সোফাগুলো টিপয় সবই কোণের দিকে জড়ো করে রাখা যেখানে বড় ড্রেসিং

টেবলটা—খালি খুবই খালি ঘরটা। কিন্তু স্তব্ধ হলেও দপ্তরটা তো সাদা হয় না, আর তা ছাড়া রংও আছে, যেমন, ওটা ঘুমের আবেশই, ওষুধের ঘুম, যেমন দরজার সামনের পর্দাটা। কালচে লাল নাইলন ক্রেপের। আর এখন মনে পড়ছে উর্মিলা কফির কাপ নিয়ে আসতেই পর্দাটা দুলেছিলো আর তখনই রংটাও চোখে এসে থাকবে।

কফিতে চুমুক দিলো শর্মিলা। আর ভয়ই বা কি, উর্মিলা বলেছে, হয়তো একবার শ্লোগান দেবে। হাসলো শর্মিলা আপন মনে আর ঠোঁট ডুবিয়ে নিলো কফিতে।

হ্যাঁ রংও, নীল যেমন ছিলো উর্মিলার সিফন শাড়ি।

অবশ্য শ্লোগান কথাটা তার নিজেরই আবিষ্কার (এখন সে বেশ স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছে রঙ) আর তাতে তার অধিকারও আছে কেউ যদি ক্ষুদে ক্ষুদে হাত মাথার উপরে তুলে তুলে সে রকম করছে বলে সে অনুভব করে তার নিজের শরীরের মধ্যে।

হাসলো সে।

আর সে নিজেই সাহস করে বিকাশের হাত নিজের হাতে নিয়ে নিজের নাভির কাছে রেখেছিলো। বিকাশ হয়তো কিছু ভাবতে যাচ্ছিলো তার এই সাহসিকতার ভঙ্গিতে কিন্তু সে শক্ খেয়ে চমকে উঠেছিলো আর সে, শর্মিলা, বলেছিলো, কেমন মনে হয় না শ্লোগান দেয়া?

এটা সাহসের ব্যাপারই। অথচ তখন বরং হঠাৎ সাহস চলে যাওয়াতেই মনে হয়েছিলো টেলিফোনের ছোট টেবলটাতেও পোঁছাতে পারবে না। না জানা থেকেই ভয়। এটা মারজিন্যাল কেস্, উর্মিলা যেমন বলেছে, হয়তো, হয়তো স্বাভাবিকভাবেই যাকে উর্মিলা শ্বেতপাথরের দরজা বলেছে, আর নতুবা অ্যাপেনডিক্স অপারেশনের চাইতে সহজ।

কফির কাপটা ঠোঁটে তুললো শর্মিলা। না, এখন আর সে ঘামছে না কথাটা যদিও মনের উপর দিয়ে আবার খেলে গেলো। কফির কাপটা নামিয়ে রেখে সে আঁচলে কপাল মুছলো। টেলিফোনের ছোট টেবলটাও দেখো ড্রেসিং টেবলের পাশে সরানো। আর তার মানে এই হয় সবই সরিয়ে রাখা হয়েছে যেন ঘরের মেঝেকে খালি করা হয়েছে, আর তা হলে সে অনেকক্ষণ ঘুমিয়েছে, টেলিফোন করার পর থেকেই, আর বিকেলে কোন সময়ে অ্যাম্বুলেন্স আসবার কথা।

হ্যাঁ, হাতে একটু হাত রেখেই বুঝতে পেরেছিলো উর্মিলা আর বলেছিলো এই বড়িটা খাও, আর বিকাশকেও দেখলুম গাড়ি পার্ক করতে আর অশোককেও। আ অশোক!

একটু হাসলো শর্মিলা। য়েটস্ তোমার প্রিয় কবি তা হয়তো তোমার অধ্যাপকের জন্য, অশোক। কিন্তু সেটা হয়তো সারসই ছিলো তেমন লম্বা কেঠো কেঠো পা আর তেমন সাদা লম্বা ডানা যাতে একটা শরীরের লজ্জা ঢেকে যায় যদিও তুমি এবং য়েটস্ হয়তো ভাবতে ভালোবাসো তা ছিলো এক রাজহংস।

কিন্তু একটু অবাক হলো শর্মিলা। আর তার মুখটা ফ্যাকাসে দেখালো। নড়ছে না আদৌ আর তা অনেকক্ষণ থেকে, অনেকক্ষণ থেকে। সেও ঘুমিয়ে পড়েছে নাকি?

কফির কাপটা নামিয়ে ছবির বইটা হাতে নিলো শর্মিলা আর বইটা খুলে কফির কাপটা আবার মুখে তুললো।

অবশ্য, এই বাকিটুকু খাও, আর ভয়েরও কিছু নেই, বেশ ভালো আছো তুমি যাকে এ অবস্থায় মেয়েদের ভালো থাকা বলে। বললো উর্মিলা আর একটু হেঁট হয়ে সে কফির কাপটা রাখলো শর্মিলার পাশে সোফাকেই। কাপটাও ছোট। এদিক-ওদিক তাকালো সে।

এ-ঘরের আসবাব সবই ড্রেসিং টেবলটার পাশে জড়ো করা। আর টেবলে ওটা, (ও আচ্ছা!) কেউ এনেছে, কার্ডবোর্ডের বাক্স যেমন বেনারসী বিক্রি হয়। যেন তার বিয়ের সাম্বৎসরিকই আর আজই তা! যদিবা সে দিনটাও খুব কাছাকাছি বটে।

আর সোজা হয়ে দাঁড়ালো উর্মিলা তখন দ্বিতীয় কফির কাপটা নিয়ে। আর তখন দেখা গেলো। আর স্তূপ নাকি শব্দটা? আর সোজা হয়ে দাঁড়ালো উর্মিলা, বললোও, সিঁড়ির ঘরেই তোমাদের ঘরটায় বসে আছে অশোক। একেবারেই অনভিজ্ঞ তো। জড়সড়ো আর তা ভয়েও হতে পারে। তোমার নিজেরও আর ভয় করছে না তো? দেখবে তা নয়। তোমার তবু উনিশ হলো। চলে যেতে যেতে দরজার কাছে থেমেছিলো উর্মিলা তখন। তোমার তবু আমার তুমি বরং একটু আগেই। আমেরিকাতেও আজকাল, জানো, সুতরাং একে মডার্নও বলা যায়। আর হ্যাঁ, বলি তোমাকে, এখন বোধ হয় একেবারেই নড়বে না লক্ষ্য করো। বরং গুটিয়ে আর জড়সড় হয়ে বরং নিচেতে, দেখো। আর উর্মিলা হাসলো তখন।

উর্মিলা জানেও।

কিংবা হয়তো আবার কখন সে নিজে থেকেই শেলোগান দেবে আর ক্ষুদে ক্ষুদে হাত এখন পর্যন্ত তার যে আকাশ তার গায়ে ছুঁড়ে ছুঁড়ে।

ছবির বইয়ের পাতাটা উলটালো শর্মিলা। স্তূপের মতোই, শব্দটা তাও যদি না হয়, স্তূপের মতো করে অনেকটা সদ্য পাউডার বুলালো সাদা ঘাড় ছেড়ে দিয়ে উঁচুতে তুলে বাঁধা শ্যাম্পুতে বাদামী অনেক চুল আর নীল সিফনের শাড়ি। আর সুঘ্রাণও।

ছবিটা অবশ্য পাহাড়ের আর তার নিচে এত শান্ত উপত্যকার। কফির স্বাদটা ভালোই। কাপটা নামিয়ে রাখলো সে মেঝেতে; টিপয়গুলোকেও সরিয়েছে ওরা দুপুরে। কিন্তু তাই বলে দুপুর এখন আর সাদা লাগছে না। এক শান্ত উপত্যকার ফটোই যদিবা রঙ করা।

আর উর্মিলা তখন সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেলো নিচের ঘরটায় কফি দিতে। অবশ্য সেখানে আলোটা এমন স্পষ্ট নয়। অদ্ভুত নয় একটা গোটা দুপুর একা একা বসে থাকা অশোকের? আর হয়তো টেবলে হাত রেখে কাছাকাছি দাঁড়িয়ে বললো উর্মিলা তখন দেখো দুধ আর চিনি ঠিক হয়েছে কি না। আর অশোক হয়তো বললো, এমন কি দরকার ছিলো। শর্মিলা ভালো আছে তো, শর্মি? আর ভাবলো, ঘ্রাণটা কি কখনও কখনও কি অধ্যাপকের পোশাকেও থাকে? কাছে খুব কাছে দাঁড়িয়ে বই নিতে গেলে কখনও কোন সন্ধ্যায় পাওয়া গিয়েছে। তা ছাড়া তর্ তর্ করে সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসা পায়ের শব্দ আজ শর্মির হতে পারে না। আশাও করা যায় না। আর এই সুঘ্রাণটা অবশ্যও অধ্যাপকের পোশাকে কখনও কখনও পাওয়া গিয়েছে। তখন হয়তো উর্মিলা হাসলো বেশ মিষ্টি করেই, বললোও তা হলে, বেশ ভালোই আছে সব। আর অশোকও দেখলো উর্মিলার চোখ দুটো বড় বড় আর টানা আর সাদা ঘাড়ের উপরে অনেকটা উঁচু করে তুলে বাঁধা চুল। তখন হয়তো উর্মিলা বললো, হয়তো তুমি ভেবেই পাচ্ছ না কি করতে হবে তোমাকে। হাসলো উর্মিলা আর তা হলে তার গালে টোল খেলো। কফিটা খেয়ে উপরে এসো বরং। তারপরে আমরা সবাই চা খেয়ে নেবো যখন অ্যাম্বুলেন্সও আসবে। আমি অবশ্যই ভেবেছি তুমি তিথিটার খোঁজখবর নিতে এসেছ, মানে বিয়ের তিথি। তখন হয়তো উর্মিলা ভাবলো, এটা অভিজ্ঞতার অভাবই। আর কোন কোন পুরুষ এমন হয়েও থাকে। তখন তা হলে সে বরং টেবলটায়

হেলান দিয়ে অশোকের মুখোমুখি দাঁড়ালো কারণ

ছবির বইটা—

কারণ সব মেয়েমানুষই তেমন দাঁড়িয়ে থাকে। আর তখন হয়তো উর্মি অশোকের মাথায় হাত রাখলো। আর অশোকের চাহনি কেমন ধীর নয় আর অশোকের চুলগুলি ঢেউখেলানো আর—

ছবির বইএর পাতাটা উল্টালো শর্মিলা। তা হলেও তোমার কোন অভিজ্ঞতা ছিলো না তা তো বুঝতেই পারছি। যদিও অশোক তুমি কিছু বড় হবে বয়সে আর হয়তো এক ইয়ার উপরে কলেজেও। শর্মিলা হাসলো। কিন্তু বিকাশ আর উর্মিলা মানে আমার মাকে দেখো, সমবয়সী, আর কতদরে দেখো পঁয়ত্রিশে। আজ অবশ্য শর্মিলা ঠোঁটে রং দেয়নি, নখের রংও একদিনের পুরনো। হ্যাঁ অশোক। শর্মিলার গালে টোল খেলো। তুমি বললে। আর আমি বললুম, হ্যাঁ অশোক। আর তারপর। আর আমি তখন হেসে বাঁচিনে। আর তখন তোমার মাথায় হাত রাখলুম। যেন তুমি একজনকে প্রণাম করছো। কিংবা কৃতজ্ঞ। হ্যাঁ, অশোক। আর অশোকের চুলগুলো ঢেউখেলানো।

আর এখন তরতর করে উঠে এলো উর্মিলা। তার ঠোঁটের রঙও আজ হালকা। আর একটু ঠোঁট ফাঁক করে নিশ্বাস নিচ্ছে তরতর করে সিঁড়ি বেয়ে এসে। আর একটু কফি নাও বরং। কফিটা ভালোই।

সেই কাপটা তুলেই পট থেকে কফি ঢেলে দিলো উর্মিলা। কফির এই গুণ সব সময়েই শরীরকে ঝরঝরে করে তাই নয়।

উর্মিলার ঠোঁটের রঙ আজ, কেমন, হিসেব করা নয়। যেমন শর্মিলার এই সবুজ সিফন যা হয়তো উর্মিলাই পরিয়ে দিয়েছে ঘরের আসবাব সব সরিয়ে মেঝেটা খালি করার সঙ্গে সঙ্গে।

কাপটা হাতে নিলো শর্মিলা আর উর্মিলা পর্দাটা ঠেলে রান্নাঘরের দিকে গেলো। আর পর্দাটার সামনে বললো, কেমন, দেখলে, এখন কেমন স্তব্ধ আর নিঃসাড়, যেন ধ্যান। তাই নয়? এখন সব রঙই স্পষ্ট।—পর্দার কালচে লাল আর যথা উর্মিলার সিফন শাড়ির নীল। আর এই কাপের গড়নও, ছোট কিন্তু হয়তো মাঝারি রকমে দামীও।

এটা উর্মিলারই প্রভাব যে তাদের কফির কাপগুলো দামী হলেও ছোট। এটা অবশ্যই উর্মিলা নিজের বাড়ি থেকেই এনেছে আর তা সেই চামড়ার সুটকেশেই বা রঙচটা। উর্মিলারই পছন্দ আর তারপর থেকে শর্মিলার এটাকেই স্বাভাবিক মনে করেছে। এটা তাদের পছন্দও বটে এখন।

শর্মিলা হাসলো। সুতরাং—এখন যেন বেশীই দেখছে, একটু তীক্ষ্ণ করেও বা যদিও দুপুরটা এখন স্তব্ধ, কিন্তু আর সাদা বলা যায় না। অবশ্য কিছুদিন আগে পর্যন্ত এমনভাবে শর্মিলা চিন্তা করেনি ঠিক এখন যেমন করছে। আর উর্মিলার নিজের পছন্দকে তার ভালোও লাগে। অবশ্য উর্মিলা তার মা। আর অনেক জানেও সে। ধ্যানই যেন, তেমনই স্তব্ধ।

শর্মিলা উঠে দাঁড়ালো। এখন একটু পায়চারিও করা যায়। এখন কিছু ভার বোধ হচ্ছে না বটে। আসলে ভারের কথা যদি বলো এমন কিছু ভার হয়নি তার শরীর। বড়জোর আটপাউন্ড। আশ্চর্য কথা তো। ওটা মানে ওজনটা কি মায়ের ওজনের সঙ্গে যোগ হয়? নাকি মায়ের ওজনে মিশে থাকে।

ড্রেসিং টেবলটার সামনে গদিদার তেপায়া টুলটায় বসলো। আয়নায় নিজের মুখটাকে দেখলো। কেমন অদ্ভুত নয়? নড়ছে না আদৌ অবশ্য, ধ্যান নাকি কথাটা, কিংবা অবাক। এখনও কপালটাতে আর নাকের নিচে ঘামা-ঘামা বোধ হচ্ছে। কেমন একটু নতুন নয়। আর এসব চিন্তা করার অধিকারও তার আছে—আগে শ্লোগান দেয়া হয়ে থাকে যদি তবে এখন অবাকই বলতে পারে যদি সে অনুভব করে তার নিজের শরীরের মধ্যে কেউ অবাক হয়ে যাচ্ছে। শর্মিলা হাসলো। আর সন্দেহও যেন।

আঁচলটা দিয়ে কপালের ঘাম মুছলো সে। এটাও সিফনের বটে আর সবজে। উর্মিলার পরনে নীল। আর তার হাতে নীল কাচের চুড়ি। কিন্তু সহজে এই শাড়িটা ইস্ত্রি ভেঙে লেপটে গিয়েছে। উর্মিলা হয়তো বলবে এটা শাড়ি পরার ব্যাপারই নয়। আর জানেও সে। কতদিন থেকে এই শাড়ি আর আদ্দির শেমিজ তার তোলা ছিলো কে জানে হয়তো আজকের জন্য। জানেও সে যেমন বলেছে নড়বে না বরং গুটিয়ে নেবে। কিংবা, আজ সে অবশ্য অনেক স্পষ্ট করে দেখতে পাচ্ছে এখন থেকে আর চিন্তাও বেশ তীক্ষ্ন, সেই যেদিন স্কুলে যাওয়ার জন্য পোশাক পরে হঠাৎ সে ব্যাপারটা দরজার পিছনে দাঁড়িয়ে কাঁদছিলো শর্মিলা পোশাক পরে হঠাৎ সে ব্যাপারটায় দরজার পিছনে দাঁড়িয়ে কাঁদছিলো শর্মিলা উর্মিলা বলেছিলো কিছুই নয়। যেমন উর্মিলা বলেছে মারজিন্যাল কেস তো, আজই ডাক্তার মনস্থির করবে, হয়তো অ্যাপেনডিক্স সরানোর মতো কিংবা আরও সহজ—

আর আজ সে দেখতেও পাচ্ছে যেন। ড্রেসিং টেবলটার পাশে জানলা। ওদিকের ঝুল বারান্দাটা চোখে পড়লো শর্মিলার। ওই চওড়া পিঠটা বিকাশের। আর নীল সিফন অবশ্যই উর্মিলার। বিকাশই আসছে। কিন্তু এরকম তো চোখে পড়ার কথা নয়। একটু অবাকই হলো সে। তাহলে সে জানলার বদলে পর্দা দেয়া দরজার কাচে ফোটা জানালাটা দেখতে পেলো। তাই হবে যেন ওদিকের ঘরটাও এ ঘরের মধ্যেই। এমন আর কখনও দেখেনি সে।

কিন্তু বিকাশ এলো আর সে বললো, উনি বললেন, ঘুম ভেঙেছে আর কফিও খেয়েছো।

বিকাশ দরজার পাপোশে পা ঘষলো। বাইরে ভিতরে বাইরে ভিতরে। চাঁপা রঙের নরম সিল্কের প্যান্ট, চওড়া বুক, আর দৃঢ় পেশী, ইস্পাতনীল ম্যানিলা আর কমলা রঙের জুতো।

দরজা পার হতে হতে বিকাশ বললো,—বসি তোমার কাছে একটু, আর পা ঘষলো আর পা ঘষে নেয়ার সঙ্গে সঙ্গে হাতদুটোও দুলে দুলে সামনে আসছে না। কি আনন্দই হয়েছে লোকটার।

বিকাশ বললো, আমি তোমার কাছে একটু বসি।

শর্মিলা সোফায় গিয়ে বসলো আর বিকাশ ড্রেসিং টেবলের সামনে থেকে তেপায়া তুলে আনলো একটা। বসলো শর্মির মুখোমুখি।

সে যখন বসলো তার উরুর পেশীগুলি কত স্থিতিস্থাপক আর দৃঢ় তা বোঝা গেলো। আর বাড়িতেও দেখো সে পুরো পোশাকই পরে আছে। বিকাশের তেপায়াটা একটু নিচুই হলো, কারণ আসবাব সব ওদিকে জড়ো করা। সাবধান হওয়াই, হাসলো শর্মির ঠোঁট, যেন অন্যান্যদিন সে দুপুরে সেগুলিকে নিয়ে সার্কাস করে। অবশ্য অত্যন্ত দামী কিছু তাতে সন্দেহ নেই। আর সে জন্যই বিকাশকে আজ পুরো পোশাকই পরে থাকতে হচ্ছে বাড়িতেও, যদিও ট্রাউজারটা বলতে পারো নরম সিল্কের যা ড্রেসিংগাউনেও চলে, যেন প্রয়োজনের সময়ে

পোশাক বদলাতে দেরি না হয়।

আর বিকাশ বললো, এখন তুমি বেশ ভালোই আছ, উনি বললেন। আর তোমার যখন ফোন, আমি অবশ্য পাইনি, ধরবার আগেই কেটে দিয়েছিলো, টেলিফোন গার্লদের কাছে যা বলার বলে দিয়ে। এবং তারা খবর দিলো দলবেঁধে উঠে এসে হৈ-চৈ করে। আর বড়বাবু বললো ওদের আজ মাপ করতেই হয়। আর বড়সাহেব বললো শিপিং কোম্পানি তো শ্যাম্পেন ছাড়া কি যাত্রা শুরু হবে? জাহাজের মাথায় শ্যাম্পেন বোতল ভাঙলে তবে। আর তখন কথা বললুম পান্নালালদের ঘরে। ওরা বললো ডিজাইনটা শান্তিপুরী পাড়েরই হয়, অর্ডার পেলে বেনারসী হয় বটে তিন সপ্তাহে। বললুম আজই চাই যে আর ওরা বললে দুধে কড়িয়াল হতে পারে আর লালপাড়ে রুপোর জরির দাঁত। এখন আর কষ্ট নেই তো, না? উর্মিলার উরুর উপরে হাত রাখলো সে।

হাসলো শর্মিলা। কার্ডবোর্ডের বাক্সটাই হয়তো। কিন্তু সেখানা ছিলো বেনারসী।

বিকাশের হাতের আঙুলগুলো লম্বা, নখগুলো ম্যানিকিউর করা, কিন্তু তর্জনী আর মধ্যমা সিগারেটে বাদামী।

আর আজ শর্মিলা দেখতেও পাচ্ছে এখন। বেশ সাহসও হয়েছে বিকাশের আজ হয়তো শক্ খাওয়ার মতো চমকে উঠবে না। তা ছাড়া এখনও সেও যেন অবাক হয়ে আছে, ধ্যান বলেছিলো উর্মিলা না? শর্মিলার মুখে স্নিগ্ধ হাসি দেখা দিলো। কিন্তু তাই বলে পঁয়ত্রিশ বছরের একজন পুরুষের পক্ষে তেমন চমকে ওঠা গর্ভবতী স্ত্রীর পেটে হাত রেখে! তা বরং প্রমাণ করে শিপিং কোম্পানির লাভের গ্রাফ কখন ক্লান্ত হচ্ছে তা জানাই সব নয়।

তোমার গড়নটা লম্বা শর্মি, বললো বিকাশ, আচ্ছা, আর লম্বা পা, আচ্ছা ওষুধ খেতে না? এখন অবশ্য পিছনটাও ভার হয়েছে। হয়তো ভুলে যেতুম কোন কোন সন্ধ্যায়, শর্মিলা বললো। বিকাশের হাতের উপরে হাত রাখলো সে।

অবশ্য, বিকাশ হাসলো, তার জন্য কোন দুঃখ নেই। এটা কৌতূহলই। ভালোই হয়েছে, খুব ভালোই। অনেক সময়ে ভুলও ভালোই।

সে ভাবলো এরপরে হয়তো শর্মিলার এমন চেহারা থাকবে না। ঘরের আলোটা যেন তার ম্যানিলা রঙের সঙ্গে নড়েচড়ে উঠলো। আর তার নরম সিল্কের ট্রাউজার্সের নিচে থেকে তার হাঁটু শর্মিলার হাঁটু দুটোকে ছুঁয়ে গেলো। শক্ত কঠিন আর বড় ম্যাপের গাঁট।

আর শর্মিলা বেশ ভালো করে দেখলো বিকাশকে। একটু চাপা আর ধোঁয়ায় কালো ঠোঁট, চোয়ালটা চোখে পড়ে, নাকটা উঁচু পাখির ঠোঁটের মতো, আর আজ দেখো বাঁ দিকের গোঁফ একটু বেশী সরু হয়েছে আর তেমন করে দেখলে চোখের কোলের বাদামী কালিমা চোখে পড়বে। তাহলেও হাঁটুটা সরিয়ে নিলো শর্মিলা আর বিকাশের গলার দিকে চাইলো সে। আর সুঘ্রাণটাও পেলো। অডিকোলন নয় বিকাশ যা অফিস-ফেরত ব্যবহার করে।

—দেখো, তুমি, আচ্ছা, তুমি কি আমার বাবার কাছে পড়েছো? শর্মিলা বললো। তা পড়লেও একেবারে প্রথম দিকের ছাত্র হবে। ভাবলো সে। আর এমন সুঘ্রাণ কখনও কখনও তার বাবার পড়বার ঘরেই পাওয়া যায়।

—হয়তো হতেও পারে। বিকাশ বললো, এটাও খুব কৌতুকেরই দেখো টেলিফোন গার্লরা ডিকোরামের উপর দিয়েই উঠে এসেছিলো। বিকাশ হাসলো। গোলমাল শুনে অফিস সুপার এসে বললো আজ এসব মাপ করতে হয়, সার। বললুম কেন? আর ও বললে আমরাও খবরটা শুনেছি। একটা নতুন জাহাজ হলে কি আমরা কম আনন্দ করি!

অবশ্য, সব লোক একরকম হয় না। ভাবলো শর্মিলা।

সিগারেট ধরালো বিকাশ আর বললো, একটা সিগারেট ধরালে অসুবিধা হবে না তো?

শর্মিলা হাসলো। হাসিটাই অনুমতি হতে পারে। আর অশোক সে অবশ্য এমন সিগারেট খায় না, এত ঘন ঘন নয়, আর তা বরং নরম আর মৃদু গন্ধের, আর সে অবশ্য তার বাবার প্রিয় ছাত্র।

কিন্তু তখনই সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে হাসলো বিকাশ। আর বললো সেই যাই হোক কখনও কখনও ওষুধ খেতে ভুলে ভালোই হয়। হয়েছে তো, বেশ ভালোই। নতুন জাহাজ ভাসালো বলেছিলো, বিকাশ হাসলো আবার। আর তাতে তোমার স্বাস্থ্যের ক্ষতি হবে না। লম্বাটে গড়ন তোমার, লম্বা পা, আর তেমন ভারি নয় এমন পিছন। আর বাড়ও বন্ধ হবে না। কারণ উনিই বলেছেন তুমি বরং তাঁর আরও আগে। আর তোমার গড়ন তোমার মায়ের মতোই।

অবশ্য বিকাশ খুবই আনন্দিত। হাসলো শর্মিলা। নতুন একটা জাহাজ ভাসানোর মতোই আনন্দ। আর তার কিছু অধিকারও আছে। যদিও অশোক আর সে হয়তো শক্ খাওয়ার মতো চমকে উঠতো না। হয়তো বলতে পারতো, নড়ছে মনে হচ্ছে, আশ্চর্য আগেই প্রাণ হয়! আর এখন যেন অশোক ভয়ে স্তব্ধ। সবাই এরকম হয় না, হয়তো তখনও অশোক অবাক হয়ে যেতে পারতো।

কিন্তু এখন আর আদৌ নড়ছে না। আর অবাক হওয়ার মতোই যেন। শর্মিলার ঠোঁট দুটো হেসে উঠলো, হ্যাঁ, পৃথকই পুরুষরা। সবাই তোমার বাবার মতো হবে এমন কথাও নেই। শর্মি ভাবলো। তার বাবা অবশ্যই পণ্ডিত, জ্ঞানী, সহানুভূতিশীল। এই পঁয়তাল্লিশ বছরেই কত সুধীর। আর ইংরেজি সাহিত্যের এমন বিচক্ষণ পণ্ডিতই বা আর কে আছে এমন এ অঞ্চলে।

বিকাশ বললো, আজ আমার আনন্দের দিনই যদি ভেবে দেখো। আর হাসলো সে, আর উঠে দাঁড়ালো। বললো, তারপর অফিস সুপার বললো দিনটা চমৎকার সার। আর বললুম, এগ্রীড্, আজ আমার বিয়ের তিথিও বটে। আর তখন পান্নালালদের বললুম বেনারসীর কথা।

আর বিকাশের গড়ন, শর্মিলা ভাবলো, এমন তার ম্যানিলার ঢেউ থেকে ধরা পড়ছে। যদিও তার উরু শক্ত আর পা দুটো লম্বা। আসলে সেটা স্বপ্নের ভয় যা য়েটস্‌এর কবিতার, যা অশোক পড়েছিলো, সবে মিলে একটা পুরো ভয়ের স্বপ্ন হয়েছিলো। এখন কি সারস মনে হবে? বরং সাপ্‌ল্ আর ভিরাইল। আর সে সবই ছিলো স্ত্রী আচার। আ মরণ, তোমার ছোটকাকী। সেই দুধে বেনারসী যেমন যা উর্মিলা পরেছিলো।

একটু ঘুরলো ঘরে বিকাশ আর তারপরে সোফার পিঠের কাছে এলো। বললো,—কি সুন্দর করে চুলগুলো বাঁধা, যেন স্তূপ। হয়তো উনিই বেঁধে দিয়েছেন, তোমার সাদা লম্বা ঘাড়ের উপরে ছোটছোট চুলগুলো উল্টে খোঁপার মধ্যে আটকে আছে। তুমি যখন ঘুমিয়েছিলে উনিই হয়তো বেঁধে দিয়েছেন। তোমার চুলগুলো—একটু পাউডার দিয়ে দেবো চুলের গোড়ায়?

শর্মিলা হাসলো আর মাথাটা একটু নোয়ালো বা আর তা সম্মতিও। আর ভাবলো সে অবচেতন মনও যেন কিংবা তার ভয়। হাই তুললো শর্মিলা। সাদা লম্বা ঘাড় আর তার শেষে কেঠো ঠোঁট। বিকাশের গলায় ওগুলো ভাঁজ, ত্রিবলী না কি বলে? আসলে

সে নিজে হয়তো কোনদিন রাজহাঁস দেখে ভয় পেয়েছিলো কিংবা বিশ্রীভাবে হিস্‌হিসিয়ে এগিয়ে রাজহাঁসের গলার সামনে থেকে ছুটে পালাতে গিয়ে হাঁটু কেটে ফেলেছিলে পড়ে গিয়ে। আর হয়তো বা উর্মিলাকে জিজ্ঞাসা করলে জানা যায়। হাসি হাসি মুখে ভাবলো এমন স্পষ্ট দেখতেও পায়নি এখন যেমন অবচেতনকেও। নতুবা বিকাশ বরং সাপ্‌ল্‌ আর ভিরাইল।

পাউডার আনলো বিকাশ আর খোঁপার গোড়ায় দিল পাফ বুলিয়ে বুলিয়ে। শর্মিলা আয়নার সামনে বসেছিলো বটে নিজের চুল দেখেনি। উর্মিলার চুল স্তূপের মতো বাঁধা বটে আজ, আর তা হলে, বিকাশ যেমন বলছে, তার নিজের চুলও তেমন একই রকমে বাঁধা। আর পাফ বুলিয়ে বুলিয়ে দিলো বিকাশ আর তারপরে চুমু খেলো খোঁপার গোড়ায়।

আর শর্মিলা এবার স্পষ্টই দেখতে পেলো মানে ঘ্রাণে, অডিকোলন নয় যা বিকাশ ব্যবহার করে অফিস-ফেরত বরং যেন এ সুঘ্রাণটা তার বাবার পড়ার ঘরেই পাওয়া যায় কখনও কখনও, ওয়াইনের একজাত। না, বিকাশ এর আগে আর কবে খেলো? তাহলে এই হয় না ওয়াইনটা এসেছে তাদের বাড়ি থেকেই আর রঙ-চটা সেই চামড়ার ব্যাগেই। আর তাহলে নীল সিফনের কোলের আঁচলেও একই সুঘ্রাণ।

রিচ্যুয়াল নাকি কথাটা, অশোকের প্রিয় শব্দ, কারণ উর্মিলাও কদাচিৎ স্পর্শ করে। শর্মিলা হাসলো আবার, যেমন স্ত্রী-আচার। অবশ্য উর্মিলা জানায়নি। আর কাছে থেকেও কি জানা যায় উর্মিলা কি জানে যেমন চুলে চিরুনি চলতে চলতেও পাশে থেকে তুমি জানবে না কখন সেটা খোঁপা হয়ে উঠেছে।

আর হাত উলটে ঘড়ি দেখলো বিকাশ। আসছি আবার আসছি বলে সে বরং বেরিয়ে গেলো। আর হাত দুটোও যেন দুললো আবার। স্ত্রী-আচারই, তাকে রিচ্যুয়ালও বলা যায় হয়তোবা। আর হয়তোবা তা তিনজনেরই মনে আছে—উর্মিলা, শর্মিলা আর বিকাশ।

হ্যাঁ ছোটকাকী, এটাই বাসরঘর।

উর্মিলা ফিরে দাঁড়াতেই সাদা জমিতে সোনার বুটির ঘোমটা খসে খসে মুক্তোবসানো চিরুনির, প্রজাপতি যেন, এমন খোঁপা।

এটাই তবে, বললো, ঠানদিদি কিন্তু বয়সের তফাত হলো না বরং—

—আ, মরণ ছোটকাকী, কিন্তু মেয়েরা কি তেমন পুরুষ চায় না? দেখছো কেমন শাপল এবং ভিরাইল। পুরুষ হিসাবে দেখো বিকাশকে যদিও বা আমার সমবয়সী।

—আঃ মরণ, মেয়ের বিয়ে নয়? হাসলো ঠানদিদি ঝিরঝির করে।

কিন্তু স্ত্রী-আচার তো! উর্মিলাও হাসলো।

আর ঠানদিদি হিসাবে সেই একদিনই সে এসেছিলো। তা আগে ঠানদিদি বলে জানাও যায়নি তাদের কলেজেরই একজন অধ্যাপিকা বরং—। যেমন জানাও যায়নি ওয়াইনটাও আসতে পারে চামড়ার ব্যাগে।

কিন্তু, হয়তো বা ভাবলো শর্মিলা—উর্মিলা অবশ্য জানে, আর কতটুকু যে জানে তা নিজে থেকে না জানালে জানাও যায় না, যদিও আজ শর্মিলাও অন্যদিনের চাইতে ভালো বুঝতে পারছে। হয়তো উর্মিলা ঠিকই বলেছে, ধ্যানই কথাটা। যদিও সে নিজে অবাক কথাটাও আবিষ্কার করলো।

তখন কিন্তু অশোক এলো আর উর্মিলাও। আর উর্মিলা বললো, বসো এখানে অশোক। বিকাশকেও কাজে লাগিয়েছি। একটা হাইটির ব্যবস্থা করছি। তারপর আমরা

সবাই খেয়ে নেবো। এখানেই, শর্মিও খাবে, আর শর্মিকে ঘিরে বসে আমরা। ছটাতেই আসবে অ্যাম্বুলেন্স। বিকাশও এলো। হাসলো সে আর সিগারেট ধরালো। বললো, নতুন নয় পরিস্থিতিটা? একেবারেই এই প্রথম ঘটতে চলেছে মনে হয় না?

উরুতে একহাত অন্যহাত কোমরে দিয়ে দাঁড়ালো উর্মিলা। সে হয়তো বা এখনি আবার তরতর করে সিঁড়ি দিয়ে উঠে এসেই। নীল কাঁচের চুড়িপরা তার হাত।

বিকাশ বললো,—তোমারও, যদি ভেবে দেখো, আজ তুমি দিদিমা হতে চলেছো যা তুমি এর আগে কোনদিনই ছিলে না।

—আচ্ছা সে দেখা যাবে, উর্মিলা বললো, এখন আমাদের চা খেতে হবে। এ ঘরেই। শর্মিকে ঘিরে বসে। শর্মিও খাবে। আর বুঝতেই পারছো ভয়ের কিছু নয়ই। কেমন মিলছে না যেমন বলেছি এখন সে বোধ হয় ধ্যানে বসেছে। হাসলো সে।

আর মাথার উপরে হাত তুলে আড়মোড়া ভাঙলো। তার বাহুর ভিতরের দিকটা বাইরের চাঁপা রঙের চাইতে বরং সাদা। আর সে হাসলো ঝিক্‌মিক্ করে আর বললো— সবাই একরকম হয় না, শর্মিলাদের বাড়ির মিডওয়াইফ তখন শর্মিলার বাবাকে ঠাট্টা করে বলেছিলো আপনি তো তখন বৈঠকখানার অন্ধকারে মুখ লুকিয়ে যা করার আমরাই করেছি সুন্দরী মেয়েটার জন্য। শর্মি তখনই সুন্দরী ছিলো। আর এই 'ছেলেটিও দেখো তার অধ্যাপকের মতোই। এসো বিকাশ। খাবারগুলো আমরা এঘরেই নিয়ে আসি হাতে হাতে। সোফার পিছনে সরে এলো সে। নিচু হয়ে শর্মিলার গালে ঠোঁট দুটো বুলিয়ে দিলো। আর তখনই উঠে দাঁড়ানো বললো, উত্তাপ নেই। সবই স্বাভাবিক।

দরজার কাছে গিয়ে মুখ ফিরিয়ে বললো সে তুমি অবশ্য বলতে পারো আমি নিজেকে মূল্যবান মনে করছি। সকলেই তা, যদি বলো। কারণ তোমার কথাতেই ঠানদিদি হতে চলেছি। অবশ্য মাঝখানে শর্মি; তাকে ঘিরে ঘিরেই। তা ছাড়া আজ আনন্দের দিনও, তোমাদের বিয়ে আজ একবছর হলো।

আর তাহলে সে ভালো ঠানদিদি হয়েছিলো একদিনের ছোটকাকী। বিমলি শর্মির বিয়েতে এসে। আ, মরণ—

কিন্তু এমন করে আড়মোড়া ভাঙা ভালো হয়নি। বসো অশোক, বললো সে,—এসো এসো বিকাশ।

তখন শর্মিলা ভাবলো, হ্যাঁ গন্ধটা তার পরিচিতই উর্মিলার নীল সিফনে যা ছিলো, তার বাবার পড়ার ঘরে কখনও কখনও যা পাওয়া যায় যখন তিনি স্থির হয়ে বসেন। অবশ্য সব পুরুষকে একই হতে হবে এমন কথা নেই। অ্যাক্‌চুয়েরিরা অন্য রকমের হয়ে থাকে। উজ্জ্বল দেখাচ্ছে না বিকাশকেও। ভিরাইলই যদি তা বলতে চাও। আর অশোকও কালে একজন অধ্যাপক হবে না তা কে বললো?

আর সবটাই এক রিচুয়ালের অঙ্গ হতে পারে, অশোকের আশাটাও। রিচুয়াল খানিকটা যা প্রয়োজনের বেশী অথবা যার প্রয়োজন এখন আর চোখে পড়ে না। বললো সে, বা অশোক বসো।

আর ওয়াইনটাও এসেছে যেমন কফির কাপগুলো সেই রঙচটা চামড়ার ব্যাগেই। এদিকে কিন্তু এমন প্রথার কথা কে শুনেছে যে এ অবস্থায় বিকাশকে ওয়াইন ব্যবহার করতে হবে যা সে কোনদিনই করে না, কিংবা এর আগে নীল কিংবা অন্য কোন রঙের উর্মিলার সিফনে এমন সুঘ্রাণ থাকবে। হঠাৎ, হাসলো শর্মিলা, যেন বুঝতে পারলো সে। এ তো

আর সত্যি জাহাজ ভাসানো নয় যে মদের বোতল ফাটাতে হবে যেমন বিকাশ বলেছে, হয়তো উর্মিলাকেও তা বলে থাকবে আর তাতেই। যেমন ধরো কফির ছোট কাপ তাদের বাড়ির। আশ্চর্য তো এর আগে মনে হয়নি, হয়তো কোন ডাক্তার কোথাও বলে থাকবে বেশী কফি ভালো নয়। আর তখন এই মাপের কফি-কাপ কিনেছিলো উর্মিলা। আর সেই মাপই এখন প্রথা তাদের বাড়িতে। আর অশোক বলেছিলো এটা ভালোই দ্বিতীয়বার চাইতে অতিথির লজ্জা নেই। আর এখনই যেন বলা যায় না আর কী আবিষ্কৃত হতে দেবে উর্মিলা।

কিন্তু অশোক, বললো শর্মিলা, তুমি কি ভয় পেয়েছো? যদিও তোমার এই ভঙ্গিটাই স্বাভাবিক হতে পারে। বিকাশকে আনন্দিত মনে হচ্ছে না? হ্যাঁ তুমি আমাকেও অভিনন্দন দিতে পারো। অবশ্য এ সবই রিচ্যুয়াল।

—রিচ্যুয়াল বলছো?

—তাই বলতে পারো। বললো শর্মিলা আর স্নিগ্ধ আর ডাগর হলো তার চোখ। আচ্ছা অশোক, আচ্ছা তোমার হাতটা আগে আমার হাতে দাও, আচ্ছা, তোমার কিন্তু কোন অভিজ্ঞতাই ছিল না। এমন বিকেল হতে চলেছিলো। দুপুর। আর তুমি বললে। আর আমি বললুম, হ্যাঁ অশেক। আর তারপর তুমি যেন পায়ের কাছে অবাক প্রার্থনা করবে এমন যেন কৃতজ্ঞ। হেসে বাঁচিনে।

অশোকের মাথায় অন্য হাত রাখলো শর্মিলা। বললো ভয়ের কিছু নেই। আর হাসলো সে, বললো, জানো এখন যেন সে একেবারে স্তব্ধ আর যেন অবাক কিংবা প্রার্থনাই করছে। একটা পবিত্রতায় পেঁাছে যাবে যেন। কেমন, সব চাইতে পবিত্র নয় যখন যখন তাকে বুকে করা হবে।

কিন্তু তখনই নানাবিধ খাবার নিয়ে এলো বিকাশ আর উর্মিলা। অনেক খাবার।

আর অশোক তোমাকে একদিন তখন বলবো কি ক'রে রিচ্যুয়াল হয়। সেদিন আমি হাসছিলুম তোমার কৃতজ্ঞতায়, কারণ আমার তবু তো বিকাশের অভিজ্ঞতা ছিলো, তুমি একেবারেই অবাক। আর ভীরু আর কৃতজ্ঞ।

কিন্তু তখনই উর্মিলা বললো। বসো অশোক, ব'সে যাও। ওখানেই দিচ্ছি। শর্মির ট্রেটা সোফার উপরেই দাও বিকাশ। আর আজ আনন্দের দিনই, তোমার মনে পড়বে অশোক আজ শর্মির বিয়ের তিথিও।

শর্মিলা ভাবলো অথবা এমন করে রিচ্যুয়াল সৃষ্টি হয়। সে বললো তুমি কিছু খাচ্ছ না অশোক। হাসলো সে, বসলো তুমি তখন এক ইয়ার উপরে পড়তে বটে এখন অভিজ্ঞতায় আমি বরং। আর নিজের ট্রে থেকে সন্দেশ তুলে অশোকের মুখে তুলে দিলো।

যদিও আধখানা তার হাতেই রইলো কারণ বিকাশ বললো তখন শাড়িটার মানে যেটা দুপুরে পান্নালালদের বাড়ি থেকে দিয়ে গেছে তার জমিতে সোনার বুটি নেই বটে, কিন্তু তেমন দুধে কড়িয়ালই প্রায় বেনারসীই আর লাল পাড়ের পাশে সোনার দাঁড়ও। আজ হ'য়ে উঠলো না শর্মি ক্লিনিক থেকে ফিরলে মুক্তোবসানো সোনার চিরুনি গড়িয়ে দেব।

উর্মিলা ডবল অবাক হ'লো, সে কি!

শর্মিলা হাসলো। আর ঝিরঝির করে হাসলো উর্মিলা। ওমা বললো সে, বিকাশ তুমি আগেই চা ঢালছো কেন? অশোক তুমিও খাচ্ছো না।

হাতে ধরা আধখানা সন্দেশটা যেন খা ভুলেই শর্মিলা খেতে শুরু করলো।
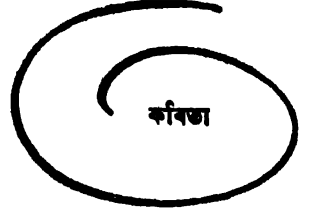
আমি লোকটা

মণীন্দ্র রায়

আমি লোকটা যা নই, অর্থাৎ
আমার আত্মীয় কিংবা স্বজন যা নয়,
আমার বন্ধুরা কিংবা পড়শিরা যা নয়,
পরিচিত প্রতিষ্ঠান-সমিতি যা নয়,
আজকের আকাশ মাটি জীবন যা নয়
অর্থাৎ এসবই আমি,
এ সবেরই যোগবিয়োগ কাটাকুটি, আমি
আমি লোকটা তাই
বন্ধুর হাত-ধরে চলতে বন্ধুরা পাথর,
আত্মীয়-স্বজন ক্রমে তৈলচিত্র স্মৃতির দেয়ালে,
প্রতিষ্ঠানে ধারণায় ক্রমাগত কালের হলুদ—
অর্থাৎ এসবই আমি,
আমি লোকটা তাই
আমার বুকের মধ্যে যেখানে পাথর
সেখানে যা নই,
আমার স্মৃতির মধ্যে তৈলচিত্রে যেখানে দেয়াল
সেখানে যা নই,
আমার রক্তের মধ্যে পাপপুণ্যে যেখানে শিকড়
সেখানে যা নই,
অর্থাৎ কথাটা এই—
আমি যা হয়েছি, কিংবা হয়ে যাচ্ছি, হই,
জীবনের পেন্ডুলামে সেই
ডাইনে আর বাঁয়ে অন্ধ স্থিতিস্থাপকতা

আমাকে নিশ্চিত ক্রমে ছকের বাহিরে
ঘোর ছেলেমানুষির তুলকালামে ছোঁড়ে
যেখানে না-আমিগুলি ধারণার উথালপাতালে
পাপপুণ্য ভালোমন্দ উড়িয়ে হাওয়ায়
আমার যে-আমি রোজ কোণঠাসা, তারই মুখোমুখি
কেবলই জানাতে চায় বিরোধী জগৎ
যেখানে জন্মের আগে দ্রোহময় তারার আগুন
ক্রমাগত গড়ে তোলে শাণিত আদল,
আমি তার ইস্পাতের ধার বুকে বয়ে
রক্তাক্ত, অথচ আজো কাটাতে পারি না নগ্ন ধাতুমল।

পুনর্জন্মের জন্যে

শিবশম্ভু পাল

আমি শর্তনিরপেক্ষ নই।
তুমি যদি মৌনতার পাথরে ছোঁয়াও হাতখানি
তাহলেই অভিভূত হতে পারি চন্দ্রাহত শহরে আজব।

অন্যথায় আমার কোনো কৌতূহল নেই
কোন সিন্ধুতীরে কোন আঁকাবাঁকা আলো অন্ধকার
ডুবে যায় জ্যোৎস্নার নীলান্ত প্লাবনে।

শুধু কিছু আর্তনাদ যখন যেমন জোটে সরব নীরব
যখন যেমন পাই সকালে সন্ধ্যায়
কখনো শ্লোগানে আর কখনো-বা অপ্রস্তুত রূঢ় প্রত্যাখ্যানে।

অথচ এমন কথা ছিল না মোটেই
এখনো ত্বকের নিচে অভিজাত উত্তরাধিকার
শব্দহীন বয়ে যায়, বাগানবাড়ির শখ, নানাছন্দে পদ্যচর্চা, সব।

আমি শর্তনিরপেক্ষ নই।
এখনো পুনর্জন্ম অসম্ভব নয়
যদি তুমি একবার তারপর বারবার সাক্ষাতের প্রতিশ্রুতি দাও।

বালককালের চোখের জল

তুলসী মুখোপাধ্যায়

বালককালের চোখের জল এখন চোখের জলে ধুয়ে যাচ্ছে
দুগাল বেয়ে ধুয়ে যাচ্ছে ধুয়ে যাচ্ছে
চোখের জলে চোখের জল ধুয়ে যাচ্ছে!

একদিন বড় কোনো দুঃখের সামনে দাঁড়ালেই
ফোয়ারার মতো ফেটে পড়ত পৃথিবী
যেমন চলৎশক্তিহীন রথে কর্ণের আকৃতি
একদিন বড় কোনো ক্ষমার সংস্পর্শে এলেই
ঝুপ্‌ঝুপ্‌ করে বৃষ্টি নামত চারধারে
যেমন ক্রুশবিদ্ধ যীশুখৃষ্ট
একদিন বড় কোনো ভালোবাসার মুখোমুখি হলেই
থৈথৈ জলে ভেসে যেত পথঘাট
যেমন বিদ্যাসাগরের জীবনী
আর আমি তালসুপুরির মাথা ছাড়িয়ে কখন দাঁড়িয়ে যেতুম
জবাকুসুমসঙ্কাশের মতো ছড়িয়ে পড়তুম নিখিল আকাশে
প্রতিজ্ঞার মতো কীসব দারুণ ইচ্ছে বিঁধে যেত বুকে!

আজকাল পায়পায় কেবল সীমানা, কাঁটাতার
দুহাত উঁচুতে উঠলে অবশ্য পতন
দুপা ছড়াতে গেলে
অনধিকারপ্রবেশ-দায়ে যাবজ্জীবন কারাবাস
আর দশদিকে খটখটে রোদ
দশদিকে খটখটে রোদ
বালককালের কোনো দাগও নেই জীবনযাপনে

বালককালের চোখের জল এখন চোখের জলে ধুয়ে যাচ্ছে
চোখের জলে চোখের জল ধুয়ে যাচ্ছে!

তেমন সময়

তরুণ সেন

তেমন সময় শুধু ভীষণ সংক্ষিপ্তভাবে আসে
ভিখিরিঅলার হাতে তুলে দিতে ইচ্ছে হয় সমস্ত সকাল
দরদালান, টেম্পো, ট্রাম, মোড়ের কাগজ-অলা
চায়ের টেবিলে কূট সর্বজ্ঞ তাত্ত্বিক
মনে হয় চিত্রপট—যেন বা রৌদ্রের স্রোতে ভিড় স্নানঘাটে
দুটি আঙুলের ফাঁকে যেন গলে যেতে পারে অবিশ্রাম কাল

মনে পড়ে—এরকম ভাবে আমি অভ্যস্ত নিয়মে
সাইরেন বা গির্জার ঘণ্টায় মিলিয়ে নিয়েছি হাতঘড়ি
জাতীয় সড়ক ছেড়ে মাইল মাইল প্রান্তরের বুকে নামে যেরকম চাষী
ফুটপাথ ছেড়ে আমি নেমে গেছি শহরের ভিড়ে
ভেসে গেছি মাঝে মধ্যে—যেন বিসর্জনশেষে খড়ের প্রতিমা
কখনো দেখেছি ঘাট, নোনাজলে স্নান করে তরতাজা রমণী
কিশোরীর চোখে ফিঙে, সুপুষ্ট মার্জার—গায়ে রৌদ্দুরের নিমা

ঘুম ভেঙে চলে গেছি বহুদিন শহরের বুকের গভীরে
তেমন ভিখিরিঅলা পেলে তার হাতে দেব
সকালের সমস্ত মহিমা
তেমন সময় শুধু মাঝে মধ্যে ভীষণ সংক্ষিপ্তভাবে আসে

এবার আমায় দীক্ষা দাও

ফিরোজ চৌধুরী

আমি প্রস্তুত হোয়ে এসেছি
প্রভু, এবার আমায় দীক্ষা দাও
আমার মাথা স্পর্শ কোরে বলো—
বৎস, কল্যাণ হোক
আমি ঘরে ঘরে তোমার বার্তা পেঁাছে দেবো
যে বার্তা মানুষকে বাঁচাতে শেখায়
সমস্ত পাপ এবং অন্ধকার থেকে..

সবুজ কচি পাতার মতন যেমন শিশুরা বেড়ে ওঠে
তেমনি বেড়ে ওঠে লোভ হিংসা ঘৃণা এবং ক্রূর চেতনা
সূর্যমন্দিরের দিকে যেতে মাঝপথে অকস্মাৎ দিগ্‌ভ্রম
তীরভূমিতে এলোপাথাড়ি অজস্র ঢেউ
মোনালিসার মুখে কী বদমায়েশি দ্যাখো!

আমি প্রস্তুত হোয়ে এসেছি
প্রভু, এবার আমায় দীক্ষা দাও।

বয়কট, বোমা ও ভদ্রলোক, ১৯০৫-১৮

হীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

এবিষয়ে আগে যা বলেছি তা মোটামুটি এইরকম: গত শতকের শেষাদিক থেকে ভদ্রলোকের আর্থনীতিক শোচনীয়তা রাজনৈতিক অর্থে তাদের খানিকটা বেপরোয়া করে তুলতে সাহায্য করেছিল। তার আগে ইংরেজিনবিশ ভদ্রলোকের সংখ্যা ছিল কম, অল্প আয়াসে ডেপুটি কিংবা—আরও ভাল—দারোগা হওয়া যেত; তাই ভদ্রলোকের পক্ষে মহারানী-বলতে-অজ্ঞান মডারেট হওয়াই ছিল স্বাভাবিক। কিন্তু উনিশ শতকের অষ্টম দশম থেকে দুর্গত ভদ্রলোকের চাকরির দাবি—তা সে একজন কার্জনের কাছে যতই বিরক্তিকর ঠেকুক—তাদের এক্স্‌ট্রিমিজ্‌মের পথে পেঁাছে দিল। ভদ্রলোকেরা শিল্পবাণিজ্যের পথেও যেতে পারতেন, কিন্তু সেদিকে দুটি অন্তরায় ছিল: বিদেশী স্বার্থ এবং ও ব্যাপারে তাঁদের নিজেদের রুচির বাধা। বাড়িতে বসে বৃহস্পতিবারে লক্ষ্মীপুজো করলেও সারস্বত ভদ্রলোকেরা অনেকেই মাস্টার হতেন (তাঁদের অধিকাংশই আবার তিন টাকা মাইনের প্রাইমারি স্কুলে), কিংবা সামান্য কেরানি, কিংবা ব্রীফ্‌বিহীন উকিল, কিংবা আদালতের গাছতলার মুহুরী। কলম পিষতে তাঁদের উৎসাহ থাকলেও সর্বথা যোগ্যতা ছিল না। বই মুখস্থের কিংবা সরাসরি নকলের প্রথা থাকলেও চেয়ার-বেঞ্চি ভাঙার হালফ্যাশান ছিল বলে জানা যায় না। হয়তো সেজন্যই পরীক্ষায় ব্যর্থতার সংখ্যা ছিল অত্যধিক, যেটা রাজনৈতিক দৃষ্টিতে ভয়াবহ। য়ুনিভার্সিটিজ্‌ অ্যাক্‌ট্‌ দিয়েও সরকার এই সমস্যা দূর করতে পারেন নি। তাছাড়া বঙ্গভঙ্গে এই আশঙ্কা দেখা দিল যে নতুন-তৈরী পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানেরা চাকরি বাগাবেন, পুরনো প্রদেশে সংখ্যাগরিষ্ঠ বিহারীরা। এমন কি ১৯১১-য় ভাঙা বাংলা জোড়া লাগলেও ভদ্রলোকেরা বিহার-উড়িষ্যা ফিরে পেলেন না, রাজধানীও উঠে গেল কলকাতা থেকে দিল্লী। তাতে চাকরির বাজার আরও সঙ্গীন হলো, বিশেষ অন্যান্য প্রদেশেও যখন ইংরেজি-পড়া লোকের প্রসার হচ্ছিল। অন্যান্য আপদের মধ্যে লক্ষ করেছি ১৯০৫—৭-এ সুজলা পূর্ববঙ্গে বন্যা, অনাবৃষ্টি, কোনও কোনও জায়গায় দুর্ভিক্ষ এমন কি। তদুপরি ১৯০৫-১৮ পর্যন্ত অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি, যাতে ঋণ না করে ভদ্রতা বজায় রাখা কঠিন হয়ে পড়েছিল। ভদ্রলোকের সান্ত্বনার একমাত্র জায়গা ছিল চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত; বঙ্গভঙ্গের ফলে সেটিও কিছু কালের মতো অস্থায়ী মনে হতে চলেছিল। মূল্যবৃদ্ধির ফলে ধান- ও পাট-বেচা কৃষকের সুরাহা হলেও খাজনা-আদায়কারীর সুবিধে হয় নি, কেননা বর্গা চাষের বিশেষ চল ছিল না। এমনিতেই জমি থেকে আয় গিয়েছিল কমে : একদিকে ১৮৮৫ সালের টেনান্সি অ্যাক্‌টে প্রজারঞ্জক ব্রিটিশরাজ রায়তের কিছু সুবিধে করে দিয়েছিলেন; অন্যদিকে প্রজননপটু খাজনাভোগী ভদ্রলোকের সংখ্যা বেড়ে চলেছিল মারাত্মকভাবে। আর যাই দোষ থাক তাঁদের, আমাদের বিদেশী শাসকেরা নিজেদের অক্ষমতা ঢাকতে 'ছোট পরিবারই সুখী পরিবার' কানের কাছে আড়কাঠির মতো নিত্য এই মন্ত্রণা দিতেন না ভদ্রলোকেরা সেহেতু অসুখী ছিলেন।

ইত্যাকার অবস্থায় বয়কট ও বোমা স্বভাবতই ভদ্রলোকের সমর্থন পেয়েছিল। জমিদার ও অধস্তন খাজনা-আদায়কারী ছাত্র, বেকার ও বুদ্ধিজীবী—এ'দের অনেকেই ছিলে

স্বদেশী ও সন্ত্রাসের পৃষ্ঠপোষক। বয়কট সমর্থক জমিদারদের মধ্যে কয়েকজন খুবই শক্তিশালী ছিলেন, যেমন মৈমনসিং, সুসং আর নাটোরের মহারাজ, উত্তরপাড়ার রাজা, ভাগ্যকুলের (ঢাকা) জমিদার। মুর্শিদাবাদের নবাব এবং কাশিমবাজার আর বর্ধমানের দুই মহারাজ রাজানুগত ছিলেন। হয়তো সেজন্য তাঁদের এলাকায় বয়কট কিংবা স্বদেশী সমিতি দেখা দেয় নি। তবে অন্যান্যেরা, প্রায় সব ছোটখাট জমিদারই—যথা পাবনা-রাজসাহী-মৈমনসিং-বাখরগঞ্জ-যশোর-খুলনা-নদীয়া-হুগলি জেলার জমিদারেরা—সমিতি ও স্বদেশীর আনুকূল্য করেছিলেন বলে পুলিস রিপোর্টে জানা যায়।

সুদূর গ্রামাঞ্চলে রায়তের জানপ্রাণের মালিক ছিলেন বলতে গেলে জমিদার ও তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গ : নায়েব-আমলা-লেঠেল-পাইক ইত্যাদি। জমিদার শুধু খাজনা পেতেন না, স্থানীয় হাট-বাজারের তিনিই ছিলেন স্বামী। তাঁর বাজারের দোকানদারকে তিনি অনায়াসে, এবং আইনসংগতভাবে, বিদেশী জিনিস বেচতে নিষেধ করতে পারতেন, শুধু ঢ্যাড়া পিটিয়ে দিলেই হলো। খরিদ্দারকেও স্বদেশী কিনতে চোখ-রাঙানো যেত, সে বেচারিও জমিদারের প্রজামাত্র। টেনান্সি অ্যাক্ট্ অনুসারে প্রজাকে ভিটেমাটিছাড়া করা বেআইনি ছিল বটে, কিন্তু কজন কৃষকই বা ভদ্রলোকের মতো আইনজ্ঞ ছিল এবং জলে বাস করে কুমিরের সঙ্গে লড়াইতেই বা কার উৎসাহ। সুতরাং উৎখাত না করা গেলেও উৎখাতের ভয় দেখানো যেত; আর কিছু না হোক জরিমানা কিংবা নানা রকম উপায়ে হয়রানি করা তো যেত।

বিদেশীবর্জনের আনুকূল্যমাত্র নয়, বেশ কয়েকজন ভূস্বামীর কাছ থেকে সমিতিসমূহ অর্থসাহায্য বা অন্য ধরনের সাহায্য পেয়েছিল। '১০০০্ টাকা দিব, বোমা প্রস্তুত কর', বলেছিলেন মৈমনসিংয়ের মহারাজা সূর্যকান্ত আচার্যচৌধুরী। যুগান্তর গ্রুপের ভূপেন দত্তের লেখায় এই খবর পাই। বঙ্গভঙ্গ হওয়ায় পাছে সাধের জমিদারি প্রথাই উঠে যায় এই আশঙ্কায় নাকি জমিদার-মহলে 'ইংরেজকে ঠেঙ্গাও বলিয়া রব উঠিয়াছিল'। মৈমনসিংয়ের আরেক জমিদার গৌরীপুরের ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী জাতীয় শিক্ষা পরিষদে পাঁচ লক্ষ টাকা দেন, তাছাড়া যুগান্তর গ্রুপের নেতা বারীন ঘোষকে একশ টাকা। ঠাকুরবাড়ির সুরেন্দ্রনাথ ও শিল্পী গগনেন্দ্রনাথ নিয়মিত অর্থসাহায্য করেছেন যুগান্তর কিংবা মানিকতলার দলকে। মেদিনীপুরের জনৈক জমিদারের তহবিল থেকে বছরে হাজার টাকা পেত যুগান্তর কাগজ। পাবনার জমিদার মুনসেফ অবিনাশ চক্রবর্তী দেন তাঁর যথাসর্বস্ব। উত্তর বাংলায় তাঁরই সহায়তায় মানিকতলার দল প্রভাব বিস্তার করেছিল। পুলিস ফাইলে ও আদালতের কাগজপত্রে আরও অনেক নাম পাওয়া যায়। যেমন কলকাতায় ওয়েলিংটন স্কোয়্যারের সুবোধ মল্লিক জাতীয় শিক্ষার কাজে এক লাখ টাকা দান করে সাধারণের মুখে রাজা সুবোধ মল্লিক নামে খ্যাত হন। তিনি বারীন ঘোষ ও তাঁর অগ্রজ অরবিন্দের বিশেষ গুণগ্রাহী ছিলেন। অরবিন্দের বন্দে মাতরম্ পত্রিকার অন্যতম প্রধান অংশীদার ছিলেন তিনি। কলিকাতা ব্রতী সমিতির স্থাপক-পোষক মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা গিরিডিতে অভ্রখনির মালিক ছিলেন, বাখরগঞ্জেও তাঁর জমিদারি ছিল। বাখরগঞ্জের আরেক জমিদার অশ্বিনীকুমার দত্ত ছিলেন স্থানীয় স্বদেশবান্ধব সমিতির সভাপতি। ঐ জেলার আরও আটজন জমিদার তাঁর সহকারিতা করেছেন। ঢাকা অনুশীলন সমিতির অন্যতম পরিচালক ভূপেশ নাগের জন্ম জমিদারঘরে। শ্রীরামপুরের জমিদার দুলাল নরেন গোসাঁই তো স্বদেশী ইতিহাসে মানিকতলা বোমা মামলার বিভীষণ হিসেবে কুখ্যাত হয়ে আছেন।

বস্তুত জমিদার ও অন্যান্য খাজনা-আদায়কারীদের সহায়তা এতই আন্তরিক মনে হয়েছিল যে তাঁর অসহযোগ পরিকল্পনায় অরবিন্দ খাজনা না দেয়ার কথা ভুলেও উচ্চারণ করেন নি। এই অসহযোগ বিষয়ে বন্দেমাতরম্ কাগজে ১৯০৭-এর এপ্রিলে তিনি কয়েকটি প্রবন্ধ লেখেন। প্রবন্ধগুলি পরে একত্রে *The Doctrine of Passive Resistance* নামে বই হয়ে বেরিয়েছে। অরবিন্দ বলছেন যে সরকার অচল করতে হলে ব্রিটিশ আর্থনীতিক 'শোষণ'ব্যবস্থায় ঘা দিতে হবে; অতএব বিদেশী দ্রব্য কিনব না। 'বিজাতীয়' শিক্ষাপদ্ধতির —বিপিনচন্দ্র যাকে সরকারি গোলামখানা বলে ধিক্কার দিতেন—অবসান চাই; অতএব 'ন্যাশনাল স্কুল' গড়তে হবে। আদালতের 'পক্ষপাত' বন্ধ করতে হবে; চাই জনগণের পঞ্চায়েত। এবং সরকারি পুলিশি দুঃশাসন রুখতে চাই বেসরকারি সমিতি। কিন্তু এসব যাই করা হোক না কেন, জমিদারের মাধ্যমে সরকারের প্রাপ্য খাজনা মিটিয়ে যেতে হবে। কেননা, অরবিন্দের যুক্তি, 'in Bengal. . .a refusal to pay rents would injure not a landlord class supported by the alien [আয়র্ল্যান্ডে যেমন] but a section of our own countrymen who have been intolerably harassed, depressed and burdened by. . .bureaucratic exactions and fully sympathise, for the most part, with the national movement'. অরবিন্দের বক্তব্যে আন্দোলনের শ্রেণী-চরিত্র স্পষ্ট। জমিদারের প্রতি মমতায় তাঁর সঙ্গে মডারেটদের (যাঁরা কিনা সমগ্র ভারতেই চির-স্থায়ী বন্দোবস্তের প্রয়োগ চাইতেন) প্রভেদ ছিল না। ফলে তিনি যে নব্য-'ক্ষত্রিয়' বাহিনী তৈরী করেন তাঁদের ঘোষিত উদ্দেশ্য গীতাবর্ণিত শ্রীকৃষ্ণের অনুসারী হলেও বারীন ঘোষের সানুতাপ আত্মকথনে তাঁরা ছিলেন সম্পন্নের স্বার্থরক্ষায় 'ভাড়াটিয়া গুণ্ডা' মাত্র।

এদিকে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আয়ু বিষয়ে যেইমাত্র তাঁরা নিশ্চিন্ত হলেন, তখন থেকেই বহু জমিদার আন্দোলন থেকে সংবৃত। বঙ্গভঙ্গের সহমরণে জমিদারি যাবে না বুঝে তাঁরা যে সরকারের বশংবদ তা জানিয়ে ঘোষণাপত্র প্রকাশ করলেন, ১৯০৭-এর মাঝা-মাঝি। তিক্ত-বিষণ্ন, অরবিন্দ তাঁদের নতুন বর্ণনা দিলেন : 'অশিক্ষিত হাতজোড়করা চাপ্রাশি'। যুগান্তর গাল পাড়ল এই বলে যে এরা বাংলাদেশের চিরন্তন দাসবংশ। জমিদারদের সরকারি দলে টেনে আনতে আরও একটু সাহায্য করল মর্লে-মিন্টো সংস্কারের প্রতিশ্রুতি। তারপর ১৯০৮-এর গ্রীষ্মে যখন বোমা ফাটল মজঃফরপুরে, নরেন গোসাঁইয়ের স্বীকারোক্তিতে অনেক গোপন কথা বেরিয়ে পড়ল মানিকতলা মামলায়, তখন জমিদারকুলে ধর্মভয় যেন ভাল করেই ফিরে এল। দুই বাংলার জমিদার-সমিতি সরকারকে পরামর্শ দিলেন জবরদস্ত শাসনের। রাজভক্ত জমিদারদের নিয়ে একটা ইম্পীরিয়ল লীগ্ জন্ম নিল, তার অন্যতম সভ্য প্রাক্তন বিপ্লবী গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর। মৈমনসিং-সুসং-উত্তরপাড়ার সঙ্গে রাজবন্দনায় গলা মেলালেন অন্যান্য ছোটখাট জমিদার, রায়বাহাদুর আর খানবাহাদুর। সরকারি দলিলে তাঁদের আনুগত্য অক্ষয় হয়ে আছে।

কয়েকজন জমিদার অবশ্য সমিতির সঙ্গ ছাড়েন নি। তাঁদের মধ্যে নাড়াজোলের রাজাসহ ছ'জনের উল্লেখ পাই ১৯০৮-এর মেদিনীপুর ষড়যন্ত্রে। ১৯১০-এ বাংলা সরকার যে তিপ্পান্ন জনকে নির্বাসন দেয়ার কথা ভাবেন তাঁদের মধ্যে চারজন জমিদারবংশীয়। প্রথম মহাযুদ্ধকালে ঢাকা অনুশীলনের কয়েকজন নামকরা কর্মী এসেছিলেন ত্রিপুরা জেলার এক জমিদারবাড়ি থেকে। যেসব জমিদার আর্মস্ অ্যাক্টের আওতায় পড়তেন না তাঁদের কারও কারও বন্দুক সন্ত্রাসবাদীর কাজে লেগেছে।

উকিল-মোক্তার-মাস্টার জাতীয় শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী ভদ্রলোকেরাও সন্ত্রাসবাদীকে স্বাগতম্ জানিয়েছেন। ঢাকা অনুশীলন সমিতির কাগজপত্রে তার প্রমাণ আছে। সমিতির অধীন জেলা-সংগঠকদের তিন মাস অন্তর কেন্দ্রে রিপোর্ট পাঠাতে হতো। চট্টগ্রাম জেলার নজমপুর পরগনার অন্তঃপাতী দুর্গাপুর থেকে ১৯১২ সালে লেখা এই রকম একটি ত্রৈমাসিক বিবরণে সংগঠক মহাশয় যা জানাচ্ছেন তা বাংলায় এইরকম : এই পরগনায় ভদ্রলোকের বসতি একমাত্র এই দুর্গাপুরে। এই স্থানেই আমি থাকি। এইখানে কিঞ্চিৎ কাজকর্ম হইতে পারে বলিয়া আশা করা যায়। দুর্গাপুরের নিকটবর্তী ফেণী যদ্যপি একটি ক্ষুদ্র শহর, তথায় বহু শিক্ষিত লোকের বাস। তথাকার পরিস্থিতি সেজন্য সাতিশয় সুবিধাজনক।

ঢাকা জেলা, বিশেষ করে বিক্রমপুর পরগনা, তৎকালীন বাঙালি ভদ্রলোকের অন্যতম পীঠস্থান। এবং ভারতবর্ষে কেরানি ও বিপ্লবী উভয়ই ঢাকা-বিক্রমপুরের দান। ঢাকা সমিতির সন্ধ্যাভাষায় বিক্রমপুরের নাম তাৎপর্যময় : সাহসপুর। ঐ সমিতির প্রধান উদ্যোক্তাদের অনেকেই ওকালতি করতেন পূর্ব বাংলায় সন্ত্রাসবাদের আরেক ঘাঁটি মাদারিপুরে। এখানেও, সিডিশন কমিটি লক্ষ করেন, বহু ইংরেজিবিদ্ ভদ্রলোকের বসবাস। ভূপেন দত্ত লিখছেন যে কলিকাতা-অনুশীলন সমিতির প্রচারকেরা বিহার আর উড়িষ্যায় প্রবাসী বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের কাছে সাদর অভ্যর্থনা পেতেন। মেদিনীপুরে মানিকতলার বোমারু হেমচন্দ্র দাসেরও অনুরূপ অভিজ্ঞতা। ১৯০৮ সালে মেদিনীপুরে যে ছাব্বিশজনকে গ্রেপ্তার করা হয় তাঁদের মধ্যে ছিলেন সাতজন উকিল, পাঁচজন কেরানি, একজন সাংবাদিক আর একজন ইস্কুল মাস্টার। বাখরগঞ্জে স্বদেশী স্বেচ্ছাসেবকদের ভিতর অনেকেরই আত্মীয় কিংবা অভিভাবক ছিলেন সরকারি চাকুরে। ঐ জেলার ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব তাঁর ডায়েরিতে নালিশ করছেন : জেলার শিক্ষকেরা 'anti-Government to a man' এবং উকিলেরা 'for the most part thoroughly disloyal'. স্বদেশী ফান্ড্-এ দানের উদ্দেশে বাখরগঞ্জের উকিলেরা মক্কেলদের নিকট বাড়িতে ফী নিতেন। স্বদেশীওয়ালাদের মোকদ্দমার তদ্বির অনেক সময় তাঁরা বিনা পয়সায় করতেন; বাদীপক্ষে সওয়াল করার জন্য উকিল জোগাড় করাই ছিল ভার। কলকাতায় অনুশীলন সমিতির সভাপতি ও সহ-সভাপতি, যথাক্রমে প্রমথনাথ মিত্র ও চিত্তরঞ্জন দাস, দুজনেই ব্যারিস্টার। মানিকতলা মামলায় অরবিন্দের পক্ষ সমর্থন করেই চিত্তরঞ্জন দেশজোড়া খ্যাতি অর্জন করেন। তার আগে তাঁকে বড় কেউ চিনত না।

সন্ত্রাসবাদী অনেকের দুরবস্থার প্রমাণ মেলে। তাঁর 'অগ্নিদিনের কথা'-য় ঢাকা অনুশীলনের শ্রীযুক্ত সতীশ পাকড়াশি জানাচ্ছেন যে যে-সব দুর্গত খাজনা-আদায়কারী অন্য কোনও কাজকর্ম পান নি তাঁদের অনেকেরই সমিতির কাজে নাম লিখিয়েছেন। একাধিক পুলিস রিপোর্ট্ এ কথার সমর্থক। ১৯১০ সালে ঢাকা মামলায় জড়িত সাতচল্লিশ জনের মধ্যে একত্রিশ জনই বেকার। ১৯০৭-এ চাঁদপুরে সরকারি কেরানিগিরির জন্য ব্যর্থ-আবেদন অনেকেই স্থানীয় সমিতির স্বেচ্ছাসেবক হয়েছেন। তেমনি, ঐ বছর বরিশালে সমিতি-স্বেচ্ছাসেবকদের ভিতর অন্তত একশজন স্থানীয় সেট্‌ল্‌মেন্ট্ অফিসের ছাঁটাই যুবক। বাখরগঞ্জ জেলায় স্বেচ্ছাসেবকদের বহুলাংশেরই অন্য কোনও কাজ ছিল না। পূর্ব বাংলায় সমগ্রভাবে স্বদেশী কর্মীদের বেশ একটা বড় অংশই ছিলেন বেকার ভদ্রলোক। সেখানে যে কয়েক শ' সন্দেহজনক লোকের নাম পুলিসের খাতায় ছিল তাঁদের মধ্যে শতকরা বিয়াল্লিশ

জন, ১৯১৫ সালে বাংলা জেলা শাসন কমিটির হিসেব অনুসারে, বেকার বা প্রায়-বেকার। এঁদের প্রত্যেকের কার্যকলাপের আনুপূর্বিক ইতিহাস অনুসরণ করে কমিটি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছন যে যাঁরা মোটামুটি একটা কাজ জোটাতে পারেন নি তাঁরা প্রায় অনিবার্যভাবেই সন্ত্রাসী আন্দোলনে যোগ দিয়েছেন।

স্ট্যাটিস্টিক্স্ আর পুলিস ডসিয়েতে যে তথ্য শুকনো ইতিহাস, হঠাৎ কোনও ব্যক্তিগত চিঠি কিংবা ডায়রিতে সে বর্তমানের মতোই স্পন্দিত হতে পারে। ১৯০৭-এ পুলিশি হানায় এমন একটি চিঠি পাওয়া যায় ঢাকা অনুশীলন সমিতিতে। বোন লিখছে ভাইকে, পুলিসের খাতায় ইংরেজি অনুবাদ আছে, সে যুগের বাংলায় এই রকম দাঁড়াবে: এইসঙ্গে অনাথ ও কানুকে লেখা পত্রগুলি তুমি তাহাদিগকে কষ্ট করিয়া দিয়া দিবা; আমি কেন এজন্য অনর্থক চারিটা পয়সা ব্যয় করিব?...শুনিয়া যারপরনাই আনন্দিতা হইলাম যে বাবার পাঁচ টাকা মাহিয়ানা বৃদ্ধি হইয়াছে। তোমাদের সকলের রোজগারে যেদিন তিনি বসিয়া খাইতে পারিবেন সেই দিন আমাদের কত না সুখের দিন হইবে। হায়! তিনি ষোল বৎসর বয়স হইতে চাকুরির ঘানি ঠেলিতেছেন।...আমি এখন তাঁহার জন্য একটা সোয়েটার বুনিতেছি। বিলাতি উল বলিয়া রাগ করিও না; পশম স্বদেশী কোথায় পাইব?

এই প্রসঙ্গে কয়েকজন সন্ত্রাসবাদীর ব্যক্তিগত ইতিহাস পরীক্ষার যোগ্য। শতকের সূচনায় বারীন ঘোষ যখন বাংলাদেশে বিপ্লব প্রচার করে বেড়াচ্ছিলেন তখন তাঁর নিজস্ব কোনও অর্থসংগতি ছিল না। দেওঘরে মাতামহ রাজনারায়ণ বসুর আশ্রয়ে থেকে কুড়ি বছর বয়সে তিনি সাধারণভাবে এনট্রান্স্ পাশ করেন, পাটনা কলেজে এফ. এ. ক্লাসে ভর্তি হন। তারপর রাজনারায়ণ মারা গেলেন, বারীন্দ্রের পড়াশুনো ইতি। এইবার জীবিকার সন্ধান, তিনটে অস্থায়ী টিউশন, তারপর পাটনায় এসে চায়ের দোকান বাঁকিপুরে, সেই কলেজ-গেটের সামনে: B. Ghose's Tea Stall. Half-anna Cup. Rich in Cream. সে সময়কার একটি চিঠিতে দিদি সরোজিনীকে লিখছেন: 'সম্মুখে ভীষণ দারিদ্র্য আসিতেছে; যে টাকা আছে তাহাতে মাস তিনেক চলিবে, তাহার পর কী হইবে ভগবান জানেন।...আমি এত নিঃসহায় তা আগে বুঝি নাই।' পাটনায় প্লেগের মড়ক লাগায় চায়ের দোকান তুলে দিয়ে বারীন্দ্র চলে যান অধ্যাপক অরবিন্দের আশ্রয়ে, বরোদায়। তারপর বরোদা থেকে বাংলা। ১৯০৮-এ যখন বারীন মানিকতলার বাগানবাড়িতে ধরা পড়েন তখন তাঁর বয়স আঠাশ হলেও চেহারা দেখলে কেউ বিপ্লবী যুবক বলবে না: ওজন মাত্র বিরানব্বই পাউন্ড, চোখে মাইনাস সাড়ে সাত পাওয়ারের চশমা। এসব কথা বারীন্দ্রের নানা আত্মকথায় ছড়িয়ে আছে। তাঁর ও তাঁর সহকারী বন্ধুদের কথা পুলিস রিপোর্ট থেকেও জানা যায়। যেমন উল্লাসকর দত্ত: এফ. এ. ফেল; বস্ত্রশিল্প বিষয়ে কিছু শিখেছিলেন, কিন্তু প্রয়োগের সুযোগ হয় নি। মানিকতলা মামলার বিচারক তাঁর রায়ে বলছেন যে একমাত্র দীনদয়াল নামে জনৈক যুবক ছাড়া যুগান্তর গ্রুপের বাকী সকলেই প্রায় নিরুদ্দেশ ভবঘুরে। দীনদয়াল ছিলেন ট্রামওয়েতে সামান্য ক্যাশিয়ার। বোমার আন্দোলনে অন্যতম প্রথম শহীদ মেদিনীপুরের ক্ষুদিরাম—যাঁকে আমরা 'অগ্নি-শিশু' বলে romanticise করি—অত্যন্ত গরিব ঘরের ছেলে। তাঁকে খুব কাছ থেকে দেখেছেন হেম দাস। তাঁর লেখা পড়লে জানা যায় ক্ষুদিরাম 'বাংলার হাজার-হাজার ছেলের মতোই একটি ছেলে', বহুদিন যাঁকে 'অর্ধভুক্ত বা অভুক্ত' অবস্থায় কাটাতে হয়েছে। মানিকতলা বা যুগান্তর দলের সমসাময়িক ঢাকা অনুশীলনের দলপতি পুলিন-বিহারী দাস। তাঁর বাবা মিউটিনির সময় সরকারপক্ষে ভলান্টিয়ারি করেও কেরানিগিরির

উপরে উঠতে পারেন নি। ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট পিতৃব্য এবং সামান্য কিছু জমিজমা ছিল বটে, কিন্তু বাপের মৃত্যুর পর পুলিন দাসকে সংসারের দায়িত্ব নিতে হয়। ইতিমধ্যে তিনি তিনবার এফ. এ. ফেল করেছেন, দুবার বি. এ.—অবশ্য পাশ করলেই যে বাংলাদেশে রাজা হওয়া যায় না সে আমরা আগেই দেখেছি। ঢাকা কলেজে পুলিনবাবু ল্যাবরেটরি অ্যাসিস্ট্যান্ট্ হন। তাঁর চেয়েও বিখ্যাত দুজন বিপ্লবী পশ্চিমবঙ্গের বাঘা যতীন এবং রাসবিহারী বসু। এঁদের মধ্যে প্রথমজন এন্‌ট্রান্স্ পাশ করেছিলেন, দ্বিতীয় জন এন্‌ট্রান্সের চৌকাঠ পার হন নি। জীবিকার দিক থেকে ফল তুল্যমূল্য : দুজনেই কেরানি। কেরানিগিরিও জোটাতে পারেন নি এমন একজন সন্ত্রাসবাদী খুলনার বিধুভূষণ দে। বাংলার অ্যাড্‌ভোকেট্-জেনারেল কেন্‌রিক্ সাহেবের কাগজপত্রের মধ্যে এঁর ডায়রির ভগ্নাংশ প্রাপ্য; ১৯০৯ সালের এপ্রিল-অগস্ট্ মাসে লেখা। বিধুভূষণের কর্মলাভের যোগ্যতা-অযোগ্যতা বিচারের সুযোগ আসে নি, কেননা চাকরির সন্ধানে ভদ্রস্থ হয়ে বেরোনোর মত তাঁর জামা-কাপড় কিংবা জুতো কোনটাই ছিল না। কোনও কোনও দিন তাঁর স্রেফ অনশনে গেছে, পয়সা না থাকায় বিনাতেলে স্নান করতে হয়েছে, এদিকে তাঁর পরিবারের লোকেরা তাঁরই মুখ চেয়ে ছিলেন। আরেক জন অখ্যাত বিপ্লবী রসিকচন্দ্র সরকার। রাজসাহী জেলে তিনি আত্মহত্যা করেন ১৯১৮ সালে। জেলের খাওয়া সুনিশ্চিত হলেও তাঁর মুখে রোচে নি এই জন্য যে তাঁর বাড়ির অন্যান্য সকলের কিছুই জুটছিল না। ম্যাজিস্ট্রেটের রিপোর্টে রসিক সরকারের কাহিনী মর্মান্তিক, কিন্তু মহিমময়। সারা গায়ে কেরসিন ঢেলে তিনি আগুন জেবলে দেন, কিন্তু ঐ যন্ত্রণার মধ্যেও অভিমানবশত চীৎকার করেন নি।

আন্দোলনে ছাত্রসম্প্রদায়ের ভূমিকা সংক্ষেপে কী ছিল? বাঙালী ছাত্রকে ম্যাট্‌সিনি-গ্যারিবল্‌ডির কথা শুনিয়ে প্রথম ক্ষেপিয়ে তোলেন সুরেন্দ্রনাথ, '১৮৭০-এর দশকে। ১৮৮৩-তে ইল্‌বর্ট্ বিল্ উপলক্ষ্য করে ছাত্রদের রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে সক্রিয় প্রবেশ। এইবার বয়কট ও বোমার আন্দোলনে তাঁরাই ছিলেন পুরোভাগে। আগেই লক্ষ্য করেছি যে সিডিশন কমিটির গণনা অনুসারে ১৯০৭-১৭ সালের মধ্যে বৃত্তি-অনুযায়ী যে ১৩৫ জন ভদ্রলোক বাংলাদেশে তাঁদের মধ্যে ৬৮ জন—তার মানে শতকরা পঞ্চাশের কিছু বেশি ছিলেন ছাত্র।

বাংলা-ভাষা-বিরোধী আন্দোলনে গোড়া থেকে ছাত্রেরা অংশ নেন। অগস্ট্ ১৯০৫ থেকেই দেখা গেল সঙ্ঘবন্ধ ছাত্রদল হাটে-বাজারে বিলেতিবর্জনের নীতি প্রয়োগ করে চলেছেন। এই কাজে তাঁদের দ্রুত সাফল্যের প্রমাণ কার্লাইল্ ও লিয়ন্ সার্কিউলর্। অক্টোবরে এই দুটি সার্কিউলরের মাধ্যমে দুই বাংলার সরকার স্থির করলেন: সরকারী সাহায্যভোগী স্কুলের ছাত্রেরা যদি বয়কটে মাতেন তাহলে সেই সব স্কুল ভবিষ্যতে আর সরকারী প্রশ্রয় পাবে না এবং সরকারী বৃত্তি-পাওয়া ছাত্র ভর্তি করতে কিংবা বৃত্তি-পরীক্ষায় ছাত্র পাঠাতে পারবে না; ঐসব বিদ্যালয় যাতে অনুমোদিত না হয় সেজন্য বিশ্ববিদ্যালয়কে নির্দেশ দেয়া হবে; এবং আন্দোলিত ছাত্রদের পক্ষে সরকারী কর্ম হবে আরও দুর্লভ।

কার্লাইল্ ও লিয়ন্ সার্কিউলরের প্রতিবাদে কলকাতার বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ছাত্রেরা গঠন করেন অ্যান্টি-সার্কিউলর্ সসায়টি। তার নেতা সিটি কলেজের ছাত্র শচীন্দ্র-প্রসাদ বসু। কলকাতার বাইরের ছাত্রসমাজের সঙ্গে এই সসায়টির সম্বন্ধ ছিল। তাছাড়া সরকারী সার্কিউলরে অনেক ছাত্রের কিছুমাত্র যায় আসে নি, এজন্য যে এমনিতেই বেশির

ভাগ স্কুল সরকারী সাহায্য পেত না; বহু স্কুলেই এন্ট্রান্স্ পর্যন্ত পড়ানোর ব্যবস্থা ছিল না, সুতরাং বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন না পেলেও তাদের চলত। সরকার-নিয়ন্ত্রিত স্কুল থেকে যে-সব ছাত্রের নাম কাটা গেল তাঁদের পড়াশুনার জন্য জাতীয় শিক্ষা পরিষদের ব্যবস্থাপনায় অনেকগুলি 'ন্যাশ্‌নাল্' স্কুলও ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে উঠল।

বাংলাপ্রদেশে 'ন্যাশ্‌নাল্' স্কুলের সংখ্যা অবশ্য খুব বেশি ছিল না। ১৯১০ সালের সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে এই রকম দশটি স্কুল খোলা হয়, তার ভিতর আটটি ১৯০৮-এর মে মাসের মধ্যে। মানিকতলার যুবকেরা দলের লোক বাড়াবার জন্য স্কুল-কলেজে প্রচারের উপর বিশেষ জোর দেন নি; তাঁদের প্রচারযন্ত্র ছিল প্রধানত খবরকাগজ আর বক্তৃতা। এই দলে একমাত্র হৃষিকেশ কাঞ্জিলাল স্বেচ্ছায় স্কুলমাস্টার হয়েছিলেন, যাতে করে ছাত্রদের কাছে ইংরেজের 'অনন্ত ভণ্ডামি' উদ্‌ঘাটন করা যায়। মানিকতলা মামলা কিংবা মেদিনীপুর মামলা থেকে জানা যায় যে মানিকতলা গ্রুপ এবং তাঁদের সহকারী দলগুলি ছাত্রদের মধ্যে বিশেষ সুবিধে করে উঠতে পারেন নি। ১৯০৮ সালে মেদিনীপুরে যে ছাব্বিশ জনকে বন্দী করা হয় তাঁদের মধ্যে ছিলেন মাত্র একটি ছাত্র।

পূব বাংলার কথা স্বতন্ত্র। বিলেতের টাইম্‌স্ কাগজের বিশেষ সংবাদদাতা ১৯০৯ সালে লিখছেন যে সাধারণভাবে বাঙালেরা কলকেতার ঘটিবাবুদের চাইতে 'more courageous, more determined, more persistent। হয়তো সে কারণে ১৯০৮-এর মে মাসের মধ্যে পূর্ববঙ্গে চল্লিশটি 'ন্যাশ্‌নাল্' স্কুল দেখা দেয়; আড়াই থেকে তিন হাজার ছাত্র এইসব স্কুলে ভর্তি হয়েছিল। ১৯০৮-এ লিখিত পূর্ববঙ্গীয় শিক্ষা-বিভাগের ডিরেক্টরের রিপোর্ট পড়লে অনুমান হয় যে এই চল্লিশটি স্কুলেই পাঠ্যবস্তু জাতীয়তাবাদী, শিক্ষকেরা এক্‌স্‌ট্রিমিস্‌ট্, ছাত্রেরা ঘোর দেশপ্রেমী। তাঁরা পড়তেন রজনীকান্ত গুপ্তের আর্যকীর্তি, হেম বাঁড়ুজ্যের ভারতভিক্ষা, নবীন সেনের পলাশির যুদ্ধ। চল্লিশটির মধ্যে অন্যূন ছটি স্কুলে ছোরা-লাঠি-তরোয়াল-তীরধনুক ইত্যাদির ব্যবহার শেখানো হতো। 'ন্যাশ্‌নাল্' স্কুলের সংখ্যা পরের বছর আরও বেড়ে যায়; ১৯০৯-এর গ্রীষ্মে পূর্ববঙ্গে মোট পঁয়ষট্টিটি এইরকম বিদ্যালয় চালু ছিল। তার মধ্যে আটান্নটি ফরিদপুর (১১), ত্রিপুরা (১১), বাখরগঞ্জ (৯), ঢাকা (৮), মৈমনসিং (৮), শ্রীহট্ট (৫), রংপুর (৪) আর পাবনা (২) জেলায়। জলপাইগুড়ি, রাজসাহী, দিনাজপুর, বগুড়া, মালদহ, চট্টগ্রাম ও নোয়াখালিতে একটি করে বাকী সাতটি।

ছাত্রদের সঙ্গে পূর্ববঙ্গের সমিতিগুলির ছিল নিবিড় যোগ। মৈমনসিং জাতীয় বিদ্যালয়ের বহু ছাত্র স্থানীয় সাধনা সমাজের সদস্য ছিলেন। ঢাকা ন্যাশ্‌নাল্ স্কুল আর ঢাকা অনুশীলন সমিতি বলতে গেলে যমজ। ঢাকা মোকদ্দমায় প্রকাশিত হয় যে নোভেম্বর ১৯০৫-এ বিপিন পাল ও প্রমথ মিত্র ঢাকায় আসেন, তখন ঐ স্কুল আর সমিতি জন্ম নেয়। সমিতি ছিল পঞ্চাশ নম্বর ওয়ারিতে, স্কুলের ঠিকানা একান্ন ওয়ারি। সমিতির নেতা পুলিন দাস ও তাঁর সহকারী ভূপেশ নাগ উভয়েই ছিলেন পাশের বাড়িতে শিক্ষক। বরিশালে ব্রজমোহন ইন্‌স্টিটিউশন্ (ব্রজমোহন স্কুল ও কলেজের মিলিত নাম) সম্বন্ধে জেলার পুলিস সাহেব ও ম্যাজিস্ট্রেটের উদ্বেগের অন্ত ছিল না। তাঁদের বর্ণনায় এই প্রতিষ্ঠান ছিল আন্দোলনের কেন্দ্র, 'a nursery for volunteers and a school for sedition'। অশ্বিনীকুমার দত্ত ছিলেন একাধারে ব্রজমোহন ইন্‌স্টিটিউশন্ ও স্বদেশবান্ধব সমিতির কর্তা। আবার কলেজেরই অধ্যাপক সতীশ চট্টোপাধ্যায় সমিতির সেক্রেটারি। সমিতির

দলবৃদ্ধির জন্য ছিলেন স্কুল আর কলেজের ছাত্রেরা; সমিতির ভলান্টিয়ারদের ক্যাপ্টেন ও লেফ্‌টেন্যান্ট্‌ হবার জন্য অধ্যাপকেরা; সমিতির লাঠিখেলার জন্য তেমনি কলেজের আঙিনা —মন্তব্য করছেন বাখরগঞ্জের বিচলিত কর্তৃপক্ষ। তবে একটা জিনিসে খট্‌কা লাগছে। সেপ্টেম্বর ১৯০৭-এর একটি পুলিস রিপোর্টের সঙ্গে উপরের বর্ণনা মিলছে না। এই রিপোর্ট্‌ পড়লে মনে হবে বাখরগঞ্জের আন্দোলনে ছাত্রদের এত বড় অংশ ছিল না: বাখরগঞ্জের যে ছটি থানায় ভলান্টিয়ারদের সংখ্যা শতাধিক সেখানে তাদের মধ্যে 'ছাত্র কিংবা প্রাক্তন ছাত্র' শতকরা সতেরর চেয়ে সামান্য কিছু বেশি। বরিশাল থানায় ভলান্টিয়ার-ছাত্রের শতকরা সংখ্যা আরও কম: ৩০৯ জন ভলান্টিয়ারের মধ্যে মাত্র ৩৪ জন 'ছাত্র কিংবা প্রাক্তন ছাত্র'।

১৯০৯ সালের সূচনা থেকে 'ন্যাশ্‌নাল্‌' স্কুলের ক্ষয় শুরু। তার অনেক কারণ ছিল। ঠাণ্ডামাথা স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিচালনায় জাতীয় শিক্ষা পরিষদ মডারেট রাজপথে অবিচল থেকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিকল্প হয়ে দাঁড়ায়। বিরক্ত অরবিন্দ অগস্ট্‌ ১৯০৭-এ কলকাতা ন্যাশ্‌নাল্‌ কলেজের অধ্যক্ষপদে ইস্তফা দেন; তার পরে কয়েক মাস তিনি সেখানে ইতিহাস ও রাষ্ট্রবিদ্যা পড়ালেও ১৯০৮-এর মে মাসে মানিকতলা মামলা বাবদ গ্রেপ্তার হবার পর জাতীয় শিক্ষা পরিষদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিন্ন হয়। তখন থেকে পরিষদ একেবারেই মডারেট্‌। ডিসেম্বরে সরকারের রুদ্রমূর্তি দেখে স্যর গুরুদাস অচিরে 'ন্যাশ্‌নাল্‌' স্কুলের ছাত্রদের রাজনীতি পরিহার করে অধ্যয়নে তপস্যারত হতে উপদেশ দেন। তাছাড়া চাকরির বাজারে পরিষদের চাইতে য়ুনিভার্সিটির সার্টিফিকেটের দাম ছিল বেশি। সুতরাং 'জাতীয়' বিদ্যালয়গুলির আর্থিক বাড়বাড়ন্ত হয় নি। কোনও কোনও স্কুল পরিষদ থেকে মাসে-মাসে অর্থসাহায্যও পেত, সব স্কুল পেত না। স্যর তারকনাথ পালিত পরিষদকে যে দু হাজার টাকা দিচ্ছিলেন, ১৯১২-র জুন থেকে তা বন্ধ হয়ে যায়। শিক্ষকেরা সময়মত মাইনে পেতেন না, যদিও এটা উল্লেখযোগ্য যে দুর্মর আদর্শবাদী কেউ-কেউ স্বেচ্ছায় বিনা মাইনেয় পড়াতেন। স্কুলগুলির প্রধান ভরসা ছিল ছাত্রদের গুরুদক্ষিণা, স্থানীয় ভদ্রলোকদের কাছ থেকে গৃহীত চাঁদা, এবং দোরে-দোরে মুষ্টিভিক্ষা। এ অবস্থায় 'জাতীয়' শিক্ষা মাথায় উঠল। ১৯১২-য় পুনর্মিলিত বাংলাদেশে 'ন্যাশ্‌নাল্‌' ছাত্রসংখ্যা ছিল কিঞ্চিদধিক এক সহস্র, অর্থাৎ বাংলাদেশে মোট পুরুষ ছাত্রের পঁচিশ ভাগের এক ভাগ। স্কুলের সংখ্যা ছিল মাত্র ষোল। পরবর্তী পাঁচ বছরে ষোলকলা ক্ষয়ে ছ'য়ে দাঁড়াল।

এই প্রসঙ্গে বিক্রমপুরের সোনারং ন্যাশ্‌নাল্‌ স্কুলের কথা এসে পড়ে। ১৯১০ সালে সন্ত্রাসবাদীদের প্রভাবাধীন একমাত্র 'ন্যাশ্‌নাল্‌' স্কুল, এটি স্থাপিত হয় ১৯০৮-এর এপ্রিলে। জাতীয় শিক্ষা পরিষদের অনুমোদিত না হলেও এই স্কুল ছিল ঢাকা জেলায় সবচেয়ে বর্ধিষ্ণু 'ন্যাশ্‌নাল্‌' স্কুল। এর দু বছর বয়স অবধি সরকার এই স্কুলের বিরুদ্ধে আপত্তিকর কিছু পান নি। ১৯১০-এর জুলাইতে পুলিন দাস যখন ঢাকা মামলায় আসামী হন তখন তাঁর কয়েকজন বিশ্বস্ত অনুচর সোনারং গ্রামে আশ্রয় নেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন ত্রৈলোক্য চক্রবর্তী ও প্রিয়নাথ আচার্য। প্রথমোক্তের আত্মকথা ও বরিশাল মামলায় দ্বিতীয়োক্তের স্বীকৃতি থেকে জানতে পারি যে সমিতির সোনারং পর্বে তাঁদের গুরু ছিলেন মাখন সেন, সোনারং স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান শিক্ষক। ত্রৈলোক্য চক্রবর্তী ও অন্যান্যেরা স্কুলের শিক্ষক হয়ে সংলগ্ন হস্টেলে থাকতেন। এখান থেকে গুরু-শিষ্য সহযোগিতায় অন্তত তিনটি ডাকাতি হয়। একটা ছোট মামলায় জড়িয়ে পড়ার ফলে জানুয়ারি ১৯১১-তে সোনারং স্কুল

উঠে যায়। যাঁরা এই মামলা ফস্‌কে বেরিয়ে যান তাঁরা আবার ঢাকায় ফিরে আসেন, এবার তাঁদের নেতা হন সোনারঙের প্রাক্তন ছাত্র নরেন সেন।

'ন্যাশ্‌নাল্‌' স্কুলের ছদ্মবেশে তাঁরা এখন থেকে সাধারণ স্কুল-কলেজের দিকে নজর দেন। ১৯১২ সালের ঢাকা সমিতির কয়েকটি দলিল সন্ত্রাসবাদী কাজে ছাত্রদের গুরুত্ব প্রমাণ করে। তার মধ্যে ত্রৈমাসিক বিবৃতির কথা আগেই বলেছি। আর একটি দলিলের বিষয় জেলা সংগঠন পরিকল্পনা। এই পরিকল্পনায় জেলা-সংগঠককে নির্দেশ দেয়া হয় যে সমিতির জনবল বৃদ্ধির জন্য ছাত্রমহলে যেন বিশেষ জোর দিয়ে প্রচার করা হয়। সমিতিতে 'গৃহী' মানুষের প্রবেশ নিষেধ নয়, তবে অবিবাহিত যুবকেরা স্বাগতম্‌, কেননা তারাই 'শক্তি, কর্ম ও ত্যাগের আধার'। এই নির্দেশ অনুসারে চট্টগ্রামের জেলা-সংগঠক দুর্গাপুর গ্রামের হাই স্কুলে শিক্ষকের কাজ জুটিয়ে নেন। ঢাকায় সমিতি-প্রধানের কাছে তিনি ত্রৈমাসিক বিবৃতি দিচ্ছেন: 'স্থানীয় উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয়টির অবস্থিতি-হেতু অবস্থার ক্রমোন্নতি ঘটিতেছে।...দ্বিতীয় শ্রেণীর [আজকাল যাকে ক্লাস নাইন বলা হয়] একটি ছাত্র আমাদের কাজে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছে। আশা করা যায় যে আরও দুই-তিন জন শীঘ্রই দীক্ষা লইবে। আমি উহাদের সহিত "বহিরঙ্গ" আলাপ করিতেছি।' এই সময়, ১৯১২-র নোভেম্বরে ঢাকার তরুণ ছাত্র গিরীন দাসের বাড়িতেও কিছু কাগজপত্র পুলিশি তল্লাসে ধরা পড়ে। গিরীনের বাবা ছিলেন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, ইংরেজভক্ত রায়বাহাদুর। তাঁর বাড়ি পুলিসের নজর এড়িয়ে যাবে এই আশায় গিরীন দাসের কাছে প্রচারপত্র, অস্ত্র ও লুঠের মাল রাখা হয়েছিল। কাগজপত্রের মধ্যে ছাব্বিশটি নামের একটি তালিকা পাওয়া যায়। এই ছাব্বিশ জনের মধ্যে দশ জনের কোনও কাজকর্ম ছিল না; বাকী ষোল জনের ভিতর দশ জনই ছাত্র। ঐ মাসেই ঢাকা সমিতির আরেক জন কর্মী মদন ভৌমিকের বাড়িতে পুলিশি হানার ফলে দুটি চাঁদার খাতা পাওয়া যায়। এই খাতা দুটোয় যে তিরাশি জনের উল্লেখ আছে তাঁরা সবাই ছাত্র। সঙ্কেতে তাঁদের স্কুল-কলেজের নামও ছিল, যেমন ঢাকা কলেজ, জগন্নাথ কলেজ, কলেজিয়েট স্কুল, জুবিলি স্কুল, নর্মাল স্কুল, পগোস স্কুল, মিট্‌ফোর্ড স্কুল, উকিল ইন্‌স্টিটিউশন, ইম্‌পিরিয়ল সেমিনারি, মেডিক্যাল স্কুল, প্রাইভেট মেডিক্যাল স্কুল, এবং স্কুল অব ইন্‌জিনিয়ারিং। ঐ সময়কার ঢাকা অনুশীলন সমতির বলতে গেলে প্রায় সব কর্মীই ছাত্র। ঢাকা সমিতির অমৃত হাজরার কাছে ১৯১৩ সালে যে কাগজপত্র মেলে তাতেও এই কথা সমর্থিত হয়। কলকাতার রাজাবাজার বস্তিতে একখানা ঘর নিয়ে তিনি বোমা বানাতেন। তাঁর তোরঙ্গে কুড়ি জনের নাম পাওয়া যায়, তার ভিতর আঠার জনই ছাত্র।

এদিকে কাশীতে শচীন্দ্রনাথ সান্যাল একটি অনুশীলন সমিতি খোলেন; ১৯০৮-এ। তিনি প্রথমে কলিকাতা অনুশীলন সমিতির সদস্য ছিলেন; তাঁর বাবা কাশীর ডাক-বিভাগে বদলি হওয়ায় শচীন্দ্র সেখানে যান। তিনি তখন স্কুলের উপর ক্লাসের ছাত্র। বাংলাদেশে অনুশীলন নামটা পুলিসের চোখে সন্দেহজনক হয়ে পড়ায় শচীন্দ্র তাঁর সমিতির নাম পালটে রাখেন ইয়ং মেন্‌স্‌ অ্যাসোসিয়েশন। তাঁর সহকারী নলিনীমোহন মুখোপাধ্যায় ভূপেন দত্তের কাছে লিখছেন: 'আমরা...ছাত্রদের মধ্যে স্বাধীনতার মতবাদ প্রচার করিতে লাগিলাম। ইহাতে ছাত্রদের মধ্য হইতে ভালভাবেই সাড়া পাওয়া যায়।...ইহা ব্যতীত মদনপুরায় আদর্শ বিদ্যালয় নামক একটি বিদ্যালয় বালকদের জন্য স্থাপন করা হয়। বালকদের মনকে বৈপ্লবিক ভাবাপন্ন করিয়া তোলাই ইহার উদ্দেশ্য ছিল।' সান্যালের অপর সহকর্মী বিভূতি হালদার

বেনারস মামলায় আদালতে যে বিবৃতি দেন তা থেকে জানা যায় যে তাঁদের অ্যাসোসিয়েশনে শ'খানেক সদস্য ছিলেন, বেশির ভাগই স্থানীয় স্কুলের বাঙালী ছাত্র। ১৯১৩ সালে সান্যালের আরেক বন্ধু, বিহার ন্যাশ্‌নাল্‌ কলেজের ছাত্র বঙ্কিম মিত্র বাঁকিপুরে কিছু ছাত্রকে প্রভাবিত করেন।

ছাত্ররা কেন রাজনীতি করেন সেকথা জানতে উৎসুক ছিলেন বড়লাট হার্ডিং। সেজন্য আরব্য রজনীর হারুন্‌-অল্‌-রশিদের মতো ১৯১১-য় ছদ্মবেশী তিনি একবার কলকাতার কয়েকটা হস্টেলে হাজির হন। টাইম্‌স্‌ পত্রিকার চিরল্‌ সাহেবকে লেখা তাঁর একখানি ব্যক্তিগত চিঠিতে তার আকর্ষক বর্ণনা পাই। হস্টেলে-হস্টেলে নোংরা ঘরদোর আর আবর্জনার স্তূপে সন্ত্রস্ত হার্ডিং কলকাতায় নতুন কয়েকটা হস্টেল তৈরীর জন্য অর্থ বরাদ্দ করেন; ভাবখানা যেন সন্ত্রাসবাদী ছাত্রেরা সবাই কলকাতার হস্টেলে খেয়ে রাজনীতির মোষ তাড়াতেন। তেমনি য়ুনিভার্সিটি কর্তৃপক্ষও ছাত্রদের অভিযোগ মেটাবার সস্তা উপায় খুঁজে পেয়েছিলেন ছাত্রদের উদ্দেশে কড়া-কড়া সার্কিলউরের মধ্যে। এসবে ফল যে কিছু হয় নি তার প্রমাণ ১৯১৩-র একটি সি. আই. ডি. রিপোর্ট্‌। এতে এই সন্দেহ করা হচ্ছে যে বাংলাদেশে অন্তত একত্রিশটি কলেজ ও দু'শ' ন'টি স্কুলের বেশ কিছু ছাত্র ইংরেজদ্রোহে লিপ্ত। ১৯১৫-১৬ সালের জন্য লিখিত বার্ষিক বিবরণে বঙ্গ সরকারের শিক্ষা-বিভাগের ডিরেক্টরও অনুরূপ আশঙ্কা প্রকাশ করেন। ১৯১৬-য় বড়লাট চেম্‌স্‌ফোর্ড্‌কে লেখা একটি ব্যক্তিগত চিঠিতে ছোটলাট কারমাইক্‌ল্‌ জানাচ্ছেন যে কলকাতার মেস্‌গুলি সন্ত্রাস-বাদী আড্ডা হয়ে উঠেছে।

বনিতা

সুশীল রায়

[পরাশর পুরকায়স্থ পরিণত বয়সে বিপত্নীক হন। মস্ত বাড়িটা শূন্য। এক হাউস-কীপার আবশ্যক। কাগজে বিজ্ঞাপন দেন। কয়েকজন প্রার্থী এর আগে দেখা করে গিয়েছেন।......]

আরতি অধিকারী

পরাশরবাবুর বরাত খুব খারাপ না। তাঁর বাছাইটাও নেহাত মন্দ হয়নি বলতে হবে। যারা আসছে তারা মোটামুটি দেখতে সকলেই বেশ ভালো। এদের মধ্যে কাকে তাঁর পছন্দ হচ্ছে, কিংবা কাউকেই একান্ত পছন্দ হচ্ছে কিনা—সে কথা তিনি কাউকে বলছেনও না, এমনকি নিজেও হয়তো তা ঠিক জানেন না।

এখন তাঁর সামনে এসে যিনি বসেছেন তাঁর দিকে একটু চেয়ে তাঁর এত কথা মনে হল। ফুলদানিতে ফুলের গুচ্ছ রাখা হয় হয়তো চোখের তৃপ্তির জন্যে, মনের শান্তির জন্যে। তাঁর সম্মুখে বসে রয়েছেন সে মহিলাটি তাঁর মুখ অনেকটাই ফুল্ল ফুলের মতন। বয়স একটু হয়েছে, বয়স যখন এঁর আরো কম ছিল তখন দেখতে যে আরো মনোহর ইনি ছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। বয়স হয়েছে, কিন্তু কত আর হবে? পরাশরবাবুর যা চাহিদা, তার চেয়ে অবশ্যই অনেক কম। আনুমানিক চল্লিশ চেয়েছেন তিনি, কিন্তু ইনি নিশ্চয় অত হবেন না।

একেবারে চুপ করে স্থির হয়ে বসে আছেন মহিলাটি। ঠিক যেন একটা মূর্তি, চোখে পলক কি পড়ছে? বোধ হয় পড়ছে না।

অদ্ভুতই লাগছিল পরাশরবাবুর। নিটোল জল যখন চৌবাচ্চায় টইটুম্বর হয়ে থাকে তখন তার স্তব্ধতা ভেঙে দিতে যেমন মায়া হয়, ঠিক সেই রকম মমতা বোধ করছিলেন পরাশর, তাই কথা বলছিলেন না। ইচ্ছে হচ্ছিল, থাক্ না, কথা তো অনেক হয়েছে, অনেক হতেও পারবে। এর সঙ্গে নাহয় একটু নীরব আলাপই হোক।

হঠাৎ যেন মূর্তিতে প্রাণপ্রতিষ্ঠা হল, নড়ে বসলেন আরতি অধিকারী।

"এ জায়গা খুঁজে নিতে অসুবিধে হয়নি?" জিজ্ঞাসা করলেন পরাশর।

"না। অসুবিধে হবে কেন। এ দিকটা আমার চেনা। এই রাস্তায় অনেক বার অনেক দিন যাতায়াত করেছি।"

সিঁথির অস্পষ্ট সিঁদুরের দাগ লক্ষ করে পরাশরবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনি তো বিবাহিত। স্বামীর মত আছে তো এই কাজে?"

আরতি অধিকারী একটু হাসল, বলল, "তাঁর মতের দরকার হবে না।"

এ কথা শুনে একটু চিন্তান্বিত হলেন পরাশর, বললেন, "কি রকম?"

"স্বামী আমাকে ত্যাগ করেছেন।" পরিষ্কার উত্তর দিল আরতি।

এ রকম কথা শোনার জন্যে প্রস্তুত ছিলেন না পরাশর, তিনি বোধহয় একটু বিচলিত হলেন, একটু বিব্রতও। তালুর সঙ্গে জিভ ঠেকিয়ে দুঃখব্যঞ্জক একটু শব্দ করলেন, বললেন, "দুঃখেরই কথা।"

"স্বামী কী করেন?" জিজ্ঞাসা করলেন পরাশর।

"সরকারি আপিসে চাকরি করেন।"

"থাকেন কোথায় তিনি?"

"কলকাতাতেই। একটা মেস্‌এ।"

দেখাশোনা নাকি হয় না। মাঝেমাঝে দেখা করতে ইচ্ছে হয় আরতির। কিন্তু দেখা করতে গিয়ে কী মূর্তিতে তাঁকে দেখবে, এই ভয়ে নাকি যায় না।

বনহুগলীর মেয়ে আরতি অধিকারী। কিন্তু আরতি নাকি তার আসল নাম নয়, এটা তার পেশাদারি নাম। তার আসল নাম রাজলক্ষ্মী।

লেখাপড়া শেখার সুযোগ তার হয়নি। তার বাবার অবস্থা ভালো না। খাইয়ে-পরিয়ে কোনোরকমে বড় করেছেন, লেখাপড়া শেখাতে পারেননি। সে মূর্খ বলেই নাকি তার যত অসুবিধে। লেখাপড়া একটু জানলে এলোমেলো কাজ করে তাকে ঘুরে বেড়াতে নাকি হত না।

স্বামী তাকে ত্যাগ করেছে, সে তাই আবার গিয়ে উঠেছে বনহুগলীতেই—বাবার কাছে। তার তিনটি বাচ্চা—দুই ছেলে, এক মেয়ে। বড়ছেলেটির বয়স বছর বারো হবে, মেয়েটি সবচেয়ে ছোট—সাড়ে-চার-পাঁচ তার হল।

তিনটি ছেলেমেয়ের মা এ? বয়স যাই হোক, ছেলেমেয়ের মা বলে কিন্তু কিছুতেই মনে হয়নি পরাশরবাবুর।

তার বাবার এক বন্ধু ছিলেন, তাঁর নাম বিপিনবিহারী। তাঁরই চেষ্টায় বছর পনেরো-ষোলো আগে বিয়ে হয় আরতির। বিপিনবাবু কলকাতার এক মেস্‌এ থাকতেন, সেই মেস্‌এই থাকত—

"ওঃ, বুঝেছি।"

সামান্যই চাকরি করেন তার স্বামী। তাঁর নাম উচ্চারণে আর ক্ষতি কী এখন, এখন তো তিনি আর স্বামী নন্‌। তাঁর নাম আদিত্য।

বেশ সুখের আর শান্তির সংসারই সে পেতেছিল পটলডাঙায়। দেড়খানা ঘরের একটা বাসাবাড়িতে। বেশ সচ্ছল সংসারই বলতে হবে। একে-একে তিনটি ছেলেমেয়ে হল, ক্রমে বেড়ে উঠল অনটন। অনটনই-বা হবে না কেন। জিনিসপত্রের দাম বেড়ে চলেছে হুহু করে, কিন্তু আপিসের মাইনে তো সেভাবে বাড়ে না!

সে বলেছে, তার আসল নাম রাজলক্ষ্মী। লক্ষ্মীর মতনই নাকি তার চেহারা, লক্ষ্মীর মতনই নাকি তার স্বভাবও—এই রকম বলত পাঁচজনে। সে নিজে অবশ্য কিছু বুঝত না। এমন যার চেহারা আর এমন যার স্বভাব—তার নাকি সত্যি-সত্যি রাজলক্ষ্মীই হওয়া উচিত ছিল। বড়বাড়ির বউ হওয়ারই নাকি তার কথা। কিন্তু তা না হয়ে তার যে অন্যরকম বাড়ির বউ হতে হল তার কারণ সে আগেই বলেছে—লেখাপড়া সে জানে না।

লক্ষ্মীতে আর সরস্বতীতে বিবাদ যে আছে তার একটা মস্ত প্রমাণ নাকি সে নিজে। সরস্বতীর ধারে-কাছে কখনো সে যায়নি। নিজের নামটা সই করতে অবশ্য পারত, কিন্তু নিজের নামের বানানও ভুল করে ফেলত মাঝেমাঝে। তখন সে নাকি তার স্বামীকে হেসে বলত, 'কী নামেরই ছিরি। বানান লিখতে কলম ভাঙে। কেন, অলকা অমলা কমলা বিমলা—এসব নাম কি নাম না?'

তার স্বামী তার হাসিতে যোগ দিত।

আরতি, ওরফে রাজলক্ষ্মী, এই কথাটুকু বলে আবার স্তব্ধ হয়ে বসল।

সরস্বতীর সঙ্গে বিবাদ তার থাকতে পারে, কিন্তু এইভাবে স্তব্ধ হয়ে বসায় তার মুখখানা অবিকল সরস্বতী-মূর্তির মতন দেখতে লাগল। পরাশর কিছুক্ষণ চেয়ে থাকল সেই মুখের দিকে।

নতুন সংসার বেশ গুছিয়ে-গাছিয়ে নিয়ে আরম্ভ করেছিল তারা জীবন। দুটি প্রাণীর পক্ষে দেড়খানি ঘর অনেক। মেস্‌এ আদিত্যর একার যে-খরচ পড়ত, প্রায় সেই খরচেই তাদের দুজনের বেশ কুলিয়ে যেত।

কিন্তু অবস্থা ক্রমশই জটিল হয়ে উঠতে লাগল। বছর-তিনের মধ্যেই হল একটি বাচ্চা, তার দু বছর পরে আর একটি, আবার বছর-আড়াই পরে আরও একটি।

যে-দেড়খানা ঘর ছিল অনেক, সেই জায়গাই হয়ে দাঁড়াল যেন পায়রার খোপ।

যে আয়ে কুলিয়ে যেত বেশ ভালো ভাবেই, সাত-আট বছরে আয় কিছু বাড়া সত্ত্বেও প্রত্যহ লেগে গেল অনটন। যে আয় বাড়ল তা কারো গায়ে লাগল না।

চোখে সর্ষেফুল দেখতে লাগল তারা।

কোলের মেয়েটাকে পাথান-কোলে ফেলে আরতি তাকে বার্লিজল খাওয়াচ্ছিল, ছেলে-দুটি পাশের ছোট ঘরটায় হুটোপাটি করছিল। চৌকির কোণে বুকের সঙ্গে দুটো হাঁটু এক করে উদাসভাবে বসে ছিল আদিত্য, অনেকক্ষণ এইভাবে বসে থেকে সে একটা শব্দ করল, 'হুঁ'।

ঝিনুক বাজিয়ে-বাজিয়ে মেয়েটাকে শান্ত করছিল সে, হঠাৎ আদিত্যর ঐ শব্দ শুনে সে বলল, 'কী হল?'

উত্তর না দিয়ে আদিত্য কী সব যেন বলল, কবিতার মতন করে কিসব যেন বলল, কথাগুলো সব মনে নেই আরতির, তবে মনে পড়ে, 'দারিদ্র্য, অসহ, পুত্র জায়া অহরহ'—এই রকম কী যেন।

ঐসব শুনে আরতি জিজ্ঞাসা করেছিল, 'ওর মানে কি? জায়া মানে কি গো?'

আদিত্য নাকি পায়চারি করতে-করতে বলেছিল, 'জায়া মানে জান না? জায়া মানে তুমি। জায়া মানে জ্বালা।' বলে সে আক্ষেপ করতে থাকে—তার মেস্‌এর জীবনই নাকি ভালো ছিল, বিপিনবাবুই নাকি যত নষ্টের মূল, বনবাদাড় থেকে এরকম সোনার টিয়ে ধরে আনবার দরকার তাঁর কি ছিল?

আদিত্য এরকম কথা বলতে পারে তা ধারণাই কখনো করতে পারেনি সে। এভাবে তার সঙ্গে কখনো সে কথা বলেনি। সেদিন হঠাৎ তার এ কী হল!

কিন্তু হঠাৎ নাকি কিছু হয় না। আদিত্য নাকি কিছুদিন থেকেই গুমরাচ্ছিল। দুধের সাধ ঘোলে মেটাবার কথা নাকি সে শুনেছে, কিন্তু দুধের বদলে বার্লিজল?

আদিত্যর ঐ ব্যবহারে কেঁদে ফেলেছিল নাকি আরতি, কোল থেকে বাচ্চাটাকে নামিয়ে সে নাকি চোখের জল মুছেছিল! তাকে জ্বালা বলল আদিত্য, তাকে বন থেকে নিয়ে এসেছে বলল, তাকে এভাবে অপমান করল। আগে তো কখনো এমন কথা বলত না। কী দোষ সে করেছে?

আদিত্য তাকে গেঁয়ো মেয়ের মত প্যানপ্যান করে কাঁদতে বারণ করল, ধমক দিয়ে চুপ করতে বলল।

চুপ করেছিল সে। কিন্তু তার শরীর জ্বলে-পুড়ে যেতে লাগল।

আদর্শ পরিবারই তো ছিল তাদের। তিনটি মাত্র সন্তান তাদের। কিন্তু এই আদর্শে কাজ কী হল? সংসারের আবহাওয়া যতটা সম্ভব বিষাক্ত হয়ে উঠল।

এইভাবে দিন কাটে, বছরও।

আদিত্যর চেহারা অনেক খারাপ হয়ে গেল ক্রমশ। কিন্তু আশ্চর্য, আরতি যেমনকার তেমনি থেকে গেল। সংসারের এই গ্লানির ছাপ তার চেহারায় এতটুকু পড়ল না। ব্যাপারটা বেশ মজারই বটে। সে লক্ষ করত, আদিত্য আড়চোখে এক-একবার চুরি করেই যেন নিজের স্ত্রীর শ্রীটা দেখত, যেন সে পরস্ত্রীর রূপ দেখে নিচ্ছে।

সংসারের যাতে সাশ্রয় হয় তার জন্যে এদিকে চেষ্টা করে চলেছে আরতি। কিন্তু তার রেস্ত কম, তার যোগ্যতা নেই কোনো। তবু চেষ্টার ত্রুটি সে করেনি।

একদিন সে আদিত্যকে বলেই ফেলল কথাটা। সন্ধ্যার সময় আপিস থেকে ফিরে আদিত্য চা আর পাঁপড়ভাজা খাচ্ছে ঘরের এক কোণে বসে। বিছানার চাদর পাততে-পাততে সে বলল, 'আমি একটা চাকরি নেব।' চমকে ওঠার মতই কথা, কিন্তু আদিত্য যেন চমকাল না। কিছু বললও না। আরতি আবার বলল, 'সত্যি বলছি কিন্তু। ছেলেমেয়েদের লেখা-পড়া শেখাতে হবে না? ইস্কুলে ভরতি করতে হবে না?'

পেটে বোমা মারলে যার ক অক্ষর বের হয় না, সে করবে চাকরি? আদিত্যর বিশ্বাসই হল না। কত লেখাপড়া-জানা ছেলেমেয়ে কাজ পাচ্ছে না, আর আরতি কিনা করবে চাকরি!

কিন্তু আরতি যখন বলল যে, সে কথা দিয়ে এসেছে, কাজ নেবে বলে পাকা কথাই দিয়ে এসেছে তখন অবাক হল নাকি আদিত্য। কাজ যারা দেয় কথা দেওয়ার অধিকার তাদের, কিন্তু এটা আবার কী বিপরীত কথা, কথা দিয়ে এসেছে আরতি?

হ্যাঁ, কথা দিয়ে এসেছে সে। সে কাজ করবে। কিসের আবার কাজ, ফিরিওলার কাজ। গুঁড়ো সাবান বেচবে আরতি। বাড়ি-বাড়ি গিয়ে খদ্দের জোটাবে।

আদিত্য যখন শুনল যে ছেলেমেয়েদের ঘুম পাড়িয়ে ঘরে তালা দিয়ে দুপুরবেলা কাজে বের হবে আরতি, তখন ব্যাপারটা তার কাছে খুব নিষ্ঠুর বলে মনে হল। ওরা বন্দী হয়ে থাকবে এই পায়রার খোপের মধ্যে? কান্নাকাটি করলে, ক্ষিদে পেলে কী করবে ওরা—একথা ভেবে দেখেছে কি একবারও?

কতটা কী ভেবেছে বা ভাবা উচিত, সে খেয়াল হয়নি তার। সে একটু মরীয়া হয়ে উঠেছে। তাকে বাঁচতে হবে, বাচ্চাদের বাঁচাতে হবে। সংসারের শান্তি ফিরিয়ে আনতে হবে। তারই চেষ্টায় আরতি বেরিয়ে পড়ল রাস্তায়।

রোদে-রোদে ঘুরে বাড়িতে-বাড়িতে গিন্নিদের কাছে গিয়ে হাজির হয় আরতি।

নতুন এই সাবান মেয়েমহলে জনপ্রিয় করে তুলতে পারলে তার ভবিষ্যৎ নাকি উজ্জ্বল।

সে নাকি খুব সরল, শহুরে-পনা নেই নাকি তার একটুও—এইসব কথা বলতেন নাকি গিন্নিরা। কোনো-কোনো গিন্নি তার কথা শুনে হাসতেন, কেউ-বা তার চেহারার তারিফ করতেন, কেউ তার হাঁড়ি-হেঁশেলের কথা শোনার জন্যে খুব আগ্রহ দেখাতেন। ক'টি তার ছেলেমেয়ে, তার কর্তা কী করেন—এসব কথাও জানতে চাইতেন অনেকে। সে অকপটেই সব কথা বলত, কিন্তু তার কেমন-যেন মনে হত তার কথা কেউ পুরো বিশ্বাস করছেন না, তাঁদের নিশ্চয় মনে হত—ভিতরে নিশ্চয় কোনো রহস্য আছে।

কিন্তু এসব সত্ত্বেও কিছু-কিছু কাজ তার জোগাড় হত।

প্রথম যেদিন কমিশনের টাকা আদিত্যকে এনে দিল, সেদিন আদিত্য একটু হেসে

বলেছিল, 'রোজগার করতে তাহলে শিখলে?' তার বলার ভঙ্গিটা একটু যেন কেমন ছিল।

বেচু চাটার্জি স্ট্রীটের এক মহিলার সঙ্গে তার খুব ভাব হয়ে গিয়েছিল। নাম তাঁর মনোরমা। আরতি তাঁকে মনোদি বলত। মস্তবড় বাড়ি। খুব বড়লোক। কী বন্-বন্ পাখা ঘোরে ঘরে, কী দামী-দামী চেয়ার, কী মোটা-সোটা গদি। সে অবাক হয়ে দেখত ঐসব। এত শৌখিন মানুষ ইনি, এত টাকার মানুষ, কিন্তু এতটুকু দেমাক নেই। তিনি বলতেন, 'ঐ দ্যাখ্-না, বাগানের দিকে দু-তিনটে খালি ঘর পড়ে আছে, দরকার হলে আসবি, ওখানেই থাকবি। ভাড়া গুনতে কষ্ট হলে ভাড়া গুনবি কেন খালি-খালি?'

পথে ঘুরতে-ঘুরতে যখন কষ্ট হত, তেষ্টা পেত, তখন ঐ বাড়িতে গিয়ে সাদা-আলমারির ঠান্ডাজল খেত সে।

মনোদি তাকে খুব স্নেহ করতেন। এই কাজে কত পাচ্ছে জানতে চাইতেন। একটু বাড়িয়ে বলতে ইচ্ছে হত তার, কিন্তু তা না বলে ঠিক কথাই বলত।

টাকার অঙ্ক শুনে তিনি হয়তো আশ্চর্য হতেন, বলতেন, 'তা আর কী করবে, অন্য রাস্তাই-বা কই।'

আরতিও নাকি ঐ একই কথা ভাবত। অন্য-কোনো রাস্তা পাওয়া গেলে সে নিশ্চয় তার চেষ্টা করত। রোজগার করার জন্যে কত জনই তো কত কষ্ট করে। কোনোরকম কষ্ট করতেই সে অরাজি না। সে চায় টাকা। সংসারে শান্তি ফিরিয়ে আনতে চায় সে। সংসারের শ্রী ফিরিয়ে আনতে চায়।

সেদিন সে গিয়েছে পঞ্চানন ঘোষ লেনে। এ গলি তার চেনা। এখানে সে আগেও এসেছে। বেশ সরু গলি। ঘরে-ঘরে দরজা বন্ধ। কড়া নেড়ে-নেড়ে সে অনেককে বিরক্ত করল। কাজ তো হলই না, গালমন্দ খেয়ে চলে আসছে, এমন সময়ে সামনের বাড়ির জানলা দিয়ে এক ভদ্রলোক উঁকি দিয়ে জানতে চাইলেন, সে কী চায়। তারপর তাকে ইশারা করে দাঁড়াতে বলে একটু পরে এসে দরজা খুললেন। তাঁর কানের কিনারে চুলে পাক ধরেছে, মুখে পাইপ, পরনে পাজামা।

এগিয়ে গেল সে। তার আপাদমস্তক বেশ ভালোভাবে দেখে ভদ্রলোক বললেন, সে কিছু বেচতে এসেছে কিনা।

আরতি বলল, 'সাবান।' সাবান বেচতে এসেছে সে।

ভদ্রলোক একটু হাসলেন, তার পর বললেন, ধর্মতলার দিকে সে যেতে পারবে কিনা, যদি পারে তবে তিনি ঠিকানা দিয়ে দিচ্ছেন, বিকেলে তিনটে-চারটের সময় ওখানে গেলে একটা ব্যবস্থা নাকি তিনি করবেন।

ঘরের মধ্যে নিয়ে তাকে তিনি বসালেন। মস্ত টেবিলের ওপাশে গিয়ে বসে টেবিলের আলো জেবলে নিলেন, তারপর ইংরেজিতে কী-যেন বললেন, একটু থেমে বললেন, 'এর চেয়ে অনেক ভালো কাজ তোমাকে পেতেই হবে।'

তার হাতে ঠিকানা দিয়ে তিনি বললেন, তাঁর নাম বি. বি. বক্‌সি। ওই ঠিকানায় গিয়ে বক্‌সি সায়েবের সঙ্গে দেখা করতে চাই বললেই হবে। ওখানে নাকি তাঁর স্টুডিয়ো।

পরাশর যেন কিছু বুঝলেন, বললেন, "কী নাম? বি. বি. বক্‌সি?"

পরাশরবাবু এই ভদ্রলোককে বিলক্ষণ চেনেন। কিন্তু সে কথা তিনি এখন বললেন না। সংসারে এমন ক'জনই-বা আছেন যাঁরা নাকি নিজে থেকে এমন আশ্বাস দিতে পারেন। কিন্তু ইনি তা দিলেন। ভদ্রলোককে তাই তার সেদিন খুব ভালো লেগেছিল।

পঞ্চানন ঘোষ লেন থেকে বেচু চাটার্জি স্ট্রীট বেশি দূর না। সে মনোদির কাছে গেল। এবং তাঁকে সে জানাল যে, এবার সে নিশ্চয় একটা বড় অর্ডার পাবেই। খুঁটিনাটি করে সব কথা তখনই বলল না, কাজটা আগে পেয়ে তারপরে বলবে ঠিক করল। আদিত্যকেও সে সব কথা বলেনি, কেবল বলেছে, এবার সে মস্ত অর্ডার পাবে বলে আশা করছে।

একথা শুনে আদিত্যর উল্লাস করে ওঠা উচিত ছিল, কিন্তু সে নাকি মুখ ভার করে ছিল।

তারপর কিছুদিন কেটে গিয়েছে। আদিত্য কেমন-যেন অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকাতে আরম্ভ করেছে তার দিকে। তারপর একদিন বলেই ফেলল আদিত্য, 'কী, ব্যাপার কী? চোখে-মুখে যেন জেল্লা দেখছি একটু। ভ্যানিটি ব্যাগ কেনা হয়েছে দেখছি। বেশ দু-হাতে টাকা লুটছ বলে মনে হচ্ছে যেন। বাচ্চাদের জন্যে তো বেশ জামা-ফ্রকও এনেছ দেখছি। এত পাচ্ছ কোত্থেকে?'

আরতি এর উত্তরে আদিত্যকে মনে করে দিল যে, কিছুদিন আগে সে একটা মোটা কাজ পাওয়ার কথা বলেছিল, সে কাজ সে পেয়েছে।

বেশ শ্লেষ দিয়েই আদিত্য কী-সব কথা যেন বলল, অনেক ব্যঙ্গ ছিল, অনেক বিদ্রূপও ছিল তার কথায়।

আরতি সেদিন একটা অন্যায় করে ফেলেছিল। রাগ-তাপ তার বড় একটা নেই, কিন্তু সেদিন সে রেগে উঠেছিল, এবং বড় কঠিন কথা বলে ফেলেছিল আদিত্যকে, বলেছিল, 'অক্ষম লোকেরা একটু হিংসুকই হয়।'

একথা শুনে ক্ষেপে ওঠাই স্বাভাবিক। আদিত্য অগ্নিশর্মা-মূর্তি ধরে দাঁড়িয়েছিল। ছেলেমেয়েরা ভয় পেয়ে যায়, ঘরের কোণে তারা জড়োসড়ো হয়ে বসল। তাদের মুখের দিকে চেয়ে কান্না পেয়েছিল আরতির। যাদের জন্যে সে এত কষ্ট করে চলেছে, সব লজ্জা সব সংকোচ ধূলিসাৎ করে দিয়েছে, তাদের যদি সুখী করতে সে না পারল, তাহলে মিথ্যাই তার অত চেষ্টা, এত কষ্ট।

সেদিন নাকি আরতি খুব কেঁদেছিল।

কয়েকদিন আগে মনোদিকে সে কিছু-কিছু বলেছে, পরদিন সে গিয়ে সব কথা খুলে-মেলেই বলল। বলল, 'জানেন, মনোদি, কাজটা শুনতেই খারাপ, কিন্তু কাজটা কি সত্যিই খারাপ? ওখানে সকলেই বেশ ভদ্র, কেউ কোনোদিন এতটুকু অশ্রদ্ধা করেনি, অসম্মান করেনি। এতটুকু বেয়াড়াপনা করে না। প্রথম-প্রথম একটু লজ্জা করত, কিন্তু ক্রমে তা কেটে গিয়েছে। এখন বেশ সহজেই পারি।'

মনোদি সব শুনে হাসতে লাগলেন। তিনি নাকি একটু-একটু শুনেই সব বুঝতে পেরেছিলেন আগেই। কিন্তু অপেক্ষা করে ছিলেন, কবে এসে সে নিজে থেকে খুলে বলবে সব কথা। তারপর আরতির থুৎনিতে একটু টোকা দিয়ে নাকি বলেছিলেন যে, তাঁরও নাকি ইচ্ছে হচ্ছে তিনিও আর্টিস্ট হন।

কথাটা বলেই মনোদি সোফার মধ্যে গড়িয়ে পড়লেন, খুব হাসতে লাগলেন। হাসি থামিয়ে বললেন, 'বাড়িতে খুব অশান্তি বেধেছে তো? ওসব কিছু না। স্বামীকে একটু বেশি করে আদর করবি। অমন সুন্দর চেহারা তোর, চেহারাটা একটু মেলে ধরিস তার সামনে। ওতেই ওদের মন গলে যাবে। বউয়ের কাছে হেরে যাচ্ছি দেখলেই স্বামীরা ক্ষেপে যায়। ও কিছু না।'

কিন্তু ও কিছু না কেন। মনোদির কথা মিথ্যা। ওটা যে ভীষণ কিছু তার প্রমাণ পেতে তার দেরি হল না।

সেদিন তার ফিরতে দেরি হয়ে গিয়েছে। ফিরে এসে দেখে, খাঁচার বাঘের মত রাস্তায় পায়চারি করে বেড়াচ্ছে আদিত্য। দরজায় তালা দিয়ে বেরিয়েছে আরতি। দরজায় তালা ঝুলছে। ছেলেমেয়েরা জানলায় বসে। ঘরে ঢুকতে না পেরে আদিত্য ক্ষেপে আগুন হয়ে আছে।

সেই রাত্রেই বেধে গেল কুরুক্ষেত্র। পাড়ার লোক জুটে গেল। লজ্জায় মাথা-কাটা যেতে লাগল। মনে-মনে প্রতিজ্ঞা করে ফেলল সে।

পরদিন আদিত্য আপিসে বেরিয়ে গেল। তার কিছুক্ষণ পরে ছেলেমেয়েদের নিয়ে আরতিও বেরিয়ে পড়ল।

সে কোথায় গেল কেউ জানে না।

পরাশরবাবু যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন এইভাবে বললেন, "ব্যস, খতম। শেষ হয়ে গেল তো সব?"

আরতি বলল, "প্রায়। এইখানে শেষ হয়ে গেলেই হয়তো ভালো হত। কিন্তু আর-একটু আছে। এত কথা বলে আপনাকে নিশ্চয় খুব বিরক্ত করছি?"

"না, না।" পরাশরবাবু মাথা নাড়লেন, "আমার তো বাঁধা-বরাদ্দ সময়। এক ঘণ্টা সময় তো আমাকে দিতেই হবে?"

ঘড়ির দিকে তাকালেন পরাশরবাবু, সাতটা বাজতে এখনো কয়েক মিনিট বাকি আছে।

সব শেষ হবার আগে, সম্পর্কটা একেবারে চুকিয়ে ফেলার আগে আদিত্যর সঙ্গে তার দেখা হয়েছে। তার সঙ্গে কথাও হয়েছে।

আরতি নিরুদ্দেশ হবার পর কয়েকদিন ধরে আদিত্য নাকি তার অনেক খোঁজ করে। কিন্তু কোনো কিনারা করতে পারেনি। তারপর সে ছেড়ে দেয় হাল। চুপচাপ বসে থাকে কয়েক দিন। কিন্তু তার পরেই নাকি তার রোখ চেপে যায়, যেমন করেই হোক, খুঁজে বার করবেই বলে সে প্রতিজ্ঞা করে বসে। কিন্তু, অমন প্রতিজ্ঞা সে না করলেই পারত। এমন-ভাবে খুঁজে বার করার দরকার কী ছিল তার—এই আক্ষেপ নাকি প্রকাশ করেছিল আদিত্য।

কোনোদিন আপিস কামাই করে, কোনোদিন আপিস থেকে অসময়ে বেরিয়ে পড়ে সে নাকি খুঁজে-খুঁজে সারা হয়ে যেতে লাগল। আরতির জন্যে অবশ্য তার নাকি এত গরজ ছিল না, তার ছেলেমেয়ের জন্যে তো তার টান আছে, মায়া আছে—তাদের খোঁজ তো তার চাইই।

মানিকতলায়ও নাকি গিয়েছিল আদিত্য। সেখানেই নাকি সেই সাবান-কম্পানির আপিস।—সেখানেও সে গিয়েছিল। রাজলক্ষ্মী নামে একটি মেয়ে তাঁদের কাজ করত, এখবরও নাকি সে সংগ্রহ করে। কিন্তু কোনো খোঁজ তারা দিতে পারে না।

হাওড়ার ব্রিজে দাঁড়িয়ে সে নাকি লোক গুনেছে। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল, গড়ের মাঠ, জাদুঘর, এমনকি চিড়িয়াখানাতেও সে গিয়েছে। যদি-বা সেখানে দেখা পায়। যদি-বা ছেলেমেয়েদের নিয়ে বেরিয়ে থাকে! কিন্তু কোথাও দেখা পায়নি।

একটা মানুষের পক্ষে একা লুকিয়ে থাকাই কঠিন, কিন্তু তিন-তিনটে বাচ্চা নিয়ে কি ভাবে গা-ঢাকা দিয়ে আছে সে—আদিত্যের কাছে এটাই নাকি খুব আশ্চর্য লেগেছে।

কিন্তু রাজলক্ষ্মী যে এতটা সাংঘাতিক, এত বড় শয়তান, এত বড় বেইমান—তা সে নাকি ধারণাই করতে পারেনি। তা যদি পারত তবে তার খোঁজ করতে গিয়ে এমন বেকুব

নাকি তাকে হতে হত না।

হঠাৎ একদিন দুপুরবেলা শেয়ালদা স্টেশনের কাছ থেকে দুই ফুটপাথের দিকে নজর রাখতে-রাখতে নাকি এগিয়ে চলেছে আদিত্য। হাঁটতে হাঁটতে সে এসে পোঁছল মৌলালির মোড়ে। এখানে না এলেই বুঝি তার ভালো হত। এই দিনটি তার জীবনের নাকি একটা ভীষণ দিন।

মৌলালির মোড়ে পোঁছে চুপচাপ নাকি সে দাঁড়িয়ে ছিল। হঠাৎ তার চোখে নাকি পড়ল একটা চেনা চেহারা। ধর্মতলা স্ট্রীট ধরে তখন এগিয়ে চলেছে আরতি, এখন যার নাম হয়েছে লেনিন সরণী। প্রথমেই নাকি চিনতে পারেনি, চিনতে নাকি একটু অসুবিধেই তার হয়েছিল—বেশ চাল হয়েছে, বেশ চটক নাকি তার হয়েছে লক্ষ করেছিল আদিত্য।

ভিন্ন ফুটপাথ ধরে আদিত্যও হাঁটতে লাগল। অনেকটা হাঁটল। তারপর নাকি সে দেখল যে, একটা মস্ত বাড়ির গেট দিয়ে ভিতরে ঢুকে গেল রাজলক্ষ্মী।

এক্ষুনি কাজ সেরে সে বেরিয়ে আসবে এই আশায় আদিত্য নাকি গেটের কাছে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে।

পরাশরবাবু মাথা নাড়তে লাগলেন, বললেন, "বুঝেছি। বক্সিকে চিনি। তারপর?"

কিন্তু বেরিয়ে সে আসছে না দেখে আদিত্য নাকি ধৈর্য হারায়। এক ঘণ্টার বেশি হয়ে গেল, এতক্ষণ ধরে কী-এমন কাজ থাকতে পারে জানার কৌতূহলেই আদিত্য নাকি সাহসে ভর করে ভিতরে ঢুকে গেল।

"আপনি তো জানেনই মনে হচ্ছে। বিরাট বাড়ি। খুব নিরিবিলি। খুব ঠাণ্ডা। দেয়ালে-দেয়ালে ফ্রেমে-বাঁধানো মস্ত-মস্ত ছবি। বারান্দায় কত পাথুরে মূর্তি বিভিন্ন ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে। একতলায় লোকজন নেই। শুধু ঐ মূর্তি, শুধু ঐ ছবি। আদিত্য ধীরে-ধীরে উপরে উঠে এসেছিল।"

উপরে উঠে বারান্দা পার হয়ে দূরে একটা দরজার কাছে কয়েক পাটি জুতো দেখতে পেয়ে সে নাকি সেইদিকে যায়।

দরজার সামনে পোঁছে সে নাকি অবাক, সে নাকি হতভম্ব। সে যা দেখল তা সে নাকি বিশ্বাস করতেই পারল না। ছোট ছোট টেবিলে বসে কারা যেন মাথা নীচু করে কীসব আঁকছে, আর আর আর—তাদের সামনে—অল্প উঁচু প্লাটফর্মের উপরে দাঁড়িয়ে আছে নিরাবরণ ওটা কে? পাথরের মতন অটল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে কে এ?

আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিল নাকি আদিত্য, এমন মূর্তি সে কখনো দেখেছে বলেও যেন তার মনে হয় না! তার নাকি মাথা ঘুরতে লাগল।

আরতি বলল, "উনি যে দরজার ওপারে এসে হাজির হয়েছেন আমরা তা জানিই নে। বারান্দায় ধুপ করে একটা শব্দ হল। সবাই লাফ দিয়ে উঠে ছুটে গেল। একটু পরে আমিও বেরিয়ে এলাম। দেখি, আদিত্য। প্রায়-অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে।"

আরতি তার কথা শেষ করে চুপ করে বসল। পরাশরও এর পর কোনো কথা বলতে পারলেন না, তিনি মনে-মনে আদিত্যর চোখ দিয়ে ঐ দৃশ্যটা দেখার চেষ্টা করতে লাগলেন।

পরাশর বললেন, "কাজটা তো বেশ ভালো। অঢেল পয়সা। তার আবার চাকরির দরকার কী।"

"তাই মনে হয় অবশ্য।" আরতি বলল, "কিন্তু তিনটি বাচ্চা, তারা বড় হচ্ছে। বুড়ো বাবা-মা। এসবের খরচও তো কম না। কত আর পাই বলুন! আমি মডেল, আপনি

বলছেন অঢেল টাকা। কিন্তু এসবের মজুরি কত তা জানেন না। অন্যভাবেও যারা উপায় করে তাদের কথা অবশ্য আলাদা। অগত্যা ফটোগ্রাফারেরও মডেল হয়েছি, হয়তো আমাকে পাবেন কোনো ক্যালেন্ডারেও। তার-চে বরঞ্চ রাখুন-না আমাকে, ও-কাজ ছেড়ে দিই। শরীর ভাঙছে, আর কতদিনই-বা পারব এ কাজ করতে!"

পরাশরবাবু বললেন, "সব শোনা থাকল। ভেবে দেখি।"

সন্ধ্যা নেমে এসেছে। ঘর থেকে বেরিয়ে সেই অন্ধকারের মধ্যে মিলিয়ে গেল আরতি।

গো পা গ ঙ্গো পা ধ্যা য়

পরাশর কী রকম যেন একটু ক্লান্তই ছিলেন আজ। ক্লান্ত তিনি বড়-একটা হন্ না, কিন্তু আজ ঘুম ভাঙার পর থেকে তাঁর যেন কিরকম নিরুৎসাহ মনে হচ্ছে। আরতি অধিকারী কেমন স্পষ্টভাবে বলে গেল নিজের কথা। এতটুকু জড়তা নেই, এতটুকু সংকোচও বোধ করল না সে। মানুষ বিপদে পড়লে কেমন বেপরোয়া হয়ে ওঠে তারই যেন প্রমাণ দিয়ে গেল আরতি। আদিত্যের কথাও বেশ মনে হচ্ছে তাঁর। নিজেকে তিনি আদিত্যের অবস্থার মধ্যে ফেলে ব্যাপারটা একটু ভাববার চেষ্টা করেই যেন শিউরে উঠলেন। চোখের সামনে হঠাৎ ওরকম দৃশ্য দেখে আদিত্যের মাথা ঘুরে গিয়েছিল, লোকটার মাথার জোর আছে বলতে হবে, ধড় থেকে মাথাটা যে খুলে যায়নি—এই বুড়ি যথেষ্ট!

যাক্ গে, ওকথা নিয়ে আর তিনি ভাবতে চান না। এখন আবার নতুন একজনের আসার সময় হয়ে এল।

তিনি সকালের আহার সেরে নিয়ে অন্যান্য দিনের মত একটু আগেই নীচে নেমে এলেন। আটটা তখন বেজেছে মাত্র। নিজের আসনে বসে তিনি খবরের কাগজে চোখ বুলালেন কিছুক্ষণ। তারপর তাঁর আপিসের কয়েকটা চিঠিতে সই করলেন। সই করতে-করতে একটু মাথা তুলে সম্মুখে চাইতেই দেখলেন, পর্দার ফাঁক দিয়ে কে-যেন উঁকি দিচ্ছে।

"কে?" পরাশরবাবু জিজ্ঞাসা করলেন।

জিজ্ঞাসা করা মাত্র একটি মেয়ে তর্‌তর্ করে ভিতরে ঢুকে বলল, "আমার নাম গোপা গঙ্গোপাধ্যায়। আপনি আজ আসতে বলেছেন।"

ঘড়ির দিকে তাকালেন পরাশরবাবু, সাড়ে আটটাও এখন বাজেনি, সাড়ে-আটটা বাজতে এখনো মিনিট দুই বাকি। মেয়েটির মুখের দিকে তিনি একবার তাকালেন, তারপর বললেন, "ন'টার সময়-না আসার কথা?"

"হ্যাঁ। কিন্তু সঙ্গে তো ঘড়ি নেই। যদি দেরি হয়ে যায় তাই চলে এসেছি।"

"বেশ। বোসো।"

মেয়েটা বসল। একটু-যেন সন্ত্রস্ত, একটু-যেন ভীত সে। তার মুখ দেখে এই রকম মনে হল পরাশরবাবুর।

ফণিভূষণ নিশ্চয় এখনো এসে পেঁাছয়নি। ন'টার একটু আগে সে আসে। দরোয়ানটাও বুঝি প্রস্তুত ছিল না, হয়তো এদিক-ওদিক আছে। এই ফাঁকে মেয়েটা চলে এসেছে নিশ্চয়।

পিছন-ফিরে-ফিরে মেয়েটা পর্দার দিকে তাকাল দু-একবার। পরাশরবাবু লক্ষ করলেন, বললেন, "কী দেখছ?"

"কিছু না। সঙ্গে আমার এক বন্ধু এসেছে কিনা! তাই দেখছিলাম।"

"ওখানে লোকজন আছে, নিশ্চয় তাকে বসাবে।"

"না তো! কেউ নেই তো ওখানে! ঢুকব কি ঢুকব না ভাবছিলাম, আমার বন্ধুটি বলল—চলে যা। তাই শুনে চলে এলাম।"

ছেলে-বন্ধু আবার নিয়ে এসেছে নাকি সঙ্গে? কিন্তু সে কথা তো খোলাখুলিভাবে জিজ্ঞাসা করা যায় না, তাই পরাশরবাবু একটু ভেবে জিজ্ঞাসা করলেন, "নাম কী?"

"গোপা গঙ্গোপাধ্যায়।" চট করে উত্তর দিল মেয়েটি।

"না, তোমার নাম না। তোমার নাম তো শুনেছি, তোমার বন্ধুটির নাম জিজ্ঞাসা করছি।"

"আমার বন্ধুর নাম?" মেয়েটি বলল, "লিলি।"

পরাশরবাবু কিছুক্ষণ মাথা নীচু করে বসলেন। বহুকাল আগের কথা তাঁর হয়তো মনে পড়েছে, এই ধরনের নাম তাঁরা এক সময়ে ব্যবহার করতেন, পরাশর পুরকায়স্থ তখন ছিলেন পিপি। সে একটা সময় গিয়েছে বটে। জীবনে তখন কত রোমান্স্ ছিল, রোমাঞ্চ ছিল।

গতকাল সন্ধ্যাবেলাই তিনি তাঁর বরাতের কথা ভেবেছিলেন। যারা আসছে তারা মোটামুটি সবাই দেখতে বেশ ভালো। বিশেষ করে আরতি অধিকারীর চেহারাটা টাটকা দেখা, তার কথাই তাঁর এখন মনে পড়ছে। কিন্তু এখনও আবার তিনি ভাবছেন তাঁর বরাতের কথাই। এই মেয়েটির চেহারা কিন্তু একটুও ভালো না। এটাও তাঁর বরাত।

মেয়েটার দিকে আর-একবার তাকালেন তিনি, পরনের কাপড়ও ছিমছাম না, আধ-ময়লা-গোছের। দুই হাতে লাল রঙের দুটো প্লাস্টিকের চুড়ি।

পরাশরবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমার বয়স কত?"

"আমার? সাতাশ-আঠাশ হবে। উনিশ-শ বিয়াল্লিশে নাকি জন্মাই—ভারতবর্ষে যখন গান্ধীজীর সেই আন্দোলন চলছে, তখন নাকি আমার জন্ম।"

"কিন্তু", পরাশরবাবু বললেন, "আমি তো চল্লিশ বছর বয়স হতে হবে বলেছিলাম।"

"তাই বুঝি? তা তো লক্ষ করিনি।" গোপা গঙ্গোপাধ্যায় উঠি-উঠি করতে লাগল। এই পরিবেশের মধ্যে এসে প্রথম থেকেই সে বেশ অস্বস্তি বোধ করছে, পালাতে পারলে বেঁচে যায় বলে যেন মনে হচ্ছে তার।

তার দরখাস্তের দিকে চেয়ে পরাশরবাবু বললেন, "মধ্যমগ্রামে থাকো। সঙ্গে আর কে আছেন?"

"সঙ্গে আমার বন্ধু আছে—লিলি।" বেশ ভয়ে-ভয়েই উত্তর দিল গোপা।

পরাশরবাবু হাসলেন, বুঝতে পারলেন মেয়েটা নার্ভাস হয়ে পড়েছে, বললেন, "জিজ্ঞাসা করছি, মধ্যমগ্রামে তোমার সঙ্গে আর কে আছেন?"

"আমার এক পিসি আছেন, আর কেউ নেই।"

ওদিকে ফণিভূষণ এসে পৌঁছেছে। একটি মেয়েকে বসে থাকতে দেখে তাকেই প্রায় নিয়ে আসছিল ভিতরে, কিন্তু আর-একটি মেয়ে ভিতরে আছে শুনে সে পর্দা পর্যন্ত এসে দাঁড়াল।

পরাশরবাবু মাথা না তুলেই বললেন, "ঠিক আছে।"

ফণিভূষণ সরে গেল। বেয়ারাকে গিয়ে বোধহয় একটু ধমকও দিল, সেও আগে লক্ষ্য করেনি বলে।

কিন্তু ধমক-ধামক নিয়ে ওরা মাথা ঘামাতে তেমন রাজি না। দুটো-একটা কথা বেয়ারাকে বলেই ফণিভূষণ এসে বসল তার চেয়ারে। আর মাত্র দুটো দিন। আজ আর কাল। তাহলেই এই ঝঞ্ঝাট চুকে যায়। ফণিভূষণ তার পকেট থেকে বের করে নামের তালিকাটা দেখে নিল। সে বুঝতে পারল, যিনি ভিতরে ঢুকেছেন তার সামনের ঐ মেয়েটি নিশ্চয় তার সঙ্গী।

কোত্থেকে কীসব জিনিস যে জোগাড় করছেন—আশ্চর্য। এমন রাশভারি একজন মানুষ, চারদিকে এত তাঁর খাতির, এত তাঁর নাম—তাঁর কাছে কিনা আসছে যত-সব—

আর ভাবতে পারল না ফণিভূষণ। আপিসেও নানা জনে নানারকম কথা বলে তাকে। সব কথার উত্তর দেওয়াও তার পক্ষে মুশকিল। সে চুপ করে থাকে। চুপ করে থাকাই তার কাজ. এখনো সে চুপ করে বসল। মাঝেমাঝে কেবল তাকাতে লাগল লিলির দিকে।

ভিতরে তখন গোপা কথা বলে চলেছে পরাশরবাবুর সঙ্গে।

যে চাকরিটা সে এখন করছে তা তার মনের মতন কাজ না, কিন্তু তবু উপায় কী! কাজ তো একটা করতেই হবে।

শ্যামবাজার পাঁচমাথার মোড়ে একটা মস্ত দোকান আছে না? পাঞ্জাবিদের দোকান? না, না, মনোহারী দোকান না—খাবারের দোকান। চপ-কাটলেট পাওয়া যায়, রুটি-তর্কা পাওয়া যায়, মেঠাই-মণ্ডা পাওয়া যায়—আরো-সব আজেবাজে জিনিসও পাওয়া যায়। তারা ছয়-সাতটি মেয়ে কাজ করে সেখানে। খদ্দেরদের কাছ থেকে অর্ডার নেওয়া, তাদের দেখা-শুনা করা—এইসব হচ্ছে তাদের কাজ। অনেক পাজি লোকও আসে, যা-তা কথা বলে। কিন্তু তাদের কথায় কান করে না লিলি আর সে। ওদের দুজনের তাই খুব ভাব। আরও যারা আছে? থাক্‌গে বাবা, তাদের কথা না বলল গোপা। তারা সব পারে, তাদের খুব সাহস। কোথায় কখন চলে যায় তা ওরাই জানে।

"ওদের মতন চলা কি আমাদের উচিত? বলুন আপনি? আমরা হচ্ছি ভদ্দর-লোকের মেয়ে। আমাদের বাড়িতে পিসিমা আছেন। আমাদের কত ভাবনা!"

গোপার নাকি ভাগ্যি খুব ভালো, তাই সে পেয়েছে এই চাকরিটা। এখন বেশ চলে যাচ্ছে। কিন্তু কাজটা যদি আর-একটু আগে পেত তাহলে নাকি তাকে খোয়াতে হত-না অত আদরের কাকাতুয়াটা। অল্পের জন্যে হারাতে হল তাকে।

কথাটা বলেই গোপা স্তব্ধ হয়ে বসল। তার চোখও বুঝি একটু ছলছল করে উঠল।

"ওই পাখিটা নাকি আমার সমান-বয়সী। আমার সঙ্গে ওর ভাবও ছিল খুব। সব সময় আমাকে ডাকত—'গোপা, দানা দে।' গোপা, জল দে।' আবার, দিতে দেরি হলে তার সে কী রাগ! পাখা ঝাপটে ঝুঁটি ফুলিয়ে চীৎকার করে সে কী ধমক!"

একেবারে মানুষের মতন কথা বলত নাকি কাকাতুয়াটা। একেবারে মানুষের মতনই নাকি বুদ্ধি ছিল তার। কিন্তু—

গোপা আবার হঠাৎ থেমে গেল।

সেই স্তব্ধ মুখের দিকে চেয়ে রইলেন পরাশর। ঐ মুখটার উপরে দৈন্যের ছাপ বেশ স্পষ্ট। মুখটা বোধ হয় খুব অসুন্দর নয়, কিন্তু সৌন্দর্য যদি-বা কিছু থাকে তা হয়তো চাপাই পড়ে আছে। মুখটা একটু-যেন চেনা-চেনা, একটু-যেন দেখা-দেখা মনে হচ্ছে তাঁর। পথে-ঘাটে-ঘোরা মেয়ে। কখন্ হয়তো কোথাও একে তিনি দেখেছেন।

"আমার পিসি আর আমি থাকি মধ্যমগ্রামে। আমাদের আর কেউ নেই। খুব আপনার

জন ছিল ঐ পাখিটা, সেও আর নেই।"

পরাশরবাবু বললেন, "শিকল ছিঁড়ে উড়ে পালিয়েছে বুঝি?"

"শিকল ছেঁড়ার মত জোর ওর আর ছিল না—তাই তো খুব কষ্ট হয় ওর কথা ভাবলে।" চোখের পাতা দ্রুত ওঠানামা করতে লাগল গোপার।

পরাশরবাবু অন্য কথায় চলে এলেন, বললেন, "যেখানে কাজ করছ সেখানে কী রকম পাচ্ছ?"

"দিনে দেড় টাকা পেতাম। দশ-বারো দিন হল মাইনে বেড়েছে—দু টাকা পাচ্ছি। তার উপর দুবেলা খাওয়া দিচ্ছে।"

কিন্তু কতদিন এ কাজ করতে পারবে তা সে বুঝতে পারছে না। ও রকম জায়গায় বেশিদিন কাজ করা কি যাবে। সেইসব ভেবেই তো তাড়াতাড়ি সে দরখাস্ত করেছে এখানে। যদি এখানে কাজ সে পেয়ে যায় তবে বেঁচেই যাবে সে, সত্যিকারের বাঁচা যাকে বলে সেইরকম বেঁচে যাবে। কিন্তু

গোপা বলল, "কিন্তু আপনি তো চল্লিশের নীচে নেবেন না। আমার আশাও তাই নেই। মিথ্যেমিথ্যি কতদূর থেকে ছুটে এলাম ভাবুন। কাজের জন্যে অবশ্য এরকম ছুটোছুটি করতেই হয়। এক জায়গায় গেলেই যদি কাজ জুটে যেত তাহলে তো ভাবনা ছিল না। প্রত্যেক লোকেই তবে চাকরি পেয়ে যেত।"

কথাগুলো শুনে পরাশরবাবুর একটু অবাকই লাগল। জীবনকে আর সংসারকে এতটা এ চিনে ফেলেছে জেনে ফেলেছে প্রথমে তা বুঝতে পারেন নি পরাশরবাবু।

মধ্যমগ্রাম কি কখনো দেখেছেন পরাশরবাবু? ওরা যখন সেখানে প্রথম আসে তখন লোকজন সেখানে খুব কম ছিল। এখন অনেক লোক হয়েছে, অনেক বাড়ি হয়েছে। অনেক পাকা-পাকা বিরাট-বিরাট দালানও হয়েছে সেখানে। তাদের বাড়ি? সেটা বাড়ি না, সেটা একটা ঘর—একটা মাটির ঘর। সামনে একটা পেয়ারা গাছ আছে। সেই গাছে চড়ুই শালিখ এসে বসে, এসে বসে টিয়াপাখিও। ঘাড় উঁচু ক'রে ক'রে ওই পাখিদের ধমক দিত কাকাতুয়াটা। তার জমিতে ওরা এসে হানা দিয়েছে, এই জন্যেই হয়তো খুব রাগ দেখাত কাকু। হ্যাঁ, কাকাতুয়াকে গোপা কাকু বলে ডাকত।

কাকু যখন খুব মেজাজ দেখাত তখন গোপা এসে গম্ভীর হয়ে তার সামনে দাঁড়ালেই সে বুঝত, চুপ ক'রে বসত দাঁড়ে। একটু পরে বলত, 'দানা দে।'

পাখির আহার! সেই আহারই তখন জোটাতে পারছে না গোপারা। গোপাদের তখন এমনি দশা।

*

পিসিমা চুপ ক'রে বসে থাকতেন দরজার কোণে। গোপা ঘরের ভিতরে টান হয়ে শুয়ে থাকত। যেন মুখ দেখাতে লজ্জা হত কাকুকে।

কাকু গলা ফাটাত, 'গোপা, দানা দে। গোপা, জল দে।'

তাড়াতাড়ি উঠে এসে গোপা দাঁড়ের বাটিতে জল ঢেলে দিয়েই আবার দৌড়ে চলে যেত ঘরের ভিতরে।

এভাবে তো চুপচাপ শুয়ে থাকলে চলবে না। ঘরে কোনো রেস্ত নেই। পাখির আহারই যখন নেই, অবস্থা যখন এসে পৌঁছেছে এমন এক অচল সীমায়, তখন বুঝতেই পারা যাচ্ছে সব ব্যাপারটা।

গোপা কাজের সন্ধানে বের হল। কত জায়গাতেই যে সে গিয়েছে তার কোনো হিসেব

নেই। কোনো সুবিধা করতে পারছে না। এত ঘুরতে-ঘুরতে তার মনে হল, ঘোরাঘুরি তো সে করছেই, বাড়িতে-বাড়িতে গিয়ে লেস্-ফিতে-মাথার কাঁটা-চিরুনি বিক্রি করলে কেমন হয়। ভালোই বোধহয় হয়, কিন্তু তার জন্যেও কয়েকটা অন্তত টাকা তার দরকার। সামান্য কয়েকটা টাকা হলেই হয়। কিন্তু কোথায় সে পাবে সেই টাকা? অনেক ভেবেছে সে। দু-তিনটে টাকা হলেই হয়ে যায়, হিসেব করে সে দেখেছেও।

পেয়ারা গাছের ডালের সঙ্গে কাকুর দাঁড় ঝোলানো আছে। দাঁড়ে বসে-বসে ঝিমোয় সে। ডাকাডাকি করে এখন কম। হয়তো বুঝেছে যে, ডেকে বিশেষ ফল হবে না। কিন্তু মাঝে-মাঝে হয়তো ভুলে যায়, চেঁচিয়ে ওঠে—'গো-পা—'

তার পালকের রং কেমন-যেন চটে যাচ্ছে। বুড়ো হয়ে যাচ্ছে নাকি তাদের কাকু? কিন্তু এরই মধ্যে বুড়ো সে হবে কেন, সে তো গোপার সমবয়সী।

সেদিন ঘুরতে-ঘুরতে গোপা এসে পৌঁছল মানিকতলায়। একটা ওষুধের কারখানায় কাজ হচ্ছে দেখে, সে তাদের আপিস-ঘরে ঢুকে পড়ল বেপরোয়া হয়ে। এক ভদ্রলোক খুব গম্ভীর হয়ে বসেছিলেন চেয়ারে। মেঝেতে অনেক ওষুধের বাক্স।

গোপা ঢুকে পড়ল ঘরে। কাজ আছে কিনা জানতে চাইল। কিন্তু কাজ নেই শুনে সে বলল, 'আপনাদের ওষুধ আমি বিক্রি করতে পারি।'

ভদ্রলোক নাকি এক চোখ একটু ছোট করে তার দিকে চেয়ে একটু হেসে বলেছিলেন, 'পারো বুঝি?' এবং একটু থেমে বলেছিলেন, 'তাহলে তো আমাকেও কিনতে পার মনে হচ্ছে! কিনবে নাকি?'

অদ্ভুত লোকটা। গোপা সেখান থেকে বেরিয়ে এল। পথে যেতে-যেতে ভাবল—লোকটা নিষ্ঠুরও কম না।

বিরাট একটা মনোহারী দোকান আছে মানিকতলা বাজারের কাছে, গোপা সেখানে গিয়ে ঢুকল। একটা ছোকরা এগিয়ে এসে বলল, 'কী দেব?' গোপা বলল, 'লেস-ফিতে-আলতা। দাম কাল দিয়ে যাব।' ছেলেটা উত্তর দিল না, সরে গেল।

আজ গোপা ভাবে, এভাবে সে ধার চাইতে সাহস করেছিল কিভাবে! এটা তো সাহসেরই কাজ, তাই না?

পরাশরবাবু বোধহয় একটু অন্যমনস্ক ছিলেন, হঠাৎ এই প্রশ্ন শুনেই বলে উঠলেন, "নিশ্চয়।"

রাত্রে শুয়ে-শুয়ে গোপা নাকি সেদিন আকাশ-পাতাল অনেক কথা ভেবেছিল। নিজের কথা আর পিসিমার কথা নিশ্চয়ই সে ভেবেছে, কিন্তু সবচেয়ে বেশি করে ভেবেছিল তার কাকুর কথা। বেচারা মুখের কথা বলতে পারে, কিন্তু মনের কথা তো বলতে পারে না। শেখা বুলি সে বলে বটে, কিন্তু তার আসল বলার কথা তো তার মুখ দিয়ে বের হয় না। বেচারা নিশ্চয় খুবই কষ্ট পাচ্ছে। তাকে এই কষ্ট দিয়ে কী লাভ? এর একটা ব্যবস্থা করলে হয় না?

পিসিমাকে সে কিছু বলল না। পরদিন সকালে উঠেই সে তৈরি হয়ে নিল। পিসিমা তখন পুকুরঘাটে গিয়েছেন, সেই সুযোগে সে কাকাতুয়ার দাঁড়টি ঝুলিয়ে নিয়ে রওনা হল বাড়ি থেকে।

একে বিক্রি করবে সে আজ। এতে সকলেরই সুবিধে। কাকু একটা ভালো বাড়িতে গিয়ে পড়বে, আর ঐ টাকা দিয়ে গোপারও নিজেদের একটা ব্যবস্থা করতে পারবে।

"বিপদে পড়লে মানুষ খুব নিষ্ঠুর হয়ে যায়, তাই না?"

এ কথার উত্তর দিলেন না পরাশরবাবু।

গোপা নাকি শ্যামবাজারের পাঁচমাথার মোড়ে কাকুর ঐ দাঁড় নিয়ে দাঁড়িয়ে জনে-জনে জিজ্ঞাসা করতে লাগল কিনবেন নাকি। রাস্তা দিয়ে অজস্র লোক যাতায়াত করছে, কিন্তু কেউ কোনো উত্তর দিচ্ছে না। রাস্তার ধারে একটা গাছ ঘের দেওয়া আছে তারের জাল দিয়ে, সেই তারের সঙ্গে দাঁড়টা ঝুলিয়ে দাঁড়িয়ে রইল গোপা।

হঠাৎ একটা লোক থমকে দাঁড়াল, 'কত দাম?' গোপা বলল, 'সাত টাকা', লোকটা বলল, 'পাঁচ টাকা হলে নিই।' আপত্তি করল না গোপা। রাজি হয়ে গেল পাঁচ টাকায়। গোপার হাতে টাকা দিয়ে তার থেকে দাঁড়টা খুলে নিয়ে লোকটা যেই রওনা হয়েছে অমনি তার পিছনের দোকান থেকে কে-যেন তাকে ডাকল। গোপা গেল। 'দৈনিক দেড় টাকা, দু বেলা খাওয়া—কাজ করবে?'—এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার আগেই গোপা রাস্তায় ছুটে এসে বহুদূর পর্যন্ত তাকাল। কোনো দাঁড় না, কোনো কাকু না, কাউকে দেখতে পেল না সে। রাস্তার দুই ধার দিয়ে স্রোতের মতন বয়ে চলেছে লোক।

দম বুঝি ফুরিয়ে গিয়েছে গোপার। সে থামল।

একটু পরে বলল, "কিন্তু কত জিনিস ফেলে এসেও একে ফেলে আসা হয় নি, সঙ্গে করে আনা হয়েছিল টেনে। সে এক লম্বা রাস্তা, লম্বা গল্প। আমি কিনা তাকে বেচে দিলাম? অল্পের জন্যে তাকে খোয়ালাম। আমার নিশ্চয় পাপ হবে।"

এ কথারও কোনো উত্তর দিলেন না পরাশরবাবু। কোনো মন্তব্য করারও ইচ্ছে তাঁর হল না। কিন্তু তাঁর মন কেমন-যেন ভারি হয়ে গেল। চুরটটা মুখে দিতে গিয়ে নামিয়ে রাখলেন ছাইদানির উপরে।

গোপার কথা ফুরিয়ে গিয়েছে। উঠি-উঠি করছে সে।

"তোমার মা-বাবা—" পরাশরবাবুর প্রশ্ন শেষ হবার আগেই গোপা বলল, "কাউকে আমি দেখিনি। আমি এই পিসিদেরই চিনি। এঁরাই আমাকে মানুষ করেছেন।"

তার জীবনটা নাকি বেশ মজার। কোথা থেকে সে এল, কেমন করে সে এল—কিছুই সে জানে না।

যখন তার একটু জ্ঞান হয়েছে তখন সে দেখল একটা লম্বা রাস্তা ধরে কাতারে-কাতারে লোক হেঁটে চলেছে। যার যা সম্বল আছে, তা সঙ্গে নিয়ে চলেছে সকলে। কেউ গলায় ঝুলিয়ে নিয়েছে সেলাই-কল, তার ভারে নুয়ে পড়েছে, তবুও চলেছে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে। রাস্তার মধ্যেই নাকি বহুলোক মারাও গিয়েছে। প্রাণের ভয়েই তারা পালাচ্ছিল, কিন্তু সেই প্রাণই তারা রাখতে পারল না।

সেই দলে আসছিল তারাও। সে তার পিসির কোলে চেপে আসছিল। সারাদিন তো সকলে হাঁটতই, রাত্রেও অন্ধকার ভেদ করে হেঁটে চলত। রাস্তা যেন আর ফুরায় না। আশ্চর্যই বলতে হবে, মানুষের আয়ু ফুরায় কিন্তু রাস্তা ফুরাতে চায় না।

তার পিসির দাদা—যাকে নাকি গোপা বলত বাবু—তিনি ঐ কাকাতুয়ার দাঁড় নিয়ে আগে-আগে চলেছেন। এখনো সেই ছবিটা গোপার চোখে স্পষ্ট হয়ে লেগে আছে।

ঐ ভদ্রলোকের নাম হরগোবিন্দ বসাক। তাঁর দোকান ছিল সোনা-রুপার। ছেলে-পুলে নেই। তাঁর স্ত্রীও মারা গিয়েছেন অনেক কাল আগে। মানুষটাও ছিলেন ভালো। অসহায় শিশুটার দশা কী হবে?—এটা নিয়ে যখন কথা হচ্ছিল তখন তিনি নাকি এগিয়ে

গিয়ে ভার নেন গোপার।

এলোমেলো কথা শুনতে-শুনতে পরাশরবাবুর মেজাজ কেমন-যেন ভোঁতা হয়ে গিয়েছে এখন, তাই তিনি বিশেষ কথা বলছেন না। অনেক সময় অন্যমনস্ক হয়েও যাচ্ছেন।

হরগোবিন্দ বসাক সঙ্গে করে কিছু সোনাও নাকি নিয়ে এসেছিলেন। এদেশে এসে পৌঁছনোর কিছুদিন পরেই তিনি মারা যান। তারপর থেকে পিসিমাই তার একমাত্র ভরসা, আর সঙ্গী একমাত্র ঐ পাখিটা—ঐ কাকু।

"মা-বাবাকে দেখই নি তুমি? এ তো অদ্ভুত কথা। দুজনে কি একসঙ্গেই মারা গেলেন?" পরাশরবাবু বললেন।

গোপা বলল, "আমি কিছুই জানি নে। যা আমি বলছি সবই আমার শোনা কথা। আমার জন্মের পরদিনই হাসপাতালে আমার মা মারা যান।"

"আর অমনি তোমাকে নিয়ে এলেন তোমার বাবু—হরগোবিন্দ বসাক?"

"আমি সব বলতে পারব না। আমাকে সব কথা ওরা বলেও নি। আমি জানতেও চাই নি। কী হবে আমার জেনে?"

পরাশরবাবু বললেন, "তোমারই-বা জেনে কী হবে, আর, আমারই-বা জেনে কী হবে। থাক্ গে ওসব কথা।"

পরাশরবাবু কিছু জানতে চাইলেন না বটে, কিন্তু হাতের উপর গালের ভর রেখে চুপচাপ বসে কী-যেন ভাবতে লাগলেন। অনেকক্ষণ ধরে কী-যেন ভাবলেন। তারপর বললেন, "তোমরা যে লম্বা রাস্তা ধরে এলে। এমন আসার মানে কী?"

"বা, আসব না? তখন লড়াই চলেছে যে! বর্মা দেশে তখন কী ভীষণ কাণ্ড। বর্মা দেশ ছাড়ার জন্যে লোকে পাগল।"

পরাশরবাবু বলে উঠলেন, "বর্মা দেশ, যাকে ব্রহ্মদেশ বলে, সেই দেশটার কথা তুমি বলছ নিশ্চয়?"

"ঐ হল। একই কথা।" বলল গোপা গঙ্গোপাধ্যায়, "আমার মা ঐ দেশে ইস্কুলে মাস্টারি করতেন। বাবাকে তো কেউ চেনে না, তাই মায়ের নামেই আমার নাম—"

"বর্মা দেশের কোথায় থাকতে তোমরা?" বাধা দিয়ে বললেন পরাশর।

"রেঙ্গুনে।"

পরাশরবাবু উঠে দাঁড়ালেন। হঠাৎ তিনি কেমন-যেন চঞ্চল হয়ে উঠলেন। গোপাও চঞ্চল হয়েছে, গোপাও বার-বার পিছন ফিরে পর্দার দিকে তাকাচ্ছে।

গোপাও উঠে দাঁড়াল। হাতজোড় করে নমস্কার করল, বলল, "খবর দেবেন তো? কিন্তু আমার বোধহয় হবে না। আমি তো চল্লিশ না।"

গোপা হাঁটতে লাগল। ধীরে-ধীরে পর্দার কাছে গেল। পর্দা পার হল। পিছনে-পিছনে পরাশরবাবু চলেছেন। তাঁকে দেখেই ফণিভূষণ উঠে দাঁড়াল। উঠে দাঁড়াল লিলি।

ওদের সঙ্গে সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগলেন পরাশর। গেট পর্যন্ত গেলেন। পরাশরকে এভাবে যেতে দেখে আশ্চর্য হয়ে গিয়েছে ফণিভূষণ, তাজ্জব হয়ে গিয়েছে বেয়ারাটা। এরা কি তবে সাধারণ মেয়ে না। সাধারণ যদি না, তবে দেখতে অমন গরিব-গরিব কেন।

গোপা যখন গেট পার হচ্ছে পরাশরবাবু তখন তার মাথায় হাত দিয়ে বললেন, "ভয় কী!"

গোপা একটু দাঁড়িয়ে গেল, এমন অভয় তাকে কেউ কোনোদিন দেয় নি। লিলি

তাকে বলল, "দাঁড়ালি কেন। চল্ জিজি।"

ঐ কথা শোনামাত্র পরাশরবাবুর কানের মধ্যে একসঙ্গে সহস্র ঝিঁঝি ডেকে উঠল।

গেটের কাছেই অনেকক্ষণ তিনি দাঁড়িয়ে রইলেন। ঐ যে ওরা ধীরে-ধীরে চলে যাচ্ছে, ঐ-যে ওরা বাঁক নিল।

প্রীতি সোম

পরাশরবাবু আজ আর আপিসে বের হলেন না। তাঁর মন-মেজাজ একেবারে অন্যরকম হয়ে গিয়েছে। নিজের উপরেই কেমন-যেন রাগ হচ্ছে তাঁর। নিজেকে বড় জঘন্য আর ঘৃণ্য বলে মনে হচ্ছে। মনে-মনে নিজেকে তিনি বেইমান বলতেও ছাড়ছেন না। তুমুল তোলপাড় করে তিনি নিজেকে দেখতে লাগলেন।

পরাশরবাবুর ঠিক কী হয়েছে ধরা যাচ্ছে না। কিন্তু, মনে হচ্ছে যেন, তিনি নিজেকে ঠিক ধরে ফেলেছেন। একটা মুখ বার-বারই ভেসে উঠছে তাঁর চোখের সামনে। তিরস্কার ব্যঙ্গ ভর্ৎসনা—কী নাম দেবেন পরাশরবাবু? নিজেকে তিনি কিভাবে গঞ্জনা দিয়ে চলেছেন তা তিনিই জানেন।

এত বড় দায়িত্ব নিয়ে চালাচ্ছেন এত বড় প্রতিষ্ঠান। সমস্ত কর্মীর সুখ-দুঃখের প্রতি তাঁর সমান নজর। মানুষের উপর দরদ তাঁর আছে বলে তাঁর খুব সুনাম। কর্মীদের তিনি খুবই প্রিয়পাত্র। দায়িত্বজ্ঞান আছে বলে সকলে তাঁর প্রশংসা করে থাকে। সেসব প্রশংসার কথা শুনে তিনি তো খুশি অবশ্যই, মাঝে-মাঝে একটু স্ফীতও হন, গর্বে বুক ফুলে ওঠে।

বেকুব, বেকুব, বেকুব! যাঁরা তাঁর প্রশংসায় পঞ্চমুখ তাঁদের কথা ভেবে তিনি মনে-মনে উচ্চারণ করলেন ঐ শব্দ। কোনো মানুষকে চেনা কোনো মানুষের সাধ্য না। মানুষ নিজে নিজেকে যতটা চেনে, এমন আর কেউ চেনে না। বেশির ভাগ মানুষ যে কত হীন নীচ জঘন্য কাজ করতে পারে, বেশির ভাগ মানুষই তা জানে না। যে মানুষ তার জীবনের সব রকম তুচ্ছতা-ক্ষুদ্রতা হীনতা-নীচতার কথা কবুল করছে বলে ঘোষণা করে—সে মিথ্যেবাদী। সব কথা সে বলে না, মারাত্মক কথাগুলো সে চেপে যায়।

পরাশরবাবুও এর ব্যতিক্রম নন। তিনি তা জানতেন। আজ তা বুঝি আরও স্পষ্ট করে জানলেন।

কিন্তু তিনি কী জেনেছেন তা তিনিই জানেন। বার-বারই একটা মুখ তাঁর চোখের সম্মুখে ভেসে উঠছে। সে মুখটা কি মধ্যমগ্রামের ঐ মেয়েটার মুখ, কিংবা অন্য কোনো মুখ? যে-মুখই হোক, ঐ দুটো মুখের মধ্যে বিস্তর সাদৃশ্য যেন আছে!

নিজেকে পাপী বলেও যেন পরিত্রাণ পাচ্ছেন না পরাশর। তাঁর মনের ভিতরে নিঃশব্দে প্রবল হাহাকার বেজে চলেছে। নিজেকে কিভাবে শান্ত করা যায়—এই তাঁর এখন ভাবনা।

এ-ঘর ও-ঘর সে-ঘর তিনি ছটফট করে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। চাকর-বাকরেরা সায়েবের এই আচরণ দেখে অবাক হয়ে গেল। তারা তফাতে তফাতে নিজেদের সরিয়ে রাখল। কোথাও কিছু গোলমাল তারাই করে ফেলেছে কিনা—এই রকম ভয়ও হতে লাগল তাদের মনে।

দেরাজ টেনে, সুটকেস খুলে তিনি তাঁর পুরনো জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হবার জন্যে

যেন চেষ্টা করতে লাগলেন। সেকালের কোনো ছবি, সেকালের কোনো কাগজ কোথাও খুঁজে পান কিনা, তিনি তারই চেষ্টা করতে লাগলেন। অনেক-কিছুই তো ছিল এককালে। তার পর বিয়ের পরে অনেক-কিছু সরিয়ে ফেলতে হয়েছে, অনেক-কিছু নষ্টও করে ফেলতে হয়েছে। তবু, তবু—যদি কোনো কাগজপত্রের ফাঁকে কোনো একটা চিহ্ন কোথাও পড়ে থাকে, তিনি তারই খোঁজ করতে লাগলেন।

কিন্তু কিছু পেলেন না। সত্যি, মানুষ কী অসহায়, মানুষ কী ভিতু, নিজেকে নিরাপদ করার জন্যে মানুষ কী ভীষণভাবেই নির্মম হতে পারে। যে চিঠিটা বা যে ছবিটা জীবনের সবচেয়ে দামী জিনিস ছিল, পাঁজরের হাড়ের চেয়েও যাকে নাকি মূল্যবান বলে ঘোষণাও করা হয়েছিল—তার কোনো অস্তিত্বই এখন নেই কোনোখানে।

না, মানুষের উপরে একেবারে অশ্রদ্ধা হয়ে যাচ্ছে পরাশরের। তাদের কোনো কথারই কোনো দাম নেই, কোনো প্রতিজ্ঞারই কোনো মানে নেই। মানুষ মাত্রেই হচ্ছে বেইমান, মানুষ মাত্রেই হচ্ছে নিষ্ঠুর।

এটা বোধ হয় ঠিক করছেন না পরাশর। নিজে তিনি কিছু-একটা কাণ্ড নিশ্চয় করেছেন, হঠাৎ হয়তো নিজের কাছেই ধরাও পড়ে গিয়েছেন, সেইজন্যে নিজের অপরাধে মানুষ-মাত্রকেই অপরাধী করা—এটা হয়তো একটু বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে।

সারাটা দিন তাঁর কেটে গেল ছটফট করে। এক-একবার ইচ্ছে হতে লাগল যে, এবার সব ইতি করে দেবেন—আর ইন্টারভিউ নেওয়া নয়, অনেক তো হল। এক-একবার ইচ্ছে হতে লাগল—গাড়িটা নিয়ে একবার বেরিয়ে পড়বেন। কিসের খোঁজে তা তিনিই জানেন।

কিন্তু তখনই তাঁর মনে হল নিজের সুনামের কথা। তাঁর দায়িত্বজ্ঞানের কথা—তিনি নাকি কথার মানুষ, তিনি নাকি কাজের মানুষ। অনেক ব্যাপারেই মানুষ কাবু, কিন্তু সবচেয়ে কাবু বোধহয় সুনাম নষ্ট হবার ভয়ে। পরাশরবাবু তাই কাবু হয়ে গেলেন। তিনি বের হলেন না। বিকেল ছটার জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলেন। তখন আসবে একজন ক্যান্ডিডেট। কী যেন নাম তার? ফাইল খুলে দেখলেন—প্রীতি সোম।

সেই প্রীতি সোম যথাসময়ে এসে উপস্থিত হয়েছে। ভদ্রঘরের মেয়ের মতই দেখতে। কিন্তু চেহারার উপরে বাড়তি কিসের একটা ছাপ যেন আছে। মুখচোখের হাবভাবের মধ্যেও পালিশ আছে, কিন্তু ওরই মধ্যে একটু যেন রং-চটা ভাব। ত্রিশ-বত্রিশ বছর বয়স হবে। খাটো হাতার ছোট জামা গায়ে, পরনে কাঁচ-কলাপাতা রঙের একটি ফিনফিনে শাড়ি। সাদা সিঁথির ওপারে পিছন দিকে মস্ত একটি এলোখোঁপা।

মাঝেমাঝেই দুই হাত তুলে খোপাটা ঠিক করে নিচ্ছে, আর ঐ ফাঁকে পরাশরের মুখের দিকে চেয়ে দেখে নিচ্ছে তাঁর চোখমুখের চেহারার একটু-আধটু বদল হচ্ছে কিনা।

চোখ-দুটোও বেশ টানা। কাজল পরেছে নিশ্চয়। চোখের কিনার বেশ কালো। এতে চোখের দৃষ্টি বেশ জ্বলজ্বল করছে।

এলোখোঁপার কাঁটা তুলে সেটা আবার চুলের ফাঁকে বিঁধে দিতে-দিতে প্রীতি সোম বলল, "আপনি চল্লিশ চেয়েছেন বটে, আমার বয়স তার কিছু কম বটে, কিন্তু—"

হাত-দুটো নামিয়ে শাড়িটা গায়ের সঙ্গে একটু এঁটে নিয়ে টেবিলের কিনারে সেঁটে বসে বলল, "কিন্তু সব রকম কাজ পারব। যা আপনি চাইবেন।"

প্রীতি সোমের চোখ-দুটো একটু যেন হাসল।

গলা সাফ করে নিয়ে পরাশরবাবু বললেন, "শুনে আনন্দ হল। এমনি লোকই আমি

চাই। একেবারে একা থাকি তো! মনের মতন একজন সঙ্গী না হলে জীবনটা সঙ্গীন হয়ে ওঠে।"

টেবিলের কিনারে শরীরের ভর রেখে অযথাই একটু চাপা গলায় প্রীতি সোম বলল, "আমি আপনার সঙ্গিনী হব। আপনার যাবতীয় সুখ-শান্তি থাকবে আমার জিম্মায়। কী বলেন?"

"এতে আর বলার কী আছে।" পরাশরবাবু বললেন, "এটাই তো মানুষের জীবনের কাম্য।"

সারাদিন পরাশরবাবুর খুব খারাপ কেটেছে। সেই ভাবটা কাটিয়ে ওঠার জন্যেই সম্ভবত তিনি এমন অন্তরঙ্গভাবে কথা বলতে আরম্ভ করেছেন। বেশ হাসি-হাসি মুখ করে তিনি তাকাচ্ছেন প্রীতি সোমের দিকে। এতে প্রীতি সোম বেশ প্রীত হচ্ছে। তার মনে হচ্ছে অন্যান্য দিনের সন্ধ্যার সঙ্গে আজকের এই সন্ধ্যাটির কত তফাত। আজ কার মুখ দেখে সে উঠেছিল তা সে মনে করতে পারছে না। কিন্তু যার মুখ দেখেই উঠুক—সে লোকটা কিন্তু বেশ পয়া। আজ প্রীতিকে সে জুটিয়ে দিয়েছে এক প্রীতিপ্রদ মানুষকে।

প্রচণ্ড ঝড়ের মধ্যে যখন পড়ে কোনো পাখি, তখন সে পাখার ঝাপটা দিতে-দিতে সেই ঝড়ের এলাকা পার হয়ে যাবার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করে। তার পর নিরাপদ এলাকায় পেৌঁছলে সে একটা আশ্রয়-শাখায় বসে-বসে ঠোঁট দিয়ে যেমন মেরামত করে তার এলোমেলো পালক, পরাশরবাবুও বোধ হয় এখন সেইরকম করছেন। সারাদিন তাঁর মনের উপর দিয়ে প্রবল ঝড় বয়ে গিয়েছে। এখন সেই বিক্ষিপ্ত মনকে তিনি শান্ত করছেন।

বেশ হাসি-হাসি মুখে পরাশরবাবু বললেন, "এখন কী করা হচ্ছে?"

পরাশরবাবু কিছু-একটা আন্দাজ করে থাকবেন, তাই বোধ হয় তাঁর চোখে-মুখে বেশ-একটা কৌতুকের ভাব ফুটে উঠেছে।

পরাশরবাবুর জিজ্ঞাসার জবাব দিতে গিয়ে একটু থতমত খেল প্রীতি সোম। বলল, "তেমন কিছু না। তেমন কিছুই যদি করব তবে আবার আপনার কাছে আসা কেন।"

"তা তো বটেই। কিন্তু জিজ্ঞাসা করছিলাম, যে কাজের জন্যে আমার কাছে আসা, এরকম কাজ করার অভ্যাস আছে তো?"

প্রীতি সোম চোখ নীচু করে টেবিলের দিকে তাকিয়ে কিছুক্ষণ বসে রইল, তার পর চোখ তুলে চেয়ে একটু হাসি-হাসি ভাব করে বলল, "ঠিক এরকম কাজ করি নি বটে। কিন্তু এটা তো মেয়েদের কাজ। আমি মেয়ে হয়ে কেন এ কাজ পারব না? খুব পারব।"

এ কথা শুনে খুব খুশি হলেন পরাশর। বললেন, "নিজের উপর এই রকম বিশ্বাসই রাখতে হয়। মনের জোর থাকলে অনেক কঠিন কাজও করতে পারে মানুষ।"

"তা পারে।" প্রীতি বলল, "কিন্তু এটা কিন্তু খুবই সোজা কাজ।"

কী করে তা বুঝল প্রীতি? পরাশর মানুষটা যদি তেমন সোজা মানুষ না হয়ে থাকেন। তিনি সোজা মানুষ না হলে তাঁকে তদারকের কাজটাও সোজা না হতে পারে। কিন্তু সে কথা নিয়ে বেশি তর্কের মধ্যে যেতে চাইলেন না পরাশর।

হঠাৎ পরাশর বললেন, "তোমাকে কোথায় যেন দেখেছি!"

পরাশরের কথাটা শুনেই সামান্য-একটু চমকে উঠল প্রীতি। তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, "তা দেখে থাকতে পারেন। পথে-ঘাটে কোথাও। বাঁচার জন্যে তো চলাফেরা করে ঘুরে বেড়াতেই নয়।"

"খুবই ঘুরতে হয় বোধ হয়?"

"হ্যাঁ। খুব। হাঁটি, শুধু হাঁটি।"

মাথা দোলাতে লাগলেন পরাশর পুরকায়স্থ। মনে-মনে কী-যেন ভাবতে লাগলেন। কোথায় দেখেছেন, কখন দেখেছেন, কিভাবে দেখেছেন—এইসব কথাই ভেবে দেখতে চেস্টা করতে লাগলেন তিনি।

সে কোথায় থাকে, বাসায় আর কে-কে আছে, তারা সব কী করে, বাবা-মা বেঁচে আছেন কিনা ইত্যাদি অনেক প্রশ্ন ধীরে ধীরে করে যেতে লাগলেন পরাশর। কিছু-কিছু উত্তর সে সরাসরি দিল, কিছু-বা দিল একটু ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে।

পরাশরবাবু বললেন, "এমন অনেকে আছে যে নাকি তার বাবার নামই বলতে পারে না। বলে, বাবাকে দেখি নি, তাঁকে চিনি না।"

প্রীতি ঠোঁট ওল্টাল, বলল, "কী জানি। ওসব ন্যাকামির মানে জানি নে। আমি বাবাকে দেখেছি, তাঁর নামও জানি, তাঁকে চিনিও। আপনাকে তো বললাম তাঁর নাম।"

বাড়িতে তার বাবা আছেন, মা আছেন, দিদি আছেন, ভাই আছে। বাবা বুড়ো হয়ে গিয়েছেন, কাজকর্ম কিছু করতে পারেন না। খুব বেশি চলাফেরাও করতে পারেন না। তাঁকে একটা গড়গড়া কিনে দিয়েছে প্রীতি, তিনি এতে খুব খুশি। মা তো সেকেলে মানুষ—ঘরকন্না নিয়েই আছেন। দিদিটা দেখতে বেশ ভালো, প্রীতির চেয়ে যখন বড় তখন বয়সও তার বেশ হয়েছে। কিন্তু এক ইঞ্জিনিয়ার ভদ্রলোক তার প্রেমে পড়ে আছেন বছর পনেরো-ষোলো হল। দিদিকে ছাড়ছেনও না, বিয়েও করছেন না। সেই ইঞ্জিনিয়ারের নাকি এক অসুস্থ বউ আছে, অনেক দিন থেকে শয্যাশায়ী। পুরুষদের হালচাল বোঝে কার সাধ্য: হয়তো তাঁর বউয়ের কিছু হলে তবেই তিনি এদিকে কিছু করবেন বলে দিন গুনছেন। এদিকে প্রীতিদের অবস্থা তো শোচনীয়। মাইথনে থাকেন সেই ভদ্রলোক, মাঝে মাঝে আসেন, দিদিকে নিয়ে সিনেমায় যান, হয়তো একটা জামা কিংবা একটা কাপড় কিনে দেন—ব্যস, চুকে গেল তাঁর দায়িত্ব। আর, তার ছোট ভাইটি কাজ করে এক কারখানায়। কখনো কাজ থাকে, কখনো থাকে না। যখন যা পায় তা প্রায় নিজের জন্যেই খরচ করে, কখনো-সখনো মায়ের হাতে দেয় হয়তো দু-চার টাকা।

এই তো সংসার প্রীতিদের। তারা থাকে বেশ ভদ্র পাড়াতেই। বালিগঞ্জ প্লেসে। একটা বাড়িতে আছে দেড়খানা ঘর নিয়ে। ছোটটায় থাকেন মা-বাবা, বড়টায় তারা তিনজন।

পরাশরবাবু বললেন, "তবে সংসার চলছে কী করে?"

"চলছে। কিছুই অচল হয়ে যায় না।" একটু থেমে প্রীতি বলল, "দায় প্রায় সবটা আমার উপরেই।"

"তবে তো খুব খাটনি আছে তোমার?"

"হ্যাঁ।" প্রীতি একটু থেমে বলল, "ঝুঁকিও কম না।"

কিসের ঝুঁকি, কেন ঝুঁকি, কোথায় ঝুঁকি—ধীরে-ধীরে প্রশ্ন করে যেতে লাগলেন পরাশরবাবু। ধীরে-ধীরে উত্তর দিতে লাগল প্রীতি। অনেকক্ষণ এইভাবে কথা হবার পরে পরাশরবাবু বললেন, "বুঝেছি। যাদের ওয়াকিং গার্ল বলে, তুমি হচ্ছ তাদেরই একজন।"

অস্বীকার করল না প্রীতি সোম। পরাশরবাবু যে সব বুঝতে পেরেছেন, তা সে বুঝল। তিনি তাকে কোথায় যেন দেখেছেন বলছিলেন, হয়তো রাস্তায়-রাস্তায় তাকে হেঁটে বেড়াতেই দেখেছেন।

প্রীতি বলল, "আমরা ভদ্রঘরের মেয়ে। গৃহস্থবাড়িতে থাকি, গৃহস্থপল্লীতে থাকি। পল্লীর বউ-ঝি'দের সঙ্গে আমাদের মেলামেশা আছে। কিন্তু আমরা যে-কাজ করি তা যদি কেউ জানে তবে আমাদের সঙ্গে বোধহয় কেউ মিশবে না।"

না। গণিকা তারা না। বারবণিতাও তারা নয়। তাদের কেউ ওসব কথা বললে তাদের ইজ্জতে অবশ্যই লাগবে। অথচ, তাদের যে রকম ঝুঁকি নিতে হয় ওইসব মেয়েদের সে রকম নিতে হয় না।

প্রীতি সোম নাকি সব বোঝে। নিজেকেও সে খুব চেনে। যে কাজ করে সে জীবিকা জোগাড় করে, সে কাজের নাম কী তাও তার জানা। কিন্তু কত ভদ্র সেজে থাকতে হয় তাদের, কত অন্যরকম হয়ে থাকতে হয়,—এটা বেশ একটা কষ্ট। তাদের পাড়ায় কি এ কাজ সে একাই করে? কক্‌খনো না। আরও আছে। কিন্তু তারা সকলেই প্রীতির মতন ঘরের মেয়ে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

না। তার দিদি বের হয় না। দিদির বের হওয়া অসুবিধে আছে। যদি সেই ইঞ্জিনিয়ার ভদ্রলোক কখনো তাঁকে দেখে ফেলেন, এই ভয়ে সে বের হয় না। প্রীতি কী করে বেড়াচ্ছে তা তার দিদি জানে। দিদিরও ইচ্ছে আছে এইভাবে বের হবার, কিন্তু ঐ এক ভয়। ইঞ্জিনিয়ারের কাছে ধরা পড়ে গেলেই তার ভবিষ্যৎ অন্ধকার। অন্তত সে তাই মনে করে। কিন্তু প্রীতিদের ধারণা তার দিদির ভবিষ্যৎ অন্ধকারই হয়ে গিয়েছে। পনেরো বছর ধরে যিনি তাকে আশায়-আশায় রেখেছেন, তিনি কোন্ দায়িত্বটা পালন করছেন? একমাস দুই মাস অন্তর একটা সিনেমা কিংবা একটা শাড়ি দিয়ে একটা মানুষ দিনের পর দিন বাঁচে কী করে? একদিন-না-একদিন তারই মত তার দিদিকেও রাস্তায় নামতেই হবে বলে প্রীতির ধারণা, কিন্তু তখন তার বয়স আর থাকবে না।

হ্যাঁ। মা-বাবাও নিশ্চয় সব বোঝেন। কিন্তু এসব নিয়ে বেশি কথা বলেন না। বেশি কথা যাতে বলতে না পারেন তার জন্যেই তো ঐ গড়গড়া। অকর্মণ্য মানুষকে ব্যস্ত রাখার ওটা একটা বেশ যন্ত্র : খরচও তেমন বেশি না।

রাস্তায় রাস্তায় হেঁটে বেড়ায় প্রীতি। বাস্-স্টপে বাস্-স্টপে মাঝে মাঝে দাঁড়ায়। চোখ সব সময় ঘোরে চারদিকে। অনেক দিনের অভ্যাস। এখন লোক দেখলেই বুঝতে পারে কার কী রকম চাহিদা।

যদি পাড়ার কোনো চেনা লোক দেখে ফেলে? কী দেখবে তারা? হেঁটে যেতে দেখবে। রাস্তায় হেঁটে বেড়ানো মানাও নয়, পাপও নয়; কী দেখবে তারা? বাস্-স্টপে দাঁড়িয়ে কারো সঙ্গে কথা বলছি। আত্মীয়স্বজন কিংবা চেনাশুনা লোকের সঙ্গে এরকম দেখা হওয়া কি অন্যায়? কার-না দেখা হচ্ছে?

এইজন্যে ওসব নিয়ে কোনো ভাবনা নেই। ভাবনা হচ্ছে অন্য ব্যাপারে। ভাবনা হচ্ছে অচেনা লোকের সঙ্গে অজানা জায়গায় যাওয়ায়। এ রকমও তো যেতে হয়। সব সময় তো খুশি অনুযায়ী বাছাই করলেই চলে না!

"কি, ওভাবে তাকিয়ে আছেন যে! আমার কথা শুনে বুঝি আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছেন?" প্রীতি বলল।

"আশ্চর্য হচ্ছি নে। ভাবছি, কখন যে কী বিপদ হয়ে যায়—কে বলবে?"

"বিপদ কি হয়নি, না, বিপদ হয় না?" প্রীতি বলল, "ট্রাঙ্কের মধ্যে মৃতদেহ কি পাওয়া যায় না?"

ভ্রূ একটু কুঁচকে পরাশর তাকালেন প্রীতির দিকে। ট্রাঙ্কের মধ্যে কিংবা হোটেলের বাথরুমে মৃতদেহ পাওয়ার খবর তিনি দেখেছেন বটে কাগজে, কিন্তু সেসব কি এরাই—এই ওয়ার্কিং গার্লরা?

সকলেই তা না হতে পারে, কিন্তু অনেকেই নাকি এরা। যারা গণিকা, যারা পতিতা—তাদের জীবন নিয়েও এরকম ঘটনা ঘটে, গৃহস্থবধূদের নিয়েও কি ঘটে না? ঘটে। কিন্তু গণিকাই হোক, বা গৃহবধূই হোক—তাদের জীবন অনেক নিরাপদ, তারা থাকে নিজের ডেরায়। কিন্তু প্রীতিরা ঘোরে খোলা জায়গায় খোলা মন নিয়ে : তাদের এই মুক্ত জীবনে মুক্তিও এসে যেতে পারে যে-কোনো সময়ে।

পরাশরবাবুর প্রশ্নের উত্তরে হঠাৎ প্রীতি একটু বিষণ্ণ হল, বলল, "আমরা পতিতা নই। আমরা আমাদের মনে করি প্রণয়ী। আমরা প্রণয়পাত্র খুঁজে বেড়াই। অন্তত, ঐভাবে আমরা আমাদেরই কাছে আমাদের মান বাঁচাই।"

ঘরে-ঘরে আছে-না এমন অনেক কুমারী মেয়ে, যারা নাকি মেলামেশা করে পাঁচজনের সঙ্গে, উপহার পায় কতজনের কাছ থেকে; যারা বারএ যায় বন্ধুদের সঙ্গে, রেস্তোঁরায় যায় বান্ধবদের সঙ্গে—তাদের কি পতিতা বলবেন পরাশরবাবু. যত অধঃপতনই হোক, তবু তারা কুমারী। তারা পথে-পথে হাঁটে না, কেননা হাঁটার দরকার তাদের হয় না; তাদের কারো-কারো নিজেদের গাড়ি আছে. গাড়িতে চড়ে, কেউ-কেউ চড়ে বন্ধুদের গাড়িতে, কেউ আবার চলাফেরা করে ট্যাক্সিতে।

"তারা যা পায় তা উপহার, আমরা যা পাই তা হচ্ছে মজুরি।" প্রীতি বলল, "তাদের সঙ্গে আমাদের তফাত কিন্তু বড় কম। কিন্তু তারা তারা, আমরা আমরা। আমরা চাপে পড়ে নেমেছি এই রাস্তায়, তারা নেমেছে ফুর্তির জন্যে। এইটুকু মাত্র তফাত।"

পরাশরবাবু প্রীতির যুক্তি সমর্থন করলেন কিনা ধরা গেল না। কিন্তু প্রীতি যা বলল তা ভাববার কথাই বটে।

যারা ধনী না, তাদের মনের জোর কম। তারা তাই যে কাজই করুক একটু চুপেচাপে করে, যারা গরিব না তারা খোলাখুলিভাবেই সব করে, ওটা তাদের খেলা মাত্র, ওটা তাদের পার্টি।

যেখানে প্রীতিরা থাকে, অর্থাৎ প্রীতি ও প্রীতির মতন আরও দু-চার জন, সেই অঞ্চলের ভালো-ভালো ঘরের অনেক মেয়ের কাণ্ডের কথা তারা জানে। তাদের কথা বলে পরাশরবাবুর সময় নষ্ট করতে চায় না এখন প্রীতি।

খুব সাবধানে চলাফেরা করতে হয় প্রীতিদের। তাদের কাজ অনেকটা ফিরিওলার কাজের মতই বটে। কিন্তু তারা তাদের গায়ে বিজ্ঞাপন এঁটেও যেমন বেড়াতে পারে না, ফিরিওয়ালার মত হাঁকডাকও দিতে পারে না। তাই খরিদ্দার খুঁজে বের করা একটু কঠিনই বটে।

একজন অধ্যাপকের সঙ্গে প্রীতি নাকি একবার গিয়েছিল বেড়াতে ডায়মন্ডহারবারে। বেশি বয়স না ভদ্রলোকের, প্রীতিদের বয়সীই হবেন। সব রকম অভিজ্ঞতা জীবনে থাকা দরকার নাকি, এইজন্যেই তাঁর নাকি এরকম ইচ্ছা জেগেছে। তাঁর সঙ্গে অনেক অন্তরঙ্গ কথা হয়েছে প্রীতির। বেশ হাসিখুশি ভদ্রলোকটি। প্রীতি যখন তাদের নানা রকম অসুবিধের কথা বলছিল, তাদের জীবনের ও জীবিকার অনিশ্চয়তার কথা বলছিল তখন ভদ্রলোকটি নাকি হেসে সব কথা উড়িয়ে দেন। বলেন, যে নাকি যে লাইনে থাকে তার সেই

লাইনের কাজ জুটে যায়ই। তিনি নাকি আগে খুব প্রাইভেট টিউশনি করতেন; অনেক সময় ভাবতেন এই ছাত্রটার পরীক্ষা হয়ে গেলেই তো হাত খালি তখন কী হবে! কিন্তু আশ্চর্য, সময়-মতই জুটে যেত আর একটা। তিনি টিউশনি করে থাকেন এ খবর যারা জানত তারা খোঁজ পেলেই তাঁকে তা জানাত, কিংবা সরাসরি তাঁর কাছেও এসে হাজির হতেন কোনো অভিভাবক।

তাঁর এই যুক্তি শুনে প্রীতি খুব হেসেছিল। কিন্তু তিনি নাকি বলেন, প্রীতির কাজটাও ঠিক ঐ রকমই, প্রীতিও তো প্রাইভেটলি তাঁকে অনেক জিনিস শেখাচ্ছে!

পরাশরবাবু হঠাৎ শব্দ করে হেসে উঠলেন, বলে উঠলেন, "গ্রেট, গ্রেট, গ্রেট! কে তিনি, কে সেই অধ্যাপক। তিনি এই বয়সেই এতটা যখন বুঝেছেন তখন তাঁর ভবিষ্যৎ নিশ্চয় খুব ব্রাইট।"

একটু থেমে বললেন, "আজ সন্ধ্যায় তোমার কোনো প্রাইভেট টিউশনি নেই তো?"

প্রীতিও ঠিক সেই সুরেই বলল, "বলা যায় না। পথে বের হলেই ছাত্র জুটে যেতেও পারে।"

দুজনে এই ব্যাপার নিয়ে কিছুক্ষণ হাসাহাসি করল।

সারাদিন পরাশরবাবুর মন যেরকম গুমট হয়ে ছিল, তিনি নিজেও ভাবতে পারেন নি যে, সেই মন এত তাড়াতাড়ি এত পরিষ্কার ঝরঝরে হয়ে যেতে পারে।

বাঁদর-মার্কা অনেক লোকও নাকি জোটে তাদের বরাতে। এই রকম একজনের কথা মনে পড়েছে এখন প্রীতির। লোকটার টাকা আছে, আর গাড়ি আছে—এই তার অহংকার। কী-যেন ব্যবসা করে। খুব বড়-বড় কথা বলে, নিজেকে খুব জ্ঞানী আর গুণী বলে জাহির করারও তার ইচ্ছে। প্রথমে প্রীতিরা বুঝতে পারে নি, কিন্তু পরে ধরতে পেরেছে যে, লোকটা খুবই ধড়িবাজ। একসঙ্গে দু-তিনজন মেয়ে চাই, সব সময় এই তার বায়না। কেবল বলে সঙ্গে তার দু-তিনজন বন্ধুও যাবে। বিরাট পার্টি হবে, বিরাট ফুর্তি। কিন্তু মজা এই, মুখেই ফুর্তি-ফুর্তি করে, কিন্তু ফুর্তি করতে জানে না। প্রীতিদের মধ্যের একজনকে বলে অমুককে আর অমুককে আনতে, সকলের একসঙ্গে একই সময়ে এক জায়গায় হওয়া বেশ কঠিন কাজ। জায়গা-মত লোকটা এসে ঠিক হাজির হয় বন্ধুদের নিয়ে। বন্ধুদের খরচায় এইভাবে পার্টি চালাত লোকটা। এটা বুঝতে যাদের দেরি হয়েছে তারা বেশি ঠকেছে। এখন লোকটা ঘাড় থেকে নেমেছে, বাঁচা গেছে। কিন্তু একটা উপকার সে করে গিয়েছে, দফায় দফায় অনেক লোকের সঙ্গে পরিচয় করে দিয়েছে।

পরাশরবাবু হেসে বললেন, "এতে বুঝি প্রাইভেট টিউশনি ভালোই জুটছে?"

"আপনি ঠাট্টা করছেন। কিন্তু আমাদের প্রাণ যাচ্ছে। আর পারছি নে এ কাজ করতে। হাঁটতে-হাঁটতে হয়রান হয়ে গিয়েছি।"

প্রীতির মুখের দিকে অনেকক্ষণ চেয়ে থেকে পরাশরবাবু বললেন, "বেশি কৌতূহল থাকা ভালো না। কিন্তু জানতে ইচ্ছে করছে কতদিন হল এই কাজ করছ?"

"বছর পনেরো-ষোলো।" প্রীতি বলল, "ঐ ইঞ্জিনিয়ার ভদ্রলোক যখন থেকে দিদিকে ধরে আছেন।"

তার দিদির সঙ্গে একদিন লেক মার্কেটে হঠাৎ তাঁর দেখা হয়। দিদি এখনও বেশ সুন্দর, তখন তো আরও সুন্দর ছিল। ভদ্রলোকটিকে বেশ চালাক-চতুর, বেশ ছিমছাম। তিনি দিদির সঙ্গে কী-একটা অছিলা নিয়ে কথা বলেন, তার পর দিদিকে পৌঁছে দিয়ে যান

বাসায়। প্রীতিরা তখন থাকত ঠাকুরবাড়ি রোডে—লেক বাজারের কাছেই। প্রীতি তখন পড়ে টালিগঞ্জ ব্রিজের কাছে এক নাইট ইস্কুলে। সেই ইস্কুলে নানান রকমের মেয়ে আসত, যাদের ঠিক ভদ্রলোক বলা হয় না এমন ঘরের মেয়েরাও আসত অনেক। অনেক বিশ্রী-বিশ্রী কথাও তারা বলত, অনেক মজার-মজার কথাও। কাছেই লেক। একদিন কথা হল লেক্-এ গিয়ে মজা করা যাক। সেই মজা করতে গিয়েই সে মজল। প্রথম-প্রথম বেশ মজাই লাগত অবশ্য। তার পর অভ্যাস হয়ে গেল। হাতে টাকা পেয়ে টাকার উপর টান হয়ে গেল। দিদির সঙ্গেই সে বেড়াত, কিন্তু তখন দিদিকে তেমন সে পায় না, দিদি প্রায়ই বেড়াতে যায় ঐ ভদ্রলোকের সঙ্গে, তিনি তখন কলকাতায় কাজ করতেন, আলিপুরে ছিল তাঁর আপিস। তাই, ঘরে ফিরে একা থাকতে হবে ভেবে সে ঘুরে-ফিরে বাসায় ফিরত। সেই-যে আরম্ভ হয়ে গেল ঘোরা, এখনও সে ঘুরছে।

"হাঁটতে-হাঁটতে পা অবশ।" বলল প্রীতি।

"বিয়ে-টিয়ে করার ইচ্ছে নেই বুঝি?"

"খুব আছে। কিন্তু করে কে! কতজনই তো কথা দিল। কিন্তু হল কই। ও আর হবে না। এখন অন্য পথ দেখতে হবে। তাই আপনার কাছে এসেছি এই চাকরির জন্যে।"

"কী রকম মাইনে চাও?"

"কী রকম আপনি দিতে পারবেন?"

পরাশরবাবু বললেন, "সেটা ঠিক হিসেব করে দেখি নি। সে সম্বন্ধে তেমন ভাবিও নি কিছু। তোমার এ কাজে কীরকম হয় মাসে?"

"এসবের কোনো স্থিরতা নেই। কখনো তিন-শ'ও হয়, কখনো চার-পাঁচ শ'ও হয়। কিন্তু প্রত্যেক মাসে তো অমন হয় না। বছরের ছয় মাসই থাকে মন্দা।"

হঠাৎ প্রীতি যেন চমকেই উঠল। অনেকটা চমকের ধরনেই সে নড়ে বসল, বলল "কী সব কথা বলছি দেখুন। নিজেকে একেবারে খোলা করে ফেলছি, একেবারে খেলো করে ফেলছি। কিন্তু মুখের কথা শুনে যতটা খারাপ মনে করছেন আমাকে, ততটা খারাপ কিন্তু আমি নই। ভুল করে এ রাস্তায় চলছি ভাববেন না, ভালো রাস্তা পাচ্ছিনে বলেই—"

"কথা দিল অথচ বিয়ে করল না," পরাশরবাবু বললেন, "সেই ভদ্রলোকের ঠিকানাটা আমাকে দাও তো, তাকে গিয়ে আমি ধরি।"

"ক'টা ঠিকানা দেব? কত জনের ঠিকানা দেব? তারা কি এখনো বিয়ে না করে আমার জন্যে বসে আছে? বয়ে গেছে তাদের। তাদের অনেকেই বিয়ে করেছে, সে খবরটাও দিয়েছে আমাকে, আবার আমাকে নিয়েই সে গিয়েছে উলুবেড়িয়ার বাংলোয় ফুর্তি করতে। পুরুষ-মানুষদের আপনি চেনেন না। তারা কেবল আমাদেরই ঠকায় না, তারা তাদের বউকেও ঠকায়।"

পরাশরবাবু বললেন, "ঠিক বলেছ। পুরুষমানুষদের চেনা বড় শক্ত। এই ঠকিয়ে বেড়ানোই তাদের কাজ। তারা কেবল বেইমান নয়, তারা নিষ্ঠুরও।" একটু থেমে পরাশর-বাবু বললেন, "মেয়েরা তাদের চিনবে কী করে, তারা নিজেরাই নিজেদের চেনে না।"

"নিজেরা নিজেদের চেনে কিনা জানি নে। কিন্তু আমরা তাদের একটু-একটু চিনেছি।"

পরাশরবাবু প্রতিবাদ করে বললেন, "একটুও চেন নি। যেটুকু চিনেছ ভাবছ, সেটা ভুল চিনেছ।"

প্রীতির কিরকম যেন আশ্চর্য লাগতে লাগল। পুরুষমানুষ সম্বন্ধে পরাশরবাবুরও

ধারণা তবে এই রকম? তাঁকেও নিশ্চয় কোনো পুরুষমানুষ ভীষণ কোনো দাগা দিয়েছে। কিন্তু ব্যাপারটা কী, তা আর জানতে চাইল না প্রীতি সোম।

কিন্তু পরাশরবাবু ভাবতে লাগলেন। আকাশপাতাল কিসব ভাবতে লাগলেন তিনি। তার মুখ গম্ভীর হয়ে গেল। ঘরের তেজি আলোতেও তাঁর মুখ কী রকম যেন অন্ধকার বলে বোধ হতে লাগল।

প্রীতি কি তার অজানিতে কোনো কঠিন কথা বলে ফেলেছে? পুরুষমানুষদের সম্বন্ধে যেসব কড়া-কড়া কথা সে বলেছে, তার কোনোটা কি পরাশরবাবুর গায়ে লেগে গিয়েছে।

না। ভুলই করেছে প্রীতি। চাকরি খুঁজতে এসে আঁতের কথা এমন খোলাখুলিভাবে বলা তার ঠিক হয় নি। ঘরের আবহাওয়া হঠাৎ বেশ ভারি হয়ে গিয়েছে। প্রীতিরও যেন একটু ভয় করছে। সে উঠে চলে যেতেও পারছে না, কোনো কথাও বলতে পারছে না।

দুই হাত তুলে এলোখোঁপাটা সে মেরামত করতে লাগল অনেকক্ষণ ধরে। আলগোছে-আলগোছে তাকাতে লাগল পরাশরবাবুর মুখের দিকে। পরাশরবাবু অন্য দিকে চেয়ে আছেন। দেয়ালের দিকে ফাঁকা দৃষ্টি দিয়ে তিনি বসে আছেন চুপচাপ। হঠাৎ কী যে হল তাঁর কিছুই ধরতে পারছে না প্রীতি সোম।

ভদ্রলোকের মাথা খারাপ আছে কিনা সন্দেহ হতে লাগল তার। তাকে চাকরি দেবেন বলে তার হাঁড়ি-হেঁসেলের সব কথা তো উনি জেনে নিলেন, কিন্তু যার সঙ্গে একা বাড়িতে একা থেকে কাজ করতে হবে তাঁর সম্বন্ধেও তো সব কথা জেনে নেওয়া দরকার। তা না হলে এখানে এসেও তো বিপদে পড়তে হতে পারে।

প্রীতি দু-একবার ওঠার চেষ্টা করল। অবশেষে কিছু-একটা বলতে হয় বলে সে বলল, "আপনি কিরকম মাইনে দিতে পারবেন তা তো বললেন না।"

পরাশরবাবু ধীরে-ধীরে তাকালেন প্রীতির দিকে, বললেন, "চাকরিটা আগে হোক, তবে তো মাইনে।"

"চাকরিটা তবে হল না বুঝি?"

"এখনো কিছু ঠিক বলা যাবে না। আরও দুজন বাকি আছেন। তাঁরা কাল আসবেন। তাঁদের সঙ্গেও কথা বলে দেখি।"

"তবে, আমি কি আজ যাব?"

কোনো উত্তর না দিয়ে পরাশরবাবু উঠে দাঁড়ালেন, বললেন, "সাতটা বাজল। এখনো সন্ধ্যা বলা যায়। সন্ধ্যা উৎরে যায়নি নিশ্চয়?"

"তা বোধ হয় যায়নি।" প্রীতি বলল, "আশা নিয়ে যাচ্ছি কিন্তু। আবার আসব।"

প্রীতি বিদায় নিল। কিন্তু আবার আসার ইচ্ছে কিন্তু তার নেই। পরাশরবাবুর আচরণ দেখে সে অবাক হয়ে গিয়েছে, ভয়ও হয়তো পেয়েছে একটু।

এণা রক্ষিত

নামের সঙ্গে মানুষের কত তফাত। এণা রক্ষিত এসেছেন। তিনি নাকি অনেক দূর থেকে আসছেন, যাদবপুর এলাকা থেকে।

অনেক সময় নাম দেখে, কখনো-বা হাতের লেখা দেখে পরাশর নির্বাচন করেছিলেন

প্রার্থীদের। ভেবেছিলেন, এদের নিশ্চয় রুচি আছে, শিক্ষা আছে, দীক্ষাও আছে। কিন্তু একজনও তাঁর কল্পনার সঙ্গে এক হলেন না। প্রত্যেক দিনই তিনি একবার করে মনে করেছেন এ কথা। কিন্তু এখনকার মত এমন নিবিড়ভাবে তা ভাবেন নি।

এণা রক্ষিত তাঁকে ভাবিয়ে ছাড়লেন। খুব রুক্ষ শুক্‌নো চেহারা এণা রক্ষিতের। যাকে বলে খুব নাকাল-হওয়া চেহারা। রং কালো। কিন্তু কালো রংও অনেক সময় ফর্সাকে হার মানায়। এণা রক্ষিতের রং কালো না হয়ে অন্য কোনো রকম হলেও বিশেষ-কিছু সুবিধের হত বলে পরাশরের মনে হয় না। সাধারণ ভঙ্গিতে পরা একটা সাধারণ শাড়ি দিয়ে শরীর জড়ানো। শাড়ির আঁচলে চাবির রিং বাঁধা, রিংএর সঙ্গে একটা মাত্র চাবি।

ভাষা নিয়ে ভাববার কিছু নেই, যার যা মুখের বুলি সে তা বলবেই, কিন্তু কথা বলার ভঙ্গি যেন কেমন। যাকে বলে ছ্যাড়ছ্যাড় ক'রে কথা বলা, সেইভাবে কথা বলছেন এণা রক্ষিত।

উনিশ-শ পঞ্চাশে তিনি নাকি এসেছেন পাকিস্তান থেকে। দেশের মাটি কামড়েই পড়ে ছিলেন, সে মাটি ছাড়ার ইচ্ছে ছিলই না। কিন্তু পঞ্চাশ সালে সেই যে নতুন ক'রে বেধেছিল গোলমাল, তখন বাধ্য হয়েই ছাড়তে হল দেশ।

মান-মর্যাদা সব নাকি পদ্মার জলে ভাসিয়ে দিয়ে এণা রক্ষিত এসেছেন ভারতবর্ষে।

এণা রক্ষিত বললেন, "এহানে আমরা রিফিউজি।"

পরাশরবাবু তা বুঝতে পেরেছেন, সে কথা তিনি চোখের ইশারায় তাঁকে জানালেন।

এণা রক্ষিতের বয়স কত হবে তা ধরা যাচ্ছে না। কিন্তু বয়স যা'ই হোক—এই রকম লোক দিয়ে পরাশরবাবুর কাজ চলবে কিনা তা তিনি যেন ঠিক বুঝতে পারছেন না। অথচ একেবারে কথাবার্তা না বলাও ঠিক না ভেবে তিনি স্থির হয়ে বসলেন। আর, ইনি নাকি এসেছেন অনেক দূর থেকে—সেই যাদবপুর এলাকা থেকে। এত দূর থেকে যখন এসেছেন, তখন একটু বিশ্রাম করতে দেওয়াও দরকার।

কোনো কথা পরাশরবাবু বলছেন না দেখে এণা রক্ষিতও চুপ করে বসে রইলেন। কিন্তু অনেক কথা বলার জন্যে তিনি যেন তৈরি হয়ে এসেছেন, তাই একটু উশখুশ করতে লাগলেন।

এণা রক্ষিত জানালেন, বয়স তিনি যত চেয়েছেন, এণা রক্ষিতের তাই, সেদিক থেকে পরাশরবাবুর কোনো অসুবিধে হবে না।

উনিশ-শ পঞ্চাশে যখন তিনি আসেন তখন তাঁর বয়স ছিল কুড়ি। আরো তো কুড়ি বছর কাটল এর মধ্যে। কুড়িতে-কুড়িতে তবে কত হয়?

পরাশরবাবু মনে-মনে বললেন, 'বুড়ি', কিন্তু মুখে বললেন, "ঠিক আছে।"

এখন আর তাঁকে কি দেখছেন পরাশরবাবু, এখন তো তিনি "ষারে কয় ধ্বংসাবশেষ", কিন্তু সেই সময়ে যারা তাঁকে দেখেছে তারা এখনও নাকি তাঁর স্বাস্থ্যের কথা বলে।

কিন্তু এসব অতীতকালের কাহিনী শুনে পরাশরবাবুর লাভ? তিনি নিজেও তাঁর অতীতকে ভুলে থাকতে চান। অতীত জিনিসটা খুব সুবিধের জিনিস নয় : বিষাক্ত সাপের মতন ওর চরিত্র, চুপচাপ থাকে কুণ্ডলী পাকিয়ে, হঠাৎ ফণা তুলে কখন যে ছোবল মারে ঠিক নেই, কখন যে বিষদাঁতটা গেঁথে দেয় শরীরে তারও কোনো স্থিরতা নেই। ওর থেকে একটু তফাতে একটু সাবধানে থাকাই ভালো।

এইসব সাত-পাঁচ ভেবে পরাশরবাবু এণা রক্ষিতকে কথা বলার বিশেষ সুযোগ দিতে চাইলেন না। অথচ এণা রক্ষিত বুঝি কিছু বলবেনই।

রূঢ় হওয়া তাঁর সাজে না। কিন্তু এক-এক বার তাঁর ইচ্ছে হল তিনি একটু রূঢ়ই হবেন। অথচ তিনি তা হতে পারলেন না।

দেশ ভাগ করে মানুষের কী সর্বনাশই করা হয়েছে এসব কথা নিয়ে খুব আক্ষেপ করতে লাগলেন এণা। এ রকম ভাগাভাগি না হলে এসব দুর্দশা নাকি তাঁদের হত না। কিন্তু তা নিয়ে আর কান্নাকাটি করে কী হবে। যা হবার তা তো হয়েই গিয়েছে।

পরাশরবাবু বললেন, "ঠিকই বলেছেন। যা হবার তা তো হয়েই গিয়েছে অনেক বছর আগে। এসব ব্যাপার নিয়ে অনেক তর্কবিতর্কও হয়ে গিয়েছে। ওসব পুরনো হয়ে গিয়েছে। ওসব পুরনো কথা এখন থাক্।"

এণা রক্ষিত তৎক্ষণাৎ পরাশরের কথা মেনে নিলেন। ঠিকই তো, পুরনো কথা নিয়ে সময় নষ্ট করার দরকার কী। কাজের কথাই এখন সেরে নেওয়া ভালো।

কবে থেকে কাজে লেগে যেতে হবে তা জানতে চাইলেন এণা রক্ষিত। এ কথা জানতে চাচ্ছেন এইজন্যে যে, দিন দুই আগে খবর পেলে তাঁর খুব সুবিধে হয়। তাঁর ভাইদের এক ছেলে থাকে তাঁর কাছে, তাকে তার বাপের কাছে পৌঁছে দিয়ে আসতে হবে চন্দননগরে। তাঁর নিজের কোনো ছেলেপিলে? আরে মরণ! তাঁর আবার ছেলেপিলে কী। তাঁর কি বিয়ে হয়েছে?

কেবল তবে বুড়ো না বুঝি এণা রক্ষিত, তিনি আইবুড়োও? কিন্তু বিয়ে হল না কেন, বিয়ে করলেন না কেন তিনি—একথা জানার ইচ্ছে হল পরাশরের অকারণেই।

এণা রক্ষিত কথা বলার সুযোগ পাওয়ার জন্যেই ব্যস্ত। কিন্তু পরাশর এই সুযোগটা দেওয়া সত্ত্বেও এণা রক্ষিত চুপ করে বসে রইলেন। অনেকক্ষণ চুপ করে রইলেন তিনি।

হঠাৎ একটা কথা বলে উঠলেন তিনি, "বিভীষিকা।"

ঐ শব্দটা উচ্চারণ করেই থেমে গেলেন, তাঁর দুই চোখ একটু বড়-বড় হয়ে উঠল, তাঁর চোখের একেবারে কাছেই যেন একটা ভীষণ বিভীষিকা নৃত্য করে বেড়াচ্ছে বলে মনে হল পরাশরেরও।

এণা রক্ষিত বললেন যে, ব্যাটাছেলেরা জানোয়ার। তারা নাকি মানুষ না, তারা জন্তু। তাদের ত্রিসীমায় নাকি থাকতে নেই। তার জীবনটাকে ধ্বংস করে দিয়েছে নাকি ওই ব্যাটাছেলেরাই।

পরাশরবাবুর বেশ মজাই লাগছে। যাঁরাই আসছেন তাঁর কাছে তাঁদের মধ্যে বেশির ভাগই পুরুষমানুষদের উপর বেশ খাপ্পা। তিনিও পুরুষ, তাই পুরুষদের তিনি চিনতে পারেন নি নিশ্চয়। অন্য যেসব মহিলার সঙ্গে জীবনের বিভিন্ন সময়ে তাঁর দেখা-সাক্ষাৎ হয়েছে তাঁরা পুরুষমানুষ সম্বন্ধে তাঁদের মনের কথা বলেন নি নিশ্চয় ভদ্রতা করে, কিংবা চক্ষুলজ্জায়। এখন যাঁরা আসছেন তাঁদের ওসব বালাই নেই, তাই স্পষ্ট কথা তাঁরা বেশ সহজেই বলে চলেছেন। এবং এঁদের হিসাব বোধ হয় ভুল না। পুরুষমানুষ যে সত্যিই একটা ভয়ংকর ব্যাপার, তা বিশ্বাস করেন পরাশর। নিজেকে দিয়েই বিশ্বাস করেন। তিনিও তো কম বেইমান নন।

কিন্তু নিজের কথা এখন এত বেশি করে ভাবার দরকার কী। দরকার নেই বটে, কিন্তু না ভেবেও যেন উপায় পাচ্ছেন না তিনি।

এণা রক্ষিত চুপ করেই আছেন। কিন্তু তাঁর জিজ্ঞাসার উত্তরটা পাওয়ার জন্যে তিনি বেশ ব্যাকুলই হয়েছেন, কবে থেকে তাঁকে আসতে হবে তা তিনি জানতে চান। পরাশরের

সঙ্গে দেখা করার জন্য তিনি যে চিঠি পেয়েছেন সেই চিঠিকেই তিনি নিয়োগপত্র বলে মনে করছেন। এই নিয়োগপত্র পেয়ে তাঁর মনে হয়েছে এতদিন পরে ভগবান তাঁর দিকে মুখ তুলে চেয়েছেন। মানুষের একটা জীবন, এ তো একটা সামান্য জিনিস, কত মানুষই তো আছে বিশ্বসংসারে—তারাও তো জীবনধারণ করে চলেছে। কিন্তু এণার জীবনটা একেবারে যেন অন্য জিনিস, একেবারে আলাদা জিনিস। এমন জীবন আর ক'টা মানুষের আছে। তাকে সকলে ঘেন্না করে, তাচ্ছিল্য করে, অবজ্ঞা করে, অপমান করে। বিশ বছর ধরে নাকি সকলের ছি ছি শুনতে শুনতে তার কান ঝালাপালা হয়ে গিয়েছে। এইবার এই চিঠি পেয়ে তার প্রাণে আনন্দ এসেছে, খুশি এসেছে—জীবনে এই তার প্রথম খুশি। তাই সে বোঝাতে পারছে না তার প্রাণে আনন্দ কত! তাই তো সে জানতে চাচ্ছে কবে থেকে আসতে হবে তাকে।

পরাশরবাবু এসব কথা শুনে একটু অসুবিধেয় পড়ে গেলেন। তিনি যে বড়-রকমের একটা ভুল করে ফেলেছেন, এ বিষয়ে তাঁর কোনো সন্দেহ নেই। কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে এইভাবে লোক জোগাড় করা একটা সহজ কাজ বলে তাঁর মনে হয়েছিল, কিন্তু কাজটা যে কত কঠিন এবং কত জটিল তা তিনি এখন বেশ বুঝতে পারছেন।

এণা রক্ষিতের কথার কী উত্তর দেবেন তাই বসে-বসে তিনি ভাবছেন। আর ভাবছেন পৃথিবীতে কত রকমের মানুষ যে আছে, কত রকমের যে তাদের সমস্যা তার আর কোনো ইয়ত্তা নেই। মাত্র বারোজনকে তিনি ডেকেছেন, এতেই তিনি হিমশিম খাচ্ছেন। যে ক'টা চিঠি তিনি পেয়েছেন তাদের সকলকে যদি ডাকতেন তবে একটা বৃহৎ যজ্ঞের মতই একটা আয়োজন নিশ্চয় হত।

ঘরের চার দেয়ালের দিকে চেয়ে-চেয়ে অবাক হয়ে যাচ্ছেন এণা রক্ষিত। মানুষের এত ঐশ্বর্যও থাকতে পারে। একটা মানুষ এত ধনদৌলত নিয়ে করে কী? একটা জামা, একটা কাপড়, আর দু বেলা দু-মুঠো অন্ন হলেই যার চলে যাবার কথা, তার এত চেয়ার-টেবিল, এত ঝাঁক, এত পর্দা, এত পাখা কেন। এণা রক্ষিত ঠিক বুঝতে পারছে যে, যাদের এত আছে তারা কখনো যাদের কিছু নেই তাদের কষ্ট কেন বোঝে না।

উনিশ-শো পঞ্চাশ সাল—সে এখন কত দূরে চলে গিয়েছে। কোনোরকমে প্রাণটা হাতে নিয়ে সে এসে নেমেছিল শেয়ালদা স্টেশনে। তার পর দিনের পর দিন সেই ইস্টিশনেই কেটে গেল তার দিন। সেটা ইস্টিশান যেন নয়, সেটা একটা নরক—নরককুণ্ড। মলিনা নামে সেই মেয়েটা তার ঘুমন্ত মায়ের পাশ থেকে চুপ করে মাঝরাতে যখন উঠে চলে যেত, তখন এণা হাত ভাঁজ করে চোখ আড়াল করে শুয়ে-শুয়ে ভাবত—ও যায় কোথায়। গা শিউরে উঠত এণার। সে নিজে ঘর-পোড়া গোরু, তাই এই সিঁদুরে মেঘ দেখে তার খুব ভয় লাগত। মেয়েটার কী-যে হবে, ভাবত সে; সে প্রাণ নিয়ে ফিরতে পারলে হয়, মনে হত এণার। তার শরীর তখন কাহিল, পাঁচ-সাত রকম কথা ভাবতে ভাবতে কখন ঘুমিয়ে পড়ত এণা। শেষ-রাতে ঘুম ভাঙলে যখন দেখত যে, মলিনা তার মায়ের কোলের কাছে কোলের-মেয়েটির মত শুয়ে আছে, তখন নিশ্চিন্ত হত এণা।

শেয়ালদা স্টেশন তখন যে দেখেছে সে-ই শিউরে উঠেছে। নোংরা-নোংরা ঝোলাঝুলি নিয়ে মেয়ে-পুরুষ বাচ্চা-কাচ্চা গাদাগাদি হয়ে পড়ে আছে। এদের সকলের চেহারাই মানুষের মত, কিন্তু এরা বুঝি কেউই মানুষ নয়, যেন পিঁজরাপোলে জমায়েত করে রাখা হয়েছে একপাল পশু। এমন একটা মানুষ দেখেনি তখন এণা, যে নাকি এগিয়ে এসে এদের বাঁচবার ব্যবস্থা করবে, এদের বাঁচাবার ব্যবস্থা করবে।

তখন সে টাটকা এসেছে তার দেশের মাটি থেকে। দেশের মাটির গন্ধ তার গায়ে তখনও লেগে। দেশের মাটির হাওয়া তখনও তার বুকের মধ্যে হয়তো একটু আছে। গ্রামের সেই গাছ লতা পাতা তখনও তার চোখের সামনে সবুজ-সবুজ নিশান ওড়াচ্ছে। তাই তার কাছে নতুন ঐ অবস্থাটা খুবই বিশ্রী আর নোংরা লেগেছিল।

কিন্তু এখন সয়ে গেছে, দেখে-দেখে সয়ে গেছে সব। মানুষও যে কত নোংরা হতে পারে এখন তার সব খবর জানা হয়ে গিয়েছে এণা রক্ষিতের।

যে কলোনিতে এখন থাকে এণা, সেটাও তো একটা নরকই প্রায়। যে ঘরে অন্ন জুটছে না, সেই ঘরের মেয়ে বেনারসী পরে রাত-বারোটায় ঘরে ফিরছে। বলছে, বন্ধুর বাড়ি থেকে এলাম; বলছে, বন্ধুর শাড়ি পরে এলাম। কেউ-ই সে কথা বিশ্বাস করছে না, কিন্তু সে কথা নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটিও করছে না কেউ। প্রায় সব ঘরেরই এক দুর্গতি, কে কার ঘরের কথা নিয়ে হুজ্জোত বাড়াবে।

শেয়ালদা স্টেশন থেকে এণাকে পাঠিয়ে দিয়েছিল দণ্ডকারণ্যে। কেন যে তাকে এই দণ্ড দেওয়া হল, এণা তা জানে না। তার বাবা মা ভাই কে কোথায় আছে সে খোঁজ তখন সে জানে না। সে তখন একেবারে একা, একেবারে আলাদা।

তখনও তার শরীরের গঠন বেশ শক্ত ছিল। কিন্তু ভিতরে কোনো শক্তি ছিল না। বাইরে থেকে দেখে তো লোকে বুঝত না, তার দিকে প্যাটপ্যাট করে তাকাত, আর বলত, তোর বরাতে অনেক সুখ আছে।

দণ্ডকারণ্যে বছর-তিন ছিল এণা। তারপর এর কাছে তার কাছে খবর নিতে-নিতে, কোন্ গাঁয়ের লোক এখন কোথাকার কোন্ ক্যাম্পে আছে, কোন্ কলোনিতে আছে তার হদিশ জানতে জানতে সে খবর পেল তার মা-বাবা-ভাইয়ের। তারপর সে কত কষ্ট, কত তদারক, কত তদ্বির। অবশেষে সে ফিরে এল যাদবপুরের ঐ কলোনিতে।

সে ভেবেছিল তাকে পেয়ে তার বাপ-মা বুঝি হাতে আকাশের চাঁদ পাবে। কিন্তু এ কী হল? দণ্ডকারণ্য থেকে যখন সে এসে পৌঁছল বাপ-মা'র কাছে তখন তাঁরা মুখ ঘুরিয়ে বসলেন। ব্যাপার কী তা বুঝতে পারল না এণা। তার কান্না এল। যতই সে মায়ের কোলের কাছে ঘেঁষে বসে ততই তার মা সরে যান দূরে। তার ভাই মহিম বুঝি সব বুঝেছিল, সে তার হাত ধরে টেনে নিয়ে গেল ঘরে, আদর করে সে সেখানে বসাল। তার দিদিকে।

এণা নাকি নষ্ট হয়ে গিয়েছে। তাকে ছোঁয়াও নাকি পাপ। কিন্তু কেন? বসে বসে সে ভাবতে লাগল একমনে।

পঞ্চাশ সাল। দেশের ভিটে ছেড়ে চলে আসতেই হবে যখন ঠিক হয়ে গেল, তখন এণাও তৈরি হতে লাগল তার বাবা-মার সঙ্গে রওনা হবার জন্যে। তখন খুব গোলমাল লেগে গিয়েছে। কে কোন্ রাস্তা দিয়ে পালাবে তার জন্যে গোপনে গোপনে সকলে সলা-পরামর্শ করছে। তখন সে এক ভয়ানক অবস্থা। যারা সে অবস্থার মধ্যে না পড়েছে তারা তা বুঝতেই পারবে না।

রাত তখন নিশুতি। বাড়ির খিড়কি-দরজা দিয়ে অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে তারা রওনা হল রেলস্টেশনের দিকে। অনেকটা রাস্তা তারা চুপেচাপে চলে এসেছে, ইস্টিশান আর বেশি দূরে নয়। হঠাৎ তারা বুঝতে পারল কারা যেন তাদের পিছু নিয়েছে। তারা জোর-কদমে হাঁটতে লাগল।

হঠাৎ এণা বুঝতে পারল তার কাঁধে কার-যেন হাত, সে চীৎকার করে উঠবে, এমন সময় তার মুখ চেপে ধরল একটা শক্ত হাত।

সে পড়ে রইল। তার বাবা-মা-ভাই সেই অন্ধকারের মধ্যেই হাহাকার করতে-করতে ছুটতে লাগল।

সকলের কাছ থেকে ছটকে গেল এণা রক্ষিত।

সেইদিন ঘটল তার জীবনের সর্বনাশ। চোখের সামনে বিভীষিকা দেখতে লাগল এণা রক্ষিত।

পনেরো-ষোলো জন তাজা আর তাগ্ড়া লোক ছিল সেই দলে। তারা তাকে টেনে নিয়ে গেল এক জঙ্গলে। এলোমেলো ভাবে টানতে-টানতে তাকে নিয়ে চলল তারা।

তার পর, তার পর, তার পর? আরম্ভ করল তারা অত্যাচার। বীভৎস অত্যাচার।

সেই জঙ্গলে দিন-দুই ছিল, সেখান থেকে তাকে তারা নিয়ে গেল একটা পোড়ো বাড়িতে। সেখানে সে বন্দী হয়ে রইল।

দিনের মধ্যে চার-পাঁচ জন লোক চার-পাঁচ রকম চেহারা নিয়ে হাজির হত তার কাছে। কিন্তু তাদের চাহিদার মধ্যে কোনো ফারাক নেই।

কেউ-কেউ আসত কিছু খাবার নিয়ে, খুব দরদ দিয়ে কথা বলত, খুব দয়ামায়ার কথা বলত। খুব আদরযত্ন করে তাকে খাওয়াত। তখন এণার মনে হত একটা ভরসার জায়গা হয়তো তার হল। এ কথা ভাবছে, কিন্তু তখনই বুঝতে পারত মিথ্যা তার এই আশা। হঠাৎ নিজের মূর্তি ধরত লোকটা, ভীষণ আর ভয়ংকর হয়ে উঠত, চোখ দুটো জ্বলে উঠত আগুনের গোলার মত। তার পর—

ঘরের মধ্যে যখন এই প্রলয়কাণ্ড চলেছে, অস্পষ্টভাবে কানে ভেসে আসত একটা শব্দ। মনে হত, কেউ বুঝি তাকে উদ্ধার করতে আসছে। কিন্তু তখনই বুঝতে পারত কেউ উদ্ধার করতে আসছে না তাকে, বাইরে কারা যেন উল্লাস করছে।

ঠিক মনে নেই এণার। পনেরো দিনও হতে পারে, বিশ দিনও হতে পারে এণা ছিল এদের খপ্পরে।

তার শরীর তখন ছাতু হয়ে গিয়েছে। হাত-পায়ে তার আর কোনো বল নেই।

একদিন ভোরবেলা সত্যিই তাকে উদ্ধার করার জন্যে কারা যেন এল। এণা তখন অসাড় হয়ে পড়ে আছে।

সেই বিভীষিকার বৃত্তান্ত বলতেও তার গা শিউরে ওঠে। তার বুক কাঁপে।

সেই-যে তার শরীরে ভাঙন ধরল, তাকে আর রোখা গেল না। কী ছিল এণা, আর আজ তার কী দশা।

বিয়ে সে করেছে কিনা জিজ্ঞাসা করছিলেন পরাশরবাবু। বিয়ে আর করা যায়? ব্যাটাছেলেদের যে মূর্তি সে দেখেছে, আর কখনো ইচ্ছে করে তাদের বউ হতে? বুড়ো হয়ে গিয়েছে এণা, তবু এখনো তাই সে আইবুড়ো।

পাঁচজনের উচ্ছিষ্ট কুড়িয়ে তার জীবন কাটছে। কিন্তু কাজ যদি সে পায়, কাজ সে করবে। এইজন্যেই তো পরাশরবাবুর চিঠি পেয়ে সে ছুটে এসেছে। কবে থেকে তাকে থাকতে হবে তা বলে দিন-না পরাশরবাবু—বার-বার অনুনয় করতে লাগল এণা।

কিন্তু তাঁর কাছ থেকে তেমন পাকা কথা না পাওয়ায় এণা যেন একটু গরম হয়ে উঠতে লাগল। বলতে লাগল, এসব কী, গরিব-মানুষদের নিয়ে এরকম ছেলেখেলা কেন!

পাকাপোক্ত যদি কিছু ঠিক না হয়ে থাকে, চিঠিতে সে কথা স্পষ্ট করে লিখে দিলেই হত।

এণা রক্ষিত বেশ শক্ত হয়ে বসল, বলল যে, এ কাজ সে চায়। এ কাজ তাকে দিতেই হবে। এ কাজের যোগ্য কি সে না? যদি যোগ্য না মনে করেন পরাশরবাবু, তাহলে তার প্রমাণ দিতে হবে। বড়মানুষি নাকি অনেক দেখেছে এণা রক্ষিত।

পরাশরবাবু বেশ বিচলিত আর বিব্রত হয়ে উঠলেন, এণা রক্ষিতকে ঠান্ডা করার জন্যে বললেন, "আপনি যোগ্য না কে বলল, কিন্তু আমি আপনাকে রাখার মত যোগ্য কিনা সেটাও তো দেখতে হবে? কয়েকদিন সময় দিন্, একটু ভেবে দেখি।"

"বেশ।" এণা রক্ষিত উঠে দাঁড়াল, পরাশরকে করজোড়ে নমস্কার করে বলল যে, দিন-কয়েক বাদে সে আবার খবর নিতে আসবে।

"আসতে হবে না। আমিই খবর দেব।"

মতলব নাকি বুঝেছে এণা রক্ষিত। চলে যাবার সময় প্রায় শাসানোর মতন ক'রে বলে গেল যে, খবর না পেলে সে দেখে নেবে।

পরাশরবাবু মনে-মনে হাসলেন। একটু ভয়ও যে তিনি পাননি, এমন নয়।

ঈপ্সিতা চাকী

আবার ওবেলা যে কে আসছেন, এই একটা আতঙ্ক। কী রকম চেহারা নিয়ে আর কি রকম মেজাজ নিয়ে যে তাঁর আবির্ভাব হবে পরাশরের এ এক নতুন ভাবনা। সঙ্গে যে ছবিটা ইনি পাঠিয়েছেন, তাতে তো মন্দ দেখাচ্ছে না।

এণা রক্ষিত তো অনেকটা চরমপত্র দেবার মতনই কথা বলে গেলেন। ইনি আবার এসে কোনো গরমপত্র পরাশরকে দেবেন কিনা কে জানে।

যা হবার হবে। তার জন্যে তৈরি হয়েই রইলেন পরাশর পুরকায়স্থ।

আজ শনিবার। একটা সপ্তাহ বেশ জমাট ভাবে কেটে গেল। পরাশর যে একেবারে একা ও একক—এ কথা তাঁর মনেই হয়নি এই কয়টা দিন।

আজ শনিবার। আজ সন্ধ্যার সাক্ষাৎকারের পাট চুকিয়ে তিনি একটু বের হবেন। হাওয়া-খাওয়াই বলা যাক, বা মুক্ত বায়ুসেবনই বলা যাক—আজ পরাশর নিজেকে নিয়ে একটু বের হবেন। নিজেকে যাচাই করার চেষ্টা করবেন। তিনি লোকটা ঠিক কেমন, ঠিক কী তাঁর অভাব এবং কী তাঁর চাহিদা, এসব নিয়ে একা বসে একটু ভাবতে হবে।

মস্ত টেবিলের উপরে দুই পা তুলে দিয়ে গা এলিয়ে বসেছেন পরাশর। এভাবে তিনি বড়-একটা বসেন না, কিন্তু আজ কেন-যেন ইচ্ছে হল নিজেকে একটু ঢিলে করে দিতে, নিজেকে একটু ছড়িয়ে দিতে।

বেশ আরাম করেই বসেছেন পরাশর, এখন যদি এণা রক্ষিত এসে হাজির হয় তার দাবি নিয়ে, তাকে রাখতেই হবে—এ রকম জুলুম নিয়ে। তা হলে কী আর হবে, একটা অশান্তি একটু হবেই, হোক। জীবনে শান্তি আর কার কাছে!

তাকে রাখতেই হবে! পরাশর মনে-মনে একটু হাসলেন, নিজের মনেই একটু রসিকতা করলেন, এণা রক্ষিত বুঝি হতে চায় এণা রক্ষিতা!

বেশ মজার কথাটাই তাঁর মনে এসে গেছে, এতে তিনি বেশ খুশি। কথাটা নিয়ে বন্ধুমহলে একদিন বেশ জমাট হয়ে বসে তামাশা করা যাবে।

কখন ছটা বেজেছে তা তাঁর খেয়াল নেই। পর্দা নড়ে উঠতেই তিনি সেদিকে তাকালেন। ফণিভূষণ কী যেন বলছে।

"কিছু বলছ ফণিভূষণ?"

"উনি এসেছেন।"

তাড়াতাড়ি পা নামিয়ে সোজা হয়ে শক্ত হয়ে বসে পরাশর বললেন, "নিয়ে এসো।"

এক মিনিটের মধ্যেই এসে পৌঁছলেন ঈপ্সিতা চাকী। দরজার কাছ থেকে বেশ মৃদু আর মোলায়েম গলায় বললেন, "আসতে পারি?"

চেহারায় বেশ চটক আছে, কথায় বেশ মার্জনা আছে, পরাশর সামনের দিকে একটু ঝোঁক দিয়ে বললেন, "আসুন। আসুন।"

মাথা সামান্য ঝুঁকিয়ে একটু নমস্কার করার ভঙ্গিতে মহিলাটি তর্‌তর্‌ করে কার্পেটের উপরে হাল্কা হাল্কা পায়ের চাপ দিয়ে এগিয়ে এলেন টেবিলের পরপারে, বললেন, "বসতে পারি?"

"বসুন। বসুন।"

তিনি বসলেন। হাতের হ্যান্ডব্যাগটি কোলের উপরে রেখে সেটি খুললেন, একটি চিঠি বের করলেন, পরাশরের দিকে সেটি এগিয়ে দিতে দিতে বললেন, "এই আপনার চিঠি। আমার নাম ঈপ্সিতা চাকী।"

ঈষৎ হেসে পরাশর বললেন, "বুঝতে পেরেছি।"

"আপনি একজন গবর্নেস চেয়েছেন, হয়তো আমাকে এ কাজের যোগ্য আপনার মনে হবে।" বললেন ঈপ্সিতা।

গবর্নেস! পরাশর মনে-মনে একটু হাসলেন। তিনি তো চেয়েছেন হাউস-কীপার। কিন্তু সে কথা আর কিছু বললেন না।

"আমার ওয়াইড এক্সপিরিয়েন্স আছে। ডমেস্টিক সায়েন্স আমার ছিল।"

পরাশর বললেন, "তা আমি জানি। অ্যাপ্লিকেশনেই তার উল্লেখ তো করেছেন। আমি কিন্তু একজন এল্‌ডারলি লেডি চেয়েছিলাম।"

ঈপ্সিতা একটু হেসে বলল, "দরখাস্তে বয়সের কথা বলিনি। কোথায়ই-বা আমরা বয়সের কথা বলি! কিন্তু দেখেই নিশ্চয় বুঝতে পারছেন আমি কচি মেয়ে না। অনেক রকম কাজ করেছি । করছিও।"

"আপনি যে খুব প্র্যাকটিক্যাল তা দেখেই বোঝা যাচ্ছে।" বেশ প্রীত হয়েই বললেন পরাশর।

পরাশরের মন এখন বেশ প্রসন্ন। কেননা, ঈপ্সিতা সোম যে একজন রুচিসম্পন্না মহিলা, বেশ মার্জিত, বেশ শিক্ষিত, এবং ভালো বংশে জাত তা বেশ বোঝা যাচ্ছে।

চুল বব করে কাটা, বেশ ফাঁপানো। কপাল একেবারে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। ঠোঁটে খুব হাল্কা করে গোলাপি লিপস্টিক মাখা। গায়ে হাতকাটা ছোট জামা, পরনে বাটিক-প্রিন্টের মিহি শাড়ি। এক হাতে ছোট্ট ঘড়ি বাঁধা, অন্য হাত খালি।

দেখে মনে হয় পঁচিশ-ছাব্বিশ বছর বয়স হবে। কিন্তু আসলে খুব বেশি হলে বছর ত্রিশ। শরীর রোগা বলা যায় না, কিন্তু বেশ হাল্কা। গায়ের রং ফর্সা না, কালোও না।

"অনেক কাজ তো করেছেন", পরাশর বললেন, "কিন্তু কী-কী কাজ করেছেন জানতে পারি?"

ঈপ্সিতা চাকী স্মিত হেসে বললেন, "সে কথা বলছি। কিন্তু আপনার এখানে কী-কী কাজ করতে হবে, সেটা যদি একটু খুলে বলেন।"

"খোলাখুলির কিছু নেই। একটা বুড়োমানুষকে দেখাশুনা করতে হলে যা-যা করতে হয়—"

"কে, মানুষটা কে?"

পরাশরবাবু হাসলেন, হেসে বললেন, "যদি বলি আমি?"

"বিশ্বাস করব না।"

"কেন, অবিশ্বাসের কী আছে? আমাকে দেশাশুনা করার কি দরকার নেই?

"অনেকটা তো তাই মনে হয়। আপনি বেশ শক্ত আছেন, দেখে মনে হয় বেশ অ্যাকটিভও।"

"হ্যাঁ, অ্যাকটিভ আছি। সেই অ্যাকটিভিটি বজায় রাখার জন্যে—"

ঈপ্সিতা চাকী হেসে উঠল, "সেটা বজায় রাখার জন্য একজন বুঝি থাকবে ওস্কানি দেবার জন্যে?"

"কথাটা হয়তো ঠিকই ধরেছেন আপনি। মানুষ যখন একেবারে একা হয়ে যায়, মানুষ তখন বোবা হয়েই শুধু যায় না, বোকাও হয়ে যায়। তার কাজের মেজাজ আর থাকে না, অলস হয়ে যায় সে। এটা তো বিশ্বাস করেন?"

"তা অবশ্য না করে উপায় নেই।"

"তবে এটাও বিশ্বাস করুন, যাঁর জন্যে লোক চেয়েছি তিনি এই আমি।"

খিলখিল করে হেসে উঠল ঈপ্সিতা চাকী, হাসতে-হাসতে বলল, "ইম্‌পস্‌ব্‌ল্‌। ইম্‌পস্‌ব্‌ল্‌।"

"কী হল।"

"এই এতবড় বাড়িতে একা-একা আপনার সঙ্গী হয়ে থাকা—"

"কিন্তু এরকম তো অনেকেই থাকতে চাচ্ছে।"

"চাচ্ছে বুঝি?" ঈপ্সিতা বলল, "সেটাও ইম্‌পস্‌ব্‌ল্‌ নয়। আমাকে রাখতে চাইলে কি আমিই থাকব না ভেবেছেন?"

"তবে ইম্‌পস্‌ব্‌ল্‌ বলছিলেন কেন?"

"সেটা অন্য কথা ভেবে।" সামান্য একটু হাসি ঈপ্সিতার ঠোঁটে লেগে আছে, কী-যেন সে ভাবছে।

নিউ আলিপুর থেকে আসছে ঈপ্সিতা। তার বাবা ডিস্ট্রিক্ট জজ ছিলেন, বছর-দুই হল রিটায়ার করেছেন। এক দিদি আছেন, তিনি এখন বিলেতে, এক ইংরেজ ভদ্রলোককে বিয়ে করেছেন। দাদা অস্ট্রেলিয়ায় আছেন। তারা এই তিন ভাই-বোন। এম.এ. পর্যন্ত পড়েছে ঈপ্সিতা, কিন্তু পরীক্ষাটা দেওয়া হয়নি। হঠাৎ মাথায় পোকা ঢুকেছিল তার।

"কিসের পোকা?"

"দেশবিদেশ ঘুরে দেখতে হবে, খুব ইচ্ছে হল। সুযোগও পেলাম। ছাড়ি কেন।"

"কোথায়-কোথায় ঘোরা হল?"

ঈপ্সিতা একটু হেসে বলল, "সারা বিশ্ব।"

পরাশরবাবু এ কথাটাকে তামাশা বলে উড়িয়ে দিতে যাচ্ছিলেন, এমন সময় ঈপ্সিতা বলল, "হয়ে গেলাম এয়ার-হোস্টেস।"

পরাশরবাবু ঈপ্সিতার মুখের দিকে চেয়ে বললেন, "বা, বেশ তো। কাজ করা হল, সেই সঙ্গে নিঃখরচায় বিশ্বভ্রমণ?"

হ্যাঁ। তা হল। প্রায় সব দেশই দেখা হল। এ রকম বাইরে বেরিয়ে না গেলে নিজের দেশটাও নাকি দেখা হয় না, ভারতবর্ষ থেকে অন্যত্র গিয়ে ভারতবর্ষটাও দেখা হয়ে গেল।

"কোন্ দেশ সবচেয়ে ভালো লাগল?" জিজ্ঞাসা করলেন পরাশর।

"ইন্ডিয়া।" উত্তর দিল ঈপ্সিতা।

"বটে?"

"হ্যাঁ। এই জন্যে ভালো যে, এই একটা দেশের মধ্যে পৃথিবীর সব দেশ আছে। ইউরোপে অতগুলো দেশ। সেগুলো তো ইন্ডিয়ার এক-একটা রাজ্যের মতন। এই রকম আর-কি।"

পৃথিবী দেখা সাঙ্গ করেই সে নাকি ছেড়ে দিয়েছে হোস্টেসের কাজ। খুবই ঝকমারির কাজ ওটা। পাইলট আছে, নেভিগেটর আছে—তাদের আবার নানারকম দাবি আছে, নানা-রকম উৎপাত আছে। কিন্তু ওরা চেনা লোক, একই কোম্পানির লোক, তাদের দাবি হয়তো মানা যায়। কিন্তু এয়ার-হোস্টেসদের সঙ্গে ফুর্তি করার মতলব নিয়ে ধনীনন্দনেরা অনেক সময় প্লেনে চাপে। তাদের চাপ বড় অস্বস্তিকর। তাদের তাড়াহুড়ো লেগে যায় প্লেনে উঠেই। তাদের রাস্তা ফুরিয়ে যাবার আগেই হোস্টেসদের সঙ্গে ভাব হওয়া চাই, কথাবার্তা হওয়া চাই। তাদের ইয়ার-প্লাগ বার-বার কান থেকে খুলে পড়ে যেতে থাকে, বাম্পিং আরম্ভ হলেই তারা ভীষণ ভয় পেতে থাকে, সাহস দেবার জন্যে হোস্টেসদের কাছে পেতে চায়, কাছে পেলে ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু এর চেয়েও বড় উৎপাত বুড়ো আদমিরা—তারা বিষম বিরক্ত করে মারে। তাদের দিকে কারও যে টান নেই, তাদের জন্যে যেটুকু তদারক-তদ্বির সবই যে চাকরির খাতিরে, তা তারা বোঝে। তখন তারা ভুগতে থাকে কম্‌প্লেক্সে। তাদের দাবিও যে কারো চেয়ে কম নয়—তার প্রমাণ দেবার জন্যে অনবরত ইশারা, আর অনবরত ইঙ্গিত। প্রাণান্তকর ব্যাপার।

তিন বছর এই চাকরি করেছিল ঈপ্সিতা। তারপর ছেড়ে দিয়েছে। আপদ গেছে।

পৃথিবীর পথঘাট সব তার চেনা হয়ে গিয়েছে ইতিমধ্যে, সব বিমানপথ তার নখদর্পণে। সুতরাং কাজ পেতে তার কোনো অসুবিধে হল না। অতি সহজেই সে কাজ পেয়ে গেল ট্রাভেল এজেন্টের দপ্তরে। কাজ বেশি নেই সেখানে, কিন্তু কাজের ভঙ্গি আছে খুব। যারা কাজ করে তাদের সাজ আছে, সাজের ঘটা আছে। কেবল প্যাসেজ বুক্ করা। রেল-স্টেশনের টিকিট-কাউন্টারে কাজ করাও যা, এই কাজও কিন্তু অবিকল তাই। কিন্তু রেল-গাড়ি উড়ে চলে না, বিমান ওড়ে। সেইজন্যে বিমান-ব্যাপারে যারা কাজ করে তারাও উড়তে চায়। এখানে তাই কাজের চেয়ে সাজ বড়।

কথাগুলো শুনে মন্দ লাগছিল না পরাশরবাবুর। শনিবারের বিকেলটা একটু-নাহয় গল্প করেই কাটানো যাক। শনিবারের বৈঠকই নাহয় বলা যাক এটাকে। আজ তাঁর ইন্টারভিউ শেষ। আজ তাঁর ঘাড় থেকে নেমে যাচ্ছে একটা বোঝা। আজ তিনি একটু অন্য ভাবে চলতে চান।

এই-যে মহিলাটি এসেছেন, এঁর চেহারা মন্দ না, কথাবার্তাও মন্দ বলেন না। এটাই নাহয় হোক যাকে বলে মধুরেণ সমাপয়েৎ।

"কী, ভাবছেন কী?" ঈপ্সিতা হঠাৎ প্রশ্ন করে বসল।

"কিছু না। ভাবছিলাম অন্য কথা। আপনার হাওয়াই জাহাজের গল্প শুনে খুব উড়তে ইচ্ছে করছে। মনে হচ্ছে, উড়ে যাই পাখির মতন পাখা মেলে দিয়ে।"

"বা, বা, সুন্দর বলেছেন তো। আপনার মধ্যেও একজন কবি লুকিয়ে আছেন মনে হচ্ছে যেন।"

"এটা প্রশংসা করা হল, কিংবা নিন্দা?"

"যে-কোনো একটা নিশ্চয়ি হবে।"

"তা হোক, কিন্তু ওড়ার যাদের ইচ্ছে হয় তারাই যদি কবি, তবে পৃথিবীর কাক থেকে কাকাতুয়া সব পাখিই কবি।"

"পাখিদের কথা জানিনে, কিন্তু মানুষদের কথা জানি।"

"তা সম্ভব। পৃথিবীতে অনেক মানুষই তো দেখা হল!"

"তা হল। কিন্তু তবু চিনতে পারলাম না মানুষদের। তারা কী চায় আজ পর্যন্ত তা'ই জানা হল না।"

"তারা বেশি কিছু চায় না।" পরাশরবাবু বললেন, "মানুষের তরফ হয়ে কথা বলছি। তারা বেশি কিছু চায় না, তারা চায় সুখ তারা চায় সঙ্গ।"

"অন্যকে অসুখী করে?"

"কি জানি। অন্যকে অসুখী করে লাভ কোথায়?"

"মানুষ তবে পীড়ন করে কেন?"

পরাশরবাবু নড়ে-চড়ে বসলেন, বললেন, "ওসব কথার মীমাংসা করতে হলে যুগ-যুগ সময় কেটে যাবে। আমাদের বরাদ্দ মাত্র এক ঘণ্টা। সুতরাং আমরা সংক্ষেপে সেরে নেব।"

ঈপ্সিতা চাকী বলল যে, সে নিজের কথাই বলছিল। সে যে নিজে কী চায় তা সে নিজেই ধরতে পারেনি। তাই একবার এটা, একবার ওটা আঁকড়ে ধরেছে, আবার ছেড়ে দিয়েছে। এয়ার-হোস্টেস হল, ট্রাভেল এজেন্ট হল, তার পর কাজ নিল একটা পাবলিসিটি কনসার্নে। এখানে এসে তার যেন মনে হল, এবার সে মনের মতন কাজ পেয়েছে। এখানে তাকে বিজ্ঞাপনের কপির খসড়া তৈরি করতে দেয়। তার খুব ভালো লাগে। তখন তার মনে হয়, সে কিছু-একটা কাজ করছে। তাকে একদিন একটা ক্রিম্-এর জন্যে বিজ্ঞাপনের স্ক্রিপ্ট্ লিখতে দেওয়া হল, অনেক ভেবেচিন্তে সে লিখল—

॥ মোলায়েম মুখের মৃদু প্রলেপ ॥

সে ধারণাও করেনি যে এই সামান্য কথাটা কারো পছন্দ হতে পারে, কিন্তু আশ্চর্য, অল্পক্ষণের মধ্যে সারা আপিসে গুঞ্জন আরম্ভ হয়ে গেল—'মিস্ চাকী ইজ্ এ জিনিয়স'। বুঝলাম এটা ওদের ভালো লেগেছে। কাগজে-কাগজে বিজ্ঞাপনটা তো বের হচ্ছে, পরাশরবাবু তা লক্ষ করেছেন কিনা ঈপ্সিতা অবশ্য তা জানে না।

এখন সে সেই বিজ্ঞাপন লেখার কাজ করছে।

"তাহলে আবার এ কাজের দরকার কী। অত ভালো কাজ ছেড়ে দিয়ে এ কাজে আসার কি মানে হয় কিছু? এটা তো একটা সামান্য কাজ।"

"তা জেনেশুনেই এসেছি।" ঈপ্সিতা বলল, "তবে খুলেই বলি আমার ইচ্ছেটা। আমি লেখিকা হব। আপনার মস্ত বড় ব্যাবসা, আপনি আমাকে সাহায্য করবেন।"

পরাশরবাবু ভয় পেয়ে গেলেন। এ আবার কী রকমের সাহায্য চায় তা তিনি বুঝতে পারলেন না।

"আমি বই লিখব। অনেক দেখেছি আমি। অনেক জেনেছি। আমি যা দেখেছি আর যা জেনেছি, সেসব সত্যি কথা লিখলে কেউ তা ছাপবে না। আপনাকে দিয়ে আমি সেসব ছেপে নেব।"

এ তো বড় অদ্ভুত প্রস্তাব। পরাশরবাবু প্রায় হতভম্বই হয়ে গেলেন। তাঁর ব্যাবসা এক রকমের, তার সঙ্গে বই ছাপাবার কোনো যোগই নেই। হঠাৎ তাঁকে এরকম প্রস্তাব করা হতে পারে তা তিনি ধারণাও করতে পারেন নি।

ঈপ্সিতা জানাল যে, তার মনের মধ্যে অনেক কথা জমেছে। অনেক কথা সে বলতে চায়। সে অবসর সময়ে বসে লিখেও ফেলেছে অনেক। সেগুলো সে পড়ে-পড়ে শোনাতে চায় পরাশরবাবুকে। অনেক গোলমেলে কথাও অবশ্য আছে তাতে। তার মধ্যে আছে তার নিজের কথাও।

"নিজের আবার কী কথা?"

"নিজের কোনো কথা থাকতে নেই বুঝি! জীবনের এতগুলো বছর কেটে গেল, এতদিনের মধ্যে নিজের কোনো কথা কি জমতে পারে না?"

পরাশরবাবু বললেন, "নিশ্চয় পারে। কিন্তু কী রকমের সেসব কথা, একটু শুনি!"

ঈপ্সিতা বলল, "বলব? কিছু মনে করবেন না?"

"মনে করার কি আছে, শুনি।"

ঈপ্সিতা বলল, "প্রেম।"

কোনো চেনালোকের কাছে তো এসব কথা নিয়ে কথা বলা চলে না, তাই এতদিন সে চুপ করে আছে। পরাশরবাবু যদি অনুমতি দেন তাহলে—

এখন আবার অনেক গল্প আরম্ভ হয়ে যাবে, এই ভয়ে পরাশরবাবু বললেন, "দেব। অনুমতি দেব।"

আজই নাকি এক্ষুনি তিনি অনুমতিটা দিতেন, কিন্তু সাতটার সময় তাঁকে একটু বের হতে হবে, জরুরি কাজ আছে।

সে কী? জরুরি কাজ? আজ সাতটায়। সাতটার তো আর বেশি দেরিও নেই। কিন্তু ঈপ্সিতা যে অন্যরকম প্ল্যান করে এসেছিল। সে প্ল্যান করেছিল যে, পরাশরবাবুর সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করে সে তাঁকে নিয়ে একটু বের হবে।

আশ্চর্য! যাঁকে একেবারে চেনে না ঈপ্সিতা তাঁর সঙ্গে আলাপ করে তাঁকে নিয়ে বের হওয়া যাবে, এতটা সে ভাবতে পারল কী করে?

ঈপ্সিতা হেসে বলল, "পারা যায়। পারা যায়। পুরুষমানুষরা বড় ভঙ্গুর, অল্পেই ভেঙে পড়ে। তারা বড় ভদ্র, অনুরোধ এড়াতে তারা পারে না। বিশেষ করে মেয়েদের।"

ঈপ্সিতার চোখমুখের ভাব অনেক বদ্‌লে গিয়েছে ইতিমধ্যে। একটু যেন উদাসীন।

"কী হল আপনার?"

ঈপ্সিতা সংক্ষেপে বলল, "কষ্ট।"

এ কথা শোনার পর আর কথা চলে না। পরাশরবাবু মাঝে-মাঝে ঘড়ির দিকে তাকাচ্ছেন, আর মাঝেমাঝে ঈপ্সিতার মুখের দিকে তাকালেন।

ঈপ্সিতা বলল, "কত রকমের কথাই ওঠে। কথা তুললেই হল। যাঁরা সাহিত্য করেন

তাঁদের অনেকে নাকি বলেন—আজকাল জীবন থেকে ও লেখা থেকে প্রেম বাতিল হয়ে যাচ্ছে। এর পরে হয়তো শুনব—শিরায় শিরায় রক্ত নাকি চলাচল আর কারো করছে না। হয়তো শুনব—সাহিত্য থেকে ভাষা বাতিল হয়ে যাচ্ছে।"

কী কথা থেকে কোথায় এসে যাচ্ছে ঈপ্সিতা, পরাশরবাবু তার থই পাচ্ছেন না। কিন্তু এটুকু অনুমান করছেন যে, মেয়েটার কিছু একটা বক্তব্য আছে। সেই কথাটা সে খোলসা করে বলতে পারছে না বলেই এমন কষ্ট পাচ্ছে সে, এমন খাপছাড়া কথাও বলে বসছে।

কবি হওয়া এক জিনিস, আর কবি-ভাবাপন্ন হওয়া নাকি অন্য। যারা কবি তারা কবিতা লিখেই খালাস, তাদের মনের মধ্যে যে বেগ বা আবেগ আসে তা প্রকাশ করে দিলেই তাদের মুক্তি। কিন্তু কবিভাবাপন্নদের জীবনে নাকি অনেক কষ্ট, তাদের মনের মধ্যে বেগ আর আবেগ জমে উঠছে, অথচ তা প্রকাশ করা যাচ্ছে না—সে এক অসহ্য যন্ত্রণা। কবি-ভাবাপন্নরা তাই নাকি কেউ স্বাভাবিক ভাবে চলাফেরা করে না, তাদের অনেকেই নাকি এলোমেলো হয়ে যায়, অগোছালো হয়ে যায়, জামার বোতাম লাগাতে ভোলে। এমনি অনেক-কিছু কাণ্ড নাকি তারা করে।

এই মেয়েটারও সেই অবস্থা কিনা কে বলবে। কষ্টের কথা এ বলল, হয়তো সেটা সেই কষ্ট।

আজকের কথা এখনি শেষ করে দেবার জন্যে পরাশরবাবু বললেন, "বেশ। ঠিক আছে। আপনার বই ছাপার টাকা আমি দেব।"

কথাটা শুনে ঈপ্সিতা উল্লসিত হয়ে উঠবে বলে আন্দাজ করেছিলেন পরাশরবাবু। কিন্তু ঈপ্সিতা বেশ ক্ষুণ্ণ হয়েই কথা বলল, বলল, "আপনার কথা শুনে কষ্ট পেলাম। আপনার কাছে টাকার সাহায্য কিন্তু আমি চাইনি।"

"তবে?"

"আমি চাই একটা প্রতিষ্ঠান।"

বই ছেপে নিলেই হল না। সাধারণের মধ্যে তা পেঁৗছে দেবারও ব্যবস্থা চাই, তার প্রচারও চাই। ঈপ্সিতার ইচ্ছে এই রকম একটা প্রতিষ্ঠান সে গড়ে তুলবে। প্রচারের কাজ তার জানা আছে, কোন্ কথা বলে কোন্ জিনিস লোকের নজরে আনতে হয়, তা আর জানা।

পরাশরবাবু বিষয়টা ভেবে দেখবেন বললেন। কিন্তু সে কথায় ঈপ্সিতা খুশি নয়। ভেবে দেখব বলা আর রাজি না হওয়া একই জিনিস—এটা তার বেশ জানা আছে।

ঈপ্সিতা পরাশরবাবুকে বোঝাতে লাগল। সে বুঝতে পেরেছে, এই লোকটার টাকা আছে, এবং লোকটা যখন ব্যবসাদার, তখন ব্যবসার সুবিধের দিকটা এঁকে ভালো করে বুঝিয়ে দেওয়া চাই। গৃহরক্ষিকার কাজের জন্যে সে আসেনি, পরিচারিকাই বলো আর গবর্নেস্‌ই বলো—ওসব কাজে তার কোনো মন নেই। ওসব তো ছেঁড়া কাজ। কিন্তু বিজ্ঞাপনটা যখন তার চোখে পড়ে তখনই সে মনে-মনে ছকে নেয় কিভাবে ভদ্রলোককে রাজি সে করাবে।

এতক্ষণ যা কথা সে বলেছে তাতে তার মনে হচ্ছে যে, পরাশরবাবুকে রাজি করানো হয়তো যাবে। ভদ্রলোকের প্রাণে একটু রস-কষ আছে বলেই তার মনে হয়েছে। ব্যবসাদার বলতে যে রকম মানুষ বোঝায় ঠিক সে রকম মানুষ যে তিনি নন—তাও যেন বুঝে ফেলেছে ঈপ্সিতা।

ঈপ্সিতা বলতে লাগল, "আমরা যদি তেমন করতে পারি তাহলে কিন্তু একটা

সাংঘাতিক কাজ হয়।"

বেশ উত্তেজিত হয়েই যেন কথাগুলো বলল ঈপ্সিতা। সে আশা করেছিল পরাশরবাবুও তার সঙ্গে সঙ্গে উত্তেজিত হয়ে উঠবেন, কিন্তু তাঁকে চুপ করে বসে থাকতে দেখে সে বলল, "এ কী, কথা বলছেন না যে।"

"অন্য কথা মনে পড়ে গিয়েছিল।" পরাশরবাবু বললেন, "কিন্তু এতে কথা বলার আর কী আছে। কাজ নিয়ে কথা, কথা দিয়ে কাজ কী!"

"বা, বা, বা! সুন্দর বলেছেন তো!"

কৃত্রিম অহংকার দেখিয়ে পরাশরবাবু বললেন, "অসুন্দর কথা কখনো বলেছি কি?"

তবু ঈপ্সিতা যেন থামতে চায় না, পরাশরবাবুকে বোঝাতেই লাগল। বলতে লাগল যে, "লেখাপড়ার মতন এমন ভালো হবি আর নেই। আমরা সেই হবি নিয়ে থাকব। আমাদের অবসর সময় কাটবে কী আনন্দে তা বলে বোঝানো কঠিন।"

একটু থেমে বলল, "একা থাকতে হয় বলে সঙ্গী খুঁজছেন। সঙ্গী আর লাগবে না।"

পরাশরবাবু দেখছেন যে, তিনি যেন একেবারে বোকা আর বোবাই সত্যি হয়ে গিয়েছেন। তিনি নিজের ভবিষ্যৎ নিজে যেন তৈরি করার মালিক আর নন্। তাঁকে কী করতে হবে বা না-হবে তার নির্দেশ দেবার জন্যেই বুঝি এসেছে এই মেয়েটা। অথচ তিনি কী করবেন বা না-করবেন, তা তিনি মনে-মনে পাকা করেই ফেলেছেন। কিন্তু সে কথা এখন প্রকাশ করার দরকার কী। আর, তা প্রকাশ তিনি করবেনই-বা কেন।

এখনই বেরিয়ে পড়ার জন্যে তিনি ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। এখনই তিনি কথা শেষ করে ফেলতে চান। তাই মাথা নীচু করে কাগজপত্র ঘাঁটাঘাঁটি করছেন, আর হাতঘড়িটা চুরি করে দেখে নিচ্ছেন।

ঈপ্সিতা বলল, "অমন মুগ্ধ হয়ে আমার ছবিটা দেখছেন কেন। মানুষটার থেকে ছবিটা কি বড় হল?"

পরাশরবাবু ইচ্ছে করেই বললেন, "ভারি সুন্দর লাগছে দেখতে। তাই বার-বার চেয়ে-চেয়ে দেখছি।"

ঈপ্সিতার বুক বুঝি একটু ফুলে উঠল। একটু হেসে বলল, "আপনি খুব চালাক।"

"চালাকির কী দেখলেন?"

"আমার ছবি আপনি একটুও দেখছিলেন না। বারবার অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছিলেন। কিন্তু এমন অন্যমনস্ক কেন হচ্ছেন বলুন তো। আর কারও আসার কথা আছে নাকি?"

না। আর কেউ আসছে না। পরাশরবাবু জানালেন, বললেন, "এখানেই সমাপ্ত হচ্ছে মধুরেণ। আর কারও সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ আর নেই।"

"এবার বাছাই করছেন কাকে? আমাকে তো নয় নিশ্চয়ি, জানি।"

"কাকে বাছাই করছি তা আমি নিজেই জানিনে। আপনি জানলেন কী করে?"

"ছেড়ে দিন্। ওসব বাছাই-টাছাই ছেড়ে দিন্। ওসব দিয়ে কোনো কাজ হবে না। কে আসবে, কে এসে একটা কম্‌প্লিকেশন সৃষ্টি করবে, তার কি স্থিরতা আছে? তার চেয়ে বরঞ্চ আমরা দুজনে আসুন—"

মেয়েটা পরাশরবাবুকে কী পেয়েছে! এ পর্যন্ত যে ক'টা মেয়ে এল তাদের কেউ তো তাঁর সঙ্গে এভাবে কথা বলেনি। সারা বিশ্ব এ দেখে এসেছে বলেই কি ধরা এর কাছে সরার সামিল হয়ে গিয়েছে?

পরাশরবাবু একটু-যেন বিরক্তই হয়েছেন। কিন্তু বিরক্তি প্রকাশ করা অভদ্রতা হয়ে যাবে। অনেকেরই তো অনেক কথা ও অনেক আচরণ তিনি সহ্য করেছেন, এই মেয়েটির আচরণও একটু নাহয় সহ্য করলেন!

ঈপ্সিতা বলল, "আমি যা লিখেছি আপনাকে পড়ে শোনাব। আপনি আশ্চর্য হয়ে যাবেন। পৃথিবীতে এ রকম থাকতে পারে ভাবতে পারবেন না।"

"একদিন শুনব। আমি খবর দেব আপনাকে।"

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে ঈপ্সিতা বলল, "একজন এয়ার-হোস্টেসও যে ভালোবাসতে পারে, ভালোবাসতে জানে—এ কথা বেশ বুঝিয়ে লিখেছি প্রাণ দিয়ে। দেখবেন, পড়তে-পড়তে আপনার কান্না পেয়ে যাবে।"

"কাঁদব।"

পরাশরবাবুর মন্তব্য শুনে হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে গেল ঈপ্সিতা। চুপ করে বসে রইল। তার চোখে জল এসে গেল নাকি? পরাশরবাবু বিব্রত বোধ করলেন। ইচ্ছে হল, একটু সান্ত্বনা দেবেন। একটু সান্ত্বনা, বা একটু কৈফিয়ত। ও রকম উত্তর তিনি কেন দিয়েছেন তা একটু বুঝিয়ে বলার ইচ্ছে হল তাঁর। কিন্তু কী কথা বলতে গিয়ে আবার কী কথা বলে অবস্থা আরও জটিল করে তোলা হবে ভেবে তিনি চুপ করে রইলেন।

ঈপ্সিতা বলতে লাগল, তার দরকার নেই কোনো সহায়, তার দরকার নেই কোনো সম্বল। যেখানেই সে চায় সহানুভূতি সেখানে সে পায় বিদ্রূপ। পরাশরবাবু কবুল করেছেন যে, তিনি কাঁদবেন। তাঁর এ কথার জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছে ঈপ্সিতা।

পরাশরবাবু বললেন, "একটু ভুল-বোঝাবুঝি হয়ে গেল কিন্তু। কথাটা তাড়াতাড়ি বলতে গিয়ে একটু অন্যরকম হয়ে গিয়েছে। সত্যি, কথা দিচ্ছি, একদিন শুনতে হবে সব। আমরা তো সব ঘরকুনো, আমরা জানি আর কতটুকু। সারা পৃথিবী যার দেখা, সারা পৃথিবীর মানুষের সঙ্গে যার পরিচয়—তার অভিজ্ঞতার কি শেষ আছে? তার বলার কথার কি—"

ঈপ্সিতা বলল, "ঠিক। বলার কথারও শেষ নেই। কিন্তু সেই কথা পাঁচজনের দরবারে হাজির তো করতে হবে। তা না হলে লোকে বুঝবে কী করে?"

পরাশরবাবু একটু ঝুঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, "কে, লোকটা কে? মানে ভদ্রলোকটি কে।"

"ভদ্রলোক বলেই তো জেনেছিলাম। কিন্তু ভদ্রলোক কিনা—সেই কথাই তো এখন ভাবছি। দেখবেন, সব লিখে রেখেছি। খবর দেবেন, আসব।"

"নিশ্চয়। নিশ্চয় খবর দেব।"

ঈপ্সিতা বলল, "উঠুন। আপনি তো এখন বেরোবেন। ইফ ইউ ডোন্ট মাইন্ড্, আমাকেও একটু এগিয়ে দিন্।"

"কোন্ দিকে?"

"যেদিকে আপনি যাবেন।"

কী-যেন ভাবতে-ভাবতে পরাশরবাবু উঠলেন, ঘণ্টি বাজালেন।

বেয়ারা আসতেই তাকে বললেন ড্রাইভার গাড়ি বের করুক।

আবার বসলেন পরাশরবাবু, চুরট ধরালেন। ধোঁয়া ছাড়লেন। তার পর জিজ্ঞাসা করলেন, "কোন্খানে আপনাকে পেঁৗছে দিতে হবে বলুন।"

বেশ সহজ ভাবেই সহজ ভঙ্গিতেই ঈপ্সিতা বলল, "চলুন। অল্প কিছুক্ষণের জন্যে একটা বার্-এ গিয়ে বসা যাক্।"

পরাশরবাবু হেসে উঠে বললেন, "আমি ও-রসে বঞ্চিত।"

"বেশ তো, আপনি না হয় সফ্ট্ ড্রিঙ্ক খাবেন। কিছুক্ষণ কম্পানি দিয়ে তারপর আপনার কাজে চলে যাবেন।"

পরাশরবাবু আবার বললেন, "আপনার বুঝি এসব চলে?"

"চলে। কিছুই অচল নয়। বাঁচতে হলে সব করতে হয় মিস্টার পুরকায়স্থ।"

একটু থেমে সে বলল, "এয়ার-হোস্টেস্রাও মেয়ে। তাদের মনও মেয়েদেরই মন। মন এক-এক দিন বেশি খারাপ হলে মাত্রাও বেশি হয়ে যায়। হুঁশ হারিয়ে যায়। কে কুড়িয়ে নিয়ে যায় সেখান থেকে, কোথায় নিয়ে যায়, কী ক'রে কখন বাড়ি ফিরি কিছুই জানি নে। এই ভাবেই চলেছে জীবন। চলুন, আপনার ড্রাইভার গাড়ি নিশ্চয় বের করেছে এতক্ষণে।"

নিজেকে নিয়ে

ক'টা দিন বেশ কেটে গেল কয়েকজনকে নিয়ে। দেখতে-দেখতে কেটে গেল ছয়টা দিন : ছয়টা সকাল, ছয়টা বিকাল।

এবার পরাশরবাবু পড়েছেন নিজেকে নিয়ে।

নিজেকে নিয়ে তিনি যেন আরও বেশি বিব্রত হয়ে পড়েছেন। যারা একে-একে এসেছিল তাদের জীবনে অনেক জটিলতা আছে, কিন্তু পরাশরবাবুর জীবনটাও যে কম জটিল নয়, এতদিনে তিনি যেন তা ধরতে পেরেছেন।

তিনি ঈপ্সিতাকে নিয়ে সেদিন কোথায় গেলেন, কতক্ষণ তার সঙ্গে কাটালেন সে কথা এখন থাক্।

কিন্তু তিনি ইতিমধ্যে—অর্থাৎ এই তিন-চারদিনের মধ্যে—শ্যামবাজার এলাকায় গিয়েছেন প্রায় রোজই। কেন গিয়েছেন তা তিনিই জানেন।

মন তাঁর খুবই চঞ্চল। তিনি তাঁর বন্ধুদের সঙ্গেও দেখা করছেন না। তাঁদের কেউ তাঁর কাছে এখন পর্যন্ত আসেননি। তাঁদের নিশ্চয় ধারণা যে, পরাশর এখনো ঐসব ইন্টারভিউ নিয়েই ব্যস্ত আছেন। তিনি যে কাজের মানুষ, মাত্র ছয়দিনের মধ্যেই যে বারো দফা সাক্ষাৎকার তিনি ঝটপট সেরে ফেলেছেন, তা বোধহয় তাঁরা ধারণা করতে পারেননি।

কিন্তু খুব সমস্যার মধ্যেই পড়েছেন পরাশরবাবু। এই সমস্যার একটা সমাধান করা খুবই উচিত। কিন্তু হঠাৎ এর কোনো সমাধান করা যে কঠিন তাও তিনি জানেন। ধীরে-ধীরে কাজটা করতে হবে।

দিন-কয়েক তিনি কাজের মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে রাখলেন। কিন্তু এখানে একা-একা এভাবে থাকতে তাঁর যেন ভালোই লাগছে না। একটু পরিবর্তন দরকার, অন্তত একটু হাওয়া পরিবর্তন।

জসিদি, মধুপুর, বেনারস, কিংবা চুনার—কোনো-একটা জায়গায় গিয়ে দিন-কয়েক বেশ শান্তিতে কাটিয়ে এলে মন্দ হয় না। কিছুক্ষণ তিনি ভাবলেন। ভেবেই ঠিক করে ফেললেন চুনারেই যাবেন। জায়গাটা বেশ ভালো, জায়গাটা বেশ শান্ত। বহুকাল আগে একবার সেখানে গিয়েছিলেন, খুবই ভালো লেগেছিল।

পরদিনই তিনি রওনা হলেন। চলে এলেন চুনারে। গঙ্গার ধারা এখানে বাঁক নিয়ে ঝিরঝির করে বয়ে চলেছে। কখনো তিনি একা-একা ঘুরে বেড়ান গঙ্গার কিনারে, কখনো চুনার দুর্গের মধ্যে ঢুকে পুরাতন কালের বিস্তর স্মৃতিচিহ্ন দেখে বেড়ান। বিশাল কুয়োয় উঁকি দিয়ে নিজের মুখটা দেখার চেষ্টা করেন।

পুরনো দিনের স্মৃতিচিহ্ন দেখতে-দেখতে তাঁর নিজের পুরনো কথা মনে পড়ে যায়। সরলার কথা মনে হয়। সেবার রেঙ্গুন থেকে ফিরে আসবার পর সরলা জিজ্ঞেস করেছিল, 'অত ভারিক্কে হয়ে গেলে কেন'। ভারিক্কে ঠিক হননি তখন পরাশরবাবু, বিশেষ-কোনো কারণে তাঁর মন ভার হয়ে ছিল। সেই বিশেষ-কারণটি যে কী, তা কি কখনো কাউকে বলতে পেরেছেন পরাশরবাবু? পারেন নি। আজ পর্যন্ত তা তিনি কাউকে বলতে পারেন নি।

কিন্তু যে ব্যাপারটি তিনি মনের মধ্যে এমন গোপন করে পুষে রেখে দিয়েছিলেন, তা তেমনভাবে পোষ মানেনি।

এইজন্যেই তিনি এত বিব্রত, এত বিচলিত। এক জায়গায় স্থির হয়ে তাই তিনি থাকতে পারছেন না, চুনার থেকে তিনি চলে এসেছেন এলাহাবাদে। চুনারে গঙ্গার কিনারে যেভাবে ঘুরছিলেন, ঠিক সেইভাবেই তিনি এখানে এসে ঘুরে বেড়াচ্ছেন ত্রিবেণীতে।

এখানেও ভালো লাগল না। তাঁকে কলকাতা যেন টানছে।

কলকাতায় ফিরে এলেন পরাশর পুরকায়স্থ। ফিরে এসে দেখেন তাঁর টেবিলে কয়েকটা ব্যক্তিগত চিঠি বেশ গুছিয়ে রাখা আছে। একে একে চিঠিগুলো খুলে-খুলে তিনি পড়লেন।

স্নেহময়ী সেন জানতে চেয়েছেন পরাশরবাবু কী ঠিক করলেন, তাঁর চিঠি না পেয়ে তিনি বেশ ব্যস্ত হয়েছেন।

কুমারী মমতা এবার বেশ বড় চিঠি দিয়েছেন, বেশ আবেদন-নিবেদন আছে সে চিঠিতে। লাভলকে তিনি এখন নেই, তাঁর বর্তমান ঠিকানা তিনি জানিয়েছেন।

এণা রক্ষিত খুব রেগে চিঠি দিয়েছেন। খুব শাসিয়েছেন পরাশরকে। গরিব লোকদের এভাবে বঞ্চনা করা যে ধনীদের অভ্যাস তা সে জানে। এ অভ্যাস ধনীদের ছাড়তে হবেই। নইলে—

আর, লিখেছে ঈপ্সিতা চাকী। এর চিঠিতেও খুব রাগ। কিন্তু তারই মধ্যে এ কথা জানাতে সে ভোলেনি যে, তার এই রাগ কিন্তু নিছক রাগই নয়—এটা তার অনুরাগ। পুরুষ-মানুষের সম্বন্ধে তার অনেক নালিশ আছে, তার অনেক কিছু সে লিখেও রেখেছে, পরাশরবাবুর কবে সময় হবে, কবে তিনি সে কাহিনী শুনবেন তা যেন জানান।

আর, আর, আর—অলকা উকিল জানতে চেয়েছে তার ছবিটি তিনি আটকে রেখেছেন কেন। তাঁর তো বয়স হয়েছে, কুমারী মেয়েদের ছবি আটকে রাখা তাঁর শোভা পায় না। এ রকম আটকে রাখার উদ্দেশ্য কী।

আর-কোনো চিঠি আছে নাকি পরাশরবাবু খুঁজলেন। টেবিলের কাগজপত্র সরিয়ে-সরিয়ে তিনি খুঁজতে লাগলেন। নতুন কোনো সম্বোধন করে যদি এসে পড়ত একটা চিঠি তাহলে বেশ ভালোই লাগত। কিন্তু তিনি যে এসে পৌঁছেছেন তা হয়তো সে বুঝতে পারেনি। তিনি যে দিন-কয়েকের জন্যে বাইরে যাচ্ছেন—এ কথা তিনি ওকে জানিয়ে গিয়েছেন। কিন্তু ঠিক কবে আসবেন তা নিজেও তখন ঠিক করতে পারেননি, সুতরাং বলাও হয়নি।

ঈপ্সিতার চিঠিটা আবার পড়লেন পরাশর। পুরুষদের উপরে তার খুব রাগ, তাদের সম্বন্ধে তার অনেক নালিশ। কিন্তু সে তার ছবিটা ফেরত চায় নি।

পরাশরের ইচ্ছে হচ্ছে তিনি তাঁর জীবনের কথা লিখে ফেলবেন ঐ ঈপ্সিতার মতই। এবং একটা প্রতিষ্ঠানই না হয় খুলে ফেলবেন ঈপ্সিতার প্রস্তাব অনুসারে। সেখান থেকে প্রকাশ করবেন দুজনেরই বই।

কিন্তু সেটা পরের কথা। এখনকার কাজ এখন। তিনি অলকার ছবিটা তার ঠিকানায় পাঠিয়ে দেবার জন্যে সেটা একটা খামে পুরে ঠিকানা লিখে রাখলেন।

তার পর অনেকক্ষণ বসে রইলেন চুপচাপ করে। যার যা প্রাপ্য তাকে তা দিতে হবে, যার যাতে অধিকার তার থেকে তাকে বঞ্চিত করা হবে না। এ বিষয়ে তিনি একেবারে স্থির সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললেন। এণা রক্ষিতের চিঠিটায় আবার চোখ বুলালেন—ঠিক, এভাবে বঞ্চনা করা সত্যিই ঠিক না, গরিবদের বঞ্চনা করা ধনীদের সত্যিই অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গিয়েছে।

তিনি বের হলেন। গাড়িতে বসে ড্রাইভারকে বললেন "শ্যামবাজারের মোড়।"

কিন্তু সেখানে কারো সঙ্গে তাঁর দেখা হল না। সব দোকান বন্ধ হয়ে গিয়েছে অসময়েই। দুপুরের দিকে এই মোড়ে নাকি বেশ হাঙ্গামা হয়েছে, একটা ট্রামের কঙ্কাল দাঁড়িয়ে আছে, পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে তার বডি।

ফিরেই যাবেন কিনা ভাবছিলেন পরাশর। কিন্তু ফিরে গিয়েই-বা এখন লাভ কী।

পরাশর বললেন, "চলো। সোজা।"

শ্যামবাজার পার হয়ে চলল তাঁর গাড়ি।

পরাশর ভাবতে লাগলেন অনেক কথা। প্রথমেই তাঁর মনে হল একটা বিজ্ঞাপন দেওয়ার কথা। বাংলা ইংরেজি হিন্দি—তিন রকম পত্রিকাতেই তিনি বেশ বড়-বড় হরফে বিজ্ঞাপন দেবেন, সব ব্যাপারটা খোলাখুলি লিখেই, অমুক জায়গা থেকে আনুমানিক অমুক সময়ে যিনি দাঁড়-সমেত একটি কাকাতুয়া কিনেছেন, তিনি সেটা ফিরিয়ে দিলে অত টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে—পঞ্চাশ বা পাঁচ-শ, সেটা ভেবে ঠিক করা যাবে পরে।

॥ সমাপ্ত ॥

কাক

লোকনাথ ভট্টাচার্য

স্থান: বাংলাদেশের গভীরে কোনো গ্রাম।

সময়: রাত তিনটে নাগাদ।

পাত্রপাত্রী:

প'য়ত্রিশ-ছত্রিশ বছরের আগন্তুক।
প্রায় একই বয়সের কুটীরবাসী।
ত্রিশ-বত্রিশ বছরের বিধবা।

[পথের পাশে কুটীর দেখা যাচ্ছে, কুটীরের সামনে দশ-বারো জনের বসার মতো উ'চু দালান। মঞ্চের বাঁ দিক থেকে আগন্তুককে ঢুকতে দেখা গেল, যেন চলতে কষ্ট হচ্ছে, ধ'ুকছে—পরনে সাধারণ ভদ্র ধুতি-পাঞ্জাবি, হাতে মাঝারি গোছের সুটকেস ও অন্য বগলে সতরঞ্চি-মোড়া ছোট বিছানা। কুটীরের কাছে এসে দালানের উপর সুটকেসটা আস্তে করে রাখতে যায়, কিন্তু হাতের ঠিক নেই, সুটকেস পড়ে যায় ও ধপ্ করে শব্দ হয়। বিছানাটাও কোনোরকমে ফেলে দালানের উপর ও শুয়ে পড়ে, বিছানায় মাথা দিয়ে।]

আগন্তুক। (অস্ফুটে) উঃ, আর পারি না।

[কুটীরের দরজায় খুট করে শব্দ হয়, দরজা অল্প খোলে, কুটীরবাসী মুখ বাড়ায়।]

কুটীরবাসী। কে? (অল্প চে'চিয়ে) কে? কোন্ হায়?

[সাড়াশব্দ নেই। কুটীরবাসী বেরিয়ে আসে, হাতে লণ্ঠন, পরনে লুঙ্গি, গায়ে বিছানার চাদর কোনোরকমে জড়ানো।]

কু। (লণ্ঠনটা উ'চু করে তুলে, চে'চিয়ে) কোন্ হায়?

[অদূরে কোথাও একটা কুকুর ঘেউ ঘেউ করে ওঠে। হঠাৎ কুটীরবাসীর নজর যায় আগন্তুকের দিকে।]

কু। (এগিয়ে এসে) এই তো, বাবা হাতে-নাতে ধরা পড়েছ। কে তুমি? কী চাই এখানে?

আ। (বলতে কষ্ট হচ্ছে) আমি কিছু চাই না।

কু। চাও না মানে?

আ। পথিক মাত্র। আপনার আঙিনায় একটু আশ্রয় নিয়েছি।

কু। (নিচু হয়ে, লণ্ঠনটা আগন্তুকের মুখের কাছে ধরে) বাবা, এ যে ভদ্রলোক মনে হচ্ছে। কে মশাই আপনি? এখানে কেন?

আ। অন্য গাঁয়ে যাচ্ছিলাম, হঠাৎ শরীরটা কেমন করে ওঠে, তাই এখানে শুয়ে পড়ি।

কু। কোন্ গাঁয়ে যাচ্ছিলেন?

আ। (চেষ্টা করে উঠে বসে, বলতে কষ্ট হচ্ছে) এই পাশের গাঁয়েই বোধ হয়, কী যেন নামটা, মনে পড়ছে না (পকেটে হাত দিতে যায়)।

কু। দাঁড়ান দাঁড়ান মশাই, আপনার কথাবার্তা তো বিশেষ সুবিধের ঠেকছে না। সে কি, কোন্ গাঁয়ে যাবেন, তার নামটা পর্যন্ত জানেন না?

আ। জানতাম, এক্ষুনি মনে করতে পারছি না—কিছুক্ষণ আগেই তো বললাম।

কু। কী বললেন?

আ। ঐ নামটা।

কু। কাকে বললেন?

আ। ঐ তো স্টেশনে, যখন পথের সন্ধান নিচ্ছিলাম।

কু। স্টেশনে? আপনি স্টেশন থেকে আসছেন?

আ। কলকাতা থেকে।

কু। ও, বুঝলাম। (বিছানা ও সুটকেস-এর দিকে তাকিয়ে) হ্যাঁ, মালপত্তরও তো দেখছি। রাত্তিরের ট্রেনে এলেন?

আ। আজ্ঞে হ্যাঁ।

কু। তার মানে, আপনি তো হাঁটছেন অনেকক্ষণ—স্টেশন তো এখানে নয়।

আ। হ্যাঁ, তা প্রায় আধঘণ্টাটাক হল, কি কিছু বেশিই হবে।

কু। ভারি আশ্চর্য। তো আপনি রাত্তিরে এভাবে বেরোলেন কেন? এই ঘুরঘুট্টি অন্ধকারে, বনবাদাড়ে, রাস্তায় সাপখোপ থাকতে পারে—আবার এদিকে বলছেন শরীর খারাপ...

আ। শরীরটা তখন খারাপ ছিল না।

কু। কখন খারাপ ছিল না?

আ। ঐ যখন ট্রেন থেকে নামি। তখন তো বেশ চাঙ্গাই বোধ করছিলাম। তাছাড়া ওরাও বলল, বেশি দূরে নয়, মাইল চার-পাঁচ পথ, রাস্তাও ভালো, সোজা—তাই ভাবলাম, বেরিয়েই পড়ি, ভোর-ভোর বেশ পোঁছে যাব।

কু। কারা বলল?

আ। ওরা দুজনেই বলে—স্টেশনের লোকটি, তার আগে আমার বন্ধুটিও।

কু। আপনার বন্ধু? কে তিনি?

আ। রতন। তার নাম রতনকৃষ্ণ হালদার। চেনেন হয়তো।

কু। আজ্ঞে না।

আ। নাম হয়তো শুনে থাকবেন।

কু। আজ্ঞে তাও না, ও-নামের এখানে কাউকেই চিনি না।

আ। এখানে নয়, এ-গাঁয়ে নয়, পাশের কোনো গাঁয়ে—খুব কাছাকাছি।

কু। (ভাববার চেষ্টা করে) রতনকৃষ্ণ হালদার, হালদার—আচ্ছা কেমন দেখতে বলুন তো?

আ। বেশ লম্বা-চওড়া, চোখে চশমা।

কু। লম্বা-চওড়া? চোখে চশমা?

আ। হ্যাঁ, একেবারে ধবধবে ফর্সা। রীতিমতো সুপুরুষ।

কু। না-না, আমি যে-হালদারের কথা বলছি, এ সে-ব্যক্তি একেবারেই নয়। তার পুরো নামটা মনে নেই, তবে সেও এক হালদারই বটে। সে-লোকটা বেঁটেখাটো, রোগা টিংটিঙে, মুখ ভর্তি বসন্তের দাগ, গায়ের রঙ কয়লার মতো কালো। পাশের গাঁয়ে মুদির দোকান করেছিল, চালাতে পারল না, এখন অন্য কোথাও চলে গেছে।

[হঠাৎ আগন্তুক যন্ত্রণায় মুখ বিকৃত করে, হাত দিয়ে বুকের বাঁ দিকটা চেপে ধরে।]

কু। আবার শরীরটা খারাপ করছে? কী হল আপনার?

[আগন্তুক সাড়া দেয় না, মুখে যন্ত্রণার ভাব স্পষ্ট।]

কু। একটু শুয়ে পড়ুন না! জল খাবেন? জল এনে দেব?

[আগন্তুক হাত নেড়ে জানায়, দরকার নেই।]

কু। আপনি তো আমায় মহা মুশকিলে ফেললেন দেখছি।

আ। আবার সেই গন্ধটা...

কু। কিসের গন্ধ?

আ। (যন্ত্রণার ভাবে) সেই আবর্জনার গন্ধটা...হঠাৎ-হঠাৎ দম বন্ধ করে আনে।

কু। কিসের গন্ধ, কোন্ আবর্জনার গন্ধ? কই, আমি তো পাচ্ছি না?

আ। আপনি পাবেন না, আপনি পাবেন না।

কু। দেখুন তো, এত রাতে এভাবে আপনি এসে পড়লেন—এখন কী করি আপনাকে নিয়ে?

আ। আমায় মাপ করবেন, আমায় মাপ করবেন। আমি আপনাকে কোনো কষ্ট দিতে চাই না, কাউকেই কোনো কষ্ট দিতে চাই না।

কু। চান না তো দেখছিই, কিন্তু দিচ্ছেন তো সমানেই।

আ। আপনি শুতে চলে যান, একটু সুস্থ হলেই আমি উঠে পড়ব।

কু। বাঃ, আপনাকে এভাবে রেখে আমি শুতে যাই-ই বা কী করে? অথচ ঘরে এনেও যে তুলব আপনাকে...

আ। না-না, কোনো দরকার নেই। এখানেই ভালো, বেশ ফাঁকা, এখুনি আমি সুস্থ হয়ে উঠব।

কু। সত্যি, বড্ড ঝামেলায় ফেললেন মশাই। একটা ডাক্তার-টাক্তার ডাকতে পারলে হত—কিন্তু এই অজ পাড়াগাঁয়ে ডাক্তার পাচ্ছি কোথায়? ডিসপেনসারি যেটা আছে, সেটা তো সেই স্টেশনের গায়ে, আর এত রাত্তিরে সেখানে গিয়েও লাভ নেই—মাথা খুঁড়ে মরলেও কেউ দরজা খুলবে না।

আ। এই তো, দেখুন না, আমি বেশ ভালো বোধ করছি...

কু। না-না মশাই, আপনি ভয়ংকর অবিবেচনার কাজ করেছেন। আজ রাতটা আপনার স্টেশনেই কাটানো উচিত ছিল—অনায়াসেই প্ল্যাটফর্মে কোথাও শুয়ে পড়তে পারতেন। কাল সকালে দিব্যি আলোয় আলোয় পথ ধরতে পারতেন, মায় অন্তত কিছুদূর পর্যন্ত বাস্-ও পেতেন, আর গরুর গাড়ি তো রয়েছেই।

আ। অত শত তো জানতাম না, ওরা বললে...

কু। ওদের আর কী বলুন, ওরা তো বলেই খালাস। আর আপনার সেই ভদ্রলোক বা কেমন? আপনাকে এ-অবস্থায় একলা ছেড়ে দিলেন?

আ। কোন্ ভদ্রলোকটি?

কু। ঐ যিনি আপনার বন্ধু, কী যেন হালদার-টালদার বললেন?

আ। ওঃ, রতন—সে তো আমায় ছেড়ে দেয়নি, সে তো আমার সঙ্গেই ছিল না।

কু। সঙ্গে ছিল না? তবে এই যে বললেন আপনাকে পথের সন্ধান-টন্ধান...

আ। সেটা তো বেশ কিছুদিন আগের ব্যাপার, যখন তার সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়ে যায়।

কু। ও, বুঝলাম। তবে এখন তিনি কোথায়?

আ। কেন, তার গাঁয়ে, যেখানে আমি চলেছি। এই তো, তার নাম-ধাম সব আমার পকেটে

রয়েছে, আর সেইটে দেখিয়েই তো স্টেশনে খবরাখবর নিলাম। ওদের বাড়িতে বেশ বড় পুজো হয় বুঝলেন, নাটমন্দির আছে, পুকুর আছে, কত কী আছে।

কু। আপনি এখন একটু ভালো বোধ করছেন কি? কেমন আছেন?

আ। ভালো, বেশ ভালো। আরেকটু বসেই উঠে পড়ব। আপনি শুতে চলে যান দয়া করে।

কু। যাচ্ছি, আগে আপনি উঠুন। একটু হেঁটে দেখুন না, কেমন লাগছে?

আ। হ্যাঁ, এটা বেশ বলেছেন, আগে আপনার বাড়ির সামনে একটু পায়চারি করে নিই।

[আগন্তুক ধীরে ধীরে ওঠে, পথে নেমে পায়চারি শুরু করে।]

আ। আঃ, এই মুক্ত আকাশের তলায়, কী ভালো লাগে বলুন তো? সারা পৃথিবী ঘুমোচ্ছে, এখানে প্রকৃতি বলে একটা জিনিস আছে, আকাশে তারা আছে, মাটির ওপর গাছ আছে, হাওয়ায় নিশ্বাস আছে, সেই নিশ্বাস মানুষ নিচ্ছে তার ফুসফুসে, কারণ মানুষও বাস করছে এই প্রকৃতিরই মধ্যে—এর চেয়ে বড় খবর আর কী হতে পারে জানি না।

কু। (নিরাসক্ত ভাবে, সুটকেসটার দিকে তাকিয়ে) আপনার আবার বোঝার ওপর এই শাকের আঁটি। নিজে পারেন না চলতে, তার ওপর একটা সুটকেস, একটা বিছানা।

আ। ও কিছু ভারী নয়, এই দেখুন না আমি তুলে দেখাচ্ছি।

কু। না-না, এখন আপনাকে তুলতে হবে না—আমি নিজেই তুলে দেখছি। (সুটকেসটা তুলে) না, তেমন ভারী নয়, তবু বোঝা তো। (সুটকেস রাখে, পরে বিছানা তোলে) হ্যাঁ, এটাও তো বেশ হাল্কা দেখছি—মানে সুস্থ শরীরের পক্ষে (বিছানা রেখে দেয়)।

আ। যাচ্ছি তো হপ্তাখানেকের জন্যে, কত জিনিস নেব বলুন? আর বেশি কিছু নেবার মতো কীই বা আছে তেমন?

কু। খুব ভালো হত যদি এখানেই কোনোরকমে বিশ্রাম নিয়ে রাতটা কাটিয়ে যেতে পারতেন...

আ। না-না, সে কী কথা? এমনিতেই আপনাকে এত বিরক্ত...

কু। আর আমার মুশকিলটা কী জানেন, আপনাকে তুলি কোথায়, জায়গা যে একেবারে...

আ। আ-হা-হা, আপনি খামাখা এত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন? আমি যেচে এসে আপনার ঘাড়ের ওপর পড়েছি, ঘুম ভাঙিয়ে আপনাকে তুলে এনেছি...

কু। না-না, আপনি কিছু তুলে আনেননি, আমি তো নিজেই এলাম। এবং দেখুন তো, প্রথমে আপনার সঙ্গে কীরম অভদ্র ব্যবহারও করলাম...

আ। সে কি, অভদ্র কোথায়? এমন মাঝরাত্তিরে বলা নেই কওয়া নেই কারুর বাড়িতে হুট করে কেউ এলে সন্দেহ তো হয়ই।

কু। আসলে জানেন, আজকাল বড্ড চুরিচামারি হচ্ছে, মায় খুনখারাপি পর্যন্ত। গ্রামে তো থাকেন না—জানেন না।

আ। সে কী?

কু। আরে মশাই, যত সব নোঙরা ব্যাপার, শুনে কী করবেন।

আ। এখানেও নোঙরা?

কু। থাকগে, ছেড়ে দিন। আর সেই কারণেই যখন ধপ্‌ করে শব্দটা শুনি...

আ। শব্দ করতে আমি চাইনি, কিন্তু সুটকেসটা হাত থেকে পড়ে গেল—কী করব বলুন?

কু। সদা সর্বদা এখানে সাবধানে থাকতে হয় বুঝলেন, যা সমস্ত কাণ্ড হচ্ছে আজকাল।

আ। কী হচ্ছে?

কু। কত কীই। এই তো সেদিনই একটা খুন পর্যন্ত হয়ে গেল।

আ। খুন হয়ে গেল?

কু। নইলে বলছি কী আপনাকে? একজন জোতদারকে এইরকমই মাঝরাতে বাড়িচড়াও হয়ে বেমালুম খুন করে বসল। এই তো, বোধ হয় দিন চার-পাঁচ আগেই। শান্তি যা দেখছেন, ঐ যে প্রকৃতি-ট্রকৃতি বললেন না, ওসব ওপর-ওপর—ভেতরের ভাবখানা থমথমে, যে-কোনো মুহূর্তে যা-কিছু হয়ে যেতে পারে।

আ। এখানেও এই?

কু। হ্যাঁ মশাই, এখানেও এই, পালিয়ে যাবেন কোথায়? জোতদারটাকে বেমালুম ছুরি মেরে খুন করে, সরাসরি পেটের মধ্যে চালিয়ে দেয়। আর তার স্ত্রী তখন সামনে বসে, কাপড় দিয়ে তার মুখটা ঠেসে বাঁধা, কোথাও টুঁ শব্দটি হল না।

আ। উঃ।

কু। অত উঃ-আঃ করবার কী আছে—এসব খবর তো খবরের কাগজেও বেরোয়। পড়েন না?

আ। পড়ি বটে।

কু। তবে? যাকগে। আমার আবার ভয়টা আরো বেশি কেন জানেন—এবার একটু বসুন না আপনি!

আ। নাঃ, আবার বসা কেন। এবারে আস্তে আস্তে চলি। হ্যাঁ, কিসের ভয়ের কথা বলছিলেন?

কু। বলছি। আপনি বসুন না! একটু জিরিয়ে নিন, আরেকটু অপেক্ষা করুন। ভোরও প্রায় হয়ে এল বলে—আমারও ঘুম-টুমের দফারফা হয়ে গেছে, এখন শুয়ে কী করব? বাকী রাতটুকু আপনার সঙ্গেই কাটিয়ে দিই।

আ। সে কী? না-না...

কু। আরে দূর মশাই, একটু কথা কয়ে বাঁচছি, আমারও বেশ ভালো লাগছে, সত্যি, বিশ্বাস করুন। এখানে কথা বলার লোক পাচ্ছি কোথায়? সব তো গেঁয়ো ভূত। আসলে আমিও আপনার মতন শহরেরই লোক জানেন, একদিন পালিয়ে আসি।

আ। তাই নাকি?

কু। সে অনেক কথা—এখন আসুন, বসুন।

[আগন্তুক এসে দালানের উপরে বসে।]

আ। হ্যাঁ, কিসের ভয় বলছিলেন?

কু। ভয়? ও হ্যাঁ—আমার বাড়িটা আবার বড্ড একটু তফাতে, ধারে-কাছে পাড়াপড়শি কেউ নেই। অর্থাৎ বিপদ-আপদে পড়লে যে চেঁচিয়ে লোক জড়ো করব, তারও উপায় নেই। এবং সেই কারণেই আপনার কথাবার্তা শুনে সন্দেহটা আরো বেড়ে যায়, বুঝলেন?

আ। কেন?

কু। বাঃ, একদিকে বলছেন পথিক, শরীর খারাপ বলে আঙিনায় আশ্রয় নিয়েছেন, অন্যদিকে বলছেন কোন্ গ্রামে যাবেন তার নাম জানেন না—সন্দেহ হবে না?

আ। হ্যাঁ, তা অবশ্য সত্যি, সন্দেহ তো হওয়াই স্বাভাবিক।

কু। শুধু কি তাই? এই যে-পথটা দেখছেন, আমার এই বাড়ির পথ, এটা দিয়ে তো কোথাও যাওয়া যায় না—অর্থাৎ যেদিকে মুখ করে আপনি চলেছেন, সেদিকে তো কোথাও যাওয়ার নেই।

আ। নেই মানে?

কু। মানে আর কি, সেদিকে আরেকটু গেলেই ডোবায় পড়তেন। আর ডোবার পরেই ধানখেত শুরু হয়ে গেছে।

আ। সে কী? আর রাস্তাটা?

কু। রাস্তাটা ওখানেই শেষ, অর্থাৎ ঐ ডোবাতে গিয়েই।

আ। তবে এই যে ওরা বললে...

কু। ওরা ঠিকই বলেছে, ভুলটা আপনি করেছেন, এবং সেটা আপনাকে বলতে যাচ্ছিলামও। যখন যাবেন, রাস্তাটা ভালো করে বাতলে দেব। কিন্তু সন্দেহটা ঘোরতর হয় কেন, বুঝছেন তো?

আ। হ্যাঁ, হয়তো বুঝছি।

কু। আরে বাবা, হয়তো-ফয়তো-র কী আছে এতে? অতি সোজা জিনিস। কোনো পথিক এখানে এসে বিশ্রাম নেবে, সেটা হয় না, কারণ এখান থেকে কোনো যাওয়ার জায়গা নেই। উল্টো দিকে যদি যেতে চান, মানে স্টেশনের দিকে, তা হলে ডোবা পেরিয়ে আপনাকে আসতে হয়েছে—সেটাও সম্ভব নয়। তার মানে তেমন কথা যদি কেউ বলে তো সে প্লেন একটা ধাপ্পা দিচ্ছে, হাতে-নাতে ধরা পড়ে গিয়ে একটা অজুহাত খুঁজছে। বুঝলেন তো এবার?

আ। (হেসে) হ্যাঁ, এবারে ঠিক বুঝেছি।

কু। (সরলের মতো জোরে হেসে) বুঝেছেন? দেখুন, আপনাকে চোর-বাটপাড়ের সামিল করে ফেলেছিলাম। ভেবেছিলাম লোকটার নিশ্চয়ই কোনো দুরভিসন্ধি আছে (হাসতে থাকে)।

আ। কিন্তু আমি ভাবছি, শেষে ভুল রাস্তায় এসে পড়লাম, সেটা কী করে সম্ভব হল।

কু। কেন, খুব সহজেই সম্ভব হতে পারে। আপনাকে ওরা কী বলে স্টেশনে—বড় রাস্তা ধরে সোজা চলে যেতে, এই তো?

আ। হ্যাঁ, আর তাই তো আমি করেওছি।

কু। করেছেন ঠিকই, কিন্তু মাঝখানে যে একটা বাঁক ছিল, সেটা হয়তো অন্ধকারে ঠিক ঠাওর করতে পারেননি। সেখানটায় বড় রাস্তাটা একটু ঘুরে চলে গেছে, আর তার পাশ দিয়েই আমার বাড়ির রাস্তাটা শুরু হয়েছে। গোড়াতে এই রাস্তাটাকেও বেশ বড় দেখায়, পরে অবশ্য বেশ সরু হয়ে এসেছে, সেটা হয়তো লক্ষ্য করেননি।

আ। (দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে) ওঃ, তার মানে এতটা পথ আবার উজান বাইতে হবে।

কু। হ্যাঁ, সেটা তো এখন বাইতেই হবে, ভুল যখন করেছেন, উপায় নেই। বড় রাস্তার মুখে পড়ে আপনি ডান দিকে মোড় নেবেন—তারপরে আবার সোজা।

আ। দেখুন তো, কোথায় ভেবেছিলাম ভোর-ভোর পোঁছে যাব—এখন কপালে কত দুর্ভোগ আছে জানি না।

কু। তা আর কী করবেন—না হয় কয়েক ঘন্টা বাদেই পেঁাছোবেন, এতে কী যায়-আসে?

আ। না, তা নয়—আসলে শরীরটা হঠাৎ খারাপ হয়েই যত মুশকিল করল।

কু। আমি বলব শরীরটা খারাপ হয়ে শাপে বর হয়েছে, আপনি তো বেঁচে গেছেন মশাই।

আ। কেন?

কু। বাঃ, যেভাবে যাচ্ছিলেন, সেভাবে আরেকটু এগোলেই তো ঐ বাক্স-বিছানাসুদ্ধ ডোবায় গিয়ে পড়তেন মশাই।

আ। (হেসে ফেলে) হ্যাঁ, তা বটে।

কু। আর ডোবাটা সাংঘাতিক, জানেন—যেমন নোংরা, তেমনি গভীর। জল তেমন কিছু গভীর নয়, খাদটা গভীর। পাড় থেকে হঠাৎ নেমে গেছে, একেবারে দশ-বারো ফুটের মতন। আর অন্ধকারে আপনি দেখতেও পেতেন না কিছু, হুড়মুড় করে পড়তেন—(হেসে ফেলে) ঐখানেই আপনার পঞ্চত্ব-প্রাপ্তি।

আ। (ম্লান হেসে) যা বলেছেন।

কু। আসলে এই অন্ধকারে বেরোনোই উচিত হয়নি, স্টেশনে থাকলেই পারতেন।

আ। কিন্তু ট্রেন থেকে নেমেই যে এমন আত্মহারা হয়ে পড়লাম...

কু। আত্মহারা?

আ। হ্যাঁ, একেবারে আত্মহারা। আর দিগ্বিদিক জ্ঞান রইল না। ঐ অন্ধকার, তারার আলোয় ঐ পড়ে-থাকা পথ, ঐ নীরবতা, সামনের জোনাকি-জ্বলা সেই প্রকাণ্ড গাছটা—সব মিলিয়ে সে এক...বুঝলেন, (হেসে ফেলে) একটা বিদিগিচ্ছিরি কাণ্ড।

কু। গ্রামে কখনো আসেননি বুঝি আগে?

আ। আসব না কেন? অনেক এসেছি। তবে আজকের আসাটা আলাদা, একেবারে তীর্থ-যাত্রীর মতো। পা যে আমার কী চঞ্চল হল, কী বলব আপনাকে।

কু। বাবা!

আ। হ্যাঁ, একেবারে আশ্চর্য হবার মতনই কথা—এতটা যে হবে, তা নিজেও ভাবতে পারিনি। তার ওপর লোকটা যখন বলল, বেশি দূর নয়, মাত্র কয়েক মাইল, আর স্থির থাকতে পারলাম না। মন কেবলই বলতে থাকে, ভোরে পেঁাছে যাব, ভোরে পেঁাছে যাব—ছেলেমেয়েদের দোড়োদৌড়ি, ফুল তুলতে যাওয়া, পথের পাশে স্থলপদ্মের গাছ, স্তূপাকার শিউলি, এই গন্ধ যেন এখুনি পেলাম, আরেকটু, আরেকটু গেলেই... আপনি হয়তো ঠিক বুঝবেন না এসব কথা, আমায় জিজ্ঞাসা করবেন না।

[আগন্তুক আবার বুকে হাত দেয়।]

কু। কী হল?

আ। (যন্ত্রণায় মুখ বিকৃত করে) ভাবলেই ব্যথাটা ফিরে আসে, এত চঞ্চল হই।

কু। না-না, আপনি ভাববেন না, আপনি সুস্থ হোন, আপনাকে অনেক দূর যেতে হবে।

আ। আমার কাহিনীটা একটু আশ্চর্য, বুঝলেন, ঠিক বিশ্বাস করার মতো নয়। তা ছাড়া আপনি গাঁয়ের লোক, বুঝবেনও না।

কু। আমার এত বোঝাবুঝির কী আছে মশাই, আপনার কাহিনী আমাকে শোনাবেন কেন, আর শুনে আমারই বা হবে কী—আপনি অসুস্থ হয়ে পড়েছেন, আমার আঙিনায় আশ্রয় নিয়েছেন। এখন শুধু একটু সুস্থ হোন, এই কামনা করি।

আ। আমি আর পারছিলাম না বুঝলেন, একেবারে মরে যাচ্ছিলাম—এবং সে-মরার চেতনা যে কী সাংঘাতিক, তা কাউকে বলার নয়। তারপরে হঠাৎ এই নিমন্ত্রণটা পেয়ে যাই, একেবারে হঠাৎ, কারণ রতনের সঙ্গে দেখা নেই কত দিন, কত যুগ, সেই ছেলেবেলায় এক সঙ্গে পড়েছিলাম, তারপরে ও-ও যে কোথায় হারিয়ে গেল, আমিও হারিয়ে গেলাম, সব সম্পর্ক শেষ, একটা চিঠি পর্যন্ত কখনো লিখিনি, ও-ও লেখেনি, বলতে পারেন একেবারে ভুলেই গিয়েছিলাম। তারপর সেদিন হঠাৎ দেখা, বাজারে।

কু। বাজারে?

আ। হ্যাঁ, থলে হাতে গেছি, মাথাটা রোজকার মতনই ভারী, চলতে পারি না, চলতে ইচ্ছেও করে না, তবু চলতে হয়। গেছি, কারণ শাক-সবজি-মাছ কিনতে চাই। কেন কিনতে চাই? কারণ খাব, খেলে চলার শক্তিটা থাকবে, পরের দিন আবার বাজারে যেতে পারব —এই মাত্র।

কু। (দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে) বুঝলাম।

আ। কী বুঝলেন?

কু। ঐ যা বললেন আপনি।

আ। না-না, আপনি বুঝছেন না।

কু। (হেসে ফেলে) তো বেশ তো, বুঝছি না।

আ। তবে কেন বলছেন বুঝছেন?

কু। মশাই, আপনার সঙ্গে তর্ক করতে আমি আসিনি—তার ওপর আপনার শরীর খারাপ, আপনি একটু বিশ্রাম নিয়ে সুস্থ হবার চেষ্টা করুন না!

আ। আমি একটা খুপরিতে থাকি, বুঝলেন—হ্যাঁ, কলকাতায়—তেতলার একটা খুপরিতে। সেটাকে ঘর বলতে পারব না।

কু। তা তো বটেই, আমিই বা কী এমন রাজপ্রাসাদে থাকি?

আ। খুব থাকেন মশাই, আপনি রাজপ্রাসাদে থাকেন না তো কে থাকে? জানেন না কত সুখে আছেন।

কু। হ্যাঁ, তা হয়তো সত্যি।

আ। হয়তো নয়, সত্যিই সত্যি।

কু। তো বেশ তো, না হয় সত্যিই হল।

আ। আর সেই খুপরিটাতে জানেন—আমার সেই তেতলার খুপরিটাতে—দেয়ালে তিনটে ফোটো টাঙানো আছে। একটা আমার মা'র, একটা আমার বাবার, একটা আমার স্ত্রীর। সব মরে গেছে।

কু। স্ত্রীও?

আ। স্ত্রীও, বিয়ের অল্প পরেই। ছেলেপিলে হয়নি, পরে আর বিয়েও করিনি। আত্মীয়-স্বজন এদিকে-ওদিকে ছড়িয়ে আছে, কিন্তু তাদের মধ্যেও আপনজন কেউ নেই।

কু। তা হলে সংসারে একেবারে একলা বলুন?

আ। হ্যাঁ, এক্কেবারে একলা।

কু। বাঃ, ভালোই তো, ঝামেলা নেই, ঝাড়া হাত-পা। (হেসে) আমিও তাই, বুঝলেন?

আ। আপনারও কেউ নেই?

কু। (মাথা নেড়ে) নাঃ। আমার কেবল স্ত্রীটি ছিল না, বিয়ে থা-ই করিনি—(কানে কানে বলার ভঙ্গীতে) করতে চাইও না। কী দরকার ডেকে ঝামেলা বাড়ানোর, আপনিও যেমন! অবশ্য অন্যেরা ছিল, তারা মরে-টরে গেছে, বাঁচিয়েছে। হ্যাঁ, তারপর?

আ। তারপর আর কী, সব মরে-টরে গেলে যা হয়, আর কিছু হওয়ার নেই। শুধু তাদের ফোটোগুলো আছে। যতক্ষণ ঘরটাতে পড়ে থাকি—মানে ঐ খুপরিটাতে—ততক্ষণ তারা আমার দিকে তাকিয়ে থাকে অথবা আমি তাদের দিকে তাকিয়ে থাকি। অথবা পরস্পর পরস্পরের দিকে তাকিয়ে থাকি।

কু। তাকিয়ে থাকেন কেন, না থাকলেই পারেন।

আ। হ্যাঁ, সেটা একটা কথা বটে—কিন্তু নিজের চোখটা বন্ধ করলেই কি শান্তি মেলে? এড়িয়ে পালাব কোথায়? মৃত্যুর চোখ যে সব সময় আমার চোখের দিকে তাকিয়ে আছে—সব সময়, সব সময়, সব সময়।

কু। ওরে বাবা।

আ। নয়তো কী। ফোটোগুলোর তাকিয়ে থাকা তো আরো প্রচণ্ড গুণে বড় একটা সর্বব্যাপী মৃত্যুর প্রতীক মাত্র। যেদিকে তাকাতে যাই, মৃত্যু চোখে আঙুল ঠেকায় সেইখানে।

কু। ওরে বাবা!

আ। মৃত্যুও নয়, যথার্থ মৃত্যু তার চেয়ে শতগুণ ভালো—কিন্তু রাস্তায় মৃতদের মিছিল দেখেছেন কখনো?

কু। মৃতদের মিছিল?

আ। হ্যাঁ, মৃতদের মিছিল, যারা উঠে হেঁটে চলে বেড়াচ্ছে, কিন্তু কেউ জীবন্ত নয়, জীবনের কোনো উত্তাপ যাদের কারুরই মধ্যে আর অবশিষ্ট নেই—মরেনি এখনো, তবু সকলেরি মুখে মৃত্যুর করাল ছায়া, ছেলে বুড়ো বউ ঝি সুন্দরী মেয়ে, সব, সবাই। আর তাই জানেন, যথার্থ একটা মৃত্যু দেখলে আমার উল্লাসে চেঁচিয়ে উঠতে ইচ্ছে করে, বলতে ইচ্ছে করে হিপ হিপ হুর্রে, বেঁচে গেল, বেঁচে গেল, বেঁচে গেল একটা জীবন থেকে যা মৃত্যুর চেয়েও সাংঘাতিক।

কু। সত্যি, সাংঘাতিক।

আ। সাংঘাতিক নয়? আর চারিদিকে দুর্গন্ধ, কী ভীষণ দুর্গন্ধ, কী আবর্জনার গন্ধ, কী বলব আপনাকে।

কু। হ্যাঁ, কিছুক্ষণ আগেই কী একটা গন্ধের কথা যেন বলছিলেন আপনি, একটা আবর্জনার গন্ধ পাচ্ছিলেন যেন।

আ। পাব না? সেটা যে সব সময় নাকে লেগে রয়েছে, মনের মধ্যে জেগে রয়েছে। জানেন, আমার ঐ তেতলার খুপরিটা, জানলা খুলেছি কি আবর্জনা চোখে পড়বে।

কু। জানলা খুললেই?

আ। আর বলেন কেন। বাড়ির সামনেই আবর্জনার স্তূপ, সেটা কমে না, ছোট হয় না, বরং দিনে দিনে বেড়েই চলেছে, শেষে একদিন ছোটখাটো একটা পাহাড় হয়ে উঠবে, একটা হিমালয় হবে। আর শুধু আমার বাড়ির সামনেই বা কেন, সারা শহরটাই তো তাই। আমরা গতকাল বেঁচে ছিলাম, খেয়েছি, হেগেছি, মুতেছি, জিনিস ব্যবহার করেছি, যার একমাত্র প্রমাণ পড়ে রয়েছে ঐ আবর্জনায়—ঐ আমাদের ইতিহাস, আমাদের একমাত্র ইতিহাস।

কু। হ্যাঁ, শহরটায় বড্ড আবর্জনা হয়েছে আজকাল, মাঝে মাঝে যাই তো, দেখি—কিন্তু কেন কেউ তোলে না বলুন তো?

আ। তুলবে কোথায়? কোন্ ভাগাড়ে নিয়ে যাবে? সারা শহরটাই তো ভাগাড়, এমন অপূর্ব একখানি ভাগাড় ভূ-ভারতে আর নেই। বুঝলেন মশাই, দম যেন বন্ধ হয়ে আসে—একদিকে ঐ মৃতের মিছিল, অন্যদিকে আবর্জনার গন্ধ, মনে হতে থাকে আমি যেন পাঁকে ডুবে যাচ্ছি, রেহাই নেই, হাঁস ফাঁস করে হাত-পা ছুঁড়ে যে একটু শেষ চেষ্টা করব বাঁচার, তারও উপায় নেই। তা ছাড়া চেষ্টা করার মতো শক্তিও নেই, যেন

প্রবৃত্তিও নেই—এবং এ-কথাটা শুধু আমার একলারই নয়, সকলের, সকলের।

কু। সত্যি, সাংঘাতিক।

আ। আর সে কী কাক-ডাকা জানেন, সর্বক্ষণ।

কু। কাক?

আ। হ্যাঁ মশাই, কাক। ঐ একটা পাখি যাকে পাখি বললে পাখির অপমান করা হয়। এত ঘৃণা বোধ হয় কোনো পাঁকের কৃমিকেও করি না। কিন্তু করব কী, সারা শহর জুড়ে, আমাদের সমস্ত জীবনটা ভরে ঐ একমাত্র পাখি, ডাকছে দিন নেই রাত নেই, ডাকছে আমাদের কানে, আমাদের শিরায়, ঘিলুতে। শহরে মানুষ বলতে যেমন আমরা, জীবন বলতে যেমন আমরা, পাখি বলতে ঐ কাক।

কু। সে কী মশাই, রাতেও ডাকে?

আ। হ্যাঁ, রাতেও তো প্রায়ই ডাকে, আবর্জনায় জ্যোৎস্না পড়ুক বা না পড়ুক, কাছাকাছি কোথাও পটকা ফাটুক বা না ফাটুক, ডেকেই চলেছে—কা-কা, কা-কা, কা-কা।

কু। ভারি আশ্চর্য।

আ। আশ্চর্য বটে। বলছিলাম না, মরে যাচ্ছিলাম, অবশ হয়ে আসছিলাম—আজ নয়, অনেকদিন ধরে। এক সময় মনে হল, যেন আমার ডান হাতটা আর চলছে না, যেন পক্ষাঘাত হয়ে গেছে, তারপর সেটা কোনোরকমে ভালো হল তো হঠাৎ দেখি বাঁ পা-টা চলে না বা মাথাটা চলে না বা চোখটা চলে না বা ঘাড়ের কাছটা হঠাৎ অসাড়-অসাড় ঠেকছে। তখন ভাবি, তো বাজারে ছুটে যাই আবার, গিয়ে মালিশের কিছু তেল কিনে আনি তবে, অচল জায়গাটা সচল করি, চলতে থাকি, বাঁচতে থাকি। কিন্তু জানেন, পরক্ষণেই আবার কোন্ শয়তান কানে ফিসফিস করে, বেঁচে হবেটা কী, এভাবে বেঁচে হবেটা কী, মর্ না, মর্ ব্যাটা, মর্ না, ল্যাটাটা চুকিয়ে দে। তখন আবার চোখে সর্ষেফুল দেখতে থাকি, আবার মাথাটা ঝিমঝিম করতে শুরু করে, ঝিমঝিম, ঝিমঝিম, ঝিমঝিম, আবার সেই দুঃসহ আবর্জনার গন্ধটা পেয়ে বসে আমায়, দম বন্ধ করে আনে, আবার দশটা-বিশটা-পঞ্চাশটা কাক চীৎকার করে পাড়া মাতায়, মনে হতে থাকে অতলে তলিয়ে যাচ্ছি, অতলে তলিয়ে যাচ্ছি, অতলে তলিয়ে যাচ্ছি...

কু। ব্বাবা, এভাবে বেঁচে থাকা যায়? এখনো একটা বিচ্ছিরি অসুখ করে যে মরেননি...

আ। সেইটেই আশ্চর্য। কিন্তু জানেন, মরে তো প্রায় গিয়েছিলাম, একবার নয়, বহুবার। এই যে বুকের ব্যথাটা দেখছেন, আমার এই বুকের ব্যথাটা, এটা তো আজকের নয়, অনেক দিনের। মাঝে মাঝেই চাড়া দিয়ে ওঠে, এবং যখনই চাড়া দিয়ে ওঠে, মনে হয় এই বুঝি শেষ, এ-যাত্রা আর উতরোলাম না। কিন্তু সেই ছেলেবেলায় পরীক্ষা দেওয়ার কথা মনে আছে? ভয়ে বুক দুরদুর করতে থাকে, পরীক্ষার হল্-এ বিড়বিড় করে বলতে থাকি, হে মা কালী, হে মা কালী, এ-যাত্রা উতরে দাও, এ-যাত্রা উতরে দাও, এবং যাত্রাটা উতরে যেত, মনে পড়ে?

কু। (হাসতে হাসতে) হ্যাঁ, মনে পড়ে।

আ। ঠিক সেইরকমই ব্যথাটা যখনই চাড়া দিয়ে ওঠে, জানি না কার উদ্দেশে ওরকম কাকুতি-মিনতি করতে লেগে যাই, দাঁত কিড়মিড় করে, জোড়হাত কাঁপতে থাকে, কিন্তু যাত্রাটা উতরে যাই। বেঁচে তো আছি, দেখছেন তো, এই তো এসেছি এত দূরে।

কু। তা তো দেখছিই।

আ। (দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে) যাক, অনর্থক আপনার সময় নষ্ট করছি বসে বসে, এবার উঠতে হয়।

কু। (হাই তুলে) নাঃ, সময় নষ্ট কেন, কথা বলার তো লোকই পাই না এখানে। (হেসে) কত রকমের গল্প শুনলাম, এই ধরুন, আবর্জনার গল্পটাই। এখানে এসব শোনায় কে?

আ। আবর্জনার ঐ গন্ধটা জানেন, সেটা আর শুধু আবর্জনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই, সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। আমরাও আবর্জনা হয়ে গিয়েছি, আমাদের গায়েও ঐ একই গন্ধ। কাউকে ঘরে এনে তুলতে পারি না, রাস্তায় চলতে পারি না, ট্রাম-বাস্-এ ওঠা মুশকিল, কারুর পাশে গিয়ে যে বসব, সে-উপায়ও নেই, কারণ তার গা দিয়ে ঐ একই গন্ধ ছাড়ছে। এবং শুধু তার গা দিয়েই বা কেন, আমার নিজের গা'টাও তো সমান। যেন মানুষ নয়, সর্বত্র পাল-পাল শুয়োর ঘুরে বেড়াচ্ছে, জাঁতা-কলে পিষছে সকলকে, এবং সেই পেষার ফলে যা বেরোচ্ছে তা কোনো আখের রস নয়, তা দুঃস্থ মনের, অসুস্থ শরীরের বোতল বোতল ক্লেদাক্ত ঘাম। সমস্ত জীবনের প্রতিশ্রুতি আজ এইখানে এসে ঠেকেছে, এ ছাড়িয়ে দৃষ্টিও চলে না, মনে হয় জীবন বলতে যেন আর কিছু নেই— সর্বক্ষণ ধুঁকতে থাকি, বুঝতে পারি শেষ হয়ে আসছি, আরেকটা দমকা হাওয়া, সঙ্গে সঙ্গে দীপ নিববে। এমন সময়, ভাগ্যিস, সেদিন হঠাৎ দেখা রতনের সঙ্গে।

কু। ও, আপনার সেই বন্ধুটি?

আ। অ্যাদ্দিন বাদে দেখা, আমি চিনিনি, ও কিন্তু আমায় ঠিক চিনেছে, একেবারে নাম ধরে ডেকে উঠেছে। আমি তো আশ্চর্য—এটা-ওটা কথা, তারপর ওর গাঁয়ে যাওয়ার নেমন্তন্ন করে বসল।

কু। উনি কি গাঁয়েই থাকেন?

আ। থাকে বোধ হয়, কিংবা হয়তো কিছুকাল শহরে থাকে, কিছুকাল গাঁয়ে।

কু। কী করেন?

আ। অত জিজ্ঞেস করার ফুরসত পেলাম কোথায়—ও ওর গাঁয়ের প্রসঙ্গ পাড়ল আর আমিও নেচে উঠলাম। কী আনন্দ যে হল, কী বলব আপনাকে। ও বললে, ওদের গাঁয়ে গেলে আমার খুব ভালো লাগবে, সব ভুলে যাব। বললে, যতদিন খুশি থাকতে পারব, সম্পূর্ণ সুস্থ না হলে ফিরবই না—বললে, গাঁয়ে এসব কিছু নেই, আবর্জনা নেই, গন্ধ নেই, গন্ধ যা আছে তা স্থলপদ্মের, শিউলির, আর পুজোও আসন্ন, ওদের বাড়িতেই পুজো, বাড়িভর্তি একগাদা ছেলেমেয়ে, দৌড়োদৌড়ি, দাপাদাপি, খেলা-খেলি, সে এক বুঝলেন, (হেসে ফেলে) সে এক এলাহি কাণ্ড।

কু। আপনার খুব ভালো লাগছে, না?

আ। ভালো লাগছে মানে? মনে হচ্ছে কী জানেন? মনে হচ্ছে বেঁচে গেলাম, হয়তো সত্যিই বেঁচে গেলাম, কারণ এটা তো ঠিকই, আমি মরে যেতে পারি, আপনি মরে যেতে পারেন, আমরা সকলে মরে যেতে পারি, কিন্তু আমরা মরে গেলেই তো সারা পৃথিবীর সমস্ত জীবনটা সঙ্গে সঙ্গে মরে যেতে পারে না, সেটা তো হয় না, কারণ ইতিহাস বলে তো একটা জিনিস আছে, ভবিষ্যৎ বলে একটা জিনিস আছে, সেটাকে তো চলতে হবে, সকাল থেকে সন্ধ্যায়, সন্ধ্যা থেকে আবার ভোরে। এই যে আপনার দাওয়ায় বসে আছি, এই যে গ্রামটা, আমি মরে গেলেই তো আর এ-গ্রামটা মরে যাবে না মাটির ওপর গাছ থাকবে, গাছের ওপরে আকাশ থাকবে, আকাশভর্তি যে-অমল

বায়ু, তাও থাকবে। স্থলপদ্ম থাকবে, শিউলি থাকবে—বলুন, থাকবে না?

কু। নিশ্চয়, থাকবে তো বটেই।

আ। আসলে আমরা যে যার নিজের খুপরিতে বাস করি বুঝলেন, তার বাইরে আর কিছু দেখতে পাই না, আর সেই কারণেই মাঝে মাঝে এমন হতাশ বোধ করি, নইলে হতাশ বোধ করার তো কিছু নেই।

কু। না, কিছু নেই, একেবারেই নেই।

আ। না না, হতাশ বোধ করব না, কারণ স্থলপদ্ম থাকবে, শিউলি থাকবে। আর তা থাকবে বলেই একথা নিশ্চয় জানি যে একদিন ইতিহাসের অমোঘ সূত্র ধরে ঐ স্থলপদ্ম ঐ শিউলি আমাদের শহরের বিরুদ্ধে আক্রমণে এগোবে, এগোবেই, রণদামামা বেজে উঠবে, মরণবাঁচন যুদ্ধ লাগবে দুর্গন্ধে ও সুগন্ধে, এবং সে-যুদ্ধে শেষ পর্যন্ত সুগন্ধেরই জয়, কেউ ঠেকাতে পারবে না—আমার ঐ আবর্জনাটা প্রাণপণে লড়বে, জানি সহজে ছেড়ে দেবে না, কিন্তু ছেড়ে তাকে দিতেই হবে। আর ঐ যে ছোট ছোট ছেলেমেয়ে জানেন, যাদের দেখতে চলেছি, ওদেরই শক্ত সমর্থ হাত একদিন এগিয়ে আসবে সব আবর্জনা সব দুর্গন্ধ সব শুয়োর ঝেঁটিয়ে বিদেয় করতে, ইয়া মোটা মাংসপেশী তাদের সেদিন, রুখবে কে?

কু। সত্যিই তো, রুখবে কে?

আ। কে রুখবে? কেউ পারবে না। তারা তখন ভাঙনের কাজে লাগবে, নতুন সৃষ্টির আগে ভেঙে তছনছ করে দেওয়া সব, বুড়ো-বুড়ো ভাঙা-ভাঙা মানুষ সব চুরমার, শয়তানের যত কৃমি আজ কিলবিল করে বেড়াচ্ছে, তাদের টুঁটি চেপে ধরবে—উঃ, সে কী রণ-দামামা সেদিন, ভাবুন মশাই, ভাবুন একবার। কিছু বলছেন না কেন?

কু। বলব কী বলুন, বলার কী আছে—ভালোই তো।

আ। ভালো নয়? বুঝছেন না, সেদিন আর আবর্জনা নয়, মানুষের পোশাক-পরা শুয়োর নয়, সেদিন গ্রামে গ্রামান্তরে আমাদের দুর্গন্ধ শহরে আবার মানুষের বসতি হবে—মানুষ, মানুষের পোশাক-পরা মানুষ, অন্য কিছু নয়। আমি থাকব না, হয়তো আজকের আমাদের কেউই থাকবে না সেদিন, কী আসে যায়? তবু সেই ছেলে-মেয়েগুলোকে একবার চোখের দেখা দেখতে পাব তো, চোখ জুড়িয়ে যাবে—তাই চলেছি, বুঝলেন?

কু। (হাই তুলে) বুঝলাম।

আ। (হঠাৎ কাছে সরে এসে, আগ্রহের ভাবে) ছেলেমেয়েগুলোর জন্যে আমি কিন্তু একটা জিনিস নিয়ে চলেছি।

কু। (ক্লান্তির ভাব দূরে ফেলে, চোখ বড় বড় করে) কী জিনিস?

আ। খালি হাতে তো যেতে পারি না, মুখমিষ্টির জন্যে কিছু তো নিয়ে যেতেই হয়, বলুন?

কু। সত্যিই তো। কী জিনিস?

আ। এক হাঁড়ি চন্দ্রপুলি। কী, ভালো লাগছে শুনে?

কু। খুব ভালো লাগছে। এক হাঁড়ি চন্দ্রপুলি?

আ। এক হাঁড়ি। অনেকগুলো আছে, যত খাবে খাক। কিন্তু কলকাতা থেকে নয়, ঐ দুর্গন্ধ শহর থেকে ওদের জন্যে কী নিয়ে যাব বলুন, এবং কেনই বা?

কু। তবে কোথায় পেলেন?

আ। বলব?

[কুটীরবাসী ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে।]

আ। জয়নগর থেকে। জয়নগরের একটি লোক পাড়ায় নিয়মিত আসে, মিষ্টি বিক্রি করে, তাকে পাকড়াও করে বসি। একেবারে খাঁটি লোক, সত্যিকারের ময়রা—আর গাঁয়ের লোক তো, তার চোখের চাওয়াই আলাদা। আর কথাগুলোও কী মিষ্টি, বলে কী জানেন? বলে বাবু আমরা তো কলকাতার নই, কলকাতায় কত বড় বড় দোকান আছে—আমাদের বোর্ড নেই, আমরা অন্ধকারের বাসিন্দে, কিন্তু মিষ্টিটা একটু খেয়ে দেখবেন।

কু। খেয়েছিলেন?

আ। হ্যাঁ, একটু চেখেছিলাম, একেবারে খাসা। এক-একটা বেশ বড় বড়, ক্ষীর আছে, নারকেল আছে, তার ওপর পেস্তা বাদাম আছে, গন্ধই আলাদা মশাই। অবশ্য সাধারণ চন্দ্রপুলিও ছিল, শুধু নারকেলের, একটু ছোট ছোট, এক-একটা বিশ নয়া করে। এগুলো তিরিশ নয়া করে, এগুলোই নিলাম। বলুন, ভালো করেছি কি না?

কু। সে কী, নিশ্চয়।

আ। খরচ অবশ্য একটু হল, তবে সে-খরচ করেও আনন্দ। বলুন?

কু। তা তো বটেই।

আ। আচ্ছা, আপনি তো বললেন আপনারও কেউ নেই, একলাই আছেন?

কু। হ্যাঁ।

আ। তো চলুন না কেন আমার সঙ্গে, যাবেন?

কু। কোথায়?

আ। আমার সেই বন্ধুটির বাড়ি, পাশের গাঁয়েই তো। ভালো লাগল তো কিছুদিন রইলেন, না লাগল তো ফিরে এলেন, কাছেই তো, যাবেন আর আসবেন।

কু। কী করতে?

আ। বাঃ, একটু পুজো দেখে এলেন, ছেলেমেয়েদের দাপাদাপি, দৌড়োদৌড়ি, খেলা—কত মজা। কী, করছেন না তো কিছু, না হাতে অন্য কাজ আছে?

কু। না, কাজ সেরকম কিছু নেই।

আ। তবে? চলুন না, বাকি পথটায় আমিও একজন সঙ্গী পেয়ে যাব, বেশ ভালো লাগবে—চলুন, উঠে পড়া যাক, অ্যাঁ?

কু। দূর মশাই, আমার ওসব ভালো-টালো লাগে না।

আ। (স্তম্ভিত ভাবে) সে কী!

কু। আরে দূর মশাই, অমন পুজো ঢের দেখেছি, ফি বারই তো দেখছি—আপনি শহুরে লোক, ঘুরে আসুন, আমাদের ওসব দরকার-টরকার নেই।

আ। (হতাশের ভঙ্গীতে) যাবেন না তা হলে?

কু। কোথায় যাব? আরে মশাই, আপনার কথাবার্তা শুনে মনে হচ্ছে আপনি এ-জগতের লোক নন, আপনাকে বোঝাই কী করে? গ্রাম-গ্রাম করে আপনি তো আহ্লাদে আটখানা হচ্ছেন, আমার অত আহ্লাদ নেই, বুঝলেন।

আ। কেন?

কু। আরে মশাই, গ্রাম দেখাতে আপনি এসেছেন আমায়, কী দেখাবেন আপনি? আমি তো

গাঁয়েরই লোক। আর ঐ যে ছেলেমেয়েগুলোর কথা বলছিলেন না, ক'টা ছেলেমেয়ে অমন দেখতে চান বলুন, আপনাকে এ-গাঁয়েই দেখিয়ে দিচ্ছি, আমার ইস্কুলেই দেখিয়ে দিচ্ছি।

আ। ইস্কুলে?

কু। হ্যাঁ, আমি যেখানে পড়াই, একটা প্রাথমিক বিদ্যালয়। অনেক কাল আগে আসি, কলকাতা থেকেই, একদিন কাজ পেয়ে যাই, চলে আসি, তারপর থেকে পড়েই আছি —কোথায় আর যাব, আবার কোথায় চাকরির ধান্দায় ঘুরব? তা ছাড়া একটা তো পেট, কোনোরকমে চালিয়ে যাওয়া, জীবনটা কাটিয়ে দেওয়া। কিন্তু আদর্শ এক-কালে আমারও ছিল, অল্প বয়স তো তখন, ইস্কুলের চাকরিটা পেয়ে ভাবি যে যাক, ভালোই হল, শিশুদের গড়ে তুলব, জীবনে একটা কিছু করব—দূর দূর মশাই, ধাপ্পা, ধাপ্পা।

আ। ধাপ্পা?

কু। সব ধাপ্পা, আলবত ধাপ্পা। কী শোনাবেন তাদের আপনি, আর শিখিয়ে কী ঘেঁচু হবেটাই বা কী, গ্রামের অবস্থা জানেন? এখন জ্ঞানগম্যি হয়েছে, বুঝেছি কিস্সু করার নেই, একেবারে কিস্সু করার নেই, অতএব গা এলিয়ে দাও, একটা জীবন বাবা, যতটা দায়মুক্ত হয়ে পারো বেঁচে যাও, ব্যস। হ্যাঃ, বলছিলেন না, শক্ত সমর্থ হাত, ইয়া মোটা মাংসপেশী! কোথায় দেখছেন আপনি? বলে খেতে পায় না, বই কেনার পয়সা তো দূরের কথা, সর্বক্ষণ রোগে ভুগছে, পেটে পিলে, ভবিষ্যৎ অন্ধকার, আর এদিকে আপনি কাব্যি করতে বসে গেছেন! যান যান মশাই।

আ। (যন্ত্রণায় মুখ বিকৃত করে) কিন্তু রতন যে বললে......

কু। রাখুন মশাই আপনার রতন, সে আবার কী বলবে? তার বাড়ির ছেলেগুলো হয়তো মোটাসোটা, তারা হয়তো জমিদার, খেতে-দেতে পায়, দৌড়োদৌড়ি করে—কিন্তু তারা করবে দেশোদ্ধার? খেপেছেন? হ্যাঁঃ, স্থলপদ্ম! শিউলি! আপনার মশাই মাথা খারাপ।

আ। (অত্যন্ত কষ্টের সঙ্গে, বিড়বিড় করে) কী বলছেন, মাথা খারাপ......

কু। মাথা খারাপ নয় তো কী? এই তো আপনি যাচ্ছেন, যান না, বেশ তো, ঘুরে আসুন, সুস্থ হয়ে ফিরুন। কিন্তু সেখানে না হয় আপনি এক মাসই রইলেন, কি তিনমাসই রইলেন, কি ধরুন পুরো একটা বছরই রইলেন, তবু তার মধ্যেই আপনার কলকাতার আবর্জনাটা কি হাওয়ায় উবে যাবে ভাবেন?

আ। (বুকটা আবার চেপে ধরে) না, উবে যাবে তো বলছি না...

কু। ও কি, আপনি আবার বুকে হাত দিচ্ছেন কেন?

আ। (কাতর ভাবে) সেই ব্যথাটা...

কু। শুয়ে পড়ুন, শুয়ে পড়ুন।

[কুটীরবাসী আগন্তুককে ধীরে ধীরে শুইয়ে দেয়।]

কু। শেষকালে আমার কথাতেই কি ব্যথাটা জাগল? আমিই কিছু বললাম না কি?

[আগন্তুকের সাড়া নেই—দেখাই যাচ্ছে, প্রচণ্ড যন্ত্রণায় সে ছটফট করছে।]

কু। (ব্যস্তসমস্ত হয়ে, উঠে পড়ে) একটু জল দিতে পারলে বোধহয় ভালো হত, একটু পাখার বাতাস...

[কুটীরবাসী ছুটে কুটীরের দরজায় যায়, দমাদম ধাক্কা দিতে শুরু করে—
ইতিমধ্যে আগন্তুকের দেহ সটাং হয়, সে নিস্পন্দের মতো পড়ে থাকে।]

কু। (দরজায় ধাক্কা দিতে দিতে) এই মাগী, দরজা খোল্ বলছি, শীগগির খোল্।

[দরজা অল্প খোলে, ত্রিশ-বত্রিশ বছরের বিধবা মুখ বাড়ায়।]

বি। কী, চেঁচিয়ে এত পাড়া মাত করবার কী আছে?

কু। দরজায় আবার খিল দিতে গিছলি কেন?

[দরজা খুলে বিধবা বেরিয়ে আসে।]

বি। না, খিল দিতে যাবে না! রাত দুপুরে কত্তার গপ্প করার শখ হল, আর সময় পেলে না। আর সেই তখন থেকে বক-বক-বক-বক-বক-বক, চলেছে তো চলেছেই—একটু চোখের পাতা ফেলতে পারিনে গো!

কু। থাক থাক, এখন চট্ করে একটু জল নিয়ে আয় দেখি, শীগগির।

বি। জল! কী হবে? খাবে?

কু। কথা নয়, শীগগির। ভদ্রলোক বোধ হয় মরতে বসেছেন।

বি। সে কী! এ কী ঝামেলা রে বাবা। হ্যাঁ গো, লোকটা কে?

কু। (আদেশের সুরে) আবার কে-কে করছিস? জল নিয়ে আয় বলছি।

[কুটীরবাসী বিধবাকে ঠেলে ভিতরে পাঠিয়ে দেয়।]

কু। (হঠাৎ ভিতরের দিকে উদ্দেশ করে, চেঁচিয়ে) আর হ্যাঁ, পাখাটাও নিয়ে আসবি।

[কুটীরবাসী ফিরে আসে, সেখানে আগন্তুকের দেহ
শায়িত অবস্থায় নিস্পন্দের মতো পড়ে আছে।]

কু। (আগন্তুককে নাড়া দিয়ে) ও মশাই, বলি শুনছেন? এ কী রে বাবা, নড়ে না চড়ে না, কী সব্বনাশ।

[বিধবা কুটীর হতে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে আসে, এক হাতে মাটির কুঁজো, অন্য হাতে তালপাতার হাতপাখা। কুঁজো হতে কুটীরবাসী সামান্য জল হাতে নেয়, আগন্তুকের মুখে ছিটিয়ে দেয়। পরে পাখাটা নেয়, হাওয়া দিতে শুরু করে।]

কু। (আগন্তুককে নাড়া দিয়ে) ও মশাই, শুনছেন? কথা বলছেন না কেন? (বিধবার দিকে তাকিয়ে) মরে গেল না কি রে? সব্বনাশ!

বি। সে কী, মরে গেল?

কু। আমি তো কিছু বুঝতে পারছি নে রে বাবা।

বি। নাড়ীটা দ্যাখো না।

কু। (আগন্তুকের হাত খুঁজতে খুঁজতে) নাড়ী দেখতেই যদি জানব......

বি। তো জানোটা কী! মরণ আমার।

কু। গালাগাল দিবি নে বলছি।

বি। থাক, ঢের হয়েছে, আমিই দেখছি।

[বিধবা নিজেই আগন্তুকের হাতটা তুলে নেয়, কানের কাছে ধরে।]

বি। (চিন্তিতের ভাবে) কই, নাড়ী পাচ্ছি বলে তো মনে হচ্ছে না।

কু। পাচ্ছিস নে?

[বিধবা হঠাৎ নিচু হয়ে আগন্তুকের গালে গাল রাখতে যায়।]

কু। এই মাগী, ও কী হচ্ছে?

বি। (মুখ তুলে) কতবার না বলেছি, মাগী-মাগী করবে না?

কু। নাঃ, করবে না! মাগী ছাড়া কী তুই? পুরুষমানুষ দেখেছে কি ঝাঁপিয়ে পড়েছে।

বি। (উঠে দাঁড়িয়ে, ঝগড়ার ভাবে) কোথায় ঝাঁপিয়ে পড়তে দেখলে গো তুমি? ঝাঁপিয়ে পড়তে চাইলে অনেক আগেই পড়তাম, তোমার ঘরমুখো আর হতাম না।

কু। তো কী করছিলি তবে?

বি। (ভেঙিয়ে ভেঙিয়ে) কী করছিলাম! নিজের মন যার বিষ, সে সব তাতে বিষ দেখে।

কু। তো করছিলি কী তুই, কথা এড়াস কেন?

বি। তো করবই যদি তো সেটা কি তোমার চোখের সামনে করব? আ আমার মরণ, এ-বুদ্ধিটুকু নেই।

কু। তো করছিলি কী, গালে গাল ঠেকিয়ে?

বি কী করছিলাম? ধড়ে প্রাণ আছে কি না, সেটা দেখছিলাম—কী, মনে ধরল উত্তরটা?

কু। তো ধড়ে প্রাণ আছে কি না, সেটা বুঝি অমন করে দেখে? বোকা বানাবার আর জায়গা পাসনি, না?

বি। কেমন করে দেখে? শুনি তবে, কেমন করে দেখে?

কু। ওভাবে তো জ্বর দেখে।

বি। তাই তো দেখছিলাম।

কু। জ্বর দেখছিলি তুই?

বি। জ্বর নয় জ্বর নয়, গায়ের উত্তাপ, বুঝলে? মরে গেলে যে মানুষ ঠাণ্ডা হয়ে যায়, দেহ একেবারে হিমশীতল হয়ে যায়, সেটা জানো তো, না সে-বুদ্ধিটুকুও নেই?

কু। তো দেখলি কী?

বি। দেখতে দিলে আমায়?

কু। আচ্ছা দাঁড়া, আমিই দেখছি। (নিচু হয়ে আগন্তুকের গালে গাল রেখে) ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডাই তো ঠেকছে, কী জানি বাবা। (উঠে পড়ে, বিধবাকে) এখন কী করা যায় বল্ তো. সত্যি সত্যি মরে গেল নাকি?

বি। হ্যাঁ গা, লোকটা কে গো—চিনতে?

কু। দূর—আগে কক্ষনো দেখিনি পর্যন্ত।

বি। তো তার সঙ্গে এত গল্প ফেঁদেছিলে কেন? চেনা নেই, জানা নেই, তার সঙ্গে এত বকর-বকর, আর এমনি রাত দুপুরে...আর হঠাৎ মরলই বা কী করে? বেশ তো কথা বলছিল।

কু। কী বলছিল শুনছিলি?

বি। আমার ভারি বয়ে গেছে শোনবার। বলে ঘুমোবার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করছি... তো লোকটা কে গা?

কু। কলকাতা থেকে আসছিল, হঠাৎ শরীর খারাপ হয়, এখানে শুয়ে পড়ে।

বি। তো এখানে কেন? মরতে আমাদের দালানে কেন?

কু। অমন মরতে-মরতে করে কথা বলবি নে বলে দিচ্ছি—মাগীর কথা শুনলে গা জ্বালা করে।

বি। তা তো জ্বলবেই, তো এ-লোকটার সঙ্গে কী এমন পিরীতের কথা হচ্ছিল তোমার?

কু। মুখ সামলা মাগী, মুখ সামলা—একটা সত্যিকারের ভদ্রলোকের সম্বন্ধে অমন যা-তা

বলবি নে। এমন ভদ্রলোক তোর চোদ্দপুরুষে দেখেনি।

বি। দ্যাখো এখন, মুখখারাপ কে করছে?

কু। বেশ করব, মুখখারাপ করব, তুই অমন যা-তা বলবি আর মুখ বুঁজে সহ্য করব? তোকে কী বোঝাব বল, একটা মুখ্যু মাগী কোথাকার, কত বড় অনর্থক এই জীবন একটা, কত বড় একটা জঞ্জাল! আর সেই জঞ্জালের মধ্যে এমন একটা লোকের সাক্ষাৎ পাওয়া, সেটা রোজ ঘটে না, বুঝলি।

বি। বাবা, এ যে দেখছি ভক্তি একেবারে উথলে উঠছে। তো কী এমন কথামৃত ছাড়ছিলেন তিনি, শুনি?

কু। (আক্ষেপের সুরে) তোকে কী বলব, তোকে কী বলব, তুই কী বুঝবি! (অন্যমনা হয়ে) আসলে আমার কথাটাতেই কি ব্যথাটা অমন হঠাৎ চাড়া দিয়ে উঠল, আমিই কি কিছু বললাম?

বি। (হঠাৎ সন্দিগ্ধ হয়ে) কী বলেছিলে তুমি?

কু। এমন কিছু নয়, বিশ্বাস কর্, কিছু বলিনি। এমন কি শেষটায় কথাবার্তা আমি চালাচ্ছিলামই না, ও-ই হাউ হাউ করে বলতে শুরু করে দিল। আমি তো ভাব-ছিলাম, এই ওঠে, এই ওঠে, কিন্তু ওঠবার লক্ষণই দেখি না, সেই গ্যাঁট হয়ে বসেছে তো বসেইছে। একবার বলল পর্যন্ত, এবার উঠে পড়া যাক, আপনাকে অনেক কষ্ট দিলাম, ইত্যাদি ইত্যাদি—আমি কিন্তু তখন ওকে ফিরে বসতে বলিনি, একেবারেই না, বিশ্বাস কর্। ওদিকে তখন লোকটার কেমন যেন ভাবাবেশ হল, মুখ দিয়ে কথা হুড় হুড় করে বেরিয়ে আসছে, বেরিয়ে আসছে, আর থামতে চায় না।

বি। কী এমন কথা?

কু। কত কথা। শহর থেকে গ্রামে আসছে, আহ্লাদে আটখানা, পাশের কোন্ গাঁয়ে বন্ধুর বাড়িতে পুজো দেখতে চলেছে। এই নিয়ে যত রাজ্যের সব আবোল-তাবোল কথা।

বি। আবোল-তাবোল?

কু। হ্যাঁ, মনে হয় আবোল-তাবোল, কিন্তু একটা অর্থ আছে—লোকটা ভারি অদ্ভুত, বুঝলি। শহরে আর বাঁচতে পারছিল না, দুর্গন্ধ, নোংরা, এই সব, এখন ভাবছিল গ্রাম এসে শহরকে বাঁচাবে। তারপর আরো সব কত রকমের কথা—স্থলপদ্ম, শিউলি...

বি। স্থলপদ্ম, শিউলি?

কু। হ্যাঁ, গ্রামের স্থলপদ্ম-শিউলি এসে একদিন শহরের আবর্জনাকে আক্রমণ করবে, দুর্গন্ধের সঙ্গে সুগন্ধের লড়াই লাগবে, এক ভয়ংকর মরণ-বাঁচন যুদ্ধ, শেষে দুর্গন্ধ হেরে যাবে, সুগন্ধ জিতবে...

বি। (গালে হাত দিয়ে) ও মা, এসব কী অনাছিষ্টি কাণ্ড গা! রাত দুপুরে অচেনা লোকের বাড়ি বয়ে এসে ঘুম ভাঙিয়ে এসব কথা শোনানো, এ বাবা আগে কখনো শুনিনি। বুঝলে, লোকটা নির্ঘাত পাগল ছিল, পাগল না হলে এমনতর কথা কেউ বলবে না।

কু। আমি তো বলেই ফেলি মাথাখারাপ, আর সেইটে শুনেই হয়তো ভদ্রলোক এমন ব্যথা পেলেন...

বি। বলেছিলে মাথাখারাপ?

কু। (বিড়ম্বিতের ভাবে) আ-হা বলা মানে কি, কথার পিঠে একটা কথা বলা, এই পর্যন্ত।

তা ছাড়া ঠাট্টা করেও তো আমরা মানুষকে কখনো সখনো মাথাখারাপ বলে থাকি, বলি না?

বি। কিন্তু আমার কথা হচ্ছে, একটা পাগলের সঙ্গে সেই ঠাট্টাটাই বা তুমি করতে যাবে কেন?

কু। এ তো আচ্ছা জ্বালা হল দেখছি—পাগল বললেই পাগল? লোকটা একেবারেই পাগল নয়। আসলে লোকটা...লোকটা একটা ভয়ংকর ভাববিলাসী, একটা আদর্শবাদী, একটা বিরাট মহৎ কল্পনার জগতে সারাক্ষণ বাস করছে—অমন ফ্যাল ফ্যাল করে তাকাসনে, এসব কথা তুই বুঝবিনে, তোর মাথায় ঢুকবে না। (হঠাৎ কপাল চাপড়ে) কিন্তু খামাখা আমি কেন লোকটাকে মাথাখারাপ বলতে গেলাম!

বি। তাহলে দাঁড়াচ্ছে এই, তোমার কথা শুনেই লোকটা মরল, এই তো?

কু। (হঠাৎ ভয় পেয়ে) মানে?

বি। মানে তুমি যদি কিছু না বলতে তো লোকটা মরত না—সোজা কথা।

[হঠাৎ কোত্থেকে একটা কাক ডেকে ওঠে।]

কু। (চমকে) কী ডাকল ওটা?

বি। কেন, কাক। ভোর তো হয়ে এল বলে।

কু। ভোর হয়ে এল বলে? ভোরে যে ও পেঁৗছে যাবে বলেছিল।

বি। (মুখে কাপড় দিয়ে, হাসি চাপার ভঙ্গীতে) তো পেঁৗছে তো গেছে। একেবারে দিব্য ধামে।

কু। আবার মশকরা করছিস তুই, জাহান্নমের কীট একটা। এদিকে শুনছিস না, কাক ডাকছে, ডাকতে শুরু করেছে!

বি। ও মা, এসব কী কথা গো, পাগলের সঙ্গে থেকে শেষটায় তুমিও পাগল হয়ে গেলে নাকি? কাক তো রোজই ডাকে।

কু। কিন্তু এমন বিচ্ছিরি আওয়াজ? কই, আগে তো শুনিনি। (হঠাৎ নাকে হাত দিয়ে) ঐ তো, যেন আবর্জনার গন্ধটাও পাচ্ছি, একেবারে হু হু করে উঠে আসছে—পাচ্ছিস তুই?

বি। কই বাবা, আমি তো কিছু পাচ্ছিনে—শেষকালে তোমারই কি মাথাখারাপ হল নাকি?

কু। আবার মাথাখারাপ-মাথাখারাপ করছিস?

বি। চোখরাঙানি দ্যাখো, অত ধমকাচ্ছ কেন গা? হ্যাঁঃ, নিজে পথে হেগে এখন চোখ-রাঙানো হচ্ছে! তোমার কথাতেই তো লোকটা মরল, তুমিই না মাথাখারাপ বলতে গিয়েছিলে?

কু। (ঘাবড়ে গিয়ে, আত্মরক্ষার ভাবে) আমার কথাতে মরল মানে? (তোতলার ভাবে) মারলি...মারলি তো তুই!

বি। (হতভম্বের মতো) আমি মারলাম?

কু। নয়তো কী? তুই যদি দরজায় খিল না দিতিস, যদি সময়ে একটু জল আনতে পারতাম...

বি। (গালে হাত দিয়ে) দ্যাখো, এখন সব আমার দোষ।

কু। আর তুই হতচ্ছাড়ী না থাকলে লোকটাকে অনায়াসে ঘরে এনে তুলতে পারতাম। প্রথম থেকেই একটু সেবাশুশ্রূষা করতে পারলে কিছু হত না। কিন্তু নিয়ে যাই কী করে,

কোন্ মুখে? ওখানে তুই তো উরু দুটো বার করে পড়ে আছিস।

বি। কী, যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা?

কু। চুপ কর্! ঝি আছিস, ঝির মতো থাকবি।

বি। (চেঁচিয়ে) কী, ঝি আছি! তো হ্যাঁরে মুখপোড়া, আমি তো ঝিই থাকতে চেয়েছিলাম, তুই থাকতে দিলি? বিয়ে করবি বলেছিলি কেন, কোথায় গেল সে-শপথ তোর? নইলে আমার ভারি বয়েই গেছে তোর বিছানায় অমন চিৎপটাং হয়ে পড়ে থাকতে—আমি অমন মেয়েছেলে নই, বুঝলি? আমার একটা সম্ভ্রমজ্ঞান আছে।

কু। আস্তে কথা বল্, অত চেঁচাবার কী আছে—পাড়ার লোককে শুনিয়ে খুব লাভ হবে, না?

বি। (ভেঙিয়ে ভেঙিয়ে) নাঃ, লাভ হবে না, চেঁচাবে না! (চেঁচিয়ে) খুব চেঁচাব, নিশ্চয় চেঁচাব, রাজ্যির লোক ডেকে চেঁচাব। (আবার ভেঙিয়ে) হ্যাঁঃ, কী আমার ভদ্দরলোক এসেছেন গো, ইস্কুলের মাস্টারমশাই এসেছেন! এক-একবার ইচ্ছে করে তোর মুখোশটা টেনে ছিঁড়ে ফেলে দিই, লোকে সব জানুক, দেখুক, পাষণ্ড একটা। (থেমে) আর চেঁচালেও বা শুনছে কে? সব আটঘাট বেঁধেই তো এখানে উঠে আসা হয়েছে, তোমার ফন্দী জানতে কারুর বাকী আছে? ফষ্টিনষ্টি করবে বলেই তো ও-বাড়ি থেকে পালিয়ে এলে, নইলে বাড়িটা তো ছিল তোমার ইস্কুলের পাশেই, ছাড়লে কেন? ছাড়লাম, কেন এখানে বেশ নিরিবিলি, রাতে-রাতে ও আসবে, ভোর-ভোর পালিয়ে যাবে। কম শয়তান তুমি! কিন্তু লোকের চোখে ধুলো দেওয়া অত সহজ নয়, বুঝলি?

কু। আবার তুই-তোকারি করছিস?

বি। কেন করব না রে, একশো বার করব, বেশ করব। তুই করতে পারিস আর আমি করতে পারব না? (ভেঙিয়ে) অ্যাঁঃ, বিয়ে করবে! এখনো বিয়ের নাম পর্যন্ত নেই, শুধু অপমান করেই চলেছে। আমার মান-ইজ্জত সব চুলোয় গেল।

কু। (ভেঙিয়ে) অ্যাঁঃ, মান-ইজ্জত, তোর আবার মান-ইজ্জত! বলে মাইনে পাচ্ছিস, তার ওপর বিনা-পয়সায় খেতে পাচ্ছিস, থান পাচ্ছিস—সেটা যথেষ্ট নয়। কে দিত তোকে এ-সব?

বি। ঢের লোক দিত। ঐ চক্কোত্তিদের বাড়িতেই তো কাজ করছিলাম, বেশি মাইনের লোভ দেখিয়ে তুই আনলি কেন? আনলি, কারণ আমার শরীরের ওপর তোর শনির দৃষ্টি পড়ে—তখন কি আর অত বুঝেছিলাম, বুঝলে কি আর আসি। (থেমে, ভেঙিয়ে) ঝি! ঝি হয়েই তো আসি। তো একদিন যখন ঘর মুছছিলাম, হঠাৎ উঠে গিয়ে দরজায় খিল দিতে গেলি কেন, বল্ পোড়ারমুখো, বল্! তখন তো খুব ভালো লেগেছিল, না?

কু। তো তুই হাত দিতে দিলি কেন, পালালি না কেন?

বি। কী, পালালাম না কেন? সব ভুলে গেলি? পালাতে আমি যাইনি? বল্ বুকে হাত দিয়ে, বল্ পোড়ারমুখো! কিন্তু পালাতে তুই দিয়েছিলি? জাপটে ধরে বিছানায় তুললি কেন? (ভেঙিয়ে) অ্যাঁঃ, তার পর থেকে কত আদর, কত কথা, তোকে এই করব, তোকে সেই করব! হারামজাদা!

কু। এই করব সেই করব মানে?

বি। মানে বলেছিলি বিয়ে করবি, বল্, বলিসনি? একবার নয়, দুবার নয়, কত হাজার

বার বলেছিস। (ভেঙিয়ে) আমাদের একই ঘর, বিয়েতে মুশকিল নেই—হ্যাঁঃ, মুশকিল নেই! আর দ্যাখ্, কথাটা যখন তুললিই তো আজ আমি এর একটা হেস্তনেস্ত করে ছাড়ব, হ্যাঁ। ঢের সয়েছি, আর পারছি না। বল্, বিয়ে করবি কি না, নইলে এই আমি চললাম।

কু। কী হবে তোকে বিয়ে করে, একটা বাঁজা মাগীকে?

বি। কী বললি? আবার বলে দ্যাখ্।

কু। বলবই তো। একটা বাঁজা মাগীকে বিয়ে করে কী হবে?

বি। আমি বাঁজা? কেন রে হারামজাদা, সে-খবরটা বুঝি তোর কানে কানে কেউ দিয়ে গেছে?

কু। কানে কানে দিতে যাবে কেন? আর অন্যের মুখে আমি ঝালই বা খাব কেন? হ্যাঁঃ, হাতে পাঁজি মঙ্গলবার!

বি। মানে?

কু। মানে এই তো তোকে নিয়ে খাটে তুলছি আজ তিন বচ্ছর, কত কসরত করছি—কই, সব পন্ডশ্রম, শুধু হাঁপাতে হাঁপাতে আমিই মরি, গা দিয়ে ঘাম ঝরে। ফল তো আজ পর্যন্ত কিছু দেখলাম না।

বি। ও, তবে আমিই বাঁজা? সেটা তবে সব আমারই দোষ?

কু। আর কার?

বি। কেন, তোর হতে পারে না? আমি তো বলব তোরই দোষ, তুইই বাঁজা।

কু। যা-যা, বাজে বকিস নে।

বি। বাজে বকছি? তবে রে, দেখতে চাস? বেশ, প্রমাণ তোর আমি হাতে-নাতে এনে দেব। দ্যাখ্ আমি অন্য কারুর সঙ্গে ঘর করতে পারি কি না—তারপর একদিন পেটটা ঢোল করে এই তোরই সামনে এসে দাঁড়াব। কী, রাজী?

কু। হারামজাদী মাগী, সব পারিস তুই।

[আবার কাক ডেকে ওঠে, এবার বেশ কয়েকটা একসঙ্গে।]

কু। ঐ আবার ডাকছে! এত কাক তো এখানে কখনো ডাকে না, এ কী হল! ঐ আবর্জনার গন্ধটাও পাচ্ছি, হ্যাঁ হ্যাঁ, আবার পাচ্ছি—এ কী সব্বনাশ, এখন আমি কী করব!

[কুটীরবাসীর কথা শেষ হওয়ার আগেই বিধবা কান্নার ভাবে আক্ষেপ জুড়ে দেয়।]

বি। (আক্ষেপের সুরে) এখন আমি কী করব, কোথায় যাব! এত গালাগাল তো ও আমায় কখনো দেয়নি—মাগী বলেছে, তুই-তোকারি করেছে, তবু আদরও করেছে। কিন্তু আজ এ কী! হারামজাদী বলছে, এমন কি বাঁজা পর্যন্ত বলছে। আমি কী করেছি ওর, আমি তো কিছু করিনি। (কাপড়ে মুখ ঢেকে, কাঁদতে কাঁদতে) মা গো, আমি কোথায় যাব এখন!

কু। (কাছে এসে, সান্ত্বনার সুরে) কাঁদিস নে রে, কাঁদিস নে—কেঁদে কী হবে? আসলে হয়তো তুইও যেমন বাঁজা, আমিও তেমনি বাঁজা, আমরা দুজনেই সমান বাঁজা, আমাদের কারুর কিছু হবার নেই রে। আমাদের জীবনে ফসল নেই, বুঝলি—আর তোর-আমার এই জীবনটা দেখছিস তো, এটা কি জীবন একটা? এ তো পাঁকের কৃমির জীবন রে! উঃ, কী দুর্গন্ধের জীবন, পাচ্ছিস তো দুর্গন্ধটা তুই, না এখনো পাচ্ছিস নে? আমার বোধ হয় চৈতন্য হয়েছে, নাকটা তাই হঠাৎ তীক্ষ্ম হয়ে উঠল। আসলে

লোকটা যা বলতে চেয়েছিল, বোধ হয় সেটা শহরের দুর্গন্ধ নয়, গ্রামেরও দুর্গন্ধ নয়, কিন্তু আগোগাড়া আমাদের এই জীবনটাই যে জঞ্জাল হয়ে উঠেছে, এ-দুর্গন্ধ সেই জঞ্জালের। না-না, লোকটা বোধ হয় ঠিকই বলেছিল...

বি। (হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে, আগন্তুককে দেখিয়ে) আর যত নষ্টের গোড়া এই লোকটা, মরার আর জায়গা পেল না—আমাদের যা শান্তিভঙ্গ হবার তা তো হলই, এখন তার ওপর পুলিশ আসুক, জেরা হোক, তদন্ত হোক...

কু। (চমকে উঠে) হ্যাঁ রে, ঠিক ধরেছিস—আমার তো খেয়ালই ছিল না। তো মড়াটাকে নিয়ে এখন কী করা যায় বল্ তো?

বি। করবে আর কী, এখন বসে বসে পাপের ফলভোগ করো।

কু। কিন্তু পাপ কোথায়—কই, আমরা তো কিছু করিনি।

বি। হ্যাঁ, সেটা এবার পুলিশকে বোঝাও। বোঝাতে জান বেরিয়ে যাবে।

কু। মানে? আমাদের সন্দেহ করবে?

বি। তা একটু করবেই তো। এখানে হঠাৎ মরতে গেল কেন, কী হয়েছিল, কী বৃত্তান্ত —জানতে চাইবে না?

কু। তো কী করা যায়?

বি। (হঠাৎ চোখ বড় বড় করে) হ্যাঁ, মাথায় একটা বুদ্ধি এসেছে।

কু। কী বুদ্ধি? বল্ না!

বি। কেন বলতে যাব? এতক্ষণ তো খুব গালাগাল দিচ্ছিলে।

কু। আর দেব না রে, সত্যি বলছি। বল্ না রে, বল্ না!

বি। আমি বলি কি, চলো আমরা দুজনে ধরাধরি করে মড়াটাকে বড় রাস্তার মোড়ে রেখে আসি।

কু। বড় রাস্তার মোড়ে?

বি। হ্যাঁ, রাস্তার পাশে শুইয়ে দেব, বাক্স-বিছানাও নিয়ে যাব—লোকে ভাববে, পথের ওপরই মরে পড়ে গেছে।

কু। (একটু ভেবে) হ্যাঁ, ফন্দীটা বেশ ভালোই রে, তোর বুদ্ধি দেখছি খুব। হ্যাঁ-হ্যাঁ, বেশ ফন্দী, বেশ, কারণ পরে ডাক্তারী পরীক্ষা-টরীক্ষা যখন হবে, তখন মৃত্যুর কারণটা সহজেই আঁচ করে নিতে পারবে।

বি। তো তাহলে আর দেরি নয়, ওঠো, ভোর হওয়ার আগে আগেই সব করে ফেলতে হবে —নইলে লোকে দেখে ফেলবে।

কু। ওঠ্, চল্। (উঠতে যায়, থেমে) কিন্তু একটা কথা ভাবছিলাম, বুঝলি?

বি। কী?

কু। লোকটা ভারি ভদ্রলোক ছিল রে, আমার তো অসম্ভব ভালো ঠেকল। আমি বলি কি, বড় রাস্তার মোড়ে নিয়ে যাচ্ছি ঠিকই, কিন্তু পরে ওর বন্ধুটিকেও একবার খবর দিই, অ্যাঁ? সেটা উচিত হবে।

বি। বন্ধুটি কে?

কু। কে এক রতনকৃষ্ণ হালদার না কী বললে, একটা-দুটো গাঁ বাদেই তার বাড়ি, বাড়িতে পুজোটুজো হয়।

বি। রতনকৃষ্ণ হালদার? বাড়িতে পুজো-টুজো হয়?

কু। তাই তো বললে। ঠিকানাটা ওর পকেটেই আছে।
বি। কী করে জানলে?
কু। ও-ই বলছিল। সেই ঠিকানাটা দেখিয়েই স্টেশনে জিজ্ঞাসাবাদ করে, পথের সন্ধান নেয়।
বি। তো বেশ তো, দ্যাখো না।

[কুটীরবাসী আগন্তুকের পকেট হাতড়ায়। বুক-পকেট থেকে খুচরো দুটি একটি মুদ্রা ও পাশের বাঁ পকেট থেকে রুমাল ভিন্ন আর কিছুই বেরোতে দেখা যায় না।]

কু। আরে, কোথায় গেল তবে?
বি। ঠিক শুনেছিলে?
কু। একদম ঠিক।
বি। তবে সেটা গেল কোথায়?
কু। তাই তো বুঝতে পারছি না।
বি। আমার ধারণা, ওটা বাজে কথা—আমার তখনি সন্দেহ হয়েছিল।
কু। মানে?
বি। মানে রতনকৃষ্ণ হালদার বলে কেউ নেই, থাকতে পারে না। কাছাকাছি এখন কোনো হালদার-বাড়ি নেই যেখানে পুজো হয়, অন্তত আমি শুনিনি বাবা।
কু। কিন্তু আমায় মিথ্যে-মিথ্যে একটা কথা বলে লোকটার লাভ?
বি। পাগলের আবার লাভ-লোকসান কী? তুমিই তো বলছিলে কী সব আবোলতাবোল বল্‌ছিল। আসলে লোকটার মাথার ঠিক নেই।
কু। না-না, এটা আমার কিন্তু বিশ্বাস করতে বাধছে...
বি। (সুটকেসটা দেখিয়ে) দ্যাখো তো বাক্সটার মধ্যে আছে কি না—চাবি তো দেওয়া নেই দেখছি।
কু। (দ্বিধার ভাবে) অন্যের বাক্স, খুলব?
বি। কেন খুলবে না? লোকটা তো মরে গেছে।

[কুটীরবাসী সুটকেস খোলে। একে-একে বেরোয় খবরের কাগজে মোড়া চন্দ্রপুলির ছোট হাঁড়ি, দুয়েকটা পরিষ্কার ধুতি-পাঞ্জাবি, কিছু গেঞ্জি ও জাঙিয়া, মুখ-ধোওয়া ও দাড়ি-কামানোর সরঞ্জাম, মাথার তেলের শিশি ও চিরুনি, দুটি ছোট তোয়ালে ও সুটকেস-এর পকেট থেকে একটি খাম।]

কু। (খাম তুলে ধরে) হয়তো তবে এর মধ্যেই আছে।
বি। দ্যাখো না!
কু। খুলব?
বি। খোলা তো আছেই।
কু। মানে ভেতরে হাত দেব?
বি। আঃ, কী মুশকিল! অতই যদি দ্বিধা তোমার তো দাও দেখি, আমায় দাও। (খামটা টেনে নিয়ে খুলে, ভিতরে তাকিয়ে) বাবা, এ যে দেখছি দশ টাকার নোট শুধু! (নোটগুলো বার করে, গুনতে গুনতে) এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ, ছয়, সাত, আট, নয়, দশ। (কুটীরবাসীর দিকে তাকিয়ে, বিস্ময়ে ও আনন্দে) তার মানে একশো টাকা! কত টাকা গো! এত টাকা একসঙ্গে কক্ষনো দেখিনি।

কু। কিন্তু আর কিছু আছে ভেতরে? কোনো কাগজ-ফাগজ?

বি। (খামের ভিতরে ভালো করে দেখে) কই, আর তো কিছু দেখছি না।

কু। আশ্চর্য! তাহলে ঠিকানার ব্যাপারটা তো কিছু বোঝা গেল না।

বি। বললাম তো তোমায়, যত সব বাজে কথা।

কু। (রাগের ভাবে) অমন বাজে-কথা বাজে-কথা করিসনে বলছি। বাজে কথা! বললেই হল। একটা লোক মরতে চলেছে, বাজে কথা বলে তার লাভ কী?

বি। অত-শত জানিনে বাপু, ঠিকানাটা কোথাও নেই, সেটাই মোদ্দা কথা।

কু। আশ্চর্য! রহস্য একটা। তবে কি আগাগোড়া জিনিসটাই লোকটার মনগড়া ব্যাপার?

বি। আমার তো তাই মনে হচ্ছে।

কু। কিন্তু না-না-না, সেটা কী করে বিশ্বাস করি...

বি। (নোটগুলো আবার গুনতে গুনতে) এক, দুই, তিন, চার...

কু। ও কী করছিস তুই?

বি। আচ্ছা, এর থেকে পঞ্চাশটা টাকা আমরা রেখে দিই, কেমন?

কু। রেখে দিই মানে?

বি। মানে আমরা নিয়ে নিই—পুজো এসে গেল, কত কাজে লাগবে।

কু। (স্তম্ভিতের ভাবে) হারামজাদী, এসব কী বলছিস তুই?

বি। (মুখ-ঝামটা দিয়ে) কেন বলব না গো? আমরা না নিলে পুলিশে নেবে, তার চেয়ে বরং আমরাই পাই। তবু তো বাকী পঞ্চাশটা টাকা ছুঁচ্ছিনে, যেমন ছিল তেমনি রেখে দিচ্ছি, নইলে আবার সন্দেহ জাগতে পারে। মানে আমরা পাই পঞ্চাশ, পুলিশ পাক পঞ্চাশ।

কু। (ঘৃণার ভাবে, দাঁতে দাঁত চেপে) কী জঘন্য মেয়েমানুষ একটা! (আদেশের সুরে) না, খবরদার, ও-টাকা তুই ছুঁবিনে, যেমন ছিল রেখে দে।

বি। (রাখতে রাখতে) বেশ, রেখে দিচ্ছি—যুধিষ্ঠিরের পুত্তুর তুমি...(হঠাৎ খবরের কাগজে মোড়া হাঁড়িটা দেখে) এটা কী গো?

কু। ওটা একটা হাঁড়ি, ওতে মিষ্টি আছে।

বি। তুমি তাহলে আগেই সব খুলে দেখেছ বলো?

কু। দেখব কেন? শুনেছি। লোকটাই বলছিল। কী মিষ্টি আছে, তাও বলে দিতে পারি।

বি। কী মিষ্টি?

কু। ক্ষীরের চন্দ্রপুলি, পেস্তা-বাদাম বসানো। লোকটা তাহলে মিথ্যে কিছু বলেনি রে, ঐ তো হাঁড়ি-ভর্তি মিষ্টি নিয়ে চলেছিল।

বি। (চোখ বড় বড় করে) ক্ষীরের চন্দ্রপুলি? পেস্তা-বাদাম বসানো?

কু। বিশ্বাস না হয় তো দ্যাখ্ না খুলে—লোকটার সত্যি-মিথ্যে সব যাচাই হয়ে যাবে। কিন্তু আস্তে আস্তে, ছিঁড়বিনে কিছু, কারণ ঐভাবেই আবার মুড়ে রাখতে হবে।

[বিধবা ধীরে ধীরে কাগজ সরায়, হাঁড়ি বেরিয়ে পড়ে—হাঁড়ির মুখটা শালপাতা দিয়ে ঢাকা, দড়ি দিয়ে বাঁধা। দড়ি খুলে শালপাতা তুলতেই চন্দ্রপুলি নজরে পড়ে, বিধবা হাঁড়ির কাছে মুখটা টেনে আনে, গভীরভাবে নিশ্বাস নেয়।]

বি। (গন্ধ শুঁকে) উঃ, কী সুন্দর! দেখি তো কেমন খেতে।

[একটা চন্দ্রপুলির কোনা ভেঙে বিধবা মুখে পুরে দেয়। সঙ্গে সঙ্গে কুটীর-

বাসী বিধবার হাতে সজোরে ধাক্কা মারে, মিষ্টির কণা মাটিতে পড়ে যায়।]

কু। এ কী করলি তুই রাক্ষুসী, সব্বনাশী—এটা কী করলি তুই?

বি। (বিস্ময়ে) বাবা, মিষ্টিতে একটু মুখ বসিয়েছি বলে এত কাণ্ড?

কু। নিশ্চয় কাণ্ড, একশো বার কাণ্ড—কেন তুই তোর পোড়ার মুখ ঐ মিষ্টিতে বসাতে যাবি?

বি। বাঃ, এখন এ-মিষ্টি খাবে কে?

কু। যে-ই খাক না, তোর তাতে কী? তুই খাবি নে।

বি। তো বেশ তো, খাব না তো খাব না, এই রেখে দিলাম। এখন পুলিশে খাবে, পুলিশের পেটে যাবে, হল তো?

কু। যে-ই খাক না কেন, যার পেটেই যাক না কেন, তোর পেটে যাবে না, কারণ এ-মিষ্টি ও তোর নাম করে আনেনি, এ-মিষ্টিতে তোর অধিকার নেই।

বি। তো যার নাম করে এনেছিল, তাকে এখন পাচ্ছ কোথায়?

কু। পাই বা না পাই, আমার ভারী বয়ে গেল—আমরা পাঁকের কৃমি, বুঝলি, এ-মিষ্টিতে আমাদের অধিকার নেই। এ-মিষ্টিগুলো ও কত ছোটো ছোটো ছেলেমেয়ের নাম করে এনেছিল—সে'রম ছেলেমেয়ে এ-জগতে থাক বা না থাক, অন্য যে-কেউ এ-মিষ্টি ছোঁবে, সে যত বড় পুলিশই হোক না, জানিস একদিন তাকে তার প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে, নাকের জলে চোখের জলে নাজেহাল হতে হবে। ওরে রাক্ষুসী, পোড়ারমুখী, মুখ্যু মাগী, তোকে বোঝাই কী করে, এ-মিষ্টি যে লোকটার বড় আশার মিষ্টি রে, বড় ভালোবাসার মিষ্টি রে!

বি। এসব কী যে বকছ তুমি আজ, আমি কিচ্ছু বুঝতে পারছি নে।

কু। তোর তো বোঝার নয়, তুই বুঝবি কী করে? রাক্ষুসে মাগী একটা, খাবার দেখেছিস কি ঝাঁপিয়ে পড়েছিস। সারা রাতের পরে মুখ ধোওয়া নেই, চোখে জল দেওয়া নেই, এদিকে ভোর হয়ে এল বলে—তবু তুই ঝাঁপিয়ে পড়বি, কারণ সামনে একটা খাবার রয়েছে। একবার ভাববি নে পর্যন্ত কী খাবার, কিসের খাবার, কার জন্যে এই খাবার, তোর ভারি বয়েই গেছে—রাক্ষুসে মাগী। (হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে, উঠে দাঁড়িয়ে) যা, তুই বেরিয়ে যা, বেরিয়ে যা আমার সামনে থেকে, আমার বাড়ি থেকে, আমার জীবন থেকে, আমার চিন্তা থেকে, আমার স্মৃতি থেকে, আমি তোকে আর সহ্য করতে পারছিনে। দ্যাখ্ আমি নিজে একটা জঘন্য লোক, কিন্তু বলতে পারিস, তাই বলে আরেকটা জঘন্য লোকের সঙ্গে আমি সারা জীবন বাস করব কেন, কী আমার এমন দায় পড়েছে? না-না, এভাবে আমি আর বাস করব না, তুই বেরিয়ে যা। আমার যা হয় হবে, আর এমনিতেই কীই বা হওয়ার ছিল এমন, এই তো জীবন, তবু আমি এই ডোবাটার ধারে একলাই পড়ে থাকব, একলাই মরব, তোকে নিয়ে মরার আমার কোনো দরকার নেই—জানি এখন থেকে আমার জীবনেও শুধু কাক ডেকে চলবে, আবর্জনায় দম বন্ধ হয়ে আসবে। আসে আসুক, যা হয় হোক, তুই বেরিয়ে যা। বেরিয়ে যা মাগী, রাক্ষুসী, সব্বনাশী, বেরিয়ে যা!

বি। (রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে, উঠে দাঁড়িয়ে) কী, এত বড় অপমান! কেন গা, কোথায় কী করেছি আমি, আজ তখন থেকে একটার পর একটা অপমান করে চলেছ? (চেঁচিয়ে) বেরিয়ে যা! তো হ্যাঁ রে হারামজাদা, একদিন ডেকে আনতে গিয়েছিলি

কেন, তোর বাড়িতে কে আসতে চেয়েছিল? (আবার ভেঙিয়ে) বেরিয়ে যা! বেশ, যাচ্ছি—এই চললাম (কুটীরের দিকে চলে যেতে উদ্যত)।

কু। যা, আর তোর যা-সব কাপড়চোপড় আছে, সব নিয়ে যা—কোনো চিহ্ন রাখবি নে।

[বিধবা রেগে মেগে কুটীরে ঢোকে, কুটীরবাসী মাথায় হাত দিয়ে বসে থাকে। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই বিধবা বেরোয়, হাতে তাল-গোল পাকানো দু-তিনটে থান ও একটা গামছা। বেরিয়ে আসার সময় কুটীরের দরজায় সজোরে শব্দ করে, চলে যেতে উদ্যত হয়।]

কু। (মাথা তুলে) শোন্!

বি। (থমকে দাঁড়িয়ে) আবার কেন?

কু। শোন্, রাগ করিসনে, যাসনে।

বি। কেন?

কু। (আক্ষেপের সুরে) কী হবে তোর গিয়ে! কোন্ মোক্ষটা আমি পাব? আমার তো কোনো মোক্ষ পাওয়ার নেই রে, তুই থেকেই যা। দেখলি তো আমার আগুনের দৌড়, একেবারে হাউইবাজির মতো, দেখতে দেখতে মিলিয়ে যায়। রঙচঙ খুব, কিন্তু উঠতে না উঠতেই যে-মাটি থেকে উঠল, সেই মাটিতেই পড়ে যায়—এত হাত-পা ছোঁড়া, এত আস্ফালন, সব বুজরুকি, হাউইবাজি তো, যাবে আর কদ্দুর? যাওয়ার আকাশ আমাদের নেই। তুই থেকেই যা, তোকে ছাড়া আমি থাকতে পারব না রে, শেষে এত আস্ফালন করে তোর দরজাতেই আবার ধন্না দেব—কী দরকার? তা ছাড়া লোকটা যে আমি কীরকম, কোন ধাতুতে গড়া, সেটা তো জানাই, সুতরাং খামাখা চেঁচামেচি কেন? (উঠে দাঁড়িয়ে, কাছে এসে, অনুনয়ের ভাবে) কিন্তু ঐ মিষ্টিটা তুই ছুঁবি নে —লক্ষ্মী আমার, সোনা আমার, ও-মিষ্টিটায় হাত তুই দিবি নে।

বি। (নরম হয়ে) বেশ, হাঁড়িটা ঠিক করে রাখছি।

[বিধবা হাঁড়ির মুখ বন্ধ করে, খবরের কাগজে সেটা মোড়ে, সুটকেস-এ রেখে দেয়।]

কু। (বিধবার কাছে এসে, আদরের ভাবে) তবে তুই থাকলি আমার সঙ্গে, আমরা দুজনেই রইলাম—কী বল্?

বি। (কুটীরবাসীর কানের কাছে মুখ এনে) আমায় বিয়ে করবে?

কু। বিয়ে? বেশ, করব।

বি। (আগ্রহের সঙ্গে) সত্যি করবে?

কু। সত্যি করব।

বি। কবে করবে?

কু। তা—বলিস তো আজই করব।

বি। আজ তো দিন নেই।

কু। তো আজ থেকে যেদিন প্রথম দিন আছে, সেদিনই করব।

বি। করবে?

কু। করব।

বি। (আনন্দে কুটীরবাসীকে জড়িয়ে ধরে) তুমি আমায় বিয়ে করবে, তুমি আমায় বিয়ে করবে। (ছেড়ে দিয়ে, আগ্রহের ভাবে) আর জানো?

কু। কী?

বি। আমাদের ছেলেপিলে ঠিক হবে, কিচ্ছু ভেবো না।

কু। (অন্যমনস্কভাবে) হবে?

বি। কেন হবে না? তিন বছর কিচ্ছু সময় নয়—কত লোকের তো দশ বছর বাদেও হয়। (কপালে জোড়হাত ঠেকিয়ে) হে মা কালী, হে মা কালী...

কু। (বিড়বিড় করতে করতে) হে মা কালী, হে মা কালী...

বি। (হেসে ফেলে) তুমিও বলছ?

কু। (অন্যমনস্কভাবে) না, লোকটাও বলছিল কি না, হে মা কালী, হে মা কালী...

বি। (বিরক্তির ভাবে) আবার ঐ লোকটা! একটা যত নষ্টের গোড়া। (হঠাৎ সচকিত হয়ে) ওঃ, চলো চলো, মড়াটা রেখে আসতে হবে না? ভোরের তো আর দেরি নেই।

কু। তাই তো, চল্ চল্।

বি। (আড়চোখে একবার সুটকেসটার দিকে তাকিয়ে) কিন্তু তুমি এই লুঙ্গি পরে যাবে?

কু। কেন?

বি। চলতে কষ্ট হবে না? শেষে লুঙ্গি সামলাবে না মড়া সামলাবে? আমি বলি কি একটা ধুতি পরে এসো, বেশ ভালো করে মালকোঁচা-টোচা বেঁধে।

কু। বলছিস?

বি। হ্যাঁ। তাড়াতাড়ি করো, আমি বসে আছি।

[কুটীরবাসী কুটীরের ভিতরে যায়। বিধবা সতর্কের মতো এদিক-ওদিক তাকিয়ে নেয়, পরে ঝাঁপিয়ে পড়ে সুটকেসটার উপর, সুটকেস খুলে টাকার থাম বার করে, তাড়াতাড়িতে যতগুলো নোট পারে নিয়ে নেয়, একইভাবে হাঁড়ি খুলেও গোটা দশেক চন্দ্রপুলি তুলে নেয়, একটা চন্দ্রপুলি মাটিতে পড়ে যাওয়াতে "আ মরণ" বলে একবার, পরে বার-করা টাকার নোট ও চন্দ্রপুলি আঁচলে বাঁধে, বাকী টাকা ও মিষ্টি যথারীতি সাজিয়ে সুটকেস-এ রেখে দেয়, সুটকেস বন্ধ করে ও দূরে সরে এসে চুপ করে বসে থাকে। অচিরেই কুটীরবাসী বেরিয়ে আসে, পরনে ধুতি ও গেঞ্জি। আঙিনায় লণ্ঠনটা জ্বলছিল, কুটীরবাসী কাঁচ তুলে ফুঁ দিয়ে নিবিয়ে দেয়। হঠাৎ একসঙ্গে যেন অনেকগুলো কাক ডেকে ওঠে।]

কু। (সন্ত্রাসের ভাবে) ঐ আবার কাক ডাকছে দ্যাখ্!

বি। (হেসে) তোমার কী হল বলো তো আজ—ভোর হচ্ছে, কাক ডাকবে না? রোজই তো ডাকে।

কু। কিন্তু এতগুলো কাক এক সঙ্গে? আর এত জোরে, এমন বিচ্ছিরি আওয়াজ করে?

বি। তুমি ঘুমিয়ে থাকো বলে শোনো না, নইলে রোজই ডাকে।

কু। কিন্তু পাখিও তো ডাকে—কই, আজ তো ডাকছে না?

বি। ডাকবে গো ডাকবে—আরেকটু আলো ফুটুক, সময়টা আসতে দাও।

কু। ডাকবে?

বি। নিশ্চয় ডাকবে। নাও, চলো এবার, মড়াটা তোলা যাক।

কু। চল্।

বি। (হঠাৎ কাছে এসে, আদরের ভাবে) বিয়ে করবে?

কু। করব।

বি। মড়াটাকে সাক্ষী করে বলো।

কু। সাক্ষী করে বলছি।

বি। (আনন্দে আত্মহারা হয়ে) ওঃ লক্ষ্মী আমার সোনা আমার, তুমি আমায় বিয়ে করবে?

কু। বিয়ে করব।

বি। (মন্ত্রের মতো, গদগদ হয়ে) তুমি আমায় বিয়ে করবে...

কু। বিয়ে করব...

[ভোরের পূর্বাভাস দেখা যাচ্ছে। ওরা কথা বলতে থাকে, যবনিকা পড়ে। বহু কাকের ডাক শোনা যায়, ডেকেই চলেছে।]

আধুনিক সাহিত্য

"যুবক যুবতীরা" (১৩৭৩) উপন্যাসের গোড়ায় সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় বলেছেন : 'এই উপন্যাসটি আমি লিখতে শুরু করি দশ বছর আগে। পরে, নানা সময়ে বিচ্ছিন্নভাবে লিখে শেষ করা। সেই জন্য, সর্বত্র হয়তো ভাষায় সমতা নেই। প্রকাশের আগের মুহূর্তেও যতদূর সম্ভব সংশোধন করেছি।' এছাড়া "অন্য মনে" (১৩৭৬) পত্রিকাটিতে এক সাক্ষাৎকারে তিনি জানিয়েছেন : '"যুবক যুবতীরা" উপন্যাসটি বিদেশে থাকাকালীন রচিত —"উত্তর তরঙ্গে" প্রকাশিত। শ্রদ্ধেয় সাগরময় ঘোষ "আত্মপ্রকাশ" লিখতে বলেছিলেন।'

এই কথাগুলো থেকে বোঝা যে "আত্মপ্রকাশ" প্রথম বই হ'য়ে বেরোলেও সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের রচিত প্রথম উপন্যাস "যুবকযুবতীরা"ই। তার পরে খুবই অল্প দিনের মধ্যে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের আরো পাঁচটি উপন্যাস বই হ'য়ে বেরিয়েছে : "সুখ অসুখ", "অরণ্যের দিনরাত্রি", "হৃদয়ে প্রবাস", "প্রতিদ্বন্দ্বী" ও "সরল সত্য"। এই তালিকার মধ্যে কেবল দুটি বইকে ধরা হয়নি : এক। "সোনালি-দুঃখ"—কারণ নতুন অন্তরাখ্যান থাকলেও সেটা আসলে ট্রিস্টানকাহিনীরই পুনর্কথন; আর দুই। "রুপালি মানবী"—কারণ সেটা আসলে বৈদেশিক পটভূমিকায় রচিত কতগুলো বিচ্ছিন্ন ছোটোগল্পের যোগসাজস। এ দুটি বইকে আমাদের আলোচনা থেকে আপাতত বাদ দিলেও দেখতে পাবো যে 'প্রথম' উপন্যাস "আত্মপ্রকাশ" বেরিয়েছে নভেম্বর ১৯৬৬-এ, আর সপ্তমটি অর্থাৎ "সরল সত্য" বেরিয়েছে নভেম্বর ১৯৬৯-এ। মাত্র তিন বছরের মধ্যে এতগুলো উপন্যাসের প্রযোজনা লেখকের অবিরাম ও অবিরল সৃষ্টিশীলতা প্রমাণ ক'রে দেয়। বোধ হয় কোনো অন্তর্লীন আবেগ বা তাগিদের ফলেই এটা সম্ভব হয়েছে, আর এই অনুমান যে মিথ্যে নয় তার কারণ উপন্যাসগুলোর অধিকাংশেরই প্রসঙ্গ ও বিষয়বস্তুর মিল।

কী ক'রে সরলতা হারিয়ে যায়, বেশিরভাগ উপন্যাসেরই তা প্রধান প্রসঙ্গ। এবং বারে-বারে এই প্রসঙ্গ নিয়ে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় এমনই অবিশ্রাম লিখতে চেয়েছেন যে মনে হয় তাঁর কাছে এই প্রসঙ্গটির একটি বিশেষ গুরুত্ব আছে। "অন্য মনে"র (শরৎ ১৩৭৬) সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন : 'কবিতাই বলুন, বা গল্প-উপন্যাসই বলুন, আমি সাহিত্যে একটা জিনিসই আনতে চাইছি—সেটা হচ্ছে 'কনফেসন্যাল' সাহিত্য, একান্ত ব্যক্তিগত প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ছাড়া তা' হয় না।' এবং সরলতা হারিয়ে ফেলার মতো 'একান্ত ব্যক্তিগত প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা' আর কীই বা আছে? আর এই অভিজ্ঞতাকে কেন্দ্র ক'রেই তাঁর বেশির ভাগ উপন্যাসে রচিত হয় কাহিনীর আবর্ত, চরিত্রের টানাপোড়েন, বিভিন্ন অসহায় পরিস্থিতি। তার ফলে অনেক সময়েই দেখা যায় তাঁর ভিন্ন ভিন্ন উপন্যাসে একই ঘটনা ভোল পালটে ফিরে এসেছে। একটা দৃষ্টান্ত নেয়া যাক।

"আত্মপ্রকাশ" উপন্যাসের অনেকখানি অংশ জুড়ে আছে হারানো সরলতাকে ফিরে পাবার জন্য সুনীলের হাহাকার। বাচ্চা মেয়ে যমুনাকে সেইজন্যেই সে ভেবেছিলো সরলতার দিব্য প্রতিভাস—ভেবেছিলো কথাটিতে জোর দিতে চাই, কারণ যমুনাকে সুনীল যতটা অনভিজ্ঞা ও অপাপবিদ্ধা ভেবেছিলো সে মোটেই ততটা সরলা ছিলো না, বেশ পাকা ও

'স্বাভাবিক' ছিলো সে। কিন্তু লুপ্ত সরলতার জন্য হাহাকার ছিলো যার, সেই সুনীলের কাছে মনে হয়েছিলো অন্তত এই একটা জায়গা থাক, যে-সরলতার কল্পনাতেও তার কাছে হারানো শৈশবস্বর্গ ফিরে আসবে। পরে, যখন স্বভাবতই সুনীল তার বন্ধুদের সঙ্গে ভিখারি-ভিখারি খেলায় ব্যস্ত, তখন একবার সে এমন এক নীল গাড়ির কাছে এসে 'মুখের চেহারা খুবই করুণ করে তুলে' ভিক্ষা চাইলো, যার জানলার পাশে বসেছিলো যমুনা। তারপর :

'সঙ্গে সঙ্গে আমি চট করে ফিরে এলাম। অবিনাশ যমদূতের মতন দাঁড়িয়েছিল কাছেই, বললো, চেষ্টা না করেই ফিরে এলি যে! যা! আমি বললুম, না, আমি এবার যাবো না। যা—না—বলে অবিনাশ আমাকে ঠেলে দিল গাড়িটার কাছে। আমি কোনোক্রমে গাড়ির বডিতে হাত রেখে ঝোঁক সামলে নিলাম। যমুনা দেখতে পেয়ে বললো, একি সুনীলদা!

'আমি সঙ্গে-সঙ্গে হাসিমুখে বললাম, যমুনা, তোমায় কতদিন পরে দেখলুম। ভালো আছো?

'গাড়িতে যমুনা ও সরস্বতী, আর একজন অচেনা বিবাহিতা নারী এবং একজন পুরুষ। যমুনা আজ আবার লাল রঙের পোশাক পরেছে, শরীরে সেই লাল আভা। পুরুষটি প্রশ্ন করল্মে, আপনি গাড়িতে উঠবেন? সরস্বতী বললো, ড্রাঙ্ক! ড্রাঙ্ক! মুন্নি, কাঁচ তুলে দে!

'যমুনা বললো, সুনীলদা, গাড়িতে আসবেন? আসুন না।

'আমি যমুনার দিকে খুবই স্নেহময় হাসি দিয়ে বললুম, যমুনা, আমার টাকা হারিয়ে গেছে, আমাকে পাঁচটা টাকা দাও তো। গাড়িতে উঠবো না।

'—পাঁচ টাকা তো নেই। এক টাকা আছে—

'—মুন্নি, কাঁচ তুলে দে—

'—না, আমার পাঁচ টাকাই চাই—

'—মুন্নি, কাঁচটা তুলে দে না!

'আর সময় নেই, আর সময় নেই, এক্ষুনি লাল থেকে সবুজ হবে। মজার ব্যাপার এই, সরস্বতীও আজ পরেছে সবুজ শাড়ী, একেবারে মিলে যায় দেখছি। আমি অধৈর্য হয়ে বললুম, ঠিক আছে যমুনা, তুমি একটা টাকাই দাও! ওতেই হবে!

'কিন্তু আর কথা শোনা গেল না, হুস করে গাড়ি ছেড়ে দিল।'

"সরল সত্য" উপন্যাসের মধ্যে অংশুমান দত্তর সঙ্গে ছেলেবেলা থেকেই প্রচণ্ড লড়াই ছিলো মিহিরের। মিহির ছিলো স্কুলের 'বুলি', উভকামী, সব রকম অন্যায়ের প্রতি-মূর্তি। সে পরে অংশুর প্রেমিকাকে বিয়ে করলো, উৎকোচ নিতে বাধ্য করলো অংশুকে —সবদিক থেকে তাকে নুইয়ে ফেললো। এই অবস্থায় কাহিনী এগুচ্ছে, এক রাত্রে, বারোটাও বাজেনি, গুণ্ডারা আক্রমণ করলো অংশুকে, তার ঘড়ি-ব্যাগ সব ছিনিয়ে নেবে ব'লে। অংশু গোড়ায় লড়তে চাচ্ছিলো তাদের সঙ্গে, কোমর থেকে বেল্টটা খুলে ঘোরাতে-ঘোরাতে চ্যাঁচাচ্ছিলো : পুলিশ! পুলিশ!

তারপর :

'এক ঝটকায় বেল্টটা আমার হাত থেকে কেড়ে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েই সে তার জামার তলা থেকে ছুরি বার করলো। লম্বা, ফলা-বেঁকানো ছুরি। আমার পিছনে দেয়াল, আর পালাবার উপায় নেই, আমি স্থির চোখে লোকটার দিকে তাকালুম, এই প্রথম ভয়ে আমার

গলা শুকিয়ে এলো। ঘড়িটা চাওয়া মাত্রই খুলে দিয়ে দেওয়া উচিত ছিল আমার। কলকাতা শহরে এটাই নিয়ম—তা কি আমি জানি না!...

'এখন ছুরি-হাতে ঐ লোকটার চোখ দেখে আমার রক্ত হিম হয়ে এলো। এই যেন সাক্ষাৎ মৃত্যু! কি মারাত্মক হিংস্র সেই চোখ দুটো, সেখানে দয়া নেই, মায়া নেই, কোনো-রকম দুর্বলতা নেই, শাদা দাঁতগুলো ঝলসে সে বললো, এবার শালা? খুব চাবুক কষিয়েছিস! হারামির বাচ্চা—

'ঝুপ করে একটা কালো অ্যাম্বাশেডর গাড়ি এসে থামলো, সঙ্গেসঙ্গে সেটার দরজা খুলে একজন বলিষ্ঠ চেহারার লোক নেমে এলো, হাতে তার একটা লোহার হ্যান্ডেল, বিকট চিৎকার করে সে তেড়ে এলো গুণ্ডাগুলোর দিকে। ছুরিওয়ালা লোকটার পিছন দিক থেকে কাঁধে ঝাড়লো রডের বাড়ি, সে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল, তারপর অন্য দুটোর দিকে ফিরে বললো, আয়, দেখি কে কত গুণ্ডা আছিস! আয় শালারা—

'আমি হতবাক হয়ে আমার উদ্ধারকারীর দিকে চেয়ে দেখলাম। আর কেউ নয়, মিহির। হাতের রডখানা বোঁ বোঁ করে ঘোরাতে লাগলো মিহির। দু'জন গুণ্ডা ছুটে পালালো, ছোরাওয়ালা পালাতে পারেনি, মিহির তার কলার চেপে টেনে তুললো, ইতিমধ্যে কোথা থেকে লোকজন এসে বেশ একটা ভিড় জমিয়ে ফেললো। হাঁপাতে হাঁপাতে মিহির আমাকে বললো, কি রে, তোর লাগেনি তো! গাড়িতে নবনীতা বসে আছে, ও-ই প্রথম তোর চিৎকার শুনতে পায়, বললো, গলাটা চেনা-চেনা!—

'কনস্টেবলের হাতে গুণ্ডাটাকে স'পে দিয়ে মিহির ভিড় ঠেলে আমাকে নিয়ে এলো গাড়ির কাছে। গাড়ির মধ্যে অন্ধকার আলো করে নবনীতা বসে আছে। নবনীতা মিষ্টি করে হেসে বললো, আপনার কিছু হয়নি তো?'

এই দুটি ঘটনার মধ্যে বাইরের কোনো মিল নেই—কিন্তু ভিতরে-ভিতরে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের চিন্তার মধ্যে কোথাও নিশ্চয়ই একটা যোগসাজস আছে। না-হ'লে সরলতার অবসান ব্যাপারটা ফুটিয়ে তোলবার ঠিক আগেই কেন 'দৈবাৎ' এমনভাবে তাদের সঙ্গে দেখা হ'য়ে যায়, যারা হয়তো-বা লুপ্ত সরলতাকে ফিরিয়ে দিতে পারতো? আরো মজা : "আত্মপ্রকাশ"-এ গাড়িতে আরো বসেছিলো সরস্বতী, যে সুনীলকে সুযোগ দেয়নি; 'সরল সত্য'য় গাড়ি থেকে নেমে এসে অংশুকে বাঁচালে মিহির, যে নবনীতাকে কেড়ে নিয়ে গিয়েছিলো।

কিন্তু শুধু এ-রকম গোপন সংযোগই তাঁর উপন্যাসে পৌনঃপুনিক নয় : আছে আরো বাস্তব, প্রাত্যাহিক, ছোটো-ছোটো টুকরো-টুকরো ঘটনা। প্রায় দলিলের মতো, তথ্যচিত্রের মতো অবিকল দৈনন্দিন জীবনের প্রতিচ্ছবি : ট্রামে বাসে চড়া, ইন্টারভিউয়ের বিবরণ, একাধিক দোন কিহোতির মতো মারামারির বর্ণনা। আর আস্তে আস্তে পুরো পরিকল্পনার মধ্যে তারা বেমালুম মিশিয়ে যায়, আভ্যন্তরীণ অর্থে ভ'রে ওঠে, অসহায় দিনরাত্রিগুলিকে ফুটিয়ে তোলে। মানুষের প্রতি মানুষের তাচ্ছিল্য, একজনের আরেক-জনকে মাড়িয়ে চ'লে যাওয়া—সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাসে এ-সব প্রসঙ্গও পৌনঃ-পুনিক। এইজন্যই এদের বারংবার উল্লেখে যে সরলতা হারিয়ে ফেলার পিছনে এখনকার সমাজের এই দিকগুলিও অবিশ্রামভাবে সক্রিয়।

'এই উপন্যাস বর্ণিত জীবন কাল্পনিক নয়, কিন্তু চরিত্রগুলি সব কটিই মনগড়া। উদ্দেশ্যহীন, আদর্শহীনভাবে আমি কয়েকজন সরল যুবক-যুবতীর নিষ্পাপ জীবনের

কথা ফোটাতে চেয়েছি।' এই কথাগুলো সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় বলেছিলেন "যুবক যুবতীরা" সম্বন্ধে। কিন্তু এক অর্থে সব উপন্যাসের বেলাতেই এই কথাগুলো প্রযোজ্য। 'সরল', 'নিষ্পাপ', 'উদ্দেশ্যহীন', 'আদর্শহীন'—প্রত্যেকটি কথাই তাঁর মূল পরিকল্পনা থেকে উদ্ভূত। অবিনাশ আর পরীক্ষিৎ—দুজন তরুণ লেখক বন্ধু অনিমেষের কাছে বেড়াতে গিয়েছে মফঃস্বলে, দুপুরবেলা, অনিমেষ আপিশ গেছে, পরীক্ষিৎ দিবানিদ্রায় মগ্ন, পাশের ঘরে অনিমেষের স্ত্রী গায়ত্রী শেলাই করছে। অবিনাশ পাশের ঘরে গিয়ে গায়ত্রীর সঙ্গে প্রেম ক'রে এলো। অনায়াস, সরল, উদ্দেশ্যহীন সঙ্গম—প্রায় অচেনা দুটি যুবক-যুবতী, প্রেম করার আগে ভালোবাসা কথাটিও কেউ একবার উচ্চারণ করেনি, এমনই উদ্দেশ্যহীন। কিন্তু এই ঘটনাটি যেভাবে সাজানো হয়েছে, তাতে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের লেখার কতগুলি সূত্র চোখে পড়ে যায়। "অন্যমনে"র সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছিলেন : 'ব্যক্তিগতভাবে আমি চিনি নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারকে—আমি তাই নিয়েই লিখবো।' এই উপন্যাসের গোড়াতেও বলেছিলেন, 'বর্ণিত জীবন কাল্পনিক নয়'। সুতরাং ধ'রেই নেয়া যায় নিম্নমধ্যবিত্ত কতগুলি সংস্কার ও মূল্যবোধকে ঘিরে পুরো ব্যাপারটিকে তিনি বুনতে চাচ্ছেন। অবিনাশ ও গায়ত্রীর সঙ্গম সরল ও নিষ্পাপ, কেননা উদ্দেশ্যহীন—যদি যুক্তির পারম্পর্য এই রকম হ'য়ে ওঠে তা'হলেই বোঝা যায় 'সরল' ও 'নিষ্পাপ' এই শব্দটির সামাজিক সংজ্ঞার্থের সঙ্গে তাঁর সংঘাত। আর তাঁর 'বর্ণিত জীবনে' অর্থাৎ 'নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারে' এই সংঘাত 'কাল্পনিক নয়'—এটাই সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের দাবি। সব ভেঙে যাচ্ছে কি-রকম, পালটে যাচ্ছে পুরোনো মূল্যবোধ, নতুন কিছু গ'ড়ে উঠছে না—যদি না প্রায় বয়ঃসন্ধিকালের মতো কেউ সরল শৈশবের উৎকাঙ্ক্ষায় দপ ক'রে জ্ব'লে ওঠে। এই সমাজের বিরুদ্ধে এক ধরনের প্রতিবাদ যেন। সেইজন্যেই তাঁর বেশির ভাগ উপন্যাসে প্রধান পাত্রপাত্রীর বয়েসের গণ্ডি চোখে পড়ার মতো। বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ ধাপের ছাত্র কেউ, কেউ-কেউ বা পাশ-টাশ ক'রে চাকরি করছে, কেউ-বা পাশ করার পরে বেকার। আরো কতগুলো সাদৃশ্য চোখে পড়ে। ছেলের সঙ্গে বাবার সংঘর্ষ : "অরণ্যের দিনরাত্রি"তে অসীম যখন বলে তার বাবা কীভাবে ডিফেন্স ফান্ডে মোটা চাঁদা দিয়ে ও প্রভাব খাটিয়ে মোটর দুর্ঘটনা থেকে তাকে সাজা পাওয়ার হাত থেকে বাঁচিয়ে দিয়েছিলেন, "সরল সত্য"র মধ্যে অংশুর বিধবা পিশিকে তার 'ঘুষখোর' নীতিবাগীশ বাবা দূর-দূর ক'রে তাড়িয়ে দিলেন, তখন মনে প'ড়ে যায় 'আত্মপ্রকাশ' উপন্যাসে সুনীলের সঙ্গে তার বাবার সম্পর্কের কথা। পুরোনো মূল্যবোধের সঙ্গে সংঘাতের ছবিগুলো এমনি সহজ-ভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়—কিন্তু মূল্যবোধগুলো যেমন নিম্নমধ্যবিত্তের, প্রতিবাদের ও সংঘাতের ধরনগুলোও অনেকটা তেমনি। আর সব সময়েই আছে ছেলেবেলার জন্য আকুলতা; "প্রতিদ্বন্দ্বী"তে বর্ণনা আছে বাবা যখন বেঁচে সিদ্ধার্থরা বাড়িশুদ্ধ সবাই দেওঘর বেড়াতে গিয়েছিলো একবার, পুজোর ছুটিতে। তখন :

'সিদ্ধার্থ প্রত্যেকদিন সকালবেলা তপু আর টুনুকে নিয়ে নন্দন পাহাড়ে বেড়াতে যেতো। অল্প-অল্প শীতের মিষ্টি হাওয়া, চারদিকে এমন একটা টাটকা ভাব যেন মনে হতো, পৃথিবীর হাওয়ায় আর একটুও ধুলোবালি নেই, প্রত্যেকটি নিশ্বাসের পরিষ্কার বাতাস বুকের ভেতরটা পর্যন্ত ধুয়ে মুছে দিয়ে আসছে। গাছের পাতা থেকে টুপটুপ পড়ছে শিশিরের জল, পায়ের তলায় ঘাস চুপচুপে ভিজে, তার ওপর দিয়ে হেঁটে যাওয়ায় এক ধরনের মাদকতা ছিল। সিদ্ধার্থর এখন মনে হয়, তখন, সেই ছ-বছর আগেকার

দেওঘরে সে যেন দেখেছিল ঘাস ও গাছপালার রং অনেক বেশি গাঢ় সবুজ, ভোরবেলায় আকাশ টকটকে নীল, লালচে রঙের রাস্তাটাও ছিল ঝকঝকে পরিচ্ছন্ন—যেন তার উপর শুয়ে থাকা যায়, কোথাও কোনো মলিনতা ছিল না।'

এই গাঢ় সবুজ রঙের গাছপালা ও টকটকে নীল আকাশের বর্ণনা আছে "আত্মপ্রকাশ" আর "সরল সত্য"তেও—আর সবখানেই এটা বলা আছে তা আর ইহজীবনে দেখা যাবে না—চিরকালের মতো তা হারিয়ে গিয়েছে। আর যখন এইভাবে এ-সব তথ্য সাজানো হয় তখন গাছপালার এই শ্যামলিমা, আকাশের এই স্বচ্ছ নীলিমা কেমন যেন বদলে যায়।

বদলে যায় এইজন্য যে মানুষের সমাজে ঘুষ চলে, দুর্নীতি চলে, মেয়ে ব'লে হায়ার-সেকেন্ডারি পাশ ক'রে কেউ চাকরি পেয়ে যায় অথচ বি.এস-সি. পাশ ক'রে স্বাস্থ্যবান ও নির্দোষ একটি ছেলে কোনো কাজ পায় না। এই সমাজে মানুষ মানুষকে এমন তাচ্ছিল্য করে যে ইন্টারভিউ দিতে ডেকে এনে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অবহেলাভরে দাঁড় করিয়ে রাখে, আবোলতাবোল এলোমেলো অপ্রয়োজনীয় প্রশ্ন ক'রে অপমান করে, বাস থেকে নামবার সময় লোকে অন্য লোককে মাড়িয়ে চ'লে যায়, রাস্তা পেরুতে চাচ্ছে কোনো অন্ধ, তাকে কেউ পার করিয়ে দেয় না। আর 'এইভাবেই দিনটিন কেটে যায় আর কি'।

বলতেই হয় সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাসের প্রধান প্রসঙ্গ আমাদের এখনকার সময়কে তীব্রভাবে ছুঁয়ে আছে। আর তার ফলেই তাঁর উপন্যাসগুলো অনেক অতৃপ্তি সত্ত্বেও আমাদের স্পর্শ ক'রে যায়।

অতৃপ্তির কারণ আছে। এমনিতে—মানতেই হয়—সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাস কাহিনী বা আখ্যানসম্বল নয়, প্রসঙ্গনির্ভর। অর্থাৎ পাকানো জটগুলো ছাড়ানো হয় না সব সময়, বেশির ভাগ চরিত্রই ছাঁচে ফেলে গড়া হয়, পরিস্থিতি কখনো-কখনো অতিনাটকীয় বা উচ্ছ্বাসসমাকুল। যাকে নিটোল কোনো আখ্যান বলা যায়, সবগুলো সমস্যারই যেখানে সমাধান ক'ষে বার ক'রে ফেলা হয়েছে, এমন বস্তু সম্ভবত সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় তৈরি করতেই চাচ্ছেন না—শুধু সমাজের কতগুলো দিকের ঢাকা খুলে ফেলতে চাচ্ছেন হয়তো। না-হলে উপন্যাস সম্বন্ধে তাঁর ধারণা খুবই প্রচলনির্ভর; তাঁর উপন্যাস এগোয় টুকরো-টুকরো ঘটনা ও পরিস্থিতি জুড়ে-জুড়ে—শুধু প্রধান চরিত্রটি তার বিবর্তমান প্রতিক্রিয়ার সূত্রে সবকিছুর মধ্যে যোগাযোগ রচনা ক'রে দেয়।

কোনো তরুণ লেখকের কাছে আমাদের দাবি অনেকখানি। কেবল যে তাঁর প্রসঙ্গ বা বিষয়বস্তুই আমাদের আকৃষ্ট করবে, তা নয়—তাঁর প্রকরণগত পরীক্ষানিরীক্ষাও আমাদের তাঁর সম্বন্ধে উৎসুক করবে। বলতেই হয়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাসে রচনাভঙ্গি-জনিত কোনো বিস্ময় বা আকর্ষণ নেই। প্রচলিত উপন্যাসের ধরনে প্রযোজিত ব'লেই ছাঁচে-ফেলা চরিত্র বা উচ্ছ্বাসময় পরিস্থিতি দেখলে আমাদের অস্বস্তি হয়—না-হ'লে, উপন্যাসের প্রাকরণিক তাৎপর্য অন্যরকম হ'লে, এ-সব চরিত্র বা পরিস্থিতিও দিব্যি মানিয়ে যেতো।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় যখন প্রথম কবিতা লিখতে শুরু করেছিলেন, তখন ছন্দে-মিলে তাঁর দক্ষতা ছিলো, চাতুরীও ছিলো যথেষ্ট, কিন্তু তবু পাঠকের কাছে তাঁর স্বাতন্ত্র্য উদ্ঘাটিত হয়নি—কারণ তখন তিনি প্রচলনির্ভর প্রসঙ্গ ও প্রকরণ ব্যবহার করতেই অভ্যস্ত ছিলেন। কিন্তু আস্তে-আস্তে বদলে গেলো তাঁর কবিতার জগৎ, প্রসঙ্গ হ'য়ে উঠলো সত্যিকার অর্থে 'কনফেশন্যাল', প্রকরণগত পরিবর্তনও অগোচর রইলো না। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ই হ'য়ে উঠলেন। "কৃত্তিবাস"-সম্পাদনার, গোড়ার দিকে

অন্য পাঁচটা কাগজের থেকে তাকে আলাদা ক'রে শনাক্ত করার কোনো উপায় ছিলো না—কিন্তু হঠাৎ সম্পাদনার পদ্ধতি বদলে গেলো আমূল, "কৃত্তিবাস" বলতে বিশেষ একটি ধারণার জন্ম হ'লো। তাঁর উপন্যাসও এবার বিশেষ হ'য়ে উঠুক, বিশিষ্ট হ'য়ে উঠুক, স্বতন্ত্র হ'য়ে উঠুক—প্রকরণের দিক থেকেও, চিন্তার দিক থেকেও। চেনা যাক, যে, যে-সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় কবিতা লেখেন, তিনিই এই উপন্যাসগুলো লিখেছেন—অন্য-কেউ নন। কবিতা লেখার সময় একরকম, আর উপন্যাসের বেলায় আরেক রকম—সত্যি তো এমনভাবে কেউ টুকরো-টুকরো ব্যক্তিত্ব হ'য়ে যায় না।

এখানে স্পষ্ট বলা ভালো সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের গদ্য চিরকাল আমার ঈর্ষা জাগিয়েছে। সোজা সরল ভাষা, ভঙ্গিটা ঋজু, তেজিয়ান, ইচ্ছাকৃতভাবে উদাসীন—এবং কোথাও অহেতুক কোনো কবিত্ব করা নেই : কি প্রবন্ধ, কি গল্প-উপন্যাস—সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় প্রথম সাফসুফ কথা বলবার পক্ষপাতী। নেই বাক্যবন্ধের জটিল ও পাকানো সাত-হাত-লম্বা প্যাঁচ, নেই পাণ্ডিত্যের নখদর্পণে ত্রিসংসারের যাবতীয় বস্তুর প্রতিভাস, নেই অবিরল ব্যুৎক্রমের ন্যাকামি, নেই প্যারেনথিসিস ক'রে মাঝখানে মনের অবচেতন উৎকাঙ্ক্ষার উৎক্রমণ কি দূরবর্তী অথচ গুপ্তসংযোগে ঘনিষ্ঠবদ্ধ কোনো অন্তর্গূঢ় বিকীর্যমান উল্লেখ। তাঁর গদ্য সোজাসুজি চোখের দিকে তাকায়। কিন্তু এই গদ্য 'একেবারে নিজস্ব' কোনো উপন্যাসে ব্যবহৃত হচ্ছে না দেখলে কষ্ট লাগে।*

মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

---

* সরল সত্য—সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। আনন্দ পাবলিশার্স (প্রাঃ) লিমিটেড। ৫ চিন্তামণি দাস লেন। কলিকাতা ৯। মূল্য পাঁচ টাকা।

স মা লো চ না

The Heart-Keeper. *By* Francoise Sagan. John Murray. 21*s.*

যখন একটিমাত্র উপন্যাস লিখে ফ্রাঁসোয়া সাগাঁ বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন, তখন মনে হয়েছিল, পাঠকদের হাতে তিনি একখানি দর্পণ তুলে দিয়েছেন—যৌবনের শরীরের প্রান্তরেখাগুলির তীক্ষ্ণতার প্রতিভাস ধরা পড়েছিল। সেই আয়নার ফ্রেমে লেখিকার বয়েস লেখা ছিল। তারপর তাঁর বয়েস বেড়েছে, অনেকটা পথ অতিক্রম করে এসেছেন, আরো কয়েকটি উপন্যাসে কিছু নতুন বিষয় স্পর্শ করতে চেয়েছেন, আর অতি-দ্রুত অর্জিত সেই বিপুল জনপ্রিয়তা তাঁকে অনুসরণ করে এসেছে ছায়ার মতন। জন-প্রিয়তা উৎকর্ষের মাপকাঠি নয়, বলা বাহুল্য। তথাপি *Bonjour Tristesse* প্রথম প্রকাশ-কালে অজস্র বয়স্কমনকেও যে তৃপ্তি দিয়েছিল সেটাই মনে রাখবার মতন কথা। ইতিমধ্যে সে বইটির ষাট লক্ষাধিক কপি বিক্রি হয়ে গিয়েছে—এ-খবরে বড়জোর চমকে ওঠা যায়। এ-খবর অন্য কিছু, গভীর কিছু, প্রমাণ করে না। তবে আমরা চমকে উঠি, কারণ আমাদের ভাষায় লেখা উপন্যাসের জন্য সারা পৃথিবীতে পাঠক নেই। একালে প্রকাশিত একখানি সার্থক বাংলা উপন্যাসের দু'হাজার কপি বিক্রি হলে আমরা খুশী। বাংলাভাষার লেখক বলেই এই সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করা আমাদের পক্ষে কোনদিন সম্ভব না। অথচ ফ্রাঁসোয়া সাগাঁর *The Heart-Keeper*-এর মতন উপন্যাস বাংলা ভাষায় শুধু শারদীয় পত্রিকায় প্রতি বছর কয়েকখানা করে লেখা হয়। তার মধ্যে আবার দু-একটির পুস্তকাকারে প্রকাশের সৌভাগ্য হয় না বেশ কয়েক বছর।

বিদেশের পত্রিকায় ইদানীং চিত্রনাট্য প্রকাশিত হচ্ছে। চলচ্চিত্র যেমন সাহিত্য নয়, তেমন চিত্রনাট্যও সাহিত্য নয়, অন্তত সাহিত্যের একটি শাখারূপে স্বীকৃতি পায় নি। অথচ চিত্রনাট্যপাঠকের সংখ্যা বাড়ছে এবং তাঁরা চিত্রনাট্য পড়ে নাকি সাহিত্যপাঠের আনন্দ পাচ্ছেন। এসবের পর এখন আমাদের দেশেও সংগত কারণে বিশিষ্ট পত্রিকায় বিশেষ বিশেষ চলচ্চিত্রের চিত্রনাট্য ছাপা শুরু হয়েছে। এই প্রসঙ্গটি আসছে এই কারণে যে, দেশেবিদেশে এমন কিছু উপন্যাস প্রকাশিত হচ্ছে যেগুলি আসলে চিত্রনাট্যের মতন উপন্যাস। এই ধরনের উপন্যাস পড়লে মনে হয়, লেখক অথবা লেখিকা মূলত চলচ্চিত্রে রূপায়ণের কথা ভেবেই লিখেছেন। কোনো নতুন ধর্ম তৈরির চেষ্টা নয়, তেমন কোনো উদ্দেশ্য কোথাও কেউ প্রকাশ করেছেন বলেও জানি না, বস্তুত সাহিত্যসৃষ্টি প্রধান লক্ষ্য নয়, লক্ষ্য চলচ্চিত্র। আমার মনে হয়েছে, ফ্রাঁসোয়া সাগাঁর *The Heart-Keeper* তেমন একখানি উপন্যাস।

কয়েকটি চরিত্রকে একটি ঘটনায় সংস্থাপিত করে তাদের মধ্যে একটি সম্পর্ক তৈরি করা এবং তারপর চরিত্রগুলিকে আলোয় এনে অজস্রবার ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে তাদের স্বচ্ছ করে তোলা : অনেকটা এই রকম সাগাঁর উপন্যাস রচনার রীতি। আলোচ্য উপন্যাসটিতে আলোকপাত যথেষ্ট নয়—এমন সন্দেহ থেকে যায়, চরিত্রগুলি স্বচ্ছ হল না—এমনও মনে হয়। অবশ্য সম্পূর্ণ স্বচ্ছতার কোনো শর্ত ছিল না, থাকার কোনো মানে নেই এবং অস্বচ্ছ-

তারও একটা নিজস্ব জাদু আছে।

উপন্যাসটির পটভূমি হলিউড। সাগাঁর হলিউডে প্রায় রূপকথার সুদূরতা। তার সঙ্গে আবার আশ্চর্যভাবে পরিচিত প্রাত্যহিকতার খুঁটিনাটি মিশেছে। এক রাত্রির দুর্ঘটনায় তিনটি চরিত্রের মধ্যে সম্পর্ক তৈরি হল। সান্টা মনিকায় সমুদ্রতীরের রাস্তায় পল ব্রেট তার জাগুয়ার ঘণ্টায় নব্বই মাইল বেগে চালাচ্ছিল, পাশে ছিল ডোরোথি সীমুর, যার বয়েস পঁয়তাল্লিশ হলেও শরীর এখনো আকর্ষক। ডোরোথির ভাবী তৃতীয় স্বামী পল, দুজনেই চলচ্চিত্র শিল্পের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। অকস্মাৎ দ্রুত ধাবমান মোটরের ঠিক সামনে হেডলাইটে ঝলসে উঠল লুইস, সোনালি চুল, সুন্দর, তরুণ। মনে হল: The earth hath bubbles, as the water has. পলের দক্ষতায় সবাই বেঁচে গেলে, সামান্য আহত লুইসকে ডোরোথি তার বাড়িতে নিয়ে এল, তাদের জীবনেও। স্নেহে প্রেমে লুইসকে ঢেকে রাখল ডোরোথি এবং তার প্রতি লুইসের অনুরাগ বিখ্যাত অভিনেতা হওয়ার পরও একটুও শিথিল হল না। অনেকগুলি ঘটনা ও আরো কতকগুলি চরিত্রের মধ্যে থেকে এই তিনটি চরিত্রকে ছেঁকে তুলে লেখিকা তাদের মধ্যে একটি স্থায়ী সম্পর্ক স্থাপন করেছেন। ডোরোথি ও পলের বিবাহের পরও তাদের বাড়িতে এবং তাদের জীবনে লুইস রয়ে গেল, কারণ পল বুঝেছে—তা না হলে ডোরোথির সুখ নেই। ইতিমধ্যে শুধু ডোরোথিকে ভালবাসার জন্যে লুইস চারটি খুন করেছে এবং ধরা পড়ে নি। ইতিমধ্যে এক ঝড়ের রাত্রিতে ইঙ্গিত পাওয়া গেছে, লুইস শরীরী প্রেমে অক্ষম।

একশ' পাতারও কম পরিসরে এত কিছু ঘটনা ও সম্পর্কের জটিলতা উপস্থাপিত। মিতভাষিতা শুরু থেকেই সাগাঁর একটি বিশেষ গুণ ছিল। এই বইটিতে অন্তত কয়েকটি নাটকীয় মুহূর্তে মনে হতে পারে, সম্ভবত এক ধরনের মিতভাষিতার অপর এক নাম কৃপণতা। সুতরাং অস্বচ্ছতা থেকে যায় এবং অস্বচ্ছতা থেকে উৎসারিত রহস্য।

গল্পটির প্রাণকেন্দ্রে রয়েছে লুইস। সে নিপুণ খুনী, সে এল-এস-ডির স্বাদ জানে, সে শরীরী প্রেমে অক্ষম, সে আবার শিশুর মতন সরল ও সৎ। এমন একটি চরিত্র এমন কৃপণ আলোয় বিশ্বাসযোগ্য হয়েছে কিনা সন্দেহ থেকে যায়।

কোনো মূল্যবোধের প্রতি লেখিকার টান স্পষ্ট হয় নি, আবার সব চেনা মূল্যবোধ ভেঙে ফেলার দুরন্ত তারুণ্যও কোথাও অনুভব করা যায় না। প্রধানত গল্পটি এবং সেই গল্পের গতির অসাধারণ তীব্রতা পাঠককে আকর্ষণ করে।

সুধাংশু ঘোষ

Writers in the New Cuba, *Edited By* J. M. Cohen. Penguin. 18*s*.

"রাইটার্স ইন্ দি নিউ কিউবা" বইটির সম্পাদক জে. এম. কোহেন নয়া কিউবার সাহিত্যের সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দেবার দায়িত্ব যথেষ্ট আত্মবিশ্বাস নিয়ে গ্রহণ করেছেন। মুখবন্ধে সম্পাদক জানিয়ে দিয়েছেন, গ্রন্থভুক্ত লেখকগোষ্ঠী সবাই কিউবার বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থায় আস্থাবান এবং কয়েকটি কবিতা ছাড়া প্রায় সব লেখাই ১৯৫৯-এর বিপ্লবের পর রচিত। তিনি অবশ্য এ কথাও স্পষ্ট করে জানিয়েছেন যে, লেখাগুলো সংকলিত হয়েছে

তাদের অন্তর্নিহিত সাহিত্যমূল্যের জন্য, কোনো রাজনৈতিক মতাদর্শের ভিত্তিতে নয়। দেশটা যখন কিউবা যার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান স্বাভাবিক কারণেই অত্যল্প এবং কিউবা যখন সমাজতান্ত্রিক দেশ, তখন কিউবান সাহিত্যকে বিচার করা আর সহজ থাকে না। অনেকগুলো প্রশ্ন একসঙ্গে হাজির হয়। কিউবার সব প্রতিষ্ঠিত লেখকরাই কি স্থান পেয়েছেন গ্রন্থটিতে? রাজনৈতিক আদর্শে অনুপ্রাণিত সাহিত্য কি তেমন উচ্চ মানের হচ্ছে না যা গ্রন্থটিতে স্থান পেতে পারত? কিংবা, আমরা কি ধরে নেব, রাজনীতি আর সাহিত্যকে সম্পাদক পৃথকভাবে দেখেছেন? বলা বাহুল্য, প্রথম প্রশ্নের উত্তর দেবার জন্য কিউবান সাহিত্য সম্পর্কে যে জ্ঞান থাকা দরকার তা বর্তমান সমালোচকের নেই। দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরও সহজলভ্য নয়। সম্পাদক যদি 'বিশুদ্ধ' সাহিত্য ও রাজনৈতিক সাহিত্য পাশাপাশি রাখতেন তবে একটা তুলনামূলক আলোচনা করা যেতে পারত। কিন্তু তিনি বলেই দিয়েছেন নির্বাচিত লেখকেরা বর্তমান কিউবান সমাজব্যবস্থাকে গ্রহণ করলেও আলোচ্য গ্রন্থটিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তাঁদের সাহিত্যিক দক্ষতার গুণে। সুতরাং তৃতীয় প্রশ্নের উত্তর সম্পাদকের জবানিতেই পাই। সাহিত্য ও রাজনৈতিক আদর্শকে তিনি মিশিয়ে ফেলতে চান না। ও'র কাছ থেকেই জানতে পারা যায়, ১৯৬৫ সালে যখন তিনি কিউবায় যান লেখক সমিতিতেও এই উদারপন্থী মতবাদ জনপ্রিয় ছিল। এর কারণ নিকলাস গুয়েলিন, লেখক সমিতির সভাপতি ও 'কাসা ডি লা অ্যামেরিকা'র উদারতা। ১৯৬১ সালে ক্যাস্ট্রো বুদ্ধিজীবীদের উদ্দেশ্যে যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন (বক্তৃতাটি গ্রন্থে স্থান পেয়েছে) তাতেই অবিপ্লবী অথচ সৎ বুদ্ধিজীবীদের জন্য সমাদরের আশ্বাস ছিল। 'কাসা ডি লা অ্যামেরিকা' যে সাহিত্য প্রতিযোগিতার আয়োজন করে প্রতি বৎসর তারও বিচারের মানদণ্ড সাহিত্যিক গুণাগুণ। সুতরাং দেখা যায়, কিউবায় সমাজতন্ত্র খুবই উদারপন্থী, এই উদারতার নমুনা কোহেন-সম্পাদিত গ্রন্থের প্রতিটি গল্পে ও কবিতায়, যেগুলো পড়লে কারও পক্ষে কল্পনা করা সম্ভব নয় যে কিউবার সমাজ যুক্তরাষ্ট্রের মত নয়, যে কিউবা একটি নতুন সমাজ গড়ার কাজে ব্যস্ত। সম্পাদক যে রাজনীতিকে বাইরে রাখতে চেয়েছেন এবং তাঁর উদারতাও যে অসীম তার প্রমাণ তাঁর মুখবন্ধের 'পুনশ্চ' অংশটি। সেখানে তিনি বর্তমান কিউবান কম্যুনিস্ট পার্টির সংকীর্ণতাকে নিন্দে করেছেন কেন-না তাঁরা হোমোসেক্সুয়ালিটি বরদাস্ত করছেন না, বীট কবিদের অনুপ্রেরণা দিচ্ছেন না ইত্যাদি।

সংকলনের গল্পকারদের প্রায় সবাই কাফকা ও কামুর দ্বারা প্রভাবিত। প্রথম গল্পটি 'দি এক্জিকিউশন' শুরু হয় কাফ্কার "দি ট্রায়াল"-এর একটি উদ্ধৃতি দিয়ে। লেখক ক্যালভার্ট কেসির জন্ম আমেরিকায়, শিক্ষা কিউবাতে, ইংরেজিতেও লেখেন। গল্পের নায়ক মেয়ার হাজতে যাবার আগে তার মনে টেলিফোনের রহস্যময় গুঞ্জন ঘিরে আতঙ্ক সৃষ্টি হয়েছে। শান্তিতে থাকার জন্য সে সব জানালা বন্ধ করে ঘর অন্ধকার করে থাকে। তারপর পুলিশ এসে তাকে হাজতে নিয়ে যায়। অভিযোগ স্পষ্ট নয়। গোটা ব্যাপারটাই সাজানো। জেল হাজতে বসে সে তার প্রেমিকা ইভার কথা মনে করে। ইভা তাকে স্ক্রীপ্চার থেকে যৌনরসাত্মক অংশ পাঠ করে শোনাত। পরিশেষে মেয়ারকে খুন করা হয়। লেখনরীতির মধ্যে এমন এক ভাবাত্মক গভীরতা ও স্নায়বিক অস্থিরতা আছে যা প্রায় কাফ্কার কাছাকাছি যায়। মনোজগতের পেছনে যে বাস্তব জগৎ আছে তাকে পাওয়া যায় না। কী যে অপরাধ নায়কের, কার বিরুদ্ধে সে দাঁড়িয়েছে, ইতিহাসের কোন্ যুগ এটা বোঝা যায় না। প্রতীকী

গল্পে ওসব দাবি করাও সংগত নয়, এমনই একটা প্রথা আজকাল চলছে। ও. জে. কার্ডোসোর গল্প 'দি ক্যাটস্ সেকেন্ড ডেথ'-এর চরিত্রেরা মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী নয়, মাছ ধরা তাদের ব্যবসা। খুবই জোরালো চিত্রাঙ্কন, মাছ ধরা, 'বেড়াল' নামক বুড়ো কৃপণ অসৎ জেলেটি, রোব্ল্স্-এর চিন্তাপ্রবাহ, দামাসোর সঙ্গে ঝগড়া! কিন্তু শেষ পর্যন্ত যে সিদ্ধান্তে রোব্ল্স্ এল তার মানে বুড়ো জেলেটি তাকে খাটিয়ে লাল করা সত্ত্বেও সেই তার গুরু, কারণ সেই তাকে মাছ ধরা শিখিয়েছে। দামাসো যখন বলে কেউই জগতে একা একা কাজ করে না ও করতে পারে না, রোব্ল্স্ বলে তার দুটো হাত আছে, তাই যথেষ্ট। পরিশেষে দেখা যায় দামাসো (যে সমষ্টির সহযোগিতায় বিশ্বাস করে) যে মাছটি ধরতে পারেনি রোব্ল্স্ (যে ব্যক্তির ক্ষমতায় বিশ্বাসী) সেই মাছটি ধরতে পেরেছে। চমৎকার সিদ্ধান্ত সমাজবাদী লেখকের! লেখকের জন্ম আবার চাষীর ঘরেই! ক্যালভার্ট কেসির আর একটি গল্প 'দি লাকি চান্স' দাম্পত্য জীবনের একঘেয়েমি ও সেই একঘেয়েমি-চূর্ণ-করা অনাবিল অবৈধ দৈহিক প্রেমের চিরন্তন মুহূর্তকে ধরে রাখার চেষ্টা করেছে। জর্জ তার স্যুটকেসটা কিছুতেই বন্ধ করতে পারে না, অথচ তার স্ত্রী অতি সহজেই ওটা বন্ধ করে। সাধারণ সংসারে সে যে একজন বিদেশী এটা তারই প্রমাণ। তারপর স্ত্রী বেড়াতে গেলে আসে লরা। লরার পাশে শুয়ে সে সাশ্রুনেত্রে চায় সময় চলে গিয়েও যেন না যায়। মনোজগতের অদ্ভুত ঘটনার প্রতীকী বহিঃপ্রকাশ।

সব চাইতে উদ্ভট গল্প ('উদ্ভট' নাটকের অর্থে উদ্ভট) ভার্জিলিও পিনেবার 'দি ড্র্যাগি'। গল্পের উত্তমপুরুষ মোটেই দাম্পত্য জীবনে সুখী নয়, স্ত্রীর জন্য তাকে 'লিকর ড্র্যাগি' নামক একটি খাবার আনতে হয়। শুরু থেকেই তার মন খুনী মানুষের মত আতঙ্কিত, চঞ্চল এবং পাগলাটে। বাসে চড়ে হঠাৎ সে দেখে এক স্থূলকায়া বৃদ্ধার অঙ্কস্থিত একটি পশুসদৃশ শিশু পাশের একটি ছোট মেয়েকে লজেন্স দিচ্ছে। তার হঠাৎ সন্দেহ হয় হয়ত লজেন্সটাতে বিষ আছে, হয়তো শিশুটা ও তার ঠাকুমা আসলে ঐভাবে মানুষ খুন করে। মেয়েটিও সেই মুহূর্তে গড়িয়ে পড়ে মারা যায়। পুলিশ আসে। কিন্তু দেখা যায় বৃদ্ধার কোলে শিশু নেই, আছে একটি শূকরছানা এবং তার ব্যাগে কোনো লজেন্সের বাক্স নেই। সার্চ করে পুলিশ দেখে নায়কের পকেটে আছে ড্র্যাগির বাক্স। তাকে সন্দেহক্রমে গ্রেপ্তার করা হয়। রুদ্ধশ্বাসে পড়তে হয় গল্পটি। অবাক লাগে কি করে এই ইন্ট্রোভার্ট চরিত্রটি এমন দার্শনিক নির্লিপ্ততা নিয়ে মেয়েটির মৃত্যুর কারণ অনুসন্ধান করে মনের মধ্যে। ঘটনা পরিশেষে কী যে প্রমাণ করে বলা শক্ত। হয়তো ইয়নেস্কোর মত লেখকের বক্তব্য ঘটনা শুধুই ঘটে, কোনো কারণে ঘটে না, কারণ খোঁজাটা মানুষের একটা স্বভাব মাত্র। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য যে লেখক একাধারে কবি ও নাট্যকার। তাই বোধহয় গল্পটিতে অ্যাব্সার্ড নাটকের প্রভাব। কোহেন একেই বলেছেন 'black fantasy'। একই ধরনের লেখা অ্যানা মারিয়া সিমো-র 'গ্রোথ অব্ দি প্লান্ট'। স্নেহহীন স্বৈরাচারী পিতার হাত থেকে আত্মরক্ষা চায় একটি শিশু। তাদের স্নানাগারে একটি চারাগাছ আনা হয়েছিল। আস্তে আস্তে সেটা বেড়ে উঠেছে। একদিন পিতার কাছ থেকে শিশুটি পালিয়ে গাছটির মাঝখানে আশ্রয় নিল। তার চোখে কানে সমস্ত ইন্দ্রিয়তে গাছটি ছড়িয়ে গেল। একটা কবিতার স্বাদ গল্পটিতে, তবে কবিতাটি বড়ই দুর্বোধ্য। অনেকটা ইয়নেস্কোর অ্যামিডি নাটকে শবদেহের ব্যাপ্তির মত। ধনতান্ত্রিক দেশগুলোর লেখকদের মত কিউবার লেখকরাও শব্দের খাঁচায় বন্দী হয়ে আছেন। বস্তুর জগৎ ছেড়ে তারা সবাই আর একটা

জগৎ তৈরি করেছে যার অস্তিত্ব শুধু মনে, হয়তো একটা অনুভূতিতে, হয়তো বা একটা শব্দের মধ্যে। লেখিকার আর একটি গল্প 'এ ডেথ্‌লি সেম্‌নেস' এলিয়টের 'ওয়েস্টল্যান্ডে'র ভাষান্তর মনে হয়। চারপাশে সবই এক, ভয়ঙ্করভাবে এক, একঘেয়ে, যেমন ঐ রেডিওটা, সব সময় একই কথা উগ্‌রে দিচ্ছে। প্রাণহীন, একঘেয়ে, বিস্বাদ এই জীবন। পাঠকরা যদি প্রশ্ন করেন, কোন্ জীবন? সমাজতান্ত্রিক দেশের জীবন? উত্তর দিতে পারব না। শুধু জানা যায়, লেখিকা বিট্ সম্প্রদায়ের একজন নেতৃস্থানীয়া।

'দি ডিস্‌কাভারি' গল্পে লেখক আন্তন আরুফাত শ্রমিকশ্রেণীর জীবনকে মনস্তাত্ত্বিক ও বস্তুবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে দেখিয়েছেন। একঘেয়ে কাজের মধ্যে থেকে একটি শ্রমিক হঠাৎ একদিন অসুস্থ বোধ করতে থাকে। সে আশ্রয় নেয় বাথরুমে। কয়েকদিন বার হয় না সেখান থেকে। তারপর একদিন ছুটে বেরিয়ে যায়। পরিশেষে বাইরের জগৎটার সংস্পর্শে সে নিজেকে খুঁজে পায়। লোকটির মনোবিকার যদিও বিষয়বস্তু, বাইরের বাস্তব জগৎটা কখনো দৃষ্টির বাইরে যায় না। একটি সার্থক গল্প।

আর একটি সুন্দর গল্প 'দি ক্রিপ্‌ল্'। একটি ছাত্রের আত্মকথন। সে অপেক্ষা করছে তার শত্রুকে নিধন করার জন্য রাস্তার এক কোণে। তার চিন্তাস্রোত চলে যায় কলেজের সেই দিনটিতে যেদিন 'বতিস্তা নিপাত যাক' শ্লোগান দেবার সময় পুলিশ আক্রমণ চালিয়েছিল, যেদিন জনৈকা অধ্যাপিকা তাকে বাঁচিয়েছিলেন মৃত্যুর হাত থেকে। বর্তমান মুহূর্তের চারপাশ দিয়ে ঘিরে আছে অতীতের ঘটনাগুলো। কোনো কিছুই অস্পষ্ট নয়, অথচ গল্পের স্বাদও গভীর। লেখক রড্রিগেজ তাঁর সমাজচেতনার জন্য স্বাতন্ত্র্যের দাবি রাখেন। গন্থালেজের 'ফোর ইন্ এ জিপ' গল্পের বিষয়বস্তু একটি রাজনৈতিক হত্যা, তবে তার বক্তব্য ও গঠন কোনোটাই আকর্ষণীয় নয়। 'এ স্প্যারোস নেস্ট ইন্ দি অনিং' গল্পটি শুরু হয় খুবই স্বাভাবিক হাস্যরস দিয়ে। স্ত্রী স্বামীকে পাঠায় পাশের বাড়ির ব্যালকনির পর্দায় চড়াইপাখির যে বাসাটি হয়েছে সেটা ভেঙে গিয়ে যাতে ভ্রূণহত্যা না হয় তার জন্য প্রতিবেশীকে সতর্ক করে দিতে। ভদ্রলোক গিয়ে সে বাড়ির একটি মেয়ের সঙ্গে প্রেম, তারপর দৈহিক সম্পর্কও স্থাপন করার চেষ্টা করলেন। কিন্তু মেয়েটিকে বিদায় নিতে হ'ল। চড়াইপাখির বাসাটিও একদিন ভেঙে গেল। কারণ, ভদ্রলোক আসল ব্যাপারটিই জানাতে ভুলে গেছেন। গল্পটির মধ্যে একটি 'irony' আছে এবং তা সুসংহত রূপ পেয়েছে। কিন্তু নয়া কিউবার লেখকের কাছে আত্মমগ্ন প্রেম, জীবনের একঘেয়েমি, যৌন সমস্যা প্রভৃতি বিষয় এখনো সমান গুরুত্ব পাচ্ছে দেখে কিঞ্চিৎ অবাক লাগে। হাম্বার্টো আর্নোল 'মিঃ চার্লস' গল্পে অনেকটা চেখভের ঢঙে একটি কৃষ্ণকায় শোফরের স্নবারি ও দাসবৃত্তির ইঙ্গিত দিয়ে গল্পটিকে এমন এক জায়গায় নিয়ে যান যেখানে কোনো সিদ্ধান্তই সম্ভব নয়। লুই অ্যাগুরিওর গল্প 'সান্টা রিটাস হোলি ওয়াটার' জনৈক পাদ্রীর কপটতার কাহিনী। পুলিশের সামনে দাঁড়িয়ে পাদ্রীটি অস্বীকার করে তার পূর্বোক্ত আদেশ। গল্পের বক্তা তার বিশ্বাসকে আর আঁকড়ে ধরে রাখতে পারে না। পরিণাম এক নৈতিক বিহ্বলতা। পরিবেশ, চরিত্র, বক্তব্যের দিক থেকে গল্পটি মাটির কাছাকাছি এবং সেইজন্যই সুখপাঠ্য।

গ্রন্থটির শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ একটি নাটক—অ্যাবেলার্ডো এস্টোরিনোর 'কইন্‌স্ ম্যাংগো'। এই একাঙ্কিকার পাত্রপাত্রী অ্যাডাম, ইভ, কেইন্ ও এবেল। যদিও বাইবেলের জগৎ তবু চরিত্রেরা কৌতুককরভাবে আধুনিক, আমাদেরই প্রতিবেশী। পিতা অ্যাডাম তাঁর ডানপিটে

গোঁয়ার ছেলে কেইন্‌-কে ভদ্রতা, শিষ্টাচার ও ঈশ্বরভক্তি শেখান সুযোগ পেলেই। এবেল তাঁর আদর্শ পুত্র। কিন্তু কেইন্‌ বিদ্রোহী, সংশয়বাদী। ভক্তি করার কারণ না জেনে সে কাউকে ভক্তি করবে না। ঈশ্বর তার মতে নিষ্ঠুর, স্বৈরাচারী, এবং স্বার্থপর। তিনি নিজে কাজ করেন না, তিনি শুধু জগতের মালিক, তাঁর হয়ে আর সবাই কাজ করে। অ্যাডাম-ইভকে তিনি স্বর্গ থেকে বিতাড়িত করেছেন একটা সাধারণ ভুল করার জন্য, যেটা তিনি তাঁর প্রেম দিয়ে ক্ষমা করতে পারতেন। তিনি এবেলের মেষ গ্রহণ করেন, কারণ তিনি রক্ত-পিপাসু, তিনি কেইনের আম গ্রহণ করবেন না, যেহেতু সে ঈশ্বরকে শর্তহীন ভক্তি দিতে নারাজ। কেইন্‌ জিহ্বাহীন শয়তান সর্পকে জিজ্ঞাসা করে কোনো কথা বার করতে পারে না। তখন সে বলে, তার কথার দরকার নেই, সে শুধু এমন একটা কাজ করবে যা কেউ তাকে শিখিয়ে দেয় নি, যার জন্য সে হয়তো চিরকালের জন্য একটা বদনাম পাবে, কিন্তু তাতে তার কিছু যায় আসে না। তার প্রস্থানের সঙ্গে সঙ্গে গোলমাল শোনা যায়। নেপথ্যে, সিংহ, ঘোড়া, কুকুরের সমবেত আর্তনাদ। অ্যাডাম মঞ্চে আসেন এবং কোণ থেকে একটি অভিধান তুলে পাতা ওল্টাতে থাকেন। ইভ আসেন অন্য দিক থেকে, জিজ্ঞাসা করেন 'কী দেখছ?' অ্যাডামের উত্তর—'কেইন... (শব্দটি বার করে) একটি পাপ কাজ করেছে।' স্পষ্টতই বোঝা যায়, নাটকের ফর্ম মোটেই সরল নয়। চরিত্রগুলোর প্রত্যেকের দ্বৈত অস্তিত্ব, একটি বাইবেলে, আর একটি বর্তমান যুগে। ধর্মীয় পুরাণের কাহিনীকে আধুনিক দৃষ্টিতে উপস্থিত করা খুব কঠিন নয়। কিন্তু নাট্যকার এখানে এমন একটি উপায় উদ্ভাবন করেছেন শেষের দিকে যার ফলে অ্যাডাম হঠাৎ আমাদেরই একজন হয়ে অভিধান পড়তে থাকে, কেইনের অস্তিত্ব তার কাছে শুধু অভিধানের একটি নামের মধ্যে। অনেকটা ব্রেখ্‌টের কায়দায় নাট্যকার দর্শকের সমালোচক মনকে জাগিয়ে তোলেন চরিত্র ও ঘটনার আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বকে তুলে ধরে। নাট্যকার বিপ্লবের ওপরও নাটক লিখেছেন, তার কোনো একটা সহজেই গ্রন্থে স্থান পেতে পারত, কারণ একই লেখকের দুটি লেখা আমরা দেখেছি।

বাকী থাকে কবিতা। এলিয়ট, অ্যাপলজীয়র, লর্কা প্রভৃতির প্রভাব প্রকট এখানে। রেতামারের সাবলীল অথচ সূক্ষ্ম আইরনি মেশানো বাচনভঙ্গীর ফলে 'অফ রিয়্যালিটি' কবিতাটি প্রথম পাঠেই মন জয় করে। বিবাহের পোশাক ভাড়া করে পরেও একটি নব-দম্পতি কেমন কয়েক মুহূর্তের জন্য সুখ-সুখ খেলতে পারে তারই অম্লমধুর ছবি। হেবার্টো প্যাডিলা ইংরিজি সাহিত্যের অনুরাগী। তাঁর কবিতা 'উইলিয়াম ব্লেকের শৈশব' ব্লেকের যুগ ও বর্তমান যুগের পার্থক্যকে আলোকিত করে। তিরিশ দশকের ইংরিজি কবিদের কিঞ্চিৎ প্রভাব এই কবিতায়। এফ. জ্যামিস লেখক সমিতির পত্রিকা সম্পাদনা করেন। তাঁর 'জীবন' কবিতায় তিনি দৃপ্তকণ্ঠে জানান, অনেকটা সুকান্তর ভাষায়, ত কবিতায় লাইল্যাক ফুলের ছায়া পড়বে না আজ, পড়বে তাঁর বজ্রমুষ্ঠির, যার আঘাতে জীবন তাঁর কবিতায় শতপুষ্পে বিকশিত হবে। খুব আলাপী ঢঙ ও কথ্যভাষার ব্যবহারে কবিতার প্রচারধর্মী আদর্শ কখনো কৃত্রিম বক্তৃতা মনে হয় না। পাব্‌লো আর্মান্ডো ফার্নান্ডেজ-এর যেসব কবিতা নির্বাচিত হয়েছে তাতে একটা অতীতমুখীনতা স্পষ্ট। নিহত বীর শহীদের জন্য একটা ব্যথাতুর কামনা।

কোহেনের প্রচেষ্টা নিঃসন্দেহে ধন্যবাদার্হ এই কারণে যে, নয়া কিউবার সাহিত্যের সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দেবার দায়িত্ব তিনি গ্রহণ করেছেন। কিন্তু রাজনৈতিক মতাদর্শ ছাড়া যে সমাজতান্ত্রিক দেশের সাহিত্যকে বিচার করা সংগত নয় একথা তিনি

জেনেও মূল্য দেন নি। ফলে জে. পি. মারে তাঁর প্রবন্ধ 'কিউবার মার্কসবাদ ও গণতন্ত্র'-এ ('মার্কসবাদ ও গণতন্ত্র' হার্বার্ট অ্যাপ্‌থেকার সম্পাদিত পুস্তকের অন্তর্ভুক্ত, ১৯৬৫) যে শ্রেণীহীন কিউবান গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কথা বলেছেন, "গ্রান্‌মা" পত্রিকায় ফিডেল ক্যাস্ট্রো যে বক্তব্য রাখেন, দ্যাব্রে 'বিপ্লবের মধ্যে বিপ্লব' পুস্তিকায় ক্যাস্ট্রোনীতির যে খাঁটি মার্কসীয় দিকটির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, এগুলোর সঙ্গে কোহেন-সম্পাদিত পুস্তকের নয়া কিউবার মিল পাই না। একটা নতুন সমাজ গড়ার কাজ চলছে অথচ কোথাও তেমন আত্ম-বিশ্বাস, আনন্দ, বলিষ্ঠ আদর্শবাদ বা নতুন শ্রেণীসংঘাত নেই। তার বদলে পাই বিচ্ছিন্নতা-বোধ, মানসিক যন্ত্রণা, স্মৃতিমন্থনের তন্ময়তা, যৌনকাতরতা।

দীপেন্দু চক্রবর্তী

সাহিত্যে শালীনতা ও অন্যান্য প্রবন্ধ। সরোজ আচার্য। রূপা। কলিকাতা, ১২। মূল্য ছয় টাকা।

বাংলা ভাষার প্রবন্ধসাহিত্যে দুটো সাধারণ ধারা লক্ষ্য করা যায়। বিষয়ের দিক থেকে যেমন তেমনি ভাষার দিক থেকেও। একটাকে যদি বলি মননধর্মী বা যুক্তিনির্ভর তবে অন্যটিকে বলা যাবে ফিচারধর্মী বা ব্যক্তিগত। এমন একদিন ছিল যখন আজকের তুলনায় বাংলা ভাষায় যুক্তিনির্ভর প্রবন্ধ রচনা হতো অনেক বেশি। কারণ ফিচারধর্মী বা ব্যক্তিগত রচনা তখনও তেমন দানা বাঁধেনি। ক্রমে সাহিত্যের অন্যান্য বিভাগের লেখার সংখ্যা উল্লেখযোগ্য-ভাবে বাড়তে লাগলো আর প্রবন্ধসাহিত্য পিছিয়ে যেতে শুরু করলো।

বিদেশী অনেক ভাষায় অনেক লেখক আছেন যাঁরা প্রবন্ধ লেখেন, শুধুই প্রবন্ধ লেখেন। ফলে নিশ্চয়ই তাঁদের প্রস্তুতির জন্য দীর্ঘ সময় ব্যয় করতে হয়, লেখা সংখ্যায় অনেক কম হয়। সেটাই উচিত। বাংলা ভাষায় শুধুই প্রবন্ধ লেখেন এমন লোকের সংখ্যা কম। কেন শুধু প্রবন্ধই একজন লেখক লিখছেন না, তা ভেবে দেখার বিষয়। প্রবন্ধ রচনার জন্য যতোটা অধ্যয়ন প্রয়োজন তা এখনকার বাংলা ভাষার লেখকেরা করেন না বললে ভুল হবে। অথবা প্রবন্ধ লেখার মেজাজ এখন সবার মধ্যেই অনুপস্থিত বলাও ঠিক নয়। আমাদের প্রবন্ধের ভাষাও ইতিমধ্যে তৈরি হয়ে গেছে। তাই মনে হয় প্রবন্ধ রচিত না হবার পেছনে যেসব কারণ কাজ করছে তার সঙ্গে লেখকের যোগ সম্ভবত কিছুই নেই। হয়তো বা এর জন্য আমাদের পত্রপত্রিকাগুলিই দায়ী। অথবা দায়ী আমাদের পাঠকদের রুচি। পাঠকের মনোযোগের আকর্ষণ করার জন্য, ক্রেতার কৃপা লাভের জন্য প্রয়োজন উত্তেজক অথবা নরম, দীর্ঘ আর শ্লথ, ক্ষুদ্র ও দ্রুত কাহিনী কিংবা ফিচার। ফলে যাঁরা সচেতন পাঠক তাঁরা কোন আত্মশ্লাঘায় অভিযুক্ত করবেন লেখকদের প্রবন্ধ লেখা হচ্ছে না ব'লে? আমাদের দেশে যখন কোনো প্রবন্ধের বই প্রকাশিত হয় তখন তা অনিবার্যভাবে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পত্রিকায় ছাপা হওয়া নানা প্রবন্ধের একই মলাটে বাঁধা সংকলন মাত্র। প্রায়ই দেখা যায় সময়ের ব্যবধান লেখকের মূল বক্তব্যর যোগসূত্র ছিন্ন করেছে। সমস্ত বইটা পড়ে পুরোপুরিভাবে লেখককে ধরা যায় না। কখনো কখনো লেখক একই গ্রন্থে নানা বিপরীত যুক্তির জালে আবদ্ধ হন। সরোজ আচার্যের "সাহিত্যে শালীনতা ও অন্যান্য

প্রবন্ধ" তেমন একটি প্রবন্ধের বই।

আমার স্থির বিশ্বাস কোনো লেখককে বুঝতে হ'লে তাঁর জীবনের অন্তত কয়েকটি মূল ঘটনা বা বিষয় জানা প্রয়োজন। যতটুকু বইটির পেছনের মলাটে লিপিবদ্ধ আছে তা থেকে লেখক হিসেবে তাঁর সম্পর্কে তেমন কিছুই জানা যায় না। অবশ্য এই পরিচিতির প্রথমেই বলা হয়েছে—"স্বল্পবাক্‌ বহুবিদ্যা-ভিক্ষু সরোজ আচার্য সাধারণের কাছে তেমন পরিচিত ছিলেন না।" যদিও আমার বিশ্বাস, যেহেতু বইটি লেখকের অকালমৃত্যুর পর প্রকাশিত তাই প্রকাশকের পক্ষে যুক্তিযুক্ত হ'তো যদি তাঁরা একটি পরিচয়মূলক আলোচনাও অন্তত জুড়ে দিতেন বইয়ের গোড়ায়। যা থেকে লেখকের মেজাজ বা কিছু নিতান্ত বাস্তব তথ্যও জানা যেত।

"সাহিত্যে শালীনতা ও অন্যান্য প্রবন্ধ" গ্রন্থে মোট চৌদ্দটি রচনা স্থান পেয়েছে। তার মধ্যে নয়টি রচনা সাহিত্য বা সাহিত্য-ঘেঁষা। তাছাড়া অন্যগুলো রাজনীতি বা সম-সাময়িকতার প্রয়োজনে রচিত। সাহিত্যবিষয়ক লেখাগুলোর মধ্যে মোটামুটিভাবে লেখকের বক্তব্য হচ্ছে সাহিত্য ও অশ্লীলতা, লেখকের উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাত্রা, সদ্য শেষ হওয়া ইংরিজি ভাষার সাহিত্য আন্দোলন, রবীন্দ্রনাথ ইত্যাদি বিষয়ে।

সাহিত্যে শালীনতা বিশয়ে নানা সময়ে নানা দেশে অনেক রকম আলোচনা হয়েছে। এখন আমাদের দেশেও হচ্ছে। শালীনতা কিংবা অশ্লীলতা বিষয়ে অনেকে খুবই স্পষ্ট এবং কেউ কেউ কিছুটা ধোঁয়াটে। যদি আমরা মেনে নি, যেহেতু আমাদের এই দেহ, এই ইন্দ্রিয়, আমাদের ইচ্ছা-অনিচ্ছা, আমাদের বাঞ্ছা-কামনা আমাদের খুব প্রিয়, তাই এর ব্যবহার, এর প্রকাশ লজ্জার নয়, ঘৃণ্যও নয়। এমন কি সাহিত্যেও এর প্রকাশ অবহেলার যোগ্য নয়। কারণ যা সত্য, যথার্থ কিংবা স্বাভাবিক তাই মোটামুটি সাহিত্যের উপজীব্য। কিন্তু আমরা জানি, আমাদের মতোই অনেক সাহিত্যপাঠক বিশ্বাস করেন, সাহিত্যকে অবশ্যই হ'তে হবে বিশুদ্ধ; হ'তে হবে এমন একটা কিছু যা পাঠককে পৌঁছে দেবে নতুন এক অলৌকিক জগতে। তাঁরা সাহিত্যের শালীনতা বজায় রাখার পক্ষপাতী হ'লেও সাধারণ-ভাবে প্রয়োজন অনুযায়ী লেখায় দেহের কোনো কোনো তাড়নার উল্লেখমাত্রে কম্পিত হন না। কারণ তাঁরাও যেমন মহাভারত মহৎ সাহিত্য ব'লে বিবেচনা করেন তেমনি মাদাম বোভারি পাঠ ক'রে শিউরে ওঠেন না। কিন্তু হেনরি মিলার কিংবা নবোকফ পাঠে তাঁদের যথেষ্ট আপত্তি দেখা যায়। এতে কিছুই এসে যায় না। কারণ, যেহেতু লেখকের স্বাধিকার কোনো আইন, তা যে-কোনো দেশেরই হোক, খর্ব করতে পারে না, ফলে একজন লেখক তাঁর বিবেচনা অনুযায়ী গ্রন্থ রচনা করবেন, যেমন চিরকাল ক'রে এসেছেন আর পাঠক তাঁর রুচি অনুযায়ী তা পাঠ করবেন অথবা বর্জন করবেন। এবং গ্রন্থটি যদি যথার্থ সাহিত্য হ'য়ে ওঠে তবে তা অধিকাংশ পাঠক বর্জন করলেও কালে তা পঠিত হবে, এমন কি, পূজিতও হবে। যেমন হয়েছে, জয়সের উলিসিস, অথবা লরেন্সের লেডি চ্যাটার্লি।

সরোজ আচার্য তাঁর সাহিত্যে শালীনতা বিষয়ক প্রবন্ধগুলোতে কখনো কখনো স্ববিরোধী মত প্রকাশ করলেও মোটামুটিভাবে মহৎ সাহিত্যের উপর আস্থা রেখেছেন। কেবলমাত্র শরীরবিষয়ক, বা ইন্দ্রিয়ভাবনার পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা আছে ব'লেই তা বর্জন করার পক্ষপাতী তিনি নন। কারণ তিনি বলছেন, 'অতএব সাহিত্যে ভদ্রস্থ গণ্য হতে পারে এমনতর সাবেকী বিষয়বস্তুর বাঁধা-ধরা লিস্ট এখন বাতিল। সমকামিতা, অজাচার, যৌন অক্ষমতা, যৌনমানসের নানারকম জটিলতা, এগুলি নিছক বৈজ্ঞানিক কৌতূহলের বিষয়

গণ্য হবে কেন? মানুষের নানা জীবন-যন্ত্রণা, সুখ-দুঃখ, বেদনার সঙ্গে যখন এগুলির নিগূঢ় সম্পর্ক তখন সাহিত্যশিল্পলোকে এসব বিষয়ের প্রবেশ একান্ত অশালীনবোধে নিষিদ্ধ করা যায় না।'

অবশ্য আমি বুঝতে পারি না কেন সরোজবাবু এই যুক্তিপূর্ণ সিদ্ধান্তের পর একই প্রবন্ধে বলেন, 'লেডী চ্যাটার্লি'র অলজ্জ ভাষা ও যৌনাচার বর্ণনা নাকি মহৎ মানবিক ভাব-সঞ্চারী।' অর্থাৎ লেখকের মতে এই গ্রন্থের ভাষা ও যৌনাচার বর্ণনার জন্য গ্রন্থটি মহৎ মানবিক ভাবসঞ্চারী হ'তে পারে না। বার্ট্রান্ড রাসেলের পোর্ট্রেটস্ ফ্রম মেমারি বইটির লরেন্স বিষয়ক লেখাটিতে আছে, 'তিনি সেক্স-এর উপর এতো জোর দিয়েছিলেন কারণ তিনি কেবল সেক্সের দ্বারাই বিশ্বাস করতে বাধ্য হতেন যে তিনিই জগতে একমাত্র মানুষ নন। কিন্তু এই বিশ্বাস তাঁর কাছে এমন মর্মান্তিক ছিলো যে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যৌন-সংযোগই একমাত্র চিরন্তন সংগ্রাম যেখানে একে অন্যকে ধ্বংস করার জন্য নিয়ত চেষ্টা করছে।' (পৃষ্ঠা ১০৮)

সরোজ আচার্য একই প্রবন্ধে অন্যত্র লিখছেন, '"লোলিটা" অথবা "লেডি চ্যাটার্লিজ লাভার" বিদেশী ভাষার মাধ্যমে অনেকটা স্বচ্ছন্দে পড়া যায়; বাংলা ভাষার প্রচলিত প্রকাশ-ভঙ্গি এবং পরিচিত সুভদ্র শব্দসম্ভারের দোষ অথবা গুণ যাই হোক না কেন, "লোলিটা", "লেডী চ্যাটার্লি" কিংবা ওই ধরনের কোনও গ্রন্থের হুবহু বাংলা অনুবাদ কখনও যে রুচিকর হতে পারে সে-কথা কল্পনা করাও দুঃসাধ্য।' যে-কোনো কারণেই হোক "সাহিত্যে শালীনতা ও অন্যান্য প্রবন্ধ" গ্রন্থে এ-ধরনের স্ববিরোধী নানা যুক্তি ও মন্তব্য ছড়িয়ে আছে। বিশেষত সাহিত্যবিষয়ক লেখাগুলোতে। মনে হয় বিভিন্ন সময়ে রচিত বিভিন্ন প্রবন্ধ একই মলাটে গ্রথিত করাই এর জন্য মূলত দায়ী।

আমার লেখাগুলি প'ড়ে মনে হয়েছে লেখক বস্তুত আবেগপ্রবণ। তার ফলে তাঁর অধিকাংশ প্রবন্ধে অনেক সময় অসমর্থিত আবেগ প্রাধান্য পেয়েছে। অথবা চালিত হয়েছেন মন্দামন্দের তাৎক্ষণিক বিচারে। কিন্তু সাহিত্য বিষয়ক ভিন্ন অন্যান্য প্রবন্ধে, যেমন, 'ইংরেজী বাঁচাও!' 'ইয়ে আজাদী', 'সাংবাদিকতা ও কিংবদন্তী', 'তার অন্ত নেই', 'সেই কলঙ্কে নিন্দাপঙ্কে', বা 'ডিপ্লোমেসি'-তে তাঁর এই সারল্য বা আবেগপ্রবণতাই লেখাগুলোকে সুখপাঠ্য করেছে। ব্যক্তিগত রচনার ঢঙে লিখিত এই প্রবন্ধগুলিতে তিনি অনায়াসে বলেছেন সহজ অথচ সত্য, জটিল অথচ যথার্থ এমন কথা যা আমাদের ভাবনা জাগরিত করে। এমন এক-একটা আলো ছড়িয়ে পড়ে জীবনের বা রাজনীতির এক-একটা কোণে যে সেখানকার অন্ধকার মুহূর্তে মিলিয়ে যায়। যেমন, তাঁর 'ইয়ে আজাদী' প্রবন্ধে। প্রবন্ধটি মূলত মৌলানা আজাদের "ইন্ডিয়া উইনস্ ফ্রীডম" গ্রন্থের সমালোচনা প্রসঙ্গে রচিত ভারত-বর্ষের স্বাধীনতা ও তার পরবর্তী অবস্থার সমালোচনা। লেখাটি পড়তে পড়তে মনে হবে সরোজ আচার্য অতিদ্রুত নিজের মত গঠন করেন এবং অতিদ্রুত সেই মত খণ্ডন করেন। অথচ সরোজ আচার্য এমন একজন লেখক, যাঁর সারল্য কখনো কখনো পাঠকের মতবিরোধী হলেও তাঁর বক্তব্যে সায় দিতে অনুপ্রাণিত করে।

কমলেশ চক্রবর্তী

একত্রিংশত্তম বর্ষ চতুর্থ সংখ্যা

মাঘ-চৈত্র ১৩৭৬

কবিতার ভাষা

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়

যে অপরিহরণীয় ভবিতব্য একান্তভাবে মানুষেরই, য়োরোপে শিল্পবিপ্লবের পরে ব্যক্তি তাকে অনাবৃত তীব্রতায় অনুভব করেছে আপন প্রাতিস্বিক জগতে। নৈঃসঙ্গ্যই সেই অমোচনীয় নিয়তি। একদিকে বাইরে যখন মানুষের প্রভুত্বের সীমা ও আয়তন বেড়ে চলেছে অপরদিকে নিজের মনের গহনে জটিলে তখনই মানুষও এক অজ্ঞেয় সমুদ্রের ডাক শুনেছে। সেখানে এক কম্পাসহীন মনঃসমুদ্রচারণায় চেতনার স্বরূপায়তন ক্রমবর্ধমান দেখে ব্যক্তির বিস্ময়ের সীমা থাকে নি। বহুদিনের অনুপস্থিত 'আমি' তার অনাবিষ্কৃত আন্তর মহাদেশের সকল রহস্যকে মেলে ধরে কবির কাছে উদ্ঘাটিত হতে চেয়েছে, উন্মোচিত হতে চেয়েছে। স্বভাবতই এই সময়ে কবির প্রকরণে শব্দ এবং প্রতীকের যুগ্ম স্বাধিকার। শব্দের শক্তি কত অজেয়—কী তার সাধ্য, আর অসাধ্য—কতখানি অর্থকে সে নিজের কবলে আনে, নিজেই যথাসময়ে তা ছড়িয়ে দেবে বলে, কেমন করে তাকে নতুন তাৎপর্যে দীপ্যমান করা যাবে—আপন নৈঃসঙ্গ্যের মুখোমুখি হয়ে, তারই মার খেতে খেতে কবিরা তা উপলব্ধি করলেন। তখনই তাঁরা বুঝলেন বচনকে সেই অবধি নিয়ে যেতে হয় যেখান থেকে অনির্বচনীয়ের আরম্ভ। শব্দ সেখান থেকেই বহু অনুষঙ্গের পারিষদবর্গের সমভিব্যাহারে তার সীমা ভাঙার যাত্রা শুরু করে—সে রাজার ললাটে কবি নিজে রাজপুরোহিতের মতো পরিয়ে দেন কল্পনার অভিজ্ঞান টীকা। শব্দই তখন শব্দচিত্র হতে হতে আপন রাজাধিকারে প্রতীক হয়ে ওঠে। প্রকৃত কবিতায় শব্দ, শব্দচিত্র এবং প্রতীক গৃহীত অথবা রচিত নয়, জাত।

গদ্যে শব্দেরা স্বাধীন নয়। তারা অভিধান-শাসিত। সংস্কৃত ক্লাসিকে শব্দের অভিধা-নির্দেশিত অব্যর্থতা বিস্ময়কর। রসজ্ঞ সমালোচক দেখিয়েছেন মেঘদূতে কালিদাস একাধিক 'স্ত্রী'-বাচক শব্দকে ভিন্ন ভাবব্যঞ্জনায় প্রয়োগ করেছেন। আধুনিক কবি এই পথেই হাঁটেন এবং পৌঁছে যান আর একটু দূরে। তিনি নব অনুষঙ্গ সৃষ্টি করেন। তাদের স্বাধীন করে তোলা একালের কবিরই কাজ। তখনই তারা দ্বিতীয়ার্থকে বাড়ায়, বদলায়। একই শিখাকে আলাদা আলাদা আবরণে দেখা যায় পৃথক দ্যুতি বিকিরণ করতে।

যে Lily একদা ছিল শুদ্ধ শুভ্রতার অনুষঙ্গবাহী, প্রির্যাফায়েলাইটদের করস্পর্শে সেই Lily-র শুভ্রতায় এল নীরক্ততার আসঙ্গ। রক্তের লাল রঙ কখনো হয় উদ্দীপনার রঙ, কখনো হয়ে ওঠে হিংস্র নৃশংসতা। 'মদ' বা 'মাতাল' আবিষ্টতার প্রাথমিক অর্থকে ছেড়ে নিয়ে যেতে পারে স্বার্থবিস্মৃত আত্মোৎসর্জনের দ্বিতীয়ার্থে—'রক্ত আলোর মদে মাতাল ভোরে', 'মাতাল হয়ে পাতাল পানে ধাওয়া'। হেমন্ত রবীন্দ্রার্থে যা জীবনানন্দীয় অর্থে তা নয়। একই 'শরৎ-নীলিমা' কল্পনা-পর্যায়ে যে অর্থসঞ্চারী, পূরবীতে সে অর্থ নিশ্চয়ই নেই। 'নীল' এখানে যদি মৃত্যুর রঙ, ওখানে তা হলে পূর্ণতার। অতঃপর আমাদের কাছে স্বতঃসিদ্ধ হয়ে ওঠে এই সত্য যে কবিতার বাইরে শব্দেরা দরিদ্র। অথচ, কবিতাপাঠক মাত্রেই জানেন কোনো প্রতিশব্দের মধ্যে শব্দের সেই গূঢ়তা নেই—মাত্রাগুণে মিলিয়ে দিলেও সে হারিয়ে যাবে। সে হারিয়েই থাকবে ততক্ষণ, যতক্ষণ না কবি কবিতার শব্দধ্বনির বিশিষ্ট কাঠামোর মধ্যে অম্বিষ্ট অনন্যকে মনের মতো করে পাবে, যতক্ষণ না তার আর্থ-অবয়বের গভীর রহস্যকে উচ্চাবচ করে তুলবে।

সোনার তরী কাব্যগ্রন্থের 'বিম্ববতী' কবিতাটির গাঠনিক-সিদ্ধি প্রসঙ্গত আলোচ্য। ভ্রাতুষ্পুত্রী অভির মুখ থেকে শোনা রূপকথার গল্প কবিতাটির বহির্জাগতিক উদ্ঘাত। কবিতাটিতে কোথাও কিন্তু শিশুর স্বর নেই। শিশুর অমূল কল্পনার অনর্গল অর্থ-হীনতার মাধুরীও এখানে যথাসম্ভব বর্জিত। কবিতাটি সচেতন রূপকর্ম। প্রতিটি স্তবকের আঁটসাঁট বাঁধন বড় বেশী নিখুঁত। গল্প এখানে একাভিপ্রায়ী—তীরের মতোই লক্ষ্যভেদী, পাখির মতো ভঙ্গি নেই তার। কবি খুব সতর্ক এবং সন্তর্পিত, নির্ভুল এবং সুমিত। রানীর সজ্জার কথা বলা হয়েছে খুঁটিয়ে। আর তাঁর দেহের কথা, রূপের কথা একবারও না। কাহিনীর যেটুকু নিষ্ঠুর অংশ তার জন্য প্রতি স্তবকে বরাদ্দ করা হয়েছে একটি করে চরণ। রানীর সজ্জার বর্ণনা বর্ণাঢ্য। একক চরণের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা শীর্ণ তর্জনীর মতোই রানীর নবঘন স্নিগ্ধবর্ণ নব নীলাম্বরী, গোলাপি অঞ্চল, সুবর্ণমুকুর, প্রবালের হার, সিঁদুরের টিপ, রক্তাম্বর পট্টবাস এবং পীতবসনের নবরৌদ্রবিভার হৃদয়হীন রক্তাক্ত নিষ্ঠুরতাকে দেখিয়ে দিচ্ছে। পাপের চেয়েও পাপাত্মক বলে প্রতিভাত হচ্ছে অননুশোচিত অসূয়া। বিম্ববতীর রূপকেও নেপথ্যে রাখা হয়েছে। তার সমস্ত রূপের প্রতিনিধি তার অনসূয়া হাসি। তার মৃত্যুঞ্জয় মন্ত্র তার প্রেম। সে প্রেম আভাসে ব্যক্তমাত্র। এদিকে কিন্তু রানীর মৃত্যুর বর্ণনাও সেই যুগল প্রাণের সঙ্গে এক চিত্রল বৈপরীত্য সৃষ্টি করেছে।

তবু এরকম নিটোল আর্থ-অবয়ব সত্ত্বেও কবিতার কুহকে সিদ্ধ হল না বিম্ববতী। কাহিনী-কবিতা হিসাবে এ ঋজু বটে, প্রত্যক্ষ বটে—কিন্তু কৃত্রিমতা এখানে সংগুপ্ত নয়। পীড়িত করে 'নব' বিশেষণের পুনরাবৃত্তি। 'ধরাতলে রূপসী সে সকলের চেয়ে'—এই স্তবকান্তিক ধুয়ায় 'স'-এর মতো স্বজন-বিমুখ ব্যঞ্জনধ্বনিকে ভিড়ের মধ্যে ঠেলে দেওয়া হয়েছে। ছন্দের দ্বিচারণে স্পষ্ট হয়ে ওঠে কবির দ্বিধা। সমিল প্রবহমান পয়ার ছন্দে কাহিনী-ধারা চলতে চলতে পুরনো আট-ছয়ের চালে আরাম পেতে চেয়েছে। তখনই স্পষ্ট হয়ে উঠল এই সত্য—যে ছন্দে 'মেঘদূত', 'অহল্যার প্রতি', 'মানসসুন্দরী' বলা চলে সেই ছন্দে রূপকথা অচল।

অপরদিকে শব্দের অনুষঙ্গ সৃজনী ক্ষমতা যদি কোনো কারণে ব্যাহত হয় তাহলে কবিতার আর্থ আবয়বেরও ক্ষতি ঘটে। বলাকার ২২ সংখ্যক কবিতা (যখন আমার হাতে

ধরে/আদর করে......) এ বিষয়ে উত্তম সাক্ষ্য। কবিতাটির এই অংশে :

আমি যে সেই বৈশাখী মেঘ বাঁধনছাড়া
ঝড় তাহারে দিল তাড়া;
সন্ধ্যারবির স্বর্ণকিরীট ফেলে দিল অস্তপারে,
বজ্রমানিক দুলিয়ে নিল গলার হারে;

স্বর্ণকিরীট অবশ্যই রাজার ভাবানুষঙ্গ বহন করে। কবিতায় নাটকে রবীন্দ্রনাথের রাজা রাজবৈরাগীরই প্রতীক। এখানে মেঘের পক্ষে রাজবৈরাগীর মতো স্বর্ণকিরীট বিসর্জন প্রত্যাশিত। কিন্তু উদ্ধৃত অংশের দ্বিতীয় চরণের 'তাড়া', 'বাঁধনছাড়া মেঘ'কে তাড়না করছে বা তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে এমন অর্থের দিকে ঝুঁকে পড়েছে। এই দ্রুত ব্যস্ততার ফলে মেঘ কিরীট-বিসর্জী রাজমহিমার ধীর লয় থেকে বঞ্চিত হয়েছে। এবারে কিন্তু সেই ছড়ার ছন্দই রাজার সেই বৈরাগ্যবাসনাকে ঘন এবং তীব্র হতে দিল না। আসলে বলাকায় রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব রাজা-কল্পনা কাব্যের ভাবভিত্তির কাছ থেকে কোনো আনুকূল্য পায় নি। ২৭ সংখ্যক কবিতায় যে রাজা খাজনা তলব করেন, তিনিও না হতে পারলেন উপযুক্ত পরিমাণে নিষ্ঠুর, না হতে পারলেন অনিবার্য। বলাকার ভাববৃত্তের প্রধানাংশে রয়েছে আধুনিক মানুষ। তার সঙ্গে কবির এতকালের লালিত, পোষিত, রাজানুষঙ্গের মিল দুরূহ।

রবীন্দ্র-পাঠক জানেন যে কবিতায় গানে রবীন্দ্রনাথের রাজা, অতিথি, দস্যু, বর, ঝড় ইত্যাদি আকারত পৃথক হলেও প্রকারত একই ভাবানুষঙ্গের স্রষ্টা। কেমন করে প্রসঙ্গগুলি কবিকল্পনার প্রসাদ পেয়ে দ্বিতীয়ার্থের ছায়াকে প্রগাঢ় করে তোলে তা যথাস্থানে আলোচিত হবে। এখানে শুধু একটি বিষয় উল্লেখ্য। অচরিতার্থতার বোধ আধুনিক ব্যক্তির অপরিহরণীয় নিয়তির করচিহ্ন। সেই বিশূন্য বন্ধ্যা বিরসতার প্রতিমুখে অন্ধকারের গর্ভ থেকে জাত হল এক রাজাকল্পনা, এরই গৌণ রূপে থাকল দস্যু-কল্পনা। তাৎপর্য একই—ভেঙে চুরে দেয় চিরাভ্যাসের মেলা। এই দস্যু-কল্পনার নানা উজ্জ্বলতার মাঝে এক স্থানে একটি কবিতা সচেতন পাঠকের দৃষ্টি এড়ায় না। কবিতাটি পরিশেষ কাব্যগ্রন্থের 'সুসময়'। ঝড় এখানে দস্যু :

বৈশাখী ঝড় যতই আঘাত হানে
সন্ধ্যা সোনার ভাণ্ডারদ্বার পানে,
দস্যুর বেশে যতই করে সে দাবী
কুণ্ঠিত মেঘ হারায় সোনার চাবি
গগন সঘন অবগুণ্ঠন টানে।

এ দস্যু কবির প্রিয়তম দস্যু নয়। মূল্যহীনকে সোনা করার পরশপাথর তার হাতে নেই। এক কথায় কবির স্বহস্তপ্রদত্ত ভাবানুষঙ্গের কিছুই এ দস্যুর সঙ্গে জড়িত নয়। পরন্তু অলক্ষ্যে এ রবীন্দ্রনাথেরই এক তীক্ষ্ম গল্পের নিষ্ঠুর অংশকে মনে পড়িয়ে দিচ্ছে। মানভঞ্জন গল্পে গিরিবালার স্বামী চাবির জন্য যে অহৃদয় ইতর আচরণ করেছিল এখানে বৈশাখী ঝড়ের আচরণের সঙ্গে তার মিল আছে :

গোপী বলিল, "দিবে না বৈ কি! কেমন না দাও দেখিব।" বলিয়া সে গিরিবালার আঁচলে দেখিল চাবি নাই। ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া তাহার আয়নার বাক্সর দেরাজ খুলিয়া দেখিল, তাহার মধ্যে চাবি নাই। তাহার চুল বাঁধিবার বাক্স জোর করিয়া ভাঙিয়া খুলিল, তাহাতে কাজললতা, সিঁদুরের কৌটা, চুলের দড়ি প্রভৃতি বিচিত্র উপকরণ

আছে—চাবি নাই। তখন সে বিছানা ঘাঁটিয়া, গদি উঠাইয়া, আলমারি ভাঙিয়া নাস্তানাবুদ করিয়া তুলিল।

গিরিবালা প্রস্তরমূর্তির মতো শক্ত হইয়া দরজা ধরিয়া ছাদের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

মানভঞ্জন গল্পের শেষে গোপী যেমন গিরিবালার জীবনে অকিঞ্চিৎকর হয়ে গেল, এ কবিতার বৈশাখী ঝড়ও কবিতার পরবর্তী স্তবকে লক্ষ্মীছাড়া হয়ে নিরুদ্দেশ। কিন্তু কবিতাটি জীবন্ত হল না। এখানে কল্পনায় এমন শক্তি নেই যার সাহায্যে কবি ঝড় বা দস্যুর সমগ্র-রবীন্দ্র-কাব্য-প্রদত্ত অনুষঙ্গকে উপেক্ষা করে এই কবিতার ইতর দস্যুর অনুষঙ্গকে রসসিদ্ধি দিতে পারেন। সুতরাং পৃথক চিত্রকল্প হিসাবে এটি চমৎকার হলেও ব্যর্থতা একে স্পর্শ করেছে, তাই শেষ চরণটি ক্লিশে, শুধু ছকা কথা।

দুই

কবিতার শব্দ বিন্যাসে ফুটে ওঠে রেখা, গাঢ় হয় রঙ, জাগে উচ্চাবচতার লাবণ্য। কোনো নারীর রূপপ্রসাধনের সঙ্গে এ তুলনীয় নয়। হলে, তাকেই বলতাম রীতিবাদিতা। এর সঙ্গে বরঞ্চ তুলনীয় কোনো পূর্ণাঙ্গ নারী। তখনই জানি এ শুধু সাবয়ব নয়, এ স্বয়ংসিদ্ধাও বটে। তখনই আর্থ-বিন্যাসেও আসে অনির্বচনীয়ের সঙ্কেত। তখন ব্রজ-বুলির মতো কৃত্রিম ভাষাতেও কবিতা কালকে জয় করে। রায়শেখরের বিখ্যাত 'সখি হামারি দুখের নাহি ওর' পদটির কাব্যার্থের প্রাণবত্তা আজও প্রশ্নাতীত। দ্বিতীয় চরণের তৃতীয় পদটিতে সমগ্রার্থের বিপুল উদ্ভাসন—শূন্য মন্দির মোর। তৃতীয় চরণে মেঘগর্জিত আকাশের বর্ণনায় 'ঝম্পি ঘন গরজন্তি সন্ততি ভুবন ভরি বরিখন্তিয়া'—সাধারণ ছেকানু-প্রাসের নিদর্শন মাত্র নয়। পুঞ্জীভূত যুক্তব্যঞ্জনের সমারোহ বর্ষা-প্রকৃতির পূর্ণতার স্তননের ও সমারোহের প্রতিধ্বনি ও প্রতিচ্ছবি। এই বাইরের পূর্ণতার মাঝখানেই দ্বিতীয় চরণের ঐ সংক্ষিপ্ত পদটি অনিদ্রিত—শূন্য মন্দির মোর। অধিকাংশ চরণের শেষ 'আ'-স্বরধ্বনি এক তীব্র আর্তির স্মারক। 'নাথির বিজুরিক পাঁতিয়া'—নায়িকার আশা-আশঙ্কায় জাগর হৃদয়ের প্রতিচ্ছবি। 'কৈছে নিরবহ হরি বিনে ইহ রাতিয়া'—ঠিক তার পরেই চরম নৈঃসঙ্গ্যের নিরাশ্বাস বেদনা। অথচ আপাতবিচারে এ ভাষা কৃত্রিম। কিন্তু তখনই আমরা বুঝি যে কবিতায় কৃত্রিম ভাষা বা অকৃত্রিম ভাষা বলে কিছু নেই, আছে শুধু কবিতার ভাষা। সে ভাষারও একমাত্র অভিজ্ঞান exactness বা কার্বিক্য যথাযথতা।

ক্যাপটেন কুক্ সতের শো তিয়াত্তর খৃষ্টাব্দে দক্ষিণ মেরু অভিযাত্রায় গিয়েছিলেন। তিনি প্রথম দেখেছিলেন মেরুসাগরের দিনগুলি কুহেলী-মলিন—ভাসন্ত বিশাল বরফখণ্ড সহসা উল্টে যাচ্ছে, সশব্দে ফেটে যাচ্ছে। এ সবের পুংখানুপুংখ বিবরণ আছে কুকের জর্নালে। সতের শো আটানব্বই সালে কোলরিজের এনশ্যেন্ট মেরিনার প্রকাশিত হল। কুকের জার্নাল কোলরিজ কি পড়েছিলেন? কে জানে! কিন্তু কোলরিজ যখন বলেন :

> The ice was here, the ice was there
> The ice was all around:
> It crack'd and growl'd and roar'd and howl'd
> Like noises in a swound,—

তখন সহজে অবিশ্বাস করা যাবে না যে কোলরিজ কুকের বিবরণী পড়েন নি। কিন্তু যদি পড়েই থাকেন, তাতে কী এল গেল? কুক কোথায় পাবেন উদ্ধৃত অংশের তৃতীয় ও চতুর্থ পংক্তির যথার্থতা (exactness) যা শুধু কাব্যেরই অধিগত, কোথায় পাবেন সেই শ্রুতি এবং দৃষ্টির সম্ভোগের বিচিত্র আয়োজন?

কবিতায়, বিশেষত যে কবিতা ব্যক্তিগত এবং আত্মজা, কবি অভিজ্ঞতার সহায়তায় আবেগের ওঠাপড়াকে সাজিয়ে তোলেন, গুছিয়ে নেন। কবিতার সেই গূঢ় আলাপে বিশেষণ যেমন আবেগের ক্রমপরিণামী স্তরগুলিকে স্পষ্টতা দেয়, ক্রিয়া তেমনি কল্পনার পরিধিকে দেয় বিস্তৃতি। দুইই যেখানে একত্র সেখানে বাস্তবতার সেই অনাবৃতপূর্ব স্বরূপটি ধরা পড়ে, যা আধুনিক কবির জটিল জগতের সংকেতবহ। April is the cruellest month, breeding Lilacs out of the dead land. . . এই উক্তিতে cruellest এই বিশেষণ ও breeding ক্রিয়া একত্রে যে গূঢ়কে ব্যঞ্জিত করে তুলল, তা প্রকৃতপক্ষে কবির অভিজ্ঞতার দান। পক্ষান্তরে "বসন্তে কি শুধু কেবল ফোটা ফুলের মেলা রে—" এই পদে এমনই এক গূঢ় ব্যঞ্জনাকে ধরিয়ে দিতে গিয়েও কবি দিলেন না। তা হয়ে থাকল শুধু এক কাব্যিক ভাবুকতা।

'সোনার তরী' এবং 'নিরুদ্দেশযাত্রা' কবিতা দুটির রসসিদ্ধির প্রসঙ্গে দুই কবিতার অন্তর্গত গাঠনিক বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে আলোচ্য। শাব্দ অবয়ব এবং আর্থ অবয়বের যে নিবিড় সম্বন্ধপাতে কাব্যাত্মা কান্তিমান, এই দুটি কবিতাতেই তার সাক্ষ্য পাওয়া যায়। সোনার তরী কবিতাটিতে কৃষক এবং মাঝির এতদ্দেশীয় নিত্যসম্পর্ক থেকে নিষ্কাশিত হয়েছে এক জীবনার্থ—যাকে নিয়ে ব্যাখ্যার অন্ত নেই। কিন্তু কবিতাটির ভাবে একটি নাটকীয় গতি না থাকলে এ জীবনার্থ ব্যঞ্জিত হতে পারতো না। কৃষকের প্রত্যাশা অন্তত একবার চরিতার্থতার সীমাকে ছুঁয়েছে—'যত চাও তত লও তরণী পরে' এই স্তবকে। কৃষকের চাওয়া-পাওয়ার দুঃসহ জীবনে এই হল সৌভাগ্যের তুঙ্গ মুহূর্ত—মেঘাবৃত অন্ধকারে ক্ষণায়ু রবিরশ্মি। এই তুঙ্গ মুহূর্তের পরেই catastrophe নেমে এসেছে দ্বিগুণিত তীব্রতায়। শেষ স্তবকে "শূন্য নদীর তীরে রহিনু পড়ি" এই তীব্রতার চূড়ান্ত লগ্ন। এই কৃষকের মানবিক পূর্ণতায় কোনো খাদ নেই। প্রথম স্তবকে 'রাশি রাশি ভারা ভারা' যেমন তার গার্ণিতিক বৈশ্যাসিদ্ধির নিদর্শন—পঞ্চম স্তবকের 'থরে বিথরে' তেমনি গার্ণিতিকতা-মুক্ত রসানন্দময় মানসতায় উত্তরণের নিদর্শন। কিন্তু এ আনন্দের ধর্মই এই যে একে যে সন্ধান করে সে বিনিময়ে অসামান্য বেদনায় বিদ্ধ হবে। সহজাত অথচ পুনর্লব্ধ সেই নৈঃসঙ্গ্যই পরিণত মানুষের পরম অভিজ্ঞান।

কবিতাটি জ্যাবদ্ধ ধনুর মতো শরসন্ধানী নয়—সংহততন্ত্রী বীণার মতো সুর-সঞ্চারিণী। এর স্তবকে স্তবকে কয়েকটি সুনির্বাচিত বিশেষণে সূচিত হয়েছে বচনের শেষ সীমা—তারা হৃদয়ের ঝরোকা খুলে দেয় আচম্বিতে। সব ঝরোকাগুলি খোলা হলে ঘর ভরে যায় আলোয়। নদীর বিশেষণ 'খরপরশা', জলের বিশেষণ 'বাঁকা'—সেখানে ঢেউগুলি 'নিরুপায়'। শ্রদ্ধেয় বুদ্ধদেব বসু 'কবি রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে বলেছিলেন যে মিলের খাতিরেই ঢেউগুলি নিরুপায় হয়েছে। একথা মানলে অনেকখানি কবিতা হারিয়ে যায়। নিয়তির মতো নাবিকের নিষ্ঠুরতার বা উদাসীনতার কাছে এই করুণ কৃষক পরিশেষে ত্যক্ত হবে এক অনুপায় শূন্যতায়। তৃতীয় স্তবকে নাবিকের প্রথম আবির্ভাবে 'ঢেউগুলি নিরুপায় ভাঙে দুধারে'—শেষ স্তবকের করুণ মিনতি ও কঠিন প্রত্যাখ্যানের পূর্বচ্ছবি। সে যেন অদৃষ্টের

মতোই নির্বিকার, জড়প্রকৃতি ঢেউ, এবং মানুষ-কৃষক, কারো প্রতি তার কোন মমতা নেই। বাঁকাজল, নিরুপায় ঢেউ, সকালের মেঘার্তভা—সব মিলিয়ে ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে এক অর্থময়তা—যা কবিতার শব্দে নেই, অর্থে নেই। তা শুধু এ দুয়ের সহযোগিতা-সম্ভব।

নিরুদ্দেশ যাত্রা কবিতায় আর্থ অবয়ব গড়ে উঠেছে অনুভূতির উচ্চাবচতায়, ভাবের অনিবার্যতায়। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত প্রতিটি স্তবকে একটির পর একটি সোপান পেরিয়ে আমরা পৌঁছে যাই শেষ স্তবকের অনিবার্য অন্ধকারে। প্রথম স্তবকে প্রশ্ন, দ্বিতীয় স্তবকে আশা, তৃতীয় স্তবকে আশঙ্কা, চতুর্থ স্তবকে আশার স্মৃতি, পঞ্চম স্তবকে আশা-আশঙ্কার খর অনুভব, ষষ্ঠ ও শেষ স্তবকে অনিবার্য অন্ধকার। প্রথম পাঁচটি স্তবকে সেই নারীর দেহ, বা দেহসম্বন্ধীয় কিছুরই উল্লেখ নেই। আছে শুধু নীরব হাসির বাঙ্ময়তা। শেষতম স্তবকে এল দেহের ঘ্রাণ, চুলের স্পর্শ—হারিয়ে গেল সেই হাসি। অনেক তরঙ্গের মাঝখানে যা ছিল একমাত্র সম্বল তা হারিয়ে যাবার আশঙ্কাতেই আমরা বুঝলাম যে হাসি শুধু হাসিটুকুই নয়। তখনই নিবিড় অন্ধকার অতলান্ত বলে মনে হল। এই আর্থ অবয়ব এক অর্থাতিরিক্তের দোলা পাচ্ছে কবিতাটির শব্দ-তরঙ্গের ঘাতে ঘাতে। লক্ষণীয় এই কবিতার বিস্ময়কর ক্রিয়াপদগুলি। 'অকূল সিন্ধু উঠিছে আকুলি'—কবিতার মূলে আকুলতাকে প্রথম স্তবকেই প্রতিষ্ঠিত করেছে। 'ঝলিতেছে জল, তরল অনল'—পরের স্তবকের এই চিত্রকল্পটি জীবন পেল 'ঝলিতেছে' ক্রিয়ার স্পর্শে। আর সেই স্পর্শই বিস্ময় সৃষ্টি করল 'গলিয়া পড়িছে অম্বরতল' এই পরের চরণে। 'গলিয়া পড়িছে' শুধু বাক্যের ক্রিয়া নয়; কল্পনার ক্রিয়া। কিন্তু এই ক্রিয়াত্মক কল্পনা চূড়ায় পৌঁছল কবিতার তৃতীয় স্তবকে—'অসীম রোদন জগৎ প্লাবিয়া দুলিছে যেন'। 'রোদনের' সঙ্গে 'দুলিছে' ক্রিয়াপদের যোগ একমাত্র এই কবিতাতেই সম্ভব হল। যখন সম্ভব হল তখন একবারও একথা মনে হল না অসম্ভব সম্ভব হয়েছে। বরঞ্চ মনে হল এমন স্বাভাবিক অথচ অবার্থ কথা আমরা এর আগে শুনিনি কেন। 'সোনার তরী'তে অভিনব বিশেষণ প্রয়োগ—'নিরুদ্দেশ যাত্রা'য় অভিনব ক্রিয়া-উদ্ভাবন—কাব্যগ্রন্থটির দুই প্রান্তের দুটি কবিতায় দুই পৃথক বাণীসিদ্ধির নিদর্শন। পরবর্তী 'শেষ বসন্ত' কবিতাটিতেও স্তবকের পাপড়িগুলি একটি সংহত কল্পনার চারিপাশে ঘনবদ্ধ। প্রস্তাব, প্রস্তাবের হেতু, আশ্বাস, মিনতি, প্রতিশ্রুতি, বসন্তের শেষ সান্ত্বনা—এই সাতটি মুহূর্তে শেষ বসন্তের প্রার্থনাকে ঘিরে মঞ্জরিত। এক-একটি স্তবকে সাতটি চরণ। কবিতাটিতে নায়কের প্রস্তাবের সকল কারণ্য শান্ত সংযমে বাঁধা। এমন কি ষষ্ঠ স্তবকের চূড়ান্ত মুহূর্তেও তা অশান্ত হয়ে ওঠেনি। শুধু নিরাশ্বাস বেদনার অন্তহীনতার দিকে অঙ্গুলি সঙ্কেত করা হল সময়ের উল্লেখে 'নীড়ে ফেরা পাখি যবে অস্ফুট কাকলিরবে দিনান্তেরে ক্ষুব্ধ করি তোলে'। 'ক্ষুব্ধ করি তোলে' বহুব্যঞ্জক ক্রিয়া। তখনই ঝরাপাতা দলে' নায়িকার চলে যাবার তাৎপর্যটিও মূর্ত হল। এক সমাসন্ন অনির্দেশ্য স্তব্ধতার প্রাক্কালে দুটি ছোট শব্দের কল্পনা—দ্রুত পায়ে শুকনো পাতা ভেঙে চলে যাবার শব্দ, রাত্রির আগে পাখিদের আকাশ-হারানোর অস্ফুট কান্নার শব্দ। কবিতাটি এখানেই শেষ হতে পারত। এই অনিবার্য ভাবিতব্যের সম্মুখেই নায়কের মূর্তি স্তব্ধ থাকুক এমনটি আমরা চাই বলেই শেষতম স্তবকের সান্ত্বনা বাহুল্য মনে হয়।

শব্দের সঙ্গীতে আর্থ অবয়বে আসে অর্থাতিরিক্তের দোলা, আবার অর্থের ইঙ্গিতে শাব্দ আবয়বে আসে বিচিত্রের আভাস। 'চৈত্র মাসে শুক্ল নিশা। জুঁহি বেলির গন্ধে

নিশা। জলের ধ্বনি তটের কোলে কোলে। বিচিত্রা হে বিচিত্রা। অনিদ্রারে আকুল করি তোলে'—'জংহি' হিন্দি শব্দটি সরিয়ে বাংলা জুইকে বসালে শব্দের সংগীত হারিয়ে যায়, এবং অর্থও অক্ষুণ্ণ থাকে না। 'জংহি' শব্দের মহাপ্রাণবর্ণে সঞ্চারিত রয়েছে অনিদ্র শুক্ল রাতের অব্যক্ত বেদনা। জুই শব্দে এখনো কোনো কবি সে অর্থানুষঙ্গ সৃষ্টি করেন নি। 'রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর। প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর'—জ্ঞানদাসের এই বিখ্যাত পদে 'ঝুরে' এবং 'কান্দে' এই ক্রিয়া দুটির শব্দার্থে বিশেষ পার্থক্য নেই। কিন্তু এই ক্রিয়াদুটির স্থান-পরিবর্তনে কবিতাটি রসাতলে যাবার আশঙ্কা বেশি। জীবনানন্দের 'আমি সেই সুন্দরীরে দেখে লই—নুয়ে আছ নদীর এপারে। বিয়োবার দেরি নাই—রূপ ঝরে পড়ে তার'—এখানে 'বিয়োবার' ক্রিয়াপদটি ব্যবহৃত হয়েছে উচ্চাঙ্গের কবিত্ব-সম্ভব সন্তর্পিত সতর্কতায়। 'দেখে লই'-এর পরিবর্তে কবি যদি চলিত ক্রিয়া 'দেখে নিই' প্রয়োগ করতেন তাহলে 'বিয়োবার' হত অশালীন উক্তি। 'দেখে লই' বলার ফলে ব্যাপারটিতে ঋজু প্রখরতা কমে গেল—এল এক স্তিমিত নিস্পৃহতা—তখনই মূল লক্ষ্য হল 'রূপ ঝরে পড়ে তার'। তখনই কবি সময়ের হাতে যে ক্ষয়ের কথা বলতে চাইছেন তা দাঁড়াতে পারল।

তিন

বিশেষত যে কবিতায় আধুনিক ব্যক্তির নিভৃত জটিলতার প্রতিফলন, যে কবিতা একজনের একান্ত অভিজ্ঞতারই স্মারক, সে কবিতায় শব্দপুঞ্জের স্বয়ংনির্ভরতা বিস্ময়কর। Emily Dickinson-এর একটি কবিতা 'The last night that she lived...' স্মরণীয়। It was a common night, except the dying—কিন্তু তার পরেই কবি বলছেন:

> We noticed smallest things—
> Things overlooked before,
> By this great light upon our minds
> Italicized, as 'twere.

Italicized শব্দটির অভাবিতপূর্ব ব্যঞ্জনা শুধু এই কবিতাতেই সম্ভব। অথচ যিনি এই শান্ত বিষণ্ণ কবির জীবনকথা জানেন তিনি আন্দাজ করেন, এই নারী কবি নিজের জীবন নিংড়ে শব্দটি নিষ্কাশন করেছেন এবং, সে জীবনকথা না জানলেও ক্ষতি নেই, Italicized নিজেই কবিতাটিতে স্বরাট হয়ে বিরাজিত। কবিতাটির শেষতম স্তবকটির ভাষায় সামান্য ও অসামান্য এক হয়ে গেছে:

> And we placed the hair,
> And drew the head erect;
> And then an awful leisure was,
> Our faith to regulate.

Our faith to regulate নিঃসন্দেহে অসামান্য কাব্যোক্তি। পূর্ব চরণের leisure-এর বিশেষণ awful শেষতম চরণের to regulate এই ক্রিয়াকে দিয়েছে উদাসীন মহাকালকে স্পর্শ করার ক্ষমতা। এ ভাষা নিভৃত অনুভূতির জগতের ভাষা। সংশয় এবং অসংশয় এখানে একীভূত।

একালের এক তরুণ বাঙালী কবির একটি কবিতা এই প্রসঙ্গে গোটা উদ্ধৃত করার লোভ সম্বরণ করা গেল না।

চাঞ্চল্য, তোমাকে আমি রাত-ভিতে স্তব্ধ বাগানের
মাটির গভীরে, নিচে রেখে আসি
দিই এক টুকরো কানি, রুস্করা এবং পেয় জল
চাঞ্চল্য, তোমাকে আমি বাগানের নখ, শিকড়ের
পাহারায় রেখে আসি, কারাগারে ফাটকে, পুলিশে...

তালকানা বাদুড় জানে আর কিছু জোনাকি নবীন
তদন্তকারীর মতো জেনে যায়—সন্দেহও করে
কেন আসি, নিজেকে না ঢেকে রেখে, চাঞ্চল্য কবর দিই রাতে?

বাদুড় গায়ের কালি ঢেলে দেয় রাত্রিকে সাজাতে
মনে হয়, কাজে আর চিন্তনে ঘটেছে ঘোর ভুল
চাঞ্চল্যের হাত থেকে ছাড়া পেতে মিথ্যে বাঁচিয়েছি
নিজেকে, সহজ ছিলো যার সবই ত্যাগ ক'রে যাওয়া॥

(চাঞ্চল্য, তোমাকে আমি/শক্তি চট্টোপাধ্যায়)

কবিতাটি পড়া শেষ হ'লে অর্ধরাত্রির ঝিল্লিস্বর শুনতে পাওয়া যায়। চাঞ্চল্যের উদ্দেশ্যে লিখিত একথা স্তব্ধতার কবিতা। প্রথম পংক্তির 'রাতভিতে' উচ্চারিত হবার সঙ্গে সঙ্গে সেই স্তব্ধতা সংক্রামিত হতে থাকে। বাগানে ফুলের গন্ধ সংগ্রহ হয়, কিন্তু তার চেয়েও নিষ্ঠুর কাজ ঘটতে পারে। তালকানা বাদুড় আর নবীন তদন্তকারীর মতো জোনাকি সেই চাঞ্চল্যকে কবর দেবার অনির্ণেয় হেতুকে আরও রহস্যঘন করে তুলল। তা স্তব্ধতাকে করে তুলল প্রায় স্পর্শগ্রাহ্য। এ ভাষা নির্জনতার এবং নৈঃসঙ্গ্যের। অথচ 'চাঞ্চল্য, তোমাকে আমি বাগানের নখ, শিকড়ের পাহারায় রেখে আসি, কারাগারে ফাটকে, পুলিশে...' এই অংশের উপাদান সংগৃহীত হল বাংলাদেশের প্রত্যহের অভিজ্ঞতা থেকে। এই অংশটি কবিতায় এসেই আনমনে চলে গিয়েছে। ভালোই হয়েছে সে বেশীক্ষণ থাকেনি। থাকলে, গায়ের কালি ঢেলে বাদুড়ের রাত্রি সাজানোর গা ছমছমে পরিবেশ এক কথায় জমে উঠত না। নৈতিক ব্যাখ্যাটি ব্যর্থ হত।

একালের কবির কাছে শব্দ শুধু বাক্যকে সম্পূর্ণ করার উপাদান নয়। শব্দের ভিতরেই রয়েছে কবির ভাবনার অভিজ্ঞান। শব্দেরা মৃত—কবিই তাকে উজ্জীবিত করেন, তখন সেই জীবন্ত শব্দেরা হয় মান্ত্রিক। কবি শব্দকে খুঁজতে গিয়ে নিজের অভিজ্ঞতাকে, স্মৃতিকে অস্তিত্বের স্তরগুলিকেই খোঁজেন। তাই এক-একটি শব্দের ভিতরে কবির সমগ্র সত্তার আলোড়নকে, সংক্ষোভ এবং শান্তিকে সংহত করে তোলাই কবির লক্ষ্য। জীবনানন্দ যখন বলেন, "ভালোবেসে দেখিয়াছি মেয়েমানুষেরে" এবং যখন বলেন:

নারী, তুমি সকালের জল উজ্জ্বলতা ছাড়া পৃথিবীর কোনো নদীকেই
বিকেলে অপর ঢেউয়ে খরশান হতে
দিতে ভুলে গিয়েছিলে;

অথবা যখন বলেন :

কোথাকার মহিলা সে? কবেকার? ভারতী নর্ডিক গ্রীক মুশিলম মার্কিন?

—তখন 'মেয়েমানুষ' 'নারী' এবং 'মহিলা' এই তিনটি শব্দ তিনগুচ্ছ অনুষঙ্গকে বহন করে। শব্দের সেই গূঢ় ক্ষমতাকে আবিষ্কার করা, সৃষ্টি করা এবং কাজে লাগানোই কবির লক্ষ্য। শব্দের সেই শক্তিকে না ব্যবহার করলে কবির যা প্রধান উদ্দেশ্য, বিশেষত আজকের কবির, সভ্যতার নিয়তিকে ব্যাখ্যা করা যাবে না। সময়, ক্ষয়, ব্যর্থতা, অনন্বয় এসবের মুখোমুখি হয়েছেন কবি। কবিই শিখিয়েছেন ভাষাই অভিজ্ঞতার অভিজ্ঞান।

ভয় করলেই ভয়

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

চলো, বেরিয়ে পড়ি।
আকাশ এখন ক্রমেই আরও রেগে যাচ্ছে।
যাক্।
ভয় করলেই ভয়, নইলে কিছু না।
রাস্তাময়
ইঁটের টুকরো, বোতল-ভাঙা কাচের গুঁড়ো
ছড়িয়ে আছে। থাক্।
যার যা ইচ্ছে, করুক।
ভয় করলেই ভয়, নইলে কিছু না।
একটু-আধটু রক্ত হয়ত ঝরতে পারে। ঝরুক।
ভয় করলেই ভয়, নইলে কিছু না।
চলো, বেরিয়ে পড়ি।

দেখো, ঠিক আমরা পেঁৗছে যাব।
ঘরের মধ্যে
হাত-পা গুটিয়ে বসে থেকে
কে কবে কোন্‌খানে গিয়ে পেঁৗছতে পেরেছে?
চলো, বেরিয়ে পড়ি।

জানি, রাস্তা এখন ক্রমেই আরও তেতে উঠছে।
উঠুক;
ঘরই জ্বলে, রাস্তা কে আর জ্বালায়?
দেখতে পাচ্ছি
ওদের চোখে বিন্দু-বিন্দু রক্ত ফুটছে।

ফ্টুক;
কাউকে একবার ঘ্রে দাঁড়াতে দেখলেই ওরা পালায়।
ওদের মারম্খো ওই ভঙ্গিটা তো আর কিছ্ নয়,
লোক-দেখানো লোক-ঠকানো
ছলা।
চলো, বেরিয়ে পড়ি।
ভয় করলেই ভয় করলেই ভয়, নইলে দেখো,
কিচ্ছ্ না, কাঁচকলা।

ভালো মনে কিছুই চাও না

দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

ভালো মনে কিছুই চাও না—জাদু নয়, অপরাধও নয়।
শুধু মগ্ন হয়ে থাকো হৃদ্য অসন্তোষে। এত দ্রুত
সিঁড়ি ভেঙে ওঠো চোখ ঝলসে যায়, এত ক্লান্ত করো
যেমন অভ্যস্ত ক্লান্তি জেগে থাকে চন্দ্রমামণ্ডলে।
শুধু স্মৃতি হাতে আছে আমাদের—তা দিয়ে কি কোনো
পণ্য কেনা যায়? তুমি লাল রিবনের ঘোড়াচুড়ো
বেঁধে প্রতি রাত্রে বসে থাকো ঐ মিনারতলায়।
তোমায় বেবুশ্যে ভেবে আঁখিঠার দিয়ে যায় যারা
সেই সব ধনীনন্দনের জন্যে তোমার যা কিছু গরিবানা।
শুধু আমাদেরই জন্যে অন্ধকারে গল্পের চমক
জ্বালিয়ে পিদিম হাতে সুদূর রহস্যে অকাতরে
ঢুকে যাও। তারপর সারা রাত রুদ্ধ দরোজায়
আমাদের লতানো স্মৃতির ঝাড় বেড়ে ওঠে মত্ত
অকাতরে ফেটে পড়ে অজস্র মিথ্যার ফুলে ফুলে।

দূরের কলাবতী

সমীর দাশগুপ্ত

শেষ সারি, উষার বাগানে
দুলে দুলে আলো দেয় আকাশে আঁধারে

খুশি-দূরে, কোনদিন প্রসিদ্ধ দুপুরে
যে-রকম ভেসে ছিল
হলুদ ঘুড়ির ঝাঁক—

কচুরিপানার ভেলা
খরস্রোতে গিয়েছিল বুকের দুপাশে ছুটে
মরা'ইলিশের গ্রাম, মাৎলায় মোহানায় জলে. .
তারপাশা বন্দর ছুঁয়ে
শৈশব হয়েছিল পাখি, বিষণ্ণ ফেরার,
স্টিমারে উৎসুক আঁখি এ-ঝড়ের প্রশ্ন শুনেছিল,
সোনালি কলার কাঁদি প্রাকৃত আঙুলে ছুঁয়ে
বেচাকেনা হয়েছিল তবু
স্তম্ভিত বাজারে ভিড়ে।

বাগান সীমায় ঠেকে চিরদিন, নৌকাও আচমকা তীরে,
মাছের নতুন ঢং কাঁটাতার ছুঁড়ে দেয় অভিন্ন হৃদয়ে।

হলুদ ঘুড়ির পাঁতি
সেইখানে গ্রীবার আড়ালে
প্রথম কৌতুক ফেলে দিয়ে
ফিরেছিল ঝাপ্সা ছোট পেয়ারার বনে—
ডালে ডালে আজও যার
জড়ানো মাঞ্জার সুতো, বিভক্ত কাগজ কাঠি
ঝাপ্টায় ভৌতিক ঝড়ে।

কলাবতী আরও দূরে থাকে
দুলে দুলে আলো দেয় অপর আঁধারে।

প্রতীকে প্রতীকে

কমলেশ চক্রবর্তী

বেদনার উৎসুক অপ্সরা নাচো সকালে বিকেলে
কখনো একাকী বাস করে তুষারে বন্দিনী
মরালীর মতো
কখনো জ্যোৎস্নায় অচেনা প্রান্তরে সে-কোন
ধবল ঘোটকীর মতো
অফুরান বেদনার উৎসবে যেতে হবে আমাদের
দলবেঁধে কখনো
কখনো একাকী বিমর্ষ

সমুদ্র অনেক দূরে
সমুদ্রের শব্দ শুনে তাই শুনিনি কখনো
কবরখানার গম্বুজ-চুড়োয় ঘুঘুদের ডাক
কারো কাছে যা মৃত্যুর প্রতীক অথবা
ভাবনার অবিশ্রান্ত প্রবহণ

অথচ সবাই বেদনার উৎসের দিকে ধাবমান
ধবল ঘোটকী অথবা বন্দিনী মরালীর মতো
তুষারের হিমেল বাতাসে।

দৃশ্যান্তরে

অনন্ত দাশ

এক দৃশ্য থেকে আরেক দৃশ্যের মাঝে
নাটকীয় অন্ধকার, অদৃশ্য সংলাপ
চরিত্রবদল করে ফিরে আসি ফের মঞ্চে
দৃশ্যান্তরে স্মৃতিমুক্ত হই।

সশস্ত্র শিবিরে আমি, সৈন্যদল
নাড়ির চারদিকে যেন সাজায় পরিখা
সূর্যপরিক্রমা শেষে পুনরায় নদী
বুক ভরে জল নিয়ে আসে

কখনো ঝড়ের রাতে মাঝমাঠে একা
পৃথিবীর হাহাকার শুনি. পুঞ্জিত মেঘের
করতলে উচ্ছ্বসিত সময়ের দ্যুতি
ক্রমশ বয়সকালে বিবর্ণ, বিস্বাদ।

তবুও মানুষ যেন সমুদ্রগভীর, অতল অরণ্যে
নিষ্পত্র বৃক্ষের গায়ে খোদাই করেছি নাম
ঘণ্টাধ্বনি থেমে গেলে—দৃশ্যান্তরে
আরেক বেড়াল শিশু খেলা করে জ্যোৎস্নার উঠানে

কাহিনীর কুহকে আমি

কায়সুল হক

কাহিনীটা শেষ করে তারা উঠে গেল।

স্বরাট আকাশ আলো ক'রে গোল চাঁদ
শহরের ঘেঁষাঘেঁষি
সমস্ত বাড়ির মাথা ডিঙিয়ে কখন
উপরে এসেছে উঠে।
টবে রাখা রজনীগন্ধার ঝাড়ে
আলোর সাঁতার দেখে
একরত্তি বারান্দায় দাঁড়িয়ে দৃষ্টিটা
চালান করে দিলাম উন্মুক্ত উপরের দিকে।

ছাতা-পড়া পুরোনো কথারা
ভিড় ক'রে আসে স্মৃতির সেতুবন্ধ হ'য়ে :
আচমকা শুনি তার অতি চেনা স্বর
মধ্যরাতের এই জ্যোৎস্নার ভেতর।
আলোর রহস্যে আমিও অন্য হয়ে যাই।
(বন্ধুদের শেষ-করা কাহিনীর মধ্যে প্রবেশ কঠিন হলো।)
স্মৃতির নানা অলিগলি এবং বন্ধুরতা উজিয়ে
আমি আর এক কাহিনীর মধ্যে চলে গেলাম।

সেই কিশোর কালের চৌকাঠ পেরিয়ে
প্রথম যেদিন ফাল্গুনের আরক্ত প্রহরে
রক্তগোলাপ হাতে যুবতী
আমার ভয়-ভয় ভালোবাসাকে
মঞ্জরিত করেছিলো
তার নিবিড় সান্নিধ্যে!
জ্যোৎস্নার বকযন্ত্রে পরিস্রুত এই চরাচরে
আর মধ্যরাতের সুপ্তির মগ্নতায়
দেখি তার কথা
আজ আমার স্নায়ুর শিকড়ে শিকড়ে
হ'য়ে গেছে কাহিনীর আশ্চর্য কুহক॥

অসংলগ্ন পেরেকের টানে

বিশ্বেশ্বর সামন্ত

ওদিকে যেও না তুমি বলি শোনো আমি আছি
এই অপবিত্র হাত স্থির হিরণ্ময় অন্ধকারে
আমি একা একা জেগে আছি,
বিষণ্ণ রাত্রির কাছে নতজানু হয়ে আছি কখন ভোরের আলোয়
বাসি মুখ ধুয়ে নেবো আমাদের স্পষ্ট দেখা যাবে
উজ্জ্বল ঝকঝকে মসৃণ দর্পণে,
নিজেকেই বলে যাবো কতটা মানুষ নিয়ে আমি বসে আছি
এই নিঃসঙ্গ বারান্দায়,
কখন আত্মীয় ভেবে পরস্পর হাতে হাত ভাঙা হাটে
সাজাবো বন্দর
এদিকে এসো বলি শোনো কেউই থাকবে না কোনোদিন
বুক খুলে জড়িয়ে নেবে না কখ্‌খনো আলিঙ্গন যাকে বলে
পরস্পর জড়িয়ে থাকা হৃদয়ের তরল মিশ্রণ,
অলস দরজা ভেঙে উঠে এসো সামনে ঘোরানো সিঁড়ি
ক্রমাগত নিচে নেমে গেছে
যেখানে গভীর খাদ আরো বেশি গভীরতা বাড়ে
ক্রমাগত অন্ধকার হলে,
মাঝে মধ্যে রসিকতা কিংবা বিদ্রূপ দরজায় দরজায় করাঘাত
কে আছো?
প্রশ্ন করো নিজেই নিজেকে কে আছো?
কতটা জটিল জেগে আছো?
আমি এই অন্ধকারে জুয়া খেলে বাজি জিতে গেছি
অতর্কিত ঝট্‌কা হাওয়ায় আমার জাহান ছিঁড়ে গেছে
অসংলগ্ন পেরেকের টানে।

অন্নদাতা

নরেন গঙ্গোপাধ্যায়

নরকুলে জন্ম নিয়েও লোকটা রাক্ষস। গোগ্রাসে খেতে পারে বলেই নয়, ওর প্রবৃত্তি, ওর আচরণ, সর্বোপরি ওর আকৃতি সব মিলিয়েই ও নর-রাক্ষস।

—কি নাম হে তোমার?

—আজ্ঞে, ঐ যে বললেন, রাক্ষস; আমার নাম নর-রাক্ষস।

—রাক্ষসই বটে। অন্ধকারে যদি দেখতাম তোমাকে তা হলেই হয়েছিল আর কি! তা অমনধারা দাড়িগোঁফ আর জটাজুট না রাখলে কি চলত না তোমার? আর ও-টা কি পরেছ গায়ে, কাকতাড়ুয়াদের মত জমা! তা সত্যি করে বল দেখি তোমায় দেখলে কি পক্ষী-টক্ষি ভয়ে পালায়?

—মানুষজনই ভয় পায় বেশি! লোকটা হি হি করে একগাল হাসে। দত্তবাবুদের রোয়াকে একদিন ঘুমুচ্ছিলুম—লোকটা আবার হাসে, তা ঘুম ভাঙলে বুঝতে পারলুম কে যেন একটা ছুঁচলো কাঠি দিয়ে আমাকে খোঁচাচ্ছে। বলুন তো কি জ্বালা, আমি তড়াক করে লাফিয়ে উঠে দেখলুম দুটো উচ্চিংড়ে ছোকরা। গাবুৎ করে একটা শব্দ তুলে যেই ওদের তেড়ে গেলুম ওরা হাওয়া। লোকটা এবার দাঁত মেলে থাকে তৃপ্তিতে।

লাউবিচির মত পেছল-পেছল দাঁত। ঐ দাঁত দিয়েই ও অখাদ্য খায়, কুখাদ্য খায়৮

বললাম,—তা যেমন তোমার চেহারা, ছোঁড়ারা তোমার পিছু লাগবে এ আর বেশি কি! আমারই ইচ্ছে হচ্ছে তোমার ঐ মাথার ঝোপ-জঙ্গলগুলো কাউকে দিয়ে সাফ করিয়ে দিই। কি সুখে যে ওগুলো পুষছো!

—আজ্ঞে, উকুন টুকুন বেশি উৎপাত করলে মাঝে মাঝে ন্যাড়া হই। একবার তো ন্যাড়া হয়ে নিসিন্দে পাতার রস লাগিয়ে ভাবলুম দিব্যি বাঁচা গেল, তা কি হল জানেন?

—কি?

—ন্যাড়া হওয়াতে নাকি আমাকে আর রাক্ষস বলেই মনে হচ্ছিল না। সাবু মাস্টার তো আমার ঐ অবস্থা দেখে রেগে কাঁই। বললে, ওরে হারামজাদা করেছিস কি! এ যে একেবারে ভদ্রলোক হয়ে গেছিস আজ। সর্বনাশ করেছিস! টিকিট কেটে কেউ আর তোর খেলা দেখবে না।

তখন উলুবেড়িয়াতে তাঁবু পড়েছিল সাবু মাস্টারের। আমিই তখন ওর একনম্বর খেলোয়াড়। আমার জন্যই লোক এসে লাইন দিয়ে টিকিট কাটত। আমি সাজগোজ করে তাঁবুর ফাঁক দিয়ে দেখতাম আণ্ডাবাচ্চারা তাদের বাপজানদের হাত ধরে চকচকে চোখে তাঁবুতে ঢুকছে। নর-রাক্ষস কেমন করে কাঁচা কাঁচা মাংস খায়, সত্যি সত্যি খায় কিনা খুটিয়ে খুটিয়ে দেখবে।

—তুমি কাঁচা মাংস খাও? সত্যি সত্যি খাও!

—খাই মানে! নর-রাক্ষস ধ্বক ধ্বকে চোখে তাকায়। পরীক্ষা করে দেখতে পারেন। না পারলে নাকে খত দিয়ে জুতো খেতে খেতে চলে যাব।

—তাই বুঝি! তাহলে তো সত্যিকারেরই রাক্ষস তুমি।

লোকটা আবার যেন পরিতৃপ্ত হয়, হাসে। হ্যাঁ, যে কথা বলছিলাম, সাবু মাস্টারের মুখখানা তো ভারী হয়ে উঠল কুমড়োর মত। বললে, হারামজাদা, রোজ দুবেলা তোর পেছনেই আমার আধমণ করে চাল লাগে; তা, তুই কিনা ন্যাড়া হয়ে ভদ্রলোকের মত হয়ে গেলি!

—আমি বললাম, উকুন বড় জ্বালায় যে মাস্টার। রাত্রে কি আর ঘুমুতে পারি। ইস, কটর কটর কটর, মাথার মধ্যে যেন দক্ষযজ্ঞ চলে।

—বললে পরে চার পয়সার গ্যামাক্সিন ঢেলে দেওয়া যেত। তুই বেটা সত্যিকারের একটা আহাম্মক।

—আমি বললাম, যাহ্ বাবা, আমি মরি আমার জ্বালায় আর তুমি মাস্টার পয়সা কামাবার ধান্দা দেখছো।

—কি, কি বললি! সাবু মাস্টার এই মারে তো এই মারে। চেঁচিয়ে মেচিয়ে একাকার করে বললো, হারামজাদা আমার এই তাঁবু আছে বলেই তুই দুবেলা তবু খেতে পাস। আধমণ চালের দাম জানিস রে আধমণী কৈলাস? যা না, নিজে রোজগার করে খেয়ে দেখ না।

—বললাম, আহ্ মাস্টার! অল্পেতেই তুমি বড় ক্ষেপে যাও। না হয় একবার ন্যাড়াই হয়ে গেছি। তাই বলে কি আর কাঁচা মাংস খাব না নাকি? দেখো, খেলা আমি ঠিকমতো জমিয়ে রাখব।

সাবু মাস্টার কি করলে জানেন, তেলে গোলা রং কিনে আনলো কয়েক কৌটো, একটা বুরুশ, কিছু তুলো, কিছু গদের আঠা। ব্যাস বুরুশ দিয়ে ডোরা ডোরা রঙের দাগ এঁকে দিলে আমার মাথায়, দিয়ে খেবড়ো খেবড়ো কিছু তুলো সাঁটিয়ে দিলে এপাশে ওপাশে। তারপর বললে, নে জামাটা খোল দেখি।

—কেন? গায়েও রঙ লাগাবে নাকি? উঠবে তো আবার?

—আমার জামা খুলে নিয়ে পিঠে বুকে ডোরা ডোরা রঙের বুরুশ চালিয়ে দিল। আমার তখন পরনে একটা জাঙিয়া, আর সর্বাঙ্গে কেবল রঙ। আমি তখন জাম্বুবানের মত একটা জীব।

টিকিট বিক্রি বেড়ে গেল।

সাবু মাস্টার বললো,—যাব্‌বেটা, সাপে বর হল আমার.

আমি বললাম,—তোমার যেমন লাভ হচ্ছে মাস্টার আমার খাওয়াটাও এবার থেকে একটু বাড়িয়ে দাও! বেশি না, আর দু-এক সের চাল বাড়িয়ে দাও দেখি দুবেলায়। পেট পুরে যদি নাই খেলাম গতর রাখব কি করে।

—এক এক বেলা দশ সের চালের ভাত খাও তুমি?

লোকটা এবার বিস্মিত চোখে তাকাল। তারপর হাসল বিনীতভাবে। যৌবনে আরো বেশি খেতে পারতাম গো বাবু। সে খাওয়া আপনি না দেখলে বিশ্বাসই করবেন না। কেউ করে না।

—এক সের চালের ভাত যে খায় তাকেই আমরা রাক্ষস বলি, তুমি তাহলে মহা রাক্ষস।

—তা যা বলেছেন, আমি নর-রাক্ষস। জন্মের পর থেকেই আমি আমার পেট চিনেছি। এই যে দেখছেন পেট, এটা একটা রবারের জালা, যত ঢালবেন তত বড় হবে। চাই কি একবার পরীক্ষা করেই দেখুন না। একটা আস্ত মুরগী কিংবা হাঁস এনে দিন না, দেখুন না আমি টুঁটি ছিঁড়ে হালুম হালুম করে ওর গোটাটাই সাবড়ে দিতে পারি কি না।

—পালক শুদ্ধ খাবে তুমি ?

লোকটা অসহায়ভাবে তাকায়। পালক কি আর খাদ্য হল, দুহাত দিয়ে হ্যাঁচকা টানে ওর চামড়া ছাড়িয়ে নেব, যেমনভাবে আপনারা বাবু গা থেকে গেঞ্জি খোলেন তেমনিভাবে ওর চামড়া ছাড়িয়ে ফেলে দিয়ে ওর মাংস হাড় রক্ত সব কিছু আমি খেয়ে ফেলব।

সাবু মাস্টার তার খেলা জমাবার জন্য বলতো, এই বেটা নর-রাক্ষস, জন্মভোর কেবল হাঁস মুরগীই খেয়ে দেখালি এবার একদিন আর একটু বড় সাইজের কিছু খা না! তোরও মুখ বদলাবে, লোকের কাছেও রোমাঞ্চ বাড়বে।

—কি খাব ?

—একটা ছোটমোট পাঁঠা খা না একদিন।

বলুন তো কি কাণ্ড! লোকটা একবার ভেবেও দেখল না, আমি রাক্ষস হতে পারি কিন্তু মানুষ তো! না হয় তুই দুবেলা আমার ভাত জোগাস, তাই বলে!

—একদিন খেয়ে দেখলেই পারতে। কিছু অন্যায় বলে নি তোমার মাস্টার।

—না অন্যায় বলবে কেন! এই পেটে যা ধরাব, তাই ধরবে। খেলুম একদিন পাঁঠা। তাঁবুর চারদিকে তখন গমগম করছে ভিড়। তাঁবুর বাইরে ছোট্ট একটা মঞ্চে নকল নর-রাক্ষস সেজে একজন অঙ্গভঙ্গি করে আস্ত পাঁটা খাওয়ার অভিনয় দেখিয়ে লোক টানছে। নেহাত হাতি-টাতি নাকি পাওয়া যায় না, তাই হাতি খাওয়া দেখানো যাচ্ছে না এখানে। আসল নর-রাক্ষস রয়েছে ভিতরে। আসুন দেখন, রোমহর্ষক দৃশ্যাবলী। জ্যান্ত নর-রাক্ষস, আফ্রিকার জঙ্গল থেকে ধরে আনা নর-রাক্ষস। শিশুদের সব সাবধান মত রাখবেন নইলে—

বলুন তো কি সাংঘাতিক সব কাণ্ড!

তা তাঁবুর মধ্যে মঞ্চে খেলা শুরু হল। প্রথমে সাবু মাস্টার কয়েকটা তাসের খেলা দেখালো। তারপর দেখালো ফাঁকা চোঙের ভিতর থেকে জাদু দিয়ে আট-দশখানা ডিম বার করে, তারপর আরো কয়েকটা মজার মজার খেলা। মাঝে মাঝে হাততালি, মাঝে মাঝে অহেতুক চেঁচামেচি! কিন্তু সেদিনকার সবচেয়ে সেরা খেলাটি দেখাবার জন্য সবার শেষে কোমরে দড়ি বেঁধে আমাকে নিয়ে আসা হল মঞ্চে। কোমরে দড়ি বেঁধে রোজই আমাকে আনা হয়। বলা যায় না, আমি তো নর-রাক্ষস, দড়ি দিয়ে বাঁধা না থাকলে হয়ত ঝাঁপিয়ে পড়ে সামনে যারা বসে আছে তাদেরই খেতে শুরু করব।

আমি ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে তাঁবু যেন ফেটে পড়ল। সাবু মাস্টারের হাতে ম্যাজিক লাঠি। দর্শকদের দিকে তাকিয়ে বললে, এবার আপনাদের সামনে হাজির করছি জ্যান্ত নর-রাক্ষসকে। আপনারা সবাই জানেন, মানুষ সৃষ্টির সেই আদিম কালে রাক্ষসের মত কাঁচা ফল-মূল মাংস ইত্যাদি খেয়ে জীবন ধারণ করত। আসলে ক্ষুধা, এই পেট, এই জঠর একে কোনদিন তৃপ্ত করা যায় না। যত যোগান দেবেন একে তত এ গ্রহণ করবে। আপনারা রুচির কথা ভাবছেন আমি জানি, কিন্তু ধরুন মহিম নামে কোন এক রুচিবান পুরুষকে বন্দী করে রাখা হল। তাকে একদিন দুদিন তিনদিন কিছু খেতে দেওয়া হল না। তখন যদি তাকে কাঁচা মাংসই ছুঁড়ে ছুঁড়ে দেওয়া হয় সে প্রাণের দায়ে তাই খেতে শুরু করবে। এই জঠরের কাছে বন্দী হয়ে থাকে রুচি, প্রেম ভালবাসা, ভাললাগা, খারাপ লাগা। এই জঠর এই পেট, এই পেটই সব, সর্বস্ব।

আমার নর-রাক্ষস এই কথাই প্রমাণ করবে আপনাদের সামনে। ওকে সারাদিনে একটি ফোঁটাও দানাপানি খেতে দেওয়া হয় না। ও তাই এত সাংঘাতিক। দেখছেন, ওকে গাছ-

কোমরে বেঁধে রাখা হয়েছে। অসুরের মত বল ওর গায়ে। ওর কোন বাছবিচার নেই, যদি নরমাংস দেওয়া যায় ও নরমাংসই খেয়ে ফেলবে। ও ক্ষুধার্ত। ও বর্বর। ক্ষুধাই একমাত্র ওর সব।

—হ্যাঁ হে নর-রাক্ষস, আমি কি মিছে কথা বললাম?

আমি শালা নর-রাক্ষস, বুঝলেন বাবু, আমার তখন কথা বলা বারণ, আমি ঘাড় দুলিয়ে রাক্ষসের মত অঙ্গভঙ্গি করে জানিয়ে দিলাম, না সাবু মাস্টার তুমি ঠিকই বলেছ, তুমিই আসলে আমার অন্নদাতা।

দেখলেন, নর-রাক্ষস আমার কথা স্বীকার করে নিল।—হ্যাঁ হে নর-রাক্ষস, আজ তোমার জন্য একটা কচি পাঁঠা আনিয়েছি, তোমার যদি আপত্তি থাকে তো বল?

আমি শালা নর-রাক্ষস, আমার আপত্তি হবে কেন! নেকড়ে বাঘের মত লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে কেঁদে কুদে কচি একটা পাঁঠা খেতে হবে আজ। খাব, তারপর গলায় আঙুল দিয়ে হড়হড় করে বমি করে আধঘণ্টা বুদ হয়ে তাঁবুর একপাশে লুকিয়ে থাকব। এত কিছু কসরত করে তবে না শালা ভাত!

একটা তিন-চার কেজি ওজনের পাঁঠা ছুঁড়ে দেওয়া হল আমার সামনে। তারপর—

নর-রাক্ষস লার্ডার্বিচির মত দাঁতগুলো বার করে হাসতে থাকল।—দিলুম শালাকে পেটের মধ্যে সেঁধিয়ে। রক্তে চর্বিতে সারা গা কেমন পিছলে একাকার হয়ে গেল আমার।

—খেয়ে ফেললে! জ্যান্ত একটা পাঁঠা!

—ঐ যে বললুম আপনাকে, আমি শালা সব খাই। খাই আর গলায় হাতে কব্জি ঢুকিয়ে বমি করি। মাঝে মাঝে মনে হয় যা খেয়েছি তা তো বেরুলই, পেটের নাড়িভুঁড়ি অবদি উলটে এল। বমি করতে করতে কখনো কখনো জ্বর এসে যেত গায়ে। কখনো কখনো মনে হত আমার বুঝি হাত-পা কিংবা দুটো একটা অঙ্গই কমে গেছে। হয়ত খাবার ঝোঁকে নিজেরই একটা হাত কিংবা পা গিলে বসে আছি। বুকে পিঠে মুড়মুড় করা ব্যথা আমার লেগেই থাকত বমির চোটে। তারপর যখন টেনেটুনে ভাতের গামলার কাছে আমাকে এনে বসিয়ে দেওয়া হত তখন আবার সব কিছুই ভুলে যেতাম। বুঝলেন বাবু যত কাণ্ড কারখানা সব এই পেটের জন্য।

—হুঁ। কিন্তু সাবু মাস্টারকে ছেড়ে এলে কেন, বেশ তো ছিলে?

—এই দ্যাখো! আপনিও বলবেন, বেশ ছিলাম। তা'লে বলি সেই আসানসোলের গল্পটা। আসানসোলে তাঁবু পড়ল সাবু মাস্টারের। সাবু মাস্টারের ব্যবসা বেশ জমজমিয়েই চলছে। হররোজ আমার নামে একটা করে মুরগী বরাদ্দ হচ্ছে আর সাবু মাস্টার তেলে জলে আর পয়সার গরমে যেন ধরাকে সরা জ্ঞান করতে শুরু করেছে। ছেঁড়া তাঁবু পালটে নতুন তাঁবু কিনেছে ও। আড়াই ফুটি বেঁটে একটা জোকার জুটিয়ে ফেলেছে এর মধ্যে। জোকার ছোকরা ছিল খেলুড়ে ঘুঘু। এমন করে লোক হাসায়, মাঝে মাঝে, আমি শালা নর-রাক্ষস, আমিও ফিক করে হেসে উঠি প্রায়।

সাবু মাস্টার নতুন লিকলিকে একটা চাবুক কিনে ফেলেছে এর মধ্যে। হাতে চাবুক না থাকলে নাকি মাস্টার মাস্টারই মনে হয় না। প্রথম দিনই আমি বললাম, দেখ মাস্টার ঐ চাবুক যদি আমার গায়ে তুলেছ কখনো তা'লে শালা আস্ত তোমাকেই খেয়ে ফেলব।

সাবু মাস্টার বলত, আরে ধুৎ! চাবুক হাতে থাকলেই বুঝি চালাতে হয়! ওটা হচ্ছে লোকদেখান। এই দেখ না, হাওয়াতে আমি এমনি করে চাবুক চালাব, ফটাস ফটাস করে

শব্দ হবে, ব্যাস।

তা সেই আসানসোলের তাঁবুতে একদিন রাত্রিবেলা খেলা শুরু হল। তাঁবুর মধ্যে জম্পেশ করা ভিড়। শালারা সব নর-রাক্ষস দেখতে এসেছে, ইচ্ছে হয় গায়ের সব শক্তি ঢেলে গাঁক গাঁক করে তেড়ে যাই ওদের, পারি না। কোনদিনই বাবু আমি একটা হেস্ত নেস্ত করে উঠতে পারি নি। আর পারবও না। একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল নর-রাক্ষস।

—হুঁ, কি করলে তুমি আসানসোলে তাই বল?

—কিই বা আর করব। কোমরে দড়ি বেঁধে টানতে টানতে আমাকে মঞ্চে এনে দাঁড় করানো হল।

সাবু মাস্টার চাবুক হাতে হাওয়ায় দুবার চারবার ফটাস ফটাস শব্দ করে বক্তৃতা দিতে শুরু করলো, আপনাদের সামনে নর-রাক্ষসকে দাঁড় করিয়েছি এখন, ও ক্ষুধার্ত। ও আদিম কালের একটা জানোয়ারের মত। ও সব কিছু খেতে পারে। ইঁট কাঠ পাথর মাটি ঘাস .... গোটা দুনিয়াটাকেই ও গ্রাস করে ফেলতে পারে। দেখুন, কী অসীম শক্তি ধরে লোকটা। ওকে ঐভাবেই বেঁধে রাখতে হয় সমস্তক্ষণ।

বুঝুন, আমি যেন সত্যিকারের মানুষই নই, একথাই ও প্রমাণ করতে চায়। সাবু মাস্টার আমাকে দুবেলা ভাত যোগান দেয়, আমার অন্নদাতা, তাই ব্যাটা এসব কথা বলে যেতে পারল। আমি নর-রাক্ষস, ঠিক আছে। আমি মাথা পেতে সব কিছু মেনে নিতাম। মেনে নিলাম সে দিনও। কিন্তু বেটা সাবু মাস্টারই আমার মাথায় রক্ত চড়িয়ে দিল। দেখি একটা মরা মুরগী আমার দিকে ছুঁড়ে দিচ্ছে; নে নর-রাক্ষস খা। মুরগীটাকে দেখেই কেমন যেন আমার সন্দেহ হয়েছিল। শালা চশমখোর হয়ে উঠেছিল। সকালবেলাই আমি লক্ষ্য করেছিলাম মুরগীটা হঠাৎ কোন ব্যামো হয়ে টেঁসে গেছে। আমার ধারণা ছিল ওটাকে ফেলে দিয়ে খেলা দেখাবার জন্য আর একটা নতুন জ্যান্ত মুরগী আনিয়ে নেবে মাস্টার। তা হারামী পয়সা চিনেছে যে।

মরা মুরগী দেখে আমার হাড়ে মাংসে যেন আগুন জ্বলে উঠল। আমি নর-রাক্ষস হতে পারি কিন্তু তাই বলে বলুন তো কি কাণ্ড!

—কি করলে তুমি?

আমি! মুখ বাঁকা করে পেট চুলকোতে চুলকোতে নর-রাক্ষস বলল,—আমি রাগের মাথায় গায়ে যত শক্তি ছিল তাই দিয়ে মুরগীটাকে একটা কিক্ করলাম।

আর যায় কোথায়! সাবু মাস্টার তেড়ে মেড়ে সপাং সপাং চাবুক চালিয়ে দিল আমার পিঠে। এই, এই শুয়োরের বাচ্চা রাক্ষস, বড্ড বেশি তেল বেড়েছে তোর, তাই না!

কিন্তু পরক্ষণেই সাবু মাস্টার বুঝলো এটা মঞ্চ। মঞ্চের সামনে সার বেঁধে লোক বসে আছে। সবাই টিকিট কেটে খেলা দেখতে এসেছে। এখানে নর-রাক্ষস গোলমাল করতে পারে কিন্তু সাবু মাস্টারের তা সামলে ওঠা উচিত। ও তখন হাত জোড় করে মঞ্চ থেকে দর্শকদের দিকে বলতে শুরু করল, আপনারা একটু ধৈর্য ধরুন নর-রাক্ষসকে কিছুক্ষণের মধ্যে বশ করছি আমি। ওটা দিনে দিনে বড্ড বেশি বুনো হয়ে যাচ্ছে। মানুষের সঙ্গে বসবাস করার যোগ্যতা ওর নেই আপনারা তা জানেন। তাই—

এমন সময় দেখি ঐ শালা জোকার হঠাৎ দর্শকদের মধ্যে লাফিয়ে পড়ে মরা মুরগীটাকে তুলে এনে হাঁকল, মাস্টার এ যে মরা মুরগী।

সাবু মাস্টার দাঁত কিড়মিড় করে বলল, রোজ রোজ জ্যান্ত পাওয়া যায় না। ওটাই

ওকে খেতে দে আজ।

আমি গাঁক গাঁক করে আবার প্রতিবাদ করলুম।

বলুন, আপনিই বলুন মরা মুরগী কি কখনো খাওয়া যায়?

আমি আর কি বলব। বললাম,—তারপর কি করলে? খেলে না বুঝি?

—মাথা খারাপ! জ্যান্ত খেয়েই বমি করে মরছি রোজ! মরা খেলে আর দেখতে হবে না আমাকে। তা আমি ঘাড় গোঁজ করে দাপাদাপি শুরু করলাম। কিন্তু সাবু মাস্টার আমার অন্নদাতা, এত সহজে আমাকে ছাড়বে কেন? দেখি জোকারটাকে কি যেন একটা ইশারা করল সাবু মাস্টার। আর অমনি, বুড়ো মতন একজন দর্শক একটা কুমড়ো কোলে নিয়ে বসে খেলা দেখছিল, সেটা তুলে নিয়ে লাফাতে লাফাতে এগিয়ে এল জোকারটা।

—এই, এই, আরে আরে, করে কি করে কি!

কিন্তু কে শোনে কার কথা। নে নর-রাক্ষস, আজ তুই কাঁচা কুমড়োটাই খেয়ে দেখা।

—মশাই, কি বলব আপনাকে! চার কেজির এক কণাও কম নয় কুমড়োটা। ভাবলাম, খেতে তো হবেই, তা দেই শালাকে সাবাড় করে। কুমড়োটাই ঘচ ঘচ করে সাবড়ে দিলাম সেদিন।

—একটা আস্ত কুমড়ো খেয়ে ফেললে?

—ফেললাম। হি‍ঁহি‍ঁ করে লোকটা হাসতে থাকল।

—কুমড়ো খাওয়াতে অবশ্য দর্শকরা খুব একটা খুশী মনে বাড়ি ফিরল না। দুজন এজকনকে বলতেও শুনলাম, খুব ফাঁকি দিয়ে আজ পয়সা মারলেন দাদা। কোথায় হাঁস মুরগী খাওয়া আর কোথায় কুমড়ো।

—তা তো বটেই। কাঁচা মাংস না খেলে ঠিক রাক্ষস বলে ভাবাই যায় না। কুমড়ো তো একটা গরুকে দিলেও খেয়ে ফেলে!

লোকটা কেমন সন্দেহের চোখে তাকিয়ে রইল। তারপর আবার বলতে শুরু করল, তা সেই রাতে খেলা ভেঙে যাওয়ার পর সাবু মাস্টারের সঙ্গে হয়ে গেল আমার এক চোট। মাস্টার বলল, তোর জন্য আজ আমার বদনাম হয়ে গেল সে খেয়াল আছে? আমি বললাম, আমাকে তাই বলে মরা মুরগীটা খাইয়ে মেরে ফেলতে চাও মাস্টার। আমি কি মানুষ নই?

—কাঁচা মাংস যে খেতে পারে সে আবার মানুষ।

—বেশ, খাব না আর মাংস।

—খাস না, বেরিয়ে যা এখান থেকে। কে তোর আধ মণ করে চাল জোগান দেয় দেখে নেব। আধ মণ চাল রোজগার করতে পারিস? নেহাত তুই সঙ্গে সঙ্গে আছিস তাই তোকে বাঁচিয়ে রেখেছি। নইলে—

আমি সত্যি সত্যি বেরিয়ে আসতাম, কিন্তু মাঝে পড়ে গেল ঐ আড়াই ফুটি জোকারটা। ওই আমাদের ঝগড়া মিটিয়ে সে রাতের মত আমাকে শান্ত করল।

—ভালই করেছিলে, তবু তো ঐ সাবু মাস্টার তোমাকে খাইয়ে পরিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছিল।

—হুঁ তা রেখেছিল। বর্ধমানে এসে একদিন এমন মাথা গরম হয়ে গেল, দিলুম ছেড়ে। সাবু মাস্টার ততদিনে এক হাজিপাজি রেণ্ডি জোগাড় করে ফেলেছে। নাম ছিল কুসুম। গাছকোমরে ঢ্যাঙা, নছল্লা কি! সব সময় কেমন যেন সাবু মাস্টারের সঙ্গে সঙ্গেই লেগে আছে। প্রতি শোয়ে তিনটি করে নাচ নাচত ঐ কুসুম। খেলা শুরু হওয়ার প্রথমে একবার। সাবু মাস্টারের ম্যাজিক দেখান শেষ হলে একবার। আর একবার আমার মুরগী খাওয়ার আগে। ওদিকে জোকার ছোকরা তো আছেই। আমি বুঝতে পারলাম, প্রথম দিকে আমার

যত কদর ছিল সাবু মাস্টারের কাছে, দিনে দিনে যেন তা কমে আসছে। তা কিছুদিন যেতে না যেতেই দেখা গেল আমার ভাতের পরিমাণও যেন কমে আসছে। একদিন আমি বললাম, কি হে মাস্টার, আমার ভাত কমাচ্ছ কেন?

সাবু মাস্টার কিছু বলার আগেই কুসুম বলল, একজনই যদি আধ মণ করে চাল ধ্বংস করে তবে চলবে কি করে?

—যে ভাবে এতদিন চলেছে।

—এতদিন তো দশ জনে খেত না। আর চিরকালই অমন ভাবে সাবু মাস্টারের মাথায় হাত বুলিয়ে খাবে সেটাই বা কি রকম! এখন থেকে আর অমন রাক্ষুসে খাওয়া চলবে না এখানে।

—কি মজার ব্যাপার দেখুন। সাবু মাস্টার কিন্তু একটাও কথা বলল না। আমি জানতুম ও বলবে না। শালার খুব চর্বি বেড়েছে এতদিনে। কুসুম ওকে বশ করেছে। তা ছাড়াও বেটার রোজগার এখন কমতি কি!

আমারই কপাল খারাপ। আমি মাথা ঠাণ্ডা রাখতে পারলুম না। বলুন বাবু কেউ কি শান্ত থাকতে পারে এর পর। দুবেলা দুটো খাওয়া, তাও কিনা খবরদারি করতে জুটে গেল একটা বাজারের মেয়েছেলে। আমি হঠ্ করে লাফিয়ে উঠে ওর চুলের মুঠি ধরে দিলুম কয়েক ঘা। আর যায় কোথায়! ঘিয়ে যেন আগুন পড়ল। সাবু মাস্টার ঐ রেণ্ডি মাগীর পক্ষ নিয়ে চাবুক হাতে আমার দিকে তেড়ে এল।

—শুয়োরের বাচ্চা, তুই মেয়েছেলের গায়ে হাত তুলিস?

আমি গজরাতে থাকি। কিন্তু সপাং সপাং করে কয়েক ঘা চাবুক আমার পিঠেই লাগিয়ে দিল সাবু মাস্টার। শংকর মাছের চাবুক, পিঠ চিরে হাঁ হয়ে গেল।

আমি প্রলয় কাণ্ড বাঁধিয়ে বসলুম। তারপর মনের দুঃখে ঘৃণায় আর অপমানে বেরিয়ে এলাম তাঁবু থেকে।

লোকটা একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে থামল। পরে ছলছলে চোখে আবার বলতে শুরু করল, আমি শালা নর-রাক্ষস, রাক্ষসের মত চেহারা নিয়ে বেঁচে থাকতে হয় আমাকে। আমার কি আর মান অপমান থাকার কথা; সাবু মাস্টার শালা বুঝলে তো! রেণ্ডি মাগী বশ করছে ওকে। যা বোঝায় ও তাই বোঝে।

ঘৃণায় আমার মরে যেতে ইচ্ছে হয়েছিল সেদিন। একটা মেয়েছেলে কিনা শেষ পর্যন্ত আমাকে অপমান করে! আর সাবু মাস্টার কিনা সেই মেয়েছেলের পক্ষ নিয়েই আমার পিঠে চাবুক চালায়!

বেরিয়ে এসে দিন কয়েক যেতে না যেতেই বাবু আমি প্যাকাটি মেরে গেলুম! এই আপনার পা ছুঁয়ে বলছি এই আক্রাগণ্ডার বাজারে আমার মত মানুষের বেঁচে থাকা যে কি দিকদারির তা আমি বুঝলুম। তখন আমি একা একাই নর-রাক্ষসের খেলা দেখাতে শুরু করলুম পাড়ায় পাড়ায়।

—এই যে দাদা, এই যে আমাকে দেখছেন, আমি একজন নর-রাক্ষস।

—তুমি নর-রাক্ষস!

—আজ্ঞে, আমি নর-রাক্ষস। দিন না একটা হাঁস কিংবা মুরগী এনে, কাঁচা-কাঁচাই খেয়ে দেখাই আপনাকে।

—আচ্ছা পাগল দেখছি, কেটে পড়ো তো বাবা! থাকা হয় কোথায়?

—আমার কোন নিবাস নেই গো বাবু! যত্রতত্র ঘুরে বেড়াই।

—তাই ঘুরে বেড়াও গে যাও। এখানে আবার জ্বালাতে এলে কেন? ঘাস খেতে পার না মাঠে গিয়ে!

—তাও পারি হুজুর! খাব?

—ডাঁহা পাগলের পাল্লাতেই পড়া গেল আজ।

—আমি পাগল নই গো কর্তা। বিশ্বাস করুন, লোকে বলে আমি আধমণী কৈলাস। আমি এক ছোটখাট সার্কাসে এতকাল নর-রাক্ষস হয়ে মুরগী খেতাম কাঁচা কাঁচা। কিন্তু—

—আচ্ছা খাও দেখি এই জঙ্গলগুলো।

—খাব! কিন্তু হুজুর মজুরি দেবেন তো। পয়সা নয়, জামা জুতো কাপড়, বাড়ি গাড়ি কিচ্ছু নয়। চাট্টিখানি ভাত। পেটটি পুরে আমাকে শেষে ভাত খাওয়াবেন তো হুজুর?

—খাওয়াব। এই জঙ্গলগুলো যদি সব খেতে পার, খাওয়াব তোমাকে ভাত।

আমি সাবড়ে দিতাম জঙ্গলগুলো। প্রতিদিনই এমনি করে অখাদ্য খেয়ে কুখাদ্য খেয়ে ভাবতাম এবার বুঝি আবার আমার অন্নদাতা পেয়ে গেলুম। কিন্তু এই যে আমার পেট দেখছেন, শুদ্ধ ভাষায় জঠর, এর ভেতরে রয়েছে এক পাতালপ্রমাণ গর্ত, কিছুতেই ভরে না বাবু। মাঝে মাঝে চেঁচিয়ে উঠে বলতে ইচ্ছে করে, আমি সত্যি সত্যি কোন মানুষ নই গো বাবু, আমি মানুষ নই। আমি একজন রাক্ষস। নরকুলে জন্ম নিয়েও রাক্ষস। মাঝে মাঝে ইচ্ছে হয় ইট কাঠ পাথর মাটি, তরুলতা, পশুপাখি, মানুষজন সব কিছু আমি খেয়ে ফেলি। বেবাক গ্রাস করে ফেলি। যেন তাবৎ ব্রহ্মাণ্ডটা জন্ম নিয়েছে আমার খাওয়ার জন্য। আমার জঠরের আগুন নেভাবার জন্য।

দাও, দাও, আরো দাও। আরো খাব আমি। আমার ভীষণ ক্ষিধে। আমি ক্ষুধার্ত। ক্ষিধেয় আমি কাতর হয়ে পড়ছি গো বাবু। এমন করে আমাকে না খাইয়ে তোমরা আমাকে মেরে ফেল না। না, না, না—আচ্ছা দিন না, আমাকে একটা কচি পাঁঠাই এনে দিন না, আমি তাই খেয়ে প্রমাণ করি আমি নর-রাক্ষস।

ক্ষুধায় পরিশ্রমে দিনে দিনে আমি কাতর হয়ে পড়লাম। আর আমি যত কাতর হতে লাগলাম ততই আমার রাক্ষসের মত চেহারা হল। এই যেমন আপনি বললেন না, অন্ধকারে হঠাৎ যদি আমাকে দেখতেন তা হলেই একটা অঘটন ঘটত। মানুষের কাছে মানুষই বুঝি সবচেয়ে বড় ভয়ের বস্তু। অথচ—

যাক গে, এর মধ্যে হঠাৎ একদিন একটা মজার ব্যাপার ঘটল। এদিক ওদিক ঘুরতে ঘুরতে এক দুপুরবেলা হাসনাবাদে গিয়ে হাজির হলাম।

তখন হাট বসেছে ওখানে। মেলাই ব্যাপারী, মেলাই ভিড়। ঝাঁকায় ঝাঁকায় মুরগী নিয়ে বসেছে দোকানী। মুরগী দেখেই তো আমার বুকের মাঝে ধুপ ধুপ করে বেজে উঠল। আমি নর-রাক্ষসের মত লাফিয়ে ঝাপিয়ে অঙ্গভঙ্গি করে চেঁচিয়ে উঠলাম, নর-রাক্ষস এসেছে, নর-রাক্ষস।

ভিড় জমে গেল আমার চারপাশে। তা, রাক্ষসের মতই চেহারা তোমার!

আমি বত্রিশ পাটি দাঁত বার করে হেসে উঠলাম। আমি নর-রাক্ষস। প্রমাণ চান, প্রমাণ? ঝাঁকা থেকে একটা মুরগী তুলে দিন, দেখুন আমি খেয়ে ফেলতে পারি কি না।

প্রমাণের আর কাজ নেই বাপু! কেটে পড়ো দেখি।

কেউ বিশ্বাস করল না আমি নররাক্ষস। অথচ বাজার ছেয়ে আছে তরিতরকারি, হাঁস মুরগী, গরু ছাগল, মাছ—ঘুরতে ঘুরতে আমি মাছের বাজারেই চলে এলাম।

নররাক্ষস এসেছে নররাক্ষস। ও দিদি মেছুনি, তোমার বোয়াল মাছটা দেবে, দেখ না, কাঁচা কাঁচাই আমি খেয়ে দেখাচ্ছি তোমাদের। আমি সব কিছু খেতে পারি। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড খেয়ে ফেলতে পারি আমি।

—তা তো চেহারা দেখেই বুঝতে পারছি। এবার ঝামেলা কমাও দেখি এখান থেকে। এই বঁটি দেখেছ, নইলে—

কোন শালাই বিশ্বাস করল না আমাকে। বরং উলটো বুঝলি রাম! ফেউ জুটে গেল পিছনে। মর জ্বালা, খোঁচাচ্ছ কেন? এই এই—কে যেন দূর থেকে একটা কলার খোসা ছুঁড়ে মারল আমার দিকে। কেউ বলল আমার পেছন দিকে একটা ক্যানাস্তারা টিন বেঁধে দেওয়া দরকার।

বাচ্চাকাচ্চা জুটে গেল মেলাই। তখন আমার পেটের ভিতর দাউ দাউ করছে আগুন। একে এই ক্ষিধে তার উপর যদি বিরক্ত করতে আসে কেউ, তখন মনের অবস্থা কেমন হয় ভেবে দেখুন। আমি বার দুয়েক হুমকি দিয়ে একটা ইট কুড়িয়ে নিলাম। এই শালা শুয়োরের বাচ্চা ফের যদি এগিয়েছিস!

কিন্তু এ কি! মেলাই ঝঞ্ঝাটে পড়লাম আমি। তাকিয়ে দেখি পিছনে যারা মজা করতে করতে এগোচ্ছিল তারা মানুষই নয়। একদঙ্গল মুরগী হয়ে গেছে কোন ফাঁকে। ঘাড় দোলাচ্ছে, পাখা ফোলাচ্ছে, ঝুঁটি নাচাচ্ছে। কোনটা লালচে, কোনটা খয়েরি, কোনটা সাদা। কোনটা দিশী পাতিমুরগী, কোনটা বিলিতি। যাহ্ বাবা, ভুল দেখছি না তো!

আমি চোখ কচলে আবার তাকালাম, মুরগী, হাজার হাজার লাখো লাখো মুরগী। সারা হাটে একটিও যে মানুষ নেই, কেবল নাদুস-নুদুস নধরকান্তি মুরগী সবাই। এতগুলো মুরগীর মধ্যে আমি একটাই মাত্র রাক্ষস, নররাক্ষস।

কেমন হল! বুঝুন ব্যাপারটা, হাসনাবাদের হাটে খানিকক্ষণ আগেও আমি গিসগিস করা মানুষজন দেখছি, আসলে ওগুলো যে মানুষই নয় কে বুঝতে পেরেছিল তখন।

মুরগীগুলো আমাকে ঘিরে যেন নাচতে শুরু করে দিল। মুরগীরা আবার বাজনা বাজাতে জানে নাকি! ও মা, এ যে দেখছি কেউ বাজাচ্ছে বিউগিল, কেউ খোল করতাল, কেউ বা পাখা দুলিয়ে সেই রেণ্ডিমাগী, কুসুমের মত নাচছে। কেউ হাসছে ফিক ফিক করে, হাসতে হাসতে লুটিয়ে পড়ছে ভুঁয়ে। ওমা, ঐ যে ঐ মুরগীটা অবিকল আড়াই ফুটি—জোকার ছোকরাটার মত অঙ্গভঙ্গি করছে।

আরো সব মজার ঘটনা ঘটল ওখানে। রাত্রি হয়ে গিয়েছিল বলে এ-পাশে ও-পাশে হ্যাজাক জ্বলে উঠল। কোনটা অনেক উঁচুতে কপিকল দিয়ে যেন ঝোলান হয়ে গেছে, কোনটা রয়েছে ভুঁয়ে, কতগুলি আবার সার বেঁধে মালার মত, অবিকল যেন সাবু মাস্টারের তাঁবু। যেন আর কিছুক্ষণের মধ্যেই খেলা শুরু হয়ে যাবে তাঁবুর মধ্যে তারই সব আয়োজন।

আমি শালা নররাক্ষস, আমি কি আর ভাল মানুষের মত হাত-পা গুটিয়ে শান্ত হয়ে বসে থাকতে পারি। আমি লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে জানান দিতে শুরু করলাম আমি নররাক্ষস।

আমার মনে হচ্ছিল সাবু মাস্টারের ফুটিফাটা তাঁবুটা যেন পালটে গেছে অনেককাল, আমি তার খবরই রাখি নি। আকাশছোঁয়া তাঁবু হয়ে গেছে সাবু মাস্টারের; এতদিনে লোকলস্কর খেলোয়াড় নাচনেওয়ালী হাজার গন্ডা জুটে গেছে ওর। হয়ত এখনি সব একে

একে আসরে এসে হাজির হয়ে যাবে।

কিন্তু প্রথমে যে এল সে হচ্ছে সাবু মাস্টার। ঝলমলে একটা জামা গায়। হাতে সেই শংকর মাছের চাবুক। আমার দিকে তাকিয়ে কেমন যেন খনখনে হাসল, কেমন আছিস রে নররাক্ষস?

আমি শালা নররাক্ষস, ঘোঁত ঘোঁত করে হাসলাম।

হাসি দেখে কি জানি কি হয়ে গেল সাবু মাস্টারের, সপাং সপাং করে চাবুক চালাল আমার পিঠে। উহু, মের না মাস্টার মের না। আমি নররাক্ষস হতে পারি কিন্তু মানুষ তো!

চাবুকের আঘাতেই বুঝি আমার তন্দ্রা কেটে গেল। দেখি হাসনাবাদের সেই হাটের তখন ভাঙনদশা। ব্যাপারীরা সব পাততাড়ি গোটাতে ব্যস্ত। আমি সেই হাটুরে ভূতদের তাড়া খেয়ে মাঠের মধ্যে এসে পড়ে আছি। পড়ে বোধ হয় অজ্ঞানই হয়ে গিয়েছিলাম। আসলে এতক্ষণ স্বপ্নের মত আবোল তাবোল কি সব মাথা মুণ্ডুই না দেখলাম। আসলে বুঝলেন বাবু পেটে ক্ষিধে থাকলে মানুষ কত কিছু না ভাবতে পারে।

লোকটা হিঁহিঁ করে আবার হাসল। ওর লাউবিচির মত পেছল-পেছল দাঁতগুলো আবার বেরিয়ে পড়ল।

বললাম, আসলে সাবু মাস্টারই তোমাকে কিনে ফেলেছে।

নররাক্ষস পেট চাপড়াতে চাপড়াতে বলল, হ্যাঁ বাবু, পেটেরই জন্য, এই জঠরের জন্য আমাকে কিনে ফেলেছে সাবু মাস্টার। আর একবার দেখা হলে ওর পায়ে হাত দিয়ে বলতাম,

—মাস্টার, তুমিই আমার অন্নদাতা, তুমিই।

তারপর ও বুঁদ হয়ে অনেকক্ষণ বসে রইল আমার পাশে। ওর চোখ ভিজে গেল জলে।

আধুনিকতা এবং রবীন্দ্র-সমালোচনা

সুতপা ভট্টাচার্য

আবু সয়ীদ আইয়ুব তাঁর আলোচনার আংশিকতা সম্বন্ধে নিজেই যথেষ্ট সচেতন। 'আধুনিক সাহিত্যের বহু বৈশিষ্ট্যের মধ্যে কেবল দুটি বৈশিষ্ট্যের কথা' তিনি তুলেছেন। এখানে প্রশ্ন. 'আধুনিক সাহিত্য' বা সাহিত্য/কাব্যের আধুনিকতা কি কতগুলি বৈশিষ্ট্যের সমাহার মাত্র? চরিত্রের বর্ণনা বাদ দিয়ে বৈশিষ্ট্যের আলোচনা কীভাবে সম্ভব? এই সূত্রে বাংলা কবিতার আলোচনায় আধুনিকতার স্বভাবনির্দেশ কতভাবে করা হয়েছে দেখা যেতে পারে। 'আধুনিক' শব্দটির অর্থ পরিপ্রেক্ষিত অনুসারে সম্প্রসারিত অথবা সংশ্লেষিত। কেউ বলেন. ঈশ্বর গুপ্তই বাংলা ভাষার প্রথম আধুনিক কবি। কেউ বলেছেন, 'রবীন্দ্রনাথেই বাংলা সাহিত্য সম্পূর্ণরূপে আধুনিক হইয়া উঠিয়াছে।' আবার একটা সময় থেকে আধুনিক কবিতা বলতে শুধু রবীন্দ্র-পরবর্তী কবিতা বোঝায় না, বোঝায় অ-রাবীন্দ্রিক কবিতা। জীবনানন্দ দাশ কোথাও আধুনিকতার সংজ্ঞা দেন এইভাবে: ক. 'মানুষের মনের চিরপদার্থ কবিতায় বা সাহিত্যে মহৎ লেখকদের হাতে যে-বিশিষ্টতায় প্রকাশিত হয়ে ওঠে তাকেই আধুনিক সাহিত্য বা আধুনিক কবিতা বলা যেতে পারে'। খ. দেশকালসন্ততি যে কোনো যুগের প্রাণবস্তু বলে পরিগণিত হবার সুযোগ যে কাব্যে লাভ করেছে সে কবিতা আধুনিক।' কিন্তু এমন ব্যাপক ও সাধারণ সংজ্ঞায় সীমাহীন থাকা তাঁর পক্ষে সর্বত্র সম্ভবপর হয় না: 'যেখানে আধুনিক কবিতা সূক্ষ্ম সুর বজায় রেখে চলছে সেখানে স্বীয় স্বাতন্ত্র্য আয়ত্তে রাখবার জন্যে রবীন্দ্রকাব্যের সঙ্গে অজ্ঞাতসারে এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে অল্পবিস্তর চেতনায়, তাকে স্বভাবতই গভীর সংঘর্ষে আসতে হয়েছে। কেননা এ হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের নিতান্তই নিজস্ব জিনিস নিয়ে আধুনিকের বোঝাপড়া—রবীন্দ্রনাথ স্পষ্টতই এই ভাবনায় আধুনিকতার বিপরীত বিন্দুতে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। কিন্তু এর মানে কি রবীন্দ্র-পরবর্তী এবং অ-রাবীন্দ্রিক কবিতা মাত্রেই আধুনিক?—উত্তর দিতে হলে আধুনিকতার ব্যাপক অথচ বিশেষ কোনো সংজ্ঞার খোঁজ করতে হয়। 'বর্তমান কবিদের অধিকাংশই সাম্প্রতিক, আধুনিক নন'—'কাব্যের মুক্তি' প্রবন্ধে এইভাবে সুধীন্দ্রনাথ সাম্প্রতিকতার থেকে আধুনিকতাকে স্বতন্ত্র করেছিলেন (অন্যত্র তাঁর লেখায় সাম্প্রতিক ও আধুনিক একই অর্থে একাকার)। কোনো নির্দিষ্ট সংজ্ঞা-নির্দেশ না করলেও সুধীন্দ্রনাথের আধুনিকতার আলোচনা অনেকাংশে এলিয়ট-এর অনুরণন। এলিয়ট থেকেই পাওয়া আত্মসচেতনতার প্রশ্নকে আধুনিক মনো-বিজ্ঞানের পটে বিস্তার দিয়ে প্রকাশ করলেন বিষ্ণু দে—'শিল্পসাহিত্যে আধুনিকতার সমস্যা ও রবীন্দ্রনাথ' প্রবন্ধে। সাম্প্রতিকতার থেকে আধুনিকতার পৃথককরণ তাঁর লেখায় যথেষ্ট গুরুত্ব পেয়েছে।—'যে মননের আর্তিতে চৈতন্যের যে সংকটযন্ত্রণায় মূর্ত হয় রচনায়, সৃষ্টিমূলক নির্মাণে মানুষের সত্তার বা চেতনার স্বকীয় বিক্ষুব্ধ মর্ষণময় বা উল্লাসকর প্রকাশ, সে-জাতের সংকট মূলত আজকের বা কালকের নিশ্চয়ই নয়।' আধুনিকতা বলতে যা বোঝেন বিষ্ণু দে এ উক্তিতে তাও নিহিত। উক্তিটির দুটি দিক: ১. সৃষ্টিমূলক নির্মাণে আমরা পাই সত্তার বা চেতনার স্বকীয় বিক্ষুব্ধ মর্ষণময় বা উল্লাসকর প্রকাশ; ২. তার মূলে থাকে নির্মাতার মননের আর্তি এবং চৈতন্যের সংকটযন্ত্রণা। প্রকাশবাদ, রবীন্দ্রনাথের

সাহিত্যতত্ত্বেরও মূল কথা। তাই দ্বিতীয় অংশটিতেই সংজ্ঞাটি বিশিষ্টতা পায়; মনন এবং চৈতন্যের টান একযোগে খোঁজে রূপ—সত্তাসংকটের মধ্যে দিয়ে ঘটে আত্মপরিচয়। যদিচ সে সংকট নিছক ব্যক্তিগত অথবা দেশকাল-অসংলগ্ন নয়—'একটা জগতের সমাজের সংস্কৃতির মধ্যে ব্যক্তিসত্তার এক তীব্র আধির আকুতির চেহারা'। বিশশতকের ইউরোপীয় সাহিত্যে অথবা তথাকথিত আধুনিক সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ দেখেছিলেন 'বিষয়ের আত্মতা'।* আগের আলোচনার সঙ্গে এর বিরোধ প্রত্যক্ষ। আধুনিকতার মূল্যবোধ 'বিষয়ের আত্মতা'র বিপরীত বরং বলা চলে। তবে বিষয়ের বহিরাশ্রয়ে আধুনিক নিজেকে বেঁধে নেন; আত্মপ্রকাশই হয়ে দাঁড়ায় আত্মসংকোচন। রবীন্দ্রনাথের উক্তিকে এইভাবে খণ্ডন করেন শঙ্খ ঘোষ—'আত্মতা' শব্দের বোধের ভিত্তিতে—'আত্মতা শব্দটির নিজস্ব মূল্য আমরা ভুলতে পারি না, রোমান্টিকতার জগতে এই শব্দকে যেন প্রক্ষিপ্তের মতো মনে হয়। সে জগৎ বিষয়ীর উন্মোচনে পরিপূর্ণ, কিন্তু তার আত্মতায় নয়।...বিষয়ীর আত্মতা সুস্থ নির্ভর হিসেবে গৃহীত হলো পারীর সেই ঘরে—...প্রতীকী কবিদের ধ্যান পর্যন্ত পেঁৗছে তবেই আমরা জানলাম বিষয়ী কীভাবে মহাবিষয়ের সমগ্রতার মধ্যে নিজেকে আবিষ্কার করে নেয়।' এইভাবে তথাকথিত আধুনিকরা আধুনিকতার এমন এক মূল্যবোধ অর্জন করে নিলেন যার একদিক সাম্প্রতিকতা ছুঁয়ে থাকলেও আর একদিক সর্বকালে বিস্তৃত। এবং এক-এক কালের দেশের সাম্প্রতিকতার সঙ্গে যুক্ত হয়ে সে মূল্যবোধ চেহারা নেয় এক-এক রকম। এই পটভূমিতে দেখলে বোদলেয়রের পাপবোধ-এর অর্থ প্রতীত হয়। নতুবা তাঁকে নিছক 'পাপবোধের কবি' বলে অভিহিত করা অবিচারের সামিল। 'মানুষ দুঃখী, কিন্তু সে জানুক সে দুঃখী, মানুষ পাপী, কিন্তু সে জানুক সে পাপী...মানুষ অমৃতাকাঙ্ক্ষী, এবং সে জানুক সে অমৃতা-কাঙ্ক্ষী: বোদলেয়ারের সমগ্র কাব্যে, যেমন ডস্টয়েভস্কির উপন্যাসে, এই বাণী নিরন্তর ধ্বনিত হচ্ছে।' জানা—কবির এই জানাকে বুদ্ধদেব বসু বলবেন 'আধুনিক সাহিত্যের অভিজ্ঞান'।

সে অভিজ্ঞান থেকে রবীন্দ্রসাহিত্য আংশিকভাবে বঞ্চিত—এই ধরনের অভিযোগ একটা সময় থেকে দানা বাঁধে। আইয়ুবের ভাষায়: 'রবীন্দ্রকাব্যে sense of evil (বা অমঙ্গলবোধ) অনুপস্থিত বা অত্যন্ত ক্ষীণ।' সুধীন্দ্রনাথ যখন রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে সমালোচনা তোলেন, তখন এইটেই থাকে প্রধান আপত্তির দিক: 'ট্রাজেডির জনকমাত্রেই...বলতে বাধ্য যে মনুষ্যত্বের অপকর্ষও তার সুপরিচিত ও আত্মনিহিত। 'পরিশেষ', 'পুনশ্চ' ও 'বীথিকা'র এক-আধটা কবিতার বিরুদ্ধ সাক্ষ্য সত্ত্বেও এ-স্বীকারোক্তি রবীন্দ্রনাথের আত্মমর্যাদাবোধে আটকায়;... অর্থাৎ তিনি মানেন না যে শুভাশুভের বিকল্প অনিবার্য।' মানেন না—এটা হয়তো একান্তবর্তী উক্তি; শিবনারায়ণ রায় বলবেন, মানেন, কিন্তু প্রকাশ করার সাহস নেই। আইয়ুব এর প্রতিবাদ করেছেন। 'আধুনিকতা ও রবীন্দ্রনাথ'-এর মুখ্য প্রতিপাদ্য এই,—জীবনের কঠোর ও কদর্য দিকটা রবীন্দ্রকাব্যে একেবারে অপ্রকাশিত কিংবা প্রকাশ তার এতই সংকুচিত যে রবীন্দ্রনাথকে কেবল মধুর রসের বা ভক্তিরসের কবি ভাবা যায়,—এ ধারণা খুবই বিভ্রান্ত।' বিভ্রান্তি দূর করার অভিপ্রায়ে আইয়ুব 'কড়ি ও কোমল' থেকে শুরু করে শেষ পর্বের কবিতা পর্যন্ত পর্যালোচনা করেন। সে আলোচনা অনেকদিক থেকে মূল্যবান। কিন্তু অমঙ্গলবোধ শব্দটি যে অর্থে গৃহীত, সেই অর্থে সর্বত্র ব্যবহৃত নয়। অমঙ্গলবোধ

* 'কাব্যে বিষয়ীর আত্মতা ছিল উনিশ শতাব্দীতে, বিশ শতাব্দীতে বিষয়ের আত্মতা' (আধুনিক কাব্য, সাহিত্যের পথে)।

বা অশুভ যাই বলা হোক তা হলো জীবনের নৈতির দিক। এবং রবীন্দ্রকাব্যের বিশ্লেষণে আইয়ুব যে অমঙ্গলবোধ দর্শান, তা অনেকস্থানেই রীতিমতো সদর্থক। 'গীতাঞ্জলি পর্বের রচনাতে দুঃখ ও অমঙ্গলকে রবীন্দ্রনাথ যেভাবে গ্রহণ করেছেন তা এই পর্বেরই বৈশিষ্ট্য'— এ বাক্যে দুঃখ ও অমঙ্গল দুটি পৃথক শব্দ প্রয়োগ করা হলো, কিন্তু 'অমঙ্গল' শব্দটি পুরো অধ্যায়ে আর কোথাও পাওয়া গেল না। তবে কি 'দুঃখ' ও 'অমঙ্গল' শব্দ দুটি প্রায় সমার্থক? কিন্তু দুঃখকে যে-যে ভাবে ব্যবহৃত হতে দেখেন লেখক এ পর্বে—ক. দুঃখের বেশেই দেবতা নেমে আসেন ভক্তের দ্বারে; খ. জীবননাথের দেওয়া দুঃখ নয়, তাঁকে না পাওয়ার দুঃখ,—সে সব প্রত্যক্ষই অমঙ্গলের বিপরীত। অর্থাৎ—নঙর্থক নয়। "চিত্রা"র 'এবার ফিরাও মোরে', "সোনার তরী"র 'গতি' এবং "মানসী"র কবিতাত্রয়তেও অমঙ্গলবোধ লক্ষ্য করা দুঃসাধ্য। 'সিন্ধুতরঙ্গ' কবিতায় আইয়ুব যে শুভ ও অশুভ দুই দেবতার নিত্য সংগ্রামের উপমা দেখেছেন তা সুধীন্দ্রনাথ-কথিত 'শুভাশুভের বিকল্প' নয়। "বলাকা"র রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে আইয়ুব লেখেন, 'এতখানি সমাজ-সচেতন অমঙ্গল-পীড়িত, দেশ-বিদেশের দুঃখ ও পাপ বিষয়ে কর্তব্যভারগ্রস্থ কর্মী-পুরুষের অস্তিত্ব ইতিপূর্বে অনুদ্ঘাটিত ছিল' এবং সুধীন্দ্রনাথের উক্তি—'বলাকার বিচরণ মর্ত্যসীমার বাইরে;...এবং এই রুক্ষ, অভব্য বস্তুতন্ত্রের পটভূমিতে 'বলাকা'র গম্ভীর শালীনতা কেমন যেন ব্যর্থ ঠেকে;'—এ উক্তির পরিপ্রেক্ষিত যদিও ছন্দ। তবে যে কবির কাছে অতল আঁধারই অকূল-আলো, তাঁকে অমঙ্গল-পীড়িত বলা একটু কঠিন। শেষপর্বের কবিতায় কদাচিৎ সংশয়ের সুর পাঠকমাত্রেই ধরতে পারেন, আইয়ুব-এর আলোচনাতেও এর বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যাবে। 'রবীন্দ্রনাথ তাঁর শেষ জীবনে এই ক্ষয়িষ্ণুতার যুগ ও সুরকে অন্তর্গ্রথিত করে কাব্য রচনা করে গেছেন'— বলে মনে করেন জীবনানন্দ দাশ। বিষ্ণু দের লেখাতেও পাওয়া যাবে অনুরূপ অভিমত,— 'দীর্ঘ সত্তর-পঁচাত্তর বছরের আস্তিক্যের অভ্যস্ত আসন সত্ত্বেও এই কবি বিশ্বের কালান্তরে এবং নিজের চৈতন্যনাশা অসুস্থতার মধ্যে বিবিক্ত আত্মচেতনার সংকটের মৌল প্রশ্নের মুখোমুখি হয়েছিলেন এবং উত্তীর্ণ কৈবল্যে লিখেছিলেন নতুন আবিষ্কারের বিরল দ্বিধান্বিত ভাষায় ছন্দে বাংলার আধুনিকতম বেশ কিছু কবিতা—আধুনিকতম কিন্তু সরলরেখায় উত্তরণশীল'। 'ফোর কোয়ার্টেটস'-এর তুলনা করে বিষ্ণু দে কখনো বলেন 'রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর আগের রোগোত্তর কবিতাগুলিতে যে-সত্তার আলো-আঁধারি জগতের প্রশ্নময় হাওয়া ওঠে, তাই যেন বিস্তৃত পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে ঘুরেফিরে এলিয়টের ফোর কোয়ার্টেটস-এ স্বয়ংসম্পূর্ণ কাব্যের বিশুদ্ধ বিষয়।' আবার কখনো 'সে বিবেচনায় প্রান্তিক থেকে শেষলেখার নবজাত রবীন্দ্রকাব্য ফোর কোআর্টেটস-এর চেয়ে একদিক থেকে শুদ্ধতর'। এই ধরনের তুলনার সার্থকতা সম্বন্ধে অনেক প্রশ্নই তোলা যায় এবং মূল্যবোধগুলিও পুনর্বার জিজ্ঞাস্য হয়! কারণ রাবীন্দ্রিক ভাববাদের উপর যে আক্রমণ এসেছে আধুনিকতার তরফ থেকে, বিষ্ণু দে অন্তত তা অস্বীকার করেন নি। 'অস্তিত্বের দুর্বহ জটিলতা এবং দুঃসমাধেয় বিরোধের মুখোমুখি হয়ে তিনি (রবীন্দ্রনাথ) আড়াল খুঁজেছেন বিমূর্ত ভাবের সরল সমন্বয়ে।......তাঁর কাব্যে জীবনকে আচ্ছন্ন করে দাঁড়িয়েছে জীবন-দেবতা;'—গ্যেটের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের তুলনা প্রসঙ্গে এ অভিযোগ তোলেন শিবনারায়ণ রায়। অবশ্য বিষ্ণু দের আলোচনায় সে 'তত্ত্ববিশ্ব' গড়ার হেতু ও উপযোগিতা উল্লেখযোগ্য প্রাধান্য পেয়েছে। প্রায় একই ধরনের যুক্তি মেলে জীবনানন্দ দাশের প্রবন্ধেও,—'কাব্যকে কবিমনের সততাপ্রসূত অভিজ্ঞতা ও কল্পনা-প্রতিভার সন্তান বলে স্বীকার করে নিলে আধ্যাত্মিক সত্যে বা যে-

কোনো সত্যে বিশ্বাস একজন কবির পক্ষে মারাত্মক দোষ নয়—বরং শূন্যবাদের চেয়ে কাব্য-সৃষ্টিকে তা ঢের বেশি জীবনীশক্তি দিতে পারে।' কোনো বিশ্বাসের প্রসিদ্ধি লাভ করার মধ্যে ভবিষ্যতের কবিতারও সম্ভাবনা নিহিত আছে—এতদূরও ভেবেছেন জীবনানন্দ। বিষ্ণু দে কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ভাববাদের হেতুস্বরূপ তাঁর দেশ-কালের পটভূমিকেই নির্দেশ করেন: 'সৌন্দর্যস্রষ্টার ঐশ্বর্যে যিনি অতুলনীয় তিনি যদি বাস্তবকে, প্রয়োজনীয়কে, প্রবৃত্তির স্থূলতাকে বারবার প্রতিবাদের স্বীকৃতি দিয়ে থাকেন তাঁর ন্যায়বিশ্বের দ্বন্দ্বমত্ততায়, তাহলে তার কারণ ছিল ভয়ানকভাবে সত্য—কি তাঁর বাস্তবজীবনের পরিবেশে কি চিন্তার উপপ্লবে।... তাই রবীন্দ্রনাথকে দেশ ও ইওরোপ, হিন্দুসভ্যতা ও ব্রাহ্মসংস্কৃতি...নানারকম দ্বিধাদ্বন্দ্বের মধ্যে একটা মানসজগৎ গড়তে হয়েছিল বহু-ধারা-সঞ্জীবিত কিন্তু মুখ্যত একক তত্ত্বের হৃদয়-অরণ্যে, যেখানে আনন্দরূপ, অমৃত, অনন্ত, সত্য, সুন্দর, মঙ্গল প্রভৃতি বাধ্যতই অস্পষ্ট কিন্তু সৃজনশীল নিশ্চিতি দিতে পারত, যে নিশ্চিতির বোধের রবীন্দ্রনাথের অসীম, অনির্বচনীয়, ইত্যাদি ধারণা কুৎসিত বিশৃঙ্খল অসম্পূর্ণ কবিস্বভাব-বিদ্বেষী বাস্তবের চেয়ে সত্য ও নিরাপদ।'--'নিরাপদ' শব্দটির জন্য যদিও এ উক্তি আর শ্লেষমুক্ত থাকে না। এইভাবেই তিনি রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্যবোধকে আংশিকতাদুষ্ট বলে তার দেশকালগত ব্যাখ্যাও দিয়ে দেন। রবীন্দ্রনাথের নির্দিষ্টতার সম্পূর্ণ রেখাচিত্র দাখিল করেও বিষ্ণু দে দেখাতে জানেন কীভাবে তিনি আধুনিক: 'বিশ্ববিচারে আমাদের গৌরব হচ্ছে কীভাবে এবং কতখানি ঐ নির্দিষ্টতাকে ক্রমান্বয়ে সংকট উত্তরণের চৈতন্যময়তায় ঐশ্বর্যবিস্তারে অতিক্রম করেছিলেন।' কিন্তু নির্দিষ্টতার প্রশ্ন কি আর টেঁকে যদি তিনি দেখতে পান রবীন্দ্রনাথ 'এলিয়টের পিকাসোর প্রায় সহযাত্রী সহধর্মী অগ্রজ'? অন্যদিকে বিষ্ণু দের মননেই ধরা পড়ে রবীন্দ্রনাথের তত্ত্বজগতে 'সত্য ও তথ্য অসংলগ্ন, বিরোধী';—এই সিদ্ধান্তে পৌঁছনোর পথ আলোচনায় তেমন স্পষ্ট নয় এবং রবীন্দ্রপাঠক মাত্রেই স্বীকার করবেন, 'তথ্যের মধ্যে সত্যের প্রকাশই হচ্ছে প্রকাশ'—এই উক্তির বৈপরীত্য রবীন্দ্রনাথে অনুপস্থিত। দার্শনিক আলোচনায় প্রমাণ করা সম্ভব, তথ্য ও সত্যের সামঞ্জস্য-সাধনই রবীন্দ্রনাথের তত্ত্ব বিশ্বের বৈশিষ্ট্য (শচীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, 'রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্যদর্শন', "সাহিত্যপত্র", শারদীয় ১৩৭২)।

রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে ভাষাগত আপত্তিও উঠছে বলে আইয়ুব লক্ষ্য করেন—'রবীন্দ্রনাথ যা বলেন—বিশেষত শেষ দশকের কবিতায়—বড়ো সোজাসুজি বলেন, ভাষা প্রায় গদ্যের মতো স্বচ্ছ ও ঋজু, সব কটি শব্দ তার অভিধাযুক্ত সব কটি বাক্যের মানে বোঝা যায় অনায়াসে বা অল্পায়াসে।' সোজাসুজি, স্বচ্ছ ও ঋজু ভাষাও যে কবিতায় থাকে, আধুনিক কবিতাতেও—দেখিয়ে আইয়ুব এর প্রতিবাদ জানিয়েছেন। তাঁর বিতর্কের বিষয় যেহেতু এক রবীন্দ্রনাথের দুই কবিতা, এ আলোচনা তাই বিশেষ ফলপ্রসূ নয়। শেষ পর্বের কবিতাকে 'বৈদগ্ধ্যের নৈপুণ্যের সব অভ্যাসকে যেন কীর্তিনাশার বানে ভাসিয়ে দিয়ে আবার মুক্তিস্নাত দীনদরিদ্র সরলতার পত্তন' বলে বিষ্ণু দে প্রশংসা করেন, কারণ 'ভাবালুর সাজ-সজ্জাহীন কাব্যেই আধুনিকতার কাব্যরূপ সাক্ষাৎ শুদ্ধ হতে পারে'। কিন্তু আপত্তির দিকটাও তাঁর আলোচনাতেই লক্ষণীয়। খানিকটা টেকনিকাল ভাষাতে তিনি বলেন,—ক. তাঁর প্রতীকোৎসারী ধ্যান হয়ে ওঠে রূপকে ব্যক্ত ধারণা; খ. উৎপ্রেক্ষার ব্যঞ্জনার চেয়ে উপমার ব্যাখ্যানের প্রবণতা। দুটি আপত্তিরই আসল জোরটা ব্যাখ্যানের উপর। ব্যাখ্যানের বৈপরীত্যে বিষ্ণু দে বলেন সংহতির মিতব্যয়িতার কথা। বস্তুত ব্যাখ্যান বা বর্ণনার পরিবর্তে আধুনিক

কবিতায় যা চাওয়া হয় তাকে বলব রূপায়ণ (expression)। "নবজাতক"-এর 'প্রশ্ন' কবিতা বর্ণনামূলক এবং "শেষ লেখা"র 'প্রথম দিনের সূর্য' চরম রূপ। রূপ কিছু বলে না, বাজে। বাংলা কবিতায় এ রূপায়ণ রবীন্দ্রনাথেই পাওয়া গেছে প্রথম। ('সারদামঙ্গল' থেকে 'সাধের আসন' পর্যন্ত বিহারীলাল রূপায়ণের জন্য রূপ খুঁজেছেন, পান নি;) 'একালের কবিতা'র ভূমিকায় বিষ্ণু দে লেখেন তাই, 'কবি আর ব্যক্তিসত্তার নির্বিশেষ আকুতির নিরাবলম্ব প্রকাশ দিয়েই ক্ষান্ত থাকতে পারেন নি, প্রয়াসী হয়েছেন প্রকাশকে বাঁধতে বিশেষের আততিতে, রূপের বা কাব্যশরীরের সজ্ঞান নির্দিষ্টতায়। মনে হয় বাংলা কবিতার দুঃসাহসী আধুনিক পর্বের পুরোধার এই অর্থে সূত্রপাত ও পরিণতি কড়ি ও কোমল থেকে শেষ লেখা পর্যন্ত।' তবু, সংযমের অভাবে বা ব্যাখ্যান-প্রবণতায় রূপায়ণ বিনষ্ট হয়েছে—এমন কবিতার সংখ্যাই রবীন্দ্র-কাব্যধারায় বেশি। আইয়ুব যেভাবে বলেন সুধীন্দ্রনাথের অভিযোগ ঠিক তাঁর উল্টো—'তবু কালক্রমে নূতন ভাষানির্মাণের উন্মাদনা তাঁকে এমনই পেয়ে বসল যে তিনি তাঁর স্বভাবদত্ত সংবেদন-শীলতা তথা দৃকশক্তির ব্যবহার প্রায় ভুলে গেলেন, তাঁর রচনারীতি প্রাক্তন সারল্য ঘুচিয়ে আত্মজ্ঞ বক্রোক্তির শরণ নিলে, এবং তিনি তাঁর আদিম অভিজ্ঞতার পুঁজি ভাঙিয়ে, সেইসঙ্গে উপমা-অলংকারের খাদ মিশিয়ে, কার্পণ্যসহকারে পরবর্তী লেখার কাজ চালাতে লাগলেন।......আজ পর্যন্ত সাহিত্যিক প্রগতির পথ-নির্দেশ করেও রবীন্দ্রনাথ গত চল্লিশ বছর ধরে স্বকীয় উপলব্ধির বহিরাশ্রয় সন্ধানে বিরত আছেন।'—চল্লিশ বছরের হিসেবটা যদিও সুধীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত; ক্ষণিকাই হয়তো তাঁর কাছে রাবীন্দ্রিক ঐশ্বর্যের চরম বলে বিবেচ্য হয়েছিল।

এখনকার কবিতায় আঙ্গিকগত যেসব বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা হয়, রবীন্দ্রনাথে সেসব কেউ খোঁজেন না। 'আয়রণি উদ্ভাবলী দ্বিধা বা ব্যাঙ্গোক্তির তীব্রতা রবীন্দ্রনাথের হাস্যরস থেকে ভিন্ন'—বিষ্ণু দের এ উক্তি রবীন্দ্রনাথের প্রতি কোনো অভিযোগ নয়। প্রসঙ্গ-প্রকরণের পরস্পর-সাপেক্ষতাই এর কারণ। 'দৃষ্টিভঙ্গির এই ব্যতিরেকী গতির জন্যে আধুনিক বাংলা কবিতার চিন্তা ও ভাষা রবীন্দ্রকাব্যের থেকে পৃথক পথে চলতে শুরু করেছে—এইটুকুমাত্র বলতে পারা যায়' (জীবনানন্দ দাশ)।

'আধুনিকতা ও রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে আইয়ুব রবীন্দ্রনাথকে আধুনিক প্রমাণ করার প্রয়াস করেন নি। আধুনিক সাহিত্যের তুলনায় রবীন্দ্রসাহিত্য যে কত মহৎ—তাই বরং তাঁর লেখার প্রতিপাদ্য। প্রতিপক্ষে বিষ্ণু দে রবীন্দ্রনাথে আধুনিকতার মূল্যবোধ অর্জিত হতে দেখেন, বিশেষত তাঁর চিত্রকলায়, শেষপর্বের কবিতাবলীতে। কিন্তু রাবীন্দ্রিক সৃষ্টি-কর্মের সামগ্রিক কোনো বিশ্লেষণ পাওয়া যায় না তাঁর আলোচনায়,—অভাববোধ থেকে যায়। প্রশ্ন জাগে, কবিতায় বা ছবিতে কতটুকু প্রকাশিত সে মূল্যবোধ, এবং সেটুকুই সব কিনা। কবি রবীন্দ্রনাথেরই অন্যবিধ অভিব্যক্তি তাঁর নাটক, উপন্যাসে। সেখানেও খুঁজে দেখলে হয়তো দেখা যাবে, সর্বনাশের চূড়ায় দাঁড়িয়ে রাজা তার আত্মপরিচয় জেনে নিচ্ছে, প্রাত্যহিকতার আলিঙ্গনে সাধ মিটছে না প্রাণস্বরূপা দামিনীর।

আধুনিকতার নিরিখে রবীন্দ্রনাথকে যাচাই করে নেবার ইচ্ছে আজকে স্বাভাবিক। তাতে যদি তিনি অনাধুনিক প্রমাণও হন তবু আমাদের পক্ষে তাঁকে অস্বীকারের প্রশ্ন ওঠে না। কারণ জন্মসূত্রেই তিনি আমাদের অঙ্গীকৃত। তাই যথার্থ নয় আইয়ুবের নিম্নোক্ত উক্তি—'বাংলা কাব্যের ঐতিহ্যও এঁদের (বর্তমান শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে যাঁদের কবিজন্ম) প্রভাবিত করেছে তবে সে ঐতিহ্য রবীন্দ্র-কাব্যবাহিত নয়'; নতুবা রবীন্দ্রসাহিত্য

নামে সৎ সাহিত্যের মূল্যায়ন হয় নিরর্থক। রবীন্দ্রনাথকে পাশ কাটিয়ে চলে যেতে পেরেছিলেন যে আধুনিক, সেই জীবনানন্দ দাশেরই উক্তি এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়—'ইংরেজ কবিরা যেমন যুগে যুগে ঘুরে ফিরে শেকস্‌পীয়র-এর কেন্দ্রিকতার থেকে সঞ্চারিত হয়ে বৃত্ত রচনা করে ব্যাপ্ত হয়ে চলেছে, আমাদের কবিরাও রবীন্দ্রনাথকে পরিক্রমা করে তাই করবে'—এই ধারণা আজ পর্যন্ত অমূলক বা অসঙ্গত বলে প্রমাণিত হয়নি বলেই মনে হয়।*

*এই লেখায় ব্যবহৃত বইগুলির নাম নীচে দেওয়া হল:
আবু সয়ীদ আইয়ুব—"আধুনিকতা ও রবীন্দ্রনাথ"; জীবনানন্দ দাশ—"কবিতার কথা"; সুধীন্দ্রনাথ দত্ত—"স্বগত", "কুলায় ও কালপুরুষ"; বুদ্ধদেব বসু—"প্রবন্ধ-সংকলন"; বিষ্ণু দে—"শিল্প সাহিত্যে আধুনিকতার সমস্যা ও রবীন্দ্রনাথ" ("সাহিত্যপত্র" পত্রিকায় প্রবন্ধাকারে প্রকাশিত), "একালের কবিতা"; শিবনারায়ণ রায়—"সাহিত্যচিন্তা"; শঙ্খ ঘোষ—"সপ্ত সিন্ধু দশ দিগন্ত"।

নীলুর দুঃখ

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

সক্কালবেলাতেই নীলুর বিশ চাক্কি ঝাঁক হয়ে গেল। মাসের একুশ তারিখ। ধারে কাছে কোনো পেমেন্ট নেই। বাবা তিনদিনের জন্য মেয়ের বাড়িতে গেছে বারুইপুর—মহা টিক্‌রমবাজ লোক—সাউথ শিয়ালদায় গাড়িতে তুলে দিয়ে নীলু যখন প্রণাম করল তখন হাসি-হাসি মুখে বুড়ো নতুন সিগারেটের প্যাকেটের সিলোফেন ছিঁড়ছে। তিনদিন মায়ের আওতার বাইরে থাকবে বলেই বুঝি ঐ প্রসন্নতা—ভেবেছিল নীলু। গাড়ি ছাড়বার পর হঠাৎ খেয়াল হল, তিনদিনের বাজার খরচ রেখে গেছে তো! সেই সন্দেহ কাল সারা বিকেল খচখচ করেছে। আজ সকালেই মশারির মধ্যে আধখানা ঢুকে তাকে ঠেলে তুলল মা—বাজার যাবি না, ও নীলু?

তখনই বোঝা গেল বুড়ো চাক্কি রেখে যায়নি। কাল নাকি টাকা তুলতে রনোকে পাঠিয়েছিল, কিন্তু দস্তখত মেলেনি বলে উইথড্রয়াল ফর্ম ফেরত দিয়েছে পোস্টাপিস। কিন্তু নীলু জানে পুরোটা টিক্‌রমবাজী। বুড়ো আগে ছিল রেলের গার্ড, রিটায়ার করার পর একটা মুদীর দোকান দিয়েছিল—অনভিজ্ঞ লোক, তার ওপর দোকান ভেঙে যেতে—ফলে দোকান গেল উঠে। এখন তিন রোজগেরে ছেলের টাকা নিয়ে পোস্ট-অফিসে রাখে আর প্রতি সপ্তাহে খরচ তোলে। প্রতিদিন বাজারের থলি দশমেসে পেটের মতো ফুলে না থাকলে বুড়োর মন ভজে না। মাসের শেষদিকে টাকা ফুরোলেই টিক্‌রমবাজী শুরু হয়। প্রতি সপ্তাহে যে লোক টাকা তুলছে তার নাকি দস্তখত মেলে না!

নীলু হাসে। সে কখনো বুড়োর ওপর রাগ করে না। বাবা তার দিকে আড়ে আড়ে চায় মাসের শেষ দিকটায়। ঝাঁক দেওয়ার নানা চেষ্টা করে। নীলুর সঙ্গে বাবার একটা লুকোচুরি খেলা চলতে থাকে।

বাঙালের খাওয়া। তার ওপর পুঁটিয়ারীর নাড়ুমামা, মামী, ছেলে, ছেলের বৌ—চারটে বাইরের লোক নিমন্ত্রিত, ঘরের লোক বারোজন—নীলু নিজে, মা, ছটা ভাই, দুটো ধুমসী বোন, বিধবা মাখনী পিসি, বাবার জ্যাঠাতো ভাই, আইবুড়ো নিবারণ কাকা—বিশ চাক্কির নীচে বাজার নামে?

রবিবার। বাজার নামিয়ে রেখে নীলু একটু পাড়ায় বেরোয়। কদিন ধরেই পোগো ঘুরছে পিছন পিছন। তার কোমরে নানা আকৃতির সাতটা ছুরি। ছুরিগুলো তার মায়ের পুরোনো শাড়ির পাড় ছিঁড়ে তাই দিয়ে জড়িয়ে সযত্নে শার্টের তলায় গুঁজে রাখে পোগো। পাড়ার লোক বলে, পোগো দিনে সাতটা মার্ডার করে। নিতান্ত এলেবেলে লোকও পোগোকে যেতে দেখলে হেঁকে ডাক পাড়ে—কী পোগোবাবু, আজ কটা মার্ডার হল? পোগো হুস্ হাস্ করে চলে যায়।

পরশুদিন পোগোর মেজোবৌদি জানালা দিয়ে নীলুকে ডেকে বলেছিল—পোগো যে তোমাকে মার্ডার করতে চায়, নীলু, খবর রাখো?

তাই বটে। নীলুর মনে পড়ল, কয়েকদিন যাবৎ সে অফিসে যাওয়ার সময়ে লক্ষ্য করেছে পোগো নিঃশব্দে আসছে পিছন পিছন। বাস-স্টপ পর্যন্ত আসে। নীলু কখনো

ফিরে তাকালে পোগো উর্ধমুখে আকাশ দেখে আর বিড়বিড় করে গাল দেয়।

আজ বিশ চাক্কি ঝাঁক হয়ে যাওয়ায় নীলুর মেজাজ ভাল ছিল না। নবীনের মিষ্টির দোকানের সিঁড়িতে বসে সিগারেট ফুঁকছিল পোগো। নীলুকে দেখেই আকাশে তাকাল। না-দেখার ভান করে কিছুদূর গিয়েই নীলু টের পেল পোগো পিছু নিয়েছে।

নীলু ঘুরে দাঁড়াল। সঙ্গে সঙ্গে পোগো উল্টোবাগে ঘুরে হাঁটতে লাগল। এগিয়ে গিয়ে তার পাছায় ডান পায়ের একটা লাথি কষাল নীলু—শালা, বদের হাঁড়ি!

কাঁই শব্দ করে ঘুরে দাঁড়ায় পোগো। জিভ আর প্যালেটের কোনো দোষ আছে পোগোর, এখনো জিভের আড় ভাঙেনি। ছত্রিশ বছরের শরীরে তিন বছর বয়সী মগজ নিয়ে সে ঘুরে বেড়ায়। গরম খেয়ে বলল—খুব ঠাবহান, নীলু, বলে ডিট্টি খুব ঠাবহান!

—ফের! কষাবো আর একটা?

পোগো থতিয়ে যায়। শার্টের ভিতরে লুকোনো হাত ছুরি বের করবার প্রাক্কালের ভঙ্গীতে রেখে বলে—একডিন ফুটে ডাবি ঠালা।

নীলু আর একবার ডান পা তুলতেই পোগো পিছিয়ে যায়। বিড় বিড় করতে করতে কারখানার পাশের গলিতে ঢুকে পড়ে।

সেই কবে থেকে মার্ডারের স্বপ্ন দেখে পোগো। সাত-আটখানা ছুরি বিছানায় নিয়ে ঘুমোতে যায়। পাছে নিজের ছুরি ফুটে ও নিজে মরে—সেই ভয়ে ও ঘুমোলে ওর মা এসে হাতড়ে হাতড়ে ছুরিগুলো সরিয়ে নেয়। মার্ডারের বড় শখ পোগোর। সারাদিন সে লোককে কত মার্ডারের গল্প করে! কলকাতায় হাঙ্গামা লাগলে ছাদে উঠে দুহাত তুলে লাফায়। মার্ডারের গল্প যখন শোনে তখন নিথর হয়ে যায়।

নীলু গতবার গ্রীষ্মে দার্জিলিঙ বেড়াতে গিয়ে একটা ভোজালি কিনেছিল। তার সেই শখের ভোজালিটা দিনসাতেক আগে একদিনের জন্য ধার নিয়েছিল পোগো। ফেরত দেওয়ার সময়ে চাপা গলায় বলেছিল—ভয় নেই, ভাল করে ঢুয়ে ডিয়েছি।

—কী ধুয়েছিস? জিজ্ঞেস করেছিল নীলু।

অর্থপূর্ণ হেসেছিল পোগো, উত্তর দেয়নি। তোমরা বুঝে নাও কী ধুয়েছি। সেদিনও একটা লাথি কষিয়েছিল নীলু—শালার শয়তানী বুদ্ধি দেখ। ধুয়ে দিয়েছি—কী ধুয়েছিস আব্বে পোগোর বাচ্চা?

সেই থেকেই বোধহয় নীলুকে মার্ডার করার জন্য ঘুরছে পোগো। তার লিস্টে নীলু ছাড়া আরো অনেকের নাম আছে যাদের সে মার্ডার করতে চায়।

আজ সকালে বুটিশকে খুঁজছে নীলু। কাল বুটিশ জিতেছে। দুশো সত্তর কি আশি টাকা। সেই নিয়ে খিচাং হয়ে গেল কাল।

গলির মুখ আটকে খুদে প্যান্ডেল বেঁধে বাচ্চাদের ক্লাবের রজত-জয়ন্তী হচ্ছিল কাল সন্ধেবেলায়। পাড়ার মেয়ে-বৌ, বাচ্চারা ভিড় করেছিল খুব। সেই ফাংশন যখন জমজমাট তখন বড় রাস্তায় ট্যাক্সি থামিয়ে বুটিশ নামল। টলতে টলতে ঢুকল গলিতে, দু বগলে বাংলার বোতল। সঙ্গে ছটকু। পাড়ায় পা দিয়ে ফাংশনের ভিড় দেখে নিজেকে জাহির করার জন্য দুহাত ওপরে তুলে হাঁকাড় ছেড়েছিল বুটিশ—ঈ-ঈ-ঈ-দ্ কা চাঁ-আ-আ-দ! বগল থেকে দুটো বোতল পড়ে গিয়ে ফট্-ফটাস্ করে ভাঙল। হুড়দৌড় লেগে গিয়েছিল বাচ্চাদের ফাংশনে। পাঁচ বছরের টুমিয়ানী তখন ডায়াসে দাঁড়িয়ে 'কাঠবেরালী, কাঠবেরালী, পেয়ারা তুমি খাও...' বলে দুলতে দুলতে থেমে ভ্যাঁ করার জন্য হাঁ করেছিল মাত্র। সেই

সময়ে নীলু, জগু, জাপান এসে দুটোকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল হরতুনের চায়ের দোকানে। নীলু বুটিশের মাথায় জল ঢালে আর জাপান পিছন থেকে হাঁটুর গুঁতো দিয়ে জিজ্ঞেস করে—কত জিতেছিস? প্রথমে বুটিশ চেঁচিয়ে বলেছিল—আব্বে, পণ্ডা-আ-শ হা-জা-আ-র। জাপান আরো দুবার হাঁটু চালাতেই সেটা নেমে দাঁড়াল দু হাজারে। সেটাও বিশ্বাস হল না কারো। পাড়ার বুকি বিশুর কাছ থেকে সবাই জেনেছে, ঈদ কা চাঁদ হট ফেবারিট ছিল। আরো কয়েকবার ঝাঁকাড় খেয়ে সত্যি কথা বলল বুটিশ—তিনশো মাইরি বলছি—বিশ্বাস কর। পকেট সার্চ করে শ' দুইয়ের মতো পাওয়া গিয়েছিল।

আজ সকালে তাই বুটিশকেই খুঁজছে নীলু। মাসের একুশ তারিখ। বুটিশের কাছে ত্রিশ টাকা পাওনা। গত শীতে দর্জির দোকান থেকে বুটিশের টেরিকটনের প্যান্টটা ছাড়িয়ে নিয়েছিল নীলু। এতদিন চায়নি। গতকাল নিয়ে নিতে পারত, কিন্তু মাতালের কাছ থেকে নেওয়া উচিত নয় বলে নেয়নি। আজ দেখা হলে চেয়ে নেবে।

চায়ের দোকানে বুটিশকে পাওয়া গেল না। ভি. আই. পি. রোডের মাঝখানে যে সবুজ ঘাসের চত্বরে বসে তারা আড্ডা মারে সেখানেও না। ফুলবাগানের মোড় পর্যন্ত এগিয়ে দেখল নীলু। কোথাও নেই। কাল রাতে নীলু বেশীক্ষণ ছিল না হরতুনের দোকানে। জাপান, জগু ওরা বুটিশকে ঘিরে বসেছিল। বহুকাল তারা এমন মানুষ দেখেনি যার পকেটে ফালতু দুশো টাকা। জাপান মুখ চোখাচ্ছিল। কে জানে রাতে আবার ওরা ট্যাক্সি ধরে ধর্মতলার দিকে গিয়েছিল কিনা! গিয়ে থাকলে ওরা এখনো বিছানায় নিয়ে আছে। দুপুর গড়িয়ে উঠবে। বুটিশের বাড়িতে আজকাল আর যায় না নীলু। বুটিশের মা আর দাদার সন্দেহ ওকে নষ্ট করেছে নীলুই। নইলে নীলু গিয়ে বুটিশকে টেনে তুলত বিছানা থেকে, বলত,—না, হকের পয়সা পেয়েছিস, হিস্যা চাই না, আমার হক্কেরটা দিয়ে দে।

নাঃ। আবার ভেবে দেখল নীলু। দুশো টাকা—মাত্র দুশো টাকার আয়ু এ বাজারে কতক্ষণ? কাল যদি ওরা সেকেন্ড টাইম গিয়ে থাকে ধর্মতলায় তবে বুটিশের পকেটে এখন হপ্তার খরচও নেই।

মোড়ে দাঁড়িয়ে একটা সিগারেট ধরায় নীলু। ভাবে, বিশ চাক্কি যদি ঝাঁক হয়েই গেল তবে কীভাবে বাড়ির লোকজনের ওপর একটা মৃদু প্রতিশোধ নেওয়া যায়!

অমনি শোভন আর তার বৌ বল্লরীর কথা মনে পড়ে গেল তার। শোভন কাজ করে কাস্টমসে। তিনবারে তিনটে বিলিতি টেরিলেনের শার্ট তাকে দিয়েছে শোভন, আর দিয়েছে সস্তায় একটা গ্রুয়েন ঘড়ি। তার ভদ্রলোক বন্ধুদের মধ্যে শোভন একজন—যাকে বাড়িতে ডাকা যায়। কতবার ভেবেছে নীলু শোভন, বল্লরী আর ওদের দুটো কচি মেয়েকে এক দুপুরের জন্য বাড়িতে নিয়ে আসবে, খাইয়ে দেবে ভাল করে। খেয়ালই থাকে না এসব কথা।

মাত্র তিন স্টপ দূরে থাকে শোভন। মাত্র সকাল ন'টা বাজে। আজ ছুটির দিন, বল্লরী নিশ্চয়ই রান্না চাপিয়ে ফেলেনি! উনুনে আঁচ দিয়ে চা-ফা, লুচি-ফুচি হচ্ছে এখনো! দুপুরে খাওয়ার কথা বলার পক্ষে খুব বেশি দেরি বোধহয় হয়নি এখনো।

ছত্রিশ নম্বর বাসটা থামতেই উঠে পড়ল নীলু।

উঠেই বুঝতে পারে। বাসটা দখল করে আছে দশ বারো জন ছেলে-ছোকরা। পরনে শার্ট পায়জামা, কিংবা সরু প্যান্ট। বয়স ষোলোর এদিক ওদিক। তাদের হাসির শব্দ থুথু ফেলার আগের গলাখাঁকারির—খ্যা-অ্যা-অ্যা-র মতো শোনাচ্ছিল। লেডীজ সীটে দুতিনজন মেয়েছেলে বাইরের দিকে মুখ ফিরিয়ে বসে। দুচারজন ভদ্রলোক ঘাড় সটান

করে পাথরের মতো সামনের শূন্যতার দিকে চেয়ে আছে। ছোকরারা নিজেদের মধ্যেই চেঁচিয়ে কথা বলছে। উল্টোপাল্টা কথা, গানের কলি। কন্ডাক্টর দুজন দু দরজায় সিঁটিয়ে দাঁড়িয়ে। ভাড়া চাইবার সাহস নেই।

তবু ছোকরাদের একজন দলের পরমেশ নামে আর একজনকে ডেকে বলছে—পরমেশ, আমাদের ভাড়াটা দিলি না?

—কত করে?

—আমাদের হাফ্-টিকিট। পাঁচ পয়সা করে দিয়ে দে।

—এই যে কন্ডাক্টরদাদা, পাঁচ পয়সার টিকিট আছে তো! বারোখানা দিন।

পিছনের কন্ডাক্টর রোগা, লম্বা, ফর্সা। না-কামানো কয়েক দিনের দাড়ি থুতনিতে জমে আছে। এবড়োখেবড়ো গজিয়েছে গোঁফ। তাতে তাকে বিষণ্ণ দেখায়। সে তবু একটু হাসল ছোকরাদের কথায়। অসহায় হাসিটি।

নীলু বসার জায়গা পায়নি। কন্ডাক্টরের পাশে দাঁড়িয়ে সে বাইরের দিকে মুখ ফিরিয়ে ছিল।

বাইরে কোথাও পরিবার পরিকল্পনার হোর্ডিং দেখে জানালার পাশে বসা একটা ছেলে চেঁচিয়ে বলল—লাল ত্রিভুজটা কী বল তো মাইরি!

—ট্র্যাফিক সিগন্যাল বে, লাল দেখলে থেমে যাবি।

—আর নিরোধ! নিরোধটা কী যেন!

—রাজার টুপি...রাজার টুপি...

—খ্যা-অ্যা-অ্যা-খ্যা-অ্যা-অ্যা...

—খ্যা...

পরের স্টপে বাস আসতে তারা হেঁকে বলল—বেঁধে...লেডীজ...

নেমে গেল সবাই। বাসটাকে ফাঁকা নিস্তব্ধ মনে হল এবার। সবাই শরীর শ্লথ করে দিল। একজন চশমা-চোখে যুবা কন্ডাক্টরের দিকে চেয়ে বলল—লাথি দিয়ে নামিয়ে দিতে পারেন না এসব এলিমেন্টকে!

কন্ডাক্টর ম্লান মুখে হাসে।

ঝুঁকে নীলু দেখছিল ছেলেগুলো রাস্তা থেকে বাসের উদ্দেশে টিটকিরি ছুঁড়ে দিচ্ছে। কান কেমন গরম হয়ে যায় তার। লাফিয়ে নেমে পড়তে ইচ্ছে করে। লাঠি ছোরা বোমা যা হোক অস্ত্র নিয়ে কয়েকটাকে খুন করে আসতে ইচ্ছে করে।

হঠাৎ পোগোর মুখখানা মনে পড়ে নীলুর। জামার আড়ালে ছোরা নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে পোগো। স্বপ্ন দেখছে মার্ডারের। তারা সবাই পোগোর পিছনে লাগে, মাঝে মধ্যে লাথি কষায়। তবু কেন যে পোগোর মতোই এক তীব্র মার্ডারের ইচ্ছে জেগে ওঠে নীলুর মধ্যেও মাঝে মাঝে। এত তীব্র সেই ইচ্ছে যে আবেগ কমে গেলে শরীরে একটা অবসাদ আসে। তেতো হয়ে যায় মন।

শোভন বাথরুমে। বল্লরী এসে দরজা খুলে চোখ কপালে তুলল—ওমা, আপনার কথাই ভাবছিলাম সকালবেলায়। অনেকদিন বাঁচবেন।

শোভনের বৈঠকখানাটি খুব ছিমছাম, সাজানো। বেতের সোফা, কাচের বুককেস, গ্রুন্ডিগের রেডিওগ্রাম, কাঠের টবে মানিপ্ল্যান্ট, দেয়ালে বিদেশী বারো-ছবিওলা ক্যালেন্ডার, মেঝেয় কয়ের কার্পেট। মাঝখানে নীচু টেবিলের ওপর মাখনের মতো রঙের ঝকঝকে

অ্যাশ-ট্রে-টার সৌন্দর্যও দেখবার মতন। মেঝের ইংরিজি ছড়ার বই খুলে বসে ছিল শোভনের চার আর তিন বছর বয়সের মেয়ে মিলি আর জুলি। একটু ইংরিজি কায়দায় থাকতেই ভালবাসে শোভন। মিলিকে কিন্ডারগার্টেনের বাস এসে নিয়ে যায় রোজ। সে ইংরিজি ছড়া মুখস্থ বলে।

নীলুকে দেখেই মিলি জুলি টপাটপ উঠে দৌড়ে এল।

মিলি বলে—তুমি বলেছিলে ভাত খেলে হাত এঁটো হয়। এঁটো কী?

দুজনকে দু কোলে তুলে নিয়ে ভারী একরকমের সুখবোধ করে নীলু। ওদের গায়ে শৈশবের আশ্চর্য সুগন্ধ।

মিলিজুলি তার চুল, জামার কলার লণ্ডভণ্ড করতে থাকে। তাদের শরীরের ফাঁক দিয়ে মুখ বের করে নীলু বল্লরীকে বলে—তোমার হাঁড়ি চড়ে গেছে নাকি উনুনে!

—এইবার চড়বে। বাজার এলো এইমাত্র।

—হাঁড়ি ক্যানসেল করো আজ। বাপ গেছে বারুইপুর। সকালেই বিশ চাক্কি ঝাঁক হয়ে গেল। সেটা পুষিয়ে নিতে হবে তো! তোমার এ দুটো পুঁটলি নিয়ে দুপুরের আগেই চলে যেও আমার গাড্ডায়, ঘুমে লিও সবাই।

বল্লরী ঝেঁঝে ওঠে—কী যে সব অসভ্য কথা শিখেছেন বাজে লোকদের কাছ থেকে। নেমন্তন্নের ঐ ভাষা!

বাথরুম থেকে শোভন চেঁচিয়ে বলে—চলে যাস না নীলু, কথা আছে।

—যেও কিন্তু। নীলু বল্লরীকে বলে—নইলে আমার প্রেস্টিজ থাকবে না।

—বাঃ, আমার যে ডালের জল চড়ানো হয়ে গেছে। এত বেলায় কি নেমন্তন্ন করে মানুষ!

নীলু সেসব কথায় কান দেয় না। মিলিজুলির সঙ্গে কথা বলতে শুরু করে।

শোভন সকালেই দাড়ি কামিয়েছে। নীল গাল। মেদবহুল শরীরে এঁটে বসেছে ফিনফিনে গেঞ্জি, পরনে পাটভাঙা পায়জামা। গত বছর যৌথ পরিবার থেকে আলাদা হয়ে এল শোভন। বাসা খুঁজে দিয়েছিল নীলুই। চারদিনের নোটিশে। এখন সুখে আছে শোভন। যৌথ পরিবারে থাকার সময়ে এত নিশ্চিন্ত আর তৃপ্ত আর সুখী দেখাতো না তাকে।

পাছে হিংসা হয় সেই ভয়ে চোখ সরিয়ে নেয় নীলু।

নেমন্তন্নের ব্যাপার শুনে শোভন হাসে—আমিও যাবো-যাবো করছিলাম তোর কাছে। এর মধ্যেই চলে যেতাম। ভালই হল।

এক কাপ চা আর প্লেটে বিস্কুট সাজিয়ে ঘরে আসে বল্লরী।

শোভন হতাশ গলায় বলে—বাঃ, মোটে এক কাপ করলে! ছুটির দিনে এ সময়ে আমারো তো এক কাপ পাওনা।

বল্লরী গম্ভীরভাবে বলে—বাথরুমে যাওয়ার আগেই তো এক কাপ খেয়েছো।

মিষ্টি ঝগড়া করে দুজন। মিলি জুলির গায়ের অদ্ভুত সুগন্ধে ডুবে থেকে শোভন আর বল্লরীর আদর-করা গলার স্বর শোনে নীলু। সম্মোহিত হয়ে যেতে থাকে।

তারপরই হঠাৎ গা ঝাড়া দিয়ে উঠে বলে—চলি রে। তোরা ঠিক সময়ে চলে যাস।

—শুনুন শুনুন, আপনার সঙ্গে কথা আছে। বল্লরী তাকে থামায়।

—কী কথা?

—বলছিলুম না আজ সকালেই ভেবেছি আপনার কথা! তার মানে নালিশ আছে একটা। কারা বলুন তো আমাদের বাড়ির দেয়ালে রাজনীতির কথা লিখে যায়? তারা কারা? আপনাদেরই তো এলাকা এটা, আপনার জানার কথা!

—কী লিখেছে?

—সে অনেক কথা। ঢোকার সময়ে দেখেন নি? বর্ষার পরেই নিজেদের খরচে বাইরেটা রঙ করালুম। দেখুন গিয়ে, কালো রঙ দিয়ে ছবি এ'কে লিখে কী করে গেছে শ্রী! তা ছাড়া রাতভর লেখে, গোলমালে আমরা কাল রাতে ঘুমোতে পারিনি।

নীলু উদাসভাবে বলে—বারণ করে দিলেই পারো।

—কে বারণ করবে? আপনার বন্ধু ঘুমোতে না পেরে উঠে সিগারেট ধরালো আর ইংরিজিতে আপনমনে গালাগাল দিতে লাগল—ভ্যাগাবন্ডস্, মিসফিট্স্, প্যারাসাইট্স্... আরো কত কী! সাহস নেই যে উঠে ছেলেগুলোকে ধমকাবে।

—তা তুমি ধমকালে না কেন? নীলু বলে উদাসভাবটা বজায় রেখেই।

বল্লরী হাসল উজ্জ্বলভাবে। বলল—ধমকাইনি নাকি! শেষমেশ আমিই তো উঠলাম। জানালা দিয়ে গলা বাড়িয়ে বললাম—ভাই, আমরা কি রাতে একটু ঘুমোবো না? আপনার বন্ধু তো আমার কাণ্ড দেখে অস্থির। পিছন থেকে আঁচল টেনে ফিস্‌ফিস্ করে বলছে—চলে এসো, ওরা ভীষণ ইতর, যা তা বলে দেবে। কিন্তু ছেলেগুলো খারাপ না। বেশ ভদ্রলোকের মতো চেহারা। ঠোঁটে সিগারেট জ্বলছে, হাতে কিছু চটি চটি বই, প্যাম্‌ফ্লেট। আমার দিকে হাতজোড় করে বলল—বৌদি, আমাদেরও তো ঘুম নেই। এখন তো ঘুমের সময় না এ দেশে। বললুম—আমার দেয়ালটা অমন নোংরা হয়ে গেল যে! একটা ছেলে বলল—কে বলল নোংরা! বরং আপনার দেয়ালটা অনেক ইম্পর্ট্যান্ট হল আগের চেয়ে। লোকে এখানে দাঁড়াবে, দেখবে, জ্ঞানলাভ করবে। আমি বুঝলুম খামোখা কথা বলে লাভ নেই। জানালা বন্ধ করতে যাচ্ছি অমনি একটা মিষ্টি চেহারার ছেলে এগিয়ে এসে বলল—বৌদি, আমাদের একটু চা খাওয়াবেন? আমরা ছজন আছি!

নীলু চমকে উঠে বলে—খাওয়ালে নাকি?

বল্লরী মাথা হেলিয়ে বলল—খাওয়াবো না কেন?

—সে কী!

শোভন মাথা নেড়ে বলল—আর বলিস না, ভীষণ ডেয়ারিং এই মহিলাটি। একদিন বিপদে পড়বে।

—আহা, ভয়ের কী! এইটুকু-টুকু সব ছেলে, আমার ভাই বাবলুর বয়সী। মিষ্টি কথাবার্তা। তাছাড়া এই শরতের হিমে সারা রাত জেগে বাইরে থাকছে—ওদের জন্য না হয় একটু কষ্ট করলাম!

শোভন হাসে, হাত তুলে বল্লরীকে থামিয়ে বলে—তার মানে তুমিও ওদের দলে।

—আহা, আমি কী জানি ওরা কোন দলের? আজকাল হাজারো দল দেয়ালে লেখে। আমি কী করে বুঝবো!

—তুমি ঠিকই বুঝেছো। তোমার ভাই বাবলু কোন দলে তা কি আমি জানি না! সেদিন খবরের কাগজে বাবলুর কলেজের ইলেকশনের রেজাল্ট তোমাকে দেখালুম না? তুমি ভাইয়ের দলের সিমপ্যাথাইজার।

অসহায়ভাবে বল্লরী নীলুর দিকে তাকায়, কাঁদো কাঁদো মুখ করে বলে—না, বিশ্বাস

করুন। আমি দেখিওনি ওরা কী লিখেছে।

নীলু হাসে—কিন্তু চা তো খাইয়েছো!

—হ্যাঁ। সে তো পাঁচ মিনিটের ব্যাপার। গ্যাস জ্বেলে ছ' পেয়ালা চা করতে কতক্ষণ লাগে! ওরা কী খুশী হল! বলল—বৌদি, দরকার পড়লে আমাদের ডাকবেন। যাওয়ার সময়ে পেয়ালাগুলো জল দিয়ে ধুয়ে দিয়ে গেল। ওরা ভাল না?

নীলু শান্তভাবে একটু মুচকি হাসে—কিন্তু তোমার নালিশ ছিল বলছিলে যে! এ তো নালিশ নয়। প্রশংসা।

—না, নালিশই। কারণ, আজ সকালে হঠাৎ গোটা দুই বড় বড় ছেলে এসে হাজির। বলল—আপনাদের দেয়ালে ওসব লেখা কেন? আপনারা কেন এসব অ্যালাউ করেন? আপনার বন্ধু ঘটনাটা বুঝিয়ে বলতে ওরা থম্‌থমে মুখ করে চলে গেল। আপনি ওই ছজনকে যদি চিনতে পারেন তবে বলবেন--ওরা যেন আর আমাদের দেয়ালে না লেখে। লিখলে আমরা বড় বিপদে পড়ে যাই। দু দলের মাঝখানে থাকতে ভয় করে আমাদের। বলবেন যদি চিনতে পারেন।

শোভন মাথা নেড়ে বলে—তার চেয়ে নীলু, তুই আমার জন্য আর একটা বাসা দেখ। এই দেয়ালের লেখা নিয়ে ব্যাপার কদ্দুর গড়ায় কে জানে। এর পর বোমা কিংবা পোটো ছুঁড়ে দিয়ে যাবে জানালা দিয়ে, রাস্তায় পেলে আলু টপকাবে। তার ওপর বল্লরী ওদের চা খাইয়েছে--যদি সে ঘটনার সাক্ষীসাবুদ কেউ থেকে থাকে তবে এখানে থাকাটা বেশ রিস্কি এখন।

বল্লরী নীলুর দিকে চেয়ে বলল—বুঝলেন তো! আমাদের কোনো দলের ওপর রাগ নেই। রাতজাগা ছটা ছেলেকে চা খাইয়েছি—সে তো আর দল বুঝে নয়! অন্য দলের হলেও খাওয়াতুম।

বেরিয়ে আসার সময়ে দেয়ালের লেখাটা নীলু একপলক দেখল। তেমন কিছু দেখার নেই। সারা কলকাতার দেয়াল জুড়ে ছড়িয়ে আছে বিপ্লবের ডাক। নিঃশব্দে।

কয়েকদিন আগে এক সকালবেলায় হরলালের জ্যাঠামশাইকে নীলু দেখেছিল, প্রাতঃ-ভ্রমণ সেরে ফেরার পথে লাঠি হাতে দাঁড়িয়ে আছেন দেয়ালের সামনে। পড়ছেন লেখা। নীলুকে দেখে ডাক দিলেন তিনি। বললেন—এইসব লেখা দেখেছো নীলু? কীরকম স্বার্থপরতার কথা! আমাদের ছেলেবেলায় মানুষকে স্বার্থত্যাগের কথাই শেখানো হত। এখন এরা শেখাচ্ছে স্বার্থসচেতন হতে, হিংস্র হতে—দেখেছো কীরকম উল্টো শিক্ষা!

নীলু শুনে হেসেছিল।

উনি গম্ভীর হয়ে বললেন—হেসো না। রামকৃষ্ণদেব যে কামিনীকাঞ্চন সম্বন্ধে সাবধান হতে বলেছিলেন তার মানে বোঝো?

নীলু মাথা নেড়েছিল। না।

উনি বললেন—আমি এতদিনে সেটা বুঝেছি। রামকৃষ্ণদেব আমাদের দুটো অশুভ শক্তি সম্বন্ধে সচেতন হতে বলেছিলেন। একটা হচ্ছে ফ্রয়েডীয় তত্ত্ব, অন্যটা মার্ক্সিজ্‌ম। ফ্রয়েডের প্রতীক কামিনী, মার্ক্সের কাঞ্চন। ও দুই তত্ত্ব পৃথিবীকে ব্যভিচার আর স্বার্থ-পরতার দিকে নিয়ে যাচ্ছে। তোমার কী মনে হয়?

নীলু ভীষণ হেসে ফেলেছিল।

হরলালের জ্যাঠামশাই রেগে গিয়ে দেয়ালে লাঠি ঠুকে বললেন—তবে এর মানে কী?

অ্যাঁ! পড়ে দেখ, এসব ভীষণ স্বার্থপরতার কথা কিনা!

তারপর থেকে যতবার সেই কথা মনে পড়েছে ততবার হেসেছে নীলু। একা একা।

বেলা বেড়ে গেছে। বাসায় খবর দেওয়া নেই যে শোভনরা খাবে। খবরটা দেওয়া দরকার। ফুলবাগানের মোড় থেকে নীলু একটা শর্টকাট ধরল। বড় রাস্তায় যেখানে গলির মুখ এসে মিশেছে সেখানেই দেয়ালে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সাধন—নীলুর চতুর্থ ভাই। কলেজের শেষ ইয়ারে পড়ে। নীলুকে দেখে সিগারেট লুকোলো। পথ-চলতি অচেনা মানুষের মতো দুজনে দুজনকে চেয়ে দেখল একটু। চোখ সরিয়ে নিল। তাদের দেখে কেউ বুঝবে না যে তারা এক মায়ের পেটে জন্মেছে, একই ছাদের নীচে একই বিছানায় শোয়। নীলু শুধু জানে সাধন তার ভাই। সাধনের আর কিছুই জানে না সে। কোন দল করছে সাধন, কোন পথে যাচ্ছে, কেমন তার চরিত্র—কিছুই জানা নেই নীলুর। কেবল মাঝে মাঝে ভোরবেলা উঠে সে দেখে সাধনের আঙুলে, হাতে কিংবা জামায় আলকাতরার দাগ। তখন মনে পড়ে, গভীর রাতে ঘুমোতে এসেছিল সাধন।

এখন কেন জানে না, সাধনের সঙ্গে একটু কথা বলতে ইচ্ছে করছিল নীলুর। সাধন, তুই কেমন আছিস? তোর জামাপ্যান্ট নিয়েছিস তুই? অনার্স ছাড়িস নি তো! এরকম কত জিজ্ঞাসা করার আছে।

একটু এগিয়ে গিয়েছিল নীলু। থেমে, ফিরে আসবে কিনা ভেবে ইতস্তত করছিল। মুখ ফিরিয়ে দেখল সাধন তার দিকেই চেয়ে আছে। একদৃষ্টে। হয়তো জিজ্ঞেস করতে চায়—দাদা, ভাল আছিস তো? বড্ড রোগা হয়ে গেছিস, তোর ঘাড়ের নলী দেখা যাচ্ছে রে! কুসুমদির সঙ্গে তোর বিয়ে হল না শেষ পর্যন্ত, না? ওরা বড়লোক, তাই? তুই আলাদা বাসা করতে রাজী হলি না, তাই? না হোক কুসুমদির সঙ্গে তোর বিয়ে—কিন্তু আমরা—ভাইয়েরা তো জানি তোর মন কত বড়, বাবার পর তুই কেমন আগলে আছিস আমাদের! আহারে দাদা, রোদে ঘুরিস না, বাড়ি যা। আমার জন্য ভাবিস না—আমি রাতচরা—কিন্তু নষ্ট হচ্ছি না রে, ভয় নেই!

কয়েক পলক নির্জন গলিপথে তারা দুজনে দুজনের দিকে চেয়ে এরকম নিঃশব্দ কথা বলল। তারপর সামান্য লজ্জা পেয়ে নীলু বাড়ির দিকে হেঁটে যেতে লাগল।

দুপুরে বাড়িতে কাণ্ড হয়ে গেল খুব। নাড়ুমামী কলকল করে কথা বলে, সেই সঙ্গে মা আর ছোটো বোনটা। শোভনের দুই মেয়ে কাণ্ড করল আরো বেশী। বাইরের ঘরে শোভন আর নীলু শুয়েছিল—ঘুমোতে পারল না। সাধন ছাড়া অন্য ভাইয়েরা যে যার আগে খেয়ে বন্ধুবান্ধবদের বাড়িতে কি আস্তানায় কেটে পড়েছিল, তবু যজ্ঞিবাড়ির ভিড়ের মতো হয়ে রইল রবিবারের দুপুর।

সবার শেষে খেতে এল সাধন। মিষ্টি মুখের ডৌলটুকু আর গায়ের ফর্সা রঙ রোদে পুড়ে তেতে কেমন টেনে গেছে। মেঝেতে ছক্ পেতে বাইরের ঘরেই লুডো খেলছিল বল্লরী, মামী, আর নীলুর দুই বোন। সাধন ঘরে ঢুকতেই নীলু বল্লরীর মুখখানা লক্ষ্য করল।

যা ভেবেছিল তা হল না। বল্লরী চিনতেও পারল না সাধনকে। মুখ তুলে দেখল একটু, তারপর চালুনির ভিতর ছক্কাটাকে খটাখট্ পেড়ে দান ফেলল। সাধনও চিনল না।

একটু হতাশ হল নীলু। হয়তো রাতের সেই ছেলেটা সত্যিই সাধন ছিল না, নয়তো এখনকার মানুষ পরস্পরের মুখ বড় তাড়াতাড়ি ভুলে যায়।

নীলু গলা উঁচু করে বলল—তোমার মেয়েদুটো বড় কাণ্ড করছে বল্লরী, ওদের নিয়ে যাও।

—আঃ, একটু রাখুন না বাবা, আমি প্রায় ঘরে পৌঁছে গেছি।

রাত্রির শোতে শোভন আর বল্লরী জোর করে টেনে নিয়ে গেল নীলুকে। অনেক দামী টিকিটে বাজে একটা বাংলা ছবি দেখল তারা। তারপর ট্যাক্সিতে ফিরল।

জ্যোৎস্না ফুটেছে খুব। ফুলবাগানের মোড়ে ট্যাক্সি ছেড়ে জ্যোৎস্নায় ধীরে ধীরে হেঁটে বাড়ি ফিরছিল নীলু। রাস্তা ফাঁকা। দুধের মতো জ্যোৎস্নায় ধুয়ে যাচ্ছে চরাচর। দেয়ালে দেয়ালে বিপ্লবের ডাক। নিরপেক্ষ মানুষেরা তারই আড়ালে শুয়ে আছে। দূরে দূরে কোথাও পোটো ফাটবার আওয়াজ ওঠে। মাঝে মধ্যে গলির মুখে মুখে যুদ্ধের ব্যূহ তৈরী করে লড়াই শুরু হয়। সাধন আছে ঐ দলে। কে জানে একদিন হয়তো তার নামে একটা শহীদ স্তম্ভ উইঢিবির মতো গজিয়ে উঠবে গলির মুখে।

পাড়া আজ নিস্তব্ধ। তার মানে নীলুর ছোটোলোক বন্ধুরা কেউ আজ মেজাজে নেই। হয়তো বৃটিশ আজ মাল খায়নি, জগু আর জাপান গেছে ঘুমোতে। ভাবতে ভালই লাগে।

শোভন আর বল্লরীর ভালবাসার বিয়ে। বড় সংসার ছেড়ে এসে সুখে আছে ওরা। কুসুমের বাবা শেষ পর্যন্ত মত করলেন না। এই বিশাল পরিবারে তাঁর আদরের মেয়ে এসে অথৈ জলে পড়বে। বাসা ছেড়ে যেতে পারল না নীলু। যেতে কষ্ট হয়েছিল।* কষ্ট হয়েছিল কুসুমের জন্যও। কোনটা ভাল হত তা সে বুঝলই না। একা হলে ঘুরেফিরে কুসুমের কথা বড় মনে পড়ে।

বাবা ফিরবে পরশু। আরো দুদিন তার কিছু চাক্কি ঝাঁক যাবে। হাসিমুখেই মেনে নেবে নীলু। নয়তো রাগই করবে। কিন্তু ঝাঁক হবেই। বাবা ফিরে নীলুর দিকে আড়ে আড়ে অপরাধীর মতো তাকাবে, হাসবে মিটিমিটি। খেলটুকু ভালই লাগবে নীলুর। সে এই সংসারের জন্য প্রেমিকাকে ত্যাগ করেছে—কুসুমকে—এই চিন্তায় সে কি মাঝে মাঝে নিজেকে মহৎ ভাববে?

একা থাকলে অনেক চিন্তার টুকরো ঝড়ে-ওড়া কুটোকাটার মতো মাথার ভিতরে চক্কর খায়।

বাড়ির ছায়া থেকে পোগো হঠাৎ নিঃশব্দে পিছু নেয়। মনে মনে হাসে নীলু। তারপর ফিরে বলে—পোগো, কী চাস?

পোগো দূর থেকে বলে—ঠালা, টোকে মার্ডার করব।

ক্লান্ত গলায় নীলু বলে—আয়, করে যা মার্ডার।

পোগো চুপ থাকে একটু, সতর্ক গলায় বলে—মারবি না বল!

বড় কষ্ট হয় নীলুর। ধীরে ধীরে পোগোর দিকে এগিয়ে গিয়ে বলে—মারবো না। আয়, একটা সিগারেট খা।

পোগো খুশী হয়ে এগিয়ে আসে।

নিশুত রাতে এক ঘুমন্ত বাড়ির সিঁড়িতে বসে নীলু, পাশে পাগলা পোগো। সিগারেট ধরিয়ে নেয় দুজনে। তারপর—যা নীলু কখনো কাউকে বলতে পারে না—সেই হৃদয়ের দুঃখের গল্প—কুসুমের গল্প—অনর্গল বলে যায় পোগোর কাছে।

পোগো নিবিষ্ট মনে বুঝবার চেষ্টা করে।

কল্লোল-পর্বে বিদেশী প্রভাব

গোপিকানাথ রায়চৌধুরী

রবীন্দ্র-অনুরাগী ভারতী-গোষ্ঠীর আমল থেকেই বিদেশী সাহিত্যের সঙ্গে যোগ রীতিমতো সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। প্রচুর বিদেশী সাহিত্যের অনুবাদ ও বিদেশী রচনার অনুসরণে বাঙালী পরিবেশে গল্প রচনার দ্বারা ভারতী-গোষ্ঠীর লেখকরা বিশ্বসাহিত্যের সঙ্গে বাংলা সাহিত্যের যোগসাধন চেয়েছিলেন। আর সেই সংযোগের দ্বারা আমাদের সাহিত্যের পরিধির প্রসার। এর চাইতে কোন অমোঘ অনিবার্য তাগিদ এ'দের বিদেশী সাহিত্য অনুসরণের পিছনে ছিল বলে মনে হয় না। ভারতী-গোষ্ঠীর কালপর্ব প্রথম মহাযুদ্ধের শুরু থেকে তৃতীয় দশকের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত। ভারতী-গোষ্ঠীর লেখকরা মহাযুদ্ধোত্তর কালে প্রচুর লিখেছেন সত্য, কিন্তু যথার্থভাবে যুদ্ধোত্তর কালের চেতনা ও মনন তাঁদের শিল্পি-সত্তাকে আলোড়িত করেনি।

সেই আলোড়নের বিপুল তরঙ্গবেগ আত্মপ্রকাশ করল এই শতাব্দীর তৃতীয় দশকের একদল তরুণতর লেখকের রচনায়। এই গোষ্ঠীতে কেবল কল্লোল পত্রিকার লেখকরাই ছিলেন তা নয়, কালিকলম প্রগতি উত্তরা ধূপছায়া সংহতি ইত্যাদি সমভাবাপন্ন পত্রপত্রিকার লেখকরাও ছিলেন। সবাইকে নিয়েই কল্লোল—কল্লোলের মিলিত চেতনা ও মনন। সেইসব চেতনার মূলে রোম্যান্টিক বিদ্রোহী যৌবনধর্ম। যুদ্ধোত্তর কালের আর্থিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক নানামুখী তীব্র সংকট দেশের মধ্যবিত্ত যুবসমাজকে এক গভীর হতাশা ও ব্যর্থতার আবর্তে নিক্ষেপ করল। প্রচলিত মূল্যবোধ সম্পর্কে তাঁদের মনে জাগল দ্বিধা সংশয় ও প্রবল জিজ্ঞাসা। দেখা দিল, যৌবনের উচ্ছ্বসিত বিদ্রোহ-চেতনা, আবার তার পরমুহূর্তেই নিষ্ফল হতাশা। একধরনের বোহেমীয় জীবনের বেপরোয়া মনোভঙ্গী, যৌনজীবনের রহস্য সম্পর্কে নীতি-নিরপেক্ষ বিস্ময় ও কৌতূহল, 'অবজ্ঞাত ও অপজাত' মানুষের প্রতি আগ্রহ ও মমত্ববোধ—এই ধরনের নানা 'কালাপাহাড়ী' চেতনা-প্রবণতার ঢেউ এসে আছড়ে পড়ল প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর কালের বিক্ষত যৌবনের চারপাশে, তাদের সত্তার গভীরে।

এই চেতনা ও প্রবণতা সেই পর্বের তরুণ লেখকের কবিতায় গল্পে উপন্যাসে ছড়িয়ে পড়েছিল। 'কল্লোলগোষ্ঠী'র সেইসব তরুণ লেখকের গল্প-উপন্যাস সৃষ্টির ক্ষেত্রে পাশ্চাত্ত্য সাহিত্য এক মূল্যবান ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। সে কেবল কয়েকখানা গ্রন্থের অনুবাদ বা সচেতন অনুসরণ মাত্র নয়, পাশ্চাত্ত্য সাহিত্য হয়ে উঠেছিল এক প্রেরণাদায়িনী শক্তি। সমকালীন পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের বাতাবরণ ও অন্তর্নিহিত জীবনদর্শন ও মূল্যবোধের মধ্যে আমাদের তরুণদলের অনেকে জীবন-পট ও চিন্তা-চেতনার এক নিগূঢ় সংগতি লক্ষ্য করে তার প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। এইদিক থেকে দেখলে মহাযুদ্ধের পর থেকে আমাদের উপন্যাস-গল্পে বিদেশী কথাসাহিত্যের অভিঘাত তীব্রতর ও জটিলতর হয়েছে। বর্তমান প্রবন্ধে আমরা সেই অভিঘাতের স্বরূপ ও তাৎপর্য নির্ণয়ের চেষ্টা করব।

বিশ শতকের শুরু থেকেই ইংলন্ডের জীবনে ও সাহিত্যে ভিক্টোরীয় যুগের আত্মপ্রসাদ ও দৃঢ়বদ্ধ আদর্শচেতনা ক্রমশ শিথিল হয়ে এসেছিল। পূর্বতন স্থিরবিশ্বাস ও আত্ম-প্রত্যয়ের বদলে সন্দেহবাদ ও প্রশ্নসংকুল মনোভাব ধীরে ধীরে মাথা তুলতে শুরু করল।

এই অনিশ্চিত অবস্থায় প্রথম মহাযুদ্ধের আবির্ভাবে জীবন ও সাহিত্যের সর্বপ্রকার মূল্যবোধের ভিত্তি একেবারে ভেঙে পড়ল।

বাংলা সাহিত্যের প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর কালপর্বের সঙ্গে স্বভাবতই ইংলন্ডের—বলা যেতে পারে, সাধারণভাবে পাশ্চাত্ত্য জীবন ও সাহিত্যের, অনেকখানি সাদৃশ্য আছে। অবশ্য য়ুরোপে প্রথম মহাযুদ্ধের প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া যতখানি প্রত্যক্ষ ও মারাত্মক হয়েছিল, আমাদের দেশে তা হয়নি। কিন্তু বিশ শতকের ক্রমবর্ধমান অনিশ্চয়তা অবিশ্বাস ও সংশয়বাদী জিজ্ঞাসু মনোভাব ওদেশে এদেশে যুদ্ধোত্তর কালে আরও বৃদ্ধি পেয়েছিল, এবিষয়ে সন্দেহ নেই। যাকে বলা হয়েছে Age of Interrogation, বিশ শতকের সেই প্রথম পাদের তরুণগোষ্ঠীর মনোভাবের দিক থেকে য়ুরোপের সঙ্গে আমাদের খুব বেশী মৌলিক প্রভেদ নেই।

অর্থাৎ আমাদের তরুণ সাহিত্যপিপাসুর দল প্রস্তুত হয়েই ছিলেন। স্বদেশের সমকালীন সাহিত্যের মধ্যে তাঁদের পিপাসার পরিপূর্ণ নিবৃত্তি হয়নি। পরিবর্তিত মূল্য-বোধের পরিপ্রেক্ষিতে জটিল জীবনজিজ্ঞাসার সম্যক উত্তর মেলেনি। তাই রবীন্দ্রনাথকে 'অতিক্রম' করে আরও দূরের দিকে হাত বাড়ালেন তাঁরা। পশ্চিমের দিকে। পশ্চিম থেকে একদিকে এল তত্ত্বচিন্তা, অন্যদিকে সৃজনশীল সাহিত্য। একদিকে ফ্রয়েড-হ্যাভলক এলিস মারফত মনস্তত্ত্ব ও যৌনবিজ্ঞান এবং মার্ক্‌স ও রুশ-বিপ্লবের মাধ্যমে সমাজতন্ত্রের চেতনা, অন্যদিকে ইংরেজী ছাড়াও রুশ, স্ক্যান্ডিনেভিয়ান, ফরাসী ইত্যাদি কন্টিনেন্টাল সাহিত্যের জোয়ার। সেইসব সাহিত্য থেকে আমাদের তরুণ লেখকদের আকাঙ্ক্ষিত বস্তু অনেক কিছু এসে গেল। তাঁরা লক্ষ্য করলেন, তাঁদের মনের চিন্তা-চেতনার সঙ্গে য়ুরোপের সাম্প্রতিক সাহিত্যের অনেক ভাবসংগতি। তাঁরা উল্লসিত হয়ে উঠলেন। সেই উল্লাস সাহিত্যসৃষ্টির ক্ষেত্রে অনেক সময় মাত্রা ছাড়িয়ে গেল।

এই শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের শুরু থেকেই যে কন্‌টিনেন্টাল সাহিত্যের চর্চা মোটামুটি ব্যাপকভাবে কলকাতার শিক্ষিত তরুণ মহলে আরম্ভ হয়ে যায়, সে সম্পর্কে সবুজপত্র-গোষ্ঠীর লেখক ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের একটি সাক্ষ্য উদ্ধৃত করছি। লেখক ১৯১০ খৃষ্টাব্দের একটি ঘটনা প্রসঙ্গে বলছেন: 'সেন ব্রাদার্স ছোট্ট দোকান খোলেন বহুবাজার ও কলেজ স্ট্রীটের মোড়ে। প্রমথ সেন ও *ভোলানাথ সেন এই সময় থেকে আমাদের বিদেশী বিশেষত রুশিয়ান, সুইডিশ, নরুইজীয়ান, ফরাসী প্রভৃতি বিদেশী সাহিত্যের খোরাক জোগাতে সুরু করেন।' [নূতন ও পুরাতন—"বক্তব্য"।]

এ সময় থেকে মোটামুটি ব্যাপকভাবে এবং এরও বেশ কিছুদিন আগে থেকে য়ুরোপীয় সাহিত্যের চর্চা বাঙালী লেখকমহলে শুরু হলেও, প্রথম যুদ্ধোত্তর কালেই যে কল্লোল ও তার সমকালীন লেখকগোষ্ঠীর 'প্রিয়' ও 'সমধর্মী' লেখকদের অনেকের রচনা এদেশে আমদানি হয়ে প্রসার লাভ করে এ একপ্রকার ঐতিহাসিক সত্য।

ইংরেজী ও কন্‌টিনেন্টাল সাহিত্য ব্যাপকভাবে অধ্যয়ন ও অনুশীলন যে বিশেষভাবে প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর কালে তরুণ বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠীর কাছে একান্ত জনপ্রিয় ও অনেকটা 'ফ্যাশন' হয়ে উঠেছিল তা শ্রীসজনীকান্ত দাসের উক্তি থেকে বোঝা যায়: (ক) 'আমি তখন (১৯২২-২৩ খৃঃ অঃ) অশান্ত চিত্তে সে সময়ের ফ্যাশন কন্‌টিনেন্টাল সাহিত্য-সমুদ্রে পাড়ি দিতাম।' (খ) 'বিশ্ব মহাযুদ্ধের আলোড়ন শেষ হইলে দেখা গেল, ইউরোপীয় সাহিত্যের উদগ্র বস্তুবাদ উগ্রমূর্তি লইয়াই বাংলার অঙ্গনে প্রবেশ করিতেছে...ইবসেন, মেটার্লিঙ্ক,

স্ট্রীন্ডবার্গ, টুর্গেনিভ, টলস্টয়, ডস্টাভস্কি, লিনান্স্কি, বোয়ার, ন্যুট, হ্যামসুন—বঙ্গবাণীর নিরামিষ অঙ্গনে তাজা রক্তের ছাপ পড়িতেছে। সে কি উত্তেজনা, কি উন্মাদনা! সেই ঢেউই চলিল কল্লোল কালিকলম প্রগতি উত্তরা পর্যন্ত।' ("আত্মস্মৃতি")

সজনীকান্ত নিজে নব্যপন্থী কল্লোলগোষ্ঠীভুক্ত ছিলেন না, বরং কল্লোলের বিরোধী দলের নেতৃস্থানীয়রূপে গণ্য হতেন। তাঁর বিবৃতি থেকে মনে হয় যে (ক) কন্টিনেন্টাল সাহিত্যের অনুশীলন কেবল কল্লোলগোষ্ঠীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, এই পশ্চিমী সাহিত্য সে-যুগের সকল বুদ্ধিজীবী তরুণকেই সমানভাবে আকৃষ্ট করত। (খ) কন্টিনেন্টাল সাহিত্যের মধ্যে মুখ্যত রাশিয়ান ও স্ক্যান্ডিনেভিয়ান সাহিত্যের রচনাই বিশেষভাবে তরুণদের আকৃষ্ট করেছিল।[১] (গ) কন্টিনেন্টাল সাহিত্য প্রথম মহাযুদ্ধোত্তরকালে তরুণ হৃদয়ে এক প্রচণ্ড উত্তেজনা ও উন্মাদনা সৃষ্টি করেছিল। এই উত্তেজনার কারণ পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের বৈচিত্র্য, অভিনবত্ব ও 'উদগ্র বস্তুবাদের' ঝাঁঝালো স্বাদ।

পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের সঙ্গে এই ব্যাপক যোগাযোগ তরুণ বাঙালী লেখকদের চিন্তা, উপলব্ধি ও সৃষ্টির ক্ষেত্রকে অল্পবিস্তর প্রভাবিত করবে, এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু সাহিত্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে প্রভাবনির্ণয় একান্ত দুরূহ ও অনিশ্চিত ব্যাপার। অবশ্য যেসব ক্ষেত্রে রচনায় স্থূল অনুকরণের চিহ্ন স্পষ্ট সেগুলি আবিষ্কার করা দুরূহ নয়। কিন্তু সাধারণত সেগুলি অক্ষম লেখকের দুর্বল রচনাই হয়ে থাকে। সত্যকার সার্থক প্রভাব বলতে লেখকের অখণ্ড শিল্পিসত্তার ওপর গূঢ়সঞ্চারী অথচ অমোঘ অভিঘাতকেই বুঝি। এই প্রভাব স্রষ্টার সমগ্র সৃজনপদ্ধতির মধ্যে—উপকরণসংগ্রহ, বিষয়নির্বাচন, রচনারীতি ও আঙ্গিককৌশল এবং সর্বোপরি সামগ্রিক জীবনবোধে সঞ্চারিত হয়ে যায়। একে পৃথকভাবে আবিষ্কার করা অনেক সময় একরূপ অসম্ভব। তাছাড়া, আলোচ্য পর্বে কোন একজন তরুণ লেখকের শিল্পিমানসের ওপর কোন একজনমাত্র বিশেষ পাশ্চাত্ত্য লেখকের প্রভাব সাধারণত চোখে পড়ে না। সুবৃহৎ কন্টিনেন্টাল ও সমকালীন ইংরেজী কথাসাহিত্যের সমুদ্র মন্থন করে তাঁরা যে শিল্প-প্রেরণার অমৃত সংগ্রহ করেছেন তা একজনের সৃষ্ট নয়। নানা দেশের সাহিত্যের এক সমবায়ী রূপ অনেক সময়ে সেখানে বাঙালী লেখকদের মর্মমূলে রসসিঞ্চন করেছে। অবশ্য লেখকদের স্বতন্ত্র মানসপ্রবণতার ফলে মাঝে মাঝে বিশেষ একজন বা কয়েকজন বিদেশী লেখকের প্রতি বিশেষ অনুরাগ চোখে পড়ে। এই প্রসঙ্গে এ-ও মনে রাখতে হবে যে পাশ্চাত্ত্য উপন্যাস-গল্পই বাংলার তরুণ লেখকদের চিন্তা ও সৃষ্টিকে নিয়ন্ত্রিত করেনি। বরং তাঁরা যে জীবন-পরিবেশের মধ্যে যে জীবন-দৃষ্টি নিয়ে গড়ে উঠেছিলেন, তারই অনুকূল বা সমধর্মী সাহিত্যই তাঁরা সন্ধান করছিলেন। দৃষ্টান্ত দিয়ে বলা চলে যে ডিকেন্স থ্যাকারে কনরাড জর্জ এলিয়ট ইত্যাদি সুপ্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিকদের রচনা থেকে আলোচ্য বাঙালী লেখক-গোষ্ঠী তেমন কিছুই গ্রহণ করেননি। অথচ পক্ষান্তরে উনিশ শতকের ফরাসী ও রাশিয়ান লেখকদের কাছে তরুণ বাঙালী লেখকরা যথেষ্ট ঋণী। অর্থাৎ ডিকেন্স প্রভৃতির রচনার সঙ্গে বাঙালী লেখকদের পরিচয় থাকলেও তাঁদের লেখার 'বিশিষ্ট রস আমাদের জীবনে ও উপলব্ধিতে ফুটে ওঠেনি।'

বিপুল পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের ব্যাপক অনুশীলনের ফলে বাঙালী লেখকদের মনের ওপর একটা প্রচণ্ড অভিঘাতের সৃষ্টি হয়েছিল, এবং তার মধ্য দিয়ে তাঁরা নিজেদের সৃজনশীল

---

[১] এই প্রসঙ্গে সেদিনের তরুণ বুদ্ধিজীবী বুদ্ধদেব বসুর সাক্ষ্য উল্লেখযোগ্য : "We read Whitman, the Russians and the Scandinavians."—*An Acre of Green Grass.*

সত্তাকে নূতন করে 'স্পষ্ট করে' চিনতে পেরেছিলেন—কতকটা আপন শিল্পিব্যক্তিত্বের সেই 'স্পষ্ট' উপলব্ধির ফলে একালের কথাসাহিত্যের নবরূপ দেখা দিয়েছিল—এই অর্থে পাশ্চাত্ত্য প্রভাব অবশ্যই স্বীকার্য। নচেৎ কোন বাঙালী লেখকের কোন বৈশিষ্ট্য বা রচনার বিষয়বস্তু বা আঙ্গিকের সঙ্গে কোন বিদেশী লেখককের রচনার আকস্মিক আপাত সাদৃশ্য মাত্রই তাকে প্রভাব বলে ঘোষণা করা নিশ্চয় সর্বদা সমীচীন নয়।

দুই

প্রথম মহাযুদ্ধের কাছাকাছি সময়ে, কিছু আগে ও পরে, যে সমস্ত য়ুরোপীয় কথা-সাহিত্যের সঙ্গে বাঙালী তরুণ লেখকদের বিশেষ সংযোগ ঘটে তাদের মধ্যে এগুলিই প্রধান: রুশ, ফরাসী, স্ক্যান্ডিনেভিয়ান ও ইংরেজী।

রুশ লেখকদের মধ্যে রুশ-বিপ্লবের পূর্ববর্তীকালেই যাঁরা প্রতিষ্ঠালাভ করেছেন তাঁরাই বিশেষভাবে বাঙলার নবীন লেখকদের আকৃষ্ট করলেন। টলস্টয়, ডস্টয়েভ্স্কি টুর্গেনিভ, চেখভ এবং গোর্কী এ'দের মধ্যে বিশেষভাবে স্মরণীয়। প্রাক্-বিপ্লব যুগের রুশসমাজ ও মধ্যবিত্ত জীবনধারার সঙ্গে বাঙালী জীবনের একটা সাদৃশ্য সেদিনকার বুদ্ধি-জীবীরা অনুভব করেছিলেন এইসব লেখকের রচনার মাধ্যমে। উনিশ শতকের ও বিশ শতকের গোড়াকার রাশিয়ার কৃষক, সাধারণ মধ্যবিত্ত, আত্মকেন্দ্রিক হতাশ ব্যর্থ বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের সঙ্গে আমাদের দেশের বিশ শতকের সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের ও তাদের সমস্যার বেশ মিল চোখে পড়েছিল সেদিন।[২] উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে রাশিয়ার যুব-সমাজে যে নিহিলিস্ট চিন্তাধারা দেখা দিল, তার ফলে সংশয় ও হতাশায় আচ্ছন্ন চরমপন্থী যুবচিত্তে দেখা দিয়েছিল উগ্র ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের চেতনা এবং রাষ্ট্র ধর্ম সমাজ ও নীতিমূলক সবকিছু পুরনো চিন্তাধারা ভেঙে ফেলার বৈপ্লবিক ধ্বংসাত্মক মনোভাব। এরই এক করুণ মর্মস্পর্শী ছবি ফুঠেছে টুর্গেনিভের 'ফাদার্স অ্যান্ড সন্স'-এর বাজারভ চরিত্রে। এই উপন্যাস ও বাজারভ চরিত্রের মর্মবাণীর সঙ্গে এযুগের বাঙালী যুবচিত্তের যে ভাবগত সান্নিধ্য কিছুটা ছিল তাতে সন্দেহ নেই।[৩]

ডস্টয়েভস্কির উপন্যাসগুলি উনিশ শতকে রচিত হলেও এর মধ্যে আধুনিক কালের মানুষের জটিল বিক্ষুব্ধ প্রবৃত্তিজড়িত, সংশয় ও উদ্বেগে বিক্ষত জীবনের বিস্ময়কর চিত্র ফুটে উঠেছে। প্রথম যুদ্ধোত্তর কালের জীবনের নূতন তাৎপর্য-সন্ধানী, সংশয়-উদ্বেগে বিদ্ধ বাঙালী তরুণ লেখকগোষ্ঠীর কাছে তাই সেদিন "ক্রাইম অ্যান্ড পানিশমেন্ট", "ব্রাদার্স কারামাজভ"-এর আবেদন ছিল অনিবার্য।

ডস্টয়েভস্কি, টলস্টয়, টুর্গেনিভ ও চেখভ মুখ্যত উনিশ শতকের লেখক। কিন্তু গোর্কী প্রধানত এই শতকের কথাসাহিত্যিক। গোর্কীর বিশ্ববিখ্যাত উপন্যাস "মাদার" ইংরেজীতে অনূদিত হল ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে। এর আগে অনূদিত হয়েছিল "লোয়ার ডেপ্থ্স" (পূর্বতন নাম—"ইন দি ডেপ্থ্স") ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে। ১৯০২ খৃষ্টাব্দেরই

[২] দ্রঃ নূতন ও পুরাতন ("বক্তব্য")—ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়।

[৩] "কল্লোল যুগ" গ্রন্থে অচিন্ত্যকুমার সেই পর্বের তরুণদের মানসপ্রবণতা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন, "কখনো উন্মত্ত, কখনো উন্মনা। কখনো সংগ্রাম কখনো বা জীবনতৃষ্ণা। প্রায় টুর্গেনিভের চরিত্র।" এ থেকে বোঝা যায়, টুর্গেনিভের কেবল "ফাদার্স অ্যান্ড সন্স" নয়, সমস্ত রচনায় একটি সামগ্রিক অভিঘাত পড়ে-ছিল বাঙালী যুবচিত্তে।

গোর্কীর কয়েকটি গল্পসংগ্রহ ইংরেজীতে ভাষান্তরিত হয়ে প্রকাশ পায়। এই গ্রন্থগুলির বিষয়বস্তু ও অন্তর্নিহিত দৃষ্টিভঙ্গী বাংলার নবীন লেখকদের মনে জনজীবনের দুঃখবেদনা আশাআকাঙ্ক্ষার ছবিটিকে গাঢ় রঙে মুদ্রিত করে দিল। গোর্কীর রচনাসমূহ, বিশেষভাবে "মাদার" তরুণ লেখকচিত্তে সমাজতন্ত্রবাদ ও সেই আদর্শে অনুপ্রাণিত জীবনধারা সম্পর্কে নূতন প্রেরণা সঞ্চার করল।[৪] এই প্রসঙ্গে বলা চলে যে, ১৩৩০ সালের বৈশাখে প্রকাশিত "সংহতি" নামে শ্রমিকদের মুখপত্রে নারায়ণ ভট্টাচার্যের "দিনমজুর", শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের রচনা "বাঙালী ভাইয়া" কিংবা প্রেমেন্দ্র মিত্রের "পাঁক"-কে রুশ সাহিত্যের বিশেষত গোর্কীর প্রেরণাসঞ্জাত মনে করলে বোধহয় খুব ভুল হবে না।

তৃতীয় দশকের পর থেকে বাঙালী লেখকদের সাহিত্যসাধনার অন্যতম আদর্শ হয়ে উঠেছিল রুশ সাহিত্য। লোকায়ত জীবনের যে বহু বিচিত্র আপাততুচ্ছ সুখদুঃখের ছবি রুশ সাহিত্যে বিশেষভাবে গোর্কীর রচনায় ফুটে উঠেছিল, তা বাংলা কথাসাহিত্যের পট-ভূমিগত ও বিষয়গত বৈচিত্র্যের দিক থেকে এক দুর্নিবার আকর্ষণের কারণ হয়ে উঠল। রুশ সাহিত্যের বিপুল মানবীয় ও শিল্পগত প্রেরণা ও আদর্শ যে সে যুগের বাঙালী তরুণ লেখকদের মনকে যথেষ্ট প্রভাবিত করেছিল, এ বিষয়ে সন্দেহের বিশেষ অবকাশ নেই। তবে যে প্রগাঢ় সমাজবোধ ও দেশের জনজীবন সম্পর্কে যে ব্যাপক ও গভীর অভিজ্ঞতা ও মমত্ববোধ থাকলে, এযুগের লেখকরা রুশ সাহিত্যের সত্যকার উত্তরাধিকার পেতেন, তা তাঁদের ছিল না। তাই দেখি গণজীবনের ছবি বলতে বাঙালী কৃষকের জীবনকথা বা শ্রমিক-জীবনের আর্থিক ও অন্যান্য সমস্যা তেমন মুখ্য হয়ে ওঠেনি, বেকার ভবঘুরে বোহেমিয়ান জীবনের গল্প, পতিতা নারী ও কেরানী যুবকের প্রেমস্বপ্ন ও দেহপিপাসা এবং বস্তিবাসী ভিখারীর স্থূল দেহচেতনার ছবি প্রধান হয়ে উঠেছে।

রুশ সাহিত্যের প্রভাব ও প্রেরণা বাঙালী লেখকদের নিজস্ব প্রবণতা ও দুর্বলতার জন্য যে বিশেষরূপে আত্মপ্রকাশ করেছিল এযুগের কথাসাহিত্যে, তার জন্য ক্ষোভের কারণ থাকতে পারে,[৫] কিন্তু তা আজ সাহিত্যের ইতিহাসের সামগ্রীরূপে নিরাসক্ত দৃষ্টিতেই বিচার্য বলে মনে হয়। তাছাড়া রুশ সাহিত্য যে আমাদের কথাসাহিত্যে পরিপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি, এ থেকে বাঙালী লেখকদের স্বাতন্ত্র্যের পরিচয়ও মেলে। তাঁরা রুশ সাহিত্যকে অনুকরণ বা অনুসরণ করতে চানও নি। কেবল তার অন্তর্নিহিত ভাবাদর্শ ও বিষয়-বৈচিত্র্যের প্রেরণায় উল্লসিত ও আশান্বিত হয়ে উঠেছিলেন।

ফরাসী সাহিত্যের সঙ্গে বাঙালী লেখকদের যোগাযোগ উনিশ শতকের শেষ থেকেই রীতিমতো শুরু হয়েছিল। প্রাক্-কল্লোল পর্বের এই ধরনের লেখকদের মধ্যে বিশেষভাবে মনে পড়ে প্রমথ চৌধুরী, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও ভারতীগোষ্ঠীর লেখকদের। এঁদের প্রচেষ্টায় রচিত পথের রেখাচিহ্ন ধরে কল্লোল-পর্বের লেখকদের মানসিকতার সঙ্গে সংযোগ ও সাদৃশ্য দেখা দিল ফরাসী লেখকদের।

ফরাসী সাহিত্যে উনিশ শতকের প্রথমার্ধ ছিল মুখ্যত রোম্যান্টিকতার যুগ। আর এই রোম্যান্টিকতার প্রতিক্রিয়াস্বরূপ উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে দেখা দিয়েছিল রিয়্যালিজম্ বা বাস্তবতা। অবশ্য যদিও ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে স্তাঁধালের 'দী রেড অ্যান্ড দী ব্ল্যাক' প্রকাশের সঙ্গে

[৪] তখনকার তরুণ গোষ্ঠীর পত্র-পত্রিকায় গোর্কীর বিভিন্ন রচনার অনুবাদ ও গোর্কী সম্পর্কিত আলোচনা বাঙালী লেখকদের গোর্কী-প্রীতির সাক্ষ্য বহন করে।

[৫] কল্লোলগোষ্ঠী-ভুক্ত লেখক নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় "কল্লোল" পত্রিকারই ৪র্থ বর্ষ ১ম সংখ্যাতেই 'রুশ সাহিত্য ও তরুণ বাঙালী' প্রবন্ধে আত্ম-সমীক্ষা প্রসঙ্গে এইরকম ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন।

সঙ্গেই ফরাসী কথাসাহিত্যে রিয়ালিজমের সূচনা এবং এই শতকের প্রথমার্ধে প্রকাশিত ব্যালজাকের উপন্যাসসমূহে এই রিয়ালিজমের প্রসার বলা হয়ে থাকে, তবু দ্বিতীয়ার্ধে গুস্তাভ ফ্লবের-এর 'মাদাম বোভ্যারী'-তে ১৮৫৭ কিংবা তারও পর ১৮৭০ খৃষ্টাব্দের পর থেকে এমিল জোলা ও তাঁর অনুসারীদের রচনায় ন্যাচারালিজমের প্রসারের ফলেই ফরাসী কথাসাহিত্যে বাস্তবতার চেহারা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে।

আমাদের আলোচ্য পর্বের তরুণ কথাশিল্পীদের কাছে এই ফরাসী-সাহিত্যসুলভ ন্যাচারালিস্ট জীবনদর্শনের এক বিশেষ আকর্ষণ ছিল বলে মনে হয়। কেউ কেউ কল্লোল-গোষ্ঠীর ওপর ফ্লবের বা জোলার প্রভাবের কথা[৬] উল্লেখ করেছেন। মনে হয়, ফ্লবের বা জোলার মনোভাব বা দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে আলোচ্যকালের বাঙালী লেখকদের সাদৃশ্য বেশ চোখে পড়ে। এই দুইজনের রচনায় (বিশেষভাবে জোলার) যৌন বাস্তবতার যে উগ্ররূপ চোখে পড়ে, তা আধুনিক বাঙালী তরুণের হতাশা- ও অবক্ষয়-পীড়িত মনের কাছে যথেষ্ট উত্তেজক বলে আদরণীয় হয়েছিল। ফরাসী দেশের উনিশ তশকের দ্বিতীয়ার্ধের জীবনপটের সঙ্গে আমাদের বিশ শতকের প্রথম পাদের অনেক দিক থেকে মিল আছে। এই প্রসঙ্গে বিনয় সরকারের উক্তি উল্লেখ করা যেতে পারে: '১৯শ শতাব্দীর ১৮৭৮-৮৮ পর্যন্ত ফরাসীদের আর্থিক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ভাঙন-গড়ন যা, বিংশ শতাব্দীব ১৯০৫ সনের পরবর্তী বাংলায় আর্থিক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ভাঙন-গড়নেও সেই বহরের বস্তু।[৭]' ফ্লবের এবং বিশেষভাবে জোলা যে যৌনবিদ্রোহ বা নীতিবিদ্রোহ কিংবা সমাজবিপ্লবী মূল্যবোধের প্রবক্তা—আমাদের যুদ্ধোত্তরকালের ভাঙনধর্মী বেপরোয়া ও ফ্রয়েডীয় যৌনচিন্তায় দীক্ষিত তরুণদের কাছে তার আবেদন অনিবার্য হয়ে উঠেছিল। সাধারণভাবে ফরাসী সাহিত্যের ভাষা, প্রকাশরীতি ও আঙ্গিকের মধ্যে যে স্বচ্ছতা, প্রত্যক্ষতা ও বস্তুনিষ্ঠ সংযত ক্ল্যাসিকাল ভঙ্গী বর্তমান, তা একালের বাঙালী লেখকদের কাছে কোনদিনই তেমন অনুকরণের বিষয় হয়ে ওঠেনি। বাঙালীর লিরিক্যাল রোম্যান্টিক মনোভাব অনেক সময়েই অতিকথনের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করেছে। এর ফলে ফরাসী কথাসাহিত্যের সংহত রূপ বাঙালী লেখকদের সাধারণভাবে প্রভাবিত করতে পারেনি। তাই মপাসাঁ দদে বা ফ্লবের-এর 'ফর্মে'র সুসংহত রূপ এযুগের রোম্যান্টিক যৌবন-স্বপ্নবিফল তরুণ কল্লোল-পন্থী লেখকদের অনুসরণের সামগ্রী হয়ে উঠতে পারেনি বলেই মনে হয়।

সেই দুরন্ত আবেগ ও নানামুখী ভাবের সংঘাতে অতিজাগ্রত চেতনার পরিবেশে প্রথম যুদ্ধোত্তর কালের তরুণ শিল্পীর কাছে 'ফর্মে'র এই সুকঠিন সংহতি সর্বত্র প্রত্যাশাও করা যায় না। প্রেমেন্দ্র মিত্র বা জগদীশ গুপ্তের ন্যায় সংযত আঙ্গিকচেতনাসম্পন্ন লেখক এযুগে এক অর্থে ব্যতিক্রম বলা যেতে পারে। ফরাসী ছোটগল্পের-সংযত আঙ্গিকনিষ্ঠার সঙ্গে এঁদের গল্পের সাদৃশ্য লক্ষ্য করার মতো।

ফরাসী কথাসাহিত্যের আরেকজন বিশ্ববিখ্যাত লেখকের প্রেরণা তরুণ কল্লোল-গোষ্ঠীর ওপর বেশ সক্রিয় হয়েছিল। তিনি বিশ শতকের মনীষী শিল্পী রোম্যাঁ রলাঁ। রলাঁর "জাঁ ক্রিস্তফ" কল্লোল পত্রিকায় ১৩৩১-এর মাঘ সংখ্যা থেকে বাংলায় অনূদিত হয়ে প্রকাশ পেতে থাকে। শ্রীকালিদাস নাগ গোকুলচন্দ্র নাগের সহযোগিতায় মূল ফরাসী থেকে অনুবাদকার্য শুরু করেন। এই মহৎ উপন্যাসের মুখ্য চরিত্র প্রতিভাবান সংগীতশিল্পী

[৬] দ্রঃ দেবীপদ ভট্টাচার্য: বাঙলা উপন্যাসের ষাট বছর ("প্রবাসী" ষষ্টিবর্ষপূর্তি সংখ্যা)।
[৭] "বিনয় সরকারের বৈঠকে"—২য় ভাগ।

ক্রিস্তফের অসামান্য শিল্পপ্রেম, তার চরিত্রের যৌবনদীপ্তি, যৌবনের ক্ষুধা এবং বেপরোয়া ভবঘুরে জীবনের প্রতি স্বতঃই আকর্ষণ বোধ করেছিলেন বাঙালী তরুণ লেখকগোষ্ঠী। জাঁ ক্রিস্তফের শেষ পংক্তি 'I am the day soon to be born'-এর মধ্যে ভবিষ্যৎ জীবনের যে সম্ভাবনাময় আশাদীপ্ত ছবি নিহিত আছে, সে যুগের হতাশপীড়িত বাঙালী যুবকদের কাছে তা একান্ত আকর্ষণীয় মনে হয়েছিল।

যে বিরোধ বা বিদ্রোহের মনোভাব প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর তরুণ লেখকদের, বিশেষভাবে 'কল্লোলগোষ্ঠী'র প্রায় একটা সাধারণ বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়েছিল, ক্রিস্তফের তথা তার স্রষ্টা রলাঁর জীবনেও সেই বিদ্রোহ—সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য মিথ্যার মুখোশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ—মর্মবাণী হয়ে উঠেছিল। ক্রিস্তফের স্রষ্টা এই বিদ্রোহ ও মানবতার আশার বাণী শুনিয়ে বাঙলার তরুণ লেখকদের মনোহরণ করেছিলেন সন্দেহ নেই। সাহিত্যসৃষ্টির ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ-ভাবে সেই মহান ব্যক্তিত্বের প্রভাব তেমন উল্লেখযোগ্য কিছু না হলেও ভাবপ্রেরণা হিসাবে এর মূল্য যথেষ্ট ছিল বলা যেতে পারে। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের 'কল্লোল যুগ' গ্রন্থে রলাঁকে লেখা কল্লোলগোষ্ঠীর পত্রের বিষয়ে যে উল্লেখ আছে এবং তার উত্তরে রলাঁর যে-পত্রের ইংরেজী অনুবাদ ওই গ্রন্থে মুদ্রিত হয়েছে, তা থেকেই রলাঁর সঙ্গে তরুণ লেখকগোষ্ঠীর আন্তরিক প্রীতি ও ভাবপ্রেরণাগত সংযোগের অনেকখানি আভাস পাওয়া যায়।

"কল্লোল-যুগ" গ্রন্থের ওই অধ্যায়ে আরও অনেকগুলি পত্রের মধ্যে জোহান বোয়ার ও ন্যুট হামসুনের (চিঠিখানি হামসুনের তরফ থেকে তাঁর স্ত্রীর লেখা) দুটি অতি সংক্ষিপ্ত সৌজন্যসূচক চিঠি আছে। বিষয় বা বক্তব্যের বিচারে পত্র দুটি নিতান্তই তুচ্ছ। কিন্তু ওই দুজন লেখকের প্রতি কল্লোলগোষ্ঠীর লেখকদের শ্রদ্ধা ও অনুরাগের পরিচয় ফুটে উঠেছে ওঁদের কাছে পত্র-প্রেরণের উৎসাহের মধ্যে, কল্লোল পত্রিকার যাত্রারম্ভে ওঁদের কাছে শুভেচ্ছা প্রার্থনার মধ্যে।

ওই দুজন লেখকই স্ক্যান্ডিনেভিয়ান ঔপন্যাসিক। এই শতাব্দীর বিশিষ্ট লেখক। সে সময়ে স্ক্যান্ডিনেভিয়ান ঔপন্যাসিকদের মধ্যে বিশেষভাবে এই দুজন. বাঙালী লেখকদের কাছে আদর্শ ও প্রেরণার অন্যতম উৎস বলে স্বীকৃত হয়েছিলেন। এর কারণ বাঙালী তরুণ হৃদয়ের আশা ও আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে এঁদের চিন্তাধারা ও জীবনবোধের অনেক বিষয়ে সাদৃশ্য। হামসুনের উপন্যাসগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য *Growth of the Soil, Pan, Hunger* ও *Vagabonds* যথাক্রমে ১৯২০ খৃঃ, ১৯২০ খৃঃ, ১৯২১ খৃঃ ও ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে ইংরেজীতে অনূদিত হয়ে প্রথম প্রকাশিত হয়। হামসুন বিচিত্র-অভিজ্ঞতাসম্পন্ন লেখক। দারিদ্র্য দুঃখ সহ্য করেছেন অনেক। ভবঘুরের মতন নানান জায়গায় দীর্ঘদিন ঘুরে বেড়িয়েছেন, তাঁর সাহিত্যে সমাজসচেতন মনের পরিচয় তেমন মুখ্য নয়। ভবঘুরে আত্মকেন্দ্রিক রোম্যান্টিক তথা বোহেমীয় মানুষের ছবিই তাঁর কাহিনীতে ফুটে উঠেছে। সেই সব বোহেমীয় ভবঘুরে বন্ধনহীন মানুষের কাছে প্রচলিত যৌননীতির কোন মূল্য নেই। তাই যৌন জীবনে তারা অনেকক্ষেত্রেই সামাজিক অর্থে নিরঙ্কুশ, তারা যৌন-বিদ্রোহী। উপরে উক্ত উপন্যাসগুলিতে লেখকের এই মনোভাবেরই পরিচয় আছে। প্রথম যুদ্ধোত্তরকালের বাঙালী লেখকদের মনের সঙ্গে, তাঁদের জীবন সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে হামসুনের উল্লিখিত দৃষ্টিভঙ্গীর যথেষ্ট সাদৃশ্য চোখে পড়ে। যুদ্ধোত্তর কালের প্রচলিত সামাজিক মূল্যবোধের ভাঙনের দিনে তাঁদের রোম্যান্টিক মনের কাছে হামসুনের আইজাক-ইঙ্গর, আডেভার্ট—কিংবা 'প্যান' বা 'হাঙ্গারে'র নায়কের ভবঘুরে অ্যাডভেঞ্চারপ্রিয় যৌনবিদ্রোহী চরিত্রের সংবেদন নিতান্ত

অল্প ছিল না। সে যুগের ক্রমবর্ধমান বেকার সমস্যা ও অর্থসংকটের দিনে 'হাঙ্গার' উপন্যাসের ক্ষুধার্ত বুদ্ধিজীবী শিল্পী নায়কের মনোবিশ্লেষণ সম্ভবত অত্যন্ত অভিনব ও যুগোপযোগী মনে হয়েছিল বাঙালী লেখকদের কাছে।

হামসুনের *Hunger* ও *Pan* বাঙলায় অনুবাদ করেন যথাক্রমে পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় (১৯২৮ খৃষ্টাব্দে) এবং অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত (১৯৩০ খৃষ্টাব্দে)। অচিন্ত্যকুমার কেবল *Pan*-এর অনুবাদকই ন'ন, তাঁর প্রথম মৌলিক সৃষ্টি 'বেদে'-তে যে বোহেমীয় বেপরোয়া নায়কের বিচিত্র অভিজ্ঞতার বর্ণনা আছে, তা অনেকাংশে হামসুনের কথা মনে পড়িয়ে দেয়। বিশ শতকের আর-এক বিশিষ্ট নরওয়েজীয় ঔপন্যাসিক জোহান বোয়ার। বোয়ার দার্শনিক-দৃষ্টিসম্পন্ন মানবতার পূজারী। তাঁর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য উপন্যাস *The Great Hunger*-এ (ইংরেজীতে প্রথম অনূদিত—১৯১৯ খৃষ্টাব্দে) এই উদার মহৎ চেতনার প্রকাশ আছে। জীবনকে তিনি দেখেছেন তীর্থযাত্রার মতো। সেই মানবতার 'নব মন্দিরে'র দিকে নায়ক পীয়ার হোম এগিয়ে চলেছে কঠিন দুঃখবরণ ও মহৎ প্রেমসাধনার পথ বেয়ে।

এ উপলব্ধি ও বিশ্বাস হামসুনের থেকে স্বতন্ত্র। *Hunger* ও *Great Hunger*-এর মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গীর বিরাট পার্থক্য। তবু দেখা যায় কল্লোল গোষ্ঠীর তরুণ লেখকদের চোখে হামসুনের মতো বোয়ারও পরম শ্রদ্ধার পাত্র। বস্তুত বোয়ারের রচনার মধ্য দিয়ে যুবচিত্তের আরেক ধরনের তৃষ্ণা চরিতার্থ হয়েছিল। প্রথম যুদ্ধোত্তর কালের সেই বিশ্বাস-ভঙ্গের ও মূল্যবোধ-রূপান্তরের দিনে, সেই সংশয়-হতাশার মুহূর্তেও মনুষ্যত্বের ওপর মৌলিক আস্থা ছিল তরুণ লেখকদের। তাঁদের রোম্যান্টিক আদর্শবাদী মন এই বিশ্বাসকে আঁকড়ে ধরে রেখেছিল।[৮] কারণ মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো শিল্পস্রষ্টার পক্ষে আত্ম-হনন। তাই সেই Age of Interrogation-এর দিনে, সেই হতাশা ব্যর্থতা ও সংশয়ের দিনেও Whitman-এর কাব্য, গোর্কী-টলস্টয়ের রচনা, রোম্যাঁ রলাঁর উপন্যাস এবং আলোচ্য লেখক বোয়ারের সাহিত্য তরুণ লেখকগোষ্ঠীর কাছে নূতন আশ্বাস ও প্রত্যয়ের বাণী বহন করে এনেছিল।

বোয়ারের উপন্যাসে জীবনপ্রত্যয়ের উপলব্ধি এসেছে নানা সংঘাত ও প্রতিকূল জীবন-সংগ্রামের মধ্য দিয়ে। *The Great Hunger*-এর নায়ক পীয়ার অবৈধ সন্তান। সারা জীবন তাকে তীব্র কঠিন আঘাতের সম্মুখীন হতে হয়েছে। ভবঘুরের মতো তাকে পথে পথে ঘুরে জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা লাভ করতে হয়েছে। তবেই সে জীবনের পরম রহস্যের আভাস পেয়েছে। *The Prisoner Who Sang* (প্রবোধকুমার সান্যাল বাঙলায় অনুবাদ করেন—"বন্দী বিহঙ্গ") গ্রন্থের নায়কও এক ভবঘুরে বহুরূপী জীবনসন্ধানী মানুষ। বোয়ারের উপন্যাসে সমাজ-সচেতন কিংবা সমাজ-সংস্কারক মন প্রশ্রয় পায় নি। হামসুন ও বোয়ার—দুজনের রচনাতেই ব্যক্তির চোখ দিয়েই জীবনের তাৎপর্য অন্বেষণ করা হয়েছে। বোয়ারের এই ব্যক্তিকেন্দ্রিক ভবঘুরে ধরনের উদাসী-প্রকৃতি পথিকচিত্ত নায়ক-বিশিষ্ট উপন্যাস, যেখানে আদর্শবোধের প্রকাশ থাকলেও তীব্র চেতনায় উচ্চকিত stark realism-এর অভাব নেই, সেই উপন্যাসের আবেদন ও প্রভাব একালের বাঙালী তরুণচিত্তের কাছে

---

[৮] 'We praised, unlike Wordsworth, what man has made of man. That is, himself, claiming that man is noble in his unremitting struggle with the brute nature within, not because he wins, for he may not, but simply because he struggles.'—*An Acre of Green Grass.*

স্বভাবতই অনিবার্য হয়ে উঠেছিল।

এসব রচনা এদেশে এসে পেঁছেছে মুখ্যত ইংরেজী অনুবাদের মাধ্যমে। কিন্তু কন্টিনেন্টাল উপন্যাস-গল্পের ইংরেজী অনুবাদই কেবল এদেশের তরুণ মনকে উদ্দীপ্ত করে নি, ইংরেজী কথাসাহিত্যের সঙ্গেও বাঙালী লেখকদের যথেষ্ট অন্তরঙ্গতা ছিল। সেটাই স্বাভাবিক। কারণ ইংরেজী সাহিত্যের সঙ্গেই আমাদের পরিচয় দীর্ঘ দিনের এবং সে পরিচয় যথেষ্ট ব্যাপক এবং প্রত্যক্ষ। তবু একটি বিশেষ দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা যেতে পারে। অবশ্য বিষয়টি সম্পর্কে সামান্য ইঙ্গিত আগেই দিয়েছি। সেটি এই যে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালের বাঙালী তরুণ লেখকগোষ্ঠীর মনে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের ফরাসী ও রুশ সাহিত্যের প্রেরণা গূঢ়সঞ্চারী হয়েছিল, কিন্তু উনিশ শতকের ইংরেজী কথা-সাহিত্যের অর্থাৎ ডিকেন্স, থ্যাকারে, জর্জ এলিয়ট ইত্যাদির ন্যায় প্রতিভাধর লেখকদের রচনার প্রভাব তেমন কার্যকর হয়েছে বলে মনে হয় না। এর অন্যতম প্রধান কারণ সম্ভবত এই যে, ভিক্টোরীয় যুগের ইংলন্ডের পিউরিট্যান-সুলভ মনোভাব, সংকীর্ণ আত্মপ্রসাদ ও নিঃসংশয় আদর্শবোধের চেতনার সঙ্গে যুদ্ধোত্তর কালের বাঙলা দেশের বিশেষ কোন সাদৃশ্য ছিল না। আধুনিক যুগ-জীবনের ভাঙনমুখী সংশয়বাদী চিন্তাধারা, বেপরোয়া যৌন জিজ্ঞাসা ও বোহেমীয় অনিকেত মনোভাবের কোন প্রশ্রয় ছিল না ভিক্টোরীয় যুগের ইংরেজী উপন্যাসে। আধুনিক তরুণচিত্তের কাছে সে যুগ ও সে যুগের সাহিত্য ছিল বড় বেশী পরিবার- ও সমাজবন্ধ এবং 'কৃত্রিম' পিউরিট্যান নীতিবাদ-নিয়ন্ত্রিত। Eternal Passion, Eternal Pain-এর যে রোম্যান্টিক যন্ত্রণা যুদ্ধোত্তর শিল্পীদের হৃদয়কে বিক্ষুব্ধ করে তুলেছিল, ভিক্টোরীয় যুগের কথাসাহিত্য সেই বিক্ষুব্ধ হৃদয়ের যন্ত্রণাকে প্রকাশ করে নি বলেই সম্ভবত তরুণদের মনে হয়েছিল। এর সঙ্গে তুলনায় উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের রুশ ও ফরাসী সাহিত্যে আধুনিক বাঙালী লেখকেরা খুঁজে পেয়েছিলেন নীতি- ও সমাজ-বন্ধনের শিথিল রূপ এবং যৌন মনোবিকলনের উগ্রতর বাস্তব রূপায়ন। অর্থাৎ জীবনের যে তীব্র ঝাঁঝালো স্বাদ তা ভিক্টোরীয় যুগের ইংরেজী কথাসাহিত্যের চেয়ে কন্টিনেন্টাল সাহিত্যে অধিক পরিমাণেই মিলেছিল।

প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর কালের কোন কোন ইংরেজ কথাসাহিত্যিকের চিন্তাধারায় আধুনিক কালের কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হয়ে উঠল। সংশয় অবক্ষয় দেহচেতনা ও ফ্রয়েডীয় মনস্তত্ত্ব তাঁদের গল্পে উপন্যাসে যুদ্ধোত্তর চেতনাকে চিহ্নিত করে দিল। এঁদের প্রতি স্বভাবতই বাঙলাদেশের তরুণ লেখকদল আকৃষ্ট হলেন। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন ডি. এইচ্. লরেন্স ও অলডাস হাক্সলি।

প্রথম যুদ্ধোত্তর কালে ইংলন্ডের মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী সমাজের মধ্যে যে লক্ষ্যহীনতা অবিশ্বাস ও নিঃসঙ্গতা দেখা দিয়েছিল, সেই অবক্ষয়ী ব্যাধিগ্রস্ত মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী সমাজের সামনে sex-mysticism-এর নূতন তত্ত্ব তুলে ধরলেন লরেন্স। মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি অবদমিত হলে ব্যক্তি তথা সমাজের পূর্ণ বিকাশ সম্ভব নয়। প্রাণশক্তি থেকে উৎসারিত হয় এই প্রবৃত্তি, যা যৌনচেতনারই নামান্তর। যুদ্ধোত্তর ব্যাধিগ্রস্ত সভ্যতায় আদিম সুস্থ যৌনচেতনার বিকাশ ঘটাতে পারলেই মানুষের পরিপূর্ণ সত্তার প্রকাশ সম্ভব। লরেন্স এইভাবে অবচেতন লোকের গভীর অন্ধকারে জীবনের প্রকৃত তাৎপর্য ও সার্থকতার সন্ধান পেয়েছেন। তাঁর উপন্যাসের মুখ্য চরিত্রগুলির, যেমন পল মোরেল উরশুলা বা কনি ক্লিফোর্ডের তীব্র জীবন-পিপাসা এবং সমাজ- ও নীতি-নিরপেক্ষ

আদিম যৌনচেতনা যুদ্ধোত্তর কালের হতাশ বিক্ষুব্ধ যৌবনধর্মের কাছে উত্তেজক উপকরণের কাজ করেছিল। সে যুগের তরুণ বাঙালী ফ্রয়েড ও এলিসের মনোবিকলন ও যৌন-চিন্তায় মত্ত হয়েই ছিলেন, লরেন্সের আদিম দেহচেতনা তাতে ইন্ধন জোগাল। লরেন্সের এই যৌন-চেতনা জোলার উপন্যাসের মতো নিছক উগ্র অতি-বাস্তবতার পরিপোষক হল না; এক নূতন জীবন-দর্শন ও আদর্শবোধ সৃষ্টি করতে উৎসুক হল। এই পর্বের আদর্শের ও মূল্যবোধের ভাঙনের দিনে বিক্ষুব্ধ তরুণ বাঙালীর জীবন-তাৎপর্যসন্ধানী রোম্যান্টিক সত্তার কাছে এই অভিনব জীবন-দর্শনের যে বিশেষ আবেদন ছিল, তা সহজেই অনুমেয়।

বিশ শতকের আরেকজন ইংরেজ লেখক প্রথম যুদ্ধোত্তর বাঙালী লেখক মহলে জনপ্রিয় ছিলেন। তিনি অলডুস হাক্‌সলি। এই বিদগ্ধ লেখক বর্তমান পৃথিবীর, বিশেষভাবে যুদ্ধোত্তর জীবনের কৃত্রিম বন্ধ্যারূপ, বুদ্ধিজীবীর জীবনের অস্থিরতা, অনিশ্চয়তা ও স্ববিরোধিতার বিশ্লেষণ তাঁর গল্পে উপন্যাসে ফুটিয়ে তুলেছেন। জীবনের এই লক্ষ্যহীনতা ও অন্তঃসারশূন্যতাকে তিনি ব্যঙ্গের আঘাতে আরও প্রকট করে তুলেছেন।

তাঁর উপন্যাস নাগরিক জীবনের পটভূমিতে রচিত 'সমস্যা-প্রধান' কাহিনী। এখানে 'কাহিনী'-অংশ সীমিত। বক্তব্যই প্রধান। এই বক্তব্য সমাজ রাষ্ট্র ধর্ম যৌন-আচরণ সাহিত্য শিল্পকলা ইত্যাদি নানা বিষয়ে বুদ্ধিগ্রাহ্যরূপে উপস্থাপিত হয়েছে। এই শ্রেণীর সমস্যা-প্রধান 'বুদ্ধিজীবী' উপন্যাসের ক্ষেত্রে হাক্‌সলির বিশেষ প্রতিষ্ঠা। প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর বাঙালী তরুণ বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের কাছে তাই হাক্‌সলির কথাসাহিত্যের আকর্ষণ স্বাভাবিক ও প্রত্যাশিত। বলা হয়ে থাকে এ যুগের তরুণ লেখকগোষ্ঠীর অনেকের ওপর হাক্‌সলির রচনার প্রভাব বর্তমান।

প্রথম যুদ্ধোত্তর কালের বাঙালী যুবমানসে প্রচলিত সমাজব্যবস্থা ও চিন্তা-ধারাকে আঘাত করার যে প্রবণতা এসেছিল, হাক্‌সলি তাতে প্রেরণা সঞ্চার করেছিলেন মনে হয়। ব্যঙ্গ বিদ্রূপ ও মননদীপ্ত বাচনভঙ্গী—সেই আঘাতের যা অন্যতম অস্ত্র, তা অন্তত আংশিকভাবে যুগিয়ে ছিলেন হাক্‌সলি, একথা বললে বোধহয় মিথ্যাভাষণ হবে না।

প্রথম যুদ্ধোত্তর বাঙলা উপন্যাসে গল্পে কাহিনী-অংশ কমিয়ে বুদ্ধি-বিতর্ক ও 'আইডিয়া'র প্রকাশ ক্রমশ প্রাধান্য পেয়েছে। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং বাঙলা কথাসাহিত্যে এই ধারার প্রবর্তন করেছেন। তাঁর শেষ পর্বের উপন্যাসে তার যথেষ্ট পরিচয় আছে। বাঙলার তরুণ মননবৃত্ত লেখকরা অবশ্যই তা থেকে প্রেরণা ও পথের ইসারা পেয়েছেন। কিন্তু য়ুরোপ থেকেও প্রেরণা এসেছে। হাক্‌সলি এই ক্ষেত্রে প্রেরণার অন্যতম উৎস। অবশ্য কল্লোল-পর্বের তরুণ কথাসাহিত্যিকের রোম্যান্টিক কবিপ্রাণ ও যৌবনসুলভ আবেগধর্মী সত্তা হাক্‌সলির হীরক-কঠিন ধারালো বিদ্রূপ ও বুদ্ধিদীপ্ত নিরাবেগ বিতর্ক- ও বিচার-প্রবণতার ব্যাপক অনুসরণে কখনো আগ্রহী হয় নি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অব্যবহিত পরবর্তী বাঙলা সাহিত্যে যতই বাস্তবতা ও মননচেতনার উদ্ভব হোক না কেন, রোম্যান্টিক চেতনাও তখন প্রবল। তার ফলে হাক্‌সলির প্রেরণা আমাদের সাহিত্যে তখনও নিতান্তই আংশিক ও সীমাবদ্ধ।

তিন

বিশ শতকের গোড়ার দিকে, বিশেষভাবে যুদ্ধোত্তর কালে এইরকম নানা বিচিত্র পথে য়ুরোপীয় কথাসাহিত্যের সঙ্গে তরুণ বাঙালী লেখকদের ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়েছে। ভাব ও ভাবনার যোগ হয়েছে। অবশ্য একথা বলা বাহুল্য যে য়ুরোপীয় সাহিত্যের সঙ্গে সংযোগের এখানেই শেষ নয়। দিনে দিনে এই সংযোগের ক্ষেত্র আরও প্রসারিত হয়েছে। যেসব বিভিন্ন বিদেশী লেখকের রচনা প্রেরণা সঞ্চার করেছে বাঙালী তরুণ লেখকের মনে, তাঁরা সকলেই নিশ্চয় এক ধরনের অর্থাৎ একই জীবনবোধসম্পন্ন, একই দৃষ্টিভঙ্গীযুক্ত লেখক ছিলেন না। যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য শিল্পীর পরম সম্পদ, অক্ষয় অধিকার—তা তাঁদের অবশ্যই ছিল। তবু, প্রশ্ন জাগে, তাঁরা সকলেই একসঙ্গে কীভাবে 'কল্লোল গোষ্ঠী'র তরুণ লেখকদের মনে প্রেরণা সঞ্চার করলেন? কারণ 'কল্লোল গোষ্ঠী'র লেখকদের একগোষ্ঠীভুক্ত বলা হলেও, তাঁরা স্বভাবতই স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বের অধিকারী।[৯] এর ফলে বিদেশী লেখকদের সম্পর্কে রুচিভেদ স্বাভাবিক। একই যৌনচেতনার প্রকাশ নানা বিদেশী লেখকের রচনায় হয়েছে। অথচ তাঁদের জীবনবোধ কখনও এক নয়। তাঁদের যৌনপ্রত্যয়ও সম্পূর্ণ সদৃশ নয়। যেমন হ্যামসুন ও লরেন্স। অথচ দুজনেই কি কল্লোল গোষ্ঠীর লেখকদের মনে বিশেষ প্রেরণা সঞ্চার করেন নি? সে প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে যে, একালের যৌনজিজ্ঞাসার ক্ষেত্রে যে-দুঃসাহসিক মনোভাব দেখা দিয়েছিল প্রথম যুদ্ধোত্তর পর্বে, সেই দুঃসাহসী চিন্তাধারার প্রকাশ উভয়ের রচনাতেই আছে। তাই তাঁদের পার্থক্য সত্ত্বেও এই 'বিদ্রোহী' সমাজ-নিরপেক্ষ ব্যক্তি-কেন্দ্রিক চিন্তাধারা একালের অধিকাংশ বাঙালী তরুণ শিল্পিমনকে উল্লসিত করেছে। আবার সেই সঙ্গে এ-ও বলা প্রয়োজন, অচিন্ত্য সেনগুপ্ত যতখানি হ্যামসুনের প্রতি আকৃষ্ট, বুদ্ধদেব বসু সম্ভবত তা নন। তাঁর গূঢ়তর আকর্ষণ বরং লরেনসের প্রতি। বলা বাহুল্য, এটা সম্ভব হয়েছে বাঙালী লেখকদের স্বকীয় প্রবণতার জন্য।

কল্লোল গোষ্ঠীর লেখকদের ওপর এই পাশ্চাত্ত্য প্রভাবের অন্তর্নিহিত একটি স্ববিরোধের প্রতি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় একবার কটাক্ষ করেছিলেন। প্রেমেন্দ্র মিত্র ১৩৩৩ সালের ১৭ই জ্যৈষ্ঠ ঘাটশিলা থেকে একটি পত্রে লিখেছিলেন, 'জীবনকে দেখবার পাঠ নিতে যদি হ্যামসুন গোর্কির পাঠশালায় গিয়ে থাকি তাতে দোষ কি......' —পত্রের এই অংশ উদ্ধার করে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন, 'মনে আছে, "মাদার" পড়তে পড়তে হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলাম--হ্যামসুন আর গোর্কিকে প্রেমেনবাবু মেলাবেন কি করে? ...ভাবের আকাশের ঝড় আর মাটির পৃথিবীতে জীবনের বন্যার পার্থক্য কি ধরা না পড়ে পারে?'[১০]

মানিকবাবুর এই মন্তব্যের সারবত্তা অস্বীকার না করেও বলা যেতে পারে, প্রত্যয়ের এই দ্বৈধতা ও বিপরীত গতি প্রথম যুদ্ধোত্তর কালে নব্য 'প্রগতি'পন্থী কল্লোল গোষ্ঠীর অনেকখানি স্বধর্ম হয়ে উঠেছিল। এই গোষ্ঠীর লেখকদের মধ্যে কখনও প্রকাশ পেয়েছে বাস্তব জীবনের প্রতি তীব্র আগ্রহ, কোথাও বা রোম্যান্টিক বোহেমীয় প্রবণতা। কোথাও বা নিঃস্ব নর-নারীর অপরিসীম দারিদ্র্যের ছবি, সেই কঠিন বাস্তবের সঙ্গে সংগ্রামের অক্লান্ত

[৯] এই গোষ্ঠী'র লেখকদের সম্পর্কে বুদ্ধদেব বসুর উক্তি স্মরণীয়, '....no two authors, though initially belonging to the same movement or the same historical group, think, feel or write in the same way.'—*An Acre of Green Grass.*

[১০] "লেখকের কথা" গ্রন্থের 'সাহিত্য করার আগে' প্রবন্ধ থেকে।

প্রয়াস, আবার অন্য দিকে কোথাও যৌন চেতনা ও দেহকামনার বাস্তব চিত্রণের মধ্যেও মধ্যবিত্ত প্রেমের রোম্যান্টিক স্বপ্নালুতা। আসলে মৈথুনপ্রবৃত্তির প্রতি আধুনিক লেখকদের যে বিশেষ আকর্ষণ, তারও অন্যতম উৎস হচ্ছে এ পর্বের লেখকদের রোম্যান্টিক রহস্যপ্রবণতা। মানবজীবনের প্রচ্ছন্ন সত্যকে জানার রোম্যান্টিক কৌতূহলই তাঁদের এই বিষয়ে অতি-মনোযোগের অন্যতম কারণ হয়ে উঠেছিল।

এই দুই বিচ্ছিন্ন প্রবণতার উল্লেখযোগ্য প্রতীক হলেন যথাক্রমে গোর্কি ও হামসুন। অর্থাৎ জীবনাশ্রিত প্রত্যক্ষ বাস্তবতা ও বোহেমীয় রোম্যান্টিকতা—এই দুয়ের প্রতি কল্লোল-গোষ্ঠীর লেখকদের অনেকের যে সমান আগ্রহ, যা হয়তো অনেক ক্ষেত্রে স্ববিরোধী, তার পিছনে পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের বেশ কিছু প্রেরণা যে বর্তমান, সেকথা নিশ্চয় মিথ্যা নয়।

অন্য আলো

অজয় দাশগুপ্ত

টাইমপিসের টিকটিক শব্দের অনুভবগুলির মধ্যে মৃণালকে মনে পড়ে। একটি শব্দের পর অন্য আরেকটি শব্দ হওয়ার মধ্যেকার ভগ্নাংশটুকু পর্যন্ত মৃণাল স্পষ্ট ব্যাপ্ত। অরুণিমা আজ সাতদিন ধরে মৃণালকে ভীষণভাবে ভুলে যেতে চাইছে। আর আশ্চর্য, ভোলা দূরের কথা, মৃণাল যেন আলাদীনের প্রদীপের দৈত্যপ্রায় বারংবার এই সাতদিন ঘুমে জাগরণে ওর চোখের সমুদ্র জুড়ে দাঁড়িয়ে থাকছে।

মৃণালকে ভুলে গিয়েছিল অরুণিমা। সম্পূর্ণ একপাশে অবহেলায় জঞ্জাল সরিয়ে রাখবার মতো সরিয়ে রেখেছিল। অন্য কেউ অরুণিমার কাছে ওর প্রসঙ্গে কিছু বললে, অরুণিমা উত্তর দিত, 'প্লীজ অন্য কিছু বলো। মেয়েমানুষের যৌবন থাকলে অ্যাডমায়ারার থাকবে। আবার স্রোতে ভেসে আসার মতো তারা ভেসে যাবে। এ নিয়ে আলোচনা করাটা স্বাস্থ্যের পক্ষে খারাপ বলেই আমি মনে করি।'

অরুণিমার সবচেয়ে কাছের ইন্দ্রাণী কিন্তু ওর এ কথা বিশ্বাস করে নি। সে শুধু মনে মনে ভেবেছে, এটা অরুণিমার ওভার স্মার্টনেস। মৃণাল ওর হৃদয়ে অবশ্যই দাগ কেটেছে। এ দাগ খড়ির দাগ নয় যে এত সহজে মুছে যাবে। অরুণিমাকে আড়ালে ডেকে ইন্দ্রাণী তাই জানতে চেয়েছিল সত্যি ব্যাপারটা কী! অফিস ফেরত দুজনে বেরিয়ে চিনেবাদাম খেতে খেতে ইন্দ্রাণী কথাটা তুলল। 'অরুণিমা, তুই কিন্তু আমার কাছেও আড়াল করছিস— সত্যি করে বল তো তোদের কী হয়েছে?'

অরুণিমা হঠাৎ চলা বন্ধ করে ফ্যালফ্যাল করে ইন্দ্রাণীর দিকে তাকাল। সেই দৃষ্টিতে বিস্ময়। তারপর আবার চলতে শুরু করে বলল, 'ইন্দ্রাণী, তুই আমাকে অবিশ্বাস করিস জানতাম না।' তার গলা গাঢ় ও স্বর নিচু।

'বুঝলাম না!' এবার ইন্দ্রাণী বিস্মিত। 'এ কী বলছিস তুই! এতদিনে তোর আমার সম্পর্কে এই ধারণা হল!'

'হবে না কেন?' উদাস অরুণিমার গলা। চিনেবাদামের খোলা ভাঙতে ভাঙতে চোখ বাদামের দিকে নির্দিষ্ট রেখে সে বলতে লাগল, 'কেউ বোকা হলে তাকে বোঝানো অসম্ভব। মৃণালবাবুকে আমার ভাল লাগত। মধ্যবিত্ত, মধ্যবিত্ত কেন গরিব আমরা—তা বলে হ্যাংলা নই। মৃণালবাবুর প্রথমদিকের সহৃদয়তার পেছনে যে কোনো উদ্দেশ্য আছে তা ভাবি নি কখনো। তাই তাঁর সঙ্গে খুবই ঘনিষ্ঠ হয়ে মিশেছিলাম। কিন্তু সেটাকে উনি যে এভাবে নেবেন এবং প্রচার করে বেড়াবেন তা অকল্পনীয়। ভেবে দেখ ইন্দ্রাণী, অনেক বিশ্বাস আর চোখের জল পেছনে রেখে চাকরি করতে বেরিয়েছি, সেই বিশ্বাসকে অপমান করতে পারি না। মৃণালবাবু বুঝেও কেন অবুঝ জানি না, অদূর ভবিষ্যতে আমার পক্ষে বিয়ে করা অসম্ভব। আমরা দুইবোন আয় করি, আর সেই টাকায় এখনো দুটি ভাইবোন লেখাপড়া শিখছে।' অরুণিমার দীর্ঘ নিশ্বাসের প্রলম্বিত শব্দ ইন্দ্রাণী শুনতে পেল। এবং অনুভব করল তার ধারণা তাহলে নিতান্তই ভুল।

'তুই স্পষ্ট করে তাহলে তো ওকে বলে দিতে পারিস।' ইন্দ্রাণী হালকা সুরে বলল,

'এখনো তো দেখি তোর দিদির পেছনে মৃণালবাবু দিদি দিদি করে ঘুরে বেড়াচ্ছে।'

'তাহলে তো অনেককেই অনেক কিছু বলতে হয়—' অরুণিমা হাসল, 'দেখ, ইন্দ্রাণী এই ছমাস চাকরির মধ্যে অন্তত কুড়িজন পুরুষের সঙ্গে মিশছি, হাসছি, বেড়াতে যাচ্ছি; হ্যাঁ, মৃণালবাবুর সঙ্গে মেলামেশাটা আমার একটু বেশিই হয়ে গিয়েছিল, যার জন্য তুইও ভুল বুঝেছিস—কিন্তু ইন্দ্রাণী, ওঁর সরল স্বচ্ছ হাবভাব আমাকে এতটা ঘনিষ্ঠ করেছিল। মৃণালবাবুকে সত্যি বলছি, আমার ভাল লেগেছিল, অন্যরকম হৃদয়বান যুবক মনে হয়েছিল।'

ইন্দ্রাণী আর কোনোদিন মৃণালপ্রসঙ্গ তোলে নি। অরুণিমা প্রত্যহের মতো অফিস করেছে, প্রত্যহ মৃণালের নানা ঘটনা শুনেছে, মনে মনে হেসেছে আর তীব্র কাঠিন্য নিয়ে মৃণালকে এড়িয়ে গেছে। মৃণাল ছাড়া অফিস স্টাফ অন্য সব পুরুষ বন্ধুরা যেমন আগে নিকট ছিল তেমনি নিকটেই থেকেছে। একমাত্র মৃণাল হঠাৎ কক্ষচ্যুত হয়ে দূরে সরে গেছে। বরং বলা উচিত, অরুণিমা তাকে ব্যবধানে সরিয়ে দিয়েছে। তবুও সে পরিত্যক্ত হয়েও অরুণিমাকে কেন্দ্র করে ঘুরেছে। দিদি অণিমার সঙ্গে ভাব পাতিয়ে বাড়িতে আসা-যাওয়া বজায় রেখেছে। অন্তত মৃণাল এমন একটা ভাব দেখাতে চেয়েছে, যেন অরুণিমা খুবই ছেলেমানুষ। নিজের ভালোমন্দ সে বোঝে না। ছেলেমানুষি কোনো অভিমানের পর্দা টাঙিয়ে ঘুরছে। সময়ে মৃণালকে কাছে ডেকে নেবে অবশ্যই।

মৃণাল আর অরুণিমার মধ্যেকার কোনো মতান্তরের কথা তাই অরুণিমার বাড়িতে রাষ্ট্র হয়নি। অণিমা খানিকটা আভাসে বুঝেছিল, আলোচনা করে নি এ নিয়ে। অরুণিমা মৃণালকে বর্জন করার পর ভয়ে ভয়ে থাকত। মৃণাল যে ধরনের বোকা তাতে যে কোনো দিন বাড়িতে হয়তো তার মনোবাসনা ঘোষণা করে একটা কেলেঙ্কারি করবে। মা এসব শুনলে, বা অন্য কোনো গুরুজন তাঁকে স্খলিতা ভাবলে সে আর মুখ দেখাবে কী করে। মৃণাল অবশ্য কিছুই করেনি। শুধু গা শুঁকে শুঁকে দিন কাটিয়েছে। এক-আধটা দিন নয়, অনেক দিন।

অরুণিমাদের বাবা নেই। অল্প বয়সে অরুণিমা বুঝতে শিখবার আগেই বাবা মারা গেছেন। জমানো যা কিছু ছিল বাবার, তা গেছে দুবোন কোনো রকমে লেখাপড়া শিখে বড় হতে। সংসারের কঠিন এক মুহূর্তে অণিমা চাকরি পেতে সবাই ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানিয়েছিল। অণিমার একার টাকায় সংসার চলছিল না, তবু নাভিশ্বাস থেকে বাঁচল। অরুণিমা এর পর চাকরি পেল, সকলের মুখে হাসি ফুটল। সামান্য একটু স্বাভাবিকতার বর্ণ পেল ওরা।

অফিস জীবনে অরুণিমা কদিনেই সকলের কাছের হয়ে গেল। নরম উষ্ণতার মনের চেহারা সকলের ভাল লাগল। এই সময়ে মৃণাল তার দরাজ হাত বাড়িয়ে ধরল। ছোটখাট, ফরসা, বেঁটে এই যুবকের ভেতরে একটা অনেক বড় অন্তঃকরণ দেখেছিল অরুণিমা।

স্বাভাবিকভাবে আলাপ শুরু হল। মৃণাল লক্ষ্য করেছিল অরুণিমা বলতে গেলে টিফিন খেত না। সত্যিই প্রথমদিকে টিফিন খাওয়ার মতো পয়সা তার ছিল না। দু-চার দিন পর একদিন টিফিনের সময় মৃণাল এগিয়ে এল। অরুণিমা এ-সময়ে সকলকে এড়িয়ে থাকত। ওর লজ্জা, যাতে কেউ না ওকে নিজেদের খাবারের ভাগ দেয়।

মৃণাল বলল, 'কী করছেন মিস সেন, চলুন টিফিন করে আসি।'

কথাটা শুনেই লজ্জায় লাল হয়ে উঠল অরুণিমা। মনে হল সে কোনো গোপন অপরাধ করে ধরা পড়ে গেছে। তাড়াতাড়ি বলল, 'আপনি যান মৃণালবাবু, আমার শরীরটা

আজ ভাল নেই। কিছু খাব না। বেয়ারাকে চা আনতে বলেছি—এখনি নিয়ে আসবে।'

মৃণাল বসল। এই প্রথম আলাপের সূত্রপাত। সে হেসে বলল, 'আমার সঙ্গে আপনার আলাপ নেই বলে যেতে চাইছেন না; আমি সবার মধ্যে সপ্রতিভ আলাপ করতে পারি না। আপনাকে একা দেখে আজ এগিয়ে এলাম। না গেলে কিন্তু খুব কষ্ট পাব।'

অরুণিমাও হেসে ফেলল। 'না, না—আপনি তা ভাবছেন কেন?' নিজের একটু আগের ধরা পড়ে যাওয়া ভাবটা সামলে বলল, 'এক অফিসে চাকরি করছি, অপরিচয়ে কী যায় আসে? সত্যিই শরীরটা খারাপ তাই—'

'ওটা কিন্তু এড়িয়ে যাওয়ার কথাই—' মৃণাল বলল, 'চলুন টিফিন খেলে শরীর খারাপ হবে না।'

অরুণিমার মন নরম। মৃণাল সেখানে রেখাপাত করল। দৃঢ়তায় না বলতে পারল না। বলল, 'যখন ছাড়বেন না তখন চলুন। আমার কিন্তু খেতে ইচ্ছে করছিল না।'

মৃণাল কোনো কথা বলল না, পাশাপাশি হাঁটতে লাগল।

এই শুরু। এরপর প্রায়ই টিফিনের সময় মৃণাল অরুণিমাকে ডেকে নিত। মৃণালের অমায়িকতায় অরুণিমা আর কোনো দিনই যেতে আপত্তি করেনি। মৃণাল তাকে বলত, 'মিস সেন, দশজনের জন্য খাটতে বেরিয়েছেন—আপনার দিকে অনেকেই তাকিয়ে আছে, কিন্তু নিজের শরীরটাও তো দেখতে হবে। না খেলে কাজ করবেন কী করে?'

অরুণিমা সরল আবহাওয়ায় মৃণালকে তার সংসারের অবস্থার কথা বলেছিল। মৃণালের পয়সায় খেতে আপত্তি করত না। সামর্থ্য অনুযায়ী মাসের মধ্যে দুদিন নিজেও মৃণালকে খাওয়াত। এইভাবে মৃণাল একমাসের মধ্যেই অরুণিমার অন্তরঙ্গ নির্ভর হয়ে উঠল। সে তাকে আপনজন বলে ভাবতে শুরু করল।

উৎসাহের সঙ্গে বাড়িতে নেমন্তন্ন করে খাওয়াল। আলাপ করিয়ে দিল দিদির সঙ্গে।

শৌখিন মৃণাল উপহার কিনে দিত অরুণিমাকে। কখনো বা অণিমা কিংবা ছোট কোনো ভাইবোনকে। অরুণিমা মৃণালকে স্নেহের শাসন করত, 'এ আপনার অন্যায় কিন্তু, আপনি এভাবে অপব্যয় করেন কেন—এরপর আর নেব না দেখবেন। তখন রাগ করলেও লাভ হবে না।'

মৃণাল শান্তভাবে অরুণিমার শাসন সহ্য করত।

ইন্দ্রাণীরা ওদের লক্ষ্য করছিল। ইন্দ্রাণী হাসতে হাসতে একদিন অরুণিমাকে বলল, 'কিরে, তোদের দুজনকে আজকাল যে খুব ব্যস্ত দেখা যায়, ব্যাপার কী! এত কিন্তু ভাল না, লোকে সন্দেহ করবে। অনেকে তো এর মধ্যেই সন্দেহ শুরু করে দিয়েছে।'

'যার যা ইচ্ছে তোরা করতে পারিস—' অরুণিমাও হেসে উত্তর দিল, 'মৃণালবাবুকে আমার ভাল লাগে, তাঁকে আমি বন্ধু মনে করি। সবাই এ নিয়ে হিংসে করতে পারিস।'

মৃণালের সাহচর্যে অরুণিমার একঘেয়ে অফিসের দিনগুলি ভাল কাটছিল। এবং অরুণিমার ধারণা ছিল এমনই চিরদিন থাকবে। কিন্তু তা থাকল না। হঠাৎ একদিন অরুণিমা আবিষ্কার করল, অন্য দশজন যুবকের থেকে মৃণালের কোনো তফাত নেই। মৃণাল দেরিতে হলেও তার লোভের হাত বাড়িয়ে ধরল। সেদিন দুজনে হাঁটতে হাঁটতে এসপ্লানেডে এল অফিস শেষে। বাস টারমিনাসে দাঁড়িয়ে অরুণিমা বলল, 'মৃণালবাবু আপনি তো বাড়ি ফিরবেন।'

'যদি বলি তোমার সঙ্গে যাব?'

'চলুন, আপত্তি করব না।' অরুণিমা হাসল সুন্দর।

'চল। তোমাকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসি।' মৃণাল একটা সিগারেট ধরিয়ে বলল, 'আজ আর টিউশনিতে যাব না। এত সকাল সকাল মেসে ফিরেই বা কী হবে। তার চেয়ে তুমি বাড়ি ফিরে একটা গান শোনাতে পার।'

'আমি আবার গান জানি নাকি!' অরুণিমা বলল।

'যতটুকু জান তাই আমার কাছে যথেষ্ট।' মৃণাল ওকে উৎসাহিত করল। 'তুমি সিরিয়াসলি গান শিখলে পারতে।'

'কখন শিখব আর কার কাছে?' অরুণিমা আকাশের দিকে তাকাল। আকাশের রক্তাভা তখন প্রায় বিলীন।

'ইচ্ছে থাকলে উপায়ের অভাব হয় না।' মৃণাল সিগারেটের ছাই ঝাড়ল। 'তুমি শিখতে চাও তো আমি ব্যবস্থা করে দেব। শিখবে?' মৃণাল দু চোখে আগ্রহ জ্বালিয়ে অরুণিমার দিকে চাইল। অরুণিমাকে তার তখন খুব সুন্দর, খুব কাছের, একান্ত নিজের বলে মনে হচ্ছিল। নিজের একটি হাত বাড়িয়ে মৃণাল হঠাৎ আবেগে অরুণিমার একটি হাত ধরে ফেলে। তার ভেতরের একটা কাঁপুনি ওই হাত বেয়ে অরুণিমাকে শিহরিত করল। তার গলার স্বরেও আবেগ কেঁপে উঠল, 'বলো তুমি শিখবে?'

অরুণিমা হাত ছাড়িয়ে নিল। একটু চঞ্চল হল। যেন হঠাৎ সন্ধ্যা হয়ে যাওয়ায় তার ভয় লাগল, বলল, 'আপনি বেশ লোক, দুটো বাস চলে গেল—বাড়ি যেতে হবে না?'

মৃণাল সংযত হল। সিগারেটটা ফেলে দিল। একটু আগে সে যেন এখানে এই এসপ্লানেডের বাস টারমিনাসে ছিল না, অন্য কোথাও চলে গিয়েছিল। সেখান থেকে ফিরে তাড়াতাড়ি বলল, 'চল, সিগারেটটার জন্য অপেক্ষা করছিলাম।'

একটা বাসে দুজনে উঠে পড়ল। ভিড়ের মধ্যে বাসে অরুণিমা একটু আগের চঞ্চলতা ভুলে সমাহিত হয়ে পড়ল। ভাবছিল, মৃণাল ও-রকম অস্থির হয়ে উঠেছিল কেন!

বাড়ি পৌঁছে অরুণিমা মৃণালকে গান শোনাল। রাত নটা নাগাদ মৃণাল উঠল। চলে যাবার সময় সে স্বাভাবিক, শান্ত। অরুণিমার অপরিহার্য বন্ধু। যাবার সময় অণিমা বলল, 'মৃণালবাবু আবার আসবেন।'

'রোজই তো আসতে চাই দিদি—' মৃণাল ফিরে বলল, 'অরুণিমা আসতে বলে কই!'

'বাঃ আমি কি আপনাকে আসতে বারণ করি নাকি! যেদিন যখন খুশি চলে আসবেন।'

মৃণাল চলে গেল ধীর পায়ে। অরুণিমার মনে হল মৃণালের আরো কিছু কথা বলার ছিল, কিন্তু সে তা না বলেই চলে গেল। আজ না বললেও সে একদিন না একদিন সেকথা বলবে। কিন্তু তখনও কি এই বন্ধুত্ব সংযত থাকবে। অরুণিমার ভেতরটা কেমন এক অস্বাভাবিক চিন্তায় দুলতে লাগল।

পরের দিন টিফিনের সময় মৃণাল বেশি কথা বলল না, শুধু বলল, 'অরুণিমা ছুটির পর তোমার সঙ্গে একটা জরুরী কথা আছে। একসঙ্গে বেরোব।'

অরুণিমার অবাক লাগল। তবু কী কথা তা সে জিজ্ঞেস করল না।

ছুটির পর মৃণাল অরুণিমার সঙ্গে পথে বার হল। খানিকটা পথ দুজনে নিশ্চুপ হাঁটল। অনেকটা পথ চলবার পর মৃণাল বলল, 'অরুণিমা, এতদিন তোমাকে একটা কথা বলব বলব করেও বলতে পারি নি। এখন দেখছি আর না বললে চলবে না। আমার মা বুড়ো হয়েছেন তুমি জান, তিনি বহুদিন থেকে আমাকে বিয়ে করতে বলছেন, তোমার মুখ

চেয়ে এতদিন তাঁকে থামিয়ে রেখেছি, আর সম্ভব নয়। এবার তোমাকেই আমি জিজ্ঞেস করছি, মাকে কী বলব?'

অরুণিমার মুখ চোখ লাল হয়ে উঠল। উত্তেজনায়, অপ্রত্যাশিত একটা কিছু ঘটে যাওয়ায় সে কাঁপতে লাগল। জনস্রোততাড়িত রাস্তার মধ্যেই সে দাঁড়িয়ে পড়ল। উত্তেজনাকে আয়ত্তে আনতে সামান্য সময় নিল অরুণিমা। তারপর বেশ রূঢ় গলায় বলল, 'এ আপনি কী বলছেন মৃণালবাবু?'

অরুণিমার হাঁটার গতি খানিকটা বাড়ল। তার সঙ্গে তাল রাখতে গিয়ে মৃণালকেও বেশ জোরে হাঁটতে হচ্ছিল। সে দ্রুত চলতে চলতে বলল, 'আমি কি কোনো অন্যায় করেছি, আমি কি তোমার অযোগ্য?'

অরুণিমার উত্তর দেবার ইচ্ছে ছিল না। দশজন থেকে আলাদা করেই এতদিন মৃণালকে ভেবেছে সে। তাদের বন্ধুত্ব নিয়ে ইন্দ্রাণীর কাছে অনেক গর্বও করেছে। কিন্তু সেই মৃণালও সাধারণ, অতি সাধারণ মানুষের মতো প্রেমিক হয়ে উঠল। অরুণিমার কান্না পেল। কোনো কথা বলতে পারল না।

'তুমি কিছু বলো, অরুণিমা, এভাবে আমাকে হতাশ করো না!' মৃণাল আবার বলে উঠল।

'আমার কিছু বলার নেই—' ধরা গলায় সে বলল, 'আপনি ভুল করেছেন, মস্ত ভুল। আপনি আর কোনোদিন আমার সঙ্গে কথা বলবেন না। কোনোদিন না, ছিঃ ছিঃ আমি যে ভাবতে পারছি না—'অরুণিমার রুদ্ধ কান্না প্রকাশ হয়ে পড়ল। সে আর দাঁড়াল না। হনহন করে হাঁটতে লাগল।

'শোন, অরুণিমা শোন—' হতভম্ব মৃণাল ডাকতে লাগল। অরুণিমা দাঁড়াল না।

এরপর দূরত্ব তৈরি হল। একই অফিসে, একই রাস্তায় অরুণিমা আর মৃণালকে চিনল না। চিনতে চাইল না। যাকে সে তার একজন শুভানুধ্যায়ী ভেবেছিল সেই তাকেই গোপনে ঘৃণা করতে লাগল। প্রথম প্রথম অফিসের সবাই অবাক হয়েছিল, তারপর একদিন আলোচনা থেমে গেল। সকলের উৎসাহ নিবে গেল। কিন্তু মৃণাল থামল না। সে তখনো অরুণিমার আড়ালে তার প্রতি তার অনুরাগের হাওয়াকে ছোটাতে চাইল। একাই সে অরুণিমাকে টেনে রাখতে চাইল। অণিমার সঙ্গে আলাপ বজায় রাখল। ওদের বাড়ি যাতায়াত করতে লাগল। অরুণিমার ভাল না লাগলেও একটা কেলেঙ্কারি যাতে না হয় তার জন্য চুপ করে সব সহ্য করল।

ছ'মাস কেটে গেল দেখতে দেখতে। মৃণালের স্মৃতিটুকুও ম্লান। অফিসশুদ্ধ সকলেই ভুলে গেল মৃণাল-অরুণিমা উপাখ্যান। এমন সময় একদিন বাড়ি ফিরে অবাক অরুণিমা। কথায় কথায় অণিমা বলল, 'অরু, আজ অনেকদিন বাদে হঠাৎ অফিসে মৃণাল এসেছিল; ওর নাকি আগামী সাতই বিয়ে। আমাকে দুহাত ধরে বারবার বলে গেল যাবার জন্য। কী ব্যাপার, হঠাৎ ঠিক হল নাকি!'

'সে কী!' অরুণিমা আকাশ থেকে পড়ল। 'আমি কিছুই জানি না।'

'তোকে নেমন্তন্ন করে নি!' এবার অণিমার অবাক হওয়ার পালা। 'অদ্ভুত কাণ্ড! যাক শেষ পর্যন্ত ও বিয়ে করল। ভালই হল।'

অরুণিমা কোনো কথা বলল না। পরদিন অফিসে গিয়ে শুনল মৃণাল অনেককেই

বিয়েয় যেতে বলেছে। এমনকি ইন্দ্রাণীও নিমন্ত্রিত। একমাত্র তাকেই মৃণাল বাদ দিয়েছে ওই শুভ অনুষ্ঠানের সাক্ষী হওয়া থেকে। একদিন মৃণালকে নিয়ে কোনো ভাবনা ছিল না। তাকে অরুণিমা অব্যবহার্য বস্তুর মতো সরিয়ে দিয়েছিল অন্ধকারে। হঠাৎ মনজুড়ে কোথা থেকে যেন অভিমান এল। আজ আবার নতুন করে অরুণিমার কান্না পেল। আর সেই কান্নায় মৃণাল তার দুচোখের সবটুকু জুড়ে দাঁড়াল। একটানা সাত দিন। সময়ের সমস্ত পল অনুপল জুড়ে।

বিয়ের সাতদিনই বাকী ছিল। সপ্তম দিন সকালে উঠে বিষণ্ণতায় সে ভাবল, আজ মৃণালের বিয়ে। খানিকক্ষণ ছটফট করল। ঘড়ি দেখল, তারপর মাকে বলল, 'মা আজ আর অফিস যাব না। একটু বেরোব, এসে খাব। আমার জন্য বসে থেক না।'

'কোথায় যাবি?' অণিমা বলল।

'একজনের বাড়িতে', অরুণিমা জবাব দিল, 'জরুরী একটা কাজে।'

সেজেগুজে অরুণিমা বেরিয়ে পড়ল। কলকাতার বাইরে শ্রীরামপুরে এসে নামল সে। স্টেশনে নেমে একবার ভাবল ফিরে যাই, তারপর আবার নিজেকে বলল, 'না সত্যটা জানিয়ে দেওয়াই দরকার। এতদিন আমি জানিনি, তাই অস্বীকার করেছি, এখন জেনেছি, অন্যকে জানাতে দ্বিধা নেই।

পায়ে পায়ে মৃণালের বাড়িতে এসে দাঁড়াল অরুণিমা। মৃণালের সঙ্গে এ বাড়িতে সে এসেছে। একা এর আগে কোনোদিন আসেনি। বাড়ির সামনে এসে থমকে দাঁড়াল সে। দ্বিধা তাকে বারবার জড়িয়ে ধরতে চাইল। দ্বিধা কাটিয়ে দৃঢ় হাতে অরুণিমা দরজার কড়া নাড়ল। অপরিচিত একজন দরজা খুলে মহিলা দেখে বলল, 'কাকে চাই?'

'মৃণালবাবু আছেন, মৃণালবাবুকে একটু ডেকে দিন—' অরুণিমা খুব সহজেই বলল, লোকটি চলে যাচ্ছিল, 'বলবেন কলকাতা থেকে এসেছি বিশেষ দরকার।' যেন অরুণিমার মনে হল মৃণাল দেখা না করতেও পারে।

সামান্য সময়েই মৃণাল এসে পড়ল। দরজার সামনে এসে অরুণিমাকে দেখে সে ভূত দেখার মতো চমকে উঠল, তাড়াতাড়ি বলল, 'অরুণিমা তুমি!'

'হ্যাঁ আমি, মৃণাল।' অরুণিমা ম্লান হাসল, 'কিন্তু কি করব বলো, আজ তোমার বিয়ের দিন, আজই আসতে হল। আমার কিছু বলার ছিল।'

'বেশ তো ভেতরে এস।' মৃণাল ধাতস্থ হয়ে বলল।

'আমি এখুনি চলে যাব—' অরুণিমা জানাল, 'চল ভেতরে—তোমাকে কথাটা বলেই বিদায় নেব। খুব কদিন ভুগছি, আজ না বললে পাগল হয়ে যেতাম, তাই অফিস ফেলে, লজ্জা ভুলে চলে এসেছি।' দুজনে ভেতরের দিকে হেঁটে চলল, দুজনের চলার গতিই শ্লথ। কী একটা ভার যেন চেপে ধরেছে।

'আমাকে ক্ষমা করো অরুণিমা—' মৃণাল বসবার ঘরে ঢুকে বলল, 'তোমাকে জানাব বলে বহুবার চেষ্টা করেছি বহু ভেবেছি, সাহস করে বলতে পারি নি। তাছাড়া পুরুষেরও তো একটা লজ্জা আছে।'

অরুণিমা আস্তে আস্তে উত্তর দিল, 'তুমি ভালই করলে মৃণাল, তুমি বিয়ে করতে চলেছ বলেই আমি আমাকে আবিষ্কার করতে পারলাম; এবং শুভকামনা জানাতে লজ্জা ত্যাগ করে ছুটে এলাম।'

'কিন্তু সেদিন, সেদিন কেন তারপরও তো অনেকদিন গিয়েছে, তুমি আমাকে বলতে

পারতে!' মৃণাল কথা বলল গভীর স্বরে, 'আমি তো বহুদিনই অপেক্ষা করেছিলাম।'

'আরো অপেক্ষা করলেও বলা হত না—' অরুণিমা বলল, 'আমি অনুভব করতে পারতাম না আমার ভালবাসাকে, অভিমানের অতল থেকে আজ কদিন আগে হঠাৎ টের পেয়েছি, তোমাকে আমি অনেকদিন ধরেই ভালবাসি। কিন্তু আমার পরিবেশ, সতর্কতা, অভাব-অনটন আমাকে এতদিন জানায়নি মনের কথা, তাই রূঢ় হয়ে মুখ ফিরিয়ে ছিলাম।'

অরুণিমা মাথা নিচু করল, মৃণালের দিকে তাকানোর শক্তি যেন অপহৃত। সে উঠে দাঁড়াল এবং মৃণালকে কিছু বলতে না দিয়ে দ্রুত ঘর থেকে রাস্তায় বেরিয়ে গেল। রাস্তার জনস্রোতে এসে যখন সে স্বাভাবিক হল, তখন অনুভব করল এখন তার মন হালকা, নির্মেঘ আকাশের মতো নীল।

আধুনিক সাহিত্য

'দৃষ্টি থাকলেই দেখা যায় না, তার জন্য চাই দৃষ্টিকোণ', পনেরো বছর আগের এই মন্তব্য আলোচ্য গ্রন্থ পড়ার শেষে পুনর্বার মনে এলো। বাস্তবিক, দীর্ঘকাল বাদে এমন একটি বই পড়লাম যাতে উপন্যাসের মনোজ্ঞতার সঙ্গে প্রবন্ধের মনীষার মেলবন্ধন ঘটেছে। প্রকৃতি-বিচারে স্মৃতিচিত্রণ জাতীয় রচনা হলেও চিত্রিত লেখক ও মনীষীদের সম্পর্কিত নানা আকর্ষণীয় তথ্যে এটি ইতিহাস-গ্রন্থের মর্যাদা দাবি করতে পারে। রবীন্দ্রনাথ, প্রমথ চৌধুরী বা বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্যকৃতি নিয়ে যাঁরা গবেষণা বা আলোচনা করবেন, এই বই তাঁদের বিশেষ সহায়ক হবে। আলোচ্য বইটি ইতিহাস আরও এক-কারণে: এতে এমন দু-চারজনের চরিত্রচিত্রণ আছে, বৃহত্তর বাঙালীসমাজের কাছে যাঁরা অপরিচিত বা স্বল্পপরিচিত; বিহারীলাল গোস্বামী এবং বনবিহারী মুখোপাধ্যায়ের মতো বিশিষ্ট বাঙালীকে বিস্মৃতির হাত থেকে উদ্ধার করে শ্রীযুক্ত পরিমল গোস্বামী ঐতিহাসিকের কর্তব্য পালন করেছেন। অন্য পক্ষে, শিশিরকুমার ভাদুড়ি ও সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতো পরিচিত বাঙালীর ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্য তাঁর কলমে আরও স্পষ্ট ও উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

একুশ জন গৃহীতনামার কথা "আমি যাঁদের দেখেছি" গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে; এবং এই একুশ জনই যে বাঙালী, প্রাদেশিক শোনালেও তা বলতে দ্বিধা নেই। এঁদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ও প্রমথ চৌধুরীর মতো সাহিত্যস্রষ্টা যেমন আছেন, তেমনই আছেন হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো গবেষক, অবাঙালীসুলভ ধৈর্য এবং একনিষ্ঠতাগুণে যাঁরা আমাদের নমস্য। শিশিরকুমার ভাদুড়ির মতো শিক্ষিত ও প্রতিভাবান অভিনেতা এবং শরৎচন্দ্র পণ্ডিতের মতো নিখাদ মানুষ ও সার্থক বাঙালীও শ্রীযুক্ত গোস্বামীর দৃষ্টিবলয়ের অন্তর্ভুত হয়েছেন। সংকলিত চরিত্রগুলির বৈশিষ্ট্য-বৈচিত্র্যও আলোচ্য গ্রন্থের আকর্ষণ বৃদ্ধির অন্যতম কারণ।

"আমি যাঁদের দেখেছি" বইটির পাঠকের আনন্দজনক লাভ, প্রত্যেকটি চরিত্রই স্ব-স্ব ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্যে তাঁর সামনে উপস্থিত, অত্যন্ত জীবন্তভাবেই উপস্থিত। লেখক শ্রীযুক্ত পরিমল গোস্বামীর এইখানেই সর্বাধিক কৃতিত্ব। দা-ভিঞ্চির ছবির মানুষগুলির মতো শ্রীপরিমল গোস্বামীর স্মৃতিচিত্রের চরিত্রগুলিও আত্মতায় স্পষ্ট, স্বাতন্ত্র্যে সুচিহ্নিত। রাজশেখর বসুর আশ্চর্য মানসিক স্থৈর্য, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জেদ, সজনীকান্ত দাসের চরিত্রের পরস্পর-বিরোধিতা প্রভৃতি শ্রীযুক্ত গোস্বামীর তীক্ষ্ন দৃষ্টি এড়ায়নি এবং প্রাসঙ্গিক ঘটনার মাধ্যমে এই দোষগুণগুলি বর্ণিত চরিত্রগুলিকে স্পষ্ট, বিশ্বাস্য ও মহনীয় করে তুলেছে।

আমার এই উক্তির তাৎপর্য কিংবা সত্যতা প্রমাণ করতে গেলে উদ্ধৃতির প্রয়োজন, যে ক্ষেত্রে যে-দোষের আশঙ্কা স্বয়ং শ্রীগোস্বামীর, প্রকাশ করেছেন (রাজশেখর বসু সম্পর্কে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের রচনার অংশবিশেষ উদ্ধৃতিতে তাঁর অতৃপ্তি: 'সমগ্রের ছন্দ নষ্ট হল খণ্ড উদ্ধৃতিতে', পৃ. ৮৮)। তবু সেই আশঙ্কা মনে রেখে "আমি যাঁদের দেখেছি" থেকে দুটি উদ্ধৃতি দিচ্ছি, যা থেকে সামান্য কয়েকটি কথার আঁচড়ে প্রতিকৃতি আঁকায় শ্রীযুক্ত

গোস্বামীর দক্ষতার পরিচয়, আংশিকভাবেও পাওয়া যাবে।

'ঠিক এই চাঞ্চল্যের মুহূর্তে প্রকাণ্ড একখানা সরাতে থরে থরে সাজানো সন্দেশ এসে হাজির হল। কবি-মগজের স্বাদ-কেন্দ্রে এতক্ষণ যে আণবিক বা মোলিকিউলার চাঞ্চল্য ঘটেছিল তা থেমে গেল, সেই স্বাদকেন্দ্র থেকে গ্যাসটেটরি ও অলফ্যাকটরি স্নায়ু বেয়ে একটা আনন্দ-স্রোত একবার বাইরে একবার ভিতরে ছুটতে লাগল। পুলক দৃষ্টি-স্নায়ু বেয়ে চোখের তারায় নাচতে লাগল' ('রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর', পৃ. ২২)।

'আরও একদিনের কথা। তিনি বিছানায় শুয়েই থাকতেন শেষ কয়েক বছর। দেখতে গিয়েছিলাম। কিন্তু চেহারা দেখে হঠাৎ মনে হল এসে ভাল করিনি। কথা বলতে তাঁর কষ্ট হবে। কিন্তু তিনি উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন। অনর্গল কথা। অনেক গল্প। গল্প করতে করতে অসুখ কোথায় অন্তর্হিত হল, তড়াক করে এক সময় বিছানার উপর উঠে বসলেন। আর ঠিক সেই সময় কোন্ মন্ত্রবলে তাঁর অসুস্থ চেহারাও মিলিয়ে গেল! উৎসবে বিদ্যুতের ছোট ছোট আলোর মালায় যেমন আলোর প্রবাহ খেলে বেড়ায়, তেমনি দেখলাম তাঁর উচ্ছলতার আলো সর্বাঙ্গে খেলে বেড়াচ্ছে। সমস্ত অঙ্গে তাঁর মনের প্রকাশ' ('প্রেমাঙ্কুর আতর্থী', পৃ. ২০৬)।

চরিত্রচিত্রণে লেখক শুধু চিত্রকরই নন, আলোকচিত্রীও—স্বীয় অন্তর্দৃষ্টির আলোকে নিপুণ চরিত্রবিশ্লেষণের ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন বহু ক্ষেত্রে (বাচ্যার্থেও লেখক আলোক-চিত্রী; গ্রন্থভুক্ত প্রায় সমস্ত ছবিই তাঁর নিজের তোলা)।

বস্তুত, সরস রচনাভঙ্গীর জন্যই "আমি যাঁদের দেখেছি" সুখপাঠ্য হয়ে উঠেছে। বইটি পড়তে গিয়ে কোথাও ক্লান্তি আসে না, শেষ পাতা পর্যন্ত আগ্রহ ও কৌতূহল জাগরূক থাকে। স্মৃতিচিত্রকার হিসাবে লেখকের সার্থকতা এইখানে। আরও একটি কারণে গ্রন্থকার আমাদের প্রশংসাভাজন : স্মৃতিচিত্র রচনা করতে গিয়ে তিনি নিজেকে কোথাও উগ্রভাবে প্রকাশ করেন নি। পরের কথা বলতে গিয়ে নিজের কথা বেশি বলাটাই আমাদের জাতীয় স্বভাব, বর্তমান গ্রন্থে সেই স্বভাবের ব্যতিক্রম লক্ষণীয়। আলোচ্য গ্রন্থে লেখক যাঁদের কথা বলেছেন, খ্যাতির তারতম্য অনুসারে তাঁদের প্রত্যেকেই বিশিষ্ট ও বরেণ্য পুরুষ, অথচ তাঁদের কথা বলার সময় নিজেকে যথাসম্ভব অপ্রকাশ রেখেছেন। আমার ধারণা দীর্ঘ দিন সম্পাদকরূপে অন্যের আত্মপ্রকাশে সাহায্য করার অভ্যাসের ফলে নিজের উপস্থিতিকে অনুচ্চ রাখার এই ক্ষমতা পরিমলবাবু আয়ত্ত করেছেন; এবং সেই ক্ষমতার বিদ্যমানতা ও পরিবর্ধনে সহায়ক হয়েছে নেপথ্যপ্রিয় ও মিতভাষী রাজশেখর বসুর সাহচর্য এবং নিরপেক্ষ, নিস্পৃহ ও মধুরস্বভাব জীবনশিল্পী দাদাঠাকুর বা শরৎচন্দ্র পণ্ডিতের এবং প্রেমাঙ্কুর আতর্থীর আন্তরিক বন্ধুতা।

"আমি যাঁদের দেখেছি"-র তৃতীয় গুণ লঘু-গুরু তথ্যবৈচিত্র্য, যে-সব তথ্যের অনেক-গুলি পাঠকের অজানা, অন্তত আমার। এরকম একটি তথ্য, সতীশ মুখোপাধ্যায়ের আমলের "বসুমতী"তে প্রকাশিত অনুবাদের অদ্ভুত নমুনা (পৃ. ২১৮)—The police are patrolling the streets of Dacca—ঢাকায় পুলিসের লোকেরা কেরোসিনের তেল ঢালছে; Mr. Day was shot with a 32 bore pistol by Gopinath Saha—৩২ নলা পিস্তল দিয়ে ডে'-কে গুলি করা হয়েছিল ইত্যাদি। হেমেন্দ্রকুমার রায়, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী ও প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের সহায়তায় নির্মলচন্দ্র চন্দ্র সম্পাদিত "বৈকালী" (১৯২৩) নামে পত্রিকায় এই সমস্ত নমুনার সংকলন দেখে সতীশ মুখোপাধ্যায় ক্রুদ্ধ হওয়ার পরিবর্তে

"বৈকালী"র কর্মকর্তাদের পুরস্কৃত করেছিলেন এবং উপরন্তু এক মন সন্দেশ কিনে সবাইকে খাইয়েছিলেন। আরও আশ্চর্য, "বসুমতী"র যে-কর্মীরা এইসব ভুল করেছিলেন মিষ্টান্ন-ভোজনে তাঁরাও বাদ পড়েন নি।

আর একটি কথা বলার জন্য গ্রন্থকারের প্রথম গুণ সরস রচনাভঙ্গীর সূত্রে ফিরে আসতে হচ্ছে। বিহারীলালের যোগ্য পুত্র ব্যঙ্গরচনায় নিপুণ শ্রীযুক্ত গোস্বামীর এই বইয়ে ব্যঙ্গ ও কৌতুকের ছটা যেমন মনকে উজ্জ্বল করে, তেমনই তাঁর বহু মন্তব্য পাঠককে জীবনের গভীরে নিয়ে যায়, কখনও বা চিত্তকে বিষাদে ভারাক্রান্ত করে তোলে। নিচের উদ্ধৃতিগুলির (সংখ্যায় ন্যূনতম) আলোকে আমার উক্তির যাথার্থ্য সপ্রমাণ হবে বলে বিশ্বাস।

'আমাদের সংস্কারে নীতি ও দুর্নীতি নামক দু'টি আচরণবিভাগ আছে। এই দু'টি বিভাগের মাঝখানে প্রাচীর তুলে নীতিধর্মী মানুষেরা অন্যের পাপপুণ্য বিচার করেন। অথচ এ দু'টির মাঝখানে যে স্থায়ী প্রাচীর গাঁথা যায় না, দেশভেদে, সমাজভেদে এবং ব্যক্তিভেদে এদের অর্থ আপেক্ষিক হয়ে পড়ে, এবং চিরদিনের জন্য কোনো দেশেই নীতি বা দুর্নীতির কোনোটাই তাদের স্থায়ী এবং চরম অর্থ বহন করে না, একথা আমরা অনেক সময় ভুলে যাই বলেই আচরণক্ষেত্রে এবং শিল্পক্ষেত্রে এত দ্বন্দ্ব' (পৃ. ২০৪)।

'এক মানুষের মধ্যে বিভিন্ন মানুষ থাকে, কিন্তু তাদের মাঝখানে প্রাচীর থাকে না। অন্তরের মানুষটির পরিচয় কি কেউ জানতে পারে?' (পৃ. ২৬০)।

'মৃত্যু যে অত্যন্ত স্বাভাবিক ঘটনা, এবং সৃষ্টির অগ্রগতির পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় এবং অনিবার্য ঘটনা, এ-কথাটা সব সময়ে মনে রাখলে দুঃখ খুব বেশি হবে না। অবশ্য অকাল মৃত্যু শোচনীয়। কিন্তু পরিণত বয়সে যাঁরা মারা যান, তাঁদের মৃত্যুর পর "মৃত্যুতে অপূরণীয় ক্ষতি হল" একথা অর্থহীন। কোনো ক্ষতিই অপূরণীয় নয়। এবং যদি অপূরণীয় ক্ষতিই হয়, তবে সেই ক্ষতি প্রকৃতির অভিপ্রেত। আর যে ক্ষতি পূরণীয় তাও তো দেখা গেল কয়েক হাজার বছর ধরে। মানুষের এতে কি উপকার হয়েছে কেউ বলতে পারে না (পৃ. ১৫৬)।

সর্বশেষ উদ্ধৃতিতে সাক্ষাৎ মেলে বিজ্ঞানচেতন পরিমল গোস্বামীর, নিরপেক্ষ ও নিস্পৃহ দৃষ্টিভঙ্গীতে এবং বিশ্লেষণী স্বভাবে যিনি রাজশেখর বসু, শরৎচন্দ্র পণ্ডিত এবং প্রেমাঙ্কুর আতর্থীর সন্নিহিত প্রতিবেশী।

সংক্ষেপে, "আমি যাঁদের দেখেছি" একটি প্রাণবন্ত চিত্রশালা, যে-চিত্রশালায় দোষে-গুণে গড়া এমন কয়েকজন খাঁটি মানুষের সাক্ষাৎ মেলে, যাঁরা ক্রমশ দুর্লভ হয়ে আসছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের অনুসরণে এই বিশিষ্ট বাঙালীদের সম্পর্কে বলা যায়, এখন আর খাঁটি বাঙালী জন্মে না, জন্মিবার যো নাই, জন্মিয়া কাজ নাই।

বর্তমান এবং ভবিষ্যতের বাঙালীদের জন্য এই স্মৃতিচিত্র রচনা করে শ্রীযুক্ত পরিমল গোস্বামী তাঁর কাছে আমাদের ঋণী করে রাখলেন।

কল্যাণকুমার দাশগুপ্ত

' আমি যাঁদের দেখেছি—পরিমল গোস্বামী। রূপা অ্যান্ড কোঃ। কলিকাতা, ১২। মূল্য বারো টাকা।

স মা লো চ না

The Communists And Peace. *By* Jean Paul Sartre. Hamish Hamilton. London. 21*s.*

সার্ত্র-এর সাহিত্যকৃতির সঙ্গে পরিচিত হলে তাঁর রাজনৈতিক চিন্তাভাবনার স্বকীয়তা বুঝতে অসুবিধা হয় না। বুর্জোয়াসমাজের যাঁরা বাইরে—যাঁরা ব্রাত্য—সার্ত্র-এর সহানুভূতি তাঁদেরই দিকে। উপন্যাসে, নাটকে, বিচিত্র প্রবন্ধে সর্বত্র, সার্ত্র-এর এই সহানুভূতি প্রকট। বুর্জোয়াসমাজকে যাঁরা ভেঙে ফেলতে চান তাঁরা স্বতঃই সার্ত্র-এর প্রিয়। *The Respectful Prostitute* -এ সার্ত্র নিগ্রো মানুষটিকে এবং বারবণিতাকে সৎ এবং প্রায়-অপাপবিদ্ধ হিসাবে হাজির করেছেন এবং দেখাচ্ছেন যে শ্বেতকায় মানুষেরা জুয়াচোর ও মিথ্যাবাদী। *The Roads to Freedom*-এ কমিউনিস্ট ব্রুনেটই সার্ত্র-এর সহানুভূতিধন্য, যদিও একথাও সত্য যে ব্রুনেটের ধ্যানধারণার প্রশ্নে সার্ত্র-এর সংশয় আছে। সার্ত্র বোদলেয়ার ও ১৯ শতকের অন্যান্য সাহিত্যিকদের ত্রুটির কথা বলেছেন। সে ত্রুটি যতটা না সাহিত্যিক, তার চাইতেও বেশী রাজনৈতিক। এই সব লেখকদের বড় ত্রুটি এই যে, তাঁরা শ্রমিকশ্রেণীর সঙ্গে সাযুজ্য-স্থাপনে ব্যর্থ হয়েছেন। উদাহরণ হিসাবে বলছেন যে, কমিউনের উপর যে নির্যাতন হয়েছিল ফ্লবেয়র তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে পারেন নি। বাম-ঘেঁষা এই মানসিকতা থেকে সার্ত্র সেই কবিতাই অনুমোদন করেছেন যে কবিতায় মধ্যবিত্তশ্রেণীর 'তথাকথিত বিবেক'-এর স্বরূপ উদ্ঘাটিত হয়েছে। অথবা যে কবিতায় এমন একটি শ্রেণীর জাগরণের কাহিনী সাহিত্যভাত হয়েছে যে শ্রেণীর ভাগ্যে জুটেছে বরাবর শোষণ ও নিপীড়ন। নাটকে এবং চলচ্চিত্রেও সার্ত্র-এর এই মানসিকতার স্বাক্ষর সুস্পষ্ট। 'দ্য চীপ্‌স আর ডাউন' চলচ্চিত্রের নায়ক কমিউনিস্ট। এই কমিউনিস্ট নায়ক একদিকে পার্টি-প্রেম অন্যদিকে মানুষী প্রেমের টানাপোড়েনে আন্দোলিত হল কিছুকাল। কিন্তু শেষপর্যন্ত নায়ক মধ্যবিত্তের ধনিকন্যার প্রেমকে প্রত্যাখ্যান ক'রে পার্টি-প্রেমের মধ্যেই নিজেকে খুঁজে পেল।

সার্ত্র-এর চিন্তায় যে স্বতঃপ্রমাণ বিশ্বাস মিশে আছে তা হল এই যে, মধ্যবিত্তশ্রেণীর কোন ভবিষ্যৎ নেই। তাঁর সব লেখাতেই মুক্তিদূত হিসাবে আবির্ভূত হয়েছে শ্রমিকশ্রেণী। দার্শনিক দিক থেকে সার্ত্র সংঘাত (conflict)-কে একান্ততত্ত্ব হিসাবে মেনে নিয়েছেন। তাঁর মতে শ্রেণীসংগ্রাম হতে আরম্ভ না করলে সমকালীন ফরাসীদেশের সমস্যাবলীর কোন ব্যাখ্যাই সম্ভব নয়।

১৯৫২ সাল পর্যন্ত সার্ত্র একদিকে যেমন বুর্জোয়া মতাদর্শের সমালোচনা করেছেন তেমনি কমিউনিস্ট পার্টির ধ্যানধারণা, বক্তব্য ও কর্মধারারও সমালোচনা করেছেন। কিন্তু যখন তিনি দেখলেন যে আমেরিকা রাশিয়ার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা ক'রে ম্যাকার্থি-বাদের পথে পা বাড়াচ্ছে তখন তিনি কমিউনিস্টদের ও রাশিয়ার সমর্থনে উচ্চকণ্ঠ হলেন।

আলোচ্য গ্রন্থে সার্ত্র-এর কয়েকটি পুরানো লেখা সংকলিত হয়েছে। ১৯৫২ থেকে ১৯৫৪-র মধ্যে *Les Temps Modernes*-এ সার্ত্র 'কমিউনিস্টরা ও শান্তি' এই নামে

কয়েকটি প্রবন্ধ লেখেন। তাৎকালিক দুটি প্রবন্ধ এবং 'ক্লদ লেফোর্টের জবাবে', মোট এই তিনটি লেখা আলোচ্য গ্রন্থ স্থান পেয়েছে।

১৯৫২ সালের ২৮শে মে কমিউনিস্টরা এক প্রতিবাদ-সমাবেশের ডাক দেন। কয়েক-মাস ধরেই কমিউনিস্টদের সংবাদপত্রে প্রচার চলছিল যে জেনারেল রিজ্ওয়ে কোরিয়ার যুদ্ধে রোগজীবাণু প্রয়োগ করে অমানুষিক বর্বরতা আমদানি করেছেন। সেই সেনাপতি ফরাসী দেশে আসছেন শুনে কমিউনিস্টরা বিক্ষোভ-সমাবেশের আয়োজন করেছিলেন। ফরাসী সরকারও চুপ করে ছিলেন না। তাঁরা সশস্ত্র পুলিশবাহিনী ও অন্যান্য বাহিনী নিয়োগ করে বিক্ষোভসমাবেশকে ব্যর্থ করবার সব রকম ব্যবস্থাই করেছিলেন। জেনারেল রিজ্ওয়ে ফরাসী দেশে এলেন, কিন্তু তেমন অঘটন কিছু ঘটল না। বিক্ষোভসমাবেশ হল কিন্তু তেমন জমল না। কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক ২৮শে মে গ্রেপ্তার হলেন। এই গ্রেপ্তার ছিল বে-আইনী। এই বে-আইনী গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে কমিউনিস্ট পার্টি ৪ঠা জুন সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দিলেন। কিন্তু আশ্চর্যের কথা, এই ধর্মঘটও সফল হল না। দক্ষিণপন্থী সংবাদপত্রগুলি আনন্দে আত্মহারা হয়ে লিখল যে, শ্রমিকশ্রেণী কমিউনিস্ট পার্টির শোষণে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। যে কমিউনিস্ট পার্টি মস্কোর উদ্দেশ্যসাধনের হাতিয়ার সেই পার্টি সম্পর্কে শ্রমিকশ্রেণীর মোহমুক্তি ঘটছে। সেই কারণেই ২৮শে মে কিংবা ৪ঠা জুন কমিউনিস্টদের ডাকে শ্রমিকশ্রেণী সাড়া দেয়নি। ঐ দুদিনের ঘটনাবলীর বিকৃতভাষ্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে সার্ত্র 'কমিউনিস্টরা ও শান্তি' নামে প্রবন্ধগুলি লেখেন। দক্ষিণপন্থী সংবাদপত্রগুলির মতামত খণ্ডন করতে গিয়ে সার্ত্র দর্শন ও রাজনীতির গহন অরণ্যে প্রবেশ করেছেন। শ্রমিকশ্রেণীর সঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টির দ্বান্দ্বিক ঐক্য, মার্কস্-বাদের রূপ ও অভিব্যক্তি, লিবারেলবুর্জোয়া মতবাদের সঙ্গে মার্কসবাদের পার্থক্য, এমনতরো নানা বিষয় নিয়ে তিনি আলোচনাও করেছেন।

সার্ত্র বল্ছেন যে শ্রমিকশ্রেণীই ইতিহাসের মুক্তিদূত। ফলে শ্রমিকশ্রেণীর বিরুদ্ধা-চরণ করা ইতিহাসের নিয়ম অমান্য করারই সামিল। শ্রমিকশ্রেণীর বিরুদ্ধাচরণ যদি করা না যায় তবে এই শ্রেণীর আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক যে পার্টি, অর্থাৎ কমিউনিস্ট পার্টি—তার বিরুদ্ধাচারণ করাও চলে না। সার্ত্র বলছেন, ২৮শে মে কিংবা ৪ঠা জুন-এর ঘটনাবলী দেখে যাঁরা বলছেন যে শ্রমিকশ্রেণী আর কমিউনিস্ট পার্টির দিকে নেই তাঁরা একেবারেই বিভ্রান্ত। শ্রমিকশ্রেণী 'শ্রেণী' হিসাবে স্বাধিকারে প্রতিষ্ঠিত হতে চাইলে শ্রমিকশ্রেণীর নিজস্ব পার্টি চাই। ফরাসীদেশে এই পার্টি হল কমিউনিস্ট পার্টি। কমিউনিস্ট পার্টিকে শ্রমিকশ্রেণী অস্বীকার করতে পারে শুধু তখনই যখন এই শ্রেণী অন্য একটি 'শ্রমিকশ্রেণীর দল'-এ সংগঠিত হয়। কিন্তু ফরাসীদেশে এহেন অবস্থার উদয় হয়নি।

সার্ত্র স্বীকার করছেন যে ৪ঠা জুন শ্রমিকশ্রেণী সাধারণ ধর্মঘটে সামিল না হয়ে তার অসন্তোষ প্রকাশ করেছে। এই অসন্তোষের কারণ বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে সার্ত্র ফরাসী দেশের শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাস, তার গতিপ্রকৃতি ও সম্ভাবনার আলোচনা করেছেন। ফরাসী দেশের বিশেষ অবস্থায় কমিউনিস্টদের বাদ দিয়ে কোন বামপন্থী সংগঠন গড়ে তোলা কেন প্রায়-অসম্ভব সে প্রশ্নও আলোচনা করেছেন।

সার্ত্র বলছেন যে কমিউনিস্ট পার্টি শ্রমিকদের স্বার্থের ধারক ও বাহক। কমিউনিস্ট পার্টি শান্তির স্বার্থে কাজ করে। রাশিয়ার বিরুদ্ধে মার্কিনীরা যে জেহাদ সংগঠিত করছে তা থেকে ফরাসী দেশের শ্রমিকশ্রেণীর লাভ করবার কিছুই নেই। বরং পুনরস্ত্রীকরণের

কর্মসূচীর বিরুদ্ধে সফল লড়াই করেই শ্রমিকশ্রেণীর জীবনযাত্রার মান উন্নত করা সম্ভব।

প্রবন্ধগুলির যুক্তিধারার সঙ্গে সার্ত্র-এর বিশ্বাস মিশে গেছে বলে এদের মূল্যায়ন বেশ কঠিন কাজ। সার্ত্র যে বক্তব্যগুলি হাজির করছেন সংক্ষেপে সেগুলি এই : ফরাসী দেশে কমিউনিস্ট পার্টিই একমাত্র পার্টি যে হাউজ অব ডেপুটিতে শ্রমিকশ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব করে এবং শ্রমিক ভোটদাতাদের স্বার্থ রক্ষণাবেক্ষণ করে। যারা বলে যে কমিউনিস্ট পার্টি হিস্টিরিয়াগ্রস্ত, হত্যাকারী ও মিথ্যাচারীদের দল এবং এই দল ঘৃণা ও হিংসাকে জাগিয়ে তোলে তাদের মানতে হবে যে, তাহলে শ্রমিকশ্রেণীও হিস্টিরিয়াগ্রস্ত, দুষ্কৃতকারী, অথবা মিথ্যাবাদী। তা যদি না হয় তবে শ্রমিকশ্রেণীর কমিউনিস্ট পার্টির প্রতি আনুগত্যের আর ব্যাখ্যা কী? কমিউনিস্ট-বিরোধীদের বিদ্রূপ করে সার্ত্র বলছেন, শ্রমিকশ্রেণী যখনই সংগ্রামে অবতীর্ণ হয় তখনই নিন্দুকেরা বলে, এসব সংগ্রামই স্টালিনবাদীরা প্ররোচিত করেছে— 'this Stalinist, his evil genius, the everlasting agitator, Russian today, Boche yesterday, scattering English gold in 1789, Russian gold in 1840, fanning the discontent of the masses and turning it to account to throw them into politics.'

সার্ত্র এধরনের স্থূল ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট নন। বিদ্রূপ, কশাঘাত—সবই ব্যবহার করেছেন সার্ত্র কমিউনিস্ট-বিরোধীদের স্বরূপ উদ্ঘাটনের উদ্দেশ্যে। তবে এখানেই শেষ নয়। সার্ত্র কমিউনিস্ট-বিরোধিতার মূলে প্রবেশ করতে চেয়েছেন। আলট্‌ম্যান ও অন্যান্য তথাকথিত গণতন্ত্রীরা বলেন, 'শ্রমিক মস্কোর হাতের পুতুল।' সার্ত্র বলছেন এসব গণতন্ত্রী তো একদিক থেকে আমেরিকার হাতের পুতুল। তাছাড়া এঁরা যখন মস্কোর কথা বলেন তখন এঁরা সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করতেই চান। '২৮শে জুনের সমাবেশ নিশ্চয়ই মস্কো করেনি।'

ঐ বিক্ষোভের এবং সমাবেশের উদ্দেশ্য কী ছিল? যুদ্ধপ্রস্তুতি? আলট্‌ম্যান কোম্পানি তাই বলবেন। তাঁরা বলবেন, 'মস্কোর কমিউনিস্টরা যুদ্ধ বাধাতে চায়'। সার্ত্র বলছেন, কথাটা সর্বৈব মিথ্যা। 'কমিউনিস্ট পার্টি এবং শান্তিসংগ্রামীরা প্যারীর মানুষকে আহ্বান জানিয়েছে যুদ্ধের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ-সমাবেশে সামিল হতে। আপনারা যাঁরা সর্বদা শান্তির মন্ত্র জপ করছেন, হাতে অলিভশাখা রেখেছেন তাঁরাই তো পারমাণবিক বোমার রাজনীতিতে বিশ্বাসী।' 'I look for your olive branches and I see only bombs. You show, you say, your strength so that you will not have to use it. But to demonstrate strength is already to do violence.'

অ্যাটম বোমার রাজনীতি আলোচনা করে সার্ত্র বলছেন যে এই মানবতা-বিরোধী রাজনীতির পাশাখেলায় সোভিয়েট-বিরোধী দেশগুলিই মত্ত। সোভিয়েট দেশ নিষ্পাপ, নিরঞ্জন, শান্তিকামী। 'Now, you pretend the Soviet leaders are monsters who consider human life of no account and can unleash war by a snap of the fingers. Then why don't they attack? Why don't they attack while there is still time, while their fighter forces are superior to the enemy's, while their armies could overrun Europe in a week?' দুজায়গায় সার্ত্র প্রত্যয়সিদ্ধ কণ্ঠে ঘোষণা করছেন যে সোভিয়েট রাষ্ট্র কোনদিনই এমন কোন পন্থা নেয়নি যাতে যুদ্ধ লাগতে পারে। 'তিরিশ বছরের ইতিহাস আমি বৃথাই ঘেঁটেছি। কিন্তু কোনদিনই রুশদের যুযুধান প্রবৃত্তির কোন পরিচয়ই আমি খুঁজে পাইনি।'

অথচ ফরাসী দেশের বুর্জোয়ারা, লিবারেলরা—সবাই এমন একটি দেশ সম্পর্কেই ফরাসী দেশের শ্রমিকদের বিরূপ করে তুলতে চাইছে। ফ্রান্সের নিরাপত্তা যে দেশ কোনদিনই বিঘ্নিত করেনি সেই দেশের বিরুদ্ধে শ্রমিকদের লড়াইয়ে নামাবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছে।

কমিউনিস্ট পার্টির বিরুদ্ধে অন্যান্য সমালোচনার জবাব দিয়েছেন সার্ত্র পার্টির প্রেমিক হিসাবে। ২৮শে মে'র বিক্ষোভ-সমাবেশ সম্পর্কে সার্ত্র কী প্রমাণ করতে চান? তাঁর বক্তব্য কি এই যে সমাবেশটি খুবই কার্যকর হয়েছিল এবং সকলেরই প্রশংসার দাবি রাখে? মোটেই তা নয়। সার্ত্র বলছেন যে, এই সমাবেশের মর্মবাণী ছিল শান্তির জন্য সংগ্রাম। 'অদ্যাবধি শান্তি বজায় আছে। মার্কিনীরা আমাদের দেশে রয়েছে, রুশরা আছে নিজেদের দেশে। শ্রমিকরা একথা জানে। তারা শুধু এটুকুই চায় যে, রুশরা নিজের দেশে থাকুক এবং মার্কিনীরা স্বদেশে। ২৮শে মে'র বিক্ষোভ-সমাবেশের এটাই ছিল বনিয়াদ।'

সার্ত্র শুধু যে প্রবন্ধাবলীতে স্থূল কমিউনিস্ট-বিরোধীদের সঙ্গে বিতণ্ডায় লিপ্ত হয়েছেন তাই নয়। যাঁরা সত্যকার বামপন্থার নামে কমিউনিস্ট সংশ্রব বর্জন করে অগ্রসর হতে চান সার্ত্র তাঁদেরও রেহাই দেন নি। তিনি বলছেন যে, কমিউনিজম-বিরোধিতার মানেই হল যুদ্ধের পক্ষে দাঁড়ানো। কেননা সাম্যবাদী সোভিয়েট দেশই একমাত্র শান্তিকামী আর আমেরিকা যুদ্ধলিপ্সু।

ক্লড লেফোর্টের জবাবে সার্ত্র কমিউনিস্ট পার্টির সংগঠন, স্তালিনবাদের ঐতিহাসিক প্রয়োজনীয়তা, এবং সোভিয়েট দেশের স্বেচ্ছাচারী শাসনের সপক্ষেও যুক্তি হাজির করেছেন। তখন সোভিয়েট দেশের কমিউনিস্ট পার্টির বিংশতিতম কংগ্রেস হয় নি, খ্রুশ্চেভ রিপোর্টও প্রকাশিত হয়নি। ফলে ভক্তমহলে রাশিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির ভাবমূর্তি তখনও অম্লান। এ-হেন পরিবেশে সার্ত্র-এর বিচারবিভ্রাট যদি ঘটে থাকে তবে তাঁকে দোষ দেওয়া চলে না।

যাঁরা সার্ত্র-এর ধ্যান-ধারণার বিবর্তনের ইতিহাস জানেন তাঁদের কাছে সার্ত্র-এর নির্বিচার সোভিয়েটস্তুতি ও কমিউনিস্ট পার্টির সমর্থন হয়তো আজ ভাল লাগবে না। কিন্তু একথা ভোলা উচিত নয় যে, ১৯৪৭ এবং ১৯৪৮ সালে সার্ত্র কমিউনিস্ট পার্টির সমালোচনায় মুখর ছিলেন। এবং পরবর্তীকালেও নিজের স্বাতন্ত্র্যের স্বাক্ষর তিনি রেখেছেন। এক বিশেষ যুগের আলেখ্য হিসাবে আলোচ্য গ্রন্থটির গুরুত্ব। সেই যুগে সার্ত্র শান্তিসংগ্রামে যোগ দিতে চলেছেন; কমিউনিস্ট পার্টির কাছাকাছি এসেছেন। এটাই সার্ত্র-এর শেষ পরিচয় নয়।

সতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

A Man in My Position. *By* Norman MacCaig. Chatto & Windus Ltd. with the Hogarth Press. London. 18*s.*

য়ুরোপীয় সাহিত্যের পণ্ডিত জে. এম. কোহেন তাঁর *Poetry of This Age* গ্রন্থে (১৯৫৯-এ প্রকাশিত) এবং ইংল্যান্ডের কবি-সমালোচক জন ওয়েন তাঁর সংকলন-গ্রন্থ *Anthology of Modern Poetry* বইটিতে (১৯৬৩-তে প্রকাশিত) আমেরিকান কবিতা সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছেন, এই কয়েক বছরের মধ্যেই তার অসারতা অংশত প্রমাণিত হয়ে গেছে। ও'রা

দুজনেই জানিয়েছিলেন যে—ইংল্যান্ডের কবিতা ও য়ুরোপের অন্যান্য দেশের কবিতার প্রতিতুলনায় আমেরিকান কবিতা অনেক বেশি নিয়ম-নির্দিষ্ট, রীতিনির্ভর, এবং অ্যাকাডেমিক। কোহেন এবং জন ওয়েন যাঁদের কথা ভেবে এই সিন্ধান্তে এসেছিলেন, তাঁরা হলেন 'আমেরিকার 'fugitive' কবিকুল—টেট, র‍্যানসম প্রভৃতি কবি যে সম্প্রদায়ের মধ্যে সর্বাগ্রগণ্য। এঁরা যে সবাই সুকবি এবং সুপণ্ডিত এ-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই, এবং এঁদের কবিতা যে মূলত অ্যাকাডেমিক তা-ও অনস্বীকার্য, কিন্তু আমেরিকান কবিতার সাম্প্রতিক স্রোতটি এই ধারার ঠিক বিপরীত দিকে প্রবাহিত হয়েছে। একদিকে ব্লাই, জেমস রাইট, ডেনিস লেভেরটভ প্রভৃতি কবিরা সহজ, চিত্রল অথচ অংশত-সুররিয়ালিস্ট কবিতার নীতি প্রবর্তন করেছেন, গীন্সবর্গ এবং তাঁর সমমর্মী কবিতালেখকেরা তাল-মান-ছাড়া কবিতার আদর্শকে নতুনভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, চার্লস ওলসন প্রমুখ "ব্ল্যাক-মাউন্টেন" দলের কবিরা তাঁদের 'projectionist' কবিতায় চেষ্টা করেছেন কবিতাকে প্রাকৃতিক বিষয়বস্তুর মতো পরিব্যাপ্ত ও রহস্যময় করে তুলতে, রবার্ট ক্রিলিও উইলিয়ম কারলস উইলিয়মসের ইমেজনির্ভর, অতি-মূর্ত কবিতার আদর্শকেও আরো অনেক দূরে এগিয়ে নিয়ে এসেছেন মনে হয়।

স্কটিশ কবি নরম্যান ম্যাককেইগের কবিতার বইটির আলোচনা সূত্রে আমেরিকান কবিতার অবতারণা ধান ভানতে শিবের গীত মনে হতে পারে, কিন্তু আমি বলতে চাইছি যে বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জে-রচিত সাম্প্রতিক কবিতাই রীতি-নির্দিষ্ট, এবং প্রথাসম্মত—যার তুলনায় আমেরিকান কবিতা অনেক বেশি স্বতঃস্ফূর্ত, পরীক্ষানিরীক্ষা-নির্ভর এবং আক্ষরিক অর্থে প্রগতিশীল। আমেরিকান কবিতার এই সাম্প্রতিক চরিত্রলক্ষণ নিয়ে খুব বেশি গ্রন্থ এখনো রচিত হয়নি—তবু যাঁরা এ-বিষয়ে উৎসাহী তাঁরা এম. এল. রোসেন্থালের *The New Poets* (Oxford University Press) বইটি প'ড়ে দেখতে পারেন। রোসেন্থালের বইটি সর্বতোভাবে পরিতৃপ্তিকর নয়—থিয়োডোর রেট্‌কে প্রমুখ প্রথমশ্রেণীর কবিদের বিষয়ে উনি অযৌক্তিক অবহেলা প্রকাশ করেছেন—তবু সব মিলিয়ে বইটি একাধিক কারণে তাৎপর্যময়।

নরম্যান ম্যাককেইগের *A Man in My Position*-এর যে কবিতাগুলি সহজ অথচ গভীর, চিত্রল এবং প্রতীকী, সেই কবিতাগুচ্ছ মোটামুটিভাবে 'সাম্প্রতিক আমেরিকান ঘরানায়' রচিত বলে মনে হয়। ওয়েনের সংকলনে এই কবির যে একটিমাত্র কবিতা অন্তর্গত হয়েছে, সেই তৃতীয় স্তবকটি হলো এই :

And *Joseph-coated* frogs tumble
Like drunken heralds in the grass
That tipples sweet marsh water and
Defies the sun's broad burning-glass."

এর সঙ্গে তুলনা করুন *A Man in My Position*-এর 'One of the Many Days'-এর প্রথম এবং শেষ স্তবকটি :

(১) I never saw more frogs
than once at the back of Ben Dorain.
Joseph-coated, they ambled and jumped
in the sweet marsh grass
like coloured ideas.

(২) But clearest of all I remember
the *Joseph-coated frogs*
amiably ambling or
jumping into the air-like
coloured ideas
tinily considering
the huge concept of Ben Dorain

একই মূল চিত্রকল্প, থীমও একেবারে আলাদা নয়, অথচ ব'লবার রীতি দ্বিতীয় কবিতাটিতে এতো স্বচ্ছন্দ, নিরলংকার, এবং concrete যে প্রথমটির তুলনায় এই কবিতাটিই আমাদের অনেক বেশি আকর্ষণ করে। মূলত এই "রীতি"-তে রচিত কবিতাগুলো থেকে আমরা একাধিক রসোত্তীর্ণ পঙ্‌ক্তি উদ্ধার ক'রতে পারি। যেমন 'I am not good at impossible things.|And that is why I'am sure|I'll love you for my ever' (Sure Prof) ; 'I think of you in gold coins' (Numismatist) ; 'And I think— Girl,|I'll write you a poem|that praises you so well|it'll glow in the dark' (Cliff top, East Coast); 'Is the noise made by a star|As it burns like a heretic in space|a noise of agony?" (Limits) ; ইত্যাদি।

'Walking to Inveruplan' কবিতাটির 'I am in my Li Po mood. I'live half a mind to sit and drink. Until the moon, that's just arisen, should sink'—প্রভৃতি পঙ্‌ক্তি শুধু লিপোর কবিতা নয়, আমেরিকার কবি রবার্ট ব্লাইয়ের 'Silence in the snowy fields'-এর অনেক কবিতাকেই মনে পড়িয়ে দেয়।

এই গ্রন্থের অন্যান্য কবিতাকে প্রধানত দুটি অংশে ভাগ করা চলে : এক, তত্ত্বনির্ভর, রূপকাশ্রিত কবিতা; দুই, আয়াম্বিক পেন্টামিটার ও ট্রোকেইক ট্রেটামিটারে লেখা প্রথানুগ কবিতা। দ্বিতীয়োক্ত ধারার একটি উদাহরণ হলো—

'I move, he moves, they move—and, given
An eye that's sharp enough and subtle'
(Things in their elements)

প্রথম ধারার প্রামাণ্য উদাহরণ সম্ভবত 'Home bird' কবিতাটি, যেটি শুরু হচ্ছে এইভাবে

'The happiness that has taken up lodgings in me
has cousins and uncles.'

তারপর থেকে পুরো কবিতাটিই পিতৃব্য এবং মাসতুতো-খুড়তুতো ভাই বিষয়ক একটি ক্লান্তিকর রূপক। অনুরূপ বিরক্তিকর 'Space Fiction' পদ্যটি।

সব মিলিয়ে *A Man in My Position* উপভোগ্য বই। এনরাইট, সিলকিন, ফিলিপ লারকিন, পিটার রেডগ্রোভ, পিটার পোর্টার, টেউ হিউজ, বা টম গানের মতো জনপ্রিয় কবি নন নরম্যান ম্যাককেইগ—তবুও "আমেরিকান" এবং "ইংরেজী" রীতির সংমিশ্রণে যে নতুন ধরনের কাব্যচর্চা চলছে, তার প্রতিনিধিত্বমূলক কবি হিসেবে ম্যাককেইগ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাছাড়া, চিত্রকল্প-রচনায় তাঁর স্বকীয়তা অনস্বীকার্য। স্বদেশে তিনি একজন স্বীকৃত প্রথমশ্রেণীর কবি।

প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত

গান্ধী—রোম্যাঁ রলাঁর দৃষ্টিতে। মূল ফরাসী থেকে লোকনাথ ভট্টাচার্য অনূদিত। সাহিত্য অকাদেমী। নিউ দিল্লী। মূল্য ৮·০০ টাকা।
গান্ধী— অন্নদাশংকর রায়। এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাঃ লিঃ। কলিকাতা ১২। মূল্য ৬·০০ টাকা।

ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য ব্যাপারটা সব সময় ভালো নয়, নিবিড়-পরিচয়ও সব সময় মঙ্গলজনক হয় না। সমসাময়িক কাল বলে যে বিশেষ সময়টিকে নির্দিষ্ট করা হয়, সে-কালটাও সব সময় সহৃদয় নয়।

এইজন্য সান্নিধ্য থেকে, নিবিড়-পরিচয় থেকে এবং সমসাময়িক কাল থেকে একটু দূরে সরে দাঁড়ানো ভালো। এতে নৈকট্য নামক বস্তুটির গ্লানির হাত থেকে নিস্তার পাওয়া যায়। এবং এতেই যা-কিছু জানা বা যা-কিছু দেখা স্পষ্টতর ও পরিচ্ছন্নতর হতে পারে। সমসাময়িক কালের হাতে ক্রুশবিদ্ধ হয়েছিলেন যিশু। সমসাময়িক কালের হাতেই নিহত হয়েছেন গান্ধী। এবং প্রায়-সমসাময়িক কালের হাতে তিনি লাঞ্ছিত হচ্ছেন।

এসব নিয়ে আক্ষেপ বা পরিতাপ করার কিছু নেই। যাঁরা সাধারণ নন্, সামান্য নন্—সাধারণের ও সামান্যের উৎপীড়ন তাঁদের উপর একটু হয়েই থাকে।

বিদেশীর চোখে গান্ধী হচ্ছেন greatest man since Jesus Christ। সেই বিদেশীর চোখে আমরা, ভারতবাসীরা, এখন কী দাঁড়িয়ে যাচ্ছি, সেইটেই ভাববার কথা। আমরা লক্ষ্য করেছি—গান্ধী সম্বন্ধে যিনি যত কম জানেন তিনিই গান্ধীর তত বেশি বিরোধী। দোষে-গুণে মানুষ। একথা আমরা ভুলতে চাইনে। গান্ধীও মানুষ। তাঁর কাজেকর্মে ত্রুটিবিচ্যুতি অবশ্যই ছিল। তাঁকে সমগ্রভাবে যদি আমরা জানতে পারি, তখনই তাঁর ত্রুটির কথা উল্লেখ করার অধিকার আমরা পাব। কিন্তু তাঁর সম্বন্ধে বিন্দুবিসর্গ কিছু না জেনে যদি অনর্গল তাঁর কুৎসা করতে আরম্ভ করি, তাহলে নিজেদেরই অজ্ঞতা ঘোষণা করা হয়।

এসব কথা উল্লেখ করার কারণ অবশ্যই আছে। বর্তমানে আমরা এই রীতির রেওয়াজ বেশ চালু হয়েছে বলে লক্ষ্য করছি। যিনি অহিংসাকে জীবনের পরমধর্ম বলে গ্রহণ করেছিলেন, তিনি নিজেই যে হিংসার শিকার হয়ে পড়বেন, এমন হয়তো তিনি নিজেও কখনো ভাবেননি। গান্ধী বলেছিলেন—'আমার জীবনই আমার বাণী'। জীবন তিনি সমর্পণ করেছেন, হিংসার শিকার হয়েছে তাঁর জীবন; তাঁর জন্মশতবার্ষিক-উৎসবের সময়ে তাঁর বাণীও যে অনুরূপভাবে হিংসারই শিকার হবে—এ তো আমাদের সকলেরই কল্পনার অতীত ছিল।

গান্ধী বলেছেন,

I am not a visionary. I claim to be a practical idealist. The religion of non-violence is not meant merely for the *rishis* or saints. It is meant for the common people as well. Non-violence is the law of our species as violence is the law of the brute. The spirit lies dormant in the brute and he knows no law but that of physical might. The dignity of man requires obedience to a higher law—to the strength of the spirit.

গান্ধীর এই উক্তির মধ্যে 'dignity of man' প্রসঙ্গের উল্লেখ আছে।—অর্থাৎ মানুষের মানমর্যাদার কথা আছে। গান্ধীকে আমরা স্বচক্ষে দেখেছি। তাঁর অসহযোগ আন্দোলন, লবণ সত্যাগ্রহ, ভারত-ছাড়-আন্দোলন ইত্যাদি সবই আমাদের জীবদ্দশায় ঘটেছে। গান্ধীর সমালোচনা আমরা করেছি, তাঁর প্রত্যেকটি পদক্ষেপ আমরা লক্ষ্য করেছি; তাঁর সব কাজ বা সব কথার সঙ্গে আমরা একমত হতে পারিনি। এটা গান্ধী কেন করলেন, ওটা গান্ধী কেন করলেন না—ইত্যাদি অনেক তর্কও করা গিয়েছে। গান্ধীর অনেক প্রার্থনান্তিক ভাষণ আমরা শুনেছি, সব ভাষণ আমাদের ভালো লাগেনি। অর্থাৎ পুংখানুপুংখরূপে আমরা তাঁকে জানবার চেষ্টা করেছি। এরকম যাবতীয় সব চেষ্টার পরে আমরা এই সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছেছি যে, তিনি greatest man since Jesus Christ।

আইনস্টাইন বলেছেন যে, এমন একজন মানুষ রক্তমাংসের শরীর নিয়ে পৃথিবীর পথ পরিক্রমা করেছেন, সুদূর ভবিষ্যতের মানুষ তা বিশ্বাস করবে না। কিন্তু আমরা তাঁকে রক্তমাংসের শরীরে পৃথিবীর পথে পদচারণা করতে দেখেছি, তাঁকে নোয়াখালিতে গিয়ে বলতে শুনেছি যে, একজন মাত্র ভালো মুসলমান ও একজন মাত্র ভালো হিন্দু তাঁর দরকার। যেদিন গভীর রাত্রে ভারতবর্ষে স্বাধীনতার উদ্বোধন হল আমরা তখন ছিলাম শ্রদ্ধানন্দ পার্কে, এবং তার অনতিদূরে কলকাতার মৌলালির কাছে আধো-অন্ধকারে একটি গাড়ির মধ্যে নীরবে বসেছিলেন যে ভারতবাসীটি—তিনি গান্ধী।

সুখ শান্তি স্বাচ্ছন্দ্য—তিনি কিছু চান নি; প্রতাপ-প্রতিপত্তি—তাও তাঁর প্রয়োজন ছিল না। ভারতবাসীর হাতে যখন এই বিশাল দেশ শাসন করার ক্ষমতা দেওয়া হচ্ছে, ঠিক সেই সময়ে 'অর্ধনগ্ন এই ফকির' রাজধানী থেকে বহুদূরে একটি পথের কিনারে বসে আছেন স্বাধীনতার পরম প্রতীক্ষায়।

গান্ধী যেমন চেয়েছিলেন,—একজন ভালো হিন্দু ও একজন মুসলমান, আমরা তেমনি আজ চাই—একজন মাত্র ভালো ভারতবাসী। আমাদের চাহিদাও বড় না।

আমাদের দেশ আজ bankrupt– দেউলিয়া। নেতা নেই আমাদের, অর্থাৎ অভিভাবক আমাদের নেই।

> Milton, thou should'st be living at this hour
> England hath need of thee...

এভাবে আমরা বিশেষ কারো নাম করে তাঁকে এখন ডাকছিনে, মৃতকে ফিরে আসতেও বলছিনে। কিন্তু আমাদের আজ এমন একজনের অন্তত দরকার যিনি কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ-মদ-মাৎসর্য—এই ষড়্ রিপুর ঊর্ধ্বে উঠে বলতে পারবেন—আমি ভারতবাসী, ভারতবর্ষ আমার প্রাণ।

পরাধীন ভারতে জন্মগ্রহণ যাঁরা করেছেন তাঁরাই এখন পর্যন্ত ভারত রাষ্ট্রের নায়ক-নায়িকা। এঁদের দিয়ে ভারতের কোনো কল্যাণ হবে কিনা জানিনে। কিন্তু স্বাধীন ভারতবর্ষের মাটিতে যাঁদের জন্ম, তাঁদের মধ্যে থেকে নতুন একজন গান্ধী উঠে আসুন, এখন না চাইলেও, আশা করব, স্বাধীন ভারতবর্ষের রক্ত সঞ্চালিত হচ্ছে যাঁদের শিরায় তাঁদের মধ্য থেকে উঠে আসুন অন্তত একজন নায়ক, যিনি অভিভাবকের ভূমিকা নিয়ে পরিচালিত করতে পারবেন ভারতবাসীকে। তেমন নায়ক কিংবা নায়িকা যেদিন পাওয়া যাবে সেই দিনই ভারতবর্ষের মঙ্গলের সূচনা।

কিন্তু বর্তমান কালের এই অস্বাভাবিক পরিবেশের মধ্যেও যাঁরা গান্ধীকে স্মরণ

করছেন, অকপটেই বলব, তাঁরা আমাদের স্মরণীয়। এই ঝড়তুফানের মধ্যেও দিক্‌ভ্রষ্ট যাঁরা হন না, তাঁরা দক্ষ নাবিক। মহতের মহত্ত্ব স্বীকার করার মধ্যেও কিঞ্চিৎ মহত্ত্ব আছে। ইংরেজিতে এইরকম একটি কথা আছে যে, next to becoming great is to admire greatness।

রম্যাঁ রলাঁ গান্ধীর জীবন পর্যালোচনা করে নিজেকেই মহত্তর করেছেন বলে আমাদের ধারণা। এই অনুবাদগ্রন্থে রলাঁর 'মহাত্মা গান্ধী' বইটির অনুবাদের সঙ্গে রলাঁর ভারত ডায়েরির অন্তর্গত গান্ধী সংক্রান্ত রচনাবলীর অনুবাদও দেওয়া হয়েছে। 'প্রকাশকের নিবেদন' থেকে জানা যায় যে, 'যদিও গান্ধী সম্পর্কে রলাঁর আরও সামান্য কিছু রচনা বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে আছে যা এখানে অন্তর্ভুক্ত করা গেল না—যেমন দুয়েকটি প্রবন্ধ, কোনো বিশেষ উপলক্ষে রলাঁর প্রেরিত কোনো ভাষণ বা আবেদন, ইত্যাদি—মোটামুটি বলা চলে, গান্ধীর উপর রলাঁর যাবতীয় মুখ্য রচনা এই গ্রন্থেই প্রথম একত্রিত হল।'

গান্ধীর জীবন ও কর্ম বৃত্তান্ত এই বইতে বিবৃত আছে। এক জায়গায় রলাঁ বলছেন,

'হিন্দুত্বের ছদ্মবেশে তাঁর আসল হৃদয়টি উদার খৃষ্টানের। টলস্টয় যদি হতেন আরো দয়াশীল, আরো শান্ত ও সার্বজনীন অর্থে হয়তো আরো স্বাভাবিকভাবে 'খৃষ্টান', তবে গান্ধী হতেন। কারণ স্বভাবের দিক দিয়ে টলস্টয় এ-সবের অনেক কম ছিলেন, যদিও নিজের ইচ্ছায় ও সাধনায় সে-ঘার্টতি অনেকটা পূরণ করতে পারেন।' পৃঃ ১৮।

অন্যত্র বলেছেন—

'গান্ধীর মধ্যে যে-একটি ঋষিসুলভ ভাব আছে, তা রবীন্দ্রনাথ চিরকাল স্বীকার করেছেন—আমার সামনেও গান্ধী সম্বন্ধে তাঁকে সশ্রদ্ধ উক্তি করতে শুনেছি। যখন গান্ধীর প্রসঙ্গে আমি টলস্টয়ের কথা পাড়ি, রবীন্দ্রনাথ বলেন, এই দুই ব্যক্তি একে অন্যের কত নিকট—শুধু তাই নয়, গান্ধীকে তাঁর টলস্টয় থেকেও আরো আলোকদীপ্ত বলে মনে হয় (এবং এ ব্যাপারে আমি তাঁর সঙ্গে একমত, আজ গান্ধীকে বেশি ভালো করে জানি বলেই)। কারণ গান্ধীর সব কিছুই স্বাভাবিক, সরল, বিনয়ী, পবিত্র, এমনকি যুদ্ধের সময়ও সেই সৌম্যভাব তিনি হারান নি। সে-জায়গায় টলস্টয়ের সব কিছুই অহংকারের বিরুদ্ধে অহংকারীর মত বিদ্রোহ, ক্রোধের বিরুদ্ধে ক্রোধ, আবেগের বিরুদ্ধে আবেগ, এমনকি অহিংসার প্রচারেও তাঁর কেমন এক হিংসার ভাব।' পৃঃ ৫৭-৫৮।

গান্ধীকে রোলাঁ যা দেখেছেন, তাঁকে যেমন বুঝেছেন তা তিনি অকপট সারল্যে বিবৃত করেছেন। তাঁর আর একটু বক্তব্য উদ্ধৃত করি—

ভারতের বাণী আত্মত্যাগ। গান্ধী বললেন, একমাত্র সে-বাণীই জগৎকে দিতে পারে ভারত, রবীন্দ্রনাথও তাঁর যাদুকরী ভাষায় সেই একই কথা বলেছেন। (১৯২১এর ২রা মার্চে লিখিত তাঁর চিঠি, যা মডার্ন রিভিউ পত্রিকায় প্রকাশিত হয় মে মাসে)।

এই ত্যাগের কথা রবীন্দ্রনাথ অনেক ভাবেই অবশ্য আরও প্রকাশ করেছেন। এই সূত্রে মনে পড়ে রবীন্দ্রনাথের সেই কবিতাও

হে ভারত, নৃপতিরে শিখায়েছ তুমি
ত্যজিতে মুকুটদণ্ড, সিংহাসনভূমি,
ধরিতে দরিদ্রবেশ;

কিন্তু সে অন্য কথা। গান্ধীকে রোলাঁ নিপুণভাবে নিখুঁতভাবে ধরে রেখেছেন এই বইয়ে, সেইসঙ্গে তিনি ভারতবর্ষের মর্মবাণীও যেন উদ্ধার করতে পেরেছেন।

এই বইয়ের আরও একটি আকর্ষণ ডায়েরি। ১৯৩১এর মে মাস থেকে ১৯৩৫এর এপ্রিল মাস—এই চার বছরের ডায়েরি থেকে গান্ধী-প্রসঙ্গ এখানে তুলে দেওয়া হয়েছে। এতে অনেক প্রসঙ্গের উল্লেখ আছে, কিছু চিঠিপত্রও আছে, সুভাষচন্দ্র বসুর কথাও আছে।

মূল ফরাসী থেকে এই বই আর ডায়েরি অনুবাদ করেছেন শ্রীযুক্ত লোকনাথ ভট্টাচার্য। ফরাসী ভাষায় এবং বাংলা ভাষায় তাঁর দখল সমান। এইজন্যেই বইটি জীবন্ত হয়েছে। অনুবাদ বলে মনে হয় না। মৌলিক গ্রন্থ পাঠের আনন্দ এতে পাওয়া গেল।

ভূমিকায় অন্নদাশংকর তাঁর গ্রন্থে বলেছেন যে অসহযোগের দিনে তিনি গান্ধীর অন্ধভক্ত ছিলেন, মাঝে সমালোচক হয়ে ওঠেন. পুনরায় ফিরে আসেন গান্ধীর কাছে, কিন্তু এবার অন্ধভক্ত হিসেবে নয়।

ভক্ত বা অভক্ত কোনোটাই অন্ধ হওয়া ভালো না। চোখ খুলে স্পষ্টভাবে দেখে নিয়ে তবেই ভক্তি বা অভক্তি আনা ভালো।

গান্ধীকে স্পষ্টভাবেই দেখে নিয়েছেন তিনি, সেইসঙ্গে অবশ্য বুঝেও নিয়েছেন। এইভাবে দেখা ও বোঝার ফলেই গান্ধী সম্বন্ধে বলার অধিকারে তিনি অধিকারী হয়েছেন।

কিন্তু গান্ধীর কথা বলতে গিয়ে অনেক প্রসঙ্গই এতে এসে পড়েছে। সেসব ব্যাপার লেখকের প্রত্যক্ষভাবে দেখা বলেই তার বিবরণ এমন স্পষ্ট হতে পেরেছে। মাউন্টব্যাটেন কি কৌশল অবলম্বন করেছিলেন, কিভাবে গান্ধীকে এড়িয়ে গিয়ে তিনি কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের কর্তাদের হাত করেছিলেন তার বিবরণ এতে আছে। প্রকৃতপক্ষে, বলতে গেলে, এ বইটি ভারতবর্ষের একটি সংকটকালের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস। অনেক অজ্ঞাতপূর্ব তথ্য এতে আছে। কিন্তু অন্নদাশংকর বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন দেশ-বিভাগ ব্যাপারটির উপর। এ ঘটনাটি তিনি যে বিশেষ মর্মবিদারক বলে মনে করেন তার প্রমাণ তিনি বহুকাল আগেই দিয়েছেন তাঁর বিখ্যাত সেই ছড়ায়—

তোমরা যে সব বুড়ো খোকা
ভারত ভেঙে ভাগ করো। তার বেলা?

গান্ধীর জীবন-সমাপ্তির সঙ্গে গ্রন্থটির সমাপ্তি।

সুশীল রায়

একালের প্রেমের কবিতা—দীপ্তি ত্রিপাঠী সম্পাদিত। বিশাখা। কলিকাতা ১৯। মূল্য চার টাকা।

একটি ভালো কবিতা রচনার চেয়ে একটি নির্ভরযোগ্য কবিতার সংকলন সম্পাদনা করা কম দুরূহ নয়। বরং বেশি। একরকম বিশিষ্ট আবেগ দ্বারা চালিত হয়ে কবি লেখেন কবিতা, তাঁর অব্যবহিত অভিজ্ঞতা হিসেবে কাজ করে অনেক ভাবনা, সঙ্গ ও অন্ধকার, বহুতর স্মৃতি ও তাৎপর্য। কবিতার চিন্তা ও কারুকলা কবির ব্যক্তিগত ব্যাপার; রচিত কবিতার জন্য পাঠকের কাছে কোন জবাবদিহি তাঁকে করতে হচ্ছে না। কিন্তু সংকলকের কাজ আরো বেশি দায়িত্ব দাবি করে। নিজে কিছু সৃষ্টি না করলেও, তিনিই কবির সঙ্গে পাঠকের সংযোগ

স্থাপনের সেতু—কবি ও পাঠক উভয়ের প্রতিই সুবিচারের কথা তাঁকে মনে রাখতে হবে। শিক্ষিত অভিজ্ঞতা, সাহিত্য-ও-সামাজিক ইতিহাস সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা এবং কবিতাপ্রবণ, সংবেদনশীল মন ব্যতিরেকে এ-কাজ সহজ নয়।

"একালের প্রেমের কবিতা" সম্পাদনা ক'রে শ্রীমতী দীপ্তি ত্রিপাঠী সেদিক থেকে কিছু কাজ করেছেন। একালের কবি বলতে তিনি বুঝিয়েছেন অরবিন্দ গুহ, শঙ্খ ঘোষ, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, আলোক সরকার, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ পঞ্চাশের কবিদের আধুনিক বাংলা কবিতায় যাঁদের অবদান গৌণ নয়। এটা ঠিক, এই সময়ে এবং এখনো পর্যন্ত এ'দের কবিতায় কোন মহৎ কবিপ্রতিভার দর্শন মেলেনি, যেমন মিলে-ছিল জীবনানন্দ, সুধীন্দ্রনাথ, বুদ্ধদেব বসু, বিষ্ণু দে, অমিয় চক্রবর্তী বা, আরো পরে—সমর সেন বা সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতায়। তবু, চল্লিশের কবিদের মন্থর, কিছু বা অপচয়িত, আবেগ যখন নতুনতর অভিজ্ঞতার জন্য স্পন্দমান, ঠিক সেই মুহূর্তে এ'রা, পঞ্চাশের কবিরা, এনেছিলেন কবিতা-চর্চার জোয়ার। যৌবনের সেই উদ্দীপনা এখনো নিষ্ক্রিয় হয়নি এবং এ-কথা অনস্বীকার্য, আধুনিক কবিতার তারুণ্যের অধিকার এখনো পর্যন্ত এ'দেরই অধিগত।

সমকালীন অসংখ্য কবির মধ্যে থেকে যোগ্যতম কয়েকজনকে বেছে নিয়ে একটিমাত্র সংকলনে গ্রন্থবন্ধ করা রীতিমতো দুরূহ ও প্রয়াসসাধ্য ব্যাপার। শ্রীমতী ত্রিপাঠীও নির্বাচনে পুরোপুরি সফল হননি। "একালের প্রেমের কবিতা"য় পঞ্চাশের স্বীকৃত কবিদের পাশাপাশি এমন কিছু নাম পাচ্ছি যোগ্যতার পরীক্ষায় যাঁরা এখনো অনুমোদনসাপেক্ষ; আবার এমন কেউ কেউ অনুপস্থিত, যাঁরা থাকলে এই সংকলনের মর্যাদাহানি হত না। এ-কথা কবিতা নির্বাচন সম্পর্কেও প্রয়োজ্য। মনে হচ্ছে, এ-ব্যাপারে প্রয়োজনীয় সাবধানতা অবলম্বন করা হয়নি; কিছুটা যথেচ্ছ নির্বাচনের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন কবিরাই—বিশেষত শক্তি চট্টোপাধ্যায়, মানস রায়চৌধুরী, সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত ও উৎপলকুমার বসু; এ'দের আরো প্রতিনিধিমূলক কবিতা নেয়া যেত।

দশকে ভাগ করে কবিদের গুণপনা বিচারের রীতিটি অবশ্য নতুন বা অভিনব নয়। যে-ভাবেই বলা হোক না কেন, কবির অভিজ্ঞতার সঙ্গে মরশুমী ফুলের ফুটে ওঠার তুলনা করা অনুচিত। যদি তাই হত, যদি সময়চিহ্ন ও যুগানুষঙ্গই কবিকর্মের চারিত্র্য বিচারের নির্ভর হত, তাহলে, পাঠকের মর্জিও যে-হেতু পরিবর্তনশীল, এককালের কবিতা আর-এক কালে এসে বাতিল হয়ে যেত। আসলে কবিতা বিচারের মাপকাঠি কবিতাই—ভালো, উজ্জীবিত কবিতা—সময়নিরপেক্ষভাবে যা পাঠককে আবিষ্ট ও আশ্লিষ্ট করে, মন থেকে যার রেশ সহজে মুছে যায় না।

অন্তত প্রেমের কবিতার ব্যাপারে এটা সর্বৈব সত্য। বহুদিন হয়ে গেল: ইতিমধ্যে প্রেম সম্পর্কে ধারণার পরিবর্তন হয়তো হয়েছে, ভাষাও বদলেছে নিয়মিত; কিন্তু, প্রেমের অনুভব এখনো অভিন্নভাবে সক্রিয়। বিষয় হিসেবেও প্রেমের চেয়ে বহুস্তর আর কিছুই নেই। প্রেমের কবিতা তখনই সফলতা পায় যখন কবি ও প্রেমিকের মধ্যে সার্থক সমীকরণ ঘটে—উভয়ের অভিজ্ঞতার মূলেই আছে উৎসর্গ ও আবিষ্কারের সম্পর্ক, নিজেকে হারিয়ে দিয়ে নিজেকে খুঁজে পাওয়ার বিস্ময়। কবি তাঁর বোধ ও শক্তি দিয়ে প্রেমিকের অভিজ্ঞতাকে তাৎক্ষণিকতার ঊর্ধ্বে নিয়ে যান, হৃদয়াবেগ পরিশুদ্ধ করে বিশিষ্টতা দান করেন। প্রেমানু-ভূতি কি, তার সরলীকরণ হলে প্রেমের কবিতা সম্ভব হত না। একেবারে অন্য পর্যায়ের

অনুভূতি সে—বলা যায়: অস্পষ্ট, বলা যায়: বিমূর্ত; যুদ্ধ, শান্তি, সুখ, দুঃখ, বিষাদ বা আনন্দিত উন্মাদনার পরিপ্রেক্ষিতে বিচার্য নয়; কোন বিশ্লেষণেই যার শিকড় মেলে না। আর যে-হেতু কবিদের অভিজ্ঞতা জনে জনে আলাদা, একান্তরে অসেতুসম্ভব এবং যুগধর্ম-নির্ভর নয়, বিশেষত সেইজন্যই প্রেমের কবিতার বৈচিত্র্য এত বেশি।

"একালের প্রেমের কবিতা"র অন্তর্ভুক্ত প্রায় সকল কবির রচনাতেই অনুরূপ বৈচিত্র্য দুর্লভ নয়। 'স্বাধীনতার স্বচ্ছল যুগে যদিও এঁদের আবির্ভাব তবু দেশবিভাগের অস্থিরতায়, আমেরিকা-রাশিয়া-চীনের পরস্পরবিরোধী প্রভাববিস্তারী নাগরদোলায়, নবলব্ধ স্বাধীনতার দায়িত্বে ও দৈন্যে এঁদের প্রেমে কখনো আশা, প্রীতি, বিশ্বাস, স্বপ্ন—কখনো পাপবোধ, কাম, হতাশা, অক্ষমতা। বহিরঙ্গে অনুকূল অন্তরঙ্গে প্রতিকূল এক যুগ-বিশেষের রচনা বলে এঁদের রচনায় মুগ্ধবোধের স্থান কম।'—সম্পাদিকার এ-রকম দুরন্ত ভূমিকা পড়ে ও 'একাল' কথাটার উপর জোর দিতে দেখে ধারণা হয়েছিল কালের হাওয়ায় প্রেমানুভূতিও বুঝি পাল্টে গেছে এবং এই সংকলন সেই পরিবর্তিত বোধ ধরে রাখার চেষ্টা। সুখের কথা, কবিদের রচনায় সেইরকম বিরাট রোমহর্ষক কোন বদলের চিহ্ন নেই। প্রকরণগত পার্থক্য ও কিঞ্চিৎ দার্শনিক প্রযুক্তি বাদ দিলে মোটামুটি এঁরা পূর্বজদের ধারাই অনুসরণ করেছেন।—

(ক) 'তোমার স্বপ্নের দ্বারে আমি আছি বসে
তোমার সুপ্তির প্রান্তে,
নিভৃত প্রদোষে
প্রথম প্রভাততারা যবে বাতায়নে
দেখা দিল।
চেয়ে আমি থাকি একমনে
তোমার মুখের 'পরে।'
(প্রতীক্ষা। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

(খ) কার মুখ মনে পড়ে, কে আমার যন্ত্রণার রানী,
কাছে সে ডাকে না, তবু দেবে না যে দূরের পারানি!
স্বাদুতা সম্ভারে শুধু থরো থরো স্মরণের ভাষা
পুরনো পটের দৃশ্যে অবিরোধী মগ্ন ভালোবাসা।
(একটি মুখ। প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত)

(গ) দেখি নাই তার নয়নে ছিল কি
নীলিম ক্ষুধা,
মৃদু-বিহসিত অধর-আধারে
রঙিন সুধা!
রজনীগন্ধা ফুলের শাখাটি
শিথিল করে
ছিল বুঝি? তার সুবাস লভিনু
তন্দ্রাভরে!
(নিশি-ভোর। মোহিতলাল মজুমদার)

(ঘ) 'যদিও শরীর কৃষ্ণশাড়িতে ঢাকো,
সুদূর দু-চোখে কাজলের রেখা আঁকো,
নগরান্তের ঠিকানার ঘরে থাকো—
তুমি বিচিত্র তৃষ্ণার সরোবর।'
(স্বর্গের স্বাক্ষর। অরবিন্দ গুহ)

(ঙ) 'জানি তোমার দু চোখ আজ আমাকে খোঁজে না আর
পৃথিবীর পরে—'
বলে চুপে থামলাম, কেবলি অশত্থপাতা পড়ে আছে ঘাসের ভিতরে
শুকনো মিয়ানো ছেঁড়া; অঘ্রান এসেছে আজ পৃথিবীর বনে;
সে সবের ঢের আগে আমাদের দুজনের মনে
হেমন্ত এসেছে তবু;'
(অঘ্রান প্রান্তরে। জীবনানন্দ দাশ)

(চ) 'ফিরে যেতে থাকে হাঁস, রৌদ্রস্নাত পশুশালা ছেড়ে ফের অমল উত্তরে
বরফ গল্লার পর ফাল্গুন সর্বত্র মুখ দেখায় মদির
আজ চতুর্দিকে দ্রুত রটে যায় তোমার আমার বিনিময়।'
(স্মৃতিপুঞ্জের অনুলিখন। মানস রায়চৌধুরী)

(ছ) 'যদি মরে যাই
ফুল হয়ে যেন ঝরে যাই;
যে-ফুলের নেই কোন ফল
যে-ফুলের গন্ধই সম্বল,
যে-গন্ধের আয়ু একদিন,
উতরোল রাত্রিতে বিলীন;
(প্রার্থনা। অরুণকুমার সরকার)

(জ) 'গোলাপ ফুটেছিলো, গোলাপ ঝরে গেছে।
অমন কতোফুল ফোটে ও ঝরে যায়—
কে তার খোঁজ রাখে? হিসাবে বাধা কতো!
গোলাপ ফুটেছিলো, গোলাপ ঝরে গেছে।'
(গোলাপ। শক্তি চট্টোপাধ্যায়)

উপরোক্ত বিভিন্ন কবিতার অংশ রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে আধুনিক বিভিন্ন কবির রচনা —দীর্ঘ সময় ও বিভিন্ন যুগ ধরে এঁরা বাংলা আধুনিক কবিতার প্রতিনিধিত্ব করছেন। এঁদের মধ্যে প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত, অরবিন্দ গুহ, মানস রায়চৌধুরী ও শক্তি চট্টোপাধ্যায় পঞ্চাশের কবি এবং তাঁদের রচনাগুলি "একালের প্রেমের কবিতা"র অন্তর্ভুক্ত। যথেচ্ছ সংগৃহীত উদ্ধৃতির সংখ্যা কিছু দীর্ঘ করা হল প্রত্যক্ষ ও অনুমেয় কারণে: শুধু দেখানোর জন্য যে বৈপরীত্য সত্ত্বেও এঁরা পরস্পরসম্পৃক্ত, এমনকি শব্দপ্রয়োগ ও চিত্রবিন্যাসেও প্রায়ই অনুরূপ—প্রকরণগত বৈষম্য উপেক্ষা করলে দীর্ঘ ধারাবাহিকতা কোথাও ক্ষুণ্ণ হচ্ছে না। অর্থাৎ, পরিবর্তন হিসেবে এমন কিছুই পাচ্ছি না যাতে মনে করা যেতে পারে প্রেম সম্পর্কিত

কোন বৈপ্লবিক ধারণা পঞ্চাশের কবিদের কবিতায় যুক্ত করেছে নতুনতর তাৎপর্য, যা আধুনিক কবিতার পারম্পর্য থেকে তাঁরা বিচ্যুত। শ্রীমতী দীপ্তি ত্রিপাঠীর ভূমিকায় এ'দের বৈশিষ্ট্য প্রমাণের বিশদ চেষ্টা রয়েছে; কিন্তু পূর্ববর্তী কবিদের সঙ্গে এ'দের সম্পর্কটিকে কোন আমল দেয়া হয়নি। বরং নির্বিচারে তিনি পঞ্চাশের কবিদের সংযোগ খুঁজেছেন মালার্মে, এলিয়ট, র‍্যাঁবো, ভের্লেন, রিল্‌কে প্রমুখ বিদেশী কবির কবিতায়; এবং এই প্রক্রিয়ায় এমন কিছু তথ্যের বোঝা পাঠকের উপর চাপিয়েছেন যা বহন করা সহজ নয়। 'এ'দের রচনায় মুগ্ধবোধের স্থান কম' বলে যে উক্তি তিনি করেছেন তার প্রয়োজ্যতা সম্পর্কেও সন্দেহ হয়। মুগ্ধবোধ ছাড়া কি প্রেমিকের উত্থান, প্রেমের কবিতা সম্ভব! নাকি প্রেমের কবিতার প্রাথমিক শর্তই মুগ্ধবোধ? তাঁর নির্বাচিত কবিদের রচনাতেই এর প্রমাণ রয়েছে--

(ক) 'বকুল, তোমাকে শুধু ঈর্ষা করি, কতো না সহজে
তুমি তার মত্ত কেশে ডুবে যাও অনির্বাণ
তোমার অতীতে নেই প্রবচন, ছায়া, শান্তি, গ্রন্থের বীজাণু

আমার অনন্ত রক্ত ঝরে যায় অগ্নির সমাজে।'
(ক্ষয়। উৎপলকুমার বসু)

(খ) 'সমুদ্রশঙ্খের চুড়ি, রাগরক্ত সিঁথির মহিমা
আদিগন্ত স্মৃতিভার সঞ্চারিতা নীলাঞ্জনা শ্যামা
অক্ষম পটুয়া আমি, আমি ব্যর্থ সাজাতে পারি না
স্মরণ শোভন রঙে হে মৃন্ময়ী তোমার প্রতিমা।'
(উৎসর্গ। তারাপদ রায়)

উদ্ধৃতি বাড়িয়ে লাভ নেই। বস্তুত, পঞ্চাশের কবিদের উত্তরাধিকার সম্পর্কে সংশয়িত হওয়া অহেতুক এবং যে-তত্ত্বটির সপক্ষে আগেই বলেছি, এ'দের শিকড় আছে রবীন্দ্রোত্তর বাংলা কবিতার গভীরে। মাঝে মাঝে উৎকেন্দ্রিক হবার চেষ্টা যে নেই তা নয়—সেটা স্বাভাবিক; যৌবনের অঙ্গীকার কিছু-না-কিছু আবিষ্কারে তৎপর হবেই। তার ফলে লাভবান হয়েছে আধুনিক কবিতা। বাগ্মিতা এ'দের কবিতায় প্রশ্রয় পায়নি; পরিবর্তে পাচ্ছি সংহত আবেগ, নিচু স্বরের হার্দ্য উচ্চারণ, প্রতীক ও চিত্রকল্পের তৎপর ব্যবহার এবং কষ্টকল্পনার পরিবর্তে বাচনে স্বতঃবৃত্তি। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য এ'দের কবিতার রহস্যময়তা, পূর্ববর্তী কবিদের অধিকাংশের রচনাতেই যার অভাব ক্লান্তিকর মনে হয়।—

(ক) 'তুমি যে বলেছিলে গোধূলি হলে
সহজ হবে তুমি আমার মতো,
নৌকো হবে সব পথের কাঁটা
কীর্তিনাশা পথে নমিতা নদী!
গোধূলি হলো।

তুমি যে বলেছিলে রাত্রি হলে
মুখোস খুলে দেবে বিভোরবিভা
অহংকার ভুলে অরুন্ধতী

বশিষ্ঠের কোলে মূর্ছা যাবে!
রাত্রি হলো॥'

(একটি কথার মৃত্যুবার্ষিকীতে। অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত)

(খ) 'লোহার কোরক থেকে আজো দীর্ঘ প্রতিধ্বনিময়
স্টেশনে স্ফুলিঙ্গ পড়ে। দরজায়, উজ্জীবিত নীড়ে
ভাঙা হাত, নষ্ট চোখ, মনে রেখো সেই দুর্ঘটনা।
চলেছি নির্বাণহীন, ক্রাচে বাহু, অন্ধের বিত্ত নিয়ে খেলা
আমাদের প্রস্তাবে কোনদিন দিলে না সম্মতি।'

(পুরী সিরিজ (অংশ)। উৎপলকুমার বসু)

স্বচ্ছ, বোধশাণিত, মাঝে মাঝে প্রজ্ঞায় রূপান্তরিত, সর্বোপরি রহস্যময়—এইসব কবিতার তাৎপর্য পাঠকের মানসিকতায় দীর্ঘ অনুরণন সৃষ্টি করে। এমনকি শরীর বা যৌনতার উল্লেখেও এ'দের শৈল্পিক সংযম ও গাঢ় অভিনিবেশ লক্ষ করবার মতো—

'এক বছর ঘুমবো না, স্বপ্ন দেখে কপালের ঘাম
ভোরে মুছে নিতে বড় মূর্খের মতন মনে হয়—
বরং বিস্মৃতি ভালো, পোশাকের মধ্যে ঢেকে রাখা
নগ্ন শরীরের মতো লজ্জাহীন, আমি
এক বছর ঘুমাবো না, এক বছর স্বপ্নহীন জেগে
বাহান্ন তীর্থের মতো তোমার ও-শরীর ভ্রমণে
পুণ্যবান হবো।'

(হঠাৎ নীরার জন্য। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়)

আবেগকে বুদ্ধির পর্যায়ে উন্নীত করা পঞ্চাশের কবিদের এক বড় অবদান হলেও, এরই পাশাপাশি এমন কিছু কবিতা রচিত হয়েছে যা নিছকই বিবৃতিমূলক আর ঝকঝকে, ইংরিজীতে যাকে বলে 'স্মার্ট', হয়তো হাততালি পাবার মতো; কিন্তু উৎকর্ষ বিষয়ে সন্দেহ থেকে যায়।

পূর্বোক্ত যে-সমস্ত ইতিহাসের ভার শ্রীমতী ত্রিপাঠী পঞ্চাশের কবিতায় আরোপ করতে চেয়েছেন, কবিদের মানসতায় তার প্রমাণ মেলা দুরূহ। এবং তা নিতান্ত অকারণ নয়। মনে রাখতে হবে এটা ইউরোপীয় ভূখণ্ড নয়, আমেরিকা, চীন, রাশিয়া বা ভিয়েতনাম নয়—ভারতবর্ষ তথা বাংলাদেশ, বহির্বিশ্বের তাপ প্রায়ই যেখানে খবরকাগজের রসদ জোগাতে জোগাতেই মিইয়ে আসে, জনমানসে তেমন আলোড়ন তোলে না। যতদূর মনে হয়, সাহিত্য-মানসেও তার কোন প্রভাব নেই। যদি তা না হত, যদি সত্যিই দেশ বা রাজনীতি বা বৃহৎ বিশ্বের টানাপোড়েন কবি-সাহিত্যিকদের অন্তত একাংশেরও চেতনায় সে-রকম আলোড়ন তুলত, তাহলে গত কয়েক দশকের মধ্যে বাঙালী জীবনের সবচেয়ে স্নায়ুপীড়ার ঘটনা 'দেশবিভাগ' নিয়ে একটি দুটি স্মরণীয় সাহিত্য রচিত হতে পারত! শ্রীমতী ত্রিপাঠী নিশ্চয় স্বীকার করবেন যে বিশ্বাসের খাতিরেই যে-বিশ্বাসকে গ্রহণ করা হয়, জীবনধারণের কিংবা নৈতিক কারণে নয়, তা শেষ পর্যন্ত ধোপে টেঁকে না—ফ্যাশনের মতই তা কিছুদিন ব্যবহার্য মাত্র। কিন্তু, তাৎক্ষণিক প্রেরণা থেকে কি উচ্চমানের সাহিত্যকর্ম সম্ভব?

প্রসঙ্গত চল্লিশের কবিদের প্রেমের কবিতা বিষয়ে শ্রীমতী দীপ্তি ত্রিপাঠীর মন্তব্য

আলোচনার অপেক্ষা রাখে। তিনি তাঁদের দেখেছেন 'ঘর ছেড়ে নিশান হাতে মিছিলের যাত্রী' রূপে, কারণ, 'গুছিয়ে গড়ে তোলার মতো মনের অবস্থা তাঁদের ছিল না। ১৯৪০-৪৭, সারা পৃথিবী জুড়ে তখন ভাঙ-চুরের পালা, রণমুখী অশ্বারোহীর প্রেম যেমন দ্রুত তেমনি গৌণ।' অবশ্যই 'রণমুখী অশ্বারোহী'দের কাছে প্রেমানুভূতি দাবি করা বাড়াবাড়ি; কিন্তু, শ্রীমতী ত্রিপাঠী কাদের অশ্বে আরোহণ করিয়েছেন ঠিক বোধগম্য হল না। হয়তো তাঁর স্মরণে ছিল সমর সেন বা সুভাষ মুখোপাধ্যায়—বিশেষ মতাদর্শে বিশ্বাস সত্ত্বেও প্রেমের কবিতা রচনায় যাঁদের অসামান্য ব্যুৎপত্তি আজ আর তর্কের অপেক্ষা করে না। বয়সের বিচারে যেখানেই থাকুন, কালের দিক থেকে এ'রা তিরিশের শেষের দিকের কবি। আর, কে না জানে, চল্লিশের কবি হিসেবে মণীন্দ্র রায়, অরুণকুমার সরকার, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, নরেশ গুহ প্রভৃতি প্রথমে রোম্যান্টিক তারপর অন্য কিছু. সমসাময়িক ইতিহাসে তাঁদের পরিভ্রমণ নিতান্তই আপতিক ব্যাপার। মণীন্দ্র রায়, মঙ্গলাচরণ ও বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কবিতার অন্যতর তাৎপর্য সম্পর্কে অবহিত থেকেও এ-কথা বলা যায় যে চল্লিশের কবিদের মুখ্য আবহাওয়া রোম্যান্টিসিজমের।

প্রেম, স্পষ্টতই, অনুভব্য বিষয়; যা ব্যক্তিগত, বস্তু বা ঘটনানির্ভর নয়। প্রেমের কবিতা রচনার জন্য নির্দিষ্ট কোন পরিবেশ, আবহাওয়া, রাজনৈতিক বা সামাজিক সুস্থিরতার প্রয়োজন যে নেই, সে-কথা বলাই বাহুল্য—ব্যক্তির চিন্তায় যে-কোন সময়, যে-কোন মুহূর্ত, যে-কোন পটভূমিই উপযুক্ত বলে ধরে নেয়া যেতে পারে। না হলে, ভাবা যায় না, পৃথিবীতে যদি তেমন সু-সময় কখনো এসে যায়—শান্তি ও পরিতৃপ্তি ভিন্ন যখন চতুর্দিকে আর কোন প্রভাব নেই, তখন কি পৃথিবীর যাবতীয় কবিকুল প্রেমের বন্যায় অবগাহন করবেন! না কি 'রণমুখী অশ্বারোহী'র জগৎই প্রেমবিবর্জিত! শ্রীমতী ত্রিপাঠীর যুক্তি এ-ক্ষেত্রে কিঞ্চিৎ এলোমেলো। অন্যথায় প্রেমের বিয়োগান্ত দিকটি তাঁর মনে পড়ত, মনে পড়ত অশ্লেষার রাক্ষসী বেলা, মনে পড়ত আবিশ্বের কয়েকটি অনিবার্য প্রেমের কবিতার জন্মমুহূর্ত।

মনে হয় প্রেমের কবিতার ভূমিকা রচনা করতে গিয়ে কবিতায় প্রেম ও অন্যান্য বিষয়-কে তিনি আলাদা করতে পারেন নি। ফলে, পাণ্ডিত্য সত্ত্বেও, তাঁর বক্তব্য দ্বিধাগ্রস্ত এবং প্রায়ই স্ববিরোধী। একদিকে তিনি একালের প্রেমের কবিতায় দেশবিভাগ, নবলব্ধ স্বাধীনতার দায়িত্ব ও দৈন্য এবং আমেরিকা, রাশিয়া, চীনের পরস্পরবিরোধী প্রভাব লক্ষ করেছেন, অন্য-দিকে, একই সময়ে, বলেছেন: 'পঞ্চাশের কবিরা ভাগ্যবান। তাঁরা যখন লিখতে শুরু করলেন তখন বিশ্বযুদ্ধ শেষ। প্রায় সাতশ' বছর পরে এক আশ্চর্য স্বাধীন ভারতের জন্ম হচ্ছে। আরো কি আশ্চর্য! সেই শুভলগ্নে তাঁদের যৌবনের সোনার ঘণ্টাও বেজে উঠেছে। এমন যোগাযোগ বিরল। তবু সেই মধুর মুহূর্ত এসেছিল। এই সংকলনে সেই প্রিয়ক্ষণটিকে ধরে রাখার চেষ্টা হয়েছে।' এই দুটি উক্তি নিশ্চয় সমার্থবোধক নয়, বরং পরস্পরবিমুখ। উপরন্তু, 'শুভলগ্ন' সত্ত্বেও, শ্রীমতী ত্রিপাঠীর মতে এ'দের 'প্রেমের কবিতা রোম্যান্টিকতার মাধুর্যে সর্বদা নিবিড় নয়—নানা জটিল গ্রন্থি-ও-প্রশ্নসংকুল।'

এই তথ্যটি নতুন। কারণ, আমরা জানতুম, প্রেমের সঙ্গে জটিলতা ও প্রশ্নসংকুলতার সম্পর্ক অবিভাজ্য; এবং সেটা শুধু একালের ব্যাপার নয়।

দিব্যেন্দু পালিত

দেবেশ রায়ের গল্প। সারস্বত লাইব্রেরী। কলিকাতা ৬। মূল্য ছয় টাকা।

নানা কারণে দেবেশ রায়ের গল্প-সংকলনের প্রকাশ আমাদের কাছে প্রায় উৎসবের মতো। গল্পের বই যখন বাজারে বের হচ্ছে না, কৃতী লেখকদের বই প্রকাশ করতে প্রকাশকদের অনটনবোধ জেগে উঠছে, তখন এই বইয়ের প্রকাশ আমাদের আশার সঞ্চার করে। দেবেশ রায় বহুদিন থেকে গল্প লিখছেন। প্রথম আবির্ভাবেই রাজার মতো কিছু গল্প লিখে ফেললেন। আমরা নিঃশ্বাস বন্ধ করে পড়ি এবং ভাবি আর আমাদের বিস্ময় বাড়ে। তাঁর গদ্যরীতি একেবারে ভিন্ন। প্রকরণ এবং কাঠামো সৃষ্টিতে সম্পূর্ণ নূতন পথ আবিষ্কারে ব্যস্ত। তিনি বেশ শক্তভাবে পাল খাটাচ্ছেন, মাঝদরিয়ায় ভরাডুবির ভয় যেন না থাকে।

নানা রঙের—লাল হলুদ অথবা নীল দ্বীপপুঞ্জের ভিতর প্রবেশ করার বাসনা তাঁর। মানুষ হচ্ছে সেই সমুদ্র, আর জটিল জীবনবোধের এক-একটা অংশ হচ্ছে সেই সব দ্বীপ। যেমন ধরা যাক তার আহ্নিক গতি ও মাঝখানের দরজা, দরজায় তিন পাশে তিনটি দ্বীপ, কোনটা নীল, কোনটা হলুদ অথবা লাল, দ্বীপের নাম তটিনী, শিশির। আর আছে পঙ্গু দাদা। দাদার বৌ তটিনী। শিশির রয়েছে মাঝখানে। চারপাশে জটিল লোনা নীল জল আবর্তিত হচ্ছে ঘুরে ফিরে—শিশিরের দায়িত্ব সংসার রক্ষা করা আর তটিনী জানে খিল খিল করে হাসতে, এত বয়সেও তার হাসিটা গেল না। শিশির, দাদা এবং বৌদির প্রতি বড় বেশী কর্তব্যপরায়ণ—সেই কবে, যেন মাস কাল বৎসরের হিসাব শেষ হয়ে গেছে, দাদা বিছানায় অবশ শরীর নিয়ে দিনগত পাপক্ষয় করে যাচ্ছেন—তটিনীর সংসারে শিশির তার আয়ু নিয়ে বসবাস করছে, একটা দরজা খোলা থাকে—কে যেন আসবে মনে হয় সেই দরজা পার হয়ে। সে এক অন্য অস্তিত্ব তার। মাঝখানের দরজা খোলা থাকলেই সে তা টের পায়। গল্পের বস্তু সামান্য অথচ এক অসাধারণ গদ্যরীতি তিনি ব্যবহার করেছেন—কোথাও কোথাও পড়তে পড়তে কাব্যের সুষমা পাওয়া যায়।

যেমন ধরা যাক তাঁর আর এক গল্প, দুপুর। দুপুর গল্পে রেণুবালা জলের গ্লাসটা যতীনবাবুর দিকে এগিয়ে দিলেন। যতীনবাবু রঙ চেনেন, রঙ জানেন না। রোদ আর আগুনে মুখের রঙ কী হয়, ঘামের রঙ কেমন—তিনি তা জানেন না, তবে চেনেন। তখন দুপুরের বর্ণনা—অনেক ছেলের মা, শিথিলদেহ শ্লথযৌবনা নারীর মতো দুপুরটা হাঁপাচ্ছে। জিভ আর দু পাশের ছুঁচলো দাঁত বের করে দুপুরটা পড়ে আছে মাদী কুকুরের মতো। তাঁর পাত্রপাত্রীর অবয়বে যে দুপুর, সে নানারকম রঙ নিয়ে জেগে থাকে। রেণুবালার কাছে দুপুরের মানে একরকম, যতীনবাবুর চোখে দুপুর মাদী কুকুরের মতো আর মেয়ে মায়ার কাছে দুপুরটা নীলখামে আসা প্রিয়জনের চিঠির মতো।

সেই দুপুরে যদি জানালায় দেখেন এক-পা-অলা এক মেয়েমানুষ হেঁটে যাচ্ছে তবে বুঝতে কষ্ট হবে না, সে রমণী দেবেশ রায়ের চরিত্র ছোট বৌ। পা গল্পে দেবেশবাবুর এক-পা-অলা ছোট বৌ একটা দু-পা-অলা বাচ্চা দিয়েছে। ছোট বৌ এক-পা-কাটা হয়ে হাসপাতালে পড়ে থাকলো। ওর কথা ছিল আত্মহত্যা করার। বড় বৌ আর ছোট বৌ একসঙ্গে আত্মহত্যা করতে চেয়েছিল। বড় বৌ পেরেছে, সে পারেনি। জীবনের বিড়ম্বনা শেষ পর্যন্ত তাকে দু-পা-অলা একটা বাচ্চা দিতে সাহায্য করেছে। অথচ যার আত্মহত্যা করার কথা নয়, সুখ ভেবে নীল চশমা চোখে এঁটে দিয়েছিল—সেই যুবক গোপাল শেষ পর্যন্ত ওভার-ব্রিজের রেলিঙ ধরে দাঁড়িয়ে থাকল। ওভার-ব্রিজ আর মাটির মাঝখানের শূন্যতার

মধ্যে পড়ে যাবার ঠিক পূর্বের হ্রস্বতম মুহূর্তে সে ভাবতে চেয়েছিল—'আমার মরার কোন মানেই হয় না।' গল্পের নাম গোপাল এবং কলকাতা। গোপাল এত বড় নগরীতে বাঁচার মতো কোন কারণই খুঁজে পায়নি। পশ্চাৎভূমি গল্পে লেখক এত বেশি রীতি এবং প্রকরণের ধাঁধায় ঘুরে মরেছেন যে পাঠক হিসাবে সেখানে মনে হয়েছে নিছক বুদ্ধির চাতুর্যের খেলা অথবা অজ্ঞ আমি বনবাসীর মতো মুখ করে তাকিয়ে আছি, কখন সেই গল্পে নিজেই গোপাল বনে গেছি, মানে নেই বুঝে ওঠার অথবা পড়ে শেষ করার, কারণ কখনও কখনও গোপাল ওভার-ব্রিজের উপরে উঠলেই একটা পেচ্ছাবখানা দেখতে পেত।

দেবেশ রায় গল্পে আস্তিকতা-নাস্তিকতা এবং জীবনমৃত্যুরহস্যে নিয়তই ডুবে আছেন। ট্রেন আমাদের সকলকে নিয়েই রওনা হয়েছে। নূতন বৌ, তার কোলের বাচ্চা এবং স্বামী অথবা পোর্টফলিও ব্যাগের বাবু, ডাক্তার এবং রাতের অন্ধকার সব নিয়ে ট্রেন ছুটছে। চোর গুন্ডা ডাকাতের ভয়, যে কোন মুহূর্তে ওরা উঠে আসতে পারে—সুতরাং চারপাশের দরজা জানালা বন্ধ করে, এই পৃথিবীকে অতিক্রম করো। দরজা কোথাও কখনও খোলা হবে না। আজকাল দেবেশবাবু গল্পে এই অনুশাসন বুঝি মেনে নিয়েছেন। কারণ খোলা কঠিন হয়ে পড়ছে। তাঁকে তখনই কেন জানি আমার উদ্বাস্তু মনে হয়। মনে হয় ঘোড়ায় চড়ে তিনি এবার বনবাসে যাবেন। আমরা নিয়ত ধাবমান ভাগ্যগত ইন্দ্রজালের ভিতর শুধু চোখ খুলে রেখেছি। অস্পষ্ট বনবাসে যাবার আগে তিনি আবার স্পষ্ট অসিযুদ্ধে নামলে পারতেন।

অস্পষ্ট বনবাসের চেয়ে স্পষ্ট অসিযুদ্ধ অধিক স্বাস্থ্যকর।

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

আদিগঙ্গা। আশুতোষ সরকার। রূপরেখা। কলিকাতা ১২। মূল্য আট টাকা।

কোন তরুণ লেখক যদি তাঁর প্রথম রচনায় একটি বিশিষ্ট ভাষা-রীতি সার্থকভাবে ব্যবহার করতে পারেন তবে সহজেই ভরসা জাগে যে নিষ্ঠা থাকলে লেখক কালক্রমে সাহিত্যের আসরে নিজের স্থান করে নিতে পারবেন। আলোচ্য বইখানি পড়ে মনে হয়েছে লেখক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উত্তরসাধক। লেখকের এই ভাষা-রীতি নিছক আধুনিক রম্য-রচনা-রচয়িতাদের মত কষ্ট করে অর্জিত কৃত্রিম অভিনব এবং দৃষ্টি-আকর্ষণকারী প্রকাশ-কৌশল নয়, তাঁর ভাষা-রীতি স্বতঃস্ফূর্ত অনায়াস-লব্ধ।

গ্রন্থের প্রথম লাইনটিই পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করে: 'বৎসহারা গাভী বলার চেয়ে বাচ্চাহারা কুত্তী বলাই ভাল।' পুত্রের অদর্শনে জননীর আকুতি বৎসহারা গাভীর মধ্যে যে গাম্ভীর্য এবং মহত্ত্ব নিয়ে দেখা দেয়, বাচ্চাহারা কুকুরীর ছটফটানির মধ্যে তার অভাব। এই একটি লাইন দ্বারা লেখক এ-কথা বোঝাতে পেরেছেন যে যাদের কথা তিনি লিখছেন তারা উচ্চতর সমাজের মত একই আবেগ এবং দুঃখ-বোধের বশীভূত; কিন্তু তাদের আবেগের প্রকাশের মধ্যে এমন একটা জৈবিক স্থূলতা আছে যা আমাদের সহানুভূতি উদ্রেকের পথে বাধা জন্মায়। আগাগোড়া বইখানিতে লেখক এই ভাষা-রীতি বজায় রাখতে পেরেছেন বলে বোঝা যায় এই রীতি লেখকের স্বভাব-সিদ্ধ।

আলোচ্য বইখানির বিষয়বস্তু হল কালীগঙ্গার পারের জীবন-যাত্রা। এই জীবন-যাত্রার দুটি বিভাগ: একদিকে বস্তিভুক্ত সমাজ, আর একদিকে বারবণিতা-সমাজ। লেখক এই উভয়-সমাজের বাস্তবকে কাহিনীতে রূপায়িত করেছেন কেন্দ্রীয় চরিত্র সোহাগিনী ওরফে সুষমা ওরফে লক্ষ্মীর জীবন-ধারাকে অনুসরণ করে। মূলকাহিনী থেকে বিচ্ছিন্ন অল্প কয়েকটি চরিত্র এবং দৃশ্যের উল্লেখ থাকলেও লেখক মোটামুটিভাবে একটি পরিচ্ছন্ন কাহিনীর মধ্যে উক্ত উভয়বিধ সমাজকে বিধৃত করেছেন। যে-কালে সাংগঠনিক শ্লথতা বাংলা উপন্যাসের ক্ষেত্রে একটি ব্যাধিতে পরিণত হয়েছে, সে-কালে কাহিনীর এই ঐক্য লেখকের উচ্চস্তরের শিল্পবোধের পরিচয় দেয়।

কাহিনী পরিকল্পনায় অবশ্য একটি বড় রকমের ত্রুটি আছে। বস্তি-জীবন থেকে বারবণিতা-জীবনে এসে নায়িকা একেবারে ভিন্ন মানুষ হয়ে গেছে। লেখক অবশ্য নায়িকার জলে-ডোবা ও স্মৃতিভ্রংশের উল্লেখ করে এই রূপান্তরকে প্রত্যয়গ্রাহ্য করতে চেয়েছেন, কিন্তু বাস্তবধর্মী উপন্যাসে চরিত্রের পরিবর্তনশীলতা সত্ত্বেও ধারাবাহিকতা বজায় রাখা অত্যাবশ্যক। তাছাড়া বস্তিজীবন চিত্রায়নের সময় লেখক নির্মম বাস্তববাদী, কিন্তু বারবণিতা জীবন কাহিনীতে লেখক রোমান্টিক প্রকাশ-ভঙ্গীকে প্রাধান্য দিয়েছেন। তাতে অবশ্য কাহিনীটি অধিকতর সুখ-পাঠ্য হয়ে উঠেছে, কিন্তু লেখকের বাস্তবনিষ্ঠায় সন্দেহ জাগে। বাড়িউলী সোহাগিনীর নিমাইচাঁদের প্রতি আকর্ষণ অত্যন্ত জান্তব, অকুণ্ঠ এবং প্রায় ভাবাবেগ-বর্জিত। কিন্তু গণিকা সুষমার কবি সুফলের প্রতি প্রেম কুণ্ঠিত, মন্থরগামী এবং নিজের কাছে নিজেকে লুকোতে ব্যস্ত,—অর্থাৎ, প্রায় মধ্যবিত্ত-সুলভ রোমান্টিক প্রেম।

কিন্তু এ অসংগতি অবাঞ্ছিত হলেও বাঙালী পাঠকের কাছে অপরিচিত নয়। তা সত্ত্বেও বইখানির মধ্যে বস্তিজীবনের যে অন্তরঙ্গ অনতিরঞ্জিত চিত্র উদ্ঘাটিত হয়েছে তার জন্য বইখানি পাঠকের কাছে স্বীকৃতি পাবে বলে ভরসা করি। লেখক নিছক কর্তব্য বোধের থেকে এ কাহিনী লেখেননি; বস্তিতে আপাত-রুক্ষতার আড়ালে আদর্শ মানুষ বাস করে—এ ধরনের সাজানো মিথ্যার প্রতিও লেখকের কোন আসক্তি নেই; বস্তিবাসীদের দারিদ্র্য-জনিত দীনতা নীচতা স্বার্থপরতার আড়ালে যে মানবিক সত্তা এবং প্রাণাবেগ আছে লেখক ঘনিষ্ঠ সাহচর্যের ফলে তাকে হৃদয়ংগম করেছেন এবং ভালবেসেছেন।

অচ্যুত গোস্বামী

নক্ষত্রজন্মের জন্য—নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। সুরভি প্রকাশনী। কলিকাতা ১২। মূল্য তিন টাকা পঞ্চাশ পয়সা।
কলকাতার যীশু—নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। অরুণা প্রকাশনী। কলিকাতা ৬। মূল্য তিন টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

"নীল-নির্জন" কাব্যগ্রন্থে নীরেন্দ্রনাথ ছিলেন মূলত রোমান্তিক। "অন্ধকার বারান্দা"-র সংরক্ত কবিতাগুলিতে যদিও তিনি পুরোমাত্রায় রোমান্তিক অনুষঙ্গ বর্জন করতে পারেননি, তবু এই কাব্যগ্রন্থটিতেই নীরেনবাবুর কবি-ব্যক্তিত্বে সময়ের নিঃশব্দ শাসন লক্ষ্য করা যায়। যুগের জটিল যন্ত্রণায় বিক্ষত মানুষের বিপন্ন অস্তিত্বে তিনি দুঃখে জর্জরিত। এবং

যেহেতু, কবি নিজেও বর্তমান শতকেরই একজন, তাই বর্তমান সময়কে তাঁর নিষ্ঠুর নদী বলে মনে হয়। এই মানসিকতার পরিণত ফসল "নীরক্ত করবী"। গ্রন্থের নামকরণেই কাব্যপ্রকৃতি অনুমিত হয়। এখানে নীরেনবাবু অনেক বেশী নাস্তিক, সমাজ- ও সময় -সচেতন। হালে, অতি অল্প সময়ের ব্যবধানে, তাঁর যে দুটি কবিতার বই—"নক্ষত্রজয়ের জন্য" ও "কলকাতার যীশু" পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে তাতে তাঁর সমাজসচেতনা যেমন একদিকে তাঁকে সময়ের বিচিত্র পরিবর্তনের সঙ্গে অন্বিত করেছে, তেমনই এই দুটি কাব্যগ্রন্থেই তিনি যেন একটু ব্যতিক্রম।

সময়সচেতনা এক অর্থে কবির নিজেরও অস্তিত্বকে ঘোষণা করে। যেমন "কলকাতার যীশু" কাব্যগ্রন্থের একটি কবিতায় (যুদ্ধক্ষেত্রে, এখনো সহজে) তাঁর মনে হয়, 'অর্থাৎ এখনো আমি বেঁচে আছি। চৌমাথায়/যে-লোকটা দাঁড়িয়ে আছে, বস্তুত আমাকে/সে-ও চোখে চোখে রাখছে, আমি তার/হিংসার ভিতরে বেঁচে আছি।' তাঁর চতুষ্পার্শ্বে যে বহমান জীবনযাত্রা সবই 'আসলে একটি সুতোয় গাঁথা আছে,/যেন বা মস্ত একটি চলচ্ছবি/দেখে যাই সারাটা দিন দূরে কাছে, (তবুও তোমার দিকে)। উত্তরচল্লিশের মধ্যবর্তী স্তরে দাঁড়িয়ে, এখন, নীরেনবাবু জীবন-স্ এসে পৌঁছেছেন। তাঁর বিশিষ্ট প্রেমচেতনা এখন সম্পূর্ণতই কবিতার প্রতি অন্বিষ্ট—কবিতা তাঁর নায়িকা। কবিতাকে ধরেই যেন তিনি বেঁচে আছেন। "নক্ষত্রজয়ের জন্য" কাব্যগ্রন্থের 'নিজের কাছে স্বীকারোক্তি' কবিতায় এই সমর্পণের ভঙ্গি তিনি এইভাবে জানিয়েছেন, 'আমি পাহাড় থেকে পড়তে পড়তে/তোমাকে ধরে বেঁচে রয়েছি, কবিতা।/আমি পাতালে ডুবে মরতে মরতে/তোমাকে ধরে আবার ভেসে উঠেছি/আমি রাজ্যজয় করে এসেও/তোমার কাছে নত হয়েছি, কবিতা।' জীবন ও সময়ের বিচিত্র অসঙ্গতিকে লক্ষ্য করে তাঁর কৌতুকপ্রাণতা আলোচ্য দুটি কাব্যগ্রন্থে আরো তীব্র হয়ে উঠেছে। 'কিচেন গার্ডেন' কবিতায় একটি গোলাপের ফুটে ওঠাকে তিনি যে 'বিলক্ষণ অন্যায়' বলেছেন তা আমাদের অপ্রয়োজনীয় আনন্দের প্রতি সুষ্ঠু ইঙ্গিত। এবং কটাক্ষ করেছেন 'চিচিঙে, লাউ, ঢ্যাঁড়শের উদ্দেশ্যে ধাবিত জনতাকে।' 'কোনো লাভ নেই' কবিতায় তাঁর কটূক্তি 'আমি গাধা পিটিয়ে ঘোড়া করতে পারি।/করে দেখেছি,/ঘোড়াগুলিও মোট বইতে চায়।/তাতে লাভ কী।' আমাদের ফাঁকা সংকীর্ণতম সীমাটুকু তিনি যেন ধরে ফেলেছেন। আসলে আমাদের 'প্রত্যেকের ঝুলির ভিতরে/তিনটে করে বেড়ালের ছানা।/... প্রত্যেকেই জানে তার তিনফুট সীমানা' (তিন ফুট কবিতা)। 'এখন পারি না' কবিতায় এই অস্পষ্ট, জটিলতাগ্রস্ত মানুষকে লক্ষ্য করেই তিনি বলেছেন, 'যে যার নিজস্ব মুখ ব্লাউজের গোপনে কিংবা শার্টের হাতায়/ঢেকে নিয়ে ইদানীং/অদ্ভুত ফিকিরে ঘুরে বেড়াচ্ছে, অথবা/গোপনে অন্যের মুখ দেখে নিচ্ছে রাত্রি বারোটায়।' 'নিজের ছবির সামনে' কবিতায় এই বিচিত্র অসংগতিপূর্ণ সামাজিক পরিবেশ থেকে বেরিয়ে যেতে চান তিনি এইভাবে—'দুপায়ে ভিতরে ঢুকে মনে হয়,/চার পায়ে বেরিয়ে যাই।' "কলকাতার যীশু" কাব্যগ্রন্থের 'জমেছে নতুন রঙ্গ' কবিতায় ব্যঙ্গের আকারে তাঁর বক্তব্য গুরুতর—'একজন প্রেমিক গিয়ে কখনো জমায় গল্প ব্যাঙের সমাজে,/কখনো সাপের মুখে চুমু খায়।/একজন বস্তুত-ভাঁড় মনস্বীর ভূমিকায় মঞ্চে নেমেছেন।' এমনকি আমাদের প্রচলিত আধুনিকতার ধারণাকেও তিনি সুন্দর ব্যঙ্গ করেছেন 'নক্ষত্রজয়ের জন্য' নাম-কবিতায়—'পাউডার-পমেড-মাখা যে-কোনো ছোকরার/পুরনো কম্বলে লাথি ঝাড়লেই 'পতন' 'মৃত্যু', 'মাস্তুল' ইত্যাদি/ইঁদুর কিচ্‌কিচ্ করে ওঠে।' 'প্রতীকী সংলাপ' কবিতায় যুদ্ধ এবং শান্তির দুই বিপরীত

প্রতীকী বৈসাদৃশ্য লক্ষ্য করে তাঁর মন্তব্য, 'ভুল ঠিকানায় ঘুরে বেড়ায় যুদ্ধ এবং শান্তি।' জীবনের প্রতি এই সূক্ষ্ম কটাক্ষ তাঁকে প্রখর জীবনচেতনার অভিমুখী করে তুলেছে। এখানে তিনি সমাজসচেতন জীবনবাদী কবি। পরাজিত মানুষ ও তার অস্তিত্বের অসহায়তা তাঁর কবিতার এক লক্ষণীয় চরিত্র। তাই বিচিত্র জীবনযাত্রার মস্ত চলচ্ছবির মধ্যেও তিনি খুঁজে ফিরছেন মানুষকে। তাঁর এই মমতাময় আকুতি তিনি ব্যক্ত করেছেন 'নিজের ছবি সামনে' কবিতায়।

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর সমগ্র কাব্যকৃতিই বিচিত্র পোশাকে সজ্জিত, বিভিন্ন আকৃতি-বিশিষ্ট সামাজিক মানুষের এক দীর্ঘ শোভাযাত্রা। এই পথযাত্রায় সময়ের শিকার কিছু বিক্ষুব্ধ, ব্যর্থ, হতাশ ও প্রবঞ্চিত যুব-পুরুষ, প্রেমিক, রাজনীতিবিদ, রহস্যময়ী নারী, একজন নিঃসঙ্গ প্রৌঢ়, স্নেহশীলা জননী, ত্রস্ত গাঁওবুড়া, এমনকি সুদূর বার্মিংহামের একজন বৃদ্ধকেও দেখতে পাওয়া যায়। এই অনিবার্য মুখের মিছিলে আরো তিনটি নতুন মুখ দেখতে পাওয়া গেল—'বাতাসী', 'কলকাতার যীশু', ও সমাজের অবাঞ্ছিত ফসল 'চতুর্থ সন্তান'। পরিবর্তিত রাজনৈতিক ও সমাজনৈতিক মূল্যবোধের প্রশ্নে আমাদের অস্তিত্বের যাবতীয় ভিত্তিভূমিকে এরা যেন আবির্ভাবের মুহূর্তেই ভেঙে তছনছ করে দিয়ে গেছে।

আগেই বলেছি, সমাজসচেতনা যেমন একদিকে তাঁকে সময়ের বিচিত্র পরিবর্তনের সঙ্গে অন্বিত করেছে, তেমনই এই দুটি কাব্যগ্রন্থেই নীরেন্দ্রনাথ একটু ব্যতিক্রম। "নক্ষত্র-জয়ের জন্য" কাব্যগ্রন্থে পাঠক লক্ষ্য করবেন নীরেনবাবু তাঁর কবিতার অথবা জীবন-চর্যার পালাবদলের ইঙ্গিত দিয়েছেন। "কলকাতার যীশু"-তে সেই ব্যক্তিগত জীবন-ভাবনাই আরো একটু বিস্তৃত পরিসর নিয়েছে। 'এবারে অন্যরকম' কবিতায় তিনি বলেছেন, 'চলো যাই, অন্য-কোনো ইচ্ছার ভিতরে যাই, ভালবাসা।/চলো যাই, দেখে আসি নদীটির অন্যপার।' (চলো, ভালোবাসা।) 'সাংকেতিক তারবার্তা'য় সারাদিন আলোর তরঙ্গ থেকে দূরে যাওয়ার এই ধ্বনি তিনি শুনেছেন। এই যাত্রার মুহূর্তেই তিনি টের পান, 'বুকের ভিতরে কিছু ছিঁড়ে যায় নিমেষে নিমেষে।/কী ছেঁড়ে বুকের মধ্যে? সম্ভবত/সমস্ত বন্ধন, সব স্নেহ মায়ামমতার সুতো' (শুধু সান্ত্বনার কথা)। এখন যেন তিনি তাই 'বৃদ্ধ রাজা' 'একবারই তো যাওয়া, আমি/খানিক বসে, খানিক জিরিয়ে/পৌঁছে যেতে চাই।/এক-বারই তো দেখবো, আমি/যেতে যেতেও চক্ষু ফিরিয়ে/দেখতে যেন পাই।' (বৃদ্ধ রাজা, ন. জ. জ.) যেভাবেই হোক, আজ খেলা ভাঙার খেলায় তাঁকে নতুনভাবে ঘর বদলের কথা ভাবতে হচ্ছে, রক্তের ভিতরে, নাড়ীর স্পন্দনে তাই যেন এক অলৌকিক হাওয়া এসে লেগেছে তাঁর গায়ে। 'শহরতলি' কবিতায় এই গোধূলিসন্ধির অধ্যায়টি আত্মজিজ্ঞাসার মতো ব্যক্ত, 'যেন শূন্যতার স্বাদ ঠোঁটে নিয়ে বিকেল বেলার/হাওয়া ঘুরে যায়।/শেষ রৌদ্র গায়ে মাখে শহর-তলির জীর্ণ বাড়ি।/কিছু পেলে?' এর সদুত্তর তিনি নিজেই দিয়েছেন। "নক্ষত্রজয়ের জন্য"-র 'একদিন ততদিন' কবিতায় তিনি বলেছেন, 'আমি তো অনন্তকাল তোমাদের কাছে/থাকতে আসিনি।' তখন তার নিহিত উত্তর এইভাবেই মিলে যায়, 'যে-অতিথি আমার ডাকের জন্যে অপেক্ষা করে না,/তার জন্যে/নিজেকে প্রস্তুত করে রাখি।' (দরজায় নারী-মূর্তি/কলকাতার যীশু)।

মৃণাল দত্ত

ত্রমাসিক চতুরঙ্গ পত্রিকার মালিকানা ও অন্যান্য বিবরণী

৪নং ফর্ম

। র্ল ৮ ।

। প্রকাশ স্থান: ৫৪ গণেশচন্দ্র এভেন্য, কলিকাতা ১৩
। প্রকাশের সময়: প্রতি তিন মাসে
। ম্দ্রাকর: আতাউর রহমান
জাতীয়তা: ভারতীয়
ঠিকানা: ৫৪ গণেশচন্দ্র এভেন্য, কলিকাতা ১৩
। প্রকাশক: আতাউর রহমান
জাতীয়তা: ভারতীয়
ঠিকানা: ৫৪ গণেশচন্দ্র এভেন্য, কলিকাতা ১৩
। সম্পাদক: দিলীপকুমার গ্প্ত
জাতীয়তা: ভারতীয়
ঠিকানা: ২৫।৪ একবালপ্র রোড, কলিকাতা ২৩
। স্বত্বাধিকারীদের নাম ও ঠিকানা: শ্রীমতী শান্তি কবির, ওয়েলেশলী রোড, নয়াদিল্লী ১১; জয়ন্তী লয়লা কবির, ঐ; ডঃ পি. কে. কবির, ৫৪ গণেশচন্দ্র এভেন্য, কলিকাতা ১৩; শ্রীমতী এন. রহমান, ৮এ শামস্ল হ্দা রোড, কলিকাতা ১৭।

।মি, আতাউর রহমান, এতদ্দ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে, পরিলিখিত বিবরণী আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য।

আতাউর রহমান
প্রকাশক

।রিখ ২৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৯